অর্চ্চনা

মাসিক পত্রিকা ও সমালোচনী।

একাদশ বর্ষ

ফাল্গুন ১৩২০ হইতে মাঘ ১৩২১

সম্পাদক—

শ্রীকেশব চন্দ্র গুপ্ত

প্রকাশক

শ্রীকৃষ্ণদাস ধর

অর্চ্চনা-কার্য্যালয়

১৮ নং পার্ব্বতীচরণ ঘোষের লেন, (অর্চ্চনা পোষ্ট) কলিকাতা

সহর মফঃস্বল সর্ব্বত্র বার্ষিক মূল্য ১।০ এক টাকা চারি আনা মাত্র

কলিকাতা
৫৩।২ সুকীয়া ষ্ট্রীট মণিকা প্রেসে
শ্রীহরিচরণ দে দ্বারা মুদ্রিত

অর্চ্চনা-সম্বন্ধে মতামত।

"অর্চ্চনা সুপরিচালিত মাসিক পত্রিকা। অর্চ্চনায় সুচিন্তিত ও সুলিখিত প্রবন্ধসমূহ প্রকাশিত হইতেছে। অর্চ্চনা বাঙ্গালায় শ্রেষ্ঠ মাসিক পত্রসমূহের অন্যতম বলিয়া পরিগণিত" —হিতবাদী।

"অর্চ্চনা সর্ব্বাংশে ভাল হইয়াছে। অর্চ্চনা সুপরিচালিত হইয়া মাসিকের মর্য্যাদা রক্ষা করিতেছে। সাহিত্যে অর্চ্চনার উচ্চ স্থান। অর্চ্চনার বার্ষিক মূল্য পাঁচ সিকা। ইহার গুণমূল্যের অনুপাতে পাঁচ সিকা অকিঞ্চিৎকর"।—বঙ্গবাসী।

"অর্চ্চনা পত্রিকাখানি বিশেষ দক্ষতার সহিত পরিচালিত হইতেছে। প্রবন্ধগুলি সারগর্ভ ও সুখপাঠ্য"।—বসুমতী।

* * এই উচ্চ শ্রেণীর মাসিক পত্রিকা "অর্চ্চনা" আজ কয় বৎসর ধরিয়া যেরূপ নির্ভীকভাবে বঙ্গ-সাহিত্যের ভাল মন্দ বিচার করিয়া আসিতেছে, যেরূপ অপক্ষপাতে ইহা সমালোচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছে, যেরূপ অল্পমূল্যে বিক্রীত হইয়াও সময়ে প্রকাশিত হইতেছে এরূপ পত্রিকা বর্ত্তমানে একখানিও দেখিয়াছি বলিয়া মনে হয় না। অর্চ্চনা বঙ্গ-সাহিত্যের গৌরব বৃদ্ধি করিবে সন্দেহ নাই। * * ইহা প্রত্যেক সাহিত্যসেবীরই পাঠ করা উচিত।—সময়।

"অর্চ্চনা কয়েক বৎসরেই প্রভূত প্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছে। "অর্চ্চনা" অনেক মাসিকের আদর্শ হইতে পারে। আলোচ্য সংখ্যার প্রবন্ধগুলি যে কোনও প্রতিষ্ঠাপন্ন মাসিককে অলঙ্কৃত করিতে পারে। অর্চ্চনা ক্ষুদ্র হইলেও অনেক লব্ধপ্রতিষ্ঠ মাসিকের অপেক্ষা উৎকৃষ্ট। * * এক সংখ্যায় এতগুলি সুখপাঠ্য ও সুলিখিত প্রবন্ধের সমাবেশ ঢক্কা-নিনাদী মাসিক সমূহেও দেখিতে পাই না।"—সাহিত্য।

হাইকোর্টের ভূতপূর্ব্ব বিচারপতি শ্রীযুক্ত সারদাচরণ মিত্র এম্-এ, বি-এল্ মহাশয় লিখিয়াছেন—

মাসিক-সাহিত্যে অনেকগুলি উৎকৃষ্ট কাগজের নাম করা যাইতে পারে। যতগুলি উৎকৃষ্ট পত্রিকা আছে, তাহার মধ্যে কলিকাতা হইতে প্রকাশিত * * অর্চ্চনা * * প্রভৃতি পুরাতন পত্রিকাগুলি * * প্রথম শ্রেণীর পত্রিকা বলিয়া গণ্য হইতে পারে।

অর্চ্চনা—মাসিক পত্রের ভিতর শ্রেষ্ঠতায় ইহা যে প্রথম শ্রেণীতে স্থান পাইয়াছে ইহা সর্ব্ববাদী সম্মত। অর্চ্চনার লেখকবর্গের ভিতর কাহাকে রাখিয়া কাহার নাম করিব? সকলেই সুপরিচিত বিখ্যাত সাহিত্যিক। * * অর্চ্চনা পড়িবার জিনিস, পাঁচজনকে পড়াইবার জিনিস। মাসিক প্লাবিত বাঙ্গালায় 'অর্চ্চনা'র আসন যে অনেক উচ্চে সে কথা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। —ভারতচিত্র।

ARCHANA—The publication is devoted to philosophical and incidentally Bengali interests. &c. &c.—*The Statesman & Friend of India.*

ARCHANA—This monthly magazine is always interesting reading and has a large circle of readers.—*The Indian Daily News.*

ARCHANA—We are glad to find that the Bengali monthly *Archana* has an assured place among the vernacular periodicals of the country and among the organs of Indian public opinion in Calcutta. It makes its appearance with characteristic punctuality. The articles are thoughtful, well-written, interesting reading and bear ample evidence of judicious editing. (Summary of Opinions)—*The Bengalee.*

ARCHANA—It contains many valuable and interesting articles * * This magazine can be recommended highly to the reading public.—*The Telegraph.*

বর্ণানুক্রমিক সূচী



কবিবর অক্ষয়কুমার

অর্চ্চনা

মাসিক পত্রিকা ও সমালোচনী।

একাদশ বর্ষ] ফাল্গুন, ১৩২০ [প্রথম সংখ্যা।

বুদ্ধ-তত্ত্ব।

রাত্রির পর দিন, অমাবস্যার পর পূর্ণিমা, গ্রীষ্মের পর বর্ষা ;—ইহা প্রকৃতির নিয়ম। আসুরভাবের পর দেবভাব প্রকাশ ;—ইহাও প্রকৃতির নিয়ম। নিয়ত পরিবর্ত্তনশীলা প্রকৃতি এক ভাবে থাকিতে পারে না। যাহা প্রকৃতির নিয়ম, তাহাই ঐশ্বরিক বিধান।

ঈশ্বরের যে মূর্ত্তি প্রকাশে দিনের উদয়, তিনি মার্ত্তণ্ড, ঈশ্বরের যে মূর্ত্তি প্রভাবে পূর্ণিমার প্রকাশ, তিনি সুধাংশু, ঈশ্বরের যে মূর্ত্তির মহিমায় বর্ষার প্রাদুর্ভাব, তিনি পর্জ্জন্য। এইরূপ পৃথিবীতে দেবভাবের অভ্যুদয় ও আসুরভাবের ক্ষয় ঈশ্বরের যে মূর্ত্তির আবির্ভাবে হইয়া থাকে—তিনিই অবতার।

উদ্দাম প্রবৃত্তি আসুরভাবের স্বরূপ। এই উদ্দাম প্রবৃত্তিই—বিলাস, লালসা, দর্প প্রভৃতি বিবিধ আকারে সমাজে প্রকট হইয়া থাকে। সংযমই—দেবভাব, শান্তি ও সন্তোষ প্রভৃতি ইহারই বিবিধ আকার। যখন দেখিবে ধর্ম্মজ্ঞান, ধন লালসার নিকট পরাজিত, শাস্ত্রজ্ঞান বিষয়-চিন্তার হস্তে লাঞ্ছিত, সংযমবুদ্ধি ভোগস্পৃহার নিকট পরাস্ত ; তখনই বুঝিবে—দেবভাবের অবসাদ ও আসুরভাবের অভ্যুদয়। যখন দেখিবে, ত্যাগ বিষয়সংগ্রহেরই প্রচ্ছন্ন উপায়, নিবৃত্তি উদ্দাম-প্রবৃত্তির প্রভাবে অভিভূত, ব্রাহ্মণ্য শক্তি অপর শক্তির প্রাবল্যে অবসন্ন ; তখনই বুঝিবে, দেবভাবের স্থলে আসুরভাবের প্রতিষ্ঠা। বৈপরীত্যেই দেবভাব

অন্যদেশে অজ্ঞান ও অবসাদময় পাশব ভাব এবং উদ্দাম প্রবৃত্তিময় আসুর-ভাবই প্রচুর পরিমাণে ও পর্য্যায়ক্রমে প্রতিষ্ঠিত; দেবভাবের স্ফূর্ত্তি সে সব দেশে অল্প; জলবায়ু ও প্রকৃতি গুণেই ভারতবর্ষের সহিত দেশান্তরের এই বৈলক্ষণ্য। কোন ভূমিতে ধান্য হয়, কোথায়ও বা রবিশস্য হয়, বাস্তবস্তু উৎপাদনে ভূমির বিভিন্ন অংশে এই প্রকার শক্তিভেদ সর্ব্বজনবিদিত। আসুরভাব ও দেবভাব প্রকাশে ভূমিগত শক্তিভেদ সর্ব্বজনবিদিত না হইলেও অন্তর্দর্শী মহাপুরুষগণের প্রত্যক্ষীভূত। দেশান্তরে দু' একজন মানবে দেবভাব থাকিলেও তাহা রাঢ় ভূমিতে কচিৎ উৎপাদিত নারিকেল বৃক্ষের ন্যায় কেবল উৎপাদয়িতার কৌশলই খ্যাপন করে, ভূমির শক্তি খ্যাপন করে না। দেবভাব-জননী শক্তি আছে বলিয়াই ভারতভূমি কর্ম্মভূমি। অন্যভূমি কর্ম্মভূমি নহে, সে ভূমিতে বৈধকর্ম্ম নাই, স্বর্গ ও অপবর্গপ্রদ দেবভাব নাই।

বর্ত্তমান সময়ে আমাদের কেবল এই ভারতভূমি নহে, সমগ্র পৃথিবীই আসুরভাবে আচ্ছন্ন, উদ্দাম প্রবৃত্তির পূর্ণ আধিপত্য সর্ব্বত্র। কেবল প্রকৃতি-ভেদে প্রবৃত্তির রূপ বিভিন্ন। ভারতে—অধস্তন আসুরভাবেরই অভ্যুদয়। এ ভাব দেখিলে মনে হয় না,যে,আর কখন দেবভাব—সংযম-শান্তি সন্তোষ প্রতিষ্ঠিত হইবে। মনে না হইলেও প্রকৃতপক্ষে কিন্তু প্রতিষ্ঠিত হইবেই, আসুরভাব দূর হইবেই, দেবভাবের প্রতিষ্ঠা হইবেই। এইরূপই হইয়া থাকে।

এক সময়ে ভগবান্ বেদব্যাসও বলিয়াছেন—

"ঊর্দ্ধ্ববাহুর্বিরৌম্যেষ ন চ কশ্চিচ্ছৃণোতি মে।
ধর্ম্মাদর্থশ্চ কামশ্চ স কিমর্থং ন সেব্যতে।"

অর্থ এবং কামভোগ ধর্ম্মফলেই হইয়া থাকে, সেই ধর্ম্ম সেবা তোমরা কেন করিতেছ না—এই কথা আমি ঊর্দ্ধবাহু হইয়া চীৎকার করিয়া বলিতেছি, কিন্তু আমার কথা কেহই শুনিতেছে না।

প্রকৃতই কেহই শুনে নাই, তাঁহার ঔরস পুত্র ধৃতরাষ্ট্রও যখন তাঁহার ধর্ম্ম উপদেশ ত্যাগ করিয়া লোভাভিভূত দুর্য্যোধনাদির অনুবর্ত্তী হইলেন, সংযমের ধর্ম আদরও করিলেন না, লালসার ক্রীড়া-পুত্তলী হইলেন—তখন আর কে শুনিবে? তখন বেদব্যাস মৈত্রেয় প্রমুখ ব্রাহ্মণবৃন্দ মর্ম্মাহত; সেই মর্ম্মব্যথাই উদ্ধৃত শ্লোকে পূর্ণ প্রকটিত। তখন ত্যাগশীল ধার্ম্মিক সর্ব্বলোকহিতে রত ব্রাহ্মণ ছিলেন। কিন্তু তাঁহার প্রভাব মন্দীভূত, জরাসন্ধ শিশুপালের বীরদর্প, ভৌমনাবের শিল্পবল, অন্ধকবৃষ্ণিকুলের ধনজন গরিমা, পাঞ্চালের ভীম অহঙ্কার,

সমাজকে অভিভূত করিয়াছিল; ক্ষত্রিয়ের রাজসশক্তির প্রভাবে দ্রোণাচার্য্যের ন্যায় সর্ব্বশাস্ত্রদর্শী ব্রাহ্মণও ক্ষাত্রবৃত্তির অনুগামী। ব্রাহ্মণের নিবৃত্তি বা সংযম, দুর্গম তপোবন বা দুষ্প্রবেশ মুনিহৃদয়েই প্রচ্ছন্ন, সমাজে প্রবৃত্তির একাধিপত্য। ইহাই তদানীন্তন আসুরভাব। সেই দুঃসময়ে জগৎপালক বিষ্ণু শ্রীকৃষ্ণরূপে অবতীর্ণ হইয়া ক্ষাত্রশক্তি প্রভাবেই ব্রাহ্মণ্যশক্তি উদ্বোধিত করিয়াছিলেন, ত্যাগী সংযমী যুধিষ্ঠিরের প্রভাব সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়া সমাজের উদ্দাম প্রবৃত্তি প্রতিহত করিয়াছিলেন; ব্রাহ্মণ্যশক্তি বা সংযম পুনরুজ্জ্বল করিয়া সনাতন বৈদিক ধর্ম্ম রক্ষা করিয়াছিলেন।

বহু শতাব্দী অন্তে আবর্ত্তিত চক্রনেমির ন্যায়, আবার আসুরভাব উত্থিত হইল। বিশ্বাসঘাতী অমাত্য শুনক প্রভুহত্যা করিয়া মগধরাজ সিংহাসনে স্বীয় পুত্র প্রদ্যোতকে অভিষিক্ত করিল; পুত্র বীরসেন রাজ্যলোভে জননীর সহিত ষড়যন্ত্র করিয়া করূষাধিপতি পিতা দধ্রের গুপ্তহত্যা সাধন করিল। ধনলোভে এইরূপ কত অকার্য্যই অনুষ্ঠিত হইতে লাগিল। রাজকুলের এইরূপ ধনলোভ ও দুষ্প্রবৃত্তি সমাজের সর্ব্বত্র সঞ্চারিত হইল; রাজা রাজ্যলোভে পুত্রহত্যা করিতে লাগিলেন। সংযমী ব্রাহ্মণ তখন অশক্ত, লুব্ধ পুত্রকেও পিতৃহত্যা হইতে নিবৃত্ত করিতে অক্ষম, লুব্ধ পিতাকেও পুত্রহত্যা হইতে নিবৃত্ত করিতে অক্ষম। তখন ধনের প্রভাবে ধর্ম্ম অভিভূত; রাজা ও ধনী উচ্ছৃঙ্খল—উচ্ছৃঙ্খলতা নিবারণে অশক্ত, কালের অনুবর্ত্তী কতিপয় ব্রাহ্মণ, প্রবলের পক্ষ; রাজার পুত্রহত্যায় বিধিদাতা। অর্থনীতিবিদ্‌গণ স্পষ্টাক্ষরে বলিলেন,—

"কর্কটসধর্ম্মাণো হি জনকভক্ষা রাজপুত্রাঃ"

রাজপুত্র ও কর্কট তুল্য—উভয়েই উৎপাদয়িতাকে বিনষ্ট করে।

ভরদ্বাজবংশধর এক নীতিবিদ্ বলিলেন—

"তেষা মজাতস্নেহে পিতর্য্যুপাংশুদণ্ডঃ শ্রেয়ান্।"

পুত্রের প্রতি পিতার স্নেহ জন্মাইবার পূর্ব্বে সূতিকাগারেই রাজপুত্রের গুপ্তহত্যাই উত্তম কল্প।

উত্তম কল্পই বটে, এমন না হইলে আর লোভের আধিপত্য। বিশালাক্ষ বলিলেন,—বড় নিষ্ঠুরতা, নিরপরাধের হত্যা অনুচিত, বিশেষতঃ এইরূপে ক্ষত্রিয় জাতিই যে বিলুপ্ত হইবে। অতএব "একস্থানোপরোধঃ শ্রেয়ান্" একস্থানে আবদ্ধ করিয়া রাখিবে। অর্থাৎ নিরপরাধে বা একমাত্র রাজপুত্র হইবার অপরাধে চিরকারাবাস। এক নীতিবিদ্ বলিলেন—উহাতে ভয় আছে, কারা-

ধ্যক্ষকে হস্তগত করিলেই ত সর্ব্বনাশ ; অতএব পুত্রকে বিলাসসুখে মগ্ন রাখাই কর্ত্তব্য। তাহা হইলে আর সে পিতৃদ্রোহী হইবে না। যথা "তস্মাদ্ গ্রাম্যধর্ম্মে যেনমবস্থজেয়ুঃ। সুখোপরুদ্ধা হি পুত্রাঃ পিতরং নাভিদ্রুহ্যন্তীতি" আসুরভাবের নিয়মই এই যে,—ধন হইতে তাহার প্রাদুর্ভাব, জ্ঞানকে সে পদদলিত করিয়া থাকে।

আসুরভাব প্রাপ্ত ধনী ত' কাহারও কথা মানিবে না, তাহার লোভের কণ্টক অপসারিত করিবেই, এ সময়ে সে যদি দু'টা অনুকূল কথা পায়, তাহার ত' আনন্দের সীমা থাকে না। সমাজে আসুরভাবের অভ্যুদয় হইলে—ধনীর সঙ্গে সঙ্গে ধনীর অনুবর্ত্তী ও আসুরভাবাপন্ন হইয়া থাকে। লোভের আধিপত্য এত অধিক যে, সর্ব্বত্যাগী ব্রাহ্মণও ধর্ম্মের প্রধান দ্বারে অপকর্ম্মকে প্রবেশ করাইতে না পারিয়া অর্থনীতির পক্ষদ্বারে তাহাকে প্রবিষ্ট করিয়াছিলেন। তবে ধর্ম্মশাস্ত্রের অপব্যাখ্যা করিয়া রাজার পক্ষে পুত্রহত্যাকে ধর্ম্মশাস্ত্রের অনুমোদিত বলিয়া যে প্রতিপন্ন করা হয় নাই—ইহা অবশ্য মন্দের ভাল। বর্ত্তমান সময়ের আসুরভাবে মন্দের ভালটুকুও নাই। যা হউক, ফল প্রায় তুল্য ; সমাজের নীতিধর্ম্মবিগর্হিত কর্ম্ম-নির্ব্বাহের জন্য ব্রাহ্মণের যে প্রযত্ন, তাহা হইতে আসুরভাবের প্রকৃষ্ট অভ্যুদয়—সর্ব্বত্রই পরিজ্ঞেয়।

ইহাই ধনলালসার নিকট ধর্ম্মের পরাভব, উদ্দাম প্রবৃত্তির ঝঞ্ঝাবাতে নিবৃত্তি-দীপের নির্ব্বাণতা, ইহাই অন্যশক্তির নিকটে ব্রাহ্মণ্যশক্তির পূর্ণ পরাজয়। এ সময়ে

"ন জাতু কামান্ন ভয়ান্ন লোভাদ্ধর্ম্মং ত্যজেজ্জীবিতস্যাপি হেতোঃ ॥"

"লালসা, ভয়, লোভ, এমন কি জীবনের জন্যও ধর্ম্মত্যাগ করিবে না"—বেদব্যাসের এই শাশ্বতবাণী ব্রাহ্মণেও ভুলিয়া থাকেন। আড়াই হাজার বৎসর পূর্ব্বে ধর্ম্মপ্রাণ ব্রাহ্মণও ইহা ভুলিয়া ছিলেন। তাই—রাজনীতির অনুবর্ত্তনে নিরপরাধ পুত্রের হত্যা, নির্ব্বাসন ও দুশ্চরিত্রতা সাধনের জন্য ব্যবস্থা দিয়াছিলেন। যখন ব্রাহ্মণও এইরূপ আসুরভাবাপন্ন হইলেন, যখন ভগবানের একটা বিভূতি ব্রাহ্মণশক্তি আসুরভাবদমনে অক্ষম হইয়া ভূতগ্রস্ত সর্ষপের ন্যায় আপনিই আসুরভাবে অভিভূত হইলেন, তখন সনাতন সমাজ রক্ষা কে করিবে? 'ধর্ম্মস্য গ্লানিঃ' এবং ব্রাহ্মণের অধঃপতনই—"অভ্যুত্থানমধর্ম্মস্য"—তাই শ্রীশ্রীবিষ্ণুর অবতার গ্রহণ প্রয়োজনীয় হইল, তিনি পশুহিংসা নিষেধের জন্য নহে, যাগযজ্ঞের বিরোধের জন্য নহে, কর্ম্মমার্গ উচ্ছেদের জন্য নহে—কিন্তু আর্ত্তত্রাণের জন্য,

সনাতন সমাজের রক্ষার জন্য, বৈদিক ধর্ম্মের প্রতিষ্ঠার জন্য, যেমন যুগে যুগে অবতীর্ণ হইয়াছেন, তেমনই সেই একই উদ্দেশে করুণাময় জগৎপালক—আসুরভাবের উন্মূলনের জন্য বুদ্ধরূপে অবতীর্ণ হইলেন, দেবভাবের অভ্যুদয়ের জন্য অবতীর্ণ হইলেন। বেদেই আছে—কর্ম্মে মুক্তিলাভ হয় না, জ্ঞানেই মুক্তিলাভ হয়; কর্ম্মে চিত্তশুদ্ধি হয়—এই সিদ্ধান্ত নিজশাস্ত্রে থাকিলেও আসুরভাবের প্রভাবে ব্রাহ্মণও এ সিদ্ধান্ত ভুলিয়াছিলেন। স্পষ্ট শাস্ত্রবাক্য থাকিলেও—তাহা নিজমতের অনুকূল নহে বলিয়া উপেক্ষিত হইয়াছিল, পূর্ণ বা আংশিক অবিশ্বাস—আসুরভাবেরই ফল, অবিশ্বাসের আচ্ছাদন অপব্যাখ্যাও আসুরভাবের ফল। সেই আসুরভাবের ফলেই বেদের উপনিষৎ অংশ অন্যভাবে ব্যাখ্যাত এবং অপ্রমাণবৎ পরিগণিত হইয়াছিল; পুরাণাদির প্রামাণ্য সর্ব্বত্র স্বীকৃত হইত না।

'মা গৃধঃ কস্যস্বিদ্ধনম্' ধনলোভীর কর্ণে এ উপদেশ স্থান পায় নাই, "মা হিংস্যাৎ সর্ব্বাভূতানি" কোন প্রাণীরই হিংসা করিতে নাই, বেদের এ উপদেশ এক প্রকার অকর্ম্মণ্যই হইয়াছিল; তখন সমাজ কেবল ধন, প্রতিষ্ঠা ও বিলাস লইয়াই উন্মত্ত। ধনাদি লাভের পথে যে অন্তরায় হইত, পিতা হউন পুত্রই হউক তাহার বধেও অনেকে কুণ্ঠিত হইত না।

"ইমা রামাঃ সরথাঃ সতূর্য্যা নহীদৃশা লম্ভনীয়া মনুষ্যৈঃ।" বলিয়া স্বয়ং যম মানবদুর্লভ দিব্য রমণী রথতূর্য্য ও রত্নময়ী মালিকা অর্পণে উদ্যত হইয়াও নচিকেতাকে প্রলুব্ধ করিতে পারেন নাই; "শ্বোভাবামর্ত্ত্যস্য যদন্তকৈতৎ" বলিয়া নচিকেতা লোভসম্বরণ করিয়াছিলেন, হায়! সেই নচিকেতার ত্যাগচিত্রও আসুরভাবের অভ্যুদয়ে অর্থবাদের বিড়ম্বনায় উপেক্ষিত। কিন্তু, কর্ম্ম ও জ্ঞানকাণ্ডময় সমগ্র বেদ, পুরাণ, স্মৃতি ও তন্ত্র—পুরাণ স্মৃতি তন্ত্রের কথা বাদ দিলেও সমগ্র বেদ একবাক্যে শিখাইয়াছেন—

"যদা সর্ব্বে প্রমুচ্যন্তে কামা যেঽস্য হৃদি শ্রিতাঃ।
অথ মর্ত্ত্যোঽমৃতো ভবত্যত্র ব্রহ্ম সমশ্নুতে॥"

কামনাত্যাগ বা বৈরাগ্যফলে মুক্তিলাভ হয়।

"অপশ্যং গোপাম্" ইত্যাদি ঋগ্বেদসংহিতা মন্ত্রে অদ্বৈতবাদ উপদিষ্ট।

"তমেতং বেদানুবচনেন ব্রাহ্মণা বিবিদিষন্তি যজ্ঞেন"

ইত্যাদি উপনিষদ্ ও "ক্রিয়াবন্তঃ শ্রোত্রিয়া ব্রহ্মনিষ্ঠাঃ" ইত্যাদি উপনিষদ্ মন্ত্রের মহিমায় অনুভূত হয়—যজ্ঞ ব্রহ্মজ্ঞান লাভের উপায়, মুক্তির সাক্ষাৎ উপায় নহে।

চিত্তশুদ্ধির হেতু বলিয়াই কর্ম্ম কর্ত্তব্য। "স্বর্গকামো যজেত"—যাহার কামনা আছে, বৈরাগ্য অভ্যাস যাহার হয় নাই, তাঁহার কামনা-সঙ্কোচ ও কর্ম্মসঙ্কোচ আবশ্যক—কামনাফলে যাদৃচ্ছিক কর্ম্ম করিয়া "জায়স্ব ম্রিয়স্ব" বা নরকভোগ না করে—নরকভোগের পর কামনার মলিনতা লইয়া পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ না করে, চিত্তশুদ্ধিলাভের উপযুক্ত জন্মগ্রহণে অধিকারী হয়, এইজন্যই যাগযজ্ঞ ব্যবস্থা। যে প্রাণাপেক্ষা প্রিয় ধন—ধর্ম্মবিশ্বাসে সহর্ষে ত্যাগ করিতে পারে, তাহার মন নিবৃত্তি অভিমুখে,—এই নিবৃত্তি-আভিমুখ্য সম্পাদনের জন্যই বেদে—

"উচ্চা দিবি দক্ষিণাবন্তো অস্থুর্যে অশ্বদাঃ সহ তে
সূর্য্যেণ। হিরণ্যদা অমৃতত্বং ভজন্তে।"—

ইত্যাদি মন্ত্রে অশ্ব হিরণ্য প্রভৃতি দক্ষিণাদানের উৎকৃষ্ট ফল কীর্ত্তিত হইয়াছে। আবার এই ফলাকাঙ্ক্ষামূলক যজ্ঞ যে মুক্তির উপায় নহে,তাহাও বেদে স্পষ্টাক্ষরে কীর্ত্তিত হইয়াছে—

"প্লবা হেতে অদৃঢ়া যজ্ঞরূপাঃ" এবং "কর্ম্মণা মৃত্যুমৃষয়ো নিষেদুঃ প্রজাবন্তো দ্রবিণমীহমানাঃ।" নিষ্কাম কর্ম্ম মুক্তির উপায়।

"কুর্ব্বন্নেবেহ কর্ম্মাণি জিজীবিষেচ্ছতং সমাঃ।"

কর্ম্মাণ্যেব কুর্ব্বন্—কেবল কর্ম্ম করিবে—ফলাকাঙ্ক্ষা করিবে না—ইহাই শ্রীগীতোপনিষদে "কর্ম্মণ্যেবাধিকারস্তে মা ফলেষু কদাচন"—বলিয়া ব্যাখ্যাত।

কর্ম্মে—চিত্তশুদ্ধি—নিবৃত্তির প্রতি আভিমুখ্য, মনোনিগ্রহের জন্য ধ্যান, ফলাকাঙ্ক্ষা ত্যাগ, বৈরাগ্য, তত্ত্বজ্ঞান—মুক্তি। ইহাই শ্রুতিস্মৃতি প্রভৃতি সর্ব্বশাস্ত্রের সিদ্ধান্ত।

আসুরভাবের প্রভাবে নিবৃত্তির অবসাদ, ফলাকাঙ্ক্ষা বর্জ্জনে অসামর্থ্য, বৈরাগ্যে বিরাগ, ফলে উৎকট আকাঙ্ক্ষা সমাজে উদ্দীপ্ত হইল। "এবমেবামুত্র পুণ্যজিতো লোকঃ ক্ষীয়তে"—বলিয়া কর্ম্মফলে যে স্বর্গলাভ হয় তাহারও ক্ষয় আছে—বেদ উপনিষদ্ দ্বারা এই তত্ত্ব উপদেশ করিলেও সমাজ তাহা ভুলিয়া গেল। ব্রাহ্মণও তাহা ভুলিলেন। এই বেদোক্তধর্ম্মতত্ত্ব সমাজে সর্ব্বত্র শিক্ষা দিবার জন্যই ভগবান্ আদর্শ প্রদর্শন ও উপদেশ প্রচারে ব্রতী হইলেন। নবীন উপায়ে বর্ণাশ্রমধর্ম্মমূলক বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম প্রতিষ্ঠা করিতে অগ্রসর হইলেন।

যে রাজ্যভোগের জন্য তখন—ভ্রাতৃহত্যা, পতিহত্যা, পিতৃহত্যা ও পুত্রহত্যা প্রভৃতি ঘোরতর অকার্য্য অবলীলাক্রমে অনুষ্ঠিত হইত, সেই দেবদুর্লভ রাজ্য-সম্পদ এবং পতিপ্রাণা যুবতী রমণী তৃণের ন্যায় ত্যাগ করিলেন, এইরূপে

নিবৃত্তির উচ্চাদর্শে দেবভাবের সংযমের ভিত্তি দৃঢ় করিয়া উদ্দাম প্রবৃত্তির বিরুদ্ধে—আসুরভাবের বিরুদ্ধে, অভ্যুত্থিত হইলেন। যে ভাব লইয়া নচিকেতা যমকে বলিয়াছিলেন—"শ্বোভাবা মর্ত্ত্যস্য যদন্তকৈতৎ, সর্ব্বেন্দ্রিয়াণাং জরয়ন্তি তেজঃ", যে ভাব লইয়া আবার বলিয়াছিলেন "ন বিত্তেন তর্পণীয়ো মনুষ্যঃ" যে ভাব লইয়া পুনর্ব্বার বলিয়াছিলেন—"অভিধ্যায়ন্ বর্ণরতি প্রমোদানতি দীর্ঘে জীবিতে কো রমেত" সেই ভাব জাগাইতে বেদ উপনিষদের মর্ম্মার্থ সমাজে সুপ্রতিষ্ঠিত করিতে বুদ্ধদেব বলিলেন—

"ক্ষণিকং ক্ষণিকং" "দুঃখং দুঃখং"। এই দুই উপদেশই বেদ-উপনিষদে প্রচারিত।

"শ্বোভাবা মর্ত্তস্য" ইত্যাদি মন্ত্র 'ক্ষণিকং ক্ষণিকং' ইহার মূল। "ন বিত্তেন তর্পণীয়ো মনুষ্যঃ" "সর্ব্বেন্দ্রিয়াণাং জরয়ন্তি তেজঃ" "অতিদীর্ঘে জীবিতে কো রমেত" এবং "তদ্‌যথেহ কর্ম্মজিতো লোকঃ ক্ষীয়তে এবমেবামুত্র পুণ্যজিতো লোকঃ ক্ষীয়তে" "নাল্পে সুখং" ইত্যাদি মন্ত্র ও ব্রাহ্মণ "দুঃখং দুঃখং" ইহার মূল। জগতের নশ্বরত্ব চিন্তা এবং দুঃখময়ত্ব চিন্তা হইতেই সংযম, নিবৃত্তি এবং বৈরাগ্য সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়া থাকে; এই চিন্তাই বর্ণাশ্রমধর্ম্মের মূল; ইহার প্রতিষ্ঠাই বৈদিকধর্ম্মের প্রতিষ্ঠা। বুদ্ধদেব স্বীয় উপদেশে সমাজে এই বেদ-উপনিষদের উপায়-নির্দ্দেশ সুপ্রতিষ্ঠিত করিলেন, উপনিষদের নাম করিলেন না,—উপনিষদের ব্যাখ্যা ও অপব্যাখ্যার শুষ্কতর্কের অবসর দিলেন না, নিজ আদর্শ ও সরল বাক্য উপনিষদের সত্যতত্ত্ব প্রচার করিলেন; এই নবীন উপায়ে আসুরভাব উদ্দাম প্রবৃত্তির মস্তকে লগুড় প্রহার হইল;—সংযম ও নিবৃত্তির তেজ প্রকাশিত হইল, দেবভাবের অভ্যুদয় হইল। বৈরাগ্য—উপায়, মুক্তি—উপেয়। ভগবান্ প্রথম দুইটী উপদেশে বেদ-উপনিষদের উপায় সাধনা-শিক্ষা দিলেন, আর দুইটী উপদেশে বেদ-উপনিষদের উপেয় সাধনা মুক্তি উপায় শিক্ষা দিলেন; সে দুই উপদেশ,—

'স্বলক্ষণং স্বলক্ষণং' 'শূন্যং শূন্যং'

স্ব—আত্মা ব্রহ্ম, তিনি ভিন্ন জগতের আর কিছু লক্ষণ নাই, চিহ্ন নাই, তাঁহার সত্তাতেই জগৎসত্তা, ইহাই 'স্বলক্ষণং' ইহার অর্থ—মূল উপনিষদ;—

"অয়মাত্মা ব্রহ্ম" "একমেবাদ্বিতীয়ং" "নেহ নানাস্তি কিঞ্চন" "বাচারম্ভণং বিকারো নামধেয়ং মৃত্তিকেত্যেব সত্যং" "স্বে মহিম্নি" ইত্যাদি বিবিধ উপনিষদ্ বাক্যেই স্বলক্ষণতত্ত্ব উপদিষ্ট।

স্ব-স্বরূপ কি তাহা বুঝাইবার জন্যই "শূন্যং শূন্যং", ইহার মূল উপনিষদে

"খং ব্রহ্ম" "আকাশশরীরঃ" "আকাশাত্মা" ইত্যাদি স্থলে স্পষ্ট অভিব্যক্ত। এই শূন্যতত্ত্ব "দহর" উপাসনায় বিশেষ উপযোগী।

উপনিষদে আছে,—

তেষামসৌ বিরজো ব্রহ্মলোকোন যেষু জিহ্মমনৃতং ন মায়া" ইহাই বৌদ্ধ-ধর্ম্মের শীলপ্রশংসার মূল। এই সকল সংক্ষিপ্ত সিদ্ধান্তের ন্যায় ত্রিপিটক ও উপনিষদ্ মূলক; এই সংক্ষিপ্ত প্রবন্ধে সে তত্ত্ব প্রতিপাদন অসম্ভব। অবসর মত ত্রিপিটক ব্যাখ্যায় তাহা প্রতিপাদন করিতে প্রয়াস করিব। এই সকল সিদ্ধান্ত-উপদেশের ফলে রাজপ্রসাদাকাঙ্ক্ষা ভোগাসক্ত তাৎকালিক ব্রাহ্মণগণের নয়ন উন্মীলিত হইল, উদ্দাম-লালসাগ্রস্ত ক্ষত্রিয়াদির চৈতন্য হইল; সমাজ জাগিয়া উঠিল। ব্রাহ্মণগণ আসুরভাবের মোহে আপনাদের যে ধন হারাইয়া-ছিলেন, বুদ্ধদেবের প্রভাবে তাঁহারা আবার সেই ধন পাইলেন, সম্মুখে রাজ-পুত্রের রাজ্যসম্পদ্ ত্যাগের আদর্শ দেখিয়া এবং তাঁহার উপদেশের মূলতত্ত্ব আপনাদের পুরাতন পুস্তকে নিহিত দেখিয়া তাঁহারাও পূর্ব্বপুরুষদিগের ন্যায় ত্যাগী হইলেন, শাস্ত্রের সর্ব্বতঃ প্রামাণ্য প্রকটনে মনোযোগী হইলেন। তাঁহাদের সেই উদ্যমের প্রথম প্রসিদ্ধ যোগাবতার বাৎস্যায়ন বা চাণক্য, দ্বিতীয় গৌড়পাদ, তৃতীয় ও প্রধান ভগবান্ শঙ্করাচার্য্য। আরও অনেক মহাপুরুষের আবির্ভাব এই সময়েই হইয়াছিল। বাৎস্যায়ন বা চাণক্য, ধর্ম্মহীন অর্থনীতিকে ঘৃণা করিয়া বলিয়াছিলেন,—"ছিঃ, পুত্রহত্যা, নিরপরাধে কারাদণ্ড এ সবত নিতান্ত অকর্ত্তব্য। বিলাসসুখে নিমজ্জনও কি করিতে আছে, তাহা যে জীবন্মরণ"। চাণক্য স্পষ্ট বলিলেন,—

"জীবন্মরণমেতৎ"। তবে উপায়? উপায় ধর্ম্মবল ও শিক্ষা। রাজা ও রাজ্ঞী কামনা-প্রবৃত্ত না হইয়া ধর্ম্মভাবে মিলিত হইবেন, মহিষীর জন্য ঐন্দ্র বার্হস্পত্য চরু সম্পাদিত হইবে। সন্তান জন্মিলে শাস্ত্রোক্ত উপযুক্ত সংস্কার হইবে তৎপরে "সমর্থং তদ্বিদো বিনয়েয়ুঃ" শিক্ষাগ্রহণ সমর্থ হইলে, সুশিক্ষক তাহাকে শিক্ষা প্রদান করিবেন। ইহাই রাজপুত্র রক্ষা। চাণক্য এইরূপে অর্থনীতির সংশোধন করিয়া ন্যায়ভাষ্যে বৈরাগ্যের উপদেশ দিয়াছেন। গৌড়পাদ প্রভৃতির উপদেশ বেদান্তাদি গ্রন্থে প্রসিদ্ধই আছে। বুদ্ধদেবের জগন্মঙ্গল অবতার, এই সকল সদুপদেশ প্রতিষ্ঠার মূলীভূত।

যে সময়ে সমাজে ধনের প্রতিষ্ঠা সেই সময়ে ধনীগৃহে জন্মগ্রহণ করিয়া ধন-সম্পদ ত্যাগ করিলে যেরূপ নিবৃত্তির প্রভাব প্রচারিত হয়, অন্য শত উপায়েও

সেরূপ হয় না। তখনও সন্ন্যাসী ব্রহ্মচারীর একান্ত অভাব ঘটে নাই, কিন্তু তাঁহার আদর্শ ধনাসক্ত সমাজে গৃহীত ও প্রতিষ্ঠিত হইত না, অনেক সময়ে বরং "তুরগ-ব্রহ্মচর্য্যে"র দৃষ্টান্তে উপহসিত হইত। ভগবান্ লোকরক্ষার্থ—সনাতন ধর্ম্মরক্ষার্থ সেইজন্যই ক্ষত্রিয়রাজকুলে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। প্রকৃষ্ট বৌদ্ধধর্ম্ম গ্রন্থ ললিতবিস্তরে এই ভাবের কথাই আছে।

তাৎকালিক ভোগাসক্ত ব্রাহ্মণের দর্পচূর্ণ করিয়া, ক্ষত্রিয়াদির উদ্দাম প্রবৃত্তি সংযত করিয়া,আসুরভাব প্রশমিত করিয়া,বৈদিক ধর্ম্মের সনাতন ধর্ম্মের প্রতিষ্ঠা করিয়া ভগবান্ লীলা-সম্বরণ করিলেন। সেই অবসরে আসুরভাব অন্য আকারে সমাজে প্রবেশ করিতে উদ্যত হইল। বুদ্ধদেবের শিষ্য প্রশিষ্যগণের মধ্যে বেদবিদ্বেষ এবং অবৈদিক সংস্কার আধিপত্য বিস্তার করিল; "ক্ষণিকং ক্ষণিকং" হইতে ক্ষণভঙ্গবাদ সৃষ্টি হইল—"স্বলক্ষণং" হইতে নিরীশ্বরবাদের অভিব্যক্তি হইল, "শূন্যং" হইতে সর্ব্বশূন্যবাদের উৎপত্তি হইল;—এইরূপ বেদবিরুদ্ধ-মতের প্রতিকূলে নব বল প্রাপ্ত সংযমী ব্রাহ্মণগণ বদ্ধপরিকর হইলেন। বুদ্ধদেব উপনিষদের যে বিলুপ্তপ্রায় অর্থ উপদেশ করিয়াছিলেন, তাহারই প্রভাবে, শ্রীমদ্-ভগবদ্ গীতার তত্ত্ব হৃদয়ঙ্গম করিয়া সংযমী ব্রাহ্মণগণ পরবর্ত্তী বৌদ্ধাচার্য্যগণের আসুরভাব প্রসূত মত সমূহ খণ্ড খণ্ড করিলেন। জগৎ নিরীশ্বর নহে, যাগ-যজ্ঞাদি ঈশ্বরোপাসনা, চিত্তশুদ্ধির উপায়,—ব্রাহ্মণগণ ইহা বুঝিয়াছিলেন। তাঁহারা বুঝিয়াছিলেন যাগযজ্ঞ হইতে ব্রহ্মজ্ঞান পর্য্যন্ত সমস্তই একসূত্রে গ্রথিত, একই সাধ্যসাধন পরম্পরার অন্তর্নিবিষ্ট। সকলকেই তাহা তাঁহারা বুঝাইলেন। সমাজের ভ্রম অপনীত হইল। বেদবিরুদ্ধ মত ভারতবর্ষ হইতে অপসারিত হইল। নিরীশ্বরবাদযুক্ত আসুরভাব উন্মূলিত হইল।

যে লালসার স্রোতে ধর্ম্ম ভাসিয়া গিয়াছিল, শ্রুতি স্মৃতি ভারত পুরাণের উপদেশ অকর্ম্মণ্য হইয়াছিল, পুত্রহত্যা ব্যবস্থাও প্রদত্ত হইয়াছিল, বুদ্ধদেবের প্রবর্ত্তিত নবীন উপায়ে সে লালসা নিবৃত্ত হইল, বৈদিক ধর্ম্ম ও সুশিক্ষার প্রতিষ্ঠা হইল, মলিনতাপ্রাপ্ত সনাতন সমাজ পুনরুজ্জ্বল হইল। ইহাই ইচ্ছাময়ের ইচ্ছা।

শ্রীপঞ্চানন তর্করত্ন।

স্মৃতি।

১

রাস্তা হেঁটে আমি পথিক
আধ শতাব্দীর চেয়েও অধিক,
দেখ্‌ছি এসে অবশেষে, সাথের সাথী যারা
চলে গেছে পাশ্‌ কাটিয়ে
সিন্ধু-পথে পাল্‌ খাটিয়ে,
কিংবা ঊর্দ্ধে পুষ্পরথে, এড়িয়ে দেহের কারা!

২

একলা এখন বস্‌ছি জুড়ে,
পান্থ-শালার ভাঙ্গা কুঁড়ে,
ধূ-ধূ ক'চ্ছে দূরে দূরে সাগর-কূলের বালি।
মাথার উপর কুঁড়ের চালে,
পথের ধারে শুক্‌নো ডালে,
কাক ডাকিছে রুক্ষ স্বরে দুঃখ ঢেলে খালি।

৩

মনের ভুলে যখন খুলি'
তালি-দেওয়া স্মৃতির ঝুলি,
হাত্‌ড়ে খুঁজে প্রাচীন সুখের মালা জড়াই গলে;
নেড়ে চেড়ে দেখে খানিক
স্নেহ-প্রীতির রত্ন-মাণিক,
ফস্‌কা গেরো এঁটে আবার জড়িয়ে রাখি থলে।

৪

দিনের শেষের ছায়ার তলে
সন্ধ্যা কাঁপে দীঘির জলে!
চাঁদের আলো মেঘের মাঝে, স্তব্ধ ধরাতল।
কোথা সঙ্গী, কোথা সখা?
করুণ সুরে কাঁদে চকা!
পরপারের পানে চেয়ে চোখে আসে জল।

৫

দূরের পথে এ যে রাত্রি!
আর কত দূর যাবি যাত্রী?
ঐ কে বলে, চির-দীপ্ত পরপারের ধরা!
আলো নয়, আলেয়ার খেলা!
ধাঁধায় কাটে আঁধার বেলা,
জীবন তার-ই স্মৃতি-ঘেরা স্বপ্ন দিয়ে গড়া!

শ্রীবিজয়চন্দ্র মজুমদার।

হীরু মণ্ডল।

মুনুর বয়স নয় বছর মাত্র। মেয়েটী এত রাগী আর খাম্‌খেয়ালী যে, পাড়ার সকলেই তাহাকে 'উগ্রচণ্ডা' বলিয়া ডাকিত। দেখিতে দিব্য সুন্দর, ফুট্‌ফুটে,—তাহার সর্ব্বাঙ্গেই যেন অনবরত একটা তড়িৎ প্রবাহ ছুটিয়া যাইতেছে। স্বভাবটাও নিতান্ত একগুঁয়ে; যাহার উপর চটিবে, তাহার আর রক্ষা নাই; আবার যাহার উপর সুদৃষ্টি পড়িবে, তাহার সহিত একেবারে অভিন্ন-প্রাণ!

মুনুর পিতা 'সহুরে' লোক। গ্রীষ্মের সময় তিনি মেয়েকে তাঁহার পিসীর বাড়ী পাঠাইয়া দিলেন। পিসী পল্লীগ্রামে থাকিতেন। মুনু খোলা জায়গায় আসিয়া রাত্রিদিন কেবল ছুটাছুটি করিতে লাগিল।

মুনুর পিসীমা অতি নিরীহ প্রকৃতির লোক। তিনি বালিকা মুনুর বাচালতা দেখিয়া স্তম্ভিত হইলেন! বালিকা আসিয়া সর্ব্বদাই ছট্‌ফট্ করে,—কখনও ঘরের চালে উঠিয়া বসে, কখনও বা পোষা টিয়াটার লেজ ধরিয়া টানে!—তার প্রত্যেক অঙ্গভঙ্গী পিসীমার আতঙ্কের কারণ হ'য়ে উঠে,—বুঝিবা কোনও দুষ্কর্ম্ম করিয়া ফেলিল! কিছুতেই আঁটিয়া উঠিতে না পারিয়া পিসী এক ফন্দী বাহির করিলেন। বালিকার একটু-কিছু দুষ্টামী দেখিলেই তিনি বলিতেন—"যা' ঠাকুরঘরে গিয়ে যে দোষ করিছিস্, তার জন্যে ক্ষমা চাইগে।" যতক্ষণ মেয়ে ঠাকুরঘরে থাকিত, ততক্ষণ পিসী হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিতেন।

একদিন সকালে মুন্নু পিসীর সঙ্গে বেড়াইতে বেড়াইতে সুযোগ বুঝিয়া পিসীর হাত ছাড়িয়া পালাইল। সেই প্রকাণ্ড মাঠের উপর দিয়া লাফাইতে লাফাইতে একটা পচা, পানাপুকুরের ধারে আসিয়া পড়িল। সেখানে দেখিল,—পুকুরের পাড়ে এক বৃদ্ধ কৃষক জলে পা ডুবাইয়া নিশ্চল ভাবে বসিয়া আছে। লোকটা এত শীর্ণ ও নিস্পন্দ যে, দেখিলে মরা মানুষ বলিয়াই ভ্রম হয়! বালিকা ধীরে ধীরে নিকটে আসিয়া বলিল—"বাঃ, বেশ জায়গাটিত"! বৃদ্ধ একবার ঘাড় বাঁকাইয়া চাহিল, তারপর শুষ্ককণ্ঠে কহিল—"হাঁ, খুকী!"

"এখানে কি পা ধোয়া হ'চ্ছে?"

"কই,—না।"

"তবে জলে পা ডুবিয়ে কি ক'চ্ছ?"

"আমি এখানে বসে জোঁক ধরি।"

"কি ব'ল্লে?"

"জোঁক ধরি।"

"জোঁক? জোঁক খাও নাকি?"

"না,—বেচি।"

"কত ক'রে পাও?"

"সময় মত দর বদলায়। কখনও একটা এক পয়সা, কখনও বা জোড়া সাড়ে তিন পয়সা পর্য্যন্ত উঠে।"

"জোঁক কি ক'রে ধর'? কই, ছিপ্‌ টিপ্‌ ত' কিছু দেখ্‌ছি না।"

"পায়ে করেই ধরা যায়—দাঁড়াও, দেখাই।"

বৃদ্ধ আরও নীচে পা নামাইয়া দিল ও কিছুক্ষণ পরে হাত ডুবাইয়া তাহার দক্ষিণ পদলগ্ন একটা জোঁক টানিয়া তুলিল।

মুন্নু বহুক্ষণ ধরিয়া পোকাটা দেখিতে লাগিল। "জোঁক কি খুব কামড়ায় যা'তে রক্ত বেরিয়ে আসে?" বলিতে বলিতে তাহার অঙ্গ কাঁপিয়া উঠিল।

বৃদ্ধ বলিল—"হাঁ, কামড়ায় বৈকি!"

"রোজ ক'টা ক'রে ধর'?"

"এই বাঁশের মত পায়ে গোটা বার' উঠিলেই যথেষ্ট মনে করি।" এই বলিয়া লোকটা তাহার গভীর রেখাঙ্কিত মুখ মুন্নুর মুখের দিকে ফিরাইল। মুন্নু তাহার অর্দ্ধ নিমীলিত চক্ষু দু'টি দেখিয়া শিহরিয়া উঠিল। দেখিল,—বৃদ্ধের চক্ষে লেশমাত্র জ্যোতিঃ নাই।

বালিকা ইতিপূর্ব্বে একটা মনসার ডাল তুলিয়া আনিয়াছিল। এখন অন্যমনস্ক ভাবে সেইটা জলের মধ্যে নাড়িতে লাগিল। হঠাৎ ডালের তীক্ষ্ণ আগাটা বুড়ার পায়ে বিঁধিয়া গেল। বৃদ্ধ বলিল—"চুপ্ এই আর একটা জোঁক আসিয়া লাগিয়াছে"। অতি সন্তর্পণে সে জলে হাত ডুবাইল, কিন্তু, কই, কোথাও ত জোঁক নাই।

বুড়া একটু অপ্রতিভ হইল—"এঃ হে, ভারি ভুল হয়েছে।"

মুনু কিন্তু বুঝিল, ব্যাপারটা কি! বৃদ্ধ যে তাহার হাতের ডালটা দেখিতে পায় নাই, এই ভাবিয়া সে একটু বিস্মিত হইল। বোধ হয়, বৃদ্ধ চোখে তত দেখিতে পায় না। আচ্ছা, দেখা যাউক! এবার ইচ্ছা করিয়া সে ডালটা বুড়ার পায়ের দিকে চালাইল।

বৃদ্ধের মুখে হর্ষের প্রভা ফুটিয়া উঠিল! "জোঁকটা আবার এসেছে—উঃ, কি কাম্‌ড়াচ্ছে!"

মুনু হাসি চাপিতে পারিতেছিল না। ওঃ কি মজা! বুড়োটা কাঁটাকে জোঁক মনে করেছে। ভারি হাসির ব্যাপার ত'! পাছে সাম্‌নে হো হো করিয়া হাসিয়া ফেলে এই ভয়ে বালিকা মাথা ফিরাইয়া লইল।

অনেকক্ষণ ধরিয়া মুনু বুড়াকে ঠকাইয়া বিপুল আমোদ উপভোগ করিতেছিল। "ওঃ, কত জোঁক ধ'র্‌ছে! আর এম্‌নি কামড়াচ্ছে!"—এই বলিয়া বৃদ্ধ তাহার শীর্ণ হস্ত ঘন ঘন চালাইতেছিল, কিন্তু একটাও জোঁক ধরিতে না পারিয়া হতবুদ্ধি হইয়া পড়িল। হঠাৎ একবার তাড়াতাড়ি জলে হাত দিতে খপ্ করিয়া ডালটা ধরিয়া ফেলিল!

মুনু হাতের ডাল ছাড়িয়া দিয়া লাফাইয়া উঠিল। তাহার ইচ্ছা হইল, দ্রুত পলাইয়া যায়! কিন্তু হৃদয়ে নিদারুণ আঘাত পাইল। তাড়াতাড়ি পকেট হইতে একটা সিকি বাহির করিয়া সে বৃদ্ধের দিকে হাত বাড়াইল।

"বুড্‌ঢা, এতক্ষণ তুমি কত জোঁক ধরিতে—তার বদলে এই সিকিটা নাও।"

বৃদ্ধ দাঁড়াইয়া উঠিল—তাহার পা ঠক্ ঠক্ করিয়া কাঁপিতেছিল,—মুখ বিবর্ণ হইয়া গিয়াছিল,—সেই স্তিমিতপ্রায় চক্ষু দু'টী আরও অঙ্গারের ন্যায় জ্বলিতেছিল।

"খুকী, আমার নাম হীরু মণ্ডল" আবেগভরে তাহার গলা কাঁপিতেছিল—"আমি এখানে পঁচিশ বৎসর পঞ্চায়তে স্থান অধিকার করিয়া আছি—ভিক্ষা আমি কখনও করি নাই।"

তারপর সেই সিকিটা স্পন্দনহীন বালিকার দিকে ফেলিয়া দিয়া আবার সেই পুকুরের ধারে জোক ধরিতে বসিল।

মুনু চলিয়া গেল—তাহার চক্ষু দু'টী জলে ভাসিতেছিল। সেদিন রাত্রে সে কিছুই খাইতে পারিল না—শয্যায় শুইয়াও সমস্ত রাত্ জাগিয়া রহিল। তাহার মনে হইল যে, সে একটা ভয়ানক অন্যায় কাজ করিয়াছে, ও পরদিন প্রাতে পিসীর বিনা আদেশেই ঠাকুরঘরে গিয়া মাথা কুটিতে লাগিল! বেচারী তাহার দোষকে দশগুণ বাড়াইয়া তুলিয়া স্পষ্টই স্বীকার করিল যে, সে একটী অসহায় বৃদ্ধকে হত্যা করিয়া আসিয়াছে। প্রায়শ্চিত্তস্বরূপ সেদিন বেলা দুইটা অবধি সে তাহার ইস্কুলের স্তোত্র আওড়াইতে লাগিল।

সেদিন বৈকালে সে আবার সেই পানাপুকুরের দিকে দৌড়িল। দেখিল, বৃদ্ধ সেইরূপ স্থির নিষ্কম্পভাবে জলে পা ডুবাইয়া বসিয়া আছে। মুনু ভয়ে ভয়ে তাহার নিকটে আসিয়া দাঁড়াইল।

ধীরে ধীরে, গভীর মিনতির সুরে বালিকা কহিল—"হীরু, আমার উপর রাগ করিয়াছ কি ?"

বৃদ্ধ একবার মুখ ফিরাইল মাত্র, কিন্তু কিছুই বলিল না।

মুনু আরো কাছে ঘেঁসিয়া বসিল—"হীরু, তুমি আমার উপর চটিয়াছ, কিন্তু আমি তোমার কাছে ক্ষমা চাহিবার জন্যই আসিয়াছি। আমি মনে যে কি ব্যথা পাইয়াছি, তাহা জানিলে তুমি নিশ্চয়ই ক্ষমা করিবে। কিন্তু কি করিয়া তোমাকে তাহা জানাইব।" মুনু তাহার পার্শ্বে বসিয়া পড়িল।

বৃদ্ধ স্থির কণ্ঠে কহিল—"তোমাকে আমি বিশ্বাস করি না। তবে ক্ষমা করিলেই যদি তুমি খুসী হও, তা'হলে তাহাই করিলাম।"

মুনুর সমস্ত স্ফূর্ত্তি ও চাপল্য ফিরিয়া আসিল। করতালি দিয়া সে বলিয়া উঠিল—"আচ্ছা, এখন তো তোমার সহিত ভাব হইল। এইবার তোমার সব কথা আমায় বল।"

বৃদ্ধ প্রথমতঃ সন্দিগ্ধনেত্রে একবার বালিকার প্রতি চাহিল, কিন্তু ক্রমশঃ মুনুর মধুর কণ্ঠস্বর ও গায়ে-পড়া ভাবে বশীভূত হইয়া গম্ভীরভাবে নিজ বিবরণ বলিতে লাগিল। 'বয়স ?— তা' প্রায় আশী হইল। কি করিয়া গাঁয়ের চাঁই হইল ?—সে গ্রামে বড় একটা কেউ লেখাপড়া জানে না। হীরু বেশ বিদ্বান্ লোক। কাশীরাম, কীর্ত্তিবাস পড়িয়া সকলকে শুনাইয়া থাকে, তাই সবাই তাকে নির্ব্বাচন করিয়াছে। অবস্থা তার প্রথমে ভাল ছিল। ইদানীং

খাজনা দিতে না পারায় তাহার ঠিক ১৭ সিকি ধার হইয়াছে। ধার শোধ না করিতে পারিলে নিশ্চয়ই তাহাকে পঞ্চায়েৎ হইতে তাড়াইয়া দেওয়া হইবে। সেই জন্যই সে এই জোঁক ধরার ব্যবসায় অবলম্বন করিয়াছে। চোখ খারাপ তাই ক্ষেতে কাজ করিতে পারে না। বন্ধুবান্ধব?—তা' সময়ে সে অনেকেরই উপকার করিয়াছে, আর চাহিলেও তাহারা কিছু কিছু দিতে পারে। কিন্তু হীরুমণ্ডল—হীরুমণ্ডল বরং না খাইয়া মরিবে, তবু—, বৃদ্ধ এবার খাড়া হইয়া উঠিল, "খুকী, আমার ঠাকুর্দ্দা এই গাঁয়ের মোড়ল ছিল!"

এতক্ষণে একটা জোঁকও ধরে নাই। বৃদ্ধ উঠিয়া লাঠি হাতে জলে খানিকটা বেড়াইয়া আসিল।

"এই জোঁকগুলাকে মাঝে মাঝে জাগাইয়া দিতে হয়—নহিলে শেওলার মধ্যে ঘুমাইয়া পড়ে।" এই বলিয়া কিনারায় ফিরিয়া আসিয়া বৃদ্ধ জলে পা আরও নামাইয়া দিল। তারপর হতাশভাবে জোঁকের প্রতীক্ষায় বসিয়া রহিল!

মুনুর হৃদয় গলিয়া গেল। সে তাহার জরাজীর্ণ, পাণ্ডুর মুখের উপর বড় বড়, ঝক্‌ঝকে চক্ষু দু'টি স্থাপন করিল। তাহার বড় ইচ্ছা, কল্যকার সেই অত্যাচারের কোনও প্রায়শ্চিত্ত করে!

কি করিয়া সে তাহার ক্ষতিপূরণ করিবে? তাহাকে ১৭ সিকি দেওয়া একেবারেই অসম্ভব, কারণ সে তাহা কিছুতেই লইবে না। মুনু হৃদয়ের অন্তরতম প্রদেশ হইতে ডাকিল "হে ঠাকুর, বুড়ার পায়ে জোঁক আনাইয়া দাও।"

হঠাৎ সে বলিয়া উঠিল, "কত জোঁক ধরিলে এই ১৭ সিকি উঠিবে?"

"শ' তিনেক।"

"তি—ন শ'? সে ত' তিন মাসেও ধরা যাবে না।"

"আমারও তাই মনে হয়—" কিঞ্চিৎ পরে হীরু বলিল—

"যদি আমার সেই কুড়ি বছরের পা থাকিত!"

বালিকা বলিল—"নরম পা হ'লে কি জোঁক শীঘ্র ধরে?"

"নিশ্চয়ই,—তাহ'লে রোজ পঞ্চাশটা ধরিতাম। জোঁকেরা মানুষেরই মত—ভাল জিনিষই পছন্দ করে।"

"ও" বলিয়া বালিকা চুপ করিয়া রহিল। তারপর হঠাৎ একটা বেশ মতলব তাহার মাথায় আসিল।

মুনু ভাবিল—"বুড়া ত' চোখে দেখিতে পায় না। মতলবটা খাটে কি না দেখাই যাউক।"

পিছন ফিরিয়া বালিকা জুতা মোজা খুলিয়া ফেলিল। তারপর আস্তে আস্তে ক্ষুদ্র পা দু'খানি জলে নামাইল। অকস্মাৎ জলস্পর্শে তাহার গা কাঁপিয়া উঠিল।

বৃদ্ধ বলিল—"কি হইয়াছে?"

মুনু উত্তর করিল—"কিছু না, ও একটা বোল্‌তা।"

বৃদ্ধ বলিল, "হাঁ, এ জায়গাটায় বড় বোল্‌তা বেড়ায়।"

তখন মুনু একটু একটু করিয়া পা নামাইয়া দিল। মিনিট দু'য়েক পরে তাহার পায়ে জোঁক আসিয়া ধরিল। কাতর হইয়া মুনু আবার শিহরিয়া উঠিল।

বৃদ্ধ পুনরায় জিজ্ঞাসিল—"কি হইয়াছে?"

বালিকা বলিল "সেই বোলতাটা আবার ফিরিয়া আসিয়াছে।"

তারপর জোঁকটা তুলিয়া বৃদ্ধের নিকট ধরিল। "বাঃ, কি করিয়া ধরিলে?"

"এটা জলের উপর ভাসিতেছিল, হাত দিয়া ধরিয়া ফেলিলাম।"

"তোমার সত্যসত্যই খুব বুদ্ধি। এরকম ক'রে জোঁক ধরা বড় সহজ নয়!" মুনু মনে মনে বলিল "মুস্কিলে পড়িলাম। এবার উল্টা গাইতে হইবে।"

আর একটা জোঁক আসিয়া লাগিল।—"দেখ, হীরু, তোমার পায়ে আসিয়া এটা লাগিয়াছিল; আমি ধরিয়া ফেলিলাম।"

"বটে, আমি ত টের পাই নাই। আর এ বুড়াবয়সে চামড়াও শক্ত হইয়া গিয়াছে—সব সময়ে অত বুঝিতে পারি না।"

"তাহ'লে এ রকম অনেক জোঁক ত' পালায়। রোস, আমি তুলিয়া দিতেছি।"

এই একটা—এই যে আর একটা—ক্রমে ঘণ্টা দুয়ের মধ্যে মেয়েটি গোটা ত্রিশেক জোঁক ধরিয়া দিল।

বুড়ার মুখ হর্ষোৎফুল্ল হইয়া উঠিল—আর মুনু—তাহার সুখের ইয়ত্তা ছিল না।

পরদিনও মুনু এইরূপ করিয়া জোঁক ধরিয়া দিল। হীরু মণ্ডলের মনে বিন্দুমাত্রও সন্দেহ নাই। গাঁয়ের মেয়েরাই সেই পুকুর ছোঁয় না—আর এক জন সহরে যে তাহাতে পা দিয়া জোঁক তুলিবে—এ তাহার স্বপ্নের অগোচর।

৫।৭ দিন ধরিয়া এই অদ্ভুত জোঁক ধরা চলিল। একদিন বৃদ্ধ বলিল, "লক্ষ্মি, আমার তা' হলে এখনও মর্ব্বার সময় হয়নি।"

"কিরূপে জানিলে?"

"লোকে বলে যার মরণ ঘনিয়ে আসে, তার পায়ে জোঁক বসে না। তা' আমার পায়ে ত' মেলাই জোঁক ধ'রছে।"

মুনু বলিল—"বালাই, এখন মর্বে কেন? তুমি এখনও দশ বছর পঞ্চায়েতি ক'র্বে।"

বুড়ার মুখে আর হাসি ধরে না!

পরদিনও বৃদ্ধ ও মুনু দুইজনে সেই রকম বসিয়া আছে, এমন সময়ে পশ্চাতে পদশব্দ শুনা গেল। মুনু ফিরিয়া দেখিল, সর্ব্বনাশ! তাহার পিসী সেখানে আসিয়া উপস্থিত!

"ওমা, আমাদের মুনু এই জোঁকো পুকুরে পা ডুবিয়ে রয়েছে!" পিসীর মূর্চ্ছা যাইবার উপক্রম হইল।

আর হীরু—সে মুনুর প্রতি চাহিয়া 'লক্ষ্মি! লক্ষ্মি!' বলিতে বলিতে একেবারে সংজ্ঞাশূন্য হইয়া পড়িল। এতক্ষণে সে সব বুঝিতে পারিল।

মুনু রাগিয়া আগুন হইল! "পিসী, তুমি কি ব'লে এই নিরীহ লোকটাকে মেরে ফেল্লে। এবার, পিসী তোমায় কিন্তু ঠাকুরঘরে যেতে হ'বে।"

বৃদ্ধ হীরু পুকুরের ঠিক ধারে লুটাইয়া পড়িয়াছিল। মুনু যাইয়া তাহার ছোট ছোট হাত দু'খানি দিয়া তাহাকে টানিয়া ধরিল। পাড়ার পাঁচজনে মিলিয়া তাহাকে ধরাধরি করিয়া কুটীরে লইয়া গেল।

খুকী জোর করিয়া শয্যাপার্শ্বে বসিয়া রহিল—"হীরু, ভয় কি, তুমি এখনি সেরে উঠ্‌বে। আমরা নিজে এখানে বাড়ী কিনিব। তারপর বাবাকে ব'লে চেষ্টা কোরে তোমায় একজন চাই কোরে দিব।"

বলিতে বলিতে হঠাৎ মুনু থামিয়া গেল। সে কাঁপিতে কাঁপিতে খাটের পার্শ্বে ঝুঁকিয়া পড়িল। বৃদ্ধ হীরুর ক্ষীণ প্রাণবায়ু বাহির হইয়াছে—কিন্তু তখনও তাহার বিশুষ্ক অধর প্রান্তে হাসির রেখা অঙ্কিত! *

শ্রীসুহাসচন্দ্র রায়।

---

* ফরাসী গল্প অবলম্বনে লিখিত।

ন্যায়দর্শনের উপযোগিতা।

ষড়্‌দর্শনের মধ্যে ন্যায়শাস্ত্রের আসন যে সর্ব্বোচ্চে, ইহা অভিজ্ঞমাত্রেই একবাক্যে স্বীকার করিয়া থাকেন। ন্যায়শাস্ত্রের শ্রেষ্ঠতা শপথ পূর্ব্বক সিদ্ধ করাইতে হয় না, প্রয়োজন-সাধকতাই এ উৎকর্ষের হেতু। এক ন্যায়শাস্ত্রে সুচারু পরিজ্ঞান থাকিলে তাহার মাহাত্ম্যে সর্ব্বশাস্ত্রের মীমাংসা করা যায়, যে কোনও শাস্ত্রীয় বিচারে মধ্যস্থতা করিবার সামর্থ্য জন্মে। তাই কথিত আছে,—"প্রদীপঃ সর্ব্বশাস্ত্রাণামুপায়ঃ সর্ব্বকর্ম্মণাম্। আশ্রয়ঃ সর্ব্বধর্ম্মাণাং বিদ্যোদ্দেশে প্রকীর্ত্তিতা॥" "কাণাদং পাণিনীয়ঞ্চ সর্ব্বশাস্ত্রোপকারকম্॥" ইত্যাদি। ভাল বৈয়াকরণ, ভাল স্মার্ত্ত অথবা ভাল আলঙ্কারিক হইতে হইলে ন্যায়শাস্ত্রের পদার্থাংশ পড়িতে হয়,—ন্যায়শাস্ত্রের পদার্থাংশে পরিশ্রম করিতে হয়। ন্যায়-শাস্ত্রে আংশিক ভাবে ব্যুৎপত্তি না থাকিলে কোনও শাস্ত্রেই প্রধান পণ্ডিত বলিয়া পরিগণিত হওয়া যায় না। অন্য শাস্ত্রে হাজার পরিশ্রম করিলেও যদি আংশিক ভাবে ন্যায়শাস্ত্র অধীত না থাকে, তবে একজন সাধারণ নৈয়ায়িকের নিকটেও বালকের ন্যায় পরাজিত হইতে হয়। এই যে বারাণসী-ধামে পাণিনীয় শাস্ত্র-ব্যবসায়ী পণ্ডিতবর্গ "ঘটকত্ব" "ঘটিতত্ব" প্রভৃতি লইয়া আড়ম্বরের সহিত ব্যাকরণের বহু বিচার করিয়া থাকেন, কিন্তু ইহার মধ্যে কয়জন "ঘটকত্ব" পদার্থের নির্দ্দোষ পরিষ্কার করিতে সমর্থ? প্রকৃত নৈয়ায়িকের হাতে পড়িলে দুই একজন প্রসিদ্ধনামা পণ্ডিত ভিন্ন সকলেরই হয় ত মৌনাবলম্বন করিতে হয়। এই সকল নানা গুণের জন্য ন্যায়দর্শনের প্রতিষ্ঠা জগদ্‌বিখ্যাত। আজও—এই অবনতির দিনেও সমাজে ন্যায়শাস্ত্রের—নৈয়ায়িকের সম্মান সর্ব্বাপেক্ষা সমধিক।

এই ন্যায়শাস্ত্র, বিশেষতঃ ইহার অন্তর্গত অনুমান খণ্ড অত্যন্ত দুরূহ বলিয়া ইহা অন্যান্য দর্শনের ন্যায় সর্ব্বসাধারণের বোধগম্য নহে। এই অপরাধে অনেকে এই উপাদেয় শাস্ত্রের প্রতি বীতশ্রদ্ধ। এমন কি, তাঁহারা এই ন্যায়শাস্ত্রের নিন্দা-জ্ঞাপক দুই একটী বচন পর্য্যন্ত গড়িয়া রাখিয়াছেন। তাঁহারা বলেন, ন্যায়শাস্ত্র অধ্যয়ন করিলে শৃগালত্ব প্রাপ্তি হয়, ভগবান্ শ্রীরামচন্দ্রের এইরূপ অভিশাপ আছে,—"অধীত্য গৌতমীং বিদ্যাং শার্গালীং যোনিমাপ্নুয়াৎ।" রামায়ণে কিন্তু এ সম্বন্ধে বিন্দু বিসর্গও লিখিত নাই। প্রত্যুত ন্যায়শাস্ত্রের উপাদেয়তা—

ন্যায়শাস্ত্রের প্রামাণিকতা, শ্রুতি, স্মৃতি, পুরাণ প্রভৃতিতে অসকৃৎ কথিত হইয়াছে। নানা গ্রন্থ হইতে কতিপয় প্রমাণ উদ্ধৃত হইল।—

"ন্যায়ো মীমাংসা ধর্ম্মশাস্ত্রাণি"—শ্রুতি।

"বিধির্বিধেয়স্তর্কশ্চ বেদঃ—" পারস্কর গৃহ্যসূত্র, ২।৬

"ত্রৈবিদ্যেভ্যস্ত্রয়ীং বিদ্যাং দণ্ডনীতিঞ্চ শাশ্বতীম্।
আন্বীক্ষিকীঞ্চাত্মবিদ্যাং বার্ত্তারম্ভাংশ্চ লোকতঃ॥"—মনু, ৭।৪৩

"আগমো বেদবাদাশ্চ তর্কশাস্ত্রাণি চাগমঃ॥"
—মহাভারত, শান্তি, মোক্ষ, ২৬৮।৪৩

"নৈয়ায়িকানাং মুখ্যেন বরুণস্যাত্মজেন চ।
পরাজিতো যত্র বন্দী বিবাদেন মহাত্মনা॥"
—মহা, আদি, ২।১১৫

"বেদবাদং ব্যপাশ্রিত্য মোক্ষোঽস্তীতি প্রভাবিতুম্।
অপেতন্যায়শাস্ত্রেণ সর্ব্বলোকবিগর্হিনা॥"—মহা, শান্তি, মোক্ষ, ২৬৯।৬৫

"তর্কেতিহাসাঙ্গপুরাণসংহিতাঃ।"—ভাগবত, ৮।২১।২।

"চতসৃষপি তে বিবেকিনী নৃপ বিদ্যাসু নিরূঢ়িমাগতা।
কথমেত্য মতির্বিপর্য্যয়ং করিণী পঙ্কমিবাবসীদতি॥"—২য় সর্গ, ৬ষ্ঠ শ্লোক।

মহাকবি ভারবির এই শ্লোকে ব্যাখ্যাবসরে মল্লিনাথ লিখিয়াছেন,—

"হে নৃপ চতসৃষু অপি বিদ্যাসু আন্বীক্ষিক্যাদিষু। "আন্বীক্ষিকী ত্রয়ী বার্ত্তা দণ্ডনীতিশ্চ শাশ্বতী। বিদ্যা হ্যেতাশ্চতস্রস্তু লোকসংস্থিতিহেতবঃ॥" ইতি কামন্দকঃ। নিরূঢ়িমাগতা প্রসিদ্ধিং গতা অতএব বিবেকিনী সদসদ্বিবেকবতী। যথাহ মনুঃ "আন্বীক্ষিক্যান্তু বিজ্ঞানং ধর্ম্মাধর্ম্মৌ ত্রয়ীস্থিতৌ। অর্থানর্থৌ তু বার্ত্তায়াং দণ্ডনীত্যাং নয়ানয়ৌ॥" ইতি তে মতিঃ কথং করিণী পঙ্কমিব বিপর্য্যয়ং বৈপরীত্যং অবিবেকরূপং এত্য অবসীদতি নশ্যতি তত্তু ন যুক্তম্॥"

বেদের ন্যায় আন্বীক্ষিকী বিদ্যাও বিশ্বস্রষ্টার প্রথম আবিষ্কার। বিশ্বকর্ত্তার কোন্ কোন্ অঙ্গ হইতে বেদাদির উৎপত্তি হইল, বিদুর এইরূপ প্রশ্ন করিলে মৈত্রেয় ঋষি বলিতেছেন,—

"আন্বীক্ষিকী ত্রয়ী বার্ত্তা দণ্ডনীতিস্তথৈব চ।
এবং ব্যাহৃতয়শ্চাসন্ প্রণবো হ্যস্য দহ্রতঃ॥"—
ভাগবত, ৩য় স্কন্ধ, ১২শ অধ্যায়, ৪৪ শ্লোক।

শ্রীধর স্বামী এই শ্লোকের ব্যাখ্যায় লিখিয়াছেন,—"ন্যায়াদীনাং পূর্ব্বাদিক্রমেণ উৎপত্তিমাহ আন্বীক্ষিকীতি। আন্বীক্ষিক্যাদ্যা মোক্ষধর্ম্মকামার্থবিদ্যাঃ। * * * দহ্রতঃ হৃদয়াকাশাৎ।"

বেদাদি শাস্ত্রের ন্যায় ন্যায়শাস্ত্রও যে এক যুগের পর আর এক যুগের প্রথম ভাগে পুনরভিহিত হইত, তাহা মহাভারতের পশ্চাল্লিখিত শ্লোকগুলি পাঠ করিলে জানিতে পারা যায়।—

"যুগান্তেঽন্তর্হিতান্ বেদান্ সেতিহাসান্ মহর্ষয়ঃ।
লেভিরে তপসা পূর্ব্বমনুজ্ঞাতাঃ স্বয়ম্ভুবা॥
বেদবিদ্ বেদ ভগবান্ বেদাঙ্গানি বৃহস্পতিঃ।
ভার্গবো নীতিশাস্ত্রঞ্চ জগাদ জগতো হিতম্॥
গান্ধর্ব্বং নারদো বেদ ভরদ্বাজো ধনুর্গ্রহম্।
দেবর্ষিচরিতং গার্গ্যঃ কৃষ্ণাত্রেয়শ্চিকিৎসিতম্॥
ন্যায়তন্ত্রাণ্যনেকানি তৈস্তৈরুক্তানি বাদিভিঃ।"

—শান্তি, মোক্ষ, ২১০ অঃ, ১৯-২২ শ্লোক।

দ্বাপর যুগে কৃষ্ণবলরামও অবন্তিপুরে সান্দীপনি মুনির নিকটে আন্বীক্ষিকী (তর্কশাস্ত্র) অধ্যয়ন করিয়াছিলেন।—

"অথো গুরুকুলে বাসমিচ্ছন্তাবুপজগ্মতুঃ।
কাশ্যং সান্দীপনিং নাম হ্যবন্তিপুরবাসিনম্॥
* * *
তয়োর্দ্বিজবরস্তুষ্টঃ শুদ্ধভাবানুবৃত্তিভিঃ।
প্রোবাচ বেদানখিলান্ সাঙ্গোপনিষদো গুরুঃ॥
* * *
সরহস্যং ধনুর্ব্বেদং ধর্ম্মান্ ন্যায়পথাংস্তথা।
তথা চান্বীক্ষিকীং বিদ্যাং রাজনীতিঞ্চ ষড়্বিধাম্॥"

—ভাগবত, ১০ম স্কন্ধ, ৪৫ অঃ, ৩১-৩৪ শ্লোঃ।

* শ্রীধরস্বামী টীকায় লিখিয়াছেন,—"সরহস্যং মন্ত্রদেবতাজ্ঞানসহিতং, ধর্ম্মান্ মন্বাদিধর্ম্মশাস্ত্রাণি, ন্যায়পথান্ মীমাংসাদীন্। আন্বীক্ষিকীং তর্কবিদ্যাম্।"

মহর্ষি নারদ, ন্যায়দর্শনে স্বীকৃত প্রতিজ্ঞা, হেতু, উদাহরণ, উপনয়, নিগমন—এই পঞ্চাবয়ব-বাক্যের গুণদোষজ্ঞ ছিলেন। নারদ যখন যুধিষ্ঠিরকে রাজধর্ম্ম উপদেশ করিতে আসিয়াছিলেন, সেই সময়ে ব্যাসদেব, নারদের বেদবেত্তৃত্ব প্রভৃতি অন্যান্য নানা গুণের উল্লেখ করিয়া বলিতেছেন,—

"পঞ্চাবয়বযুক্তস্য বাক্যস্য গুণদোষবিৎ।"

—মহা, সভা, ৫ম অঃ, ৫ শ্লোঃ।

টীকাকার নীলকণ্ঠও এই শ্লোকের ব্যাখ্যাপ্রসঙ্গে ন্যায়শাস্ত্রানুসৃত অনুকূলতর্ক-সম্বলিত অনুমান-প্রণালীর বলবত্তা স্বীকার করিয়া লিখিয়াছেন,—

"তথা চানুমানং প্রত্যক্ষাগমৌ শিথিলীকরোতি।"

সকল শাস্ত্রের, এমন কি উপনিষদাদির মীমাংসাও আন্বীক্ষিকীর (তর্কশাস্ত্রের) সাহায্যেই করিতে হয়। ভগবান্ বেদব্যাস লিখিয়াছেন,—

"তত্রোপনিষদঞ্চৈব পরিশেষঞ্চ পার্থিব।
মথ্নামি মনসা তাত দৃষ্ট্বা চান্বীক্ষিকীং পরাম্॥"

—মহা, শান্তি, মোক্ষ, ৩১৮ অঃ, ৩৪ শ্লোঃ।

আন্বীক্ষিকী তর্কশাস্ত্রেরই নামান্তর। অভিধানকার অমরসিংহ লিখিয়াছেন,— "আন্বীক্ষিকী দণ্ডনীতিস্তর্কবিদ্যার্থশাস্ত্রয়োঃ।"

তর্কশাস্ত্রের সহায়তাব্যতীত শাস্ত্রার্থ নির্ণয় অসাধ্য হইলেও বেদবিরুদ্ধ কুতর্ক অবলম্বন করা সর্ব্বথা নিষিদ্ধ। তাই মনুসংহিতায় কথিত হইয়াছে,—

"আর্ষং ধর্ম্মোপদেশঞ্চ বেদশাস্ত্রাবিরোধিনা।
যস্তর্কেণানুসন্ধত্তে স ধর্ম্মং বেদ নেতরঃ॥"

—মনু, ১২শ অঃ, ১০৬ শ্লোঃ।

অর্থাৎ যিনি বেদের অবিরুদ্ধ সত্তর্কের দ্বারা আপ্তবাক্যের মীমাংসা করেন, তিনিই ধর্ম্মের স্বরূপ জানিতে সমর্থ হন, অন্য সহস্র উপায়েও ধর্ম্মতত্ত্ব অবগত হওয়া যায় না।

বেদবিরুদ্ধ কুতর্কের আশ্রয় লইয়া নাস্তিক্য করিলে জন্মান্তরে শৃগালত্ব প্রাপ্তি ঘটে, শাস্ত্রে এইরূপ নির্দ্দেশ আছে। মহাভারতের শান্তিপর্ব্বে শৃগাল-কাশ্যপ-সংবাদে উক্ত হইয়াছে,—

"অহমাসং পণ্ডিতকো হৈতুকো বেদনিন্দকঃ।
আন্বীক্ষিকীং তর্কবিদ্যামনুরক্তো নিরর্থিকাম্॥
হেতুবাদান্ প্রবদিতা বক্তা সংসৎসু হেতুমৎ।
আক্রোষ্টা চাভিবক্তা চ ব্রহ্মবাক্যেষু চ দ্বিজান্॥
নাস্তিকঃ সর্ব্বশঙ্কী চ মূর্খঃ পণ্ডিতমানিকঃ।
তস্যেয়ং ফলনির্ব্বৃত্তিঃ শৃগালত্বং মম দ্বিজ॥"

—মোক্ষ, ১৮১ অঃ, ৪৭-৪৯ শ্লোঃ।

ইহার ভাবার্থ এই যে, আমি পূর্ব্বজন্মে নিরর্থক তর্কবিদ্যায় আসক্ত হইয়া হেতুবাদ প্রদর্শন পূর্ব্বক বেদ নিন্দা করিতাম, পরমেশ্বর, পরলোক প্রভৃতিতে সন্দিহান হইয়া নাস্তিক্য করিতাম, আজ সেই পাপের ফলে এই শৃগাল-জন্ম পাইয়াছি। এই জন্যই চার্ব্বাক-মতের তর্কবিদ্যা অবলম্বন করিয়া কখনই বলা উচিত নয় যে, "ত্রয়ো বেদস্য কর্ত্তারো ভণ্ডধূর্ত্তনিশাচরাঃ।"

শ্রুতি বলিয়াছেন,—"দ্যাবাভূমী জনয়ন্ দেব এক আস্তে বিশ্বস্য কর্ত্তা ভুবনস্য গোপ্তা।" এখন জৈন মতের তর্কশাস্ত্র অবলম্বন করিয়া পরমেশ্বরের জগৎ-কর্ত্তৃত্ব খণ্ডনার্থ—

"স্রষ্টাস্য জগতঃ কশ্চিদস্তীত্যেকে জগুর্জড়াঃ।
তদ্দুর্ণয়নিরাসার্থং সৃষ্টিবাদঃ পরীক্ষ্যতে।
স্রষ্টা সর্গবহির্ভূতঃ কস্থঃ সৃজতি তজ্জগৎ।
নিরাধারশ্চ কূটস্থঃ সৃষ্টৈবং ক্ক নিবেশয়েৎ।
নৈকো বিশ্বাত্মকস্যাস্য জগতো ঘটনে পটুঃ।
বিতনোশ্চ ন তন্বাদিমূর্ত্তমুৎপত্তুমর্হতি।
কথঞ্চ স সৃজেল্লোকং বিনান্যৈঃ করণাদিভিঃ।
তানি সৃষ্ট্বা সৃজেল্লোকমিতি চেদনবস্থিতিঃ।"

—জিনসেন-কৃত আদিপুরাণ, ৪র্থ পর্ব্ব, ১৬-১৯ শ্লোক।

ইত্যাদি যুক্তির অবতারণা করিলে পাপের ফলে পরজন্মে শৃগালাদি নীচযোনিতে জন্মগ্রহণ করিতে হইবে—ইহাই সনাতন হিন্দুশাস্ত্রের সিদ্ধান্ত।

এই প্রসঙ্গে আর একটী কথা উত্থাপন করিয়া বক্তব্য শেষ করিব। বেদান্ত, মীমাংসা প্রভৃতি দর্শনের বলে কেবল আপনাদের মধ্যেই পরস্পর বিচারমল্লতার অভিনয় করা যাইতে পারে। কিন্তু পরমত-নিরাকরণ করিতে হইলে ন্যায়-দর্শনের মুখাপেক্ষা করিতে হয়। বেদ প্রমাণ দেখাইয়া চার্ব্বাক, বৌদ্ধ বা জৈন সম্প্রদায়ের মত খণ্ডন পূর্ব্বক তাহাদের সহিত বিচার করিয়া স্বমত স্থাপন করা যায় না। কারণ, ঐ সকল সম্প্রদায় বেদের প্রামাণ্য স্বীকার করে না। এক হিন্দু ন্যায়দর্শনের যুক্তিতর্কের সহায়তা ব্যতীত বেদনিন্দক নাস্তিক সমাজকে পরাস্ত করিবার উপায়ান্তর নাই। উদ্দ্যোতকর, উদয়ন প্রভৃতি পূর্ব্বতন ন্যায়াচার্য্যগণ সত্তর্ক ও সদনুমানের বলেই বৌদ্ধ-সম্প্রদায়কে পরাজিত করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। ন্যায়শাস্ত্র কৃপাণহস্ত বীরের ন্যায় নানা বাধা বিপত্তি হইতে হিন্দু-ধর্ম্মকে রক্ষা করিয়া আসিতেছে। এইজন্যই দর্শন-জগতে ন্যায়শাস্ত্রের সাম্রাজ্য, পণ্ডিত-সমাজে নৈয়ায়িকের প্রাধান্য। দুঃখের বিষয়, এইরূপ পরম উপকারী শাস্ত্রের পূর্ব্ববৎ যথোচিত অধ্যয়ন অধ্যাপনা তিরোহিত হইতে চলিল। এখন আর সেকালের মত একনিষ্ঠ সাধকের ন্যায় কেহ তর্কশাস্ত্রে দীর্ঘকাল পরিশ্রম করে না; সুতরাং উদীয়মান নৈয়ায়িক সম্প্রদায়, ন্যায়শাস্ত্র পরিশীলনের যে সদুদ্দেশ্য, তাহা হইতে বহুদূরে পড়িয়া আছেন। সত্য বলিতে কি, এক মহা-মহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত রাখালদাস ন্যায়রত্ন মহাশয়ের দেহত্যাগের সঙ্গে সঙ্গেই ন্যায়দর্শনের সার্ব্বভৌম প্রতিপত্তি অন্তর্হিত হইবে।

শ্রীহরিহর শাস্ত্রী।

মুক্তি।

(১)

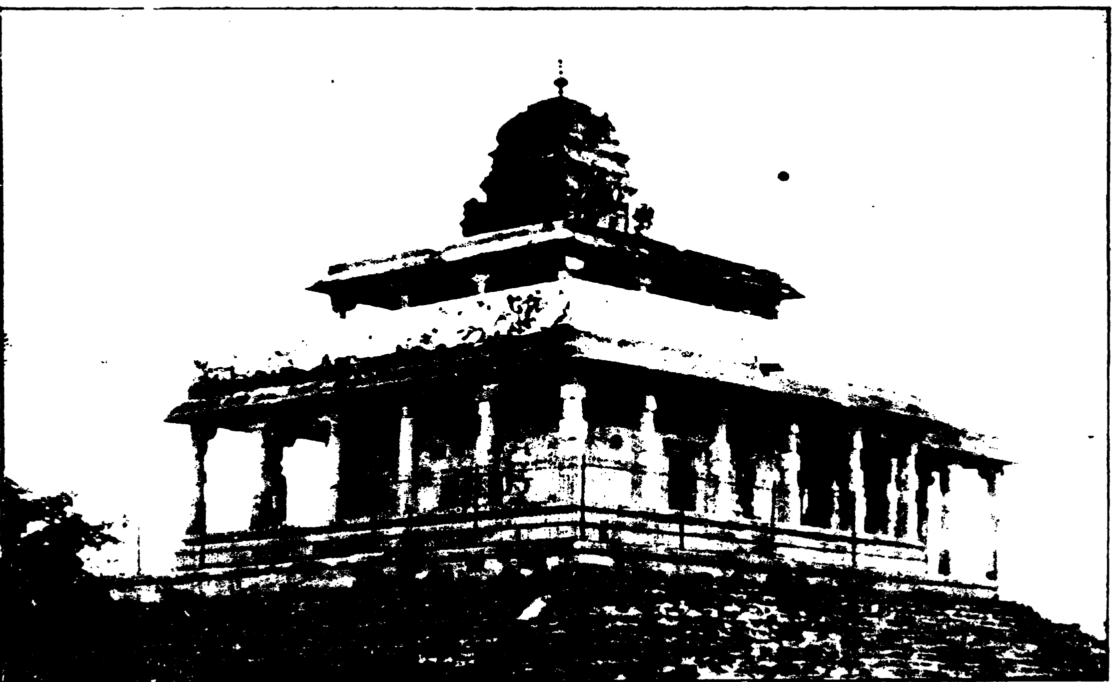
প্রাণের ভিতর মুরলী-ধ্বনি হইতেছিল। কি উন্মাদক সুর! কি আকর্ষণী মোহিনী শক্তি! সম্মুখে শয্যাশায়িতা সুপ্তা স্ত্রীর প্রতি চাহিলাম। ভগবান সেই মায়ার ইন্দ্রজালে আমাকে বাঁধিতে চাহিলেন। সোণার মত বর্ণ, নাগ-পাশের মত কালো কালো চুলের রাশি অমল শুভ্র শয্যার উপর বিস্তৃত, তালে তালে মুকুলের যৌবনস্ফীত বক্ষদেশ উঠিতেছে নামিতেছে। বোধ হয় মুকুল সুখের স্বপ্ন দেখিতেছিল, তাহার অধরে হাসির ক্ষীণ রেখা আমার প্রাণের বাঁশরীর স্বরকে স্তব্ধ করিবার জন্য বিধিমতে চেষ্টা করিতেছিল। কিন্তু সে স্বরের মাধুরী ক্ষণে ক্ষণে বাড়িতেছিল। দেহের মধ্যে সকল শিরা উপশিরা প্রাণপণ শক্তিতে রূপের মোহ-পাশটাকে কাটিবার জন্য সম্মিলিত হইয়াছিল, প্রতি শোণিতবিন্দু রণরঙ্গে মাতিয়া তুচ্ছ রূপের মোহের বিরুদ্ধে অসি ধারণ করিয়া প্রাণপণে যুঝিতেছিল। বাঁশীর অপূর্ব্ব সঙ্গীতে প্রাণ মন অবশ হইল; অনুভব করিলাম বাঁশী বলিতেছে—'পাগল মূর্খ, রূপ যৌবন কয়দিনের, রমণীর ভালবাসা, সংসারের মায়াই তো মানুষকে পশুত্বে পরিণত করে। দেহের সুখ দু'দিনের, আত্মার মুক্তিতে কি সুখ একবার ভাব দেখি। চিরানন্দময় হইবে, আনন্দের সাগরে মজিয়া থাকিবে, একি কম কথা! গৌতম রাজার ছেলে, তাঁর কি গোপা ছিল না? গোপার রূপ মাধুরীর কাছে তোর মুকুলের সৌন্দর্য্য? হাঃ বাতুল! শচীদেবীর রূপরাশি যে জ্যোৎস্নার সুষমাকে ধিক্কার দিত। নিমাই তাহাতে মজিলে কি আজ তাঁর নামে লোকে পাগল হ'ত?' ছিঃ! ছিঃ! আর সহ্য করিতে পারিলাম না। বন্ধন ছিঁড়িলাম। ক্ষণিক সুখ ছাড়িয়া অনন্ত আনন্দের দিকে ধাবিত হইলাম। বাপীতট ছাড়িয়া সমুদ্রের দিকে ছুটিলাম। কিন্তু তবু যেন প্রাণে কি একটা শক্তি ক্রীড়া করিতেছিল, কে যেন বলিতেছিল—'ছিঃ ছিঃ পালিও না। অনাথিনী মুকুলকে ছেড়ে নিজের সুখের জন্যে ছুটিও না।' আবার প্রাণে মুরলী ধ্বনি হইল, কে যেন চোখের সামনে বিশ্বরূপের পট খুলিয়া ধরিল। শশী সূর্য্য যাঁহার নেত্র, তাঁহার কাছে মুকুলের রূপ! আর বিলম্ব করিলাম না। গৃহ হইতে বাহির হইলাম। অনন্তের ছায়া আকাশের দিকে

একবার চাহিলাম। সপ্তর্ষি মণ্ডল মাথার উপর আশীর্ব্বাদ বর্ষণ করিতেছিল। পশ্চিমের দিকে কনক মূর্ত্তিতে মঙ্গলগ্রহ আমার আত্মার মঙ্গল কামনা করিতেছিলেন। আমি গ্রাম্য পথ দিয়া অনন্তের পথে চলিলাম।

(২)

গুরুদেব বলিলেন—'তোমার কার্য্য কাশীধামে। সোমানন্দের প্রাণে এখনও কামনা আছে।'

আমি লজ্জিত হইলাম। গুরুবাক্যের প্রতিবাদ করিতে পারিলাম না। কিন্তু গুরুদেব প্রাণের যে চাঞ্চল্যটুকুকে কামনা বলিলেন, আমি বিশ্লেষণ করিয়া দেখিয়াছিলাম তাহা দয়া মাত্র। দুই বৎসর তো সমানে সাধুসঙ্গ করিতেছিলাম, পূজা করিতেছিলাম, ধ্যান করিতেছিলাম। তাহার মাঝে পঁচিশ বৎসরের পূর্ব্ব জীবনের স্মৃতি আসিয়া যদি এক একবার আমার মনে উঁকি মারিত, তাহা কি অস্বাভাবিক—কামনার লক্ষণ! প্রাণের সান্ত্রীগুলা মাঝে মাঝে ঘুমাইয়া পড়িলে একখানা কাতর রমণী মূর্ত্তি ধীরে ধীরে হৃদয়ের পাশে দাঁড়াইয়া একটা ভীষণ তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে আমার দিকে চাহিত। কাতরতার মাঝে কি ভীষণতা! আমি শিহরিয়া উঠিতাম। অমনি প্রাণের সান্ত্রী পাহারাগুলা জাগিয়া উঠিত। আমি মন্ত্রোচ্চারণ করিতাম - রমণীকে হৃদয়ের ত্রিসীমায় আসিতে দিতাম না। কাণে তুলা দিতাম। সে যতই চীৎকার করিয়া বলিত—'ছিঃ ছিঃ কি নিষ্ঠুর! কি কঠিন! আমার যে কেহ নাই! এক দরিদ্র ভাই আছে সে যে নিজেই কষ্টে দিনপাত করে।'—আমি ততই উচ্চৈঃস্বরে বিষ্ণু নাম স্মরণ করিতাম; এক একবার বলিতাম—'ভগবান আছেন, নারায়ণ আছেন'। আবার তখনই স্ত্রীলোকের সহিত বাক্যালাপ করিয়াছি বলিয়া আত্মগ্লানি হইত। মন্ত্রোচ্চারণ করিতাম। তাহাকে ভুলিতাম। ইহা কি কামনা? অবশ্য গুরুদেব অন্তর্য্যামী। তিনি আমার প্রাণের ভিতর অবধি দেখিতে পাইতেন। যখনই যোগমায়া মুকুলের বেশ ধারণ করিয়া আসিতেন তখনই ভাল করিয়া তাহাকে দেখিতাম, তাহার আশে পাশে ত্রিসীমায় ফুলধনু হস্তে কোন দুরন্ত বালককে দেখিতাম না। কেবল করুণাই প্রাণে পূর্ব্বস্মৃতি জাগাইয়া তুলিত, মায়ামুগ্ধ করিতে চাহিত, পরিত্যক্তা ভার্য্যার সহায়হীনতার চিত্র ফুটাইয়া তুলিত। সন্ন্যাসীর প্রাণে করুণা—বিশেষ নিজের স্ত্রীর প্রতি করুণা—আসুরী বৃত্তি—ঘোর তামসিক ভাব—এ দুই বৎসরে তাহা উপলব্ধি করিয়াছিলাম। কিন্তু সে ভাবটাকে গুরুদেব কামনা বলিলেন, ইহাতে কষ্ট হইল।



রাম-দ্বারকা

গুরুদেব ধীরভাবে আমার দিকে দেখিতেছিলেন। তিনি অনেকক্ষণ আমাকে নীরব দেখিয়া বলিলেন—"সোমানন্দ ক্ষুণ্ণ হ'লে?"

আমি অপ্রতিভ হইলাম। তিনি তাঁহার সেই মিষ্ট স্বরে বলিলেন—'আসক্তিই কামনা। আমার সঙ্গ ছাড়্‌তে তোমার প্রাণ কাঁদছে, এই কামনা। বদরিকাশ্রমে যেতে পেলে না ব'লে ক্ষুণ্ণ হ'চ্চ, এই কামনা। সংসার বাসনাতেই।'

আমি লজ্জিত হইলাম। কিন্তু মনের একটা ভাব কাটিল। গুরুদেব সে দুর্ব্বলতাটার উল্লেখ করেন নাই। তবে কি তিনি সে কথা বুঝেন নাই?

গুরুদেব বলিলেন—'কাশীতে গিয়ে ঘাটে ঘাটে বস্‌বে। যেখানে লোক সমাগম সেখানে গিয়ে আসন পাতবে। চোখ বুজে শুনবে লোকে কি বলাবলি ক'রে। বিশেষ স্ত্রীলোক। তাহ'লেই বুঝবে সংসার কি ঘৃণার স্থল। নরনারী মনের মধ্যে কি সব তুচ্ছ ভাব পুষে রাখে'।

আমি তাঁহার পদধূলি লইলাম। তিনি বলিলেন—'লোকের দেহের অসুখে কেহ যদি তোমার সাহায্য চায় তার চিকিৎসা ক'র। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে রোগীকে পরমপথ দেখাবার অবসর বিস্মৃত হইও না'।

(৩)

মানুষ মনের মধ্যে কি সব তুচ্ছ ভাব পোষণ করে! সত্য কথা। পৃথিবীর স্বর্গ কাশীধামে যে সব কথা শুনিতাম, যে সকল কার্য্যের প্রমাণ পাইতাম, তাহাতে প্রাণে বিষম যন্ত্রণা হইত। উঃ জীবাত্মা কি হীনতাই স্বীকার করিতে পারে! মায়া কি কঠোর আবরণেই আত্মাকে ঘিরিয়া রাখিতে পারে! কলির বারাণসী পাপে পূর্ণ, ব্যভিচারে জর্জ্জরিত। যতদিন না গুরুদেবের আজ্ঞা পাইব ততদিন এই পঙ্কের মধ্যে বসিয়া থাকিতে হইবে, এই কলুষিত স্থলে বিশুদ্ধ জ্ঞান অর্জ্জন করিতে হইবে। একটা কাজ হইতেছিল। এই তিন মাসে সংসারের উপর ঘৃণাটা বেশ ফুটিয়া উঠিতেছিল।

দশাশ্বমেধ ঘাটের উপর বসিয়াছিলাম। সম্মুখে ভাগীরথী কাশীর পাপরাশি ধৌত করিয়া লইয়া চলিতেছিল। অসংখ্য নরনারী স্নান করিতেছিল, গল্প করিতেছিল, কোলাহল করিতেছিল। আমার মত কতকগুলা সন্ন্যাসী প্রাণে নানা রকমের ভাব লইয়া ঘাটের নানা দিকে বসিয়াছিল। আমার নিষেধ স্বত্বেও অনেকগুলা পয়সা আমার সম্মুখে পড়িয়াছিল।

আমি যে স্থলে বসিয়াছিলাম সে স্থলটি অপেক্ষাকৃত নির্জ্জন। দুইটি স্ত্রীলোক ঠিক আমার নিকট হইতে দুই তিন হাত দূরে বসিয়া কাহার জন্ত প্রতীক্ষা

করিতেছিল, এবং গল্প করিতেছিল। যেটি অপেক্ষাকৃত বর্ষীয়সী সে বলিল— 'ওমা কি কেলেঙ্কারী গো।'

অপর স্ত্রীলোক বলিল—'আর কি বল্‌ব দিদি আজ প্রায় দু' বছর ধ'রে আমার হাড় জ্বালাতন ক'রেছে'।

বর্ষীয়সী বলিল—'এ আপদকে ঘরে রেখেছ কেন ? ও রকম লোককে কি জেনে শুনে'—

অপর স্ত্রীলোক বলিল—'না সে সব কিছু না। ছুঁড়ি ভাল ব'লে বোধ হয়। আমার কর্ত্তা যে'—

বর্ষীয়সী হাসিল। বলিল—'তুই মর্। তোর এ জ্ঞান নেই। এক হাতে কি তালি বাজে না' ?

বুঝিলাম, স্ত্রীলোকটির হৃদয়ে তাহার স্বামী ও গল্পের রমণীটির সম্বন্ধ বিষয়ে যে সামান্য ঈর্ষা-বহ্নির রশ্মিটুকু বর্ত্তমান ছিল, তাহার সখী সে অগ্নি বেশ প্রজ্জ্বলিত করিবার চেষ্টা করিল। আগুন জ্বলিবার পূর্ব্বে বেশ ধূমশিখা উঠিল। স্ত্রীলোকটিকে সুন্দরী বলা যাইতে পারে। তাহার বয়ঃক্রম ছাব্বিশ বৎসর হইবে। কথা কহিতে কহিতে তাহার মুখ পাণ্ডুবর্ণ ধারণ করিল, বদন মণ্ডলে একটা দৃঢ়তার ভাব আসিল। একটা প্রলয়ঙ্করী বাসনা, একটা ভীষণ সংকল্প যেন তাহার হৃদয় অধিকার করিল।

বর্ষীয়সী বলিল—'এ আপদ জুটলো কোথা থেকে' ?

স্ত্রীলোক বলিল—'ওর ভাই আমার স্বামীর কাছে কাজ করে। বড় গরীব, তাই আমরা দয়া ক'রে রেখেছি'।

বর্ষীয়সী ভ্রূকুটি করিল। বলিল—'গরীব ! গরীব বলে কি নিজের জোয়ান ভাতারের'—

স্ত্রীলোকটি বলিল—'না আমার স্বামী খুব ভাল লোক ছিল। তবে একটা লোভ। ছুঁড়ি ভারি সুশ্রী'।

ঘাট হইতে তাহাদের দাসী স্নান করিয়া আসিল। তাহারা গল্প করিতে করিতে চলিল।

গুরুদেব ঠিক বলিয়াছিলেন। কাশীতে আসিয়া বুঝিতেছিলাম যে মানুষ হৃদয়ে অতি তুচ্ছ ভাব পুষিয়া রাখে।

(৪)

কত জঘন্য কথা শুনিতাম। কত বাঙ্গালী যুবক ব্যভিচার করিয়া বন্ধু

বান্ধবদের নিকট আত্মশ্লাঘা করিত। কত দিন কত যুবককে বলিতে শুনিতাম যে সে বিশ্বেশ্বর দেবের মন্দিরে তাহার প্রণয়িনীর সাক্ষাৎ পাইয়াছে, তাহার প্রণয়িনী রাত্রে তাহার নিকট অভিসারে আসিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছে। কত যুবক হা হুতাশ করিত, ব্যভিচার বাসনায় প্রত্যাহত হইয়া ভগবানের নিন্দা করিত। আমার গাত্রে শেল বিঁধিত। মানুষ এত অধম হইতে পারে, জীবাত্মার এত ভীষণ অধোগতি হইতে পারে, পূর্ব্বে তাহা জানিতাম না। এক এক সময় গুরুদেবের প্রতি অভিমান করিতাম, তাঁহাকে ডাকিয়া বলিতাম—গুরুদেব এ কি শিক্ষা দিতে নরকে বসাইয়া রাখিয়াছ! বৃদ্ধ পেনসেনভোগী বুদ্ধিমান কৃতবিদ্য ব্যক্তিগণ এই মহাতীর্থে বাণপ্রস্থ আশ্রমে আসিয়া যে সকল কথা কহিতেন, যেরূপে পুত্র ও পুত্রবধূর স্বার্থপরতা ও অকৃতজ্ঞতা সম্বন্ধে প্রাণের বিষ উদ্গার করিতেন তাহাতে কেবল তাঁহাদের হীনপ্রাণতারই পরিচয় পাইতাম। যখন সংসারের এ ভীষণ ছবিগুলা মনের মধ্যে দেখিতাম তখন স্মৃতি আসিয়া একখানি সরল—! আর ভাবিতে পারিতাম না। হৃদকম্প হইত! বিষ্ণুনাম স্মরণ করিতাম, ঘন ঘন ওঁকার ধ্বনি করিতাম, এক শত আট বার গায়ত্রী জপিতাম। যে যার কর্ম্মফল ভোগ করিবে। মায়ার বন্ধনে থাকিয়া আমার নিজের আত্মার মুক্তিপথ কণ্টকাকীর্ণ করিয়া লাভ কি।

প্রায় সাত দিন পরে সেই স্ত্রীলোকটি একটি ভদ্রলোকের সহিত ঘাটে আসিল। ভদ্রলোকটির বয়স প্রায় বত্রিশ বৎসর হইবে, বেশ সৌম্য দর্শন কান্ত মূর্ত্তি। নিম্নোষ্ঠ একটু মোটা ও ঝোলা। সুখভোগী বিলাসী ও কামাতুর বলিয়া বোধ হইল।

স্ত্রীলোকটি নির্দ্দিষ্ট স্থানে বসিল। ভদ্রলোকটিও তাহার পাশে বসিল। উভয়েরই মুখ চিন্তাক্লিষ্ট আর একটু বেদনাক্লিষ্ট। স্ত্রীলোকটি রুক্ষস্বরে বলিল—'তবে তুমি ওকে নিয়ে থাক। আমাকে দেশে পাঠিয়ে দাও।'

ভদ্রলোকটি বিরক্ত হইয়া বলিল—'এ অবস্থায় বেচারাকে ফেলে কি ক'রে যাই। যাহ'ক ভদ্রলোকের মেয়ে তো, হাঁসপাতালে দিলে ওর ভাই কি বল্‌বে'।

স্ত্রীলোকটি বলিল—'তা' ও জ্বর বিকার ছোঁয়াচে ব্যারাম। মণি আছে, তুমি আছ'—

ভদ্রলোকটি বলিল—'ওর ঘরে তো আর কেউ যাচ্চে না'।

কথা বার্ত্তায় বুঝিলাম, ভদ্রলোকটি তাহার স্বামী। যে স্ত্রীলোকটির উপর তাহার ঈর্ষা হইয়াছিল সে পীড়িতা। সে দিনকার কথাবার্ত্তার পর রমণী

প্রকাশ্যভাবে আপনার স্বামীকে সন্দেহের কথা বলিয়াছে, বোধ হয় সে স্ত্রীলোক-টিকেও বলিয়াছে। তাহাদের কন্যা মণি পীড়িতার বড় অনুরক্তা।

স্ত্রীলোকটি বলিল—'যা' ইচ্ছে কর। একটা কেলেঙ্কারী'—

এবার ভদ্রলোকটি ক্রুদ্ধ হইল। পরে শুনিয়াছিলাম তাঁহার নাম বিনয়-কুমার চট্টোপাধ্যায়। বিনয়বাবু দৃঢ়স্বরে বলিলেন—'দেখ কমল, তোমার ব্যবহার বড় ভীষণ হ'চ্চে। হ্যাঁ সত্য কথা, আমি ওকে ভালবাসি। ওর জন্যে সব করতে পারি। এখন তো তুমি বুঝেছ। আমি নিজে ওর সেবা করব। ইংরেজ ডাক্তার ডাকব'।

কমল শিরে করাঘাত করিয়া কাঁদিয়া উঠিল। বিনয়ের নিম্নোষ্ঠ আরও ঝুলিয়া পড়িল। সে দিকে অপর কেহ ছিল না। আমি এই দাম্পত্য কলহের মীমাংসা করিবার জন্য উঠিলাম। ধীরে ধীরে তাহাদের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইলাম।

বিনয় দৃঢ়স্বরে বলিল—'কি ? কিছু হ'বে না, এখন যাও'।

কমল আমার মুখের দিকে চা'হল।

আমি হাসিয়া বলিলাম—'আমি ভিক্ষা চাহি না। পরসেবা আমার গুরুর আদেশ। আমি রোগের চিকিৎসা জানি'।

বিনয় সসন্দেহে আমার মুখের দিকে তাকাইল। কমল বলিল—'হ্যাঁ বাবা তোমার কাজ আছে। আমাদের বাড়ি একজন অনাথা আছে। চিকিৎসা করতে হ'বে'।

অপরিচিতের নিকট দাম্পত্য কলহ করিয়া হাস্যাস্পদ হইতে হইবে ভাবিয়া বিনয় অগত্যা একটু স্থির হইল। কিন্তু সে আমার মত হাতুড়ের হাতে 'অনাথার' চিকিৎসা ভার অর্পণ করিতে সম্মত হইল না। সে যখন স্ত্রীর নিকট তাহার দুর্ব্বলতা স্বীকার করিয়াছে তখন আর তাহার ভয় কি ? সে অর্থবান ইংরাজ ডাক্তার ডাকিতে স্বীকৃত হইল।

(৫)

বিনয়কুমার একাকী ঘাটের ধারে পায়চারি করিতেছিল। এ তিন দিন তাহার স্ত্রীকে দেখি নাই। বিনয় চিন্তাক্লিষ্ট; কি একটা চিন্তা যেন তাহার হৃদয়কে আলোড়িত করিতেছিল। ঘাটে সে সময় বেশী লোকসমাগম ছিল না। একটা সাধু একটি পঙ্গুপদ গাভী দেখাইয়া চিন্তামগ্ন বিনয়কুমারের নিকট হইতে কিঞ্চিৎ ভিক্ষা পাইবার চেষ্টা করিতেছিল। বিনয় ফিরিয়া আমার দিকে আসিল।

আমি জাহ্নবীর দিকে তাকাইয়া হিল্লোলের শোভা দেখিতেছিলাম। ধীরে ধীরে বিনয়কুমার আমার নিকট আসিল।

উভয়ে ক্ষণকাল নিস্তব্ধ হইয়া রহিলাম। আমি সন্ন্যাসী। পৃথিবীর সহিত আমার কোনও সম্বন্ধ থাকিবার কথা নহে। গুরু আজ্ঞায় উচ্চ নীচ, মূর্খ জ্ঞানী সকলের প্রতি আমার সমান ভালবাসা দেখাইবার কথা, কিন্তু মোহের বশে তাহাকে দেখিয়া আমি যেন জ্বলিতেছিলাম। শাস্ত্র পাপকে ঘৃণা করিতে বলিয়াছে, পাপীকে আলিঙ্গন করিতে শিক্ষা দিয়াছে। আমি কিন্তু সে সকল শিক্ষা ভুলিয়া, নিজের বর্ত্তমান অবস্থা বিস্মৃত হইয়া বিনয়কুমারের প্রতি বিদ্বেষ-পরবশ হইয়াছিলাম।

সে আমাকে আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করিয়া বলিল—'ঠাকুর, তুমি জ্বরবিকারের ওষুধ জান'?

আমি তাহার দিকে চাহিলাম। আপনাকে সংযত করিলাম। কিন্তু সহসা তাহার কথার উত্তর দিতে পারিলাম না।

সে বলিল—'সে দিন তুমি এক অনাথিনীর চিকিৎসা কর্‌তে রাজি হ'য়েছিলে না'?

আমি এবার আত্মসংযম করিয়া বলিলাম—'হাঁ। সাহেব ডাক্তার কি বল্‌লেন'?

ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া বিনয়কুমার বলিল—'সাহেব বড় সুবিধা কর্‌তে পার্‌লেন না। রোগটা কঠিন'।

আমি গুরুবাক্য স্মরণ করিয়া তাঁহার সহিত চলিলাম।

(৬)

কৃশ, শীর্ণ, মলিন হইলেও তাহাকে চিনিলাম। আমার সর্ব্বশরীর থর থর করিয়া কাঁপিতেছিল। ললাট দিয়া দর দর ধারে স্বেদ পড়িতেছিল। কি ভাবিব, কি করিব, কি বলিব কিছুই বুঝিতে পারিলাম না। মুকুলের শয্যার পার্শ্বে একটি হিন্দুস্থানী দাসী বসিয়াছিল। সে বিস্মিতভাবে আমার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল।

আমি ভূমে বসিয়া পড়িলাম। মুখ শুকাইয়া গিয়াছিল, অসুর বিক্রমে হৃদ-পিণ্ড বুকের পাঁজরার উপর ধাক্কা মারিতেছিল। আমি ধীরে ধীরে চিন্তাশক্তি ফিরিয়া পাইতেছিলাম। আমার স্ত্রী, আমার পরিণীতা হিন্দু স্ত্রী অনাথিনী, ব্রহ্ম সাক্ষী করিয়া যাহাকে পত্নীত্বে গ্রহণ করিয়াছিলাম সে পরান্নভোজিনী।

তাহার পর—সে কথা ভাবিতে পারিলাম না, মিথ্যা কথা—ঈর্ষাপরবশ নীচমনা রমণীর কুৎসিত সন্দেহ। কিন্তু সেই পাষণ্ডের কথা স্মরণ করিলাম। সে তাহাকে ভালবাসে। অসম্ভব নয়—কুমুদ চাঁদকে ভালবাসে কিন্তু সে কি চাঁদ ধরিতে পারে? মুকুল—সোণার মুকুল—ছিঃ ছিঃ আমার স্বার্থপরতার জন্য তাহার কি দুর্দ্দশা হইয়াছে!

মুকুল চোখ চাহিল। বিকারগ্রস্তা রমণীর চক্ষু উন্মাদের চক্ষু—সে চক্ষে কিছু বুঝিলাম না। সে চক্ষু বলিল না যে মুকুল অমূল্য রত্ন হারাইয়াছে—সে চক্ষু বলিল না যে তাহার স্বার্থপর স্বামী নিজের আত্মার মুক্তি সাধন করিবার জন্য তাহার বিমল আত্মার এতটা অধঃপতন ঘটাইয়াছে।

মুকুল জল চাহিল। বিস্মিত হিন্দুস্থানী দাসীটা আমারই মুখের দিকে চাহিয়াছিল। আমি মুকুলের মুখে জল দিলাম। চারি চক্ষের মিলন হইল। মুকুল চক্ষু মুদিল।

একবার ভাবিলাম পলাইয়া যাই। যে গিয়াছে তাহার স্পর্শে আর নিজেকে কলুষিত করি কেন? আবার ভাবিলাম সত্য কি মুকুল—

মাথা ঘুরিল। বজ্রাঘাত কাহাকে বলে বুঝিলাম। নিজে সতীর সতীত্বাপহরণ করিলে কি অনুতাপাগ্নিতে দগ্ধ হইতে হয় তাহা উপলব্ধি করিলাম। যদি সত্য হয়? অপরাধী আমি। বিনয়ের কি দোষ?

মুকুল চোখ চাহিল। আমি ডাকিলাম—মুকুল।

সে আমার দিকে তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে চাহিল,শেষে ধীরে ধীরে বলিল—'আগে কেন বলনি দিদি? আমার তো কোন সন্দেহ ছিল না'।

প্রাণে বড় আশা হইল, আবার ডাকিলাম—মুকুল।

রোগিনী বলিল—'ওঃ ধরতে আস্‌ছে। মণির বাবা! তুমি আমার বাবা! ওগো মাগো—'

মুকুল বিকট চিৎকার করিল। আমার কর্ণে যেন বীণা বাজিল। দুই চক্ষু বহিয়া জল পড়িতে লাগিল। নারায়ণ! এখনও ঘোর কলি পড়ে নাই! এত মিষ্ট কথা, এত আশার কথা জীবনে কখনও শুনি নাই। গুরুর মন্ত্রেও এত তৃপ্তি পাই নাই। সর্ব্বশরীর শিহরিয়া উঠিল। এখনও মুক্তির উপায় আছে—

মুকুল আবার বলিল—'ওঃ! মনে করেছ আমার কেহ নাই? সন্ন্যাসী আছে—ত্রিশূল আছে। পরে নরক আছে—'

যাহার জন্ত আছে থাক্ সে নরক আমার জন্ত থাকিবে না। আমি

নারায়ণের শ্রীচরণে প্রণাম করিলাম। বুঝিলাম এই জন্যই গুরুদেব আমাকে পুণ্যতীর্থ বারাণসীতে পাঠাইয়াছিলেন। গৈরিক ভাসাইলাম। অনিশ্চিত মোক্ষপথ ছাড়িয়া কর্ম্মযোগে মুক্তিপথ দেখিলাম। পরিত্যক্তা স্ত্রীর পাণ্ডু অধরে সংসারীর মত স্নেহের চুম্বন করিলাম। তাহার সহিত সন্ন্যাসীর কঠোরতা বর্জ্জন করিলাম।

* * * * *

জীবনে বিনয় আমার সহিত সাক্ষাৎ করে নাই। তাহার স্ত্রী দয়া করিয়া আমাদের দরিদ্রের সংসারে আসিতেন।

শ্রীকেশবচন্দ্র গুপ্ত।

বঙ্গের গীতিকাব্য।

সুবর্ণবর্ষিশুভমুহূর্ত্তে বঙ্গদেশে মহাকবি জয়দেব জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহার পাদস্পর্শে কেবল বঙ্গদেশ নয় সমস্ত ভারত এক অভিনব অনির্ব্বচনীয় অমৃতধারায় আপ্লুত। মহাকবি কালিদাস ছন্দোবদ্ধ কাব্যে ও রূপকে সরস্বতীকে মহামূল্য রত্ন সিংহাসনে আসীন করিয়া আপাদমস্তক অমূল্য সমুজ্জ্বল-মণিমুক্তাখচিত নানালঙ্কারে অলঙ্কৃত করিয়াছেন। বঙ্গকবি জয়দেব সুরভি-মল্লিকা-মালতীর মালায় ভারতীর আবক্ষ-কণ্ঠদেশ বিভূষিত করিয়াছেন। ভক্তের ভক্ত্যুপহার—বন্যপুষ্পহার—অদ্যাপি ম্লান হয় নাই, হইবারও আশঙ্কা নাই, মলয়-সমীর উন্মত্তের ন্যায় সেই সুখস্পর্শ মালিকার মনোহর-সৌরভ গ্রহণ করিয়া সর্ব্বত্র ঢালিয়া দিতেছে।

সংস্কৃতে গীতগোবিন্দের ন্যায় ললিতচ্ছন্দে রচিত ললিতপদে গ্রথিত দ্বিতীয় গীতিকাব্য ছিল কি না জানি না। জানি না বলিয়াই জয়দেবকে ঈদৃশ ছন্দের আবিষ্কর্ত্তা বলিতেছি, একমাত্র জয়দেবেরই ঈদৃশ মনোহরা মৃদুল-পদাবলীর গ্রন্থন-নৈপুণ্য দেখিয়া বিস্মিত ও মোহিত হইতেছি।

জয়দেব যে বীণা গ্রহণ করিয়া ধীরে ধীরে স্বরলহরী উঠাইয়া বীণার ঝঙ্কারে দিঙ্মণ্ডল কম্পিত করিয়া—মুখরিত করিয়া—তাঁহার অভীষ্ট-দেবতাকে মুগ্ধ, প্রীত ও প্রসন্ন করিয়াছিলেন, তাহা দ্বারা জগৎ মুগ্ধ, প্রীত ও প্রসন্ন হইয়াছে। তাঁহার

আশ্রয়দাতা গৌড়েশ্বর মহারাজ লক্ষ্মণসেনকেও গুণগ্রাহী বলিয়া তাঁহারও গুণগাথার কীর্ত্তন করিতেছে। মহাকালের নিষ্পেষণে বৃদ্ধ জয়দেবের পবিত্র অবশ হস্ত হইতে যখন সেই বীণাদণ্ড শ্লথ ও স্খলিত হইল, তখন তাঁহারই চরণপ্রান্তে উপবিষ্ট তাঁহারই শিষ্যদ্বয় মিথিলার বিদ্যাপতি ও বঙ্গদেশের চণ্ডীদাস সেই বিচ্যুত বীণা উঠাইয়া লইলেন। প্রথম বাঙ্গালামিশ্রিত মৈথিলভাষায় দ্বিতীয় খাঁটি বাঙ্গালায় সেই বীণায় ঝঙ্কার তুলিতেন। মহাকবি জয়দেব "চল সখি কুঞ্জং" বলিয়া উদ্ভিন্নযৌবনা রূপসম্পদে অতুলনীয়া অনন্যসাধারণগুণে উদ্ভাসিতা সংস্কৃত-কবিতাদেবীর একটি তাদৃশী দুহিতা দেখিবার জন্য আকাঙ্ক্ষা করিয়াছিলেন। চণ্ডীদাসের যত্ন চেষ্টায় তাহা সম্পন্ন হইল। বলিতে হইবে পরমধামে অবস্থিত জয়দেব তাহা দেখিয়া কৃতার্থ হইয়াছেন।

সাগরগর্ভে বিলীন বাঙ্গলা একদিন জাগিয়া উঠিবে বলিয়া জয়দেব আশা করিয়াছিলেন। সেই আশাই সিন্ধুমগ্ন বাঙ্গালার সীমা নির্দ্দেশ করিবার জন্য "চল সখি কুঞ্জং" বলিয়া সংস্কৃত ও বঙ্গভাষার সীমানির্দ্দেশক একটি সুদৃঢ়যুগের প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। যখন ধীরে ধীরে সমুদ্র সরিয়া যাইতে লাগিল, যখন ধীরে ধীরে অতল জলধি হইতে ভূমিখণ্ড জাগিয়া উঠিতেছিল; তখন জয়দেবের শিষ্যদ্বয় বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাস সেই নবাবিষ্কৃত ভূমিখণ্ড নিজের নিজের অধিকারে আনিবার জন্য যত্ন চেষ্টার পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিলেন।

বিদ্যাপতি চণ্ডীদাসের তিরোধানের পরে মিথিলাবাসী জয়দেবের উত্তরাধিকারের জন্য আর কোনও চেষ্টা করিল না, জয়দেবকে ভুলিয়া গেল। বিদ্যাপতিকে নামমাত্র স্মরণে রাখিল। বাঙ্গালী ভুলিল না, যে প্রণালীর অবলম্বনে জয়দেবের উত্তরাধিকার গ্রহণ করা যায়; চণ্ডীদাসের অনুসৃত সেই প্রণালী অবলম্বনে সেই বিপুল ভূমিখণ্ডে বাঙ্গালীর অধিকার প্রতিষ্ঠিত করিল।

চণ্ডীদাসের পর ক্রমে গোবিন্দদাস, জ্ঞানদাস, চন্দ্রশেখর প্রভৃতি বৈষ্ণব কবিগণ প্রাদুর্ভূত হইয়া চণ্ডীদাস যে সংস্কৃত-দুহিতার মুখে আধ আধ কথা ফোটাইয়া আনন্দিত হইতেন, বৈষ্ণব কবিগণ তাহাকে শিক্ষা দান করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। সংস্কৃত-দুহিতার মুখে সকল কথা ফুটিয়া উঠিল। বঙ্গকবি ও বঙ্গলেখকদিগের অদম্য উৎসাহে ও যত্ন চেষ্টায় সংস্কৃতের কন্যা বঙ্গভাষাসুন্দরী আজ যৌবনে অধিরোহণ করিয়াছে। আজ তাহার ঢলঢলায়মান নয়নে অমৃতলহরীর সঞ্চার হইয়াছে। এজন্য আমরা বঙ্কিমচন্দ্র প্রভৃতি সুলেখকদিগের নিকটে এবং রবীন্দ্রনাথ প্রভৃতি সুকবিদিগের নিকটে কৃতজ্ঞ।

[illegible] বৈষ্ণব কবিগণ যেমন [illegible] কীর্ত্তনের [illegible] নূতন নূতন [illegible] ঢালিয়া মধুর রসের প্রবাহে বঙ্গদেশ ভাসাইয়া দিলেন, সেইরূপ তাঁহাদের [illegible] পরবর্ত্তী সময়ে সাধকশ্রেষ্ঠ মহাত্মা রামপ্রসাদ জন্মগ্রহণ করিয়া নব নব সঙ্গীতে [illegible] প্রাণপ্রদ ঝঙ্কারে নব উদ্দীপনায় মাতৃভক্ত সন্তানের মনে মাতৃভাবের উন্মাদনা আনিয়া তাহাদিগকে উদ্দীপিত ও উন্মাদিত করিলেন।

রামপ্রসাদের পরে দেওয়ান রঘুনাথ রায়, কমলাকান্ত ভট্টাচার্য্য আবার এই প্রণালীর পরমার্থসঙ্গীতের সৃষ্টি করিয়া, গীতিকবিতার পরিপুষ্টিসাধন করিলেন। পরবর্ত্তী সময়ে প্রাদুর্ভূত দাশরথিরায়েরও সহায়তা বিস্মৃত হইবার বিষয় নহে।

কালের কারণতাবাদী—আমরা ভারতবাসী,—কালের কারণতারায় আমাদিগের অভ্যস্ত। এক সময়ে কোনও এক প্রতিভাশালীর মনে যে ভাবের আবির্ভাব হয়, ঠিক সেই সময়ে তাদৃশ অন্য প্রতিভাশালীর মনেও সেইরূপ ভাবের প্রাদুর্ভূতি নিত্য আমাদিগের অনুভূতির বিষয়। এক ব্যক্তি হয়ত [illegible] সাগরের কূলবর্ত্তী, অন্য ব্যক্তি হয়ত হিমালয়ের পাদদেশে অবস্থিত। এক সময়েই সেই দুই মহাত্মাই এক মতের অবতারণা করিলেন; দুই দিক হইতে সেই মহাপুরুষদ্বয়ের মনাবিষ্কৃত মত প্রবাহিত হইয়া একত্র মিলিত হইয়া এক [illegible] হইল। দুইএর মিলনে পরিপুষ্টিলাভ করিয়া বিপুলকলেবরধারণ করিয়া [illegible] সমকে ভেরীনিনাদে আত্মসত্তার জ্ঞাপন করিল, আত্মমর্য্যাদা স্থাপন করিল। তাই আমরা রামপ্রসাদের অবস্থিতির সময়ে কোচবিহারের অধীশ্বর মহারাজ [illegible] নারায়ণ ভূপ বাহাদুরকে, নাটোরের মহারাজ পৃথ্বীপতি রামকৃষ্ণকে, ও [illegible] পুরের প্রজাবৎসল পরদুঃখকাতর সহৃদয়, সৎসাহসী ভূম্যধিকারী [illegible] রায়চৌধুরীকে ভক্তিবিহ্বলিত অলঙ্কারের ঝঙ্কারে ঝঙ্কৃত, উৎকৃষ্ট উৎকৃষ্ট [illegible] রচনা করিতে দেখিয়াছি। বৃদ্ধ দেওয়ান মহাশয়ের কণ্ঠে যখন [illegible] বিচিত্র [illegible] কৃষ্ণসঙ্গীত ও শ্যামাসঙ্গীত [illegible] বেহালার [illegible] উদ্গীত হইতেছিল, যখন সাধক কমলাকান্ত ভাবে বিভোর হইয়া শ্যামাসঙ্গীত গাইয়া [illegible] হইতেছিলেন, ঠিক সেই সময়ে [illegible] বিপুল ভূমির [illegible] ভূম্যধিকারী রাজা [illegible] চৌধুরীর মুখে [illegible] সঙ্গীতের [illegible] [illegible]

এক সময়ে রঙ্গপুর ইটাকুমারীতে সাধকশ্রেষ্ঠ হরমোহন সেন, চন্দ্রমোহন সেন, পণ্ডিতাগ্রগণ্য পূজ্যপাদ খুল্লপিতামহ গঙ্গেশ্বর ভট্টাচার্য্য, জ্যেষ্ঠতাত হরকান্ত বিদ্যাভূষণ ও পিতৃদেবের মুখে যুগপৎ শ্যামাসঙ্গীত উচ্চারিত হইয়া উত্তরবঙ্গ প্লাবিত করিতেছিল। তাই আমরা পূর্ব্বকথিত মতের সমর্থক, কালের কারণতাবাদী। অল্পদিন পূর্ব্বে একসময়ে আমরা পূর্ব্ববঙ্গে কৃষ্ণকমল গোস্বামী (যাঁহার জন্মভূমি দক্ষিণবঙ্গ) দক্ষিণবঙ্গে যাত্রাগায়ক জন্মভূমি-রাজসাহীর মতিরায় ও নীলকণ্ঠের অভ্যুত্থান দেখিতে পাই; আর বুঝিতে পাই,—বঙ্গবাসীর সুকবি শ্রীযুক্ত বিহারীলাল সরকারের উদয়োন্মুখ প্রভা; সেই সময়েই রাজসাহী বলিহারের মহারাজ কৃষ্ণেন্দ্রনারায়ণ ও শ্যামচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় (পাগল) ধর্ম্মপ্রবণ রামজয় বাগছীর শ্যামাগীতির ও সুকবি রজনীকান্ত সেনের সরস সঙ্গীত-ধারার সৃষ্টি। ঠিক সেই সময়ে গোবিন্দচন্দ্র চৌধুরীকে সাধকশ্রেষ্ঠ রামপ্রসাদের ন্যায় মহাজনের খাতার পৃষ্ঠে, আত্মীয় স্বজনের লিখিত-পত্রের শূন্য অংশে তাহার পরিত্যক্ত বেষ্টনীতে, ও সংবাদপত্রের পরিত্যক্ত মোড়কে শ্যামাসঙ্গীত লিখিতে দেখি। বলিতে কি গোবিন্দচন্দ্র সংস্কৃত চতুষ্পাঠীতে বা ইংরেজি স্কুলে পড়িবার কোনও সুযোগই পান নাই। পল্লিগ্রামে জন্মগ্রহণ করিয়া পল্লিগ্রামে গুরুমহাশয়ের নিকটে তৎকালপ্রচলিত জমিদারী সেরেস্তা চালাইবার উপযুক্ত বিদ্যামাত্র গ্রহণ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। দারিদ্র্যের নিষ্পেষণে সময়ে সময়ে তাঁহাকে অন্নাভাবের চিন্তার নিপীড়নে বিব্রত হইতে হইয়াছিল। রঙ্গপুরের কোনও মহাজনের দোকানে খাতা লিখা ভিন্ন তাঁহার ভাগ্যে কোনও রূপ উচ্চপদ প্রাপ্তি ঘটিয়া উঠে নাই। এমন কি, তিনি অর্থাভাবে নিজে কাগজ ক্রয় করিয়া একখানি খাতায় গানগুলি লিখিয়া অন্য একটি খাতায় বিশুদ্ধভাবে লিখিয়া যাইতে পারেন নাই। বঙ্গদেশের দুর্ভাগ্যবশে এই আকারে তাঁহার অনেক অমূল্য রত্ন হারাইয়া গিয়াছে। অনেকে আবার তাঁহার অনেক গান আত্মসাৎ করিয়া নিজের নামে চালাইয়া দিয়াছে।

তাজহাটের মহারাজ ৺গোবিন্দলাল রায় বাহাদুর লোকপরম্পরায় গোবিন্দচন্দ্রের অসামান্য কবিত্বের পরিচয় পাইয়া নানাস্থানে রক্ষিত ও বিক্ষিপ্ত কাগজগুলি একত্র করাইয়া পুস্তকাকারে সাজাইয়া সদ্ভাবসঙ্গীতনামে নিজব্যয়ে মুদ্রিত করেন ও তাহা দ্বারা কবিকে উৎসাহিত করেন। এক্ষণে সে গ্রন্থও দুর্লভ হইয়া পড়িয়াছে। কবি গোবিন্দচন্দ্রের এই প্রথম সুযোগ ও শেষ সুযোগ। আর তাঁহার ভাগ্যে বড়লোকের বাহুচ্ছায়ার আশ্রয়লাভ হয় নাই। দরিদ্র গোবিন্দ-

চন্দ্র দরিদ্রতার আশ্রয়েই তাঁহার অমূল্য জীবলীলা সাঙ্গ করিয়াছেন। দরিদ্রতার মধ্যে অবস্থিত হইয়া গোবিন্দচন্দ্র যে অমূল্যরত্নরাজি উপার্জ্জন করিয়াছেন, যাহার অকৃত্রিম-সমুজ্জল-বৈদ্যুতিক-প্রভায় আজ ভক্তের মনের এক উদ্দীপ্ত আলোক ফুটিয়া উঠিয়াছে, বঙ্গ সাহিত্যের এক নূতন জ্যোতিঃ বিকিরণ হইতেছে, শ্রোতৃ-মণ্ডলী যখন নানা কবির নানা প্রকারের পরমার্থগীতিধারাশ্রবণে মুগ্ধ হইয়াও আবার গোবিন্দচন্দ্রের রচিত যে সকল সঙ্গীতশ্রবণ করিবার আগ্রহপ্রকাশ করিয়া থাকেন, "গোবিন্দচন্দ্রের গান ভিন্ন অন্যের গানে কতটুকু তৃপ্তিলাভ করিব?" বলিয়া দুঃখ প্রকাশ করিয়া থাকেন, আমরা সৌভাগ্যবশতঃ সেই মহাকবি মহারসিক গোবিন্দচন্দ্রের সেই অক্ষয় ভাণ্ডারের সেই অমূল্য রত্নরাজির কতকগুলি রত্ন আজ সাহিত্য-পরিষদের সভ্যদিগকে উপহার দিতে সমর্থ হইতেছি।

রঙ্গপুর সাহিত্য-পরিষদের সুযোগ্য সম্পাদক শ্রীমান্ সুরেন্দ্রচন্দ্র রায়চৌধুরী এই মহাভাবোচ্ছ্বাসিত কবিত্বে অতুলনীয় নষ্টোন্মুখসঙ্গীতগুলির রক্ষাকল্পে সঙ্কল্প করেন। তাঁহার বহু অনুসন্ধান ও চেষ্টার ফলে স্বর্গীয় কবির অপ্রাপ্তবয়স্ক পুত্রের নিকট হইতে একখানি গানের খাতা সংগৃহীত হয়। রঙ্গপুর-সাহিত্য-পরিষদে উহা মুদ্রণ করিবার জন্য তিনি প্রস্তাব করেন। সর্ব্ব সম্মতিতে সাহিত্য-পরিষদের ব্যয়ে উহা মুদ্রিত হইবে অবধারিত হয়।

৺গোবিন্দ চৌধুরীর সঙ্গীতপুষ্পাঞ্জলির ভূমিকা লিখিবার প্রলোভন আমি ত্যাগ করিতে পারি নাই; কারণ বাঙ্গালায় এরূপ সাধক কবির সংখ্যা অতি অল্প। গানে যেমন ভাবের উচ্ছ্বাস আছে, শব্দালঙ্কারের ঝঙ্কার আছে, অর্থালঙ্কারের পরিব্যক্তি আছে, সেইরূপ পদে পদে ব্যঙ্গার্থও পরিস্ফুট। গোবিন্দচন্দ্রের দুই চারিটি গান এত উৎকৃষ্ট যে, তাহার সহিত তুলনা করিয়া বঙ্গভাষায় কোনও গান বা কবিতা দেখাইতে পারিব না, বোধ হয় এরূপ বলিলে ধৃষ্টতা হইবে না।

শ্রীযাদবেশ্বর তর্করত্ন।

ভক্তমাল ও গিরিশচন্দ্র।

নটকবি গিরিশচন্দ্র নিজরচিত কয়েকখানি নাটকে ভক্তমাল নামক বৈষ্ণব-গ্রন্থ হইতে উপাখ্যানাবলী আহরণ করিয়াছিলেন। স্থলে স্থলে নাটকে কথোপকথনের কিয়দংশও অবিকল উক্ত গ্রন্থ হইতে গৃহীত হইয়াছে। ভক্তমাল গ্রন্থের নিকট গিরিশচন্দ্র কি পরিমাণে ঋণী এই প্রবন্ধে তাহার আলোচনা করিব।

ভক্তমাল গ্রন্থে বর্ণিত কাহিনীগুলির মূলে অনেক স্থলেই সত্য ঘটনা আছে ইহাই সাধারণের বিশ্বাস। ভক্তের নিকট ভক্তমালে বর্ণিত অতিপ্রাকৃত ঘটনাবলী অবিশ্বাস্য নয়। যে সকল নরনারীর চরিত্র উক্ত গ্রন্থে বর্ণিত হইয়াছে, তাহারা অনেকেই এককালে যথার্থই বিদ্যমান ছিলেন তাহা অনেকে স্বীকার করেন। ভক্তগণের কাহিনী লোকমুখে প্রচারিত হইতে থাকে, পরে গ্রন্থাকারে নিবদ্ধ হয়। শঙ্করাচার্য্য, রামানুজ, জয়দেব, তুলসীদাস, কবীর, মীরাবাই প্রভৃতির চরিত্র ভক্তমালে স্থান পাইয়াছে। ইঁহারা যে ঐতিহাসিক ব্যক্তি তৎপক্ষে কোনও সন্দেহই নাই। কতকগুলি চরিত্র কিংবদন্তীমূলক হইতে পারে।

নাভাজী হিন্দীভাষায় ভক্তমাল নামক একখানি গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। প্রিয়দাস তাহার একটি টীকা রচনা করেন। এই হিন্দী ভক্তমাল অবলম্বন করিয়া লালদাস (নামান্তর কৃষ্ণদাস) বাঙ্গলা ভাষায় ভক্তমালগ্রন্থ রচনা করেন। ভক্তমালে আছে—

"বন্দো শ্রী অগ্রদাস যাঁর শিষ্য নাভা।
তেঁহো কৈলা ভক্তমাল সজ্জনের লোভা॥

* * *

চারি যুগের ভক্তগণের অপূর্ব্ব চরিতে।
প্রিয়দাসে আজ্ঞা দিলা টীকা বিস্তারিতে॥

* * *

গ্রন্থ হয় ব্রজভাষা সবে বুঝে নাহি।
যেহেতু গৌড়িয়াবাক্যে শ্রেণীমত কহি॥"

গুরু অগ্রদাসের আজ্ঞায় শিষ্য নাভা ভক্তমাল রচনা করিয়াছিলেন। প্রিয়দাস তাহার টীকা করেন কিন্তু এই টীকা ব্রজভাষায় রচিত বলিয়া গৌড়ীয় ভাষায় লালদাস ভক্তমাল রচনা করেন।

লালদাস ভক্তমাল রচনা করিতে হরিভক্তিবিলাস, চৈতন্যচরিতামৃত, উজ্জ্বল-নীলমণি, ষট্‌সন্দর্ভ প্রভৃতি বহু গ্রন্থের সাহায্য লইয়াছেন। স্থলে স্থলে বহু সংস্কৃত শ্লোকও উদ্ধৃত করিয়াছেন। গিরিশচন্দ্র এই শ্লোকগুলির কিরূপ ব্যবহার করিয়াছেন তাহা আমরা পরে দেখাইব।

গিরিশচন্দ্রের তিনখানি নাটকের মূল উপাখ্যান ভক্তমাল হইতে গৃহীত। সে তিনখানি নাটক, বিল্বমঙ্গল ঠাকুর, রূপ-সনাতন ও করমেতিবাই।

(১) বিল্বমঙ্গল ঠাকুর।

ভক্তমালের দ্বাদশমালায় বিল্বমঙ্গলের উপাখ্যান বর্ণিত হইয়াছে।

"দক্ষিণদেশেতে কৃষ্ণবেণ্বা নামে নদী।
তাহার নিকট গ্রামে প্রায় কর্ম্মবাদী॥
তথায় বসতি বিল্বমঙ্গল নাম বিপ্র।
লম্পট স্বভাব ধর্ম্ম অংশে অতি ক্ষিপ্র॥
নদী পারে এক বেশ্যা নাম চিন্তামণি।
তাহাতে আসক্ত সদা দিবস রজনী॥
একদিন বিপ্রের পিতৃশ্রাদ্ধ মৃতাতিথি।
বেশ্যা কহে নদীপার না আসিহ ইথি॥"

এই "নদীপার না আসিহ ইথি" নাটকে "না, আজ আবার বুঝি নদী পেরুতে নেই?"

বিল্বমঙ্গল। না, আজ আর আস্‌ছি নি। নদী পেরুতে নেই ত আসব কেমন করে?
চিন্তামণি। তা না আসিস্। কাল সকাল বেলা একবার আসিস্।"

(১ম অঙ্ক, ১ম গর্ভাঙ্ক)

বিল্বমঙ্গল নাটকের ১ম অঙ্কের ১ম দৃশ্যটিতে অতীব সুকৌশলে গিরিশচন্দ্র চিন্তামণির প্রতি বিল্বমঙ্গলের অনুরাগ প্রদর্শন করিয়াছেন। "তাহাতে আসক্ত সদা দিবস রজনী" ভক্তমালের এই একটিমাত্র পংক্তি বটে কিন্তু এই আসক্তি নাটকে ফুটাইয়া তোলা যে কতদূর কঠিন তাহা সহজেই বোধগম্য হইবে। গিরিশ-চন্দ্র একটিমাত্র দৃশ্যেই বিল্বমঙ্গলের অসীম অনুরাগ সুনিপুণভাবে অঙ্কিত করিয়াছেন। ভক্তমালের উপাখ্যান ছায়া, গিরিশচন্দ্র তাহাকে কায়া দিয়াছেন; বিল্বমঙ্গল ও চিন্তামণির সজীব চরিত্র আমাদের নয়ন সমক্ষে ধরিয়াছেন।

তারপর ভক্তমালে আছে—

"সারাদিন রহে ঘরে উদ্বিগ্ন মানস।
দ্বিতীয় প্রহর রাত্রে হইল অবশ॥
বৃষ্টিবরিষণ ঘোর বহে ঝঞ্ঝাবাত।
উঠিয়া চলিলা নাহি মানে বজ্রাঘাত॥"

নাটকে বিল্বমঙ্গল ব্যস্ত হইয়া পুরোহিতকে বলিতেছে "এই ত বাপের পিণ্ডি দিলুম, এই নাও সন্ধ্যে হ'ল। তোমার যে মন্ত্র পড়াবার ধূম।" সন্ধ্যার সময় আকাশের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া বিল্বমঙ্গল "ইস্, এই সারলে। পশ্চিমে মেঘখানা বড় উঠেছে। উঃ, বেজায় ঝড়।" (১ম অঙ্ক, ৩য় গর্ভাঙ্ক) বিল্বমঙ্গল তবু নদীপার হইয়া চিন্তামণির বাড়ী যাইবে।

"নদীপার যাইতে নাহি নৌকা নাহি ভেলা।
কাম তরণিতে চড়ি জলে ঝাঁপ দিলা॥"—[ভক্তমাল।

"একখানা কি জেলেডিঙ্গিও বাঁধা থাক্‌তে নেই? একখানা ভেলা টেলা, কাঠ টাট কত কি যে নদীর ধারে থাকে, তা কি একটা নেই? উঃ মুষলের ধারে বৃষ্টি। যা'ব, চিন্তামণিকে দেখ্‌ব। চিন্তামণি! চিন্তামণি!" (জলে ঝম্পপ্রদান)

[বিল্বমঙ্গল, ১ম অঙ্ক, ৪র্থ গর্ভাঙ্ক।

তারপর—

"কামবেগে লইয়া ডুবায় জলবেগে।
ডুবিতে ডুবিতে এক শব পাইল আগে॥
জ্ঞানহত কাষ্ঠবুজো মুদয়ে ধরিয়া।
মড়া মৃতের ক্লেদ লাগে সর্ব্বাঙ্গ ভরিয়া॥
সে অনুধাবন নাহি কষ্টে পার হইয়া।
বেশ্যার বাটীর চৌদিকে ফিরয়ে ধাইয়া॥
প্রাচীরের গর্ত্তে এক সর্প মুখ দিয়া।
রহয়ে বাহিরে পুচ্ছ লম্বিত করিয়া॥
দ্বার না পাইয়া দীর্ঘরজ্জুবুদ্ধি করি।
সেই সর্প ধরি উঠে প্রাচীর উপরি॥
ভিতরে উপর হইতে লম্ফ দিয়া পড়ে।
শব্দ শুনি বেশ্যাগণ ডরে হড়বড়ে॥
পড়িয়া চূর্ণিত দেহ উঠিতে না পারে।
ধরাধরি করিয়া আনিলা সঙ্গে ঘরে॥"

নাটকে নিশীথে প্রাচীর হইতে বিল্বমঙ্গলের পতন প্রদর্শিত হইয়াছে। সেই সময় থাক চীৎকার করিয়া উঠিল—আলো লইয়া চিন্তামণি আসিল। থাক বলিল—

"এই পাঁচীল থেকে লাফিয়ে পড়েছে। কেমন যে কায়দায় পড়েছে।...তোমরা একবার এখানে এস না গা। ধরাধরি ক'রে ঘরে নে যাই।"

[২য় অঙ্ক, ২য় গর্ভাঙ্ক।

"অঙ্গেতে দুর্গতি ক্লেদ দেখিয়া পুছয়ে।
যেরূপে আইল গিয়া প্রত্যক্ষ দেখায়ে॥"
(ভক্তমাল).

নাটকে—

"দেখ ত গা। গায়ে ত কিছু মেখে আসেনি। থু! থু! এ যে নাড়ী উঠে গেল।"..."সর্ব্বনাশ করেছে। পচা মাস, পোকা থিক্ থিক্ কচ্ছে।"

বিল্বমঙ্গলকে বলিল "চল্। তোর মড়া দেখাবি চল্।" পরে লণ্ঠন যুক্ত

সর্প দেখিয়া চিন্তামণি বলিল "চল, তুমি কি কাঠ ধরে এলে আমি দেখ্‌ব।" শেষে বিল্বমঙ্গল নদীকূলে গলিত শব দেখাইয়া দিল। তখন চিন্তামণি বলিল—

"ছি ছি ধিক্ ধিক্ তব হেন দুষ্টবুদ্ধি।
হেন কর্ম্মে যার মতি তার এই সিদ্ধি॥
হেন ভব-মদ যাতে শব কালসর্প।
না চিনিলে অধীন হইয়া কামদর্প॥
আমি বেশ্যা নীচ অতি অস্পর্শ নিন্দিত।
তাহে তুমি বিপ্র মোতে ক্রিয়া অনুচিত॥
এ হেন অপ্রাপ্ত কর্ম্মে হেন অনুরাগ।
ইহার যে শতাংশের অংশ একভাগ॥
শ্রীকৃষ্ণচরণে যদি হইত তোমার।
তবে কি না হইত চতুর্ব্বর্গ সেবা যার॥"

(ভক্তমাল)

নাটকে—

"তুমি সত্য সত্যই উন্মাদ! তোমার ঘৃণা নাই, লজ্জা নাই, ভয় নাই। তুমি দড়ী বলে সাপ ধর। কাঠ বলে পচা মড়া ধর।...এই মন, আমি বেশ্যা, যদি আমায় না দিয়ে হরিপাদপদ্মে দিতে, তোমার কাজ হ'ত।" (২য় অঙ্ক, ২য় গর্ভাঙ্ক)

বিল্বমঙ্গলের এই কথা "ভাবিয়া বিবেক হইল সুদৃঢ় মানসে।" (ভক্তমাল) নাটকে তাহা বিশদরূপে প্রদর্শিত হইয়াছে।

"স্থানান্তরে এক সাধু সোমগিরি নাম।
তাঁর স্থানে কৃষ্ণমন্ত্র লৈলা অভিরাম॥"

নাটকে তৃতীয় অঙ্ক প্রথম গর্ভাঙ্কে এই মন্ত্রগ্রহণ বর্ণিত। মন্ত্র গ্রহণের পর—

"কৃষ্ণ দরশনে মন উৎকণ্ঠ হইল।
হাহা কোথা কৃষ্ণ বলি ধাইয়া চলিল॥"

(ভক্তমাল)

নাটকে বিল্বমঙ্গলের মুখেও এ কথা প্রদত্ত হইয়াছে

"মন, হাসি পায়,
হ'ল তোর বৈরাগ্য উদয়
চ'লে গেলি একবারে গৃহবাস ত্যজি।
'কোথা কৃষ্ণ' বলি, হলি উতরোলি
যেন তোর কত প্রেম।"

[৩য় অঙ্ক, ৬ষ্ঠ গর্ভাঙ্ক।

তারপর বিল্বমঙ্গলের পরীক্ষা।

"সরোবরে স্নান করে বহু নরনারী।
সুন্দরী যুবতী এক বণিকের তিরী (স্ত্রী)॥
দৈবাৎ তাহার পানে দৃষ্টিপাত হইল।
চেন যে সাধুর মন ঈষৎ টলিল॥...
স্নান করি সেই নারী যে দিকে চলিল।
সাধু তার পাছে পাছে গমন করিল॥
বধূ নিজ অন্তঃপুর গমন করিল।
সাধু তার গৃহদ্বারে বসিয়া রহিল॥

হেনকালে সেই স্ত্রীর স্বামী সুচরিত।
যারে সাধু বলি দেখি হইলা চকিত॥
বহু স্তব করি কহে করযোড় করি।
কিবা আজ্ঞা হয় কহ করি শিরে ধরি॥
সাধু কহে যদি মোর বচন রাখহ।
তোমার রমণী আনি আমারে দেখাহ॥
বণিকচরিত্র কিছু অলৌকিক হয়ে।
বৈষ্ণবপিরীতিকাযে স্বীকার করয়ে॥"

(ভক্তমাল)

এই ঘটনা নাটকে ৩য় অঙ্ক ৩য় গর্ভাঙ্ক ও ৫ম গর্ভাঙ্কে বর্ণিত হইয়াছে। তাহার পর বণিক্ ও তৎপত্নীর কথোপকথন গিরিশচন্দ্রের নিজস্ব। এই কথোপকথনটিতে উভয়ের মনের চাঞ্চল্য উত্তমরূপে প্রকাশ পাইয়াছে। তারপর বণিক্

"অন্তঃপুরে গিয়া অলঙ্কার পরাইয়া।
আনিলা রমণী নিজ সুবেশ করিয়া॥
নির্জ্জনে সাধুর আগে হর্ষে আনি দিলা।
আপাদমস্তক সাধু সব নিরখিলা॥
চক্ষু সম্বোধন করি তত্ত্ব বিচারিয়া।
কহিতে লাগিল নিজ মন বুঝাইয়া॥
অরে মূঢ় চক্ষু কি দেখিয়া ভুলিয়াছ।
অগ্রাহ্য অবিদ্যাপথে কি ধন পাইয়াছ॥
রক্তমাংসক্লেদবিষ্ঠামূত্রময় দেহ।
ত্বক্ আচ্ছাদনমাত্র দরশ সুবহ॥
নির্ঘৃণ তোমার মতি এ হেন কদর্য্যে।
লালসা করহ যাথে নিন্দিত অভুজ্যে॥
ধিক ধিক্ অরে দুষ্ট অধম ইন্দ্রিয়।
কেন বিড়ম্বন মোরে কর অপ্রিয়॥
এই ত ইহার তত্ত্ব জানিলা এখন।
পরিণামে কেবল যে দুঃখের কারণ॥"

(ভক্তমাল)

নাটকেও অবিকল এইরূপ বর্ণনা। বিল্বমঙ্গল বলিল—

"মন, তুমি আঁখির গরব কর?...
ছাখ, তোর আঁখির আচার।
সেই মাংস অস্থি,
কাষ্ঠভ্রমে, প্রাণের তাড়নে
দিলে যারে আলিঙ্গন—
সেইমত গলিত হইবে।
বাহ্যিক এ লাবণ্যের আবরণ।
এই রূপ তাও তুমি সংসারের সার?...
বুঝ মন, মরম তোমার......
অসার যে বস্তু তাহে কহে নিত্যধন।
এর ছলে কত দিন র'বি ভুলে।"

[৩য় অঙ্ক শেষ দৃশ্য]

"এতো কহি সেই যুবতীর স্থানে কহে।
তীক্ষ্ণ দুটি সূঁচ শীঘ্র আনি দেহ মোহে॥
আজ্ঞা মানি সূচ দুটি যাইয়া আনিলা।
সাধু নিজ চক্ষে তারে বিঁধিতে কহিলা॥
পুনঃ পুনঃ আজ্ঞা না লঙ্ঘিতে পারি বিঁন্ধে।
বণিক্ দেখিয়া খেদ করে নিরানন্দে॥"

[ভক্তমাল]

এইখানে গিরিশচন্দ্র ভক্তমালের অনুসরণ করেন নাই। বণিকপত্নী নিজে বিল্বমঙ্গলকে অন্ধ করিল, এ অতি বিসদৃশ দেখায়। তাই নাটকের বিল্বমঙ্গল বলিল "তোমার অলঙ্কার থেকে দুটো কাঁটা খুলে দাও।" তারপর বণিকপত্নীকে বিদায় দিয়া নিজেই নিজের চক্ষু কাঁটা দ্বারা বিদ্ধ করিল। এই পরিবর্ত্তনে

নাটকের উৎকর্ষ হইয়াছে। দুর্ব্বাসার অভিশাপ আনিয়া কালিদাস যেরূপ অভিজ্ঞান-শকুন্তলে দুষ্মন্ত-চরিত্র দোষমুক্ত করিয়াছেন, এই পরিবর্ত্তনে গিরিশ-চন্দ্রও বণিকপত্নীর চরিত্রে দোষলেশ স্পর্শ হইতে দেন নাই। তাই বলি, এই পরিবর্ত্তন অতি সুন্দর।

আর পঞ্চম অঙ্কের দ্বিতীয় গর্ভাঙ্কটির কিয়দংশ ভক্তমাল হইতে গৃহীত। অন্ধ বিল্বমঙ্গল কৃষ্ণধ্যানরত। শ্রীকৃষ্ণ রাখাল-বালকবেশে আসিয়া বলিলেন—

"রৌদ্রে কেন বসি ভাব ভোখে কেন রহ।
ছায়াতে আসিয়া বৈস আহার করহ॥"

(ভক্তমাল)

নাটকে—

"আয়, রোদে বসে আছিস্। ছায়ায় আয়।"

"তেঁহো কহে অন্ধ মুঞি দেখিতে না পাই।"

(ভক্তমাল)

নাটকে—

"আমার হাত ধর! আমি ত দেখ্‌তে পাই না।"

"পুন কিছু হাত বাড়াইলা ভঙ্গী করি।
সাপটিয়া ধরে সাধু অতি দ্রুত করি॥...
সাধু যদি শক্ত করি শ্রীহস্ত ধরিল।
আহা মরি বাজে বলি শঠতা করিল॥
বেদনা লাগিবে বলি সাধু চমকিল।
যে হেতুক হস্ত শ্লথ পাই পলাইল॥
ফাঁফর হইয়া সাধু কহিতে লাগিলা।
এ বড় আশ্চর্য্য নহে হাত ছুড়ি গেলা॥
হৃদয় হইতে যদি পারহ যাইতে।
তবেত গণিয়ে মুঞি পৌরুষ তোমাতে॥"

(ভক্তমাল)

নাটকেও ঠিক্ এইরূপ।

"রাখাল। আয়।

(বিল্বমঙ্গল কর্ত্তৃক রাখাল বালকের হস্তধারণ)

বিল্বমঙ্গল। আর ত ছাড়্‌ব না। আমার অনেক যত্নের নিধি।

রাখাল। আমার কচি হাত। ছাড়, ছাড়, লাগে।

(বিল্বমঙ্গল কর্ত্তৃক হস্ত ছাড়িয়া দেওন)

রাখাল। এই ত ছেড়ে দিয়েছিস্। (পলায়ন)

বিল্ব। ছলে হাত ছিনাইলে
পৌরুষ কি তাহে তব ?
আরে রে গোপাল,
দেছ প্রেম বড় কাঁদাইয়ে
সেই প্রেমে, হৃদয়ে হৃদয়ে রাখিব বাঁধিয়ে ;
পার যদি হৃদয় হইতে পলাইতে
তবে ত তোমারে গণি।"

[৫ম অঙ্ক, ২য় গর্ভাঙ্ক]

এই শেষোক্ত ভাবটি ভক্তমালে উদ্ধৃত একটি শ্লোকে বর্ণিত হইয়াছে। যথা—

"হস্তমুৎক্ষিপ্য যাতোঽসি বলাৎ কৃষ্ণ কিমদ্ভুতম্।
হৃদয়াদ্ যদি নির্যাসি পৌরুষং গণয়ামি তে ॥"

এই শ্লোকটি শ্রীকৃষ্ণকর্ণামৃত ও ভক্তিরসামৃত নামক গ্রন্থে পাওয়া যায়।

তাহার পর অন্ধ বিল্বমঙ্গল কৃষ্ণকে ধরিতে চলিল।

"কৃষ্ণ দূরে দূরে যায়, সাধু পাছে পাছে ধায়
চক্ষু অন্ধ না পায় দেখিতে।
চুম্বক মণির সাথে , লৌহ স্বাভাবিক রীতে
যেন ধায়, যায় তেন মতে ॥"

(ভক্তমাল)

নাটকে—বিল্বমঙ্গল বলিল—

"ধরিব তোমায়
দেখি পারি কিম্বা হারি।"

রাখাল বৃক্ষের অন্তরাল হইতে বলিল "টু—কৈ ধর দেখি।"

"তব কৃষ্ণচন্দ্র নিজ সুধাময় করাম্বুজ
দয়া করি চক্ষে বুলাইলা।
অপ্রাকৃত দেহ সেই দিব্যচক্ষু হইল দুই
কৃষ্ণরূপ-পানের পিয়ালা ॥"

(ভক্তমাল)

নাটকে কৃষ্ণ "চা', তোর চোখ্ হয়েছে" বলিতেই বিল্বমঙ্গল দৃষ্টিশক্তি লাভ করিল।

শেষে চিন্তামণিও বৃন্দাবনে উপস্থিত হইল।

"দৈবযোগে সেই রামা, চিন্তামণি বেশ্যা নামা
কৃষ্ণকৃপা তাহার উপরি।

"সকল করিয়া দূরে কৃষ্ণ প্রেমাবেশ ভরে
আসি মিলে বৃন্দাবনপুরী ॥
সুবৈরাগ্য অনুরাগে শ্রীবিল্বমঙ্গল আগে
আসিয়া মিলিলা চমকিতে।
শ্রীবিল্বমঙ্গল তবে বন্দে দেখি গুরু ভাবে
প্রণমিলা বহু ভক্তিরীতে ॥"

(ভক্তমাল)

নাটকে চিন্তামণিকে দেখিয়া বিল্বমঙ্গল বলিল—

"একি? গুরু? প্রেমশিক্ষাদাতা? বিশ্বমোহিনী? আমায় কৃপা করুন।" (প্রণাম করণ)।

চিন্তামণি বলিল—

"শরণ লইনু মুঞি আর কিছু নাহি চাই
কৃষ্ণ মোরে দেখাও বিরলে।"

(ভক্তমাল)

নাটকে—

"তোমার কৃষ্ণ তোমার থাক্‌বে। আমায় একবার দেখাও। আমি বড় পতিত। পতিত-পাবনকে একবার দেখি।"

পরে শ্রীকৃষ্ণ উভয়কেই দর্শন দিলেন।

"চিন্তামণি অধিকারী ভক্ত অনুরোধ ভারি
দুই তত্ত্বে দিলা দরশন।"

ভক্তমালের কাহিনী এইখানে শেষ। নাটকেরও এইখানে যবনিকা।

ভক্তমালের নিকট গিরিশচন্দ্রের ঋণ উপরে উদ্ধৃত অংশগুলি হইতে স্পষ্টই বুঝা যাইবে। কিন্তু বিল্বমঙ্গলে গিরিশচন্দ্রের নিজস্বই বেশী। কেবল উপাখ্যান ও দুই চারিটি কথোপকথন ভিন্ন সবই কবির নূতন সৃষ্টি। ভিক্ষুক, সাধক, থাক, পাগলিনী নূতন চরিত্র। বণিক্ ও বণিকপত্নীর বিশদ চরিত্রও গিরিশ-চন্দ্রের নিজের। চিন্তামণির মানসিক ভাবের পরিবর্ত্তনের কথা ভক্তমালে কিছুই নাই। গিরিশচন্দ্র অতি সুকৌশলে ধীরে ধীরে চিন্তামণির মানসিক উন্নতির বর্ণনা করিয়াছেন। বিল্বমঙ্গল নাটকের নিপুণ চরিত্রচিত্র সবই গিরিশ-চন্দ্রের। নাটকের সকল সৌন্দর্য্যের আলোচনা স্থানান্তরে করিয়াছি।*

এস্থলে এইটুকু বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে, প্রাণহীন কঙ্কাল ও সুগঠিত জীবিত

* মানসী, ৪র্থ ভাগ, বৈশাখ; মল্লিখিত "বিল্বমঙ্গল ঠাকুর" দ্রষ্টব্য।

নরদেহে যেরূপ প্রভেদ, ভক্তমালের কাহিনীর সহিত গিরিশচন্দ্রের নাটকেরও সেইরূপ পার্থক্য। ভক্তমালেয় বিল্বমঙ্গল চরিত্র গিরিশচন্দ্র ঋণ গ্রহণ করিয়াছেন, কিন্তু ভিক্ষুক, সাধক, পাগ্‌লিনী প্রভৃতি চরিত্র অঙ্কন করিয়া উচ্চহারে কুসীদ প্রদানের সহিত তাহা পরিশোধ করিয়াছেন। কোল্‌রিজ্‌ বলিয়াছিলেন "Genius always pays usurious interest in borrowing"। গিরিশচন্দ্রের বিল্বমঙ্গল তাহার জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত। এই কথা পরবর্ত্তী নাটক দুটির আলোচনাতেও মনে রাখিতে হইবে।

ক্রমশঃ

শ্রীশরচ্চন্দ্র ঘোষাল।

তুমি।

(১)

গিয়েছ কি তুমি মরণের পারে
হে আমার গৃহলক্ষ্মি!
যে তোমারে আমি সর্ব্বদা চাই,
মনে হয় না ত সেই তুমি নাই,
তোমারেই আমি হেরি সব ঠাঁই
যে দিকে ফিরাই অক্ষি।
হে আমার গৃহলক্ষ্মি।

(২)

হৃদয় হইতে যাওনি ত তুমি
আঁকা আছ মোর মর্ম্মে,
মূরতি তোমার বিশ্ব যুড়িয়া
রাখিয়াছ চারিধারে ছড়াইয়া
প্রিয়তমে তুমি আছ জড়াইয়া
আমার সকল কর্ম্মে।—
আঁকা আছ মোর মর্ম্মে।

(৩)

হৃদয়ের ধন ওগো কল্যাণি
কোথা' তুমি নাই বিশ্বে।
তড়িৎ-খেলায় তোমারে পলকে
নেহারিয়া আমি শিহরি' পুলকে,
তোমারেই হেরি ঊষার আলোকে
আছ যে নিখিল দৃশ্যে।—
কোথা' তুমি নাই বিশ্বে।

(৪)

জন-কোলাহল হইলে লুপ্ত
সুপ্ত গভীর রাত্রে—
ঢালিয়া জোছনা সারা সংসারে
চাঁদ হ'য়ে তুমি হাস বারে বারে
আবার শুভ্র জলদের আড়ে
লুকাও গগন-গাত্রে।—
সুপ্ত গভীর রাত্রে।

(৫)

অন্তরে মোর মন্ত্রের মত
জাগিয়া র'য়েছ নিত্য;
শুধু ধু ধু ক'রে জ্বলে যায় হিয়া
প্রাণ কেঁদে উঠে রহিয়া রহিয়া,
তা'ই মনে হয় তুমি নাই প্রিয়া;
ছাড়নি ত মোর চিত্ত!
জাগিয়া র'য়েছ নিত্য!

শ্রীহরিহর ভট্টাচার্য্য।

ছোট গল্প।

বাঙ্গালা ভাষার মাসিক-রাজ্যে ছোট গল্পের আধিপত্য ও অত্যাচার ক্রমশঃই বাড়িয়া চলিতেছে। গল্প নহিলে মাসিকপত্র এখন তেমন বিকায় না;—গল্পই এখনকার মাসিকের কতকটা প্রাণস্বরূপ! তা' গল্প যেমনই হউক, তাহাতে কোনও ক্ষতি-বৃদ্ধি নাই।

গল্পে যে আমরা নিতান্ত নারাজ, তাহা নহে। গল্প যদি গল্পের মতন হয়, তবে তাহা পড়িয়া থাকি এবং পড়িতে ভালও বাসি। কিন্তু মাসিকের মারফতে ছোট গল্প বলিয়া সচরাচর যাহা চালান হইয়া থাকে, তাহা কি প্রকৃতপক্ষে গল্প, না, গল্পের অপচার মাত্র? ভূতুড়ে কাণ্ড বা ডিটেক্‌টিভী ব্যাপার লইয়া যা' তা' ছাইভস্ম কিছু একটা গড়িতে পারিলেই আমাদের দেশের 'মোপাঁসা'রা তাহা ছাপার অক্ষরে দেখিবার জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠেন। আর ছাপা হইলে, পাঠক-সমাজও তাহা সাদরে গলাধঃকরণ করেন। ইহার উপর আবার গল্পে যদি রিরংসা-উদ্রেকের উপাদান থাকে, তাহা হইলে ত কথাই নাই,—ছাত্রদের 'ডেস্কে'র ভিতর গিয়াও সে গল্প সসম্মানে আসন লাভ করে। এমন কি, অনুসন্ধান করিয়া দেখিলে, কুললক্ষ্মীগণের বালিশের নীচেও যে তেমন এক আধটা গল্পের অস্তিত্ব না পাওয়া যায়, তাহা নহে। 'কামেশ্বর' মোদকের জন্য আমরা এখন কেবল কবিরাজের 'পুরিয়া'র মধ্যে নহে, মাসিকের মোড়কের মধ্যেও তাহার সন্ধানে ঘুরিয়া থাকি।

এখন কথা হইতেছে এই যে, এমন অকালকুষ্মাণ্ড গল্পের জন্য, এমন বিকৃত রুচির জন্য, দায়ী বা দোষী কে? পাঠক, না লেখক? আমাদের বিবেচনায় দোষী উভয়েই; তবে তুল্যপরিমাণে নহে। এজন্য গল্পলেখকগণই অধিকতর দোষী বা দায়ী। তাঁহারা যদি এমন 'চোঁতা' জিনিস সরবরাহ না করেন, তাহা হইলে, সমস্ত গোলযোগেরই অবসান হইয়া যায়। কিন্তু যাঁহারা গল্প লিখিয়া থাকেন, তাঁহাদের মধ্যে প্রায় শতকরা সাতানব্বই জন লেখক 'দায়িত্বজ্ঞান' নামক জিনিসটার সহিত একেবারেই অপরিচিত। আর বাকী যে কয়জনের সে জ্ঞান আছে, তাঁহাদের মধ্যে আবার অধিকাংশেরই সাহিত্য-শিল্পে জ্ঞান নাই। গল্প লিখিতেও যে 'art'এর অত্যন্ত প্রয়োজন, একথা গল্পলেখকদের মাথায় বড় একটা আসে না। অতএব, গল্পের এমন শোচনীয় অবস্থার দিনে গল্প-সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করা প্রয়োজন বোধ করি।

ছোট গল্প কাহাকে বলে? প্রথমেই আমাদের জানিয়া রাখা উচিত যে,

ছোট গল্প জিনিসটা উপন্যাসের সংক্ষিপ্ত সংস্করণ বা নিছক কতকগুলা ঘটনার সমষ্টিমাত্র নহে। তবে তাহা কি? বহুদিন পূর্ব্বে "সাহিত্যে"র 'সহযোগী সাহিত্য' এ কথাটা বুঝাইবার জন্য যত্ন করিয়াছিলেন। বলিয়াছিলেন যে,— "কবিতা যেমন হৃদয়ের একটা ভাব বা আবেগ-প্রকাশের চেষ্টা করে, ছোট গল্প সেইরূপ জীবনের একটা ঘটনার বর্ণনার চেষ্টা করে। একখানা উপন্যাসে হয় ত সে ক্ষুদ্র ঘটনাটা কয়েক ছত্রমাত্র অধিকার করিতে পারে; ছোট গল্পে তাহাই পাঁচ সাত পৃষ্ঠা স্থান অধিকার করিয়া বসে। চতুর্দ্দিক-ব্যাপ্ত অন্ধকারের মধ্যে 'বুল্‌স-আই' লণ্ঠনের আলোক যেমন একস্থানে পতিত হইয়া সেই স্থানটুকুর সকল খুঁটিনাটি সুস্পষ্ট ও সমুজ্জ্বল করিয়া তুলে, ছোট গল্প-রচনার কৌশল তেমনই জীবনের একটা ঘটনার উপর পতিত হইয়া তাহাকে সুস্পষ্ট ও সমুজ্জ্বল করে। সেই চতুর্দ্দিক-ব্যাপ্ত অন্ধকারের মধ্যে একটা স্থানের উজ্জ্বলতা স্বাভাবিক নাও হইতে পারে; কিন্তু তাহাই সেই লণ্ঠনের আলোকের কার্য্য। তেমনই বিচিত্র সুখ-দুঃখ, হর্ষ-বিষাদ, উত্থান-পতন, সংঘাতময় জীবনের একটা ছোট ঘটনা অধিক প্রাধান্য পাইবার উপযোগী নাও হইতে পারে; কিন্তু তাহাকে সেই প্রাধান্য দান করাই গল্পরচনা-কৌশলের কার্য্য।"—ছোট গল্প-সম্বন্ধে 'সহযোগী সাহিত্যে'র এই অভিমত ঠিকও বটে, একটু বেঠিকও বটে। উপরি-উক্ত লক্ষণসম্পন্ন যাহা, তাহাই যে খাঁটি গল্প, একথা ঠিক। কিন্তু ছোট গল্প মাত্রেরই যে ঐ কয়টি লক্ষণ থাকিতে হইবে, নহিলে তাহা গল্পনামের যোগ্য হইবে না, একথা ঠিক নহে। তাহা হইলে, ব্যালজাক্, রবীন্দ্রনাথ, এমন কি, মোপাঁসারও অনেকগুলি ভাল ভাল গল্পকে, গল্প-নামের তালিকা হইতে একেবারে বাদ দিতে হয়। গল্পের ঘটনা যে একটীমাত্র হইবে, তাহার বেশী হইলেই যে গল্প মারা পড়িবে, এ নিয়ম অনেকেই অস্বীকার করেন। আর গল্পকে অতটা সঙ্কীর্ণ নিয়মের নিগড়ে অধিকাংশ রসজ্ঞই বাঁধিতে চাহেন না। তাঁহাদের মতে, "চিত্রকলায় যাহাকে Pastel drawing বা chalk drawing বলে, সাহিত্যকলায় ছোট গল্প অনেকটা তারই সমশ্রেণীর। পেষ্টেলাঙ্কনে লোক-বিশেষের প্রতিকৃতি অতি অল্প সময়ের মধ্যে গোটাকতক স্থূল রেখার সাহায্যে, পরিষ্কাররূপে ফুটাইয়া তুলিতে হয়। ছোট গল্পেও ঠিক সেইরূপ। এখানে গুটি-কতক ঘটনাকে আশ্রয় করিয়া, অতি অল্প পরিসরের মধ্যে, দুচারিটী লোকের ভিতরকার প্রাণটাকে ফুটাইয়া তুলিতে হয়, নতুবা সার্থকতা লাভ হয় না।"

গল্পের এ ব্যুৎপত্তি সর্ব্বাঙ্গসুন্দর না হইলেও প্রথমোক্ত ব্যুৎপত্তির চেয়ে

ইহা সুন্দর, সঙ্গত ও সারবান্। তবে উপরি-উদ্ধৃত অভিমত দুইটীকে একত্র মিলাইয়া যদি উহাদের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান করিতে পারা যায়, তাহা হইলে আমাদের বিশ্বাস, ছোট গল্পের একটি আদর্শ, সর্ব্বাঙ্গসুন্দর সংজ্ঞা রচিত হইতে পারে। কারণ, গল্প-প্রকৃতির এমন কোনও বিশেষত্ব নাই যাহা উপরি উক্ত বচন দুইটীতে না পাওয়া যায়। আর এক কথা, ঐ অভিমত দুইটীতে অল্প-বিস্তর মতভেদ থাকিলেও ছোট গল্পের সর্ব্বপ্রধান বিশেষত্ব সম্বন্ধে উহাদের মধ্যে বিশেষ মতভেদ নাই। অল্প পরিসরের মধ্যে মনুষ্য-হৃদয়ের অংশবিশেষকে ফুটাইয়া তুলাই যে গল্পের সর্ব্বপ্রধান বিশেষত্ব, একথা উভয় উদ্ধৃতাংশেই স্বীকৃত হইয়াছে।

ক্রমশঃ

শ্রীঅমরেন্দ্রনাথ রায়।

ভ্রান্তি।

আসে শ্রান্ত পান্থ কত বিশ্রাম-আশায়
তরুতলে স্নিগ্ধ ছায়ে ক্ষণেকের তরে ;
পরিচিত কেবা কা'র ? কোন দূরান্তরে
কোন্ দেশে কা'র বাস কে জানে কোথায় !
নিমেষের পরিচয়ে—সমবেদনায়
দূরান্তর দেশান্তর ভুলি স্নেহভরে
অযাচিত কত প্রীতি দিয়ে পরস্পরে—
ক্ষণপরে, কে কোথায় লইল বিদায় !
এ সংসার—এও ছায়া পান্থ সবি' হায় !
আসিছে লভিছে সাথী স্নেহের বন্ধন—
ক্ষণমাঝে ভাগ করি' দিয়ে আপনায়
ভাবিতেছে রবে চির এ মধু মিলন !
এত মোহ, এত ভ্রান্তি—এ মিথ্যা ছায়ায় !
কেন ভুলি, এ জীবন শিরার স্পন্দন !

শ্রীফণীন্দ্রনাথ রায়।

গ্রন্থ-সমালোচনা।

মালঞ্চ।—শ্রীরামসহায় কাব্যতীর্থ প্রণীত। এখানি কাব্যগ্রন্থ। মলাটের বাহার নাই, বাঁধাইয়ের কৌশল নাই, কাগজও সাধারণ রকমের। কিন্তু পুস্তকখানি পাঠ করিয়া আমরা পরিতৃপ্ত হইয়াছি। ইহাতে আধুনিক কবিদিগের নববিধানমতে ভাষার তারল্যের জন্ত ভাবের বলিদান নাই, উপমার মৌলিকতা দেখাইবার জন্ত উল্লম্ফন নাই। কবি বেশ মিষ্ট ভাষায় কাব্য রচনা করিয়াছেন। 'কবি ও কাল' নামক কাব্যে তিনি র[illegible] মহাভারত, শ্রীমদ্ভাগবত হইতে আরম্ভ করিয়া বঙ্কিমচন্দ্র, হেমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ প্রভৃতি সম্বন্ধে বেশ মনোরম কবিতা লিখিয়াছেন। তাঁহার মতে তদানীন্তনকালে দেশে পারসী সাহিত্যের আলোচনার ফলে ভারতচন্দ্রের মত কবি কুৎসিত অশ্লীল চিত্র আঁকিয়াছিলেন। 'উষণ্ডির ভিক্ষা' নামক কবিতাটি বড় [illegible] হইয়াছে। 'ত্রিমূর্ত্তি'—কবিতায় লেখক বেশ গুণপনার পরিচয় দিয়াছেন। আমরা এ গ্রন্থ-পাঠে বড় প্রীত হইয়াছি।

শুক্রনীতি-সার।—প্রয়াগের পাণিনি অফিস হিন্দুদিগের ধর্ম্মপুস্তকগুলি ইংরাজিতে অনূদিত করিয়া প্রতীচ্যে প্রাচ্যের গৌরব বৃদ্ধি করিতেছে, আধুনিক সভ্যজাতের সমক্ষে প্রাচীন সভ্যতার ঔদার্য্য ও মহত্বের পরিচয় দিতেছে। শুক্রনীতি-সার পাণিনি অফিস হইতে প্রকাশিত গ্রন্থ, প্রাচীন সংস্কৃত শুক্রনীতি-সারের ইংরাজি অনুবাদ। অনুবাদক শ্রীবিনয়কুমার সরকার এম্-এ মহোদয়। শুক্রাচার্য্যের সমাজনীতি, রাজনীতি, সমরনীতি প্রভৃতির কেবল ইংরাজি তর্জ্জমা দিয়া বিনয়কুমার বাবু কর্ত্তব্যসাধন করেন নাই। তিনি জটিল শ্লোকমাত্রের ব্যাখ্যা করিয়া তাঁহার অসাধারণ শক্তির পরিচয় দিয়াছেন।

আমাদের সমাজের যেরূপ অবস্থা তাহাতে ইংরাজি ভাষায় সংস্কৃত গ্রন্থ অনূদিত না করিয়া দিলে আমরা সংস্কৃত গ্রন্থের বড় একটা আদর করি না। বিনয়বাবুর শুক্রনীতি-সার পড়িয়া অনেকের চক্ষু ফুটিবে। প্রাচীন ভারতবাসী মনীষীরা কেবল ধর্ম্মগ্রন্থ প্রণয়ন করিতে পারিতেন, এ ধারণাটা ভ্রমমূলক বলিয়া বোধ হইবে। সকল বিষয়েই তাঁহাদের ব্যুৎপত্তি ছিল। কি আদর্শে হিন্দু সমাজ প্রতিষ্ঠিত ছিল তাহা শ্রীমদ্ শুক্রাচার্য্যের গ্রন্থে বেশ স্পষ্ট প্রতিভাত।

গ্রন্থের ইংরাজি বেশ সরল হইয়াছে। এ গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়া লেখক হিন্দু সাধারণের ধন্তবাদভাজন হইয়াছেন।

প্রতিমা।

আর্য্যসাহিত্যে অতি প্রাচীনকাল হইতেই বিবিধশ্রেণীর প্রতিমার পরিচয় পাওয়া যায়। প্রতিমার উপাদানরূপে ধাতু, প্রস্তর, মৃত্তিকা, গজদন্ত, তৃণ, কাষ্ঠ, বস্ত্র প্রভৃতি গৃহীত হইত; উপাদানের এবং প্রয়োজনের পার্থক্যানুসারে প্রতিমার নানা প্রকার শ্রেণীবিভাগ দেখা যায়। অমরকোষে—প্রতিমান, প্রতিবিম্ব, প্রতিমা, প্রতিযাতনা, প্রতিকৃতি, অর্চ্চা, প্রতিনিধি, এই কয়টি শব্দ প্রতিমা অর্থে প্রযুক্ত হইয়াছে। যদিও এই কয়টি শব্দই আপাততঃ সমানার্থ বলিয়া প্রতিভাত হয়, কিন্তু ব্যুৎপত্তিগত অর্থে এবং শাস্ত্রোক্ত প্রয়োগে, ইহাদের অর্থগত পার্থক্যের পরিচয় পাওয়া যায়। প্রতিমান শব্দের নিরুক্তি যাহার দ্বারা প্রকৃত বস্তু উপমিত অর্থাৎ অনুকৃত হয়, এই ব্যুৎপত্তি অনুসারে দেবতা মনুষ্য পশু প্রভৃতি যাবতীয় মূর্ত্তবস্তুর কৃত্রিম প্রতিবিম্বই প্রতিমা শব্দের প্রতিপাদ্য হইতে পারে; প্রতিবিম্ব প্রভৃতি শব্দের নিরুক্তিলভ্য অর্থও ইহারই অনুরূপ, কিন্তু অর্চ্চা শব্দের ব্যুৎপত্তিলভ্য অর্থ (অর্চ্চ্যতে কর্ম্মণি অঙ্ প্রত্যয়) যাহাকে পূজা করা হয়, সুতরাং কেবল দেবতার প্রতিকৃতিই অর্চ্চা শব্দের প্রতিপাদ্য; মনুষ্যাদির প্রতিকৃতি অর্চ্চা হইতে পারে না। অমরসিংহ লাঘবতঃ পূজ্য অপূজ্য উভয় প্রতিকৃতির একত্র উল্লেখ করিয়াছেন, অথবা কেবল পূজ্য প্রতিমাই তাঁহার অভিপ্রেত তাহা নিশ্চয় বুঝা যাইতেছে না।

স্মৃতির বচনে অর্চ্চা শব্দ পূজ্য প্রতিমা অর্থেই ব্যবহৃত হইয়াছে যথা,—'যে দুরাত্মার গৃহে কেশবের অর্চ্চা অবস্থিত নহে, তাহার অন্ন খাইবে না, যেহেতু ঐ অন্ন অভক্ষের তুল্য" (১)।

ভাগবতে (১১শ স্কন্ধে) পূজ্যপ্রতিমার আট প্রকার ভেদ দেখিতে পাওয়া যায়। যথা,—শিলাময়ী, দারুময়ী, লৌহময়ী, লেপ্যা, লেখ্যা, বালুকাময়ী, মনোময়ী, মণিময়ী (২)। শুক্রনীতিসারেও আট প্রকার প্রতিমা কথিত

(১) কেশবার্চ্চা গৃহে যস্য নতিষ্ঠতি দুরাত্মনঃ।
তস্যান্নং নৈব ভোক্তব্যং অভক্ষ্যেণ সমং স্মৃতম্॥ আহ্নিক তত্ত্ব।

(২) প্রতিমা সৈকতী পৈষ্টী লেখ্যা লেপ্যাচ মৃন্ময়ী।
বার্ক্ষী পাষাণ ধাতুত্থা স্থিরাজ্ঞেয়া যথোত্তরা॥ ৪র্থ অং ৪র্থ প্রকরণ।

হইয়াছে, কিন্তু তাহাদের ভেদ ভাগবতোক্ত হইতে কিঞ্চিৎ স্বতন্ত্র দেখা যায়, যথা,—সৈকতী, পৈষ্টী, লেখ্যা, লেপ্যা, মৃণ্ময়ী, বৃক্ষময়ী, পাষাণময়ী ও ধাতুময়ী। ইহারা উত্তরোত্তর স্থিরতম রূপে জ্ঞাতব্য। বালুকা নির্ম্মিত প্রতিমা মৃণ্ময়ী হইলেও তাহা স্বতন্ত্ররূপে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, ইহার কারণ এই যে, মৃণ্ময়ী প্রতিমা নির্ম্মাণে খড়, পাট প্রভৃতি উপাদানান্তর আবশ্যক হয়। সৈকতীর উপাদান কেবলই বালুকা, পিষ্টপদার্থ পিটালু প্রভৃতির দ্বারা নির্ম্মিত পৈষ্টী নামে অভিহিত হইয়াছে। যাহা চিত্রে অঙ্কিত হয় তাহার নাম লেখ্যা। স্তরে স্তরে লেপের উপর লেপ দিয়া যে প্রতিমা প্রস্তুত করা হয় তাহার নাম লেপ্যা। মৃণ্ময়ী প্রতিমার মুখ ছাঁচে এবং অন্যান্য অঙ্গ প্রত্যঙ্গ হস্ত ব্যাপারে নিষ্পন্ন হয়, বার্ক্ষী পাষাণময়ী এবং ধাতুময়ী প্রতিমা বৃক্ষ, প্রস্তর, ও বিবিধ ধাতু, এই সকল পদার্থ হইতে উৎকীর্ণ হইয়া থাকে। ধাতু গালাইয়া তাহাকে ছাঁচে ঢালাইয়াও ধাতু প্রতিমা প্রস্তুত হয়।

লৌহনির্ম্মিত প্রতিমা সূর্ম্মী, স্থূণা ও অয়ঃ প্রতিমা নামে অভিহিত হইয়াছে (১)। এই সূর্ম্মীর অভ্যন্তর সচ্ছিদ্র থাকিত এবং তাহাতে অগ্নি প্রবেশিত হইয়া দগ্ধ করিত, বোধ হয় ইহা মল শোধনের উপায়রূপে বিবেচিত হইয়াছিল।

মহাভাষ্যধৃত একটি মন্ত্রে সূর্ম্মীর এবং তাহাতে অগ্নি প্রবেশের পরিচয় পাওয়া যায় যথা,—"হে বরুণ! তুমি সুদেব অর্থাৎ সত্যদেব হও, অগ্নি যেমন সচ্ছিদ্র সূর্ম্মীর মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া দহন করে, সেইরূপ তোমার সপ্তসিন্ধু (সাত বিভক্তি) তালুকে পাইয়া প্রকাশিত হয় (২)। ব্যাকরণে পূজ্য এবং অপূজ্য এই দ্বিবিধ প্রতিকৃতি অর্থেই অর্চ্চা শব্দের প্রয়োগ দেখা যায়। বিক্রেয় এবং অবিক্রেয় অর্থাৎ যাহা দেবলকদিগের জীবিকারূপে ব্যবহৃত হয়, এই উভয়বিধ প্রতিমার সংজ্ঞাগত পার্থক্যও বিবেচিত হইয়াছে। পাণিনির কয়টি সূত্র এই বিষয়ে প্রমাণরূপে উপন্যস্ত হইতে পারে যথা,—"ইবে প্রতিকৃতৌ," ৫।৩।৯৬। ইব শব্দের অর্থে অর্থাৎ সদৃশ অর্থে প্রাতিপদিকের উত্তর কন্ প্রত্যয় হয়, প্রতিকৃতি বুঝাইলেই এই প্রত্যয় হইবে, অন্যত্র হইবে না। যথা, অশ্বের প্রতিকৃতি অশ্বক, উষ্ট্রের প্রতিকৃতি উষ্ট্রক ইত্যাদি। "জীবিকার্থে চাপণ্যে" ৫।৩।৯৯ যাহা জীবিকার জন্য ব্যবহৃত হয় অথচ বিক্রেয় নহে, সেইরূপ প্রতিকৃতিকে বুঝাইলে

(১) সূর্ম্মী স্থূণায়ঃ প্রতিমা। (অমর শূদ্রবর্গ)

(২) সুদেবো অসিবরুণ যস্যতে সপ্তসিন্ধবঃ।
অনুক্ষরন্তি কাকুদং সূর্ম্ম্যং সুষিরামিব। (উপোদ্ঘাত)

ইবার্থে বিহিত কন্—প্রত্যয়ের লোপ হয়। বাসুদেব, শিব, স্কন্দ, বিষ্ণু, আদিত্য ইত্যাদি। উদাহৃত বাসুদেব প্রভৃতি শব্দে দেবলক প্রভৃতির জীবিকা স্বরূপ—দেব প্রতিমা অভিহিত হইয়া থাকে (১)।

বিক্রেয় প্রতিমা বুঝাইলে হস্তিক, রথক, অশ্বক এই প্রকার রূপ হইয়া থাকে। [কাশিকা] দেব পথাদিভ্যঃ ৫।৩।১০০ প্রতিকৃতি বুঝাইয়া ইবার্থে এবং সংজ্ঞার্থে দেব পথাদি শব্দের পর বিহিত কন্ প্রত্যয়ের লোপ হয়। (বৃত্তিকার কর্ত্তৃক) এই স্থত্রের অভিপ্রায় বিশদরূপে কারিকাকারে বিবৃত হইয়াছে। যথা,—"অর্চ্চাসু পূজনার্থাসু, চিত্রকর্ম্ম ধ্বজেষুচ, ইবে প্রতিকৃতৌ লোপঃ কনো দেবপথাদিষু"। পূজনার্থ অর্চ্চা, চিত্রকর্ম্ম (ছবি) এবং ধ্বজ এই সকল অভিহিত হইলে সদৃশ প্রতিকৃতি অর্থে বিহিত কন্ প্রত্যয়ের লোপ হয়। পূজনীয় অর্চ্চা অর্থে শিব, বিষ্ণু। চিত্র অর্থে অর্জ্জুন, দুর্য্যোধন। ধ্বজ অর্থে কপি, গরুড় ইত্যাদি প্রয়োগ হয়।

প্রয়োজন।

প্রাচীন যুগে যে সকল কার্য্যে প্রতিমার প্রয়োজন হইত, বর্ত্তমান কালে অনেক স্থলেই তাহার বিপর্য্যয় ঘটিয়াছে। বর্ত্তমান সময়ে আভ্যুদয়িক কার্য্যে গৌরী প্রভৃতি মাতৃকা পূজায় প্রতিমার ব্যবহার দেখিতে পাওয়া যায় না, যব-পুঞ্জেই অর্চ্চনা হইয়া থাকে। কিন্তু পুরাকালে শুভ্র প্রতিমাতেও এই পূজা সম্পন্ন হইত।

প্রতিমার অভাবে পট এবং পটের অভাবে যবপুঞ্জের ব্যবস্থা দেখা যায় (২)। বর্ত্তমান যুগেও গ্রহযাগ বিলুপ্ত হয় নাই, কিন্তু সেই আর্য্যযুগের

---

(১) কাশিকায় উল্লিখিত দেবলক শব্দের অর্থ কথন প্রসঙ্গে পদমঞ্জরী টীকাকার হরদত্ত বলিয়াছেন, "যে প্রতিমা গ্রহণ করিয়া গৃহে গৃহে ভিক্ষা করিয়া বেড়ায়, সেই প্রতিমা বাসুদেব, শিব প্রভৃতি শব্দে অভিহিত হইয়াছে। এবং তাদৃশ ভিক্ষুকগণই দেবলক শব্দের প্রতিপাদ্য"। যাহা মঙ্গল কামনায় অথবা মুক্তি কামনায় গৃহাদিতে স্থাপিত এবং পূজিত হয়, তাদৃশ প্রতিমা বুঝাইলে "অর্চ্চাসু পূজার্থাসু" ইত্যাদি বক্ষ্যমাণ অনুশাসনানুসারে প্রত্যয়ের লোপ হয়। (বাসুদেবঃ শিব ইতি যাঃ প্রতিমাঃ প্রতিগৃহ্য গৃহাদ্গৃহং ভিক্ষমাণা অটন্তি, তাএব মুচ্যন্তে। তাহি জীবিকার্থা ভবন্তি দেবলকা অপি তএব ভিক্ষবোঽভিপ্রেতাঃ। যাস্ত্বায়তনেষভ্যুদয়নিঃশ্রেয়সার্থং প্রতিষ্ঠাপ্যন্তে পূজ্যন্তেচ তাস্বর্চ্চাসু পূজার্থাস্বিতি বক্ষ্যমাণেন লুপ্ ভবতি) কাশিকা।

(২) কর্ম্মাদিষু চ সর্ব্বেষু মাতরঃ সগণাধিপাঃ।
পূজনীয়াঃ প্রযত্নেন পূজিতাঃ পূজয়ন্তি তাঃ॥

নির্দ্দিষ্ট বিভিন্ন উপাদান ঘটিত তাদৃশ গ্রহ প্রতিমা আজ কয় স্থলে দেখা যায় ? মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্য বলিয়াছেন যে তাম্র, স্ফটিক, রক্তচন্দন এই তিন উপাদান দ্বারা যথাক্রমে সূর্য্য, চন্দ্র ও মঙ্গল এই তিন গ্রহের মূর্ত্তি প্রস্তুত করিতে হইবে। স্বর্ণের দ্বারা বুধ ও বৃহস্পতির মূর্ত্তি; রজত, লৌহ, সীস ও কাংস্য এই চারি ধাতুর দ্বারা যথাক্রমে শুক্র, শনি, রাহু, কেতু এই চারি গ্রহের মূর্ত্তি প্রস্তুত করিতে হইবে (১)।

পত্নীর সাহিত্য ব্যতীত যজ্ঞকার্য্যে অধিকার নাই, পত্নীর অভাবে তাহার প্রতিকৃতি প্রস্তুত করিয়া তাহাকে প্রতিনিধিরূপে কল্পনাপূর্ব্বক যজ্ঞে ব্রতী হইবার রীতি ছিল; কর্ম্মপ্রদীপে উক্ত হইয়াছে যে, রামচন্দ্রও যশস্বিনী পত্নী সীতাদেবীর সুবর্ণময়ী প্রতিমাকে প্রতিনিধিরূপে গ্রহণ করিয়া মহাত্ম-ভ্রাতৃবর্গের সহিত বহুবিধ-যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন (২)।

যে প্রতিকৃতি ক্রীড়া প্রভৃতি প্রয়োজনে ব্যবহৃত হয়, তাহা পাঞ্চালিকা এবং পুত্রিকা। অমরসিংহ এই পুত্রিকা বা পুত্তলিকা বস্ত্রদন্তাদি উপাদানে নির্ম্মিত বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন (৩)। এইস্থলে ভানুজী দীক্ষিত সম্মত পাঠ পঞ্চালিকা, তিনি ব্যুৎপত্তি দেখাইয়াছেন, "যাহা পাঁচ প্রকার বর্ণের দ্বারা ভূষিত হয় (৪)। তিনি পক্ষান্তরে পাঞ্চালিকা পাঠ গ্রহণ করিয়া তাহার নিরুক্তি দেখাইয়াছেন—"পঞ্চাল-ভব এই অর্থে পাঞ্চালিকা হইতে পারে"। এই নিরুক্তি অনুসারে বোধ হয় পাঞ্চাল দেশেই পুত্তলিকার উদ্‌ভাবন হইয়াছিল। মেদিনীকোশে কেবল বস্ত্রনির্ম্মিত-পুত্তলিকাই পাঞ্চালিকা নামে অভিহিত হইয়াছে (৫)। মেদিনীর এই উক্তিতে বোধ হয় তাঁহার সময়ে পুতুল নির্ম্মাণে

প্রতিমাসু চ শুভ্রাসু লিখিত্বা বা পটাদিষু।
অপি বা ক্ষত পুঞ্জেষু নৈবেদ্যৈশ্চ পৃথগ্বিধৈঃ॥ কর্ম্মপ্রদীপ।১৪।

(১) সূর্য্যঃ সোমো মহীপুত্রঃ সোমপুত্রো বৃহস্পতিঃ।
শুক্রঃ শনৈশ্চরো রাহুঃ কেতুশ্চেতি নবগ্রহাঃ॥
তাম্রকাৎ স্ফটিকা রক্তচন্দনাৎ স্বর্ণকাবুভৌ।
রজতা দয়সঃ সীসাৎ কাংস্যাৎ কার্য্যাগ্রহাঃ ক্রমাৎ॥ ১অ ২৬,২৭।

(২) রামোপি কৃত্বা সৌবর্ণীং সীতাং পত্নীং যশস্বিনীম্।
ঈযে যজ্ঞৈর্বহুবিধৈঃ সহভ্রাতৃভিরর্চ্চিতৈঃ॥ ৩ প্রপাঠক।১০।

(৩) পাঞ্চালিকা পুত্রিকাস্যা দ্বস্ত্র-দন্তাদিভিঃ কৃতা। শূদ্রবর্গ ২৯।

(৪) পঞ্চভির্বর্ণৈরঞ্চতে ভূষ্যতে (অঞ্চভূষণাদৌ) ঘঞ্।

(৫) পাঞ্চালিকা স্ত্রিয়াঃ বস্ত্র-পুত্রিকা-গীতিভেদয়োঃ।

কেবল বস্ত্রই উপাদানরূপে গৃহীত হইত। আচার্য্য হেমচন্দ্র পাঞ্চালিকার পর্য্যায়ে শালভঞ্জিকা শব্দের পাঠ করিয়াছেন। (১)

জটাধরের মতে কেবল কাষ্ঠনির্ম্মিত পুত্তলিকাই শালভঞ্জিকা নামে অভিহিত হইয়াছে। শালভঞ্জিকার উপাদান যাহাই হউক না কেন, ইহার বর্ণনায় সংস্কৃত সাহিত্য পরিপূর্ণ, এবং ইহার বর্ণনে সেকালের শিল্পনৈপুণ্যের পরিচয় পাওয়া যায়।

বিদর্ভ নগরের বর্ণনায় শ্রীহর্ষ লিখিয়াছেন, যে নগরে নানারূপ শালভঞ্জিকার মুখচন্দ্রস্থিত কলঙ্করূপ মৃগগুলি যেন অনেক প্রাসাদের উপরিস্থিত সিংহ কর্ত্তৃক ভক্ষিত হইয়াছে। এই উক্তিতে বুঝা যায়, পুতুলের মুখগুলি কলঙ্করহিত চন্দ্রের মত প্রতিভাত হইত (২)।

প্রাচীনতম কবিগুরু সুবন্ধুর উক্তিতে বোধ হয় সেকালে শালভঞ্জিকার অধিষ্ঠান ব্যতীত গৃহের এবং নগরের সৌন্দর্য্য সম্পন্ন হইত না। তিনি বর্ণনা করিয়াছেন যে কুসুমপুর শালভঞ্জিকাযুক্ত গৃহের দ্বারা উপশোভিত হইয়াছিল (৩)। শালভঞ্জিকার অবলম্বনে বিদ্ধশালভঞ্জিকা নামক দৃশ্য কাব্যের উৎপত্তি হইয়াছে।

দ্বারবতী পুরীর বর্ণনায় মহাকবি মাঘ লিখিয়াছেন যে নগরীতে গৃহের কপোতপালী (পায়রার খোপ) স্থিত কৃত্রিম (কাষ্ঠনির্ম্মিত) পক্ষিসমূহকে (বাস্তবিক পক্ষী মনে করিয়া) ধরিবার অভিপ্রায়ে আনত নিশ্চলাঙ্গ বিড়ালকেও মানুষে কৃত্রিম বিড়াল বলিয়াই মনে করিত (৪)।

ক্রমশঃ।

শ্রীগিরীশচন্দ্র বেদান্ততীর্থ।

---

(১) শালভঞ্জী পাঞ্চালিকা চ পুত্রিকা। তির্য্যক্ কাণ্ড।১০১৪।

(২) বহুরূপক শালভঞ্জিকা মুখচন্দ্রেষু কলঙ্করঙ্কবঃ।
যদনেকক-সৌধ-কন্ধরা-হরিভিঃ কুক্ষিগতী কৃতাইব॥ নৈষধ।২।৮৩

(৩) অস্তি সুধা ধবলৈ বৃহৎ কপাটৈস্তেরিব শালভঞ্জিকো পেতে-
বেশ্মভি রুপশোভিতং॥ বাসবদত্তা। ১১০ পৃঃ।

(৪) চিক্রংসয়া কৃত্রিম পাত্রিপঙ্ক্তেঃ
কপোত পালীষু নিকেতনানাম্।
মার্জ্জারম প্যায়ত নিশ্চলাঙ্গম্।
যস্যাং জনঃ কৃত্রি মমেব মেনে॥ ৩।৫১

অভিব্যক্তি।

পশু হইতে মানুষের অভিব্যক্তি হয়, এ কথা সর্ব্ববাদিসম্মত না হইলেও, মনুষ্যজন্ম লাভ করিয়া মানুষ যে পশুর মত আচরণ করে, প্রাচীন ও আধুনিক ইতিহাসে তাহার যথেষ্ট প্রমাণ বিদ্যমান আছে। রসুলপুরের জমিদার তনয় চুনীলালকে দেখিলে আমার অনুক্ষণ কেবল সেই কথাই মনে হইত। কৈশোরে তাহার পিতৃবিয়োগ হইয়াছিল বলিয়া চুনীলাল প্রভূত ধনের অধিস্বামী হইয়াছিল। শুনিয়াছিলাম তাহার পিতা বড়ই পরদুঃখকাতর, কোমল প্রকৃতির লোক ছিলেন। একথা শুনিয়াছিলাম মাত্র। চুনীলালকে দেখিলে সে কথা আদৌ বিশ্বাস হইত না।

আমি সামান্য স্কুল মাষ্টার, জমিদারের সহিত আমার কোনও সম্পর্ক ছিল না। তবু লোকটাকে দেখিতে পাইতাম, তাহার প্রাণহীনতার গল্প শুনিতাম, সময়ে সময়ে তাহার অত্যাচার-পীড়িত প্রজাদের কাতর আর্ত্তনাদ আমার মর্ম্মস্পর্শ করিত। এক একবার সে আমাকে বলিত—"কি ম্যাষ্টর ? তোমাদের কল্‌কেতায় না কি ভালো"—

আমি কাণে আঙ্গুল দিয়া স্থানান্তরে যাইতাম। চুনীলাল ও তাহার দুর্ব্বৃত্ত সহচরগণ খুব হাসিত।

একদিন সন্ধ্যার পর তাহাদের ঠাকুরবাটি হইতে আরতি দেখিয়া ফিরিতেছিলাম। অন্ধকারে শ্রীধর জীউর রাসমঞ্চের উপর বসিয়া চুনীলাল ও তাহার দুই বন্ধু পরামর্শ করিতেছিল। একজন বলিল—আজই রাত্রে ফতে করা ভাল।

চুনীলাল বলিল—না, শালাকে মফস্বলে পাঠালে সুবিধে হ'বে। ছুঁড়িটা তো ঠিক হাত হয় নি। একটু গোলমাল করতে পারে।

আমার প্রাণটা শিহরিয়া উঠিল। কোন্ হতভাগ্যের সর্ব্বনাশের আয়োজন হইতেছিল তাহা জানিবার জন্য একটা বড় আমগাছের আড়ালে দাঁড়াইলাম।

তাহার বন্ধু বলিল—হ্যাঁ ! গোল্ করলে তো কি হ'য়েছে ? তুমি তো খুব জমিদার !

চুনীলাল বলিল—কি জান বাহিরে একটা ভড়ং রাখ্‌তে হয়। যে কাজ সহজে হ'তে পারে সে কাজের জন্যে—

তাহার মোসাহেব বলিল—সহজে আর হ'ল কই? অনেক তো লোভ দেখানো গেল। শেষে ছুঁড়ি বল্‌লে দাদাকে ব'লে দেবে। আরে ম'ল তবে বিধবা হ'য়েছিলি কেন?

আমার সর্ব্বশরীর জ্বলিতেছিল। অভাগিনীদিগকে ভগবান কি উদ্দেশ্যে বৈধব্য যন্ত্রণায় দগ্ধ করেন সে বিষয়ে এই পশুগুলার ধারণা বুঝিলাম। তাহাদের পশুত্ব সম্বন্ধে নূতন জ্ঞান লাভ করিলাম। তাহার পর তাহারা যে ভাষায় কথাবার্ত্তা কহিতে লাগিল তাহার উল্লেখ করিলে আমাকে আর তিলার্দ্ধ কাল শিক্ষাবিভাগে থাকিতে হইবে না। প্রায় অর্দ্ধ ঘণ্টাকাল গোপনে সেই বৃক্ষান্তরালে থাকিয়া বুঝিলাম যে চুনীলালের এক ব্রাহ্মণ কর্ম্মচারীর বিধবা ভগ্নীর বৈধব্য যন্ত্রণা দূর করিবার সাধু উদ্দেশ্যে তাহারা শ্রীধর জীউর পবিত্র রাসমঞ্চে সম্মিলিত হইয়াছে। তাহাদের দুরভিসন্ধির কথা তখনই ছুটিয়া গিয়া ব্রাহ্মণকে বলিয়া দিলাম। পরদিন প্রভাতেই তাহার অভাগিনী ভগ্নীকে লইয়া ভদ্রলোক সহরে কুটুম্ববাড়ীতে রাখিয়া আসিল।

আমি কিন্তু মনের আবেগে কথাটা আমাদের স্কুলের দুই একজন শিক্ষককে বলিয়া ফেলিলাম। কাহার দ্বারা জানি না, কথাটি চুনীলালের কর্ণে পঁহুছিল। যথাসময়ে সে আমাকে ধরিল। চক্ষু রক্তবর্ণ করিয়া বলিল—ম্যাষ্টর! কা'র সঙ্গে লেগেছ জান?

যে উত্তর মুখে আসিতেছিল তাহা শুনিলে পাষণ্ড তখনই আমার সহধর্ম্মিণীর বৈধব্য ঘটাইত। আমি বাক্‌-সংযম করিয়া বেশ মোলায়েম ভাবে হাসিয়া বলিলাম—চুনীবাবু, আপনি দেশের জমিদার—

সে সপ্তমে সুর চড়াইয়া বলিল—তোর বাবার কি?

তাহার জমিদারীর সহিত আমার পিতৃদেবের কোনও সম্পর্ক, অবশ্য ছিল না। থাকিলে বোধ হয় প্রজাদিগের পক্ষে শুভ হইত। যাহা হউক আমি বহু কষ্টে আপনাকে সংযত করিয়া বলিলাম—না কিছু না। বল্‌-ছিলাম কি আপনার কর্ত্তব্য প্রজাদের সুখে রাখা, দশের কাছে গণ্যমান্য হওয়া, যা'তে সকলে—

সে আমায় অকথ্য ভাষায় গালি দিল, বলিল—সাত দিনের মধ্যে তোমায় যমের বাড়ী পাঠাব।

আমি বলিলাম—জমিদারীটা আপনার হ'লেও, রাজ্যটা ইংরাজের।

সে আমাকে গালি দিল, ইংরাজকে গালি দিল, আপনাকেও বাদ দিল না।

আমি মনে মনে সংকল্প করিলাম যে শীঘ্রই একটা শুভদিন দেখিয়া স্ত্রী ও শিশু কন্যাকে কলিকাতায় পাঠাইয়া দিব এবং স্থানান্তরে চাকুরির চেষ্টা দেখিব।

(২)

স্ত্রীর ব্যাকুলতায় আমি বিচলিত হইলাম। কন্যা মণির পীড়াটা যে এরূপ সঙ্কটাপন্ন হইয়া উঠিয়াছে আজ পক্ষাবধি সে সন্দেহ আমার আদৌ হয় নাই। মণির জ্বর কমিয়া আসিতেছিল। ললাটে বিন্দু বিন্দু স্বেদ দেখা দিতেছিল। ডাক্তারের বাটীতে ছুটিলাম। সে বেচারা অজ্ঞ, সামান্য বিদ্যা লইয়া পল্লীগ্রামে জীবিকার্জ্জন করিতেছিল। সে বলিল—বড় সুবিধা নয়, সহর থেকে হেম বাবুকে ডেকে আনুন।

বাক্সে তিনটি মাত্র টাকা ছিল। হেমবাবুকে আনিতে অন্ততঃ কুড়ি টাকা ব্যয় হইবে। মণিকে ক্রোড়ে লইয়া কাতর নয়নে নির্ম্মলা তাহার প্রতি চাহিয়াছিল। সে আমার হৃদয়ের ভারটা উপলব্ধি করিতে পারিল না। বলিল—তবে সেই বন্দোবস্তই কর। হেমবাবুকেই আনাও।

আমি একটু ইতস্ততঃ করিয়া বলিলাম—আনাব আর কাকে দিয়ে? নিজেই যাই। তবে—

নির্ম্মলা বলিল—নিজে এই তিন ক্রোশ পথ যাবে কি ক'রে? একখানা গরুর গাড়ি টাড়ি—

আমি ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া বলিলাম,—নিজে হাঁটতে পারবো। তবে—ডাক্তারের পাল্কি ভাড়া, ভিজিট নিয়ে কোন্ না—

নির্ম্মলা বুঝিল। ম্লানচক্ষে একবার আমার মুখের দিকে চাহিল। তাহার পর ধীরে ধীরে নিজের হাতের বালা খুলিয়া বলিল—তার আর কি? এখন তো—

হাঃ অদৃষ্ট! বি, এ পাশ করিয়া কতই সুখ স্বপ্ন দেখিয়াছিলাম। বিবাহের সময় কত ধুমধাম হইয়াছিল। তখন কে জানিত নিজের কন্যার প্রাণরক্ষা করিবার সামর্থ্য হইবে না, লেখাপড়া শিখিয়া সবল দেহে স্ত্রীধন ভিক্ষা করিয়া মুমূর্ষু শিশুর চিকিৎসার ব্যবস্থা করিতে হইবে? ইহার পূর্ব্বে মৃত্যু হয় নাই কেন? চক্ষু হইতে জল পড়িল! হাঃ! ভগবন!

নির্ম্মলাও কাঁদিল, বলিল—ছিঃ কেঁদোনা। মাইনে পেলে আবার উৎয়ে দিয়ো।

আমি বলিলাম—ডাক্তার আমার পরিচিত। পরে ভিজিট দিলে হ'বে।

তিনটি টাকা পকেটে লইয়া চলিলাম। ভাবিলাম, ডাক্তার ভদ্রলোক, শিক্ষিত লোক, তাঁহার পায়ে ধরিলে নিশ্চয়ই শুনিবেন, বেতন পাইলেই তাঁহার ঋণ পরিশোধ করিব। সন্ধ্যা হইয়া আসিতেছিল। স্তব্ধ প্রকৃতির মুখের দিকে চাহিয়া কেবল সেই ম্লানমুখী সহধর্ম্মিণীর কাতর মুখ মনে পড়িতে লাগিল। মণি আমাদের একমাত্র শিশু। ভগবান এ রত্ন অধমের গৃহে কেন অর্পণ করিয়াছিলেন বুঝিতে পারিলাম না।

(৩)

ডাক্তারবাবু সন্ধ্যার পর গৃহে ফিরিলেন। তাঁহার জন্য অনেক রোগী অপেক্ষা করিতেছিলেন। বড় আলবোলায় তামাক টানিতে টানিতে তিনি দুই চারি কথায় সকলকে বিদায় দিলেন। অবশিষ্ট যে দুইজন ভদ্রলোক রহিলেন, বুঝিলাম তাঁহারা তাঁহার বন্ধু। আমার দিকে চাহিয়া তিনি বলিলেন—মশায়ের কি প্রয়োজন?

আমি বলিলাম—আমি রসুলপুর স্কুলের হেড্ মাষ্টার।

হেমবাবু বলিলেন—রসুলপুর, রসুলপুর, হ্যাঁ। সেই পান্নাবাবু—

আমি বলিলাম—হ্যাঁ চুনীবাবু—

তিনি বলিলেন—হ্যাঁ চুনীবাবু। চুনীবাবু বটে। লোকটার খুব পয়সা।

আমি বলিলাম—হ্যাঁ। আমার একটি দেড় বছরের কন্যা—

একটা খানসামা তাঁহার জুতা খুলিতেছিল, হেমবাবু একটু বিরক্ত হইয়া বলিলেন—আরে মোলো যা, আস্তে খোল্ না।

তাঁহার বন্ধু দুইটি খানসামাকে ধমক দিল। খানসামা বলিল—থামুন না আপনারা।

তাঁহারাও ছাড়িবার পাত্র নহেন, বলিলেন—ছোটলোক যত বড় মুখ তত বড় কথা?

খানসামা বলিল—ছোটলোক—কারও তো খাই পরি না।

তাঁহারাও বিরক্তি প্রকাশ করিলেন। শেষে ডাক্তার বাবু বলিলেন—"আঃ সব চুপ কর না গা"। তখন শান্তি স্থাপিত হইল।

এই সব গোলমালে আমার গল্পটি ভিষকপ্রবরের কর্ণকুহরে প্রবেশ করিল না। তিনি বলিলেন—তা' হ'লে আপনি হ'লেন চুনীবাবুর কে?

আমি বলিলাম—আমি তাঁর কেউ না। আমি তাঁর গ্রামের স্কুলের হেড্ মাষ্টার।

হেমবাবু বলিলেন—ওঃ আপনি তাঁর গ্রামের হেড মাষ্টার। তাঁর মেয়ের—

আমি বলিলাম—তাঁর মেয়ে নেই। আমার মেয়ের অসুখ।

একটা ক্ষীণ নিরাশার চিহ্ন তাঁহার চোখের কোণে নিমেষের জন্য খেলিয়া গেল। আমি তাঁহাকে মণির রোগের কথা আদ্যোপান্ত বলিলাম। তিনি সমস্ত শুনিয়া বলিলেন—বেশ, তাহ'লে এখনি যাওয়া উচিত।

আমি বলিলাম—একটা কথা আছে। আমি মাষ্টারি করি, চাল্লিশ টাকা বেতন পাই। আজ মাসের আঠাসে। দোসরা তারিখে মাহিনা পেলে আপনার ভিজিটটা দিয়ে যাব।

কলিকাতার রাজপথে অকস্মাৎ একটা শিলচর্ম্মাবৃত এস্‌কিমো আসিলে লোকে বোধ হয় অত বিস্ময়ের সহিত তাহার মুখের দিকে চাহিয়া থাকিত না। ভিষকরাজ সবান্ধবে খানিকক্ষণ আমার মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন। তাহার পর আমার কথার প্রত্যুত্তর না দিয়া ভৃত্যকে বলিলেন—গাড়ুতে জল দে।

আমি বলিলাম—আমি হেড্ মাষ্টার—

ডাক্তার বলিল—কে আর বল্‌ছে বাপু যে তুমি ফাঁড়ির জমাদার—

আমি বলিলাম—আমি শিক্ষিত লোক। জুয়াচুরি করব না।

একজন বন্ধু বলিলেন—কেন বাপু ভদ্দরলোককে বিরক্ত করছ? তেতে পুড়ে এলেন।

পাষাণ গলে মানুষের মন গলে না—বিশেষ উকীল ডাক্তারের। কত সাধ্য সাধনা করিলাম, শেষে পায়ে ধরিলাম। প্রত্যুত্তরে কেবল উপেক্ষা। গৃহের সেই পাণ্ডুমুখখানি মনে পড়িল, সেই ম্লানমুখী দুঃস্থ ঘরণীর বলয় যুগল সর্পাকার লাভ করিয়া দংশন করিতে লাগিল। চক্ষু মুছিতে মুছিতে ভাবিলাম—অভিব্যক্তিবাদী বেটারা পাগল। পশু থেকে আবার মানুষ হয়! মানুষই পশুত্ব লাভ করে।

(৪)

অন্ধকার গ্রাম্য পথ দিয়া ছুটিতেছিলাম। প্রায় ছয় ক্রোশ পথ চলিয়াছিলাম। নির্ম্মলার অলঙ্কার লইয়া সহরে আসিতে ডাক্তার লইয়া গ্রামে ফিরিতে আবার ছয় ক্রোশ হাঁটিতে হইবে তাহা ভাবিয়া মোটেই চঞ্চল হইলাম না। অনেকটা সময় নষ্ট হইবে ততক্ষণে যে মণির কিরূপ অবস্থা হইবে তাহা ভাবিয়া বড় বিচলিত হইতেছিলাম। আর একটা বাগান অতিক্রম করিতে পারিলেই গ্রামে পঁহুছিব। তাই ব্যাকুল হইয়া ছুটিতেছিলাম। অকস্মাৎ পশ্চাত হইতে বজ্রমুষ্টিতে কে আমার হাত ধরিল। ফিরিয়া দেখিলাম চুনীলাল।

তাহার মুখে উন্মত্ত রক্তলোলুপ শার্দ্দূলের নির্দ্দয়তা বেশ ফুটিয়া উঠিয়াছিল। তাহাকে দেখিয়া আমি শিহরিয়া উঠিলাম। সাহসে বুক বাঁধিলাম, বলিলাম—কি চুনীলালবাবু।

পাষণ্ড কাঁপিতেছিল। বলিল—আজ, এখনই! ইষ্ট দেবতা স্মরণ কর।

ইষ্ট দেবতা স্মরণ করিলাম। কিন্তু অন্য উদ্দেশ্যে। বলিলাম—মাগো অসুরমর্দ্দিনী। কত দিন ঘুমাবি মা! এই অসুরটাকে এখনি মার্ মা!

মা শুনিল না। চুনীলাল একখানা ছোরা বাহির করিল। আমি ভীতি-বিহ্বলকণ্ঠে বলিলাম—চুনীবাবু আজকের মত সময় দাও। আজ ক্ষমা কর।

চুনীলাল হাসিল। বিষম হাসি। সে বলিল—চুনীলাল ক্ষমা টমার ধার ধারে না।

আমি বলিলাম—চুনীলাল তুমি মানুষ। মানুষের ভেতর নারায়ণ আছেন। আজকের মত আমায় সময় দাও, তারপর—

চুনীলাল মাথা নাড়িল। তাহার চোখে একটু যেন বিস্ময়ের ভাব এলো। সে অন্যমনস্ক ভাবে বলিল—কেন?

আমি বলিলাম—আমার সঙ্গে তোমার শত্রুতা। তুমি আমাকে খুন করতে চাও। আমার স্ত্রী কন্যার সঙ্গে তোমার শত্রুতা নেই। শিশুর জীবনে তোমার কোনও প্রয়োজন নেই।

তাহার হাত জ্বলিতেছিল। একটু একটু ঠোঁট কাঁপিতেছিল। আমি বলিলাম—চুনীলাল। আমি শিক্ষিত লোক। মিথ্যা কথা কইতে হ'বে বলে অন্য ব্যবসা অবলম্বন করিনি। দারিদ্র্য গ্রহণ করেছি, মাষ্টারি গ্রহণ করেছি। তুমি যবে বল্‌বে এসে তোমার কাছে হাজির হ'ব। আজ আমায় যেতে দাও।

চুনীলাল আবার বলিল—কেন?

আমি তাহাকে বুঝাইলাম। বলিলাম—এতক্ষণে হয়তো মণি নেই। পায়ে পড়ি চুনীলাল। হয় তো নেই। সোণার পুতুল কেন গরীবের ঘরে—

আর অশ্রুবেগ সম্বরণ করিতে পারিলাম না। পশুর পদতলে বসিয়া পড়িলাম। শিরে করাঘাত করিয়া বলিলাম—হায় হায় ভগবন! কেন আমার হাতে ও রত্ন দিয়েছিলে?

চুনীলাল আমায় হাত ছাড়িয়া দিল। ধীরে ধীরে বলিল—বালা বাঁধা দেবে, ডাক্তার কত টাকা চায়?

আমি বলিলাম—অন্ততঃ কুড়ি টাকা চাই। আর কিছুই চাহি না। এতক্ষণে সব ফুরিয়েছে! মারো। আজই মারো।

তাহার মুখের দিকে চাহিলাম। যাহা দেখিলাম তাহা বিশ্বাস করিতে পারিলাম না। চুনীলাল চোখ মুছিতেছিল। আমি উঠিয়া দাঁড়াইলাম। চুনীলাল বলিল—ও ডাক্তার আমার মেয়েটাকে মেরেছিল। তুমি বাড়ী যাও। আমি ভাল ডাক্তার আনছি।

আমি বলিলাম—চুনী! ভাই, পরিহাস করছ?

সে কোনও কথা বলিল না, ছুটিল। আমিও ছুটিলাম। তখনও মণি সেই ভাবে শুইয়াছিল। বাহিরে ঘোড়ার শব্দ পাইলাম। দেখিলাম চুনীলাল দ্রুত অশ্বপৃষ্ঠে ছুটিয়া সহরে যাইতেছে। এক ঘণ্টা পরে সেই ঘোড়ায় চড়িয়া সাহেব ডাক্তার আসিয়া বলিল—"শিশুর জীবনের কোনও ভয় নাই।"

পরদিন প্রভাতে জমিদার নিজের হাতে তাহাকে বেদানার রস খাওয়াইয়া দিল।

পশুত্ব হইতে ধীরে ধীরে আবার মনুষ্যত্বের বিকাশ দেখিলাম। আমি অভিব্যক্তির নিয়মগুলা এখনও বুঝি নাই।

শ্রীকেশবচন্দ্র গুপ্ত।

ভক্তমাল ও গিরিশচন্দ্র।

[২]

রূপ সনাতন।

গিরিশচন্দ্রের রূপ-সনাতন নামক নাটকখানির উপাখ্যানও ভক্তমালের দ্বিতীয় মালায় আছে। চৈতন্য-চরিতামৃত গ্রন্থেও রূপ সনাতনের কাহিনী বিদ্যমান। এই উভয় কাহিনীর মধ্যে স্থলে স্থলে কিছু প্রভেদও দৃষ্ট হয়। প্রসঙ্গ ক্রমে আমরা তাহার উল্লেখ করিব। ভক্তমালের কাহিনী এইরূপ :—

"শ্রীরূপ শ্রীসনাতন দুই সহোদর।
উজীর আছিলা দোঁহে গৌড়িয়া পাৎসার॥
দবীরখাস নাম আর সাকর মল্লিক।
খেতাব দোঁহার সর্ব্বখেতাবে অধিক॥
বড় বুদ্ধিমান্ বড় প্রতাপে উন্নত।
অর্থে পরিপূর্ণ যথা লক্ষ্মী বশীভূত॥"

গৌরাঙ্গদেবের সহিত রূপ ও সনাতনের দেখা হইল। গৌরাঙ্গদেবের অনুগ্রহে উভয়ের মনে বৈরাগ্য উপস্থিত হইল।

"প্রভুর কৃপায় কৃষ্ণে দৃঢ় অনুরাগ।
জন্মিল যাহাতে আর পরমবৈরাগ॥
প্রথমে শ্রীরূপ গেল বিষয় ছাড়িয়া।
কৃষ্ণাবেশে মগ্ন সদা বৃন্দাবনে গিয়া॥"

ইহার পর হইতে নাটক আরম্ভ হইয়াছে। সনাতনের 'সাকর মল্লিক' উপাধি নাটকেও পাওয়া যায়; যথা—"এইবার বেটা নেড়ের পুষ্যিপুত্তুর সাকর মল্লিক।" (১ম অঙ্ক, ১ম গর্ভাঙ্ক) সনাতন হোসেন সা নামক গৌড়ের নবাবের উজীর। কিন্তু রাজকার্য্য আর ভাল লাগে না।

"শ্রীল সনাতন সদা উৎকণ্ঠিত মন।
বৈরাগ্যের পথে নিজ রাখিয়া নয়ন॥
রাজকার্য্যে নাহি জ্ঞান বিরলেতে বসি।
শাস্ত্র অনুশীলন করেন দিবানিশি॥"
(ভক্তমাল)

নাটকে প্রথম দৃশ্যে সনাতন নির্জ্জন জাহ্নবীতীরে দাঁড়াইয়া ভাগীরথীকে সম্বোধন করিয়া বলিতেছে—

"মা প্রেমময়ি! আমায় প্রেমপূর্ণ কর। আমায় হরিপাদপদ্মে মতি দাও। মা গঙ্গে! আমায় বৈরাগ্য দাও—বৈরাগ্য দাও—বৈরাগ্য দাও।"

"রাজকার্য্য, সংসারকার্য্য আমি কাকে দিয়ে যাব?...
আমি আজই নবাবের কাছে বিদায় হ'য়ে যাব।"

নবাব সনাতনকে ডাকাইলে সনাতন যান না।

"পাতসা ডাকিয়া লোক পাঠাইলে কহে।
কহ গিয়া তার কিছু পীড়া হয় দেহে॥...
আপনি আইলা সনাতনেরে চাহিয়া॥"

নাটকে—

"১ম ওমরাহ। জাঁহাপনা আপনার বাড়ীতে তস্রিপ্ নিয়েছিলেন।

সনাতন। হাঁ? জাঁহাপনা?

১ম ওম। আপনার শরীর অসুস্থ শুনে আপনাকে দেখ্‌তে এসেছিলেন।

সনা। মিয়া সাহেব! সত্যই আমি মর্ম্মপীড়িত, কেবল বায়ু-সেবনের নিমিত্ত একবার বেরিয়ে এসেছি। আমি হুজুরে হাজির হতে অক্ষম।" [২য় অঙ্ক, ১ম গর্ভাঙ্ক।

ভক্তমালে তাহার পর আছে—

"পীড়া শুনি পুন রাজা বৈদ্য পাঠাইলা।
বৈদ্য আসি পরখিয়া সুস্থ দেখি গেলা॥"

নাটকে—

"বুদ্ধিমন্ত। জাহাপনা, ব্যামো সেমো সব মিছে। সত্য, মিথ্যা এই হকিম সাহেবকে জিজ্ঞাসা করুন।

হকিম্।......বেমার নয় সচ্।"—[২য় অঙ্ক, ২য় গর্ভাঙ্ক]

নবাব সনাতনকে ডাকাইলেন।

"রাজা কহে তোমার মনের কথা কিবা।
কার্য্যে নাহি যাহ নাহি বুঝি কি করিবা॥
এক ভাই তোমার ফকির হৈয়া গেলা।
তুমিও তাহাই বুঝি করিবে ভাবিলা॥
(ভক্তমাল)

নাটকে নবাব সনাতনকে বলিতেছেন—

"তুমি কি রূপের মত ফকিরী নিবে?......এ সব ফকিরী মতলব তুমি ছাড়; কাজকর্ম্মে মন দাও।"

"তবে সনাতন কহে অন্তরের মর্ম্ম।
আমা হৈতে আর নাহি চলিবেক কর্ম্ম॥"

নাটকে—

নবাব। কি, তুমি কাজ করবে না?

সনাতন। গোলাম শক্তিহীন।

তারপর নবাব

"তত্ত্ব বুঝি সনাতনে রাখে কারাগারে।
কয়েদ রাখিলা কিন্তু বিষাদ অন্তরে॥"

নাটকে নবাব আজ্ঞা দিলেন "কোই হ্যায়্ রে? এস্কো গারদ্‌মে লে যাও।" সনাতন কারাগারে নিক্ষিপ্ত হইলেন।

শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত গ্রন্থেও অবিকল এইরূপ বর্ণনা আছে। কিয়দংশ নিম্নে উদ্ধৃত হইল।

"এথা সনাতন গোঁসাই ভাবে মনে মন।
রাজা মোরে প্রীতি করে সে মোর বন্ধন॥
কোনও মতে রাজা যদি মোরে ক্রুদ্ধ হয়।
তবে অব্যাহতি হয় করিল নিশ্চয়॥
অস্বাস্থ্যের ছদ্ম করি রহে নিজ ঘরে।
রাজকার্য্য ছাড়িল না যায় রাজদ্বারে॥
লোভে কায়স্থগণে রাজকার্য্য করে।
আপন স্বগৃহে করে শাস্ত্রের বিচারে॥...

আরদিন গৌড়েশ্বর সঙ্গে একজন।
আচম্বিতে গোঁসাই সভাতে কৈল আগমন॥
পাদশা দেখিয়া সবে সম্ভ্রমে উঠিলা।
সম্ভ্রমে আসন দিয়া রাজারে বসাইলা॥
রাজা কহে তোমার স্থানে বৈদ্য পাঠাইল।
বৈদ্য কহে ব্যাধি নাহি সুস্থ যে দেখিল॥
আমার যে কিছু কার্য্য সব তোমা লঞা।
কার্য্য ছাড়ি রহিলা তুমি ঘরেতে বসিয়া॥
মোর যত কার্য্যকাম সব হইল নাশ।
কি তোমার হৃদয়ে আছে কহ মোর পাশ॥
সনাতন কহে নহে আমা হৈতে কাম।
আর একজন দিয়া কর সমাধান॥......
এত শুনি গৌড়েশ্বর উঠি ঘরে গেলা।
পলাইবে বলি সনাতনেরে বান্ধিলা॥"

[শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত, মধ্যলীলা, উনবিংশ পরিচ্ছেদ।

ইহার পর ভক্তমাল ও চৈতন্যচরিতামৃতে বর্ণিত ঘটনার সহিত নাটকের ঘটনার মিল নাই। ভক্তমাল ও চৈতন্যচরিতামৃতে আছে, সনাতন কারাগারের যবন রক্ষীকে পঞ্চ সহস্র মুদ্রা উৎকোচের প্রলোভন দেখান। রক্ষী তাহাতে প্রলোভিত না হইলে সাত হাজার টাকা উৎকোচ প্রদান করিয়া কারাগার হইতে পলায়ন করেন। গিরিশচন্দ্র নিজ নাটকে এ ঘটনা বর্ণনা করেন নাই। কেন না তাহা হইলে সনাতনের চরিত্রে দোষ পড়িবে। উৎকোচদানে পলায়ন প্রকৃত বৈষ্ণবের কার্য্য নয়। তাই গিরিশচন্দ্র দ্বিতীয় অঙ্ক, চতুর্থ গর্ভাঙ্ক, তৃতীয় অঙ্ক, দ্বিতীয় ও তৃতীয় গর্ভাঙ্কে অন্যপ্রকার ঘটনাবলীর অবতারণা করিয়াছেন ও অপূর্ব্ব প্রকারে সনাতনের কারামুক্তি দেখাইয়াছেন। বিল্বমঙ্গলে বণিকপত্নীর চরিত্রের ঔৎকর্ষ দেখাইতে যেমন গিরিশচন্দ্র ভক্তমাল বর্ণিত ঘটনা পরিবর্ত্তিত করিয়াছেন, এ ক্ষেত্রেও সেইরূপ সনাতনের চরিত্রের ঔৎকর্ষ দেখাইবার জন্য ঘটনার পরিবর্ত্তন।

সনাতন কারামুক্ত হইয়া গৌরাঙ্গের দর্শনাকাঙ্ক্ষায় চলিতে লাগিলেন।

"কতক দিবসে গেল পাতড়াপর্ব্বতে।
তথা এক দস্যু হয় কুটুম্ব সহিতে॥
ভূঞা করি খ্যাত হয় হাতগণনাতে॥
যার স্থানে সেই দ্রব্য পারয়ে কহিতে॥
উত্তরিলা অপরাহ্ন সময় যাইয়া।
হাত গণি নিজ স্বার্থ জানি সেই ভূঞা॥
গোঁসাইরে বহু সমাদরে সেবা কৈলা।
রাজমন্ত্রী সনাতন চিন্তিতে লাগিলা॥"

নাটকে আছে—

দস্যু। প্রভু, আপনারা দেখ্‌ছি সন্ন্যাসী। কৃপা করে যদি আমার কুটীরে আসেন, আমি আজ অতিথি সেবা করে জীবন সফল করব।...আসুন, গাছতলায় কেন? আসুন।...

ঈশান। প্রভু, চলুন। এখানে ডাকাতের ভয় বলছে।

সনাতন। সন্ন্যাসীর ভয় কি ঈশান? [৪র্থ অঙ্ক, ১ম গর্ভাঙ্ক।

তারপর সনাতন

"বিরলে ডাকিয়া কিছু পুছেন ঈশানে।
সত্য কহ কিছু দ্রব্য আছে তব স্থানে॥
ঈশান কহেন হয় পোনের মোহর।*
গোঁসাই কহেন এই কৃতান্তের চর॥
কেন আনিয়াছ সাথে করিয়া যতন।
ত্যাগ কর এখনি যে যাইবে জীবন॥
এত কহি মোহর ঈশান স্থান হৈতে।
মাগিয়া লইল সুধী দস্যে সমর্পিতে॥
একটি ঈশানে দিয়া চৌদ্দটি লইয়া।
ভূঞার হস্তেতে দিলা বিনয় করিয়া॥"

নাটকে সনাতন বলিলেন—

"ঈশান, তুমি প্রবঞ্চনা ক'র না। সত্য বল, তোমার নিকট কিছু আছে?"

ঈশান। আজ্ঞা। আজ্ঞা।

সনা। ব'ল, ব'ল। আমার বোধ হয় আছে, নচেৎ দস্যুর ভয় কেন?...

ঈশা। আজ্ঞে, পোনের খান মোহর এই কাঁথায় সেলাই করে এনেছি। অপরাধ মার্জ্জন করুন। পথের সম্বল ত চাই।

সনা। আমি এতক্ষণে বুঝ্‌লেম, কেন আমি চল্‌তে পারছিলাম না। কাঁথায় বেঁ শমনের অনুচর এনেছ। এখনি প্রাণনাশ হতো। কোথায় মোহর, বার কর।

দস্যু। ওরে ঝংলা।

সনা। বাপু, স্থির হও। এই তুমি মোহর নাও। একটি আমায় ভিক্ষা দাও। আমা এ ভৃত্যের পথের সম্বল নাই, একে আমি বাড়ী পাঠিয়ে দোব। [চতুর্থ অঙ্ক, ১ম গর্ভাঙ্ক।

তারপর—

"গোঁসাই লইয়া মুদ্রা ঈশানে সঁপিল।
তাহারে কহিলা এই স্বর্ণমুদ্রা লও।
মোর সঙ্গ ছাড়ি তুমি গৃহে চলি যাও॥
রোদন করিয়া তেঁহ গৃহে চলি গেলা।
কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলি গোঁসাই চলিলা একেলা॥"

নাটকেও এইরূপ।

"সনাতন। ঈশান, এই নাও, বাড়ী যাও।

ঈশান। প্রভু, আপনাকে ছেড়ে আমি কোথায় যাব? আমায় পায়ে ঠেল্‌বেন না।

সনা। তুমি কখনও ত আমার অবাধ্য হও না। আজ কেন কথা শুন্‌চ না? তোমা এখনও বিষয় বাসনা দূর হয় নি, তুমি যাও।"

---

* চৈতন্যচরিতামৃতে ঈশানের নিকট আট মোহর ছিল ইহা উল্লিখিত হইয়াছে। গিরিশচ ভক্তমাল অনুসরণে পোনের মোহরই লিখিয়াছেন। চৈতন্যচরিতামৃতে আছে—

"ভূঞা হাসি কহে আমি জানিয়াছি পহিলে।
অষ্ট মোহর হয় তোমার সেবক আঁচলে॥"

[মধ্যলীলা, বিংশ পরিচ্ছেদ।

সনাতন একেলা যাইতে যাইতে হাজিপুরে উপনীত হইলেন। তাঁহার ভগ্নীপতি শ্রীকান্তের সহিত হঠাৎ তথায় সাক্ষাৎ হইয়া গেল।

"তাঁর ভগ্নীপতি ঘোড়া খরিদ কারণ।
আসিয়াছে সেই বাগিচাতে বাসাস্থান॥"

নাটকেও শ্রীকান্ত বলিতেছে, "হাজিপুরে নবাবের জন্য ঘোড়া কিন্‌তে এসেছিলুন।"

সনাতনের অবস্থা দেখিয়া তাঁহার ভগ্নীপতি

"হাহাকার করিয়া অঙ্গুলি নাকে ধরি।
কহয়ে খেদোক্তি করি চক্ষে পড়ে বারি॥
একি দশা হাহা কেন রাজ্যপদ ছাড়ি।
মলিন বসন কেনে ভূমে যাহ গড়ি॥"

নাটকেও শ্রীকান্ত বলিল—

"হায়, হায়, সংসারটা উচ্ছন্ন গেল। তিন ভাই সন্ন্যাসী হ'ল। মহাশয়, মহাশয়, কেন এ সর্ব্বনাশ কর্‌তে বসেছেন? অট্টালিকা ছেড়ে কেন এ তরুতলে এসেছেন? উজীরি পরিত্যাগ করে কেন এ সন্ন্যাস?"

তারপর শ্রীকান্ত দারুণ শীতে সনাতন গাত্রবস্ত্রবিহীন রহিয়াছেন দেখিয়া

"শীত নিবারণ-হেতু শাল আনি দিল।
মুচকি হাসিয়া গোঁসাই দূরে ভেয়াগিল॥
তাহা রাখি পুনঃ এক বনাত আনিল।
উত্তম জানিয়া সাধু তাহাও না নিল॥
তবে তেঁহো মনে কিছু বিচার করিল।
আশয় বুঝিয়া এক ভোট যে কম্বল॥
আনিয়া দিলেন তবে চক্ষে বহে জল।
তাহাই লইয়া অঙ্গে উঠিলা গোঁসাই।
চলিলা পশ্চিম দিকে সঙ্গে কেহ নাই॥"

নাটকে শ্রীকান্ত বলিল—

"আহা, এ দুরন্ত শীতে একখানা কাপড় নাই, দেখে যে প্রাণ ফেটে যায়। এই শালখানা গায়ে দিন্।"

সনাতন। আমি সন্ন্যাসী, শাল নিয়ে কি কর্‌বো?...

শ্রীকান্ত। শাল না গায়ে দেন, এই বনাতখানা গায়ে দিন।

সনা। আমার প্রভু কন্থাধারী। নফরের এ সাজ সাজ্‌বে না।...আমার কাঁথা দিয়ে সাজিয়ে দাও।...

শ্রীকা।...এ যে দুরন্ত শীত, তা এই ঘোড়ার কম্বলখানা গায়ে দিন, আসুন।"

[চতুর্থ অঙ্ক, ২য় গর্ভাঙ্ক।

কাশীতে চন্দ্রশেখরের বাটীতে গৌরাঙ্গদেব আছেন। দ্বারে সনাতন উপস্থিত। গৌরাঙ্গদেব ঘরের ভিতর হইতে তাহা জানিতে পারিলেন।

"ঘর হৈতে কহে প্রভু কোন নিজজনে।
দেখ ত বাহিরে কেহ বৈষ্ণব ওখানে ॥
বসিয়া থাকয়ে যদি বোলাইয়া আন।"

নাটকেও গৌরাঙ্গ বলিলেন—

"চন্দ্রশেখর, দেখ ত'। দোরে ত কেউ বৈষ্ণব নাই। আমার প্রাণ যে কেমন করছে। আমার যেন কেউ আপনার লোক এসেছে।"

সনাতন আসিয়া গৌরাঙ্গপদে লুণ্ঠিত হইয়া স্তব করিতে লাগিলেন। গৌরাঙ্গ দেব সনাতনের গায়ের কম্বলের দিকে বার বার চাহিতে লাগিলেন।

"অন্তরে প্রভু ভাবয়, ভোটপানে ঘন চায়
সনাতন তৎক্ষণে বুঝিলা।
ক্ষণেক বিলম্বে উঠে গিয়া জাহ্নবীর তটে
মনে কিছু যুকতি সৃজিলা ॥
ভোট-কম্বলখানি এক যে বৈষ্ণব জানি
তাঁরে দিয়া তাঁর কন্থাখানি।
পরিবর্ত্ত করি লৈল, তেঁহো তাহে তুষ্ট হৈল
গোঁসাই লইল শ্লাঘা মানি ॥...
প্রভু গলে কান্থা দেখি, ছল ছল করে আঁখি
উঠাইয়া আলিঙ্গন কৈলা ॥

(ভক্তমাল)

নাটকে নসিবের নিকট কাঁথা লইয়া সনাতন তাহাকে নিজ কম্বল দিলেন। বলিলেন—

"দাও, আমায় কৃপা করে কাঁথাখানি দাও।...আমার মিনতি রাখ। গৌরাঙ্গদেব বার বার আমার এ কম্বলের প্রতি দৃষ্টি করেছেন। আমি এ ছার কম্বল আর গায়ে দেব না।" কন্থা পরিবর্ত্তনের পর গৌরাঙ্গদেব সনাতনকে বলিলেন "ওরে সনাতন তোর কি সুন্দর সাজ হয়েছে!"

(৪র্থ অঙ্ক, ৩য় গর্ভাঙ্ক)

জীবনের কাহিনীটিও ভক্তমালে আছে।

"দৈবযোগে গৌড়দেশে এক যে ব্রাহ্মণ।
বর্দ্ধমান দক্ষিণে মানকরেতে ভবন ॥
জীবন তাহার নাম বহু যে কুটুম্ব।
সুদরিদ্র কিছুমাত্র নাহি অবলম্ব ॥
বিবেকী হইয়া কাশীপুরীতে যাইয়া।
অর্থাকাঙ্ক্ষী হই বহু বৎসর ব্যাপিয়া ॥
শিব আরাধনা কৈল তীব্র তপ করি।
প্রসন্ন হইয়া শিব কহে বিপ্রোপরি ॥
বৃন্দাবনে যাহ যথা সনাতন নাম।
সাধুর নিকটে গিয়া পূরিবেক কাম ॥"

এ দিকে সনাতন দৈবাৎ এক স্পর্শমণি পাইয়াছিলেন।

"একদিন গোঁসাই স্নান করিতে যমুনা।
স্পর্শমণি পাইলেন যাতে হয় সোণা॥…
স্পর্শ না করিয়া খাপরাতে ধরি লঞা॥
কোন স্থানে রাখিলা মৃত্তিকা আচ্ছাদিয়া॥"

সনাতন স্পর্শমণি জীবনকে দেখাইয়া দিলেন। তখন জীবন ভাবিল—

"এ হেন পদার্থ গোঁসাই দিল কি কারণে।
রাখিবারে কায থাকুক স্পর্শ নাহি করে॥
* * * *
তেঁহ যে রতন প্রাপ্ত হইয়া মজিল।
তাহাই লইব এই প্রতিজ্ঞা করিল॥"

তখন সনাতনের চরণে পড়িয়া জীবন বলিল—

"শরণ লইনু তব অভয় চরণে।
কৃতার্থ করহ দিয়া কৃষ্ণ প্রেম ধনে॥"

ও স্পর্শমণি যমুনার জলে নিক্ষেপ করিল।

"এত শুনি বিপ্র স্পর্শমণি লয়ে করে।
টান মারি ফেলি দিল যমুনা মাঝারে॥"

নাটকের পঞ্চমাঙ্কের প্রথম গর্ভাঙ্কে এই কাহিনী অতি সুন্দরভাবে বর্ণিত হইয়াছে। দীর্ঘ বলিয়া তাহা উদ্ধৃত হইল না। কৌতূহলী পাঠক অনুগ্রহ পূর্ব্বক নাটকের উক্ত দৃশ্য দেখিয়া লইবেন।

রূপ সনাতন নাটকের শেষ দৃশ্যের ঘটনাটিও ভক্তমালে আছে। মথুরাতে চৌবে-পত্নীর গৃহে মদনমোহন ছিলেন। চৌবে-পত্নীর পুত্রের সহিত মদনমোহন ক্রীড়া করিতেন।

"মন মোহনিয়া শ্রীমন্ মদনমোহন।
শ্রীমতী কুবুজা মহিষীর প্রকাশন॥
মথুরা চৌবের নারী করেন সেবন।
নিতি মাধুকরী হেতু যান সনাতন॥"

একদিন সনাতন দেখিলেন—

"চৌবের বালক সহ মদনমোহন।
একত্রে বসিয়া অন্ন করেন ভোজন॥"

সনাতন তখন সেই বালকের উচ্ছিষ্ট প্রার্থনা করিলেন।

"তোমার শিশুর এই পাত্র অবশেষ।
যাহা থাকে তাহা দেহ করি কৃপালেশ॥"

নাটকেও সনাতন চৌবে-পত্নীকে বলিতেছেন "মা, আমি বড় ক্ষুধাতুর। আপনার বালকের যদি কিঞ্চিৎ প্রসাদ থাকে, আমায় এনে দিন্।"

তারপর ভক্তমালের কাহিনীর সহিত গিরিশচন্দ্রের বর্ণিত ঘটনার কিছু প্রভেদ লক্ষিত হয়। ভক্তমালে আছে, সনাতন ও চৌবে-পত্নী উভয়কেই মদন-মোহন স্বপ্নে বলিলেন যে, তিনি সনাতনের সহিত যাইবেন। নাটকে আছে, চৌবে-পত্নী তিনদিন স্বপ্ন দেখিয়াছিলেন 'যে তাঁহার পুত্রের উচ্ছিষ্ট ভক্ষণ করিবে মদনমোহন তাহার কাছে যাইবেন'। সনাতন উচ্ছিষ্ট ভক্ষণ করাতে মদনমোহন তাঁহার নিকট থাকিলেন। মদনমোহন দিবার সময় চৌবে-পত্নী মদনমোহনকে যে তিরস্কার করিল তাহা ভক্তমাল ও নাটকে উভয়এই সমান। যথা—

"ঠাকুরাণী কহে হাঁ হাঁ সত্য বটে বটে।
শাঠ্য বিদ্যায় পারগ বটে ঘটে॥
আমারেও কহিল যাইব অন্তস্তরে।
পূর্ব্বের স্বভাব যে তা ছাড়িতে না পারে॥

* * *

শ্রীমতী যশোদা প্রাণপণেতে পালিল।
ক্ষণমাত্রে বুকে শেল হানি পলাইল॥"

(ভক্তমাল)

নাটকে—

"আরে ছল, যশোদা কি চোট্টা। কঠিন্ কপট ঝুটা। তোম্ হাম্‌কো ছোড়্ যাগা। লাও তোমারা এসাই রীত্ হায়্। তোম্ যশোদা মায়ীকি নেহি, নন্দজীকে নেহি, ব্রজবালককা নেহি, গোপিনীকো নেহি, প্যারীজীকা ভি নেহি।"—(৫ম অঙ্ক, ২য় গর্ভাঙ্ক)

রূপ সনাতন নাটকখানিতে গিরিশচন্দ্র বেশী নূতন চরিত্র সৃষ্টি করেন নাই। রামদিন ও নসির খাঁ এই দুইটি পুরুষ চরিত্র ও তিনটি স্ত্রীচরিত্র গিরিশচন্দ্রের নিজের সৃষ্টি। রূপ সনাতনের একস্থল ব্যতীত অপর ঘটনাবলীও সমস্ত ভক্তমাল হইতে গৃহীত। যে স্থলের ঘটনা গিরিশচন্দ্রের নিজের সৃষ্টি তাহা পূর্ব্বে বলিয়াছি। কারাগার হইতে সনাতনের মুক্তি গিরিশচন্দ্র অভিনব ঘটনা দ্বারা সংসাধিত করিয়াছেন। করমেতি বাই ও বিল্বমঙ্গলের ন্যায় রূপ সনাতনে গিরিশচন্দ্রের মৌলিকত্ব তত অধিক নহে। তবে স্থূল উপাখ্যান হইতে জীবন্ত চরিত্র সৃষ্টি করিতে যে প্রতিভা আবশ্যক হয়, সে প্রতিভার দৃষ্টান্ত পদে পদে পাওয়া যায়।

আমরা রূপ সনাতনের একটি চরিত্রের কথা এ পর্য্যন্ত উল্লেখ করি নাই। সেটি সুবুদ্ধির চরিত্র। ভক্তমালে এ চরিত্রটি নাই, কিন্তু ইহা গিরিশচন্দ্রের সৃষ্টি নয়। চৈতন্যচরিতামৃত হইতে এ চরিত্রটি গিরিশচন্দ্র লইয়াছেন। উক্ত গ্রন্থে আছে—

"যবে সুবুদ্ধি রায় ছিল গৌড় অধিকারী।
সৈয়দ হুসেন খাঁ করে তাহার চাকরী॥
দীঘী খোদাইতে তারে মনসীব কৈল।
ছিদ্র পাঞা রায় তারে চাবুক মারিল॥"

[মধ্যলীলা, ২৪ পরিচ্ছেদ।

নাটকে সুবুদ্ধি বলিতেছে—

"ঐ হোসেন সা ব্যাটা আমার সেরেস্তায় চাকর ছিল। ওর কাবা খুলে দেখ গে—আজও কোড়ার দাগ আছে।" (১ম অঙ্ক, ১ম গর্ভাঙ্ক)

পরে হোসেন সা সুবুদ্ধি রায়ের জাতিনাশ করিল। তাহার কারণ চৈতন্য-চরিতামৃতে আছে—হোসেন সার পত্নী একদিন স্বামীর অঙ্গে প্রহারের চিহ্ন দেখিয়া তাহার কারণ জিজ্ঞাসা করে। পূর্ব্বে সুবুদ্ধি রায়ের কশাঘাতে এই দাগ হইয়াছে জানিয়া সুবুদ্ধিকে বধ করিতে অনুরোধ করে। হোসেন সা তাহা না করিয়া তাহার জাতিনাশ করে।

"স্ত্রী মারিতে চাহে রাজা সঙ্কটে পড়িলা।
করোয়ার পাণি তার মুখে দেয়াইলা॥"

(মধ্যলীলা, ২৪ পরিচ্ছেদ)

গিরিশচন্দ্র এ কাহিনী অবলম্বন করেন নাই। তিনি দেখাইয়াছেন সুবুদ্ধি সনাতনের বিরোধী হওয়াতে হোসেন সা ক্রোধে তাহার মুখে ফুৎকার দিয়াছিলেন। নবাব বলিলেন "তোমার কি জাত গিয়েছে। (মুখে জল দিয়া) এই থুক্ তোমার মুখে লাগ্‌ল।" (২য় অঙ্ক, ২য় গর্ভাঙ্ক) তখন সুবুদ্ধি রায় প্রায়শ্চিত্তের ব্যবস্থা খুঁজিতে কাশীতে উপস্থিত হইল।

"তবে সুবুদ্ধিরায় সেই ছদ্ম পাইয়া।
বারাণসী আইলা সব বিষয় ছাড়িয়া॥
প্রায়শ্চিত্ত পুছিল তেঁহো পণ্ডিতের স্থানে।
তাঁরা কহেন তপ্ত ঘৃত খাইয়া ছাড় প্রাণে॥"

[চৈতন্যচরিতামৃত।

নাটকে সুবুদ্ধি বলিতেছে—

"আমি কাশীতে ব্যবস্থা নিতে এসেছিলুম। আমায় ত মুসলমান করে দিয়েছে জান, তাই একটা ব্যবস্থা নিতে এসেছিলুম।...যেখানে যাই কেউ বলেন তুষানল, কেউ বলেন তপ্ত ঘৃত পান।"

সুবুদ্ধি এ কঠোর প্রায়শ্চিত্ত করিতে অক্ষম। এই সময় গৌরাঙ্গদেব কাশীতে আসিলেন।

"তবে যদি মহাপ্রভু বারাণসী আইলা।
তাঁরে মিলি রায় আপন বৃত্তান্ত কহিলা ॥
প্রভু কহে ইঁহা হৈতে যাহ বৃন্দাবন।
নিরন্তর কর কৃষ্ণনাম সঙ্কীর্ত্তন ॥
এক নামাভাষে তোমার পাপদোষ যাবে।
আর নাম লইতে কৃষ্ণচরণ পাইবে ॥
রায় আজ্ঞা পাইয়া বৃন্দাবনেতে চলিলা।"

[চৈতন্যচরিতামৃত।

নাটকেও এইরূপ বর্ণনা। সুবুদ্ধি গৌরাঙ্গদেবকে বলিল—

"আমার যা হয় একটা প্রায়শ্চিত্ত বিধি করে দাও। আমি তপ্ত ঘিটি খেতে পার্‌ব না।"

গৌরাঙ্গ বলিলেন—

"তোমার ভয় কি? তুমি কৃষ্ণনাম কর।
কৃষ্ণনামে অপার মহিমা।
এক নামে পাপ হবে ক্ষয়।
পুনঃ কৃষ্ণ বল,
কৃষ্ণচন্দ্র হবেন উদয়।
তৃতীয় নামেতে তাঁর পাবে সহবাস।
* * *
কৃষ্ণনাম কর গিয়া বৃন্দাবনে।]
দূরে যাবে সকল যন্ত্রণা,
অতি শ্রেষ্ঠ হবে তুমি কৃষ্ণনামগুণে।"

[৪র্থ অঙ্ক, ৩য় গর্ভাঙ্ক।

এইরূপে সুবুদ্ধির উদ্ধার হইল।

রূপ সনাতন নাটক রচনায় গিরিশচন্দ্র ভক্তমাল ও চৈতন্যচরিতামৃত হইতে কি সাহায্য লইয়াছেন উপরে তাহা বিবৃত হইল। এখন আমরা আর একখানি নাটকের আলোচনা করি।

ক্রমশঃ

শ্রীশরচ্চন্দ্র ঘোষাল।

পশু-পক্ষীর উদ্বাহ।

নিজ বিবাহিতা ভার্য্যা বর্ত্তমান থাকিতেও যে লোক পরস্ত্রীর প্রতি লুব্ধ কটাক্ষ করে, আমরা সেই দুর্বৃত্তকে পশু বলি। কিন্তু অনেক পশু-সমাজের ক্রিয়াকলাপ, আচারপদ্ধতি পর্য্যালোচনা করিলে বুঝিতে পারা যায় যে, এ বিষয়ে তাহাদের নীতিজ্ঞানটা আমাদের মনুষ্যসমাজের নীতিজ্ঞান অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ।

অনেক পশু-পক্ষী একেবারে একনিষ্ঠ। চরিত্রহীন মানুষের মত অনেক শ্রেণীর পশু-পক্ষী পরশ্রীকাতর বা পরস্ত্রীকাতর নহে। একস্থলে পাশাপাশি অনেক পারাবত রাখিয়া দেখিয়াছি, ঘোরতর কৃষ্ণবর্ণ কেলে গোলা পুরুষ তাহার গৃহিণীর কালো রঙ্গে মজিয়া থাকে, গলা ফুলাইয়া, পালক ফুলাইয়া বক্-বকুম সঙ্গীতে কৃষ্ণবর্ণের শ্রেষ্ঠত্ব ঘোষণা করে, ভুলেও একবার শাদা পরপো প্রতিবাসীর ধপ্‌ধপে রমণীরত্নের প্রেমে আপনার গৃহে অশান্তি সৃষ্টি করে না। যে সমাজে যেরূপ বিবাহ-রীতি প্রচলিত, সে সমাজের পশু-পক্ষী ঠিক সেই রীতি অনুসারে কার্য্য করে।

জীবজন্তুর এত শ্রেণী আছে যে, সকলের উদ্বাহ-পদ্ধতি বর্ণনা করিতে গেলে এক সপ্তকাণ্ড রামায়ণের প্রয়োজন। আর সেরূপ বাল্মিকী মুনিই বা কোথায়? মানুষে অনেক দেখিয়াছে, অনেক কৃতবিদ্য পণ্ডিত নদীনালা, গহন বিপিন, পাহাড়-পর্ব্বতে ঘুরিয়া পশু-পক্ষীর আচার-ব্যবহার পর্য্যবেক্ষণ করিয়াছে, কিন্তু তাহা সত্ত্বেও জীবজগৎ সম্বন্ধে সম্পূর্ণ জ্ঞান কেহ আয়ত্ত করিতে পারে নাই। আমরা সচরাচর যে সকল জীবজন্তু দেখিতে পাই, এ প্রবন্ধে তাহাদিগের উদ্বাহ-পদ্ধতির আভাষ দিব।

পৃথিবীতে মনুষ্যসমাজে যত প্রকার বিবাহপদ্ধতি প্রচলিত, পশু-সমাজেও সেই সকল রকম রীতি বিদ্যমান। তবে হিন্দু ও চীনবাসীর যুবক-যুবতী বা বালক-বালিকা যেমন পিতামাতার নির্ব্বাচন-শক্তির অনুগ্রহে আজীবন উদ্বাহ-বন্ধনে আবদ্ধ থাকে, বিবাহ-বিষয়ে পশু জগতে সেরূপ পিতামাতার কর্ত্তৃত্বের কথা শুনা যায় না। সকলেই স্ব স্ব সহচর সহচরী বাছিয়া লয়। সহচরীকে মুগ্ধ করিবে বলিয়া কোকিল অত গান গায়, দোয়েল শ্যামা নব-পল্লবশোভিত বাসন্তী বনকে সজীব ও সুমধুর করিয়া তুলে। সকল পুরুষ-জীবের রূপও রমণী ভুলাইবার জন্য। কার্ত্তিকেয় বাহন ময়ূরের পুচ্ছশোভা ময়ূরীকে মাতাইবার জন্য, তাহার নিজের রূপ দেখাইয়া শিখিনীর মন ভুলাইবার জন্য। কেশরী যে পশুজগতের রাজা, এ সংবাদ সে নিজে অবগত নহে। তাহার কেশর যে রাজছত্রের মত একটা শ্রেষ্ঠত্বের পরিচায়ক, কল্পনা-শক্তি-বর্জ্জিত বাস্তব জগৎ-পর্য্যালোচক বৈজ্ঞানিক তাহা বলেন না। তিনি বলেন সিংহীকে ভুলাইবার জন্য সিংহ সদাই রাজবেশে সজ্জিত। তবে পশুপক্ষীর মধ্যে প্রেম-পত্র-বিনিময়ের কোনও সাক্ষ্য অদ্যাবধি জীবতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতদিগের হস্তগত হয় নাই।

খুব অসভ্য আদিম সমাজে এক নারীর বহু স্বামী থাকে। আমার বোধ হয়, মৌমাছি প্রভৃতি পতঙ্গশ্রেণীর উদ্বাহরীতি অনেকটা এই রীতির অনুরূপ। মধুচক্রের কথা অনেকেই বিদিত। প্রত্যেক মধুচক্রে অনেক মৌমাছি থাকে। তাহারা সাধারণতঃ তিন শ্রেণীতে বিভক্ত—পুরুষ, স্ত্রী ও ক্লীব। এক এক চক্রে এক একজন মাত্র পূর্ণাবয়ব রমণী থাকেন—ইনি মধুচক্রের অধিষ্ঠাত্রী দেবী, মৌচাকের "রাণী"। ক্লীবেরা ফুলে ফুলে ঘুরিয়া মধু সংগ্রহ করিয়া আনে, গৃহ নির্ম্মাণ করে, রাণীর সেবা করে। রাণী মাঝের একটি বৃহৎ কক্ষে বসিয়া পূজা গ্রহণ করেন আর মধুপান করেন। গ্রীষ্মকালে মধুচক্রে পুরুষ মৌমাছি জন্মগ্রহণ করে। তাহারাও কাজকর্ম্ম করে না। মোগল বাদসাহের রঙ্গমহলে যেমন তাঁহার বিলাসের জন্য সুন্দরশ্রী অনিন্দ্যসুন্দরী বেগমের দল থাকিত, এ সকল মোমাছি-পুরুষও চক্রের রাণীর বিলাসের জন্য মৌচাকে বসিয়া মধুপান করে। রাণী তাহাদিগকে লইয়া আমোদ-প্রমোদে মত্ত থাকেন। যখন তিনি গর্ভবতী হয়েন তখন আর সেগুলার কোনও আবশ্যকতা থাকে না। রাণীর ক্লীব সেনানীবৃন্দ তাহাদিগকে হত্যা করে। রাণী যখন ডিম্ব প্রসব করেন, ক্লীবগণ বাছিয়া বাছিয়া তিন প্রকার গৃহে তিন শ্রেণীর ডিম্ব সংরক্ষণ করে। আবার যতদিন না ডিন ফুটিয়া পুরুষ-মক্ষিকা বাহির হয়, বস্তুতঃ যতদিন তাহারা পূর্ণাবয়ব-প্রাপ্ত না হয়, ততদিন রাণী বিরহিনী অবস্থায় কালাতিপাত করেন। বিরহ-কাতরা রাজ্ঞী অধিক পরিমাণে মধুপান করেন কি না সে কথা বলা সুকঠিন।

বোল্‌তা সমাজের বিবাহরীতিও অনেকটা মৌমাছি সমাজের উদ্বাহ-রীতির অনুরূপ। হিমালয়ের কুল্লু প্রদেশের ও দক্ষিণ ভারতের অধিবাসীবিশেষের মত বোল্‌তাদিগের মধ্যেও এক স্ত্রীর বহু স্বামী থাকে। তবে মধুমক্ষিকা-পুরুষের মত বোলতা-পুরুষ কেবল রাজ্ঞীর বিলাসের সামগ্রী নহে। তাহারাও শত্রুর আক্রমণ হইতে বাসস্থান রক্ষা করে এবং খাদ্য সংগ্রহ করে।

পিপীলিকা-সমাজের উদ্বাহ বড় শোকাবহ। যতদিন প্রণয়ের মধুর উৎসে তাহাদের প্রাণ ভরিয়া না উঠে ততদিন পুরুষ, স্ত্রী ও ক্লীব একত্র সমাজ গঠন করিয়া বাস করে। বসন্তের মলয়স্পর্শে যেমন অনেক জীবের প্রাণে মিলন-স্পৃহা জন্মলাভ করে, বসন্তে ও বরষার শেষে তেমনি পিপীলিকার ক্ষুদ্র প্রাণটি প্রেমের হিল্লোলে আলোড়িত হয়, তখন পুরুষ ও স্ত্রী পিপীলিকার পালক উঠে—মরিবার জন্য নয়, বায়ুবক্ষে উড়িয়া প্রেমতৃষা মিটাইবার জন্য। দলে দলে পুরুষ ও স্ত্রী উড়িতে থাকে, অল্পক্ষণেই প্রত্যেক পিপীলিকা আপন আপন সহচরী

নির্ব্বাচন করে, প্রেমিক-প্রেমিকার মিলন হয়। যেমনই মিলন অমনই পুরুষের প্রাণনাশ। পিপীলিকা-বধূর পালক খসিয়া যায়, সে অণ্ড প্রসব করিয়া জগতের পিপীলিকা-সংখ্যা পরিপুষ্ট করে। ইহাদের মধ্যে পাশ্চাত্য নরের বিবাহের মত নির্ব্বাচনপ্রথা প্রচলিত। কিন্তু উদ্বাহ-বন্ধন বড় ক্ষণস্থায়ী, বিবাহ বড় শোকাবহ। পুরুষ ও স্ত্রীর মিলন ঘটিলেই অমনই পুরুষ প্রাণত্যাগ করে। পিপীলিকা বধূদের সকলের ভাগ্যে বৈধব্যযোগ, সকলেরই দেবারিগণ।

হিন্দু, চীনা, মুসলমান, ইহুদি প্রভৃতি প্রায় সকল সুসভ্য প্রাচ্য জাতির মধ্যেই এক পুরুষের বহু স্ত্রী থাকিতে পারে। হনুমান ও মর্কট বানরের সমাজে এ পদ্ধতি দেখিতে পাওয়া যায়। এক একটি বীর হনুমান বিশ পঁচিশটি ঘরনী লইয়া বাস করে। 'পালের গোদা' বীর হনুমান বড় ঈর্ষাপরবশ। এত স্ত্রী লইয়াও সে সশঙ্ক। কোন অপর পুরুষ দলের ত্রিসীমায় আসিতে পারে না, এমন কি নিজ পুত্র যৌবনের দ্বারে উপনীত হইলেই বীর হনুমান তাহাকে প্রহার করিয়া দল হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দেয়। যত দিন বীর অক্ষত শরীরে অপরের আক্রমণ প্রতিরোধ করিয়া নিজের 'পাল' একত্র রাখিতে পারে ততদিন তাহার ভার্য্যাগণও তাহার প্রতি আসক্ত থাকে। অপর দলের সহিত কলহ হইলে সকলে মিলিয়া খুব যুদ্ধ করে। কিন্তু একবার 'পালের গোদা' পরাজিত হইলেই অমনই তাহার ভার্য্যাগুলিও বিজেতার 'হারেমে' মিশিয়া যায়। প্রাচ্যে এক সুলতান অপরকে পরাজিত করিয়া যেমন তাহার 'হারেম' অধিকার করিতেন, বিজয়লক্ষ্মী মুখ তুলিয়া চাহিলে হনুমান বীরও তেমনই পরাজিত শত্রুর অঙ্কলক্ষ্মী-গুলিকে দখল করিয়া বসেন।

হনুমানদিগের মধ্যে এক একটা 'নাগা'র দল থাকে। ইহারা সকলেই পুরুষ। সুবিধা পাইলে ইহারা এক একটা 'পালের গোদা' হয়। যতদিন স্ত্রী-সংগ্রহে কৃতকার্য্য না হয় ততদিন কুমার-সভার সভ্য থাকিয়াই বানর যুবক গ্রামের লোকের কলা, মূলা উদরসাৎ করে।

হরিণের সমাজেও এক একটা কুমার-সভা থাকে। তিন চারিজন কুরঙ্গ মিলিয়া বেশ মনের সুখে পানাহার করে, বনে বনে ঘুরিয়া বেড়ায়। দৈব দুর্বি-পাকে যদি তাহাদের মধ্যে একটি কুরঙ্গিনীর শুভাগমন হয় তাহা হইলেই সভার শান্তি তিরোহিত হয়। শৃঙ্গে শৃঙ্গে ঘষাঘষি হয়, বনের মধ্যে ছুটাছুটি হয়, গর্ব্বিতা কুরঙ্গিনী সানন্দে যুদ্ধ দেখে আর বোধ হয় সরসী আরসীতে নিজের কুরঙ্গ-নয়নের শোভা দেখিয়া আত্মপ্রসাদ লাভ করে। রণাবসানে বিজয়ী বীরের

গলে কুরঙ্গিনী বরমাল্য দান করে। অবশ্য মালা দেয় না, তাহাকে বিবাহ করে।

পক্ষীদিগের শ্রেণীর মধ্যেও প্রায়শঃ একনিষ্ঠা দেখিতে পাওয়া যায়। ঘুঘু, পায়রা, বন্য হংস প্রভৃতির মধ্যে একনিষ্ঠা বড় প্রশংসনীয়। চকা-চকির তো কথাই নাই। কেহ কেহ বলেন যে, পারাবত প্রভৃতির ভিতর এমন কি বিধবা-বিবাহ প্রচলিত নাই। স্বামী বা স্ত্রীর জীবনকালে অবশ্য পারাবতদিগের মধ্যে বিশ্বাসঘাতকতা দেখি নাই। কিন্তু একটি পারাবত মরিয়া গেলে বা নিরুদ্দেশ হইলে তাহার পরিত্যক্ত সহচর বা সহচরীকে পরিণয় করিতে দেখিয়াছি। কাক, কোকিল, চিল, টিয়াপাখী, শালিকপাখী, ময়না, চড়াইপাখী প্রভৃতি সবাই একনিষ্ঠ। কেবল গৃহপালিত কুক্কুট ও হংসকে বহুবিবাহ করিতে দেখা যায় পেচকেরাও নাকি বড় একনিষ্ঠ। সে বিষয় নিশাচরেরা বলিতে পারে।

শুনিয়াছি, নেকড়ে বাঘেরা বড় একনিষ্ঠ। যতদিন ব্যাঘ্র ও ব্যাঘ্রী জীবিত থাকে ততদিন তাহাদের মধ্যে পূর্ণমাত্রায় প্রেমও বিদ্যমান থাকে। একের মৃত্যুর পর অপরে কিছুদিন কাঁদিয়া আবার জীবনের সঙ্গী বা সঙ্গিনী বাছিয়া লয়। তাহারা দ্বিতীয়বার দারপরিগ্রহ 'পঞ্চজনা'র অনুরোধে করে কি না সে কথা বলা কঠিন। শৃগালও একনিষ্ঠ বলিয়া মনে হয়। আমি একবার শিকারের অভাবে একটা শৃগাল মারিয়াছিলাম। শৃগালী সারারাত তাহার মৃতদেহের পার্শ্বে বিষাদ-কাতর-মুখে বসিয়াছিল আর প্রহরে প্রহরে বুকভাঙ্গা সুরে 'হুকা হুয়া হুয়া হুয়া' করিয়া চীৎকার করিয়াছিল।

ব্রহ্মদেশে যেমন কিছুদিনের জন্য চুক্তি করিয়া লোকে বিবাহ করিতে পারে, অনেক পশুসমাজে তেমনি স্বল্পদিনের জন্য বিবাহবন্ধন দেখিতে পাওয়া যায়। প্রকৃত প্রস্তাবে এ সকল জীবের প্রাণে কোনও পারিবারিক আকর্ষণী শক্তি নাই। কেবল সন্তানোৎপাদনকালে ইহারা স্ত্রীজাতীয় জীবের তোষামোদ করিয়া ঘুরিয়া বেড়ায়। একজনকে অঙ্কলক্ষ্মী করে, কিন্তু সে গর্ভবতী হইলে স্বামী তাহাকে বর্জ্জন করিয়া পলায়ন করে।

কুকুর, বিড়াল, খরগোস, কাটবিড়ালী প্রভৃতি এই শ্রেণীর জীব। ইহাদিগের ভিতর প্রকৃত দম্পতিভাব দেখিতে পাওয়া যায় না। মুষিকগুলা এত দৃষ্টির অন্তরালে থাকে যে, তাহাদের বিষয় কিছু নির্দ্ধারিতরূপে বলা যায় না। আমার কিন্তু মনে হয় যে ইহারাও এই শ্রেণীভুক্ত। এক পিঞ্জরায় সাদা ইঁদুর রাখিয়া দেখিয়াছি যে, তাহাদের মধ্যে বেশ সখ্য স্থাপিত হইয়াছে। কিন্তু সে সখ্য

দুইজন বন্দীর সমবেদনা-প্রসূত কিম্বা দাম্পত্য-প্রণয়জাত, তাহা বলা সুকঠিন। গৃহপালিত ছাগলগুলা বড় ব্যভিচাররত, কামাতুর। প্রেমিকের তালিকায় ইহাদের স্থান বড় নিম্নে।

ওরাঙ্ নামক বনমানুষের বর্ণনায় হাক্স্‌লে সাহেব যাহা বলিয়াছেন তাহা হইতে বুঝা যায় যে, ওরাঙগণ সংসারী নয়। তিনি বলেন যে, কেবল সন্তানোৎপাদনকালে পুরুষ ও স্ত্রী ওরাঙ একসঙ্গে থাকে। তাহার পর পূর্ণাবয়ব পুরুষেরা একেলা থাকে। স্ত্রীলোকেরা শাবক প্রতিপালন করে বলিয়া প্রায় পঞ্চদশ-বর্ষীয় ওরাঙ শাবক অবধি মাতার সংসারে বসবাস করে। ওরাঙদিগের বৃদ্ধি তেমন দ্রুত নহে। যৌবনের দ্বারে উপনীত হইলেই ওরাঙ্ মাতৃসংসার ছাড়িয়া বৃক্ষশাখে বাসা বাঁধিয়া একেলা বাস করিতে আরম্ভ করে।

পশুসমাজে যে রকমই পরিণয়পদ্ধতি প্রচলিত থাকুক, স্ব স্ব সমাজের নিয়মানুসারে তাহারা প্রায় সকলেই বিবাহ করে। পশুসমাজে চিরকুমার বা বৃদ্ধা কুমারী দেখিতে পাওয়া যায় না। এ বিষয়ে তাহারা বাঙ্গালীর মত। তবে পশুসমাজে বিবাহ-বন্ধন বোধ হয় 'দিল্লির লাড্ডু' ভোজনের সহিত তুলনা করা হয় না। মিলনে পশুপক্ষী সুখ পায়, মিলনের পূর্ব্বে তাহারা কলহ করে, মিলনের পর তাহাদের মধ্যে দাম্পত্য-কলহ বিরল।

সহচরী আকর্ষণ করিবার জন্য পশুপক্ষী নানারূপ উপায় উদ্ভাবন করে। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, তাহাদের বর্ণ ও কণ্ঠস্বরের উৎকর্ষের মূলে যৌগিক প্রবৃত্তি বিদ্যমান। দারবিন্ (Darwin) সাহেব তাঁহার অমূল্য গ্রন্থে এ বিষয়ে কতকগুলি বড় হৃদয়গ্রাহী উদাহরণ দিয়াছেন। স্ত্রী সংগ্রহ করিবার জন্য কুম্ভীরগণ যুদ্ধ করিয়া, লেজ নাড়িয়া, ঘুরিয়া ফিরিয়া জলকে তোলপাড় করে। দুইটা সামন মাছ একটা স্ত্রী মৎস্যের জন্য সমস্ত দিন পরস্পরের সহিত যুঝিয়াছিল। বিহঙ্গমদিগের মধ্যে দুর্ল্লভ রমণীরত্ন লাভ করিবার জন্য সমর চলে বটে, কিন্তু সে সমর কেবল গুণের প্রতিদ্বন্দ্বিতা মাত্র। 'পারিজাত পক্ষী' (Birds of Paradise) প্রভৃতির মধ্যে বিধিমতে স্বয়ম্বরপ্রথা প্রচলিত। একস্থলে অনেকগুলি বিহঙ্গম একত্র হয়, অপরদিকে কতকগুলি পক্ষিণী সমবেত হয়। এক একটি পক্ষী তখন সভার মধ্যস্থলে আসিয়া আপনার পক্ষের সৌন্দর্য্য দেখাইতে থাকে, নানারূপ ক্রিয়া-কৌতুক প্রদর্শন করে। যাহার শক্তি উচ্চ দরের, যাহার বর্ণের জ্যোতিঃ সমধিক, একটি পক্ষিণী আসিয়া তাহার পার্শ্বে দণ্ডায়মান হয়। অমনি দু'জনে উড়িয়া গিয়া "উচ্চ বৃক্ষ শিরে বাঁধে নাড়, থাকে সুখে।"

জীবজগতের বিবাহ-পদ্ধতি বিচিত্র হইলেও শিক্ষাপ্রদ। কার্য্যের অবসরে আশে পাশে জীবজগতের ক্রিয়াকলাপ দেখিলে বেশ জ্ঞান ও আনন্দ লাভ করিতে পারা যায়।

শ্রীকেশবচন্দ্র গুপ্ত।

বিবেক-বাণী।

শিক্ষা।—বিদ্যাশিক্ষা কাকে বলি? বই পড়া? না,—নানাবিধ জ্ঞানার্জ্জন? তাও নয়। যে শিক্ষা দ্বারা ইচ্ছাশক্তির বেগ ও স্ফূর্ত্তি নিজের আয়ত্তাধীন ও সফলকাম হয়, তাহাই শিক্ষা।

শিক্ষাবলে আত্মপ্রত্যয়, আত্মপ্রত্যয় বলে অন্তর্নিহিত ব্রহ্ম জাগিয়া উঠিতেছেন।

ইচ্ছাশক্তি।—ইচ্ছাশক্তির যেথায় যত সফল বিকাশ, সেথায় সুখ তত অধিক, সে জীব তত বড়। ঈশ্বরে ইচ্ছাশক্তির পূর্ণ সফলতা, তাই তিনি সর্ব্বোচ্চ।

দুঃখ।—দুঃখ-কষ্ট তত্ত্বজ্ঞানের কষ্টিপাথর স্বরূপ।

যখন দুঃখ ও নিরাশার গভীর ভারে পৃথিবী অন্ধকারময় বোধ হয়, তখনই আমাদের অন্তশ্চক্ষু উন্মীলিত হয়। যখন বিপদ নৈরাশ্যের ঘনান্ধকারে চারিদিক একেবারে আচ্ছন্ন বোধ হয়, তখনই যেন সেই নিবিড় অন্ধকারের মধ্য হইতে হঠাৎ জ্যোতি ফুটিয়া উঠে, স্বপ্ন যেন ভাঙ্গিয়া যায় আর তখন আমরা প্রকৃতির মহান্ রহস্য সেই অনন্ত সত্তাকে দিব্যচক্ষে দেখিতে থাকি।

বড় গাছেই বড় ঝড় লাগে। যখন হৃদয়ের মধ্যে মহাযাতনা উপস্থিত হয়, চারিদিকে দুঃখের ঝড় উঠে, বোধ হয় যেন এ যাত্রা আলো দেখ্‌তে পাব না, যখন আশা-ভরসা প্রায় ছাড়ে-ছাড়ে, তখনই এই মহা আধ্যাত্মিক দুর্য্যোগের মধ্য হ'তে অন্তর্নিহিত ব্রহ্মজ্যোতি স্ফূর্ত্তি পায়। ক্ষীর ননী খেয়ে, তুলোর উপর শুয়ে, এক ফোঁটা চোখের জল কখনও না ফেলে কে কবে বড় হয়েছে, কার ব্রহ্ম কবে বিকসিত হয়েছেন? কাঁদতে ভয় পাও কেন? কাঁদ! কেঁদে কেঁদে তবে চোক সাফ হয়, তবে অন্তর্দৃষ্টি হয়, তবে আস্তে আস্তে মানুষ জন্তু গাছপালা দূর হ'য়ে তার জায়গায় সর্ব্বত্র ব্রহ্মদর্শন হয়।

নির্ভরতা।—দাঁড় চালাইতে চালাইতে শ্রম হইয়াছে, এক্ষণে তাঁহার উপর নির্ভর করিয়া কিছুক্ষণ বিশ্রাম কর; পূর্ব্বের বেগই নৌকাকে পারে লইয়া যাইবে।

বীর।—যে বীর, সেই ত্যাগ কর্‌তে পারে; যে কাপুরুষ, সে চাবুকের ভয়ে এক হাতে চোখ মুচ্‌ছে, আর এক হাতে দান কর্‌ছে; তার দানে কি ফল? বীরদিগেরই মুক্তি করতলগতা, কাপুরুষদিগের নহে।

ভারতের জাতীয় আদর্শ।—ত্যাগ ও সেবাই ভারতের জাতীয় আদর্শ—এই দুইটি বিষয়ে উহাকে উন্নত করুন, তাহা হইলে অবশিষ্ট যা কিছু আপনা আপনি উন্নত হইবে।

দাস।—দাসেরা শক্তি চায় অপরকে দাস রাখিবার জন্য।

শাক্ত।—শাক্ত শব্দের অর্থ জান? শাক্ত মানে মদ ভাঙ্‌ নয়, শাক্ত মানে যিনি ঈশ্বরকে সমস্ত জগতে বিরাজিত মহাশক্তি বলে জানেন, এবং সমগ্র স্ত্রী-জাতিতে সেই মহাশক্তির বিকাশ দেখেন।

ধর্ম্ম ও অধর্ম্ম।—যাতে উন্নতির বিঘ্ন করে বা পতনের সহায়তা করে, তাই পাপ বা অধর্ম্ম। আর যাতে তাঁর মত হবার সাহায্য করে, তাই ধর্ম্ম।

ভয়।—ভয় করিও না, সর্ব্বাপেক্ষা গুরুতর পাপ—ভয়।

প্রেম ও স্বার্থপরতা।—জীবনের অর্থ উন্নতি, উন্নতি অর্থে হৃদয়ের বিস্তার, আর হৃদয়ের বিস্তার ও প্রেম একই কথা। সুতরাং প্রেমই জীবন—উহাই একমাত্র জীবনগতি নিয়ামক।

আর স্বার্থপরতাই মৃত্যু; জীবন থাকিতেও ইহা মৃত্যু আর দেহাবসানেও এই স্বার্থপরতাই প্রকৃত মৃত্যুস্বরূপ! পরোপকারই জীবন, পরহিত চেষ্টার অভাবই মৃত্যু। বিস্তারই জীবন, সঙ্কীর্ণতাই মৃত্যু। যেখানে প্রেম, সেখানেই বিস্তার; যেখানে স্বার্থপরতা, সেখানেই সঙ্কোচ। অতএব প্রেমই জীবনের একমাত্র বিধি। স্বার্থত্যাগ অপেক্ষা জগতে বড় কিছু নাই।

চরিত্র-বল।—টাকায় কিছুই হয় না, নামেও হয় না, যশেও হয় না, বিদ্যায়ও কিছু হয় না, ভালবাসায় সব হয়—চরিত্রই বাধাবিঘ্নরূপ বজ্রদৃঢ় প্রাচীরের মধ্য দিয়া পথ করিয়া লইতে পারে।

পুরুষকার।—পুরুষকার কি জান? এই আত্মজ্ঞান লাভ কর্‌বই কর্‌ব; এতে যে বাধা-বিপদ সাম্‌নে পড়ে তা কাটাবই কাটাব। মা, বাপ, ভাই, বন্ধু, স্ত্রী, পুত্র মরে মরুক, এ দেহ থাকে থাক্‌, যায় যাক্‌, আমি কিছুতেই ফিরে

চাইব না, যতক্ষণ না, আমার আত্মদর্শন ঘটে,—এইরূপ সকল বিষয় উপেক্ষা ক'রে, এক মনে আপনার Goalএর দিকে অগ্রসর হইবার চেষ্টার নামই পুরুষকার। নতুবা অন্য পুরুষকার ত পশু পক্ষীরাও কর্‌ছে। মানুষ এ দেহ পেয়েছে সেই আত্মজ্ঞান লাভের জন্য।

আজ্ঞাবহতা।—সকল বিষয়ে আজ্ঞাবহতা শিক্ষা কর—কেবল নিজ ধর্ম্ম বিশ্বাস ছাড়া। পরস্পরের অধীন হইয়া চলা ব্যতীত কখন শক্তির কেন্দ্রীকরণ হইতে পারে না, আর এইরূপ কেন্দ্রীভূত শক্তি ব্যতীত কোন বড় কাজ হইতে পারে না।

নেতার কর্ত্তব্য।—নেতৃত্ব-কার্য্য করিবার সময় দাস ভাবাপন্ন হও, নিঃস্বার্থপর হও! আর একজন বন্ধু অপর বন্ধুকে গোপনে নিন্দা করিতেছ, শুনিও না। অনন্ত ধৈর্য্য ধরিয়া থাক,—সিদ্ধি তোমার করতলে।

আচার-ধর্ম্ম।—আচারাদির উদ্দেশ্য কি জান, মনকে একনিষ্ঠ করা। এক বিষয়ে নিষ্ঠা হ'লে—মনের একাগ্রতা হয়, অর্থাৎ মনের অন্য বৃত্তিগুলি নিবে গিয়ে, এক বিষয়ে একতানতা হয়। অনেকের বাহ্যিক আচার বা বিধি নিষেধের জালেই সব সময়টা কেটে যায়, আত্মচিন্তা করা হয় না। খেই ছাড়িয়ে গাছের ডাল-পালায় বেড়িয়ে কি হবে? দিনরাত বিধি নিষেধের গণ্ডীর মধ্যে থাক্‌লে, আত্মার প্রসারতা হবে কি করে? যে যতটা আত্মানুভূতি কত্তে পেরেছে, তার বিধি-নিষেধ ততই কমে যায়।

অনুভূতি।—মূল কথা অনুভূতি। উহাই জান্‌বি Goal; মত—পথ, রাস্তা মাত্র। কার কতটা ত্যাগ হয়েছে, এইটি জান্‌বি উন্নতির Test। কাম-কাঞ্চনের আসক্তি যেখানে দেখ্‌বি কম্‌তি—সে যে মতের—যে পক্ষের লোক হোক্ না কেন—তার জান্‌বি শক্তি জাগ্রত হচ্ছে। তার জান্‌বি আত্মানুভূতির দোর খুলে গেছে। আর হাজার আচার মেনে চল, হাজার শ্লোক আওড়াও, তবু যদি ত্যাগের ভাব না এসে থাকে ত জান্‌বি, জীবন বৃথা।

ভগবৎ-কৃপা।—কৃপা মানে কি জানিস্? যিনি আত্ম-সাক্ষাৎকার করেছেন, তাঁর ভিতরে একটা মহাশক্তি খেলে। তাঁকে centre (কেন্দ্র) করে, কিয়দ্দূর পর্য্যন্ত radius (ব্যাসার্দ্ধ) ল'য়ে যে একটা circle (বৃত্ত) হয়, সেই circleর (বৃত্তের) ভিতর যারা এসে পড়ে, তা'রা ঐ আত্মবিৎ সাধুর ভাবে অনুপ্রাণিত হয়, অর্থাৎ ঐ সাধুর ভাবে তা'রা অভিভূত হ'য়ে পড়ে। সুতরাং সাধন ভজন না করিয়াও তা'রা অপূর্ব্ব আধ্যাত্মিক ফলের অধিকারী হয়।

বন্ধন।—চির ভিখারীর ত্যাগে কি মাহাত্ম্য? ইন্দ্রিয়হীনের ইন্দ্রিয় সংযমে কি পুণ্য? ভাবহীন, হৃদয়হীন, উচ্চ আশাহীনের সমাজের অস্তিত্ব নাস্তিত্ব জ্ঞান-হীনের আবার আত্মোৎসর্গ কি? বলপূর্ব্বক সতীদাহে কি সতীত্বের বিকাশ? কুসংস্কার শিখাইয়া পুণ্য করানই বা কেন? আমি বলি, বন্ধন খোল, যতদূর পার বন্ধন খোল। কাদা দিয়ে কি কাদা ধোয়া যায়? বন্ধনের দ্বারা কি বন্ধন কাটে?

জীবসেবা ও প্রেম।—তিনি সমষ্টিরূপে সকলের প্রত্যক্ষ। অতএব যখন জীব ও ঈশ্বর স্বরূপতঃ অভিন্ন, তখন জীবের সেবা ও ঈশ্বরে প্রেম দুই একই। বিশেষ এই, জীবকে জীব-বুদ্ধিতে যে সেবা করা হয়, তাহা দয়া, প্রেম নহে, আর আত্মবুদ্ধিতে যে জীবের সেবা করা হয়, তাহা প্রেম।

প্রত্যক্ষ করিয়াছি যে, সদুদ্দেশ্য, অকপটতা ও অনন্ত প্রেম বিশ্ববিজয় করিতে সক্ষম। উক্ত গুণশালী একজন কোটী কোটী কপট ও নিষ্ঠুরের দুর্ব্বুদ্ধিনাশ করিতে সক্ষম।

শ্রীঅমরেন্দ্রনাথ রায়।

পারস্যের রাজপ্রাসাদ।

ভারতবর্ষে মোগল সাম্রাজ্যের অভ্যুদয়ের সময় রাজপ্রাসাদে যেমন হীরামুক্তা মণি মাণিক্যের সমাবেশ ছিল, ইংরাজ পর্য্যটকদিগের বর্ণনা পাঠে বুঝিতে পারা যায় যে, পারস্যের রাজপ্রাসাদে আজিও তেমনি জাঁকজমক, তেমনি বহুমূল্য হীরা জহরত মাণিক্য মরকতে সভাগৃহ ঝলসিত।

প্রাসাদের তোরণ অতিক্রম করিলেই এক নয়নরঞ্জক প্রমদোদ্যান। বড় বড় দেবদারুর সারি, মখমলের মত হরিত শষ্পাসন, সুবাসিত বিথীকা, স্নিগ্ধ শ্যাম উপবন—সদাই বিহঙ্গম কাকলীতে মুখরিত। ঝির ঝির জলের স্রোত চারিদিক দিয়া বহিয়া একটি ক্ষুদ্র সরোবরে পড়িতেছে। উদ্যানের চতুর্দ্দিকে অভ্রভেদী অট্টালিকা—নানাবর্ণের বিকাশ, অদ্ভুত শিল্প ও স্থাপত্যের পরিচয়।

দ্বিতীয় তোরণ পার হইলে প্রাসাদের রাজসভায় উঠিবার প্রধান সোপান।

সোপানের উভয় পার্শ্বের প্রাচীরে ছোট ছোট মুকুর সন্নিবেশিত। অনেকটা আমাদের আগ্রা প্রাসাদের শিষমহলের মত। সমগ্র প্রাচীর ঝিক্ ঝিক্ করিয়া জ্বলিতেছে—যেন উজ্জ্বল রজত খচিত। কিন্তু এই প্রাচীন শিল্পের মাঝে সোপানাবলীতে অর্দ্ধনগ্ন কতকগুলা বিলাতী যুবতীর প্রস্তর মূর্ত্তি রক্ষিত হইয়াছে। সাহেবেরা বলেন, এখানে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের মিলনে একটু সামঞ্জস্যের অভাব হইয়াছে—প্রাচ্যের মৌলিক শিল্পের শোভা যুবতী মূর্ত্তিতে বর্দ্ধিত হয় নাই।

উপরে উঠিয়াই মুকুর-গৃহ। এ গৃহের চতুর্দ্দিকের প্রাচীর, এমন কি ছাদ অবধি আরসী আবরিত। দুই চারিখানি মুকুর নহে, অনেক মুকুর নানাভাবে সজ্জিত। ঘরে ঢুকিলেই দেখিতে পাওয়া যায় দর্শক নানা রূপে নানা স্থানে ঘুরিতেছে। উপর দিকে চাহিলে দেখিবে মক্ষিকার মত ছাদের উপর ঘুরিতেছে, যে দিকে চাহিবে প্রতিবিম্বের প্রতিবিম্বে এক লোকের অন্ততঃ চারি শত মূর্ত্তি প্রতিফলিত হইবে। পারস্য-সম্রাটের মুকুর গৃহে ঢুকিলে চোখে ধাঁধাঁ লাগে, বিস্মিত দর্শককে দেখিয়া সশস্ত্র প্রহরী আদব কায়দা মত লম্বা সেলাম করে বটে, কিন্তু তাহার অবস্থা দেখিয়া মনে মনে হাসে।

মুকুর-গৃহে কতকগুলা কলের পুতুল আছে। ইংরাজ পর্য্যটকদিগের সে গুলা ভাল লাগে না। তাহারা বলে সে গুলা ছেলে মানুষী। পাশ্চাত্য সম্রাটদিগের গৃহসজ্জা হইলে সে গুলা বিজ্ঞান প্রীতি পরিচায়ক বলিয়া পরিগণিত হইত। পাশ্চাত্যবাসী দেশ-ভ্রমণে বাহির হইলে পরের দেশ অন্যচক্ষে দেখে। রসিক মার্কটোয়েন বা ক্লেমেন্স সাহেবের সুখপাঠ্য ভ্রমণ বৃত্তান্ত পড়িবার সময় হাসিতে হয় বটে, কিন্তু শেষে একথা না ভাবিয়া থাকিতে পারা যায় না। সকল পর্য্যটকই প্রায় তাঁহার মত—অনেকেই অনাবিল মন লইয়া পরের দেশ দেখিতে যান না।

বলিতেছিলাম মুকুর-গৃহে অনেক কলের পুতুল আছে। কল টিপিলে কাফ্রি মূর্ত্তি বেহালা বাজায়, সুরঙ্গের ভিতর রেলের ট্রেণ প্রবেশ করে। একটি প্রতিকৃতি সমুদ্র আছে, দম দিলে তাহাতে লহর উঠে। একটা চীনামূর্ত্তির মাথায় হাত দিলে সে মস্তকাবনত করিয়া জিহ্বা বাহির করে। এইরূপ নানা রকমের পুতুল আছে—শিল্পির উন্নতির জন্য কারীগরকে উৎসাহিত করিবার জন্য এইগুলির দ্বারা ইরাণাধিপতি নিজ প্রাসাদ সজ্জিত করিয়াছেন। এ গৃহে অনেক চিত্র আছে—বিলাতী, ফরাসী চিত্রকর অঙ্কিত। সে গুলা প্রথম শ্রেণীর না হইলেও সুন্দর, চিত্তরঞ্জক।

বিলাতী রকমের সজ্জিত, মোটা মখমলের পরদা আবরিত, রেশমী গালিচা বিস্তৃত, বহুমূল্য কৌচ কুরসী মণ্ডিত গৃহেরও পারস্য রাজপ্রাসাদে অভাব নাই।

সভাগৃহের সৌন্দর্য্য, সভাগৃহের জাঁক জমক উপলব্ধি করা কঠিন। এ গৃহে আমাদের ময়ূর সিংহাসন আছে। হীরা মুক্তা, মরকত মাণিক্যে, সুবর্ণ শোভায় এ গৃহ কুবেরের ধনাগার বলিয়া ধারণা হয়। গৃহতলে বহুমূল্য রেশমী গালিচা পাতা, চারিদিকে সুবর্ণ কেদারা, দুই একখানি নয়—পঞ্চাশখানি সোণার চেয়ার। কেদারার পৃষ্ঠ ও হাতল মুক্তা, ফিরোজা মাণিক্য ও মরকতের কারুকার্য্য শোভিত। এক একখানি চৌকীর মূল্য অন্ততঃ এক সহস্র পাউণ্ড—পঞ্চদশ সহস্র মুদ্রা! যে গৃহে ময়ূর সিংহাসন বিদ্যমান, সে গৃহে পঞ্চাশখানা এরূপ চেয়ার না রাখিলে চলিবে কেন?

ময়ূর সিংহাসন একখানি বৃহৎ খট্টার মত। ইহা সপ্তপদবিশিষ্ট, সুবর্ণ নির্ম্মিত—হাজার হাজার বহুমূল্য রত্ন ইহাতে সন্নিবেশিত। পৃথিবীর সাতটি অদ্ভুত পদার্থের ইহা অন্যতম। ইহার দুইটি সোপান মণিমুক্তায় ঝলসিত—ইহার গাত্রে বহুমূল্য রত্নের সারি—কেবল কতকগুলা রত্নের সমাবেশ নহে—প্রত্যেকটি সুচারুরূপে যথাস্থানে সন্নিবেশিত। সিংহাসনের পৃষ্ঠদেশ ময়ূরপুচ্ছের অনুকরণে নির্ম্মিত, অসংখ্য প্রস্তরে উহার বর্ণ বিন্যস্ত। দুই পার্শ্বে দুইটি ছোট ছোট শিখী চিত্র আছে। অত মণিকাঞ্চনের চাকচিক্যে নয়ন ঝলসিত হয়। অনেকেই ইহার মূল্য নিরূপণ করিতে চেষ্টা করে। কেহ বলে ইহার মূল্য চারি কোটী টাকা, কেহ বলে তিন কোটী মুদ্রা, কোন কোন পাগলে আবার পাই পয়সা অবধি ইহার দাম কসিয়া দেয়। আমরা বলি ইহা অমূল্য; ইহার কোনও পদার্থের সহিত তুলনা হইতে পারে না।

বলা বাহুল্য, আমাদের দিল্লীশ্বর সাহজাহান বাদসাহ সাত বৎসরের পরিশ্রমে নিজে তত্ত্বাবধান করিয়া তক্ততৌস নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। ময়ূর সিংহাসনের প্রধান শিল্পী ছিলেন বে বদল খাঁ। ১০৪৪ হিঃ অব্দে ঈদল্ ফিতরের শুভ দিনে সম্রাট সাহজাহান তাঁহার সাধের সিংহাসনে প্রথম উপবেশন করেন। সিংহাসনে তাঁহার নামাঙ্কিত ছিল এবং হাজি মহম্মদজান রচিত একটি স্তব লিখিত ছিল। সম্রাটের আদেশক্রমে এই অপূর্ব্ব সিংহাসনখানি লম্বে তিন গজ, প্রস্থে আড়াই গজ এবং উচ্চে পাঁচ গজ পরিমিত হইয়াছিল। পারস্যের ভূপতি নাদীর সাহ ১৭৩৯ খৃঃ অব্দে ভারতবর্ষ আক্রমণ করেন। তাঁহার শুভাগমনে ভারতবর্ষের

অনেক স্থল শ্মশানে পরিণত হইয়াছিল। দিল্লি সহরে তিনি রক্তের স্রোত বহাইয়াছিলেন—সেই হাহাকারের অমঙ্গল ধ্বনিতে তিনি ভারতের সিংহাসন খানি নিজ দেশে লইয়া গিয়াছিলেন।

পারস্যের এই সভাগৃহে অনেক আসবাব আছে। পারস্যাধিপতি ইউরোপ ভ্রমণ করিতে গিয়া কতকগুলা বিলাতী গৃহসজ্জা আনিয়া এই ময়ূর সিংহাসনের গৃহে রাখিয়াছেন। বড় বিসদৃশ দৃশ্য—তাজমহলের পার্শ্বেই জীর্ণকুটীর, নীলাম্বুনিধির পার্শ্বে আবিল তড়াগ। এই গৃহে বড় বড় পাত্রে মুক্তা আছে, অসংখ্য মুক্তা। একটি স্বর্ণ নির্ম্মিত ভূগোলক আছে। এই রত্ন খচিত হৈম গোলকের মূল্য দশ হাজার পাউণ্ড। ইহাতে সমুদ্রগুলি মরকতে অঙ্কিত; পারস্যদেশ ফিরোজা অঙ্কিত, আফ্রিকা লালবর্ণ—মাণিক্য মণ্ডিত, ভারতবর্ষ যামিনা প্রস্তর বা এমিথিষ্টের, ইংলণ্ড ও ফ্রান্স হীরকের। ইহা দেখিবার জিনিস—বর্ণনা শুনিলে প্রাণে পিপাসার উদ্রেক হয় মাত্র।

সিংহাসন গৃহে অনেক বহুমূল্য মুকুট আছে, শিরস্ত্রাণ আছে, অলঙ্কার আছে; প্রত্যেকটিই দেখিবার জিনিস, প্রত্যেকটির কারুকার্য্য অসাধারণ। এই সকল অলঙ্কারাদির মূল্য পাঁচ কোটী পাউণ্ড।

পারস্যের সাহ্‌কে সময়ে সময়ে এই সকল অলঙ্কার পরিতে হয়। ইহাদিগের গুরুত্বের কথা স্মরণ হইলে মনে হয় বাদসাহ হওয়া বড় কঠিন ব্যাপার। সম্রাট নসিরুদ্দিনের মৃত্যুর পর তাঁহার কুমার মজফরউদ্দিন যখন সিংহাসনাধিরোহণ করেন, সে দিনটা বড় গরম ছিল। সিংহাসনাধিরোহণ করিতে গেলে নানা প্রকার উৎসবে যোগদান করিতে হয়। সম্রাট গলদ্‌ঘর্ম্ম হইয়া উজীরদিগকে নাকি জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন—"মস্তকের এ বোঝাটা নামাইলে হয় না?"

বাদসাহ প্রথম দিনে মাথার মুকুট খুলিবেন? হ'লেই বা তাঁহার রক্ত মাংসের শরীর, হ'লেই বা মুকুট একটা বোঝার মত ভারী! সর্ব্বনাশ! জাঁহাপনা যেন অমন অমঙ্গলের কথা মুখে না আনেন। প্রহারের ভয়ে যেমন দুষ্ট ছেলে জুতা জামা খুলিয়া রৌদ্রে ছুটাছুটি করিতে পারে না, ইরাণাধিপতিকে তেমনি অনিচ্ছাসত্ত্বেও মুকুট ধারণ করিতে হইল।

সম্রাট সাধারণতঃ যে টুপি বা কুলাহ মাথায় দিয়া থাকেন পূর্ব্বে তাহা মণি-মুক্তা বিভূষিত ছিল। একদিন বিরক্ত হইয়া নাকি সাহ মজফরউদ্দীন টুপিটি গৃহের কোণে ফেলিয়া দিয়া বলিয়াছিলেন—"এ তো বিষম বোঝা! মাথাটা ফাটিয়া গেলে আর তোমাদের উপর রাজত্ব করিব কেমন করিয়া?" সভাসদেরা

অনুগ্রহ করিয়া তাঁহাকে সাধারণ লোকের মত কুলাহ পরিধান করিতে দিয়াছিলেন। তবে পারস্যের বা তুর্কীর সম্রাট আমাদের সম্রাটের মত সাধারণ পোষাক পরিচ্ছদ পরিতে পান না। বার মাস ভারতবর্ষে থাকিলে কংগ্রেস ও মোস্লেম লিগ আবেদন করিয়া তাঁহাকে কি পোষাক পরাইত কে বলিতে পারে। ইংরাজদিগের রুচি বিভিন্ন। প্রাচ্যের লোক একটু জাঁকজমক ভালবাসে।

পারস্যের রাজপ্রাসাদে তক্তই মর্ম্মর নামক মারবেল পাথরের একখানি সিংহাসন আছে। এখানিও আয়তনে বেশ বড়। ইহাও নয়নরঞ্জক—তবে যে প্রাসাদে ময়ূর সিংহাসন আছে সে প্রাসাদে ইহার সৌন্দর্য্য থাকিবে কেমন করিয়া!

পারস্য গোলাপের দেশ। তিহারাণের এই রাজপ্রাসাদের বাগানে নানাজাতীয় গোলাপের বিথীকা আছে। প্রাসাদের উদ্যান বেশ সুরক্ষিত; সাহানসাহ স্বয়ং বাগানের তত্ত্বাবধান করেন।

শ্রীকেশবচন্দ্র গুপ্ত।

প্রাচীন ভারতে অর্ণবপোত নির্ম্মাণ।

কতিপয় সংস্কৃত ও পালি সাহিত্য-পাঠে জানা যায় যে, প্রাচীন ভারতবাসী সমুদ্র-পথে বাণিজ্য করিতেন। দুঃখের বিষয়, উপরি উক্ত বিষয়ে সাহিত্যে অতি অল্প পরিমাণে উদাহরণ দৃষ্ট হয়। সংস্কৃত কলেজে "যুক্তি কল্পদ্রুম" নামে একখানি পুস্তকে জাহাজের বিভিন্ন শ্রেণী ও আকৃতি এবং যে যে উপাদানে জাহাজ নির্ম্মিত হইত সেই সমস্ত বিষয়ের বর্ণনা আছে। এই পুস্তকখানি ভোজ নরপতি কর্ত্তৃক সঙ্কলিত বলিয়া অনেকের বিশ্বাস। ইহা প্রাচীন ভারতীয় অশ্ব, হস্তী, রথ, পতাকা, ছত্র, আসন তরবারি, এবং অর্ণব পোতাদির বর্ণনায় পূর্ণ। এই পুস্তকে ভোজ নামক একজন গ্রন্থকারের মতামত অনেক স্থলে উদ্ধৃত হইয়াছে বলিয়া এই গ্রন্থখানি ধারাধিপতি ভোজরাজের সঙ্কলিত বলিয়া প্রকাশ।

কোন্ কোন্ কাষ্ঠে জাহাজ নির্ম্মাণ করিলে জাহাজ দৃঢ় ও দীর্ঘ কাল স্থায়ী হয়, প্রাচীন পোত-নির্ম্মাতাগণ তাহা বিশেষরূপে জানিতেন। "বৃক্ষ আয়ুর্ব্বেদ" শাস্ত্র মতে জাহাজ নির্ম্মাণ বিষয়ে চারি প্রকার কাষ্ঠ প্রশস্ত। এই চারিপ্রকার

কাষ্ঠের মধ্যে ব্রাহ্মণ শ্রেণীর কাষ্ঠ সর্ব্ব প্রধান। এই ব্রাহ্মণকাষ্ঠ লঘু ও কোমল, কাজেই এক টুকরার সহিত অপর টুকরা কাষ্ঠ সংযোগ করা বড় অনায়াসসাধ্য। দ্বিতীয় ক্ষত্রিয় শ্রেণীর কাষ্ঠ। এই শ্রেণীর কাষ্ঠ হাল্‌কা বটে, কিন্তু শক্ত হওয়ায় একখণ্ডের সহিত আর অপর খণ্ড সংযোগ করা যায় না। তৃতীয় বৈশ্যশ্রেণীর কাষ্ঠ। এই শ্রেণীর কাষ্ঠ কোমল বটে, কিন্তু ভারী। চতুর্থ শূদ্রশ্রেণীর কাষ্ঠ; এ শ্রেণীর কাষ্ঠ যেমন শক্ত তেমনই ভারী।

"লঘু যৎ কোমলং কাষ্ঠং সুঘটং ব্রহ্মজাতি তৎ।
দৃঢ়াঙ্গং লঘু যৎ কাষ্ঠমঘটং ক্ষত্রজাতি তৎ॥
কোমলং গুরু যৎ কাষ্ঠং বৈশ্যজাতি তদুচ্যতে।
দৃঢ়াঙ্গং গুরু যৎ কাষ্ঠং শূদ্রজাতি তদুচ্যতে॥"

ভোজের মতে ক্ষত্রিয় শ্রেণীস্থ কাষ্ঠ দ্বারা নির্ম্মিত জাহাজ ধন ও সুখের উৎস।

"ক্ষত্রিয় কাষ্ঠৈর্ঘটিতা ভোজমতে সুসম্পদং নৌকা।"

এই ক্ষত্রিয় কাষ্ঠদ্বারা নির্ম্মিত জাহাজ উত্তাল-তরঙ্গমালা সঙ্কুল মহাজলধিবক্ষে গমনের উপযোগী ও নিরাপদ বলিয়া উক্ত হইয়াছে।

অন্য কাষ্ঠদ্বারা নির্ম্মিত জাহাজ অস্থায়ী, অল্পদিনে পচিয়া যায় এবং সামান্য মাত্র জলাভিঘাতে নিমজ্জিত হয়।

বিভিন্ন জাতিদ্বয় কাষ্ঠজাতা ন শ্রেয়সে নাপি সুখায় নৌকা।
নৈষা চিরং তিষ্ঠতি পচ্যতে চ বিভিদ্যতে সরিতি মজ্জতে চ॥

জাহাজ-নির্ম্মাণ সম্বন্ধে ভোজের মত এই যে, সমুদ্রগামী জাহাজের তলদেশের কাষ্ঠ কদাচ লৌহ দ্বারা সংযুক্ত করা কর্ত্তব্য নয়। কারণ তলদেশস্থ লৌহ চুম্বক পর্ব্বত (Magnetic rock) কর্ত্তৃক আকৃষ্ট হইয়া জাহাজকে বিপদগ্রস্ত করিতে পারে। সুতরাং লৌহ ভিন্ন অন্য ধাতু দ্বারা জাহাজের তলদেশস্থ কাষ্ঠ পরস্পর সংযুক্ত করা শ্রেয়ঃ।

"ন সিন্ধু গাদ্যার্হতি লৌহবন্ধং তল্লোহকান্তৈর্হ্রিয়তে হি লৌহম্।
বিপদ্যতে তেন জলেষু নৌকা গুণেন বন্ধং নিজগাদ ভোজঃ॥"

'যুক্তি কল্পদ্রুমে' জাহাজের গঠনাদি সম্বন্ধে কয়েকটি যুক্তিযুক্ত কথার সমাবেশ আছে। জাহাজ সমূহ প্রথমতঃ দুই শ্রেণীতে বিভক্ত। যথা (১) সামান্য (২) বিশেষ। প্রথমোক্ত জাহাজসমূহ কেবল নদীতেই গমনাগমন করে এবং শেষোক্ত জাহাজ কেবল সমুদ্রগামী।

এই সামান্য শ্রেণীর জাহাজ আবার দশভাগে বিভক্ত। যথা—(১) ক্ষুদ্র, (২) মধ্যম (৩) ভীম (৪) চপলা (৫) পটলা (৬) ভয়া (৭) দীর্ঘা (৮) পত্রপুটা

(৯) গর্ভীরা (১০) মন্থরা। নিম্নে এই দশ জাতীয় নৌকার আকৃতির বর্ণনা উদ্ধৃত করা গেল।

"রাজহস্তমিতা যামা তৎ পাদ পরিণাহিনী।
তাবদেবোন্নতা নৌকা ক্ষুদ্রেতি গদিতা বুধৈঃ॥
অতঃ সার্দ্ধমিত যামা তদর্দ্ধ পরিণাহিনী।
ত্রিভাগেনোত্থিতা নৌকা মধ্যমেতি প্রচক্ষ্যতে॥
ক্ষুদ্রাথ মধ্যমা ভীমা চপলা পটলা ভয়া।
দীর্ঘা পত্র পুটা চৈব গর্ভরা মন্থরা তথা॥
নৌকাদশ কমিত্যুক্তং রাজহস্তৈবমুক্রমম্
একৈক বৃদ্ধৈঃ সার্দ্ধৈশ্চ বিজানীয়াদ্ দ্বয়ং দ্বয়ম্।
উন্নতিশ্চ প্রবীণা চ হস্তাদর্দ্ধাং শলক্ষিতা
অত্র ভীমা ভয়া চৈব গর্ভরা চা শুভপ্রদা॥"

উল্লিখিত দশ প্রকার জাহাজের মধ্যে ভীমা, ভয়া এবং গর্ভীরা জাতীয়া জাহাজ দুর্ভাগ্য সৃষ্টি করে, কারণ এই তিন শ্রেণীর জাহাজ জলে স্থির ভাবে দাঁড়াইতে পারে না।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে বিশেষ শ্রেণীর জাহাজসমূহ সমুদ্রগামী।

"মন্থরা-পরতো যস্ত তাসামেবাম্বুধৌ গতিঃ।"

বিশেষ শ্রেণীস্থ জাহাজ প্রধানতঃ দ্বিভাগে বিভক্ত।

"দীর্ঘা চৈবন্নোতা চেতি বিশেষে দ্বিবিধা ভিদা।"

দীর্ঘা শ্রেণীর জাহাজ দশ ও উন্নতা শ্রেণীর জাহাজ পাঁচ ভাগে বিভক্ত। যথা —(১) দীর্ঘিকা (২) তারিণী (৩) লোলা (৪) গত্বরা (৫) গামিনী (৬) তরী (৭) জঙ্ঘলা (৮) প্লাবিনী (৯) ধারিণী (১০) বেগিনী। নিম্নে এই দশ প্রকার জাহাজের আকৃতি বর্ণনার্থে শ্লোক উদ্ধৃত করা গেল।

"রাজহস্তদ্বয়যামা অষ্টাংশ পরিণাহিনী।
নৌকেয়ং দীর্ঘিকা নাম দশাঙ্গেনোন্নতাপি চ॥
দীর্ঘিকা তরণির্লোলা গত্বরা গামিনী তরিঃ।
জঙ্ঘালা প্লাবিনী চৈব ধারিণী বেগিনী তথা॥
রাজহস্তৈকৈকবৃদ্ধা নৌকানামানি বৈ দশ।
উন্নতি পরিণাহশ্চ দশাষ্টাংশ-মিতৌ ক্রমাৎ॥"

এই দশ প্রকার জাহাজের মধ্যে লোলা, গামিনী এবং প্লাবিনী জাহাজ দুঃখোৎপাদক। যথা—

"অত্র লোলা গামিনী চ প্লাবিনী দুঃখদা ভবেৎ।
দীর্ঘায়া মানমারভ্য যাবত্তবতি গত্বরি॥"

উন্নতা শ্রেণীর জাহাজ (১) উর্দ্ধভ, (২) অনুর্দ্ধভ, (৩) স্বর্ণমুখী, (৪) গর্ভিণী, (৫) মন্থরা এই পাঁচ ভাগে বিভক্ত। নিম্নে এই পাঁচ প্রকার জাহাজের আকৃতি-গত বর্ণনা উদ্ধৃত করা গেল। যথা—

"রাজহস্তদ্বয়মিতা তাবৎ প্রসরণোন্নতা।
ইয় মুর্দ্ধ ভিদ নৌকা ক্ষেমায় পৃথিবী ভুজাম্॥
উর্দ্ধনুর্দ্ধা স্বর্ণমুখী গর্ভিনী মন্থরা তথা
রাজহস্তৈককবৃদ্ধা নাম পঞ্চত্রয়ং ভবেৎ।
অত্রানূর্দ্ধা গর্ভিনী চ নিন্দিতং নামযুগ্মকম্।
মন্থরায়াঃ পরা যাস্তু তা শুভায় যথোত্তরম্॥"

যুক্তিকল্পতরুতে জাহাজ সাজাইবার প্রণালী সম্বন্ধেও অনেক কথার উল্লেখ আছে। যুক্তি কল্পের মতে চারি প্রকারের ধাতু জাহাজ সাজাইবার পক্ষে উত্তম। যথা—(১) সুবর্ণ (২) রজত (৩) তাম্র (৪) এই তিন ধাতুর মিশ্রজনিত উৎপন্ন ধাতু। চারি প্রকারের জাহাজের জন্য চারি প্রকারের রং বিহিত হইয়াছে। চারিটী মাস্তল সমন্বিত জাহাজ শ্বেত বর্ণে রঞ্জিত করিতে হইবে, তিনটী মাস্তল যুক্ত জাহাজ লোহিতবর্ণে, দুইটী মাস্তল বিশিষ্ট জাহাজ পীতবর্ণে এবং এক মাস্তল সর্ব্বস্ব জাহাজ নীলবর্ণে চিত্রিত করা কর্ত্তব্য। জাহাজের অগ্রভাগে সিংহ, মহিষ, ভুজঙ্গ, হস্তী, ব্যাঘ্র, পক্ষী প্রভৃতির মস্তক স্থাপন এবং জাহাজের অগ্রভাগে সুবর্ণ নির্ম্মিত, মুক্তা-খচিত নির্ম্মাল্য বিজড়িত করণ, জাহাজ সাজাইবার পক্ষে উত্তম প্রণালী বলিয়া যুক্তিকল্প কর্ত্তৃক বিহিত হইয়াছে। যথা—

বাত্বা দীনামতো বক্ষ্যে নির্ণয়ং তরি সংশ্রয়ম্।
কনকং রজতং তাম্রং ত্রিতয়ং বা যথাক্রমম্॥
ব্রহ্মাদিভিঃ পরিণাস্ত নৌকা চিত্রণ কর্ম্মণি।
চতুঃ শৃঙ্গা ত্রিশৃঙ্গাভা দ্বিশৃঙ্গা চৈকশৃঙ্গিনী।
সিতরক্তা পীতনীলবর্ণান্ কুর্য্যাদ্ যথাক্রমম্॥
কেশরী মহিষী নাগো দ্বিরদো ব্যাঘ্রো এব চ।
পক্ষী ভেক মনুষ্যশ্চ এতেষাং বদনাষ্টকম্।
নাবাং মুখে পরিন্যস্ত আদিত্যাদি দশাভুবাম্
নৌকায় মণি বিন্যাসো বিজ্ঞেয়ো নবদন্তবৎ।
মুক্তাস্তবকৈর্যুক্তা নৌকা স্যাৎ সর্ব্বতো ভদ্রা॥

জাহাজের প্রকোষ্ঠ (cabin) সম্বন্ধেও বড় হৃদয়গ্রাহী বর্ণনা আছে। প্রকোষ্ঠভেদে জাহাজ সকল তিন শ্রেণীতে বিভক্ত। যথা—

"সগৃহা ত্রিবিধা প্রোক্তা সর্ব্বমধ্যাগ্র মন্দিরা।"

ইহাদের মধ্যে যে জাহাজের প্রকোষ্ঠ সম্মুখ হইতে পশ্চাৎ পর্য্যন্ত অবস্থিত তাহাকে সর্ব্বমন্দিরা জাহাজ বলে। এই সর্ব্বমন্দিরা জাহাজে পুরাকালে রাজকীয় ধনরত্ন, অশ্ব ও স্ত্রীলোক গমনাগমন করিত। যথা—

"সর্ব্বতো মন্দিরং যত্র সা জ্ঞেয়া সর্ব্বমন্দিরা।
রাজ্ঞাং কেশাশ্চ নারীনাং যানমত্র প্রশস্যতে॥"

দ্বিতীয়তঃ মধ্যমন্দির জাহাজ। এই জাহাজের ঠিক্ মধ্যস্থলে প্রকোষ্ঠ স্থাপিত। এই শ্রেণীস্থ জাহাজে চড়িয়া প্রাচীন নৃপতিবৃন্দ প্রাতঃ ও সান্ধ্য জলবিহার করিতেন। বর্ষাকালে এই শ্রেণীর জাহাজ বিশেষ প্রয়োজনে লাগিত।

"মধ্যতো মন্দিরং যত্র সা জ্ঞেয়া মধ্যমন্দিরা।
রাজ্ঞাং বিলাস যাত্রাদি বর্ষাসু চ প্রশস্যতে॥"

তৃতীয়তঃ অগ্রমন্দিরা। এই জাহাজের সম্মুখভাগে প্রকোষ্ঠ অবস্থিত। এই শ্রেণীস্থ জাহাজ দীর্ঘ সমুদ্র যাত্রা ও জলযুদ্ধে ব্যবহৃত হইত। যথা—

"অগ্রতো মন্দিরং যত্র সা জ্ঞেয়াত্বগ্রমন্দিরা।
চিরপ্রবাস যাত্রায়াং রণে কালে ঘনাত্যয়ে॥"

এই শ্রেণীর জাহাজেই ঋষি তুগ্র দূরদেশে শত্রু দমনার্থে তাঁহার পুত্রকে প্রেরণ করিয়াছিলেন। আবার এই শ্রেণীস্থ জাহাজেই পাণ্ডব ভ্রাতৃগণ বিদুরের পরামর্শে সাক্ষাৎ মৃত্যুর হাত হইতে উদ্ধার পাইবার জন্য পলায়ন করিয়াছিলেন যথা—

"ততঃ প্রবাসিতো বিদ্বান্ বিদুরেণ নরস্তদা
পার্থানাং দর্শয়ামাস মনোমারুত গামিনীম্
সর্ব্ববাত সহাং নাবং যন্ত্রযুক্তাং পতাকিনীম্
শিবে ভাগীরথী তীরে নরৈ বিশ্রাম্ভিভিঃ কৃতাম্।"

মহাভারত, আদিপর্ব্ব।

এই শ্রেণীর জাহাজে করিয়াই বাঙ্গালীরা দিগ্বিজয়ী রঘুর ক্ষমতার প্রতিরোধ করিয়াছিলেন। যথা—

"বঙ্গানুৎখায় তরসা নেতা নৌসাধনোদ্যতান্।
নিচখান জয়স্তম্ভং গঙ্গাস্রোতন্তরেষু চ॥"—(রঘুবংশ)

সংস্কৃত সাহিত্যের ন্যায় পালি সাহিত্যেও প্রাচীন ভারতের সমুদ্রযাত্রা ও সমুদ্র-পথে বাণিজ্যের উল্লেখ দেখিতে পাই। পালি গ্রন্থ "রাজাবলী" বলেন, যে জাহাজে যুবরাজ বিজয়সিংহ ও তাঁহার অনুচরবর্গ, সিংহবাহু রাজা কর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়াছিলেন, সে জাহাজ খানিতে সাতশত আরোহীর স্থান সঙ্কুলান হইত।*

* Upham's Sacred Books of Ceylon II. 128, 168.

ফনকফটকে একখানি জাহাজের উল্লেখ আছে, সেই জাহাজখানি স্বয়ং বুদ্ধদেব ও সাতশত আরোহী সহ ভঙ্গ হইয়াছিল।

বুদ্ধদেব বরোচ হইতে সপ্তরত্ন সমুদ্রাভিমুখে যে জাহাজে যাত্রা করিয়াছিলেন সে জাহাজে সাতশত বণিক ছিল।*

তাপুসা ও পেল্ কট্ নামে দুইজন ব্রহ্মদেশীয় বণিক পাঁচশত গরুর গাড়ী পূর্ণ মাল পূর্ণ একখানি জাহাজে বঙ্গোপসাগর অতিক্রম করিয়াছিলেন।

মহাজনকফটকের যুবরাজ যে জাহাজে চম্পা (বর্ত্তমান ভাগলপুর) হইতে সুবর্ণ ভূমি (ব্রহ্ম) অধিমুখে যাত্রা করিয়াছিলেন, সেই জাহাজে সাত দল অশ্বরোহী সৈন্য ও তাঁহাদের অশ্ব ছিল।

প্রাচীন ভারতে জাহাজ গঠন সম্বন্ধে ভারতীয় চিত্র ও ভাস্কর্য্য বিদ্যা হইতে অনেক প্রমাণ পাওয়া যায়।

বোম্বাইএর নিকটবর্ত্তী সাল্‌সেট্ দ্বীপপুঞ্জস্থ কাণেরীর ভাস্কর্য্যে একখানি ভগ্ন জাহাজ ও দুইজন সাহায্যপ্রার্থী লোকের মূর্ত্তি দেখা যায়। †

পুরীস্থিত জগন্নাথের মন্দিরে একখানি রাজকীয় "বজ্‌রা" (barge) দেখা যায়। এই বজ্‌রা খুব বৃহৎ। সুদক্ষ বহিত্রবাহী সকল প্রাণপণে ইহার দাঁড় টানিতেছে।

ভুবনেশ্বরে বিন্দু সরোবরের পশ্চিম দিকে একটি পুরাতন মন্দির আছে। এই মন্দিরের ছাদ ঠিক্ একখনি উল্টে-গড়া জাহাজের গঠনে নির্ম্মিত। এই মন্দিরটীর নাম "ভাইতাল দিউল।" ভাইতারা মানে জাহাজ।

অজন্তার গিরিগুহায় অনেক জাহাজ ও নৌকার মূর্ত্তি খোদিত দৃষ্ট হয়। এই গিরিগুহা খ্রীঃ পূঃ দ্বিতীয় শতাব্দী হইতে সপ্তম বা অষ্টম শতাব্দী পর্য্যন্ত নির্ম্মিত হইয়াছিল।

মাদুরা মন্দিরে সুবর্ণ পুষ্করিণীর চতুর্দ্দিকস্থ প্রাচীরের একস্থলে সমুদ্রবক্ষে পাল তুলিয়া দ্রুত গমনশীল জাহাজের একখানি মূর্ত্তি খোদিত আছে। ‡

শ্রীশ্যামলাল গোস্বামী।

---

* Hardy's Manual of Budhism.

† Bombay Gazetteer Vol XIV. P. 166.

‡ শ্রীরাধাকুমুদ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের "The ship building in ancient India" নামক অমূল্য গ্রন্থের বহু অংশাবলম্বনে এই প্রবন্ধটী লিখিলাম।—লেখক

কালিদাসের দুষ্মন্ত।*

কলায় কলায় পূর্ণ হইয়া চন্দ্রমা যখন নিজের মধুর হাসি জগদ্বাসীর পরতে পরতে ফুটাইয়া তুলে, সর্ব্ব অঙ্গ পরিপকতা লাভ করিয়া ফলনিচয় যখন ধীরে ধীরে নবীন তপনের কমনীয়তা অপহরণ করে, দলমাত্রে বিকশিত হইয়া মনোহারি পদ্ম যখন হাসি মুখে ফুটিয়া উঠে, তখনই তাহাদের সুধাময় সৌরভে জগতের মন মাতিয়া উঠে, হৃদয়তন্ত্রী কত অপূর্ব্বরাগে ঝঙ্কৃত হয়। এমনি করিয়া অস্ফুট শক্তিগুলি ফুটিয়া ফুটিয়া, অপূর্ণ অধিকারগুলি পূরিয়া পূরিয়া এই সংসার-সরোবরে মানব-পদ্মটী যখন শোভায় ভরপূর হইয়া সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হইয়া দাঁড়ায়, তখনি মানব মানব বলিয়া পরিচিত হয়, তখনি তাহার কমনীয় শোভা জগৎকে বরণীয় করিয়া তুলে। জগতের কালিমাময়ী মূর্ত্তি স্ফূর্ত্তিহীন হইয়া যায়। জগৎ আনন্দে নাচিয়া উঠে।

চতুর কবি কালিদাস-চিত্রিত দুষ্মন্তের প্রশান্ত হৃদয় হইতে এই কথাটীর আমরা পূর্ণ শিক্ষা পাইয়া থাকি। হৃদয়গত প্রত্যেক বৃত্তির যুগপৎ পূর্ণবিকাশ, বিরুদ্ধ ধর্ম্মের যুগপৎ সমাবেশ যে জাতীয় জীবনের কেন্দ্রভূমি, তাহা দুষ্মন্ত হইতেই উপলব্ধি করিয়া থাকি। আনন্দ-তটিনীর উপান্ত সীমায় ঐ যে বিষাদ-রাশির সুবিস্তৃত কণ্টকবন, শোক-দুঃখের সূচিভেদ্য অন্ধকারে ঐ যে প্রীতি-ভারের বিদ্যুৎস্ফুরণ, ঐ সুখের ধারে দুঃখ, ঐ দুঃখের ধারে সুখ এই দোভাবা দোটানার অবিচ্ছিন্ন স্রোতে কুঞ্জচ্ছায়াবিড়ম্বী বল্লীর ন্যায় চিরদিনের জন্য প্লবমান হইয়া হৃদয়কে যে কিরূপে রক্ষা করিতে হয়, কোন্ নিভৃত স্থানে লুকাইয়া রাখিতে হয়, তাহা দুষ্মন্তদর্শিত গম্ভীর কার্য্যাবলী হইতেই বুঝিয়া থাকি। কর্ত্তব্যাবলীর ঈষৎ অনুরোধে, মনুষ্যত্বের অর্দ্ধস্ফুটিত চারু ইঙ্গিতে পূর্ণিমার জ্যোৎস্নাস্নাত রজনীর ক্রোড়প্রান্তে নিত্যবিলাসিনী প্রিয়তমাকে হৃদয়ের নিভৃত কন্দরে নিত্য বিরাজিত প্রিয়তমাকে কেমন করিয়া যে বিস্মৃতির অতলগর্ভে চিরদিনের জন্য ডুবাইয়া রাখিতে হয়, বিষবল্লীর ন্যায় ছিন্ন ভিন্ন করিয়া

* বৈদ্যনাথপুর 'সাহিত্য সমিতি'র সাধারণ অধিবেশনে পঠিত।

ভূলুন্ঠিত করিতে হয়, তাহা একমাত্র দুষ্মন্ত হইতেই উপলব্ধি করিয়া থাকি। তাই প্রাণ ভরিয়া বলিতে ইচ্ছা হয়,—দুষ্মন্ত! স্বর্গের দুষ্মন্ত! তুমি মর্ত্তের নও। মর্ত্তের এ কলুষিত বৃত্তি তোমার ও পবিত্র আত্মার ভোগ্য নয়।

বাস্তবিক দুষ্মন্ত-চরিত্রের অগাধতা, দুষ্মন্ত-চরিত্রের অতুলনীয়তা নাটকের ছত্রে ছত্রে অক্ষরে অক্ষরে আমরা দেখিতে পাই। স্বর্গীয় সুষমার প্রতিদ্বন্দ্বী তাঁহার সেই চরিত্র-রাজ্যের মাধুর্য্যময়ী কমনীয়তা আমরা প্রতি মুহূর্ত্তেই দেখিতে পাই। দেখিতে পাই,—ত্রিবর্গেরই প্রতি তাঁহার সমবৃদ্ধি ভক্তি, সমবৃত্তি অনুরাগ। দেখিতে পাই,—তাঁহার নিঃশ্বাসের প্রতিস্ফুরণেই

"ধর্ম্মার্থকামাঃ সমমেব সেব্যাঃ
যো হ্যেকসক্তঃ স জনো জঘন্যঃ"

এই শাস্ত্র-আজ্ঞার মৃদুমন্দ মলয় মারুত ক্ষণে ক্ষণে সঞ্চারিত, ক্ষণে ক্ষণে প্রবাহিত। তাই তাঁহাকে কেবল ধর্ম্মবৃত্তির (অনাত্মপরতার) একান্ত অনুরক্ত হইতে দেখা যায় না। তাই হৃদয়াভ্যন্তরে কেবল কামবৃত্তি (আত্ম-ভাব), কেবল অর্থবৃত্তির কমনীয় প্রবাহ কুলু কুলু রবে প্রবাহিত হয় না। তাই কর্ম্মবীর দুষ্মন্ত কখনও নিজের নিষ্কলঙ্ক হৃদয় কলঙ্কিত করেন নাই, অপক্ষপাতী সরল-হৃদয় দুষ্মন্ত একদেশদর্শিতার কৌটিল্যময়ী শিক্ষা কখনও অধিগত হন নাই। ধর্ম্ম, অর্থ, কাম এই তিনটীর প্রতিই তিনি সমরাগপ্রবণ স্নেহের দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া থাকেন। তাই গম্ভীর প্রকৃতি ভারবির ভাষায় বলিতে ইচ্ছা হয়—

অসক্ত মারাধয়তো যথাযথং বিভজ্য ভক্ত্যা সমপক্ষপাতয়া।
গুণানুরাগাদিব সখ্য মীয়িবান্ ন বাধতেঽস্য ত্রিগণঃ পরস্পরম্॥

এস্থলে প্রবীণ সমালোচক চন্দ্রনাথ বসুর মতের সহিত আমাদের মতের পার্থক্য বেশ স্পষ্টভাবেই পরিলক্ষিত হয়। অথচ তাঁহার ঐ বিরুদ্ধ মতের মূলে এমন কোন যুক্তির সত্ত্বা দেখিতে পাওয়া যায় না যে তাহা খণ্ডিত হইবার যোগ্য নহে। আমরা নিম্নে তাঁহার কয়েকটী কথা উদ্ধৃত করিলাম।

চন্দ্রনাথবাবু তাঁহার "শকুন্তলাতত্ত্বে" বলিয়াছেন,—"কোন একটী পুরুষের মন বুঝিতে হইলে অগ্রে তাহার শরীরটী বুঝিয়া দেখিতে হয়। মন এবং শরীর এ দুইয়ে অতি নিকট সম্বন্ধ। মনের চিত্র শরীরে আঁকা থাকে"। কথাটীর প্রমাণের জন্য তিনি সেনাপতির মনের কথাটী পাঠকগণকে উপহার দিয়াছেন। দ্বিতীয় অঙ্কে দুষ্মন্তকে দেখিয়া তাঁহার সেনাপতি মনে মনে ভাবিতেছেন,

অনবরতধনুর্জ্যাস্ফালন ক্রূরকর্ম্মা *
রবিকিরণসহিষ্ণুঃ স্বেদলেশৈরভিন্নঃ।
অপচিত মপিগাত্রং ব্যায়তত্বাদলক্ষ্যং
গিরিচর ইব নাগঃ প্রাণসারং বিভর্ত্তি॥

দুষ্মন্ত রাজা। ভারতের অতুলমহিমাসম্পন্ন চন্দ্রবংশীয় রাজগণের মধ্যে একজন প্রখ্যাতনামা রাজা। তিনি রত্নগর্ভা ভারতভূমির অতুল ঐশ্বর্য্যের অধীশ্বর। ঐশ্বর্য্যসুলভ বিলাসরাশি, মনে করিলেই তাঁহার হইতে পারে; কিন্তু তিনি বিলাসবিদ্বেষী। তিনি বীরোচিত কার্য্যনিরত। তিনি শারীরিক সুখ তুচ্ছ করিয়া ধনুক হস্তে প্রচণ্ড রবিকিরণে বীরের ন্যায় বিচরণ করিয়া থাকেন। বিলাসীর ন্যায় তাঁহার দেহ জীবন-প্রভা-হীন শিথিল-গ্রন্থি নয়। গিরিচর হস্তীর ন্যায় সে দেহ কেবলমাত্র বলব্যঞ্জক। এ ছবি, অসার বিলাস-প্রিয় ব্যক্তির ছবি নয়। এ ছবি, পুরুষকারপূর্ণ মহাপুরুষের ছবি।

চন্দ্রনাথবাবু আবার আমাদিগকে বলিয়া দিলেন যে, সেনাপতি যখন দুষ্মন্তকে দেখিয়া তাঁহার শারীরিক বলবীর্য্যের এইরূপ প্রশংসা করিতেছেন, তখন দুষ্মন্ত, শকুন্তলা-রত্ন দেখিয়া ব্যাকুল হইয়া উঠিয়াছেন। তিনি সর্ব্বদাই ভাবিতেছেন সে পবিত্র রত্ন তাঁহার হইবে কি না। বিদূষকও আমাদিগকে বলিয়া দিলেন যে, তিনি পূর্ব্বরাত্রে নিমেষমাত্র নিদ্রালাভ করেন নাই এবং আমরাও তাঁহাকে মুহূর্ত্তাগ্রে শয়নগৃহ ত্যাগ করিয়া আসিতে দেখিয়াছি। কিন্তু সেই মুহূর্ত্তে সেনাপতি আসিয়া এই বিষম হৃদয়-ব্যথার চিহ্নমাত্রও দুষ্মন্তের শরীরে বা মুখাবয়বে দেখিতে পাইলেন না। দুষ্মন্ত এখন ঠিক দুষ্মন্তই রহিলেন। তাঁহার হৃদয় এখন অটলই রহিল। আভ্যন্তরভাবের পবিত্র হৃদয়ে আত্মভাবের ছবি প্রতিফলিত হইয়াও তাহা ভিত্তিহীন হইয়া গেল।

চন্দ্রনাথবাবু আবার বলিয়াছেন যে, তৃতীয় অঙ্কের শকুন্তলা অসহ্য জ্বালায় জ্বলিয়া যাইতেছেন। তিনি বলিতেছেন যে, সেই মহাপুরুষকে না পাইলে আমি জীবনান্ত করিব। দুষ্মন্ত অনল-পূর্ণ মনে এই সকল দেখিতেছেন এবং শুনিতে-ছেন। তাহার পর মিলন। কিন্তু মিলনের সুখাস্বাদ করিবার উদ্যম মাত্রেই গুরুজন-সমাগম-শঙ্কায় শকুন্তলাকে স্থানান্তরিত হইতে হইল। তখন দুষ্মন্তের কি ভয়ানক অবস্থা! তখন তিনি প্রজ্বলিতান্তঃকরণে প্রতিনিঃশ্বাসে অনল-

---

* শিহাড়শোল রাজসভাপণ্ডিত স্বর্গীয় সর্ব্বেশ্বর তর্করত্ন মহোদয়ের হস্তলিখিত পুস্তকে "ক্রূরবর্ম্মা" এইরূপ পাঠ দেখিতে পাওয়া যায়।

শ্বাস ফেলিতেছেন। সহসা রাক্ষসপীড়িত তাপসগণের ভয়ার্ত্ত রব শ্রবণ করিলেন। শ্রবণ করিয়াই—"ভো ভো তপস্বিনঃ মা ভৈষ্ট মা ভৈষ্ট অয়মহমাগত এব" এই আশ্বাস-বাক্য স্থির গম্ভীর স্বরে উচ্চারণ করিতে করিতে রাক্ষস বধে নিষ্ক্রান্ত হইলেন। যেন শকুন্তলার নামও শুনেন নাই। যেন তাঁহার কিছুই হয় নাই। আশ্চর্য্য পুরুষ!

চন্দ্রনাথবাবুর আর একটী কথা আমরা উদ্ধৃত করিব। তিনি 'শকুন্তলা-তত্ত্বে'র দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে বলিয়াছেন যে, দুষ্মন্তের কাছে মুনি ঋষির আজ্ঞা দেবাজ্ঞার ন্যায় মাননীয় এবং পালনীয়। কথাটী তিনি বেশ পরিষ্কার করিয়াছেন।

দুষ্মন্ত মৃগয়ার খরতর ঔৎসুক্যে প্রধাবিত হইয়া ভয়-কুণ্ঠিত পলায়নপর মৃগোপরি অব্যর্থ শর নিক্ষেপ করেন, এমন সময়ে ঋষিদিগের নিষেধাজ্ঞা শ্রবণ করিলেন। অমনি মন্ত্রমুগ্ধের ন্যায় তাঁহার সেই আজানুলম্বিত উষ্ণ শোণিতোত্তেজিত বলসার বাহু গুটাইয়া লইয়া তিনি সে বীর হস্তোপযোগী শাণিত শর তূণীরের মধ্যে নিক্ষেপ করিলেন *। মৃগয়োন্মত্ত বীরচূড়ামণি যেন একটা জঠরানল-ক্ষিপ্ত কেশরীর ন্যায় কোন বৈদ্যুতিক শক্তিদ্বারা আহত হইয়া নিমেষমধ্যে বিনষ্ট হইয়া পড়িয়া গেল।

এই স্থল কয়েকটীর গূঢ় অর্থ প্রকাশ করিবার জন্য চন্দ্রনাথবাবু তাঁহার সরস সুখপাঠ্য কয়েকটী নব ভাষার অবতারণা করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন যে, আত্মভাব ও আত্মেতর ভাবের সংঘর্ষে দুষ্মন্তের আত্মেতর ভাবই পূর্ণমাত্রায় জয়ী এবং পূর্ণমাত্রায় লব্ধপ্রকাশ। ইহাই উল্লিখিত ঘটনা কয়েকটীর গূঢ় অর্থ।

এই কথাটী হইতে আমরা এইরূপ বুঝিয়া থাকি যে, ধর্ম্মবৃত্তি ও কামবৃত্তিকে লক্ষ্য করিয়াই চন্দ্রনাথবাবু, আত্মেতর ভাব ও আত্মভাব এই শব্দদ্বয়ের অবতারণা করিয়াছেন। শকুন্তলা-তত্ত্বেও আমরা দেখিতে পাই, তাঁহার যথাস্থান-প্রযুক্ত এই আত্মভাব ও আত্মেতর ভাবের মূলে কামবৃত্তি ও ধর্ম্মবৃত্তির সত্তা পূর্ণরূপে বিরাজিত। কিন্তু দুঃখের বিষয়, প্রসিদ্ধ শব্দ ত্যাগ করিয়া চন্দ্রনাথ বাবু কেন যে স্থানে স্থানে এইরূপ স্বকল্পিত শব্দের প্রয়োগ করিয়াছেন, তাহা আমরা বুঝিতে পারি নাই।

যাহা হউক, সম্প্রতি আমাদের সে কথার আলোচনায় কোন আবশ্যকতা নাই। কিন্তু তিনি 'শকুন্তলাতত্ত্বে'র একস্থলে বলিয়াছেন যে, আত্মভাব ও

* অভিজ্ঞান শকুন্তলের প্রথম অঙ্ক দ্রষ্টব্য।

আত্মেতর ভাবের সংঘর্ষে দুষ্মন্তের আত্মেতর ভাবের প্রবলতাই উপলব্ধি হয়। সকল সময়েই দুষ্মন্তের আত্মভাবের লয় হইয়া আত্মেতর ভাবের ঘোরতর উদ্রেক দেখিতে পাওয়া যায়। ধর্ম্মবীর দুষ্মন্তকে আত্মেতর ভাব-প্রধান চরিত্র বলিয়াই আমাদের প্রতীতি জন্মে।

চন্দ্রনাথবাবুর এই কথাটী আমরা অভ্রান্ত বলিয়া স্বীকার করিতে পারিলাম না। তিনি দুষ্মন্ত-শরীরের গভীরতা পর্য্যবেক্ষণ করিয়া তাঁহার চিত্তকেও যেরূপ গাম্ভীর্য্যময় বলিতে পারিয়াছেন, সেইরূপ আমরাও তাঁহার শরীরের ও শরীরের অনুরূপ কার্য্যাবলীর এমন একটী চিত্র পাইয়া থাকি যে, যাহাতে তাঁহার পূর্ব্ব কথাটী ভ্রান্তিবিজৃম্ভিত বলিয়া বোধ হয়। চতুর কবি কালিদাস আমাদিগকে এমন একটী চিত্র দিয়াছেন যে, যাহাতে দুষ্মন্তের আত্মেতর ভাবের লয় হইয়া আত্মভাবও পূর্ণমাত্রায় পরিলক্ষিত হয়। আমরা তৃতীয় অঙ্কের একটী শ্লোক উদ্ধৃত করিলাম,—

> অশিশিরতরৈরন্তস্তাপৈর্বিবর্ণমলীমসং নিশিনিশিভুজন্যস্তাপাঙ্গপ্রবর্ত্তিভিরশ্রুভিঃ
>
> অনতিলুলিতজ্যাঘাতাঙ্কাম্মুহুর্ম্মণি বন্ধনাৎ কনকবলয়ং স্রস্তং স্রস্তং পুনঃ প্রতিসার্য্যতে।

কি আশ্চর্য্য প্রেমের মহিমা! ধর্ম্মবীরের এখন ধর্ম্মচিন্তা নাই। কর্ত্তব্য বীরের এখন কর্ত্তব্যচিন্তা নাই। কি দিবা কি রাত্রি সেই একই চিন্তা। সেই শকুন্তলারই চিন্তা। চিন্তা করিয়া করিয়া দুষ্মন্ত শীর্ণ হইয়া গিয়াছেন, দুর্ব্বল হইয়া গিয়াছেন, আহারনিদ্রাবর্জ্জিত হইয়া গিয়াছেন। কিন্তু চিন্তার বিরাম নাই, বিশ্রাম নাই। শরীর এতাদৃশ কৃশ হইয়া গিয়াছে যে, ক্ষণে ক্ষণে স্থান-ভ্রষ্ট স্বর্ণবলয়টীকেও তাঁহাকে যত্নের সহিত যথাস্থানে নিবেশিত করিতে হয়।

চন্দ্রনাথবাবু কি এগুলিকে আত্মভাব-প্রসূত বলিতে চাহেন না? তিনি কি ইহা কল্পনা করিতে পারেন যে, ইহাতে ধর্ম্মবীর দুষ্মন্তের মানসিক আবিলতা বিন্দুমাত্র প্রকটিত হয় নাই? ধর্ম্মচিন্তার বিন্দুমাত্র ব্যাঘাত জন্মে নাই? তিনি ত পূর্ব্বেই বলিয়াছেন যে, চিত্তগত বৃত্তি অপ্রধান অথবা গৌণ হইলে তাহা শরীর মাত্রেই প্রতিফলিত হয় না, প্রতিফলিত হইলেও তাহা লোকলোচনের গোচরীভূত হয় না। দুষ্মন্তের এ চিত্রটীকেও কি তিনি সেই পদবীতে প্রতিষ্ঠিত করিতে চাহেন?

আবার কঞ্চুকীর কথাটী স্মরণ করুন।

> রম্যং দ্বেষ্টি যথাপুরা প্রকৃতিভির্ন প্রত্যহং সেব্যতে।
>
> শয্যোপান্তবিবর্ত্তনৈ র্বিগময়ত্যুন্নিদ্র এব ক্ষপাঃ।

দাক্ষিণ্যেন দদাতি বাচ মুচিতা মন্তঃপুরেভ্যো যদা
গোত্রেষু স্খলিত স্তদা ভবতি চ ব্রীড়াবনম্রশ্চিরং॥

কঞ্চুকীর এ কথাটী হইতেও ত দুষ্মন্তের আত্মভাবের প্রধানতা সাক্ষাৎ সম্বন্ধেই উপলব্ধি হইয়া থাকে। কবি এস্থলেও ত দুষ্মন্তের অর্থবৃত্তির সহিত আত্মবৃত্তির সংঘর্ষ স্পষ্টভাবেই পরিব্যক্ত করিয়াছেন। ঐ যে রাজলক্ষ্মীর প্রতি একান্ত অনুরাগ, ঐ যে অমাত্যবর্গের সহিত অনুকূলতা ইহা কি অর্থবৃত্তির প্রতিপোষক বলিয়া প্রতিভাত হয় না? কিন্তু কৈ এস্থলে ত তাঁহার সে বৃত্তিগুলির প্রধানতা লক্ষিত হইল না। হৃদয়-প্রধান দুষ্মন্ত এস্থলে ত তাহাদের কমনীয় ভাবপরম্পরায় অনুপ্রাণিত হইলেন না। তাঁহার হৃদয়ের তন্ত্রীতে তন্ত্রীতে বাজিয়া উঠিল কেবল শকুন্তলার সেই প্রেমবৃত্তির মধুর মূর্চ্ছনা। কেবল অনুরণিত হইল সেই 'বিবৃত্তবদনা' শকুন্তলার অতলস্পর্শি-চতুরতার সুর। আত্মেতর বৃত্তির লয় হইয়া, অর্থবৃত্তির লয় হইয়া কেবল প্রতিফলিত হইল সেই "কুরুবকশাখালগ্ন বল্কলা" শকুন্তলা।

আবার দেখুন, তৃতীয় অঙ্কে দুষ্মন্ত ও শকুন্তলা উভয়েই বহু জ্বালা বহু যন্ত্রণার পর মিলিত হইলেন। ক্রমে উভয়েই উচ্ছ্বসিত প্রেমাবেগ পরিস্ফুট হইতে লাগিল। প্রিয়ম্বদা ও অনুসূয়া দেখিয়া আনন্দিত হইলেন এবং মনে মনে কি যেন ভাবিয়া সরিয়া গেলেন। দুষ্মন্ত যাহা খুঁজিতেছিলেন তাহাই হইল। তিনি প্রেমময়ী শকুন্তলার প্রতি অসংযত আচরণ করিবার জন্য উদ্যুক্ত হইলেন। শকুন্তলা একাকিনী, নিরুপায়। তিনি পলাইবার জন্য উদ্যত হইলেন। কিন্তু সে আশাও তাঁহার ফলবতী হইল না। দুষ্মন্ত তাঁহাকে বলপূর্ব্বক নিবৃত্ত করিলেন। ধর্ম্মময়ী শকুন্তলা হৃদয়-প্রধানা শকুন্তলা তখন বলিয়া উঠিলেন,

"পৌরব। রক্ষ রক্ষ বিনয়ং, ইতস্ততঃ ঋষয়ঃ সঞ্চরন্তি"

কথাটী শুনিয়া দুষ্মন্ত তাঁহাকে গান্ধর্ব্ব বিবাহের শ্রুতিসিদ্ধতা বুঝাইতে লাগিলেন। বুঝাইতে লাগিলেন যে, গুরুজনবর্গের অনুমতি ভিন্নও কুলকামিনীগণ স্বেচ্ছায় আত্মসমর্পণে সমর্থ। কিন্তু শকুন্তলা তাহা শুনিলেন না। হৃদয়ময়ীর হৃদয় ইহা মানিল না। পরে যাহা ঘটিল, তাহা অনঙ্গ-মোহিত দুষ্মন্তের বলবতী স্পৃহারই অনুকূল।

আবার আমরা পূর্ব্বে দেখিয়াছি,—গান্ধর্ব্ব বিবাহ যে যুক্তিসিদ্ধ নহে তাহা দুষ্মন্ত বেশ ভালরূপে জানিতেন। শকুন্তলা যে স্বেচ্ছাবিবাহে অসমর্থা তাহা

তিনি স্পষ্টই বুঝিতেন। চন্দ্রনাথবাবুও কথাটী স্বীকার করিয়াছেন। শকুন্তলাকে প্রথমে দেখিতে গিয়া দুষ্মন্ত মাধব্যের কাছে তাঁহার জগন্মোহকর রূপরাশির বর্ণনা করিলে পর মাধব্য বলিলেন, আপনি শীঘ্র গিয়া তাঁহাকে গ্রহণ করিবার চেষ্টা করুন। বিলম্ব হইলে হয় ত কোন চিক্কণ-মস্তক চতুর তপস্বী তাঁহাকে দখল করিয়া ফেলিবে। তাহাতে তিনি বলিয়াছিলেন "পরবতী খলু তত্র ভবতী নচ সন্নিহিতোঽত্র গুরুজনঃ" এখন শকুন্তলা নিজেই সেই কথাই বলিতেছেন। কিন্তু কৈ দুষ্মন্ত ত তাহা শুনিলেন না। বরং তিনি বুঝাইতে লাগিলেন যে, গুরুজনের অনুমতি ব্যতিরেকেও তিনি আত্মসমর্পণে সমর্থা।

ইহাতেও তাঁহার আত্মভাবের প্রধানতা বেশ স্পষ্ট ভাবেই পরিলক্ষিত হয়। যে ধর্ম্মবীর ধর্ম্মের উচ্চ আসনে বসিয়া উচ্চনীতি, উচ্চবুদ্ধি, উচ্চ বিচারশক্তির পরিচয় প্রদান করিতেন, আজ সেই মহাত্মাই কাম-প্রপীড়িত হইয়া সে সমস্তই ত হারাইয়া বসিয়াছেন। চন্দ্রনাথবাবু কি ইহাকেও উড়াইয়া দিতে চাহেন? এস্থলেও কি তিনি দুষ্মন্তের আত্মেতর-ভাবের প্রবলতা উপলব্ধি করিতে চাহেন? জানি না, চন্দ্রনাথবাবু কোন্ অভিপ্রায় হৃদয়ে নিহিত করিয়া দুষ্মন্তের চিত্রটীকে এরূপ অসংযত ভাবে চিত্রিত করিয়াছেন।

যাহা হউক আমরা দেখিলাম, চন্দ্রনাথবাবুর প্রদর্শিত আত্মেতরভাবের ন্যায় দুষ্মন্তের আত্মভাবও পূর্ণমাত্রায় লব্ধপ্রসর এবং পূর্ণমাত্রায় জয়ী। আবার স্থলবিশেষে এ উভয়ই উভয়ের প্রকোপে বিপর্য্যস্ত ও হীনপ্রভ। অর্থাৎ এ উভয় হইতে যখন কোন রাষ্ট্রবিপ্লব বা গুরুতর অনিষ্ট ঘটিবার সম্ভাবনা না থাকে তখন এ উভয়ই প্রধানভাবে পরিস্ফুট। আবার যখন এ উভয়ের অন্যতরটী জগদ্বিধ্বংসিনী জনদাহিনী শক্তিপরম্পরায় কলুষিত, তখন সে অন্যতরেরই প্রধানতা এক নিভৃত গর্ত্তে লুক্কায়িত।

ধর্ম্মবীর দুষ্মন্ত শকুন্তলার প্রতি অসদাচরণ করিয়াছিলেন সত্য, কিন্তু তাঁহার হৃদয় পাপ-বৃত্তিতে পরিপূর্ণ নহে। তিনি কেবল কামবৃত্তির চরিতার্থের জন্যই শকুন্তলার প্রতি সপ্রণয় দৃষ্টিনিক্ষেপ করেন নাই। তিনি ধর্ম্মপ্রধানা শকুন্তলাকে হৃদয়প্রধানা শকুন্তলাকে ধর্ম্মের সঙ্গিনী, জীবনের সঙ্গিনী করিয়াছিলেন। আসমুদ্র ধরিত্রীর একাধিপত্নী করিয়াছিলেন। তাই ধর্ম্মবীর দুষ্মন্তের অনন্ত কীর্ত্তিগাথা ঐ অনন্ত আকাশের পটে চিত্রিত হইতে দেখিতে পাই।

এস্থলে ইহাও উল্লেখ করা উচিত যে চন্দ্রনাথবাবু এই দুষ্মন্তের চরিত্র-সমালোচনায় আর একটী কথা তুলিয়া গিয়াছেন। তিনি দুষ্মন্তের অর্থবৃত্তি-সম্বন্ধে

তাঁহার 'শকুন্তলাতত্ত্বে' কোন কথারই উল্লেখ করেন নাই। আমরা কিন্তু আত্মভাব ও আত্মেতর ভাবের ন্যায় তাঁহার এ বৃত্তিটীরও প্রধানতা সম্যক্‌রূপে উপলব্ধি করিয়া থাকি।

ষষ্ঠ অঙ্কটী স্মরণ করুন। প্রেম-প্রবণ-চিত্ত দুষ্মন্ত সেই নামাঙ্কিত অঙ্গুরীয়টী পাইয়া পুনঃ পুনঃ দেখিতেছেন। দেখিয়া আমূল সমস্ত কথাই তাঁহার মনে পড়িল। মনে পড়িল, সেই শকুন্তলার শান্ত গম্ভীর মূর্ত্তি। মনে পড়িল, সেই শকুন্তলার নিষ্ঠুর প্রত্যাখ্যানের কথা। এইরূপে একে একে সমস্তই তাঁহার মনে পড়িল।—হৃদয় ফাটিয়া যাইতে লাগিল। তিনি অনলসম্পৃক্ত ইন্ধনের ন্যায় অনুতাপানলে দগ্ধ হইতে লাগিলেন। শরীর কৃশ হইতে লাগিল। মুখ শুকাইতে লাগিল। অঙ্গের সে অমল জ্যোতিঃ কালিম রেখায় অঙ্কিত হইল। কিন্তু এত জ্বালা এত যন্ত্রণায় দগ্ধ হইয়াও দুষ্মন্ত নিজের দুষ্মন্তত্ব হারান নাই। এখনও তিনি তাঁহার সনাতন ধর্ম্ম রাজকার্য্য ভুলেন নাই। তিনি বেত্রবতীকে বলিলেন,—

"বেত্রবতি! মদ্বচনাদমাত্যপিশুনং ব্রূহি অদ্য
চিরপ্রবোধান্ন সম্ভাবিত মস্মাভির্ধর্ম্মাসন মধ্যাসিতুং
যৎপ্রত্যবেক্ষিতং আর্য্যেণ পৌরকার্য্যং, তৎপত্র-
মারোপ্য প্রস্থাপ্যতা মিতি"

এই যে তাঁহার রাজকার্য্য দেখিবার জন্য প্রগাঢ় ইচ্ছা, এখনও যে তাঁহার রাজলক্ষ্মীর প্রতি একান্ত অনুরক্তি ইহা কি তাঁহার অর্থবৃত্তির একান্ত প্রতিপোষক নহে? ইহাতে কি তাঁহার অর্থবৃত্তির প্রধানতা সম্যক্‌রূপে পরিলক্ষিত হয় না? কৈ চন্দ্রনাথবাবু এ সম্বন্ধে ত কোন কথাই বলেন নাই! তিনি কি বলিতে চাহেন যে ইহাতে তাঁহার অর্থসম্পদের বিন্দুমাত্র উৎকর্ষ সাধিত হয় নাই? রাজলক্ষ্মীর প্রতি অনাস্থাপরতা কি তাহার উচ্ছেদ-সাধনের ভিত্তিস্থান বলিয়া পরিগণিত হয় না?

আবার দেখুন,—কর্ম্মবীর দুষ্মন্ত সেই জগন্মোহকর চিত্রখানি দেখিতেছেন। দেখিতে দেখিতে উন্মত্ত হইতেছেন, পুলকিত হইতেছেন। চিত্র-লিখিত শকুন্তলা, চিত্র-লিখিত ভ্রমর এ সমস্তই তাঁহার সত্য বলিয়া প্রতীতি হইতেছে। তিনি আপনাকে আপনি ভুলিয়া যাইতেছেন, জ্ঞানশূন্য হইতেছেন। বাস্তবিক দুষ্মন্তের এখন কি ভয়ানক অবস্থা! কিন্তু এমন সময়ে বেত্রবতী আসিয়া অমাত্য পিশুনের পত্রটী যাই তাঁহাকে অর্পণ করিলেন, অমনি দুষ্মন্ত সমস্তই ভুলিয়া

গেলেন। সে শকুন্তলা, সে ভ্রমর, সে আশ্রমপদ, এ সমস্তই তাঁহার বিস্মৃতির গর্ভে ডুবিয়া গেল। শুদ্ধ তাহা নহে, ধর্ম্মবীর ধর্ম্মসঙ্গত বিচার করিয়া অমাত্য পিশুনের ত্রুটি সংশোধন করিলেন। তিনি যে দুষ্মন্ত সেই দুষ্মন্তই রহিলেন।

কবি এস্থলেও ত তাঁহার আত্মবৃত্তি ও অর্থবৃত্তির সংঘর্ষ স্পষ্টভাবেই ব্যক্ত করিয়াছেন। আত্মবৃত্তির লয় দেখাইয়া অর্থবৃত্তির প্রধানতা স্পষ্ট রূপেই সূচিত করিয়াছেন। মুহূর্ত্তাগ্রে যাঁহাকে জ্ঞান-শূন্য হইতে দেখিয়াছি, উন্মত্ত হইতে দেখিয়াছি, সহসা তিনি যে এইরূপ সুসঙ্গত বিচার করিবেন, অমাত্য পিশুনের ভ্রান্তিটুকু প্রকটন করিতে পারিবেন, কৈ ইহা ত অগ্রে কেহই বিশ্বাস করেন নাই। দুষ্মন্ত-হৃদয়ের তন্ত্রীতে তন্ত্রীতে অর্থবৃত্তির সুর যে ক্ষণে ক্ষণে অনুরণিত হয়, তাহা এ ঘটনাটী হইতে আমরা বেশ উপলব্ধি করিয়া থাকি।

আর বিস্তার না করিয়া বোধ হয় এইরূপ বলা যাইতে পারে যে ধর্ম্ম, অর্থ, কাম এই তিনটী বৃত্তির বিমিশ্রণেই দুষ্মন্ত-চরিত্র গঠিত। তিনি পূর্ণস্ফুট ধর্ম্ম-বৃত্তির চারু চরণ-তলে যেরূপ প্রগাঢ় ভক্তির সহিত বিলুণ্ঠিত হইয়া থাকেন, আবার সেই ভাবেই তাঁহাকে মূর্ত্তিমতী কামময়ী স্রোতস্বিনীর মধুর প্রবাহেও প্লবমান হইতে দেখা যায়, ভক্তি-প্রেমের বিকচ কুসুম-সম্ভার স্তরে স্তরে সুসজ্জিত করিয়া কমলা দেবীর শান্তি নিকেতনে অবনত মস্তকে উপস্থিত হইতে দেখিতে পাই। আত্মেতরভাবের তীব্র প্ররোচনা তাঁহার শিরায় শিরায় যেরূপ প্রীতি-ভারের অভূতপূর্ব্ব তটিনা ক্ষণে ক্ষণে ছুটাইয়া দেয়, সেইরূপ আত্মভাবের কমনীয় মূর্চ্ছনাও তাঁহার হৃদয়ের তন্ত্রীতে তন্ত্রীতে বাজিয়া উঠে।

শ্রীমৃত্যুঞ্জয় ভট্টাচার্য্য।

জীবজন্তুর সৌহৃদ্য।

পারাবত চিত্রগ্রীবের সহিত মূষিকপ্রবর হিরণ্যকের সৌহার্দ্দ্য! হাসির কথা! কিন্তু পণ্ডিত বিষ্ণুশর্ম্মা স্বয়ং একথা লিখিয়াছিলেন। আমি এস্থলে প্রত্নতত্ত্বের গবেষণায় প্রবৃত্ত হই নাই। তাহা হইলে প্রমাণ করিতে পারিতাম পণ্ডিত বিষ্ণুশর্ম্মা জীবতত্ত্বে বিশেষ ব্যুৎপন্ন ছিলেন। জীবজগতে এমন বন্ধুত্ব অস্বাভাবিক নহে। চিত্রগ্রীবের সহিত হিরণ্যকের অমন মিত্রতায় হাসিবার কথা কিছুই

নাই। কিন্তু বিষ্ণুশর্ম্মা জীবতত্ত্ব বুঝাইবার জন্য হিতোপদেশ লিখেন নাই। তিনি—"কথাচ্ছলেন বালানাং নীতিস্তদিহ কথ্যতে"—এই কথা স্পষ্ট করিয়া বলিয়া হিতোপদেশ লিখিতে বসিয়াছিলেন। বোধ হয় তিনি অজ্ঞানতঃই জীব-জগতের একটা সূক্ষ্ম তত্ত্ব, একটা চিত্তাকর্ষক বৃত্তির কথা উল্লেখ করিয়াছিলেন।

পশু বলিলেই যে 'লড়াইয়ের ভাব' সূচিত হয় তাহা আমাদের সংস্কার-মূলক। জীবজগতে অহঃরহ সমর দুন্দুভি বাজিতেছে বটে, কিন্তু ইতর শ্রেণীর জীবের মধ্যে কৃতজ্ঞতা, প্রভুভক্তি, অকৃত্রিম সৌহার্দ্দ্য, উদার সামাজিকতা প্রভৃতি সদ্‌গুণের অভাব নাই। মানুষের সহিত জীবজন্তুর যে অকপট প্রণয় জন্মে তাহাত আমরা সর্ব্বদাই উপলব্ধি করিতে পারি। জন্তুতে জন্তুতে বন্ধুত্ব হয়, পশুতে পশুতে সৌহার্দ্দ্য জন্মে, পক্ষিগণ পরস্পর পরস্পরের সহায়তা করে, কীট পতঙ্গ দল বাঁধিয়া বাস করে, একজন অন্যের সেবা করে। জীবতত্ত্ববিদ পণ্ডিতেরা পর্য্যবেক্ষণ দ্বারা এ সকল সত্য আবিষ্কার করিয়াছেন। তাঁহাদের মত একটু মনোযোগ দিয়া জীবজগতের কার্য্যাবলী পর্য্যবেক্ষণ করিলে আমরাও এ কথাগুলা বুঝিতে পারি।

এক জাতীয় জীব অপর জাতীয় জীবের উপর নির্ভর করিয়া প্রাণধারণ করে, পরভোজী (Parasitic) জীবদিগের কথা আলোচনা করিলে এ সত্য আমরা বুঝি। মানুষের পেটের ভিতর কৃমি থাকে। কুকুরের গাত্রে এঁটেলি পোকা জন্মগ্রহণ করে। শারমেয়ের ত্বকে তাহারা জলোকার মত সংলগ্ন থাকে, তাহার শোণিত পান করে। এ সবগুলা পরভোজী। এক জাতীয় জীব অপর জাতীয় জীবের প্রতিপালন করিতেছে। কিন্তু ইহার ভিতর বন্ধুত্ব নাই, উদারতা নাই, জোর করিয়া এক জাতীয় জীব অপরের রক্ত শোষণ করে। এক জাতীয় জীব অপরের পরিপোষক বটে কিন্তু স্বেচ্ছায় নহে, বাধ্য হইয়া।

খুব ইতর শ্রেণীর জীবের মধ্যে বিভিন্ন জাতীয় প্রাণীকে পরস্পরের সহিত সম্মিলিত হইয়া জীবন যাপন করিতে দেখা যায়। ইহাদের মধ্যে এক শ্রেণী অপরের গলগ্রহ নহে, পরভোজী নহে। কলিকাতার যাদুঘরের মেরুদণ্ডবিহীন জীবদিগের ঘরে একটি বড় মজার জন্তু আছে। তপস্বী কর্কট (Hermit crab) নামক এক প্রকার সমুদ্রের পোকা আছে। পোকা বলিতেছি কারণ তাহারা শঙ্খজাতীয় নহে বা মৎস্যজাতীয় নহে। ইহার বাহ্যিক আকৃতি কর্কটের মত হইলেও ইহার শরীরের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ অতি সরল। এই জীবটির দেহের

সহিত অপর একটি জীবদেহ সংবদ্ধ আছে। উহারা উভয়েই উদ্ভিদভোজী, উহাদের মধ্যে খাদ্য খাদকের সম্বন্ধ নাই। একজন চলিতে পারে অপরটি বোধ হয় সমুদ্রের মধ্যস্থ পাহাড়ের গাত্র হইতে বেশ অনায়াসে শৈবাল সংগ্রহ করিতে পারে। একটি খঞ্জবন্ধু অন্ধের ঘাড়ে চড়িলে যেমন উভয়ের বিকৃত অঙ্গের অভাব কতকটা মোচন হয়, ইহাদের সম্মিলনে বোধ হয় তাহাই হইয়াছিল। যাদুঘরে ইহাদের মৃতদেহ আছে। অবশ্য তাহাদের প্রাণের ভিতর কি ভাব ছিল তাহা মানুষের বৃহৎ মস্তিষ্কে কল্পনা করা অসম্ভব। কিন্তু তাহাদের দেহ দেখিলে বোধ হয় যে তাহারা একটা যৌথ ব্যবসায় খুলিয়াছিল।

অল্পদিন হইল আমি চারিটি বড় বিচিত্র সামুদ্রিক ঝিনুক পাইয়াছিলাম। যখন আমার হস্তগত হয় তখন ঝিনুকগুলা জীবিত ছিল। একখানা বিলাতী জাহাজের নিম্নে আটকাইয়া তাহারা কলিকাতায় আসিয়াছিল। ঝিনুকগুলি গভীর নীলবর্ণ। কিন্তু প্রত্যেকটির গায়ে প্রতিদিকে ছোট ছোট শ্বেতবর্ণের পাঁচ সাতটি করিয়া শামুক সংলগ্ন ছিল। শামুকগুলি পিরামিড্ আকারের, ডালের বড়ির মত। উপরদিকে মুখ, মনে হয় যেন সিমেণ্ট দিয়া কেহ ঝিনুক গাত্রে সেগুলিকে সংলগ্ন করিয়া দিয়াছে। সেই শামুকগুলিও তখন জীবিত ছিল। অবশ্য তাহারা সকলেই উদ্ভিদভোজী সুতরাং এ শামুকগুলি ঝিনুকের কাঁধে চড়িয়া ভ্রমণ করা ব্যতীত অপর কিছু সুবিধা পাইত না। আমি সেগুলিকে লাল মাছের সহিত রাখিয়াছিলাম। কিন্তু দুই চারিদিন পরে একে একে সকল জন্তুগুলি মরিতে আরম্ভ করিল। এখনও ঝিনুকগুলি আমার নিকট আছে। এই ঝিনুক ও শামুকের যুক্ত শরীর দেখিলে মনে হয় যে তাহারা যৌথ কারবার করিত, জীবন সংগ্রামের জন্য ইহারা একত্র থাকিত। বোধ হয় ঐ রকম কিম্ভূতকিমাকার দেহ দেখিয়া তাহাদের শত্রুপক্ষ তাহাদিগকে বিনষ্ট করিতে পারিত না।

উপরে যে কয়েকটি দৃষ্টান্ত দিলাম, ইতর শ্রেণীর সামুদ্রিক জীবের মধ্যে ঐরূপ উদাহরণ বিরল নহে। সমুদ্রের তীরে কত শঙ্খ, কত শুক্তা পড়িয়া থাকে—

"আসে যায়, কেহ নাহি চায়
সবাই খুঁজিছে মুক্তা মণি।"

কিন্তু দুই একটা তুলিয়া লইলে দেখা যায় তাহাদের ক্ষুদ্র জীবনের কত মধুর মিলনের চিহ্ন তাহাদের হৃদয়ের পরতে পরতে না থাকিলেও কঙ্কালের উপরে অঙ্কিত। অবশ্য এ সকল মিলন সখ্যের কিনা তাহা নির্ণয় করা দুরূহ। জমি-

দারের পাইক যেমন কৃষকের গৃহে বসিয়া আতিথ্য গ্রহণ করে, ঝিনুকের স্কন্ধে শামুকের আতিথ্য সেরূপ জুলুম কি না তাহা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে না।

সামাজিক কীট পতঙ্গের বিষয় আলোচনা করিলে কিন্তু দেখা যায় যে পশু-বুদ্ধি চালিত হইয়া মৌমাছি. বোল্‌তা, পিপীলিকা প্রভৃতি যেরূপে এক উদ্দেশ্যে নিজ নিজ সমাজের ইষ্টের জন্য পরিশ্রম করে, আপনাপন সম্প্রদায়ের হিতের জন্য আত্মোৎসর্গ করে. সেরূপ মহত্ত্ব মানুষে দেখাইতে পারে না। এক একটি মধুচক্র এক একটি মধুমক্ষিকা সম্প্রদায়ের যৌথ বাসস্থান। প্রত্যেক চক্রে একটি করিয়া রাণী থাকে। ক্লীব সৈনিকেরা তাহার সুখের বিধান করে, যে সকল পুরুষ লইয়া রাণী বিহার করেন তাহাদিগকে অলস ভাবে চাকের মধ্যে বাস করিতে দেয়, রাণী অণ্ড প্রসব করিলে ইহারা সেগুলিকে উপযুক্ত স্থানে রাখিয়া দেয়—তত্ত্বাবধান করে। মম লইয়া ইহারা গৃহ নির্ম্মাণ করে, ফুলে ফুলে ঘুরিয়া মধু আহরণ করিয়া চক্রের মধুর ভাণ্ডার পূর্ণ করিয়া রাখে। এক চাকের মৌমাছি অপর চাকে যায় না, বিশ্বাসঘাতকতা করিয়া মধু লুকাইয়া রাখে না। এ ক্ষেত্রে যে সখ্যভাব বিরাজ করে তাহা কে অস্বীকার করিবে? জীবনে মরণে তাহারা পরস্পরের প্রেমে আবদ্ধ, যৌথ বাসস্থান রক্ষার জন্য সকলেরই হুল সমভাবে তীক্ষ্ণ।

বোল্‌তা সমাজেরও নিয়ম মধুমক্ষিকা সমাজের অনুরূপ। ফলতঃ অনেক শ্রেণীর পতঙ্গ ঐরূপ সামাজিক। উহাদের সৌহার্দ্দ্য, উহাদের জ্ঞাতিত্ব, ভ্রাতৃত্ব, বন্ধুত্ব অতীব মধুর। আমাদের লাল ও কালো পিপীলিকাগুলাও বড় মহানুভব, বড় জ্ঞাতিবৎসল। উহারা 'কুটুস' করিয়া কামড়াইয়া 'গর্ত্তের ভিতর' প্রবেশ করে বটে কিন্তু সে গর্ত্তে তাহারা স্ব স্ব প্রধান হইয়া একেলা থাকে না, তাহাদের মত ক্ষুদ্রদেহ, ক্ষিপ্রপদ শত শত জীব একত্র সেই বিবরে বসবাস করে। তাহাদের একান্নবর্ত্তী পরিবারের উহা সাধারণ বাসস্থান। ভাই ভাই ঠাঁই ঠাঁই আমাদের নিয়ম, ক্ষুদ্র পিপীলিকার সমাজে এ নিয়ম অজ্ঞাত। তাহাদের মধ্যে একজনের নশ্বর তনু ধ্বংস হইলে পরিবারস্থ সকলে অশৌচ গ্রহণ করে কিনা সে তত্ত্ব আজিও আবিষ্কৃত হয় নাই। কিন্তু যতদিন তাহারা বাঁচিয়া থাকে ততদিন তাহারা পারিবারিক ইষ্টের জন্য বিধিমতে পরিশ্রম করে। আমাদের সমাজে মারিভয় হইলে সমাজের নেতৃবৃন্দ যেমন সকলের প্রাণরক্ষার উপায় উদ্ভাবন করেন, বিপদসঙ্কুল স্থান ছাড়িয়া নিরাপদ স্থানে পালাইবার ব্যবস্থা করেন, পিপীলিকা পরিবারের জ্ঞানবৃদ্ধেরাও তেমনি প্রাণনাশের সূচনা দেখিলে সপরিবারে নিরাপদ স্থলে

পলায়ন করে। পিঁপড়ার বাসায় উপদ্রব করিয়া প্রত্যেক দুষ্ট বালক এ কথার যাথার্থ্য অনুভব করে। Bell নামক একজন সাহেব "Inner life of animals" নামক পুস্তকে একটি বড় চিত্তাকর্ষক গল্প দিয়াছেন। দক্ষিণ আমেরিকার এক স্থলে একদল পিপীলিকা একটি ট্রামের লাইন পার হইয়া পাতা কাটিতে যাইত। পরপার হইতে পত্র সংগ্রহ করিয়া তাহাদিগকে আবার বাসস্থানে ফিরিতে হইত। প্রথম প্রথম ট্রাম লাইন পার হইবার সময় প্রায়ই দুই চারিটি করিয়া পিঁপড়া কাটা পড়িত। তবু তাহারা পরপারে যাইবার লোভ সম্বরণ করিতে পারিত না। শেষে তাহাদের মধ্যে জনকয়েক বুদ্ধিমান কীট ট্রামের রেলের নিচে একটি সুড়ঙ্গ কাটিল। পিপীলিকার সারি মহা আনন্দে সেই রেল নিম্নস্থ সুড়ঙ্গের ভিতর দিয়া গমনাগমন করিতে লাগিল। বেল্ সাহেব পরীক্ষা করিবার জন্য সেই সুড়ঙ্গের মুখটি একদিন বন্ধ করিয়া দিলেন। বুদ্ধিমান পিপীলিকার দল কিন্তু শপথ করিয়াছিল যে রেল পার হইতে গিয়া আর দুর্লভ কীটদেহ নষ্ট করিবে না। সুড়ঙ্গের মুখ বন্ধ দেখিয়া তাহারা আবার নূতন উদ্যমে নূতন সুড়ঙ্গ কাটিয়া বাসায় প্রবেশ করিল।

কীট পতঙ্গের সামাজিকতা, তাহাদিগের সৌহৃদ্য বড় মধুর। আমরা স্বার্থপর লোককে সময়ে সময়ে জন্তু বলিয়া জন্তুদিগের প্রতি মিথ্যা দোষারোপ করি মাত্র।

ইহা তো গেল এক এক শ্রেণীর কীট পতঙ্গের নিজ জাতির মধ্যে সৌহার্দ্দ্যের উদাহরণ। বিভিন্ন জাতীয় কীট পতঙ্গের মধ্যেও বন্ধুত্ব জন্মিয়া থাকে, প্রভু ও ভৃত্যের সম্বন্ধ সংস্থাপিত হয়। এফিস্ (Aphide) নামক এক প্রকার কীট আছে। ইহাদের শরীর হইতে এক রকম মধুর রস ক্ষরণ হয়। কেবল পিপীলিকার হিতার্থে ইহারা উহাদিগকে এই মধুর রস পান করিতে দেয়। এরূপ নিঃস্বার্থ পরোপকার প্রশংসার্হ সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। এফিসের শরীর হইতে এই রস নির্গত হইলে পিপীলিকারা গন্ধে গন্ধে আসিয়া তাহা পান করে কি না তাহা পরীক্ষা করিবার জন্য মহামতি দারবিন (Darwin) সাহেব এক উপায় অবলম্বন করিয়াছিলেন। এক স্থলে পাতার উপর পাঁচ সাতটি এফিস্ কীট বসাইয়া তিনি তাহাদের ত্রিসীমা হইতে সমস্ত পিপীলিকা তাড়াইয়া দিলেন। অনেকক্ষণ তাহাদিগকে পিপীলিকা সঙ্গ বর্জ্জিত করিয়া দেখিলেন যে তাহাদের ক্ষুদ্র তনু বেশ রসে জর জর হইয়াছে। এরূপ অবস্থায় পিপীলিকারা শুঁড় দিয়া তাহাদের পেটে

সুরসুরি দিলে রস নির্গত হয়, দারবিন্‌ সাহেব তাহা লক্ষ্য করিয়াছিলেন। তিনি একটি কেশ লইয়া এফিসের পেটে ঠিক পিঁপড়ার মত সুরসুরি দিতে আরম্ভ করিয়া দিলেন। কিন্তু তাহাতে ভবি ভুলিল না। কীটগণ প্রসন্ন হইল না। বোধ হয় তাহারা দারবিন সাহেবের শঠতা বুঝিয়া ফেলিল, ফলে সাহেবের ভাগ্যে এক বিন্দুও মধু জুটিল না। তখন তিনি সে স্থলে একটি বুভুক্ষু পিপীলিকা ছাড়িয়া দিলেন। তাহার কি আনন্দ! সে এফিসদের রসপূর্ণ দেহ দেখিয়া প্রথমে খানিকক্ষণ আনন্দে ছুটাছুটি করিতে লাগিল; শেষে ধীরে ধীরে কণ্ডুয়ন আরম্ভ করিল। প্রাণতত্ত্বের শিক্ষাগুরু দারবিন সাহেব যে কার্য্যে অকৃতকার্য্য হইলেন, ক্ষুদ্র কীট সে কার্য্য সাধন করিল। তাহার তোষামোদে গলিয়া গিয়া এফিস মধু বরিষণ করিল। পিপীলিকা প্রাণ ভরিয়া তাহা পান করিল।

এফিসের এ দান একেবারে সাত্ত্বিক কি না তাহা বলিতে পারি না। কিন্তু এফিসে পিপীলিকায় যে বন্ধুত্ব জন্মে, পিপীলিকার সেবায় যে এফিসের দেহ হইতে মধু ক্ষরণ হয় তাহা নিঃসন্দেহ। আদান প্রদানে উভয়েই সুখী হয়—এ সখ্য উভয় জাতির ইষ্টজনক।

পিয়ারে হুবার নামক এক প্রাণতত্ত্ববিদ্‌ সাহেব একজাতীয় পিপীলিকার মধ্যে দাস প্রথার অস্তিত্ব আবিষ্কার করিয়াছিলেন। এই জাতীয় পিপীলিকা তিনি ইংলণ্ড ও সুইজারলণ্ডে দেখিয়াছিলেন। ইহাদিগের বৈজ্ঞানিক নাম Formica Rufescens. রুফেসেন পিপীলিকাদের মধ্যে স্ত্রীলোক এবং পুরুষেরা একেবারে অলস। তাহারা বাসায় বসিয়া থাকে, অপরে যে সকল খাদ্য দ্রব্য আহরণ করিয়া আনে ইহারা তাহা ভোজন করে এবং সুখে কালাতিপাত করে। ইহাদের মধ্যে একজাতীয় বন্ধ্যা স্ত্রীলোক থাকে। তাহারাই কেবল নিজ নিজ পরিবারের জন্য একটু পরিশ্রম করে। কিন্তু পরিশ্রম করিয়া তাহারা আহার্য্যও আনয়ন করে না, বাসস্থানও নির্ম্মাণ করে না। এমন কি তাহারা নিজ পরিবারের শিশু পরিচর্য্যাও করে না। এ সম্প্রদায়ের বন্ধ্যা স্ত্রীলোকেরা কেবল Formica Fusca নামক পিপীলিকা দেখিতে পাইলে তাহাদিগকে বন্দী করিয়া নিজ পালে লইয়া যায় এবং কি জানি কি যাদুবলে তাহাদিগকে একেবারে ক্রীতদাস করিয়া ফেলে। একবার দাসত্ব গ্রহণ করিলে ফুসা পিপীলিকা রুফেনস্‌কে যেরূপে সেবা করে তাহা দেখিলে তাহাদের উপর বড়ই শ্রদ্ধা হয়। অনবরত পরিশ্রম করিয়া তাহারা প্রভু পরিবারের ভরণ পোষণ করে, তাহাদের জন্য

বাসা নির্ম্মাণ করে, এবং প্রভু পরিবারের পিপীলিকা শিশুগুলিকে অবধি প্রতি-পালন করে। এরূপ প্রভুভক্তি—বিজেতৃর সুখমন্দিরে এরূপ আত্মবলিদান—এক অপূর্ব্ব বৃত্তি। ক্রুসা পিপীলিকার পরার্থপরতা বড়ই উচ্চদরের। প্রভু পরিবারের বিপদ সম্ভাবনা বুঝিলে, দাসগণ অপর স্থলে বাসা নির্ম্মাণ করে এবং মনিবদিগকে মুখে বহন করিয়া নূতন আবাসে লইয়া যায়। বলা বাহুল্য, এত পরিচর্য্যায়, এরূপ কঠোর সেবায়, প্রভুরা একেবারে অন্তঃসারশূন্য হইয়া পড়ে। তাহারা এমন কি আহার অবধি সংগ্রহ করিতে পারে না। হুবার সাহেব ত্রিশটি রুফেনস্ ও কতকগুলি অণ্ড ও শিশু লইয়া একস্থলে রাখিয়াছিলেন। সে স্থল হইতে সমস্ত ক্রীতদাস বাহির করিয়া দিয়াছিলেন। মুখের কাছে আহার্য্য থাকিলেও তাহারা সে সকল খাদ্য স্পর্শ করিল না, অনেকগুলা অনশনে প্রাণ-ত্যাগ করিল। সাহেব তখন একটা দাস ধরিয়া তাহাদের নিকট দিলেন। দাস প্রভূত পরিশ্রমে অবশিষ্ট কীটগুলার প্রাণ বাঁচাইল, শিশু ও অণ্ডগুলির জন্য বাসা নির্ম্মাণ করিল। তাহাদের সংসারের আবার লক্ষ্মীশ্রী ফিরিয়া আসিল। অপূর্ব্ব বিধাতার সৃষ্টি! ক্ষুদ্র কীট-হৃদয়ে কি মহত্ত্ব, কি উদারতা!

ফরমিকা স্যাঙ্গুনিয়া (Formica Sanguinea) নামক অপর এক শ্রেণীর পিপীলিকা ঐরূপ পরাপেক্ষী। ইহাদেরও অনেক সুখ দাসদিগের পরিশ্রমের উপর নির্ভর করে। এই জাতীয় পিপীলিকা লালবর্ণের। ইহাদের দাসেরা কৃষ্ণবর্ণ এবং আকারে অনেক ছোট। দারবিন সাহেব যতদূর পর্য্যবেক্ষণ করিয়াছিলেন তাহাতে তিনি বলেন যে ইহারা গৃহভৃত্য মাত্র। তিনি চতুর্দ্দশটি বাসা পর্য্যবেক্ষণ করিয়াছিলেন। একটিরও ভিতর হইতে তিনি দাসগণকে বাহিরে আসিতে দেখেন নাই। প্রভুরাই বাসা নির্ম্মাণ করে, খাদ্য সংগ্রহ করিয়া আনে, বাসার ভিতর বসিয়া দাসেরা প্রভুদের সন্তানাদি প্রতিপালন করে মাত্র। কিন্তু এই জাতীয় পিপীলিকা সুইজারলণ্ডে আপনাদিগের সহিত কৃষ্ণ দাসদিগকেও বাহিরে পরিশ্রম করিতে লইয়া যায়। এই কালো পিপীলিকা দাসেদের স্ত্রীলোক ও পুরুষের একটু অধিক তেজ আছে। স্যাঙ্গুনিয়ারা তাহা-দিগকে ধরিয়া আনিয়া ক্রীতদাস করিতে পারে না। কেবল দুই চারিটা বন্ধ্যা স্ত্রীলোককে পথে ঘাটে একাকিনী দেখিতে পাইলে, লাল পিঁপড়া জোর করিয়া তাহাদিগকে বাসায় ধরিয়া লইয়া যায় এবং তাহাদের পায়ে দাসত্বের নিগড় পরাইয়া দেয়। অনেক সময় ইহারা ছোট কালো পিঁপড়ার ডিম চুরি করিয়া লইয়া আসে। 'অণ্ড হইতে বাহির হইয়া শাবকগণকে ইহাদিগের

আজীবন দাসত্ব করিতে হয়। এ সমাজে এখনও কোন উইলবারফোর্স বা জেফারসন জন্মগ্রহণ করে নাই, সুতরাং দাস প্রথার প্রভাব অক্ষুণ্ণ রহিয়াছে। বাসস্থান পরিত্যাগ করিয়া নূতন আবাসে যাইতে হইলে রুফেন্‌স্ পিপীলিকাদিগকে তাহাদের দাসেরা মুখে করিয়া লইয়া যায়, সাঙ্গুনিয়ারা কিন্তু তাহাদের দাসেদের মুখে করিয়া লইয়া যায়। বোধ হয় ভয় হয় পাছে ইহারা পলাইয়া নিজ সম্প্রদায় মধ্যে মিশিয়া যায়।

দারবিন সাহেব একবার দাস ধরিবার যুদ্ধ দেখিয়াছিলেন। কতকগুলা লাল পিঁপড়া একটা কালো পিঁপড়ার দলের ভিতর হইতে বন্দী সংগ্রহ করিতে গিয়াছিল। উভয় দলে তুমুল সংগ্রাম বাধিল। এক একটা বড় বড় লাল আততায়ীকে কৃষ্ণবর্ণের চার পাঁচটা পিপীলিকা কামড়াইয়া ধরিল। শেষে অবশ্য তাহারা জয়ী হইয়া কতকগুলাকে বন্দী করিয়া লইয়া পলাইল। অনেকে শত্রুর মৃতদেহ মুখে করিয়া পলাইল। ইহাদের যত কিছু বীরপণা এই কালো Formica Fusca পিপীলিকার উপর। Formica Flava নামক ছোট ছোট হরিদ্রাবর্ণের পিপীলিকারা কিন্তু ইহাদের দর্পচূর্ণ করে। আকারে ইহা-দিগের অপেক্ষা অনেক ছোট হইলেও ফ্লাভার কামড়ে সাঙ্গুনিয়া অস্থির হইয়া পলায়ন করে।

কীট-রাজ্যের এই সকল সন্ধি বিগ্রহ, সখ্য ও কলহের কাহিনী প্রথমে আরব্য উপন্যাসের উপকথার মত মনে হয়। কিন্তু এ সকল কথা মিলাইয়া দেখা মোটেই অসম্ভব নয়।

মৎস্যজাতির মধ্যে অনেক শ্রেণীই দলবদ্ধ হইয়া বাস করিতে ভালবাসে। কলিকাতার পরেশনাথ দেবের মন্দিরে যে জলাশয় আছে তাহাতে রুই কাৎলা মাছ বেশ ঝাঁক বাঁধিয়া ঘাটের ধারে ঘুরিয়া বেড়ায়। তাহারা কেবল স্বজাতির নিকট সামাজিকতা দেখায় না, জৈনদিগের আশ্রয়ে থাকিয়া তাহাদের প্রাণ হইতে মনুষ্যভীতি একেবারে বিলুপ্ত হইয়াছে। লাল মাছ পুষিলে মৎস্যজাতির সামাজিকতা বেশ বুঝিতে পারা যায়। তাহারা বেশ দলবদ্ধ হইয়া ঘুরিয়া বেড়ায়। একবার এক গামলার মাছ মরিতে আরম্ভ করিলে শীঘ্রই উহা মৎস্য-হীন হইয়া যায়। যে মাছটি অবশিষ্ট থাকে তাহার বিষাদ বেশ বুঝিতে পারা যায়। মাছেরা ঝাঁকে ঝাঁকে ঘুরিয়া বেড়ায়, অধিকাংশ মৎস্যকেই সন্তান পালন করিতে হয় না।

জলচর জন্তুদিগের মধ্যে বোধ হয় কুম্ভীরেরাও দল বাঁধিয়া থাকিতে ভাল-

বাসে। জলের ভিতর তাহারা ঠিক কিরূপ ব্যবহার করে তাহা বলা কঠিন। কিন্তু অনেক স্থলে নদীর তীরে বালির উপর আট দশটা কুম্ভীরকে গাদাগাদি করিয়া নির্জ্জীব ভাবে পড়িয়া থাকিতে দেখিয়াছি। আমি কলিকাতায় একটা কুম্ভীরশাবক পুষিয়াছিলাম। অনেক প্রকারে তাহার সহিত সখ্য স্থাপন করিবার চেষ্টা করিয়াছিলাম কিন্তু কোন মতে তাহাকে বশীভূত করিতে পারি নাই। এ বৎসর পূজার সময় এলাহাবাদে একটা কুম্ভীরশাবক পাইয়াছিলাম; কিন্তু তাহারও প্রাণে কিছু মধুর ভাবের অভাব ছিল। স্বজাতি বা অন্যান্য জলচরের সহিত কিন্তু উহারা ওরূপ ব্যবহার করে না। আলিপুরের পশুশালায় কুমীর, কচ্ছপ প্রভৃতি একত্র থাকে। একটির পৃষ্ঠে মুখ দিয়া অপর কুমীরকে নিদ্রা যাইতে দেখিয়াছি।

বৃন্দাবন ও মথুরায় যমুনার জলে কচ্ছপদিগকে বেশ দলবদ্ধ হইয়া থাকিতে দেখিয়াছি। ইহাদের পৃষ্ঠে কঠিন আবরণ আছে বলিয়া, ইহাদের প্রাণে ভয় কিছু অল্প। ইহারা সর্ব্বত্র নির্ভীকভাবে থাকিতে পারে।

সামুদ্রিক খড়্গা মৎস্য প্রভৃতির মাথার উপর চড়িয়া অনেক মাছ নাকি ইতস্ততঃ ঘুরিয়া বেড়ায়। হাঙ্গরদের সম্মুখে এক রকম মাছ বেড়ায়। ইহারা হাঙ্গরদিগকে পথ দেখাইয়া লইয়া যায়। তজ্জন্য ইহাদিগকে পাইলট মাছ বলা হয়। ইহারা হাঙ্গরদিগের উপকার করে বলিয়া হাঙ্গরেরাও ইহাদিগকে রক্ষা করে। এরূপ যৌথ কারবার উভয়েরই পক্ষে সুবিধাজনক।

সর্পজাতি স্বভাবতঃ একেলা থাকিতে ভালবাসে। দুই এক জাতীয় সাপ না কি রাজসাপের সেবা করে। তাহাদের সম্বন্ধে অনেক গল্প অমূলক বলিয়া মনে হয়। কিন্তু সর্পজাতি সঙ্গীতপ্রিয় বলিয়া মানবের বশ্যতা স্বীকার করে। আলিপুরের পশুশালায় একটা স্ফটিক জলপাত্রে প্রায় কুড়িটা জলচর সর্প রক্ষিত হইয়াছে। ইহারা বেশ স্বচ্ছন্দে আছে বলিয়া মনে হয়।

স্থলচর পশুপক্ষীদিগের সৌহার্দ্দ্যের কথা আলোচনা করিবার জন্য তাহাদিগকে দুই ভাগে বিভক্ত করিব। প্রথমতঃ আমরা বন্য পশুপক্ষীর তৎপরে গৃহপালিত পশুপক্ষীর বিষয় উল্লেখ করিব।

পক্ষী জাতি বড় সামাজিক। তাহাদিগকে প্রায় একেলা থাকিতে দেখা যায় না। এমন কি ঘৃণিত শকুনি গৃধিনীরাও দল বাঁধিয়া শ্মশানে ও ভাগাড়ে বসিয়া থাকে। কলিকাতা সহরে ছাদের উপর দুইটা কালো পাখির পালক উড়াইলে পাঁচ মিনিটের মধ্যে দুই শত কাক সমবেত হয়। আকাশে ঝাঁকে

ঝাঁকে চিল উড়িতে থাকে। শালিখ পাখি, টিয়া পাখি, ময়না, মনিয়া প্রভৃতি পালে পালে চরিয়া বেড়ায়। ঘুঘু, পারাবত প্রভৃতি বিহঙ্গমেরও ঐ রীতি। হাঁসের তো কথা নাই। বাল হাঁস ঝাঁক বাঁধিয়া নদীর উপর ভাসিতে থাকে। একটা বন্দুকের শব্দ শুনিলে একেবারে আকাশ ছাইয়া ফেলে। আজ কাল কলিকাতার গঙ্গায় হংসের দল আসিয়া সন্তরণ করে। বড়াল-কবি দেখিয়াছিলেন—

"তীরে নারিকেল মূলে থল্ থল্ করে জল,
ডাহুক ডাহুকী কূলে ডাকে;
সারি দিয়া মরালীরা ভাসিছে তুলিয়া গ্রীবা,
লুকাইছে কভু দাম-ঝাঁকে।"

সকল পক্ষীই সামাজিক, সকল পক্ষীই স্বজাতির সহিত একত্র মিলিয়া বিচরণ করে। তাই ইংরাজিতে কথা আছে যে, এক বর্ণের পাখী একত্র থাকে।

পক্ষী-জগতের একটা যৌথ কারবারের কথা বলিব। তাহা সৌহার্দ্দ্যের পরিচায়ক কি প্রবঞ্চনার দৃষ্টান্ত, তাহা বলিতে পারা যায় না। সম্ভবতঃ ইহা প্রবঞ্চনার দৃষ্টান্ত। তাহা হইলে বড় চতুর পাখিই প্রবঞ্চিত হয়। বায়সের কুলায় কোকিল ডিম পাড়িয়া আসে। কাক সে ডিমে তা দেয়, শাবককে মুখে করিয়া খাওয়ায়, তাহার পর পিক-শাবক বড় হইয়া পলাইয়া যায়। কাক ডাকিলে লোকে বিরক্ত হয় কিন্তু তাহার পালিত পুত্রের পঞ্চম স্বরে বিরহী দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলে, প্রেমিকের প্রাণ আনচান্ করে। গৃহপালিত কুক্কুটী দ্বারা অনেকে হংসের ডিম ফুটাইয়া লয়, হংসশাবক প্রতিপালন করিয়া লয়। যে দিন হংস-শাবক অকস্মাৎ জলে ভাসিয়া যায়, সন্তরণ করে, সেদিন তাহার পালয়িত্রী তীরে দাঁড়াইয়া কত কাতর চীৎকার করে, ডানা নাড়ে। কিন্তু তবুও হংসশিশুকে বর্জ্জন করে না।

ডিম ফুটানো সম্বন্ধে অষ্ট্রীচ্ বা উট্ পক্ষীদিগের মধ্যে একটা যৌথ কারবার প্রচলিত আছে। কতকগুলি উট-পক্ষীবধূ একত্র হইয়া অণ্ড প্রসব করে। প্রথম দিন সকলে মিলিয়া এক স্থলে যত ডিম্ব প্রসব করে একজন পুরুষ-পক্ষী সেগুলির উপর বসিয়া তা' দিতে আরম্ভ করিয়া দেয়। দ্বিতীয় দিনের ডিম্বের উপর আর একজন পুরুষ বসিয়া যায়। এইরূপে চার পাঁচ দিন তাহারা ডিম পাড়ে। পরে কে কাহার মাতা তাহা নির্ণয় করিবার কোনও উপায় থাকে না।

এই সব পাখী আবার শৈশবাবধি মানবের তত্ত্বাবধানে থাকিলে মনুষ্য

জাতির সহিত ইহাদের অকপট বন্ধুত্ব হয়। যাহারা পায়রা পুষিয়াছে তাহারা জানে পারাবত মানুষকে কত ভালবাসে, প্রভুকে কত বিশ্বাস করে। ইহারা আমার পাত হইতে ভাত খাইয়া গিয়াছে, হস্ত হইতে মিষ্টান্ন খাইয়াছে। কাকাতুয়া এবং শুকজাতীয় পক্ষীও এ বিষয়ে বড় স্নেহশীল। কাকাতুয়ারা বড় পান খাইতে ভালবাসে। আমার একটি বন্ধু সিঙ্গাপুর হইতে আমায় একটা কাকাতুয়া আনিয়া দিয়াছিলেন। সে আমার মুখের ভিতর হইতে পান কাড়িয়া খাইত। না দিলে অভিমান করিত, আমার কাছে আসিত না। ইহাদিগকে বশ করিবার প্রধান উপায় হইতেছে ইহাদের গা চুলকাইয়া দেওয়া। আলিপুরের পশুশালার মুর্শীদাবাদ ভবনে যতগুলি কাকাতুয়া ও ম্যাকাও আছে, প্রত্যেকটির ঐ নেশা। গাত্র কণ্ডূয়ন করিয়া দিলে ইহারা বড় সন্তুষ্ট থাকে।

বাঙ্গালীর প্রায় সকল গৃহেই অল্প-বিস্তর পাখী থাকে। সুতরাং পক্ষীদিগের সৌহার্দ্দ্যের কথা সকলেই অবগত। গৃহপালিত ময়ূরদের সম্মুখে শিস্ দিলে বা করতালি দিলে তাহারা পক্ষ বিস্তার করিয়া নৃত্য করে। মনিয়া পাখির পিঁজরায় অধিক সংখ্যক পক্ষী থাকিলে তাহারা সুখে থাকে। একটি সঙ্গী মরিলে তাহারা বিষাদগ্রস্ত হয়। গৃহপালিত কুক্কুট, হংস প্রভৃতি পক্ষীর মানুষের সহিত বিশেষ সদ্ভাব। ইহারা গরু ছাগলের মত মানুষের উপকার করে আর মনুষ্য-গৃহে বসবাস করে। আমি কালকা ষ্টেসনে একবার একটি কুক্কুটের বড় অদ্ভুত ব্যবহার দেখিয়াছিলাম। সে মোরগটি একটি পাহাড়ী রমণীর ক্রোড়ে বসিয়াছিল। একটা রেলের কুলি আসিয়া দুই এক কথায় বচসা করিতে করিতে রমণীটির সহিত কলহ করিল। রমণীও বেশ মুখরা। সে মুখ ছুটাইয়া চীৎকার করিয়া কুলিকে গালি দিল। প্রথমে মোরগটা বিস্মিতভাবে স্ত্রীলোকটির মুখের দিকে তাকাইয়াছিল। তাহাকে উত্তেজিত দেখিয়া সে নিজে উত্তেজিত হইয়া পালক ফুলাইয়া কুলির পায়ে সজোরে ঠোকর দিল। দুই চারিবারের পক্ষ তাড়নায়, পদাঘাতে, চঞ্চুর আঘাতে কুলিটা চলিয়া গেল। মোরগ আবার স্ত্রীলোকের ক্রোড়ে আশ্রয় গ্রহণ করিল।

সে দিন একখানি ইংরাজি কাগজে একটি হংসের কথা পড়িয়াছিলাম। একটি বালক এই হাঁসটির শৈশব অবস্থায় প্রাণ রক্ষা করিয়াছিল। হাঁসটি আজীবন বালককে ভালবাসিত। সে বিদেশে পড়িতে যাইত। মাঝে মাঝে ছুটি পাইলে যখন গৃহে আসিত তখন হংস তাহার সঙ্গ ছাড়িত না। একবার পীড়িত হইয়া বালকটি শয্যাশায়ী হইয়াছিল। তখন হাঁসটি রোগীর গৃহ ছাড়ে নাই।

আমাদের দেশের একদল লোক সামান্য দুই চারি পয়সা লইয়া কত রকমের পাখীর ক্রীড়া প্রদর্শন করে। বাবুই পাখি কেমন কৌশল করিয়া কূপ হইতে জল তুলে। বুল বুলি পাখি পয়সা চিনিয়া বাহির করে। টিয়াপাখি পায়রার গাড়ী চালায়, একটা পাখি তোপ দাগে। পাখীরাও ক্রীড়ার সময় বেশ আনন্দ উপভোগ করে। মানব জাতির সহিত সখ্য স্থাপন করিয়া বিহঙ্গম জাতি কত প্রকার অদ্ভুত কার্য্য করিতে পারে। শ্যেন পক্ষী পূর্ব্বে মানুষকে শীকার ধরিয়া আনিয়া দিত।

পশুদিগের মধ্যে বড় বড় মাংসাশী জীব তেমন সামাজিক নহে। সিংহ, ব্যাঘ্র, ভল্লুক প্রভৃতি দল বাঁধিয়া বিচরণ করে না। কিন্তু মনুষ্যের সহিত ইহাদের সখ্য হয় এবং মনুষ্যের কর্ত্তৃত্বাধীনে ইহারা নানা প্রকার কার্য্য করিয়া থাকে। সম্রাট আকবরের অনেক পালিত চিতাবাঘ ছিল। তাহারা কুকুরের মত সম্রাটের অনুগমন করিত। পালিত চিতাবাঘ সম্রাটের জন্য শীকার করিয়া মাংস আনিয়া দিত। এখনও রাজপুতানায় এক শ্রেণীর লোক পালিত চিতাবাঘ লইয়া শীকার করিয়া বেড়ায়। তাহারা শৃঙ্খলাবদ্ধ চিতাকে গাড়ী করিয়া লইয়া বেড়ায়. বনের পাশে গিয়া হরিণ সন্ধান করিয়া চিতার গলার নিগড় খুলিয়া দেয়। তাহারা গিয়া হরিণ বধ করে। সার্কাসে সিংহ, ব্যাঘ্র, ভল্লুক, কুকুর, ছাগল, গরু প্রভৃতি একত্র বাজি করে।

বন্য অবস্থায় নেকড়েবাঘ, কুকুর, শৃগাল প্রভৃতি একত্র থাকিতে ভালবাসে। কেহ শৃগাল, হেঁড়েল বা নেকড়েবাঘ বশীভূত করিয়াছে, এ কথা শুনি নাই।

ভল্লুকদিগের মানুষের সহিত সৌহার্দ্দ্য জন্মে। ভারতবর্ষের ভালুকনাচ তাহার প্রমাণ। ছোট মাংসাশীদিগের মধ্যে শুনিয়াছি ভোঁদড়েরা মনুষ্যের আজ্ঞাবাহী হয়, মনিবের জন্য পরের পুষ্করিণী হইতে মৎস্য চুরি করিয়া আনে। ভোঁদড়দের দেখিলে একথা বিশ্বাস হয় না। তাহাদিগের ভাম নামক জ্ঞাতি ভ্রাতাগণ অতিশয় অসভ্য। ইহাদিগের প্রাণের সুকোমল বৃত্তির কথা শুনি নাই। নকুল অহি-কুলের চক্ষুশূল হইলেও মনুষ্যের সহিত শীঘ্রই সখ্যতা স্থাপন করে।

কুকুরের মত বিশ্বস্ত বন্ধু মানুষের নাই। কুকুরের প্রভুভক্তির গল্প সকলেই দুই পাঁচটা করিতে পারে। আমার নিজের 'টমি'র এস্থলে একটা গল্প করিবার লোভ সম্বরণ করিতে পারিলাম না। টমি প্রায় এক বছর আমার স্নেহ পাইবার পর আমি একটি খরগোস পুষিয়াছিলাম। আমি রাত্রে যখন আহার করিতাম দুইজনে ঠিক সন্ধান করিয়া আমার দুই পার্শ্বে আসিয়া বসিত। আমিও উভয়কে

কিছু কিছু আহার্য্য দানে পরিতুষ্ট করিতাম। অবশ্য টমি আমায় যেরূপ ভালবাসিত খরগোস তাহার শতাংশের একাংশও বাসিত না। আমি তাহাকে কোলে করিলে টমির বড় হিংসা হইত। আমি যখন তাহাকে ছোলা দিতাম টমি তখন চুপ করিয়া দেখিত। আমার হাত হইতে ছোলা খাইলেই আমি খরগোসকে কোলে লইতাম। এবার টমি আমার স্নেহের কারণটা বুঝিয়া ফেলিল। ছোলা খাওয়ার সহিত যে প্রভুর ক্রোড়ে উঠিবার একটা সম্বন্ধ আছে টমি তাহা বেশ ধারণা করিল। একদিন ঈর্ষাপরবশ হইয়া সে দুইটা ছোলা খাইল। আমি অমনি তাহাকে কোলে করিলাম। টমির ক্ষুদ্র মস্তিষ্কে ধারণাটা বেশ বদ্ধমূল হইয়া গেল। ক্রমশঃ সে খরগোসের সহিত সমানে ছোলা খাইত। আমার বন্ধুরা হাসিত।

মার্জ্জার জাতিও মানব সমাজে বাস করিয়া মানুষের সহিত মিত্রতা করে। আমার বোধ হয় উহারা একটু অধিক সোহাগ চাহে তাই স্ত্রীলোকদিগের সহিত উহাদের বন্ধুত্ব অধিক হয়।

কুকুর, বিড়াল গৃহপালিত হইলে উহাদের ভিতর একটা বড় অদ্ভুত গুণ দেখিতে পাওয়া যায়। উহারা ঠিক বুঝিতে পারে কোন্ জীব তাহাদের নিজের প্রভুর। খাদ্য খাদকের সম্বন্ধ থাকিলেও প্রভু-পালিত জীবের তাহারা কোন অনিষ্ট করে না। পায়রার কাছে বিড়াল থাকিতে দেখিয়াছি, কুকুরের খাবার গিনিপিগ্, খরগোস্, সাদা ইঁদুর প্রভৃতিকে কাড়িয়া খাইতে দেখিয়াছি। আমার একটি বন্ধু গল্প করেন যে তাঁহার একটি পালিত ময়ূর বাটী সংলগ্ন উদ্যানে পড়িয়া গিয়াছিল। পাঁচ সাতটা গ্রাম্য কুকুর তাহাকে ধরিতে চেষ্টা করিয়াছিল। কিন্তু তাঁহার কুকুর সকলের সহিত যুদ্ধ করিয়া তাঁহার ময়ূরটিকে রক্ষা করিয়াছিল।

বৃহৎ পশুদিগের মধ্যে হস্তী, মহিষ, হরিণ, গরু, ছাগল, ভেড়া, অশ্ব, জেবরা প্রভৃতি সমস্ত ক্ষুরযুক্ত জীব সামাজিক—সকলেই দল বাঁধিয়া থাকে। হরিণের দলের সংখ্যা বেশ প্রবল থাকে। আফ্রিকার Spring bok নামক একটা হরিণের পালে নাকি পঞ্চদশ সহস্র জীব ছিল।*

বলা বাহুল্য,এই শ্রেণীর সকল জন্তুই মানুষের সহিত বেশ সখ্য স্থাপন করিতে পারে। অত বড় প্রকাণ্ড হস্তী মাহুতের আজ্ঞায় কি না করে? রাজপুত ও আরবের অশ্ব তাহাদের পুত্রাপেক্ষা অধিক স্নেহ মমতা পাইয়াছে এবং ঠিক সেই পরিমাণে প্রভুভক্তি দেখাইয়াছে। গরু তো হিন্দুর পরিবারভুক্ত হইয়া গিয়াছে।

* Class Book of Geography. 1900. p. 212.

ছাগল ভেড়ারও অবস্থা তদনুরূপ। মৃগগণও বহুদিন ধরিয়া হিন্দুদিগের সহিত সৌহার্দ্দ্য করিতেছে। মুনি ঋষিদের তপোবনে অবধি ইহাদের গতিবিধি ছিল।

মানুষ প্রায় সকল শ্রেণীর জীবের সহিতই বন্ধুত্ব করিতে পারে। বন্য বরাহ মানব-বশ্যতা শীকার না করিলেও তাহাদের জ্ঞাতি ভ্রাতা শূকর, ডোম হাড়ি প্রভৃতির সহিত মিলিয়া মিশিয়া বসবাস করে। আইরিসগণ এক শয্যায় শূকর লইয়া শয়ন করে।

এ প্রবন্ধে সকল জীবের সামাজিক গুণের পরিচয় দেওয়া অসম্ভব। বানর জাতীয় জীব দল বাঁধিয়া থাকে এবং মনুষ্যের আজ্ঞাধীন হইয়া সকল কার্য্য করিতে পারে। শুনিয়াছি বানরে পাখা টানে, এমন কি হিসাব অবধি করিতে পারে। বন মানুষেও নানা প্রকার ক্রীড়া করিতে পারে এবং প্রভুর সহিত খুব সখ্য স্থাপন করে।

উপরে যাহা বলিলাম তাহা হইতে স্পষ্ট প্রতীয়মান হইবে যে,জীবজন্তুর প্রাণে সুকোমল বৃত্তির অভাব নাই।

শ্রীকেশবচন্দ্র গুপ্ত।

ভক্তমাল ও গিরিশচন্দ্র।

[৩]

করমেতি বাই।

করমেতি বাই নামক নাটকের মূল ঘটনাটিও ভক্তমাল হইতে গৃহীত। ভক্তমালের চতুর্ব্বিংশতিমালায় করমেতি বাইয়ের চরিত্র বর্ণনা আছে।

"খাড়েল্যা গ্রামেতে বাস রাজপুরোহিত।
পরশুরাম নাম তাঁর কন্যা সুচরিত॥
করমেতি তাঁর নাম অলপ বয়েস।
বড়ই আশ্চর্য্য কৃষ্ণে একান্ত আবেশ॥
মহা অনুরাগ পরাকাষ্ঠা ঐকান্তিক।
দেহ-অনুরোধ নাহি কি কব অধিক॥
প্রাক্তনিক মতি কৃষ্ণে হঠাৎ লাগিল।
কৃষ্ণরূপ গুণরসে মন ডুবি গেল॥

"দশদিকে কৃষ্ণময় দেখয়ে সকল।
কৃষ্ণ লাগি সদা মন বিরহে বিকল॥
নির্জ্জনে বসিয়া সদা অন্তরে চিন্তয়।
প্রেমাবেশে হাসে কাঁদে পাগলীর প্রায়॥"

(ভক্তমাল)

নাটকেও করমেতির মনে প্রাক্তনের স্মৃতি জাগরূক। সে বলে—

"আমার সব খেলুনি আছে। সেই সেখানে, সেই কোথায় আমার মনে হচ্ছে না।...... কোথায় আছে, কিছু মনে পড়্ছে না।...কিন্তু আছে, আমার কে আছে। মিছে নয়। মিছে নয়।" সেও চারিদিকে কৃষ্ণ দেখে। বলে "আমার মনে হচ্ছে যেন কে বসে আছে, তার রাঙ্গা পা দুখানি দুল্‌ছে।...তুমি দেখ্‌তে পেয়েছ? আমি এক একবার দেখ্‌ছি।"

(১ম অঙ্ক, ১ম গর্ভাঙ্ক)

'প্রেমাবেশে হাসে কাঁদে পাগলীর প্রায়'

ইহাও নাটকে প্রকটিত। করমেতিকে দেখিয়া আলোক বলিতেছে—

" এ কি ভাব! যেন পাগল। গা মাথার কাপড়ের খম্ নেই।" (১ম অঙ্ক, ৩য় গর্ভাঙ্ক)

'কৃষ্ণ লাগি সদা মন বিরহে বিকল'।

নাটকে করমেতি বলে—

"আমি শ্যামকে খুঁজি।...তুমি বল্‌তে পার কোথায় তারে খুঁজে পাব?"

(২য় অঙ্ক, ১ম গর্ভাঙ্ক)

করমেতিকে তাহার স্বামী লইতে আসিল।

"এইরূপ রসে থাকে কথোদিন পরে।
লইতে আইল যাইতে হবে স্বামি ঘরে॥
স্বামিসঙ্গ বিষতুল্য করিয়া মানয়।
বিশেষে বিষয়ী সেই অবৈষ্ণব হয়॥"

(ভক্তমাল)

নাটকেও করমেতি স্বামীর প্রতি বিরূপা। কৃষ্ণ অনুরাগিনী। কিন্তু ভক্তমাল হইতে নাটকে এইস্থলে একটু প্রভেদ আছে। ভক্তমালে আছে, স্বামী লইতে আসিয়াছে বলিয়া নিশীথে করমেতি উচ্চ,গৃহ হইতে লম্ফ প্রদান করিয়া নিয়ে পড়ে।

"এতেক চিন্তিয়া ধনি অর্দ্ধ নিশিযোগে।
ঘর হইতে বাহিরিল মহা-অনুরাগে॥
বাটী হৈতে বাহির হৈতে না পারিয়া।
কোঠার উপর হৈতে পড়ে লম্ফ দিয়া॥"

(ভক্তমাল)

গিরিশচন্দ্র দেখাইয়াছেন, করমেতির স্বামী আলোক করমেতিকে কক্ষমধ্যে রুদ্ধ করাতে করমেতি জানালা হইতে লম্ফ প্রদান করে। নাটকের ঘটনাস্রোত ইহাতে উদ্বেলিত হইয়া উঠিয়াছে।

তাহার পর করমেতি পলায়ন করিতে লাগিল। রাজাজ্ঞায় দূতগণ তাহার অন্বেষণে প্রবৃত্ত হইল। যখন ধরে ধরে তখন

"ময়দানের মধ্যে লুকাইতে নাহি স্থান।
মৃত এক উট পড়ি আছয়ে দেখেন॥
উদর ভিতর তার সড়িয়া গিয়াছে।
গহ্বরের ন্যায় চাম শুকাইয়া আছে॥
দুর্গন্ধি কেলেদ তাহে অতিশয় হয়।
ভিতরে পশিয়া গিয়া লুকাইয়া রয়॥"

(ভক্তমাল)

গিরিশচন্দ্র উটের পরিবর্ত্তে মহিষ করিয়াছেন।

"কোথায় লুকুব ? কোথায় যাব ? একটা মরা মোষ্ পড়ে আছে না ? এই যে তুমি আমার লুকুবার যায়গা করে দিয়েছ। শৃগাল ! তুমি যে আমার এত উপকার কর্‌বে তা আমি জান্‌তেম না। তুমি ওর পেটের ভেতর সেঁধুবার বেশ পথ করেছ। আমি এর ভেতর প্রবেশ করি।"

(৪র্থ অঙ্ক, ১ম গর্ভাঙ্ক)

করমেতি তাহার পর বহুক্লেশে বৃন্দাবনে পৌছিল। সেখানে তাহার পিতা, রাজা প্রভৃতি একত্রিত হইলেন। নাটকেও রাধাকৃষ্ণের মূর্ত্তি দর্শনের পর যবনিকা।

করমেতি বাইয়ের এই সামান্য উপাখ্যানটুকু অবলম্বনে গিরিশচন্দ্র পঞ্চাঙ্ক নাটক রচনা করিয়াছিলেন। আগমবাগীশ, টুক্‌রো, দেমো, অম্বিকা প্রভৃতি বিচিত্র চরিত্রাবলী ও আলোকের অপূর্ব্ব চরিত্রও গিরিশচন্দ্রের নিজস্ব। ওথেলোর ন্যায় আলোকের হৃদয়ে সন্দেহ ও অবিশ্বাসের ঘোর ঝটিকা অতি নিপুণভাবে অঙ্কিত হইয়াছে। করমেতি বাই নাটকের সৌন্দর্য্য প্রদর্শনের স্থল ইহা নহে। সামান্য উপাদান অবলম্বনে গিরিশচন্দ্র কিরূপ বিচিত্র নাটক রচনা করিতে পারেন, ভক্তমালের ক্ষুদ্র কাহিনীটির সহিত করমেতি বাই নাটকের তুলনা করিলেই তাহা বুঝিতে পারা যাইবে।

গিরিশচন্দ্র ভক্তমাল প্রভৃতি গ্রন্থ হইতে নিজ নাটকের উপাখ্যান গ্রহণ করিয়াছেন বলিয়া তাঁহার গৌরবের হানি নাই। মহাকবি সেক্ষপীয়রের শ্রেষ্ঠ নাটকগুলির ঘটনা অন্যত্র হইতে গৃহীত। নাট্যকারের কৃতিত্ব চরিত্র-সৃষ্টিতে

পরিস্ফুট হয়। তাহা গিরিশচন্দ্র অতি সুন্দররূপে দেখাইয়াছেন। রামায়ণ, মহাভারত, পদ্মপুরাণ প্রভৃতি গ্রন্থের উপাখ্যান লইয়াই কালিদাসের অভিজ্ঞান শকুন্তল, ভবভূতির মহাবীরচরিত ও উত্তররামচরিত। গিরিশচন্দ্রের অপূর্ব্ব কৌশলে মানসিক ভাবগুলিকে কথোপকথন দ্বারা প্রকাশ করণ, জীবন্ত চরিত্র সৃষ্টি ও বহু মৌলিক চরিত্র ও ঘটনা তাঁহার অসাধারণ প্রতিভার নিদর্শন। উপাখ্যান বা চরিত্র-গ্রহণের ঋণ তাহাতে লেশমাত্র দোষ অর্পণ করিতে পারে না।

তবে একটা কথা, গিরিশচন্দ্র স্থলে স্থলে অবিকল মূলের অনুসরণ করেন নাই। মূল উপাখ্যান নিজে স্থলে স্থলে পরিবর্ত্তন করিয়াছেন। এই পরিবর্ত্তন করিবার অধিকার তাঁহার আছে কি না? বিল্বমঙ্গলে বণিক্‌পত্নী বিল্বমঙ্গলকে অন্ধ করিয়া দিল ইহাই ভক্তমালের ঘটনা। গিরিশচন্দ্র তাহার পরিবর্ত্তন করিয়াছেন। তাঁহার নাটকে বিল্বমঙ্গল নিজেই নিজের চক্ষু বিদ্ধ করিল। রূপসনাতন নাটকে সনাতন কারাগার হইতে মুক্ত হইল, কিন্তু ভক্তমালে যেরূপ উৎকোচদানে মুক্তিলাভ বর্ণনা আছে, গিরিশচন্দ্রের নাটকে তাহা নাই। এই সকল পরিবর্ত্তন উচিত কি না তাহাই বিচার্য্য।

পাশ্চাত্য শ্রেষ্ঠ নাট্যকার সেক্ষপীয়র নিজ নাটকে অনেকস্থলে এরূপ পরিবর্ত্তন করিয়াছেন। তাঁহার King John নাটকে প্রিন্স আর্থার নিজেই কারা-প্রাচীর লঙ্ঘন করিতে গিয়া প্রাণ হারাইলেন ইহা বর্ণিত আছে। কিন্তু অনেক ঐতিহাসিক রাজা জন্‌ই আর্থারকে নিহত করিয়া তাহার মৃতদেহ বাহিরে ফেলিয়া দিবার আদেশ দেন—এরূপ সন্দেহ করেন। সেক্ষপীয়র কিন্তু কলঙ্ক-বহুল রাজা জনের চরিত্রেও এ কলঙ্কটুকু লাগিতে দেন নাই। সংস্কৃত নাটকেও এরূপ আছে। মহাভারতের শকুন্তলার উপাখ্যানে দুষ্মন্ত ইচ্ছা করিয়া শকুন্তলাকে প্রত্যাখ্যান করিতেছেন। দুষ্মন্ত চরিত্র হইতে এ কলঙ্ক দূর করিতে কালিদাস নিজ নাটকে দুর্ব্বাসার শাপ সৃষ্টি করিলেন। রামায়ণে অন্যায় যুদ্ধে রামচন্দ্র বালিবধ করিলেন বর্ণিত আছে, ভবভূতি নিজ মহাবীর-চরিত নাটকের নায়ক রামচন্দ্রের চরিত্রে এ দোষ যাহাতে স্পর্শ না করে এজন্য রামচন্দ্র সম্মুখ যুদ্ধে বালিবধ করিতেছেন ইহাই অঙ্কিত করিলেন। কবি রাজশেখর নিজ বাল-রামায়ণ নাটকে দেখাইলেন শূর্পণখা ও রাক্ষসগণ কৈকেয়ী ও দশরথের মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া রামচন্দ্রের বনবাসের ব্যবস্থা করিল। তাহাতে দশরথ ও কৈকেয়ীর চরিত্রে দোষ স্পর্শ করিল না। এই সকল পরিবর্ত্তনের প্রধান কারণ

নাটকের চরিত্রগুলিকে দোষমুক্ত করা। সংস্কৃত অলঙ্কারগ্রন্থেও এ কথার সমর্থন আছে। বিশ্বনাথ লিখিয়াছেন—

"যৎ স্যাদনুচিতং বস্তু নায়কস্য রসস্য বা।
বিরুদ্ধং তৎ পরিত্যাজ্যমন্যথা বা প্রকল্পয়েৎ॥"

অর্থাৎ "নায়ক চরিত্র বা নাটকীয় রসের বিরুদ্ধ যে বস্তু তাহা হয় পরিত্যাগ করিবে কিংবা অন্যরূপে পরিবর্ত্তন করিবে।"

এই নিয়মানুসারে গিরিশচন্দ্রের পরিবর্ত্তনগুলিও সমর্থনযোগ্য। তিনি বিল্বমঙ্গলে যে পরিবর্ত্তন করিয়াছেন তাহাতে বণিকপত্নীর চরিত্র দোষলেশহীন হইয়াছে, রূপসনাতনে যে পরিবর্ত্তন করিয়াছেন তাহাতে সনাতনের চরিত্র উজ্জ্বলতর হইয়াছে। কাজেই আমরা মুক্তকণ্ঠে বলিব যে গিরিশচন্দ্র যে পরিবর্ত্তন করিয়াছেন তাহা সুসঙ্গত ও সমীচীন। এ পরিবর্ত্তনের অধিকার প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য উভয় জগতের কবিদেরই আছে এবং বহুদিন হইতে তাঁহারা এ ক্ষমতার ব্যবহারও করিয়া আসিতেছেন।

শ্রীশরচ্চন্দ্র ঘোষাল।

পুরস্কার।

(১)

সদ্য এম, এস্‌সি পাশ করিয়া দীর্ঘ এক বৎসর পরে শ্বশুর-গৃহে আসিলাম, কিন্তু একটা বিশেষ হুলস্থুল পড়িল না, এ বড় বিষম নৈরাশ্য। সকলেরই মুখে যেন একটা গাম্ভীর্য্য, সকলেরই চক্ষে যেন উপেক্ষা। মনে মনে বড় বিস্মিত হইতেছিলাম —কেন এমন হইল। ইহারা পূর্ব্বে আমাকে এত যত্ন, আপ্যায়িত, অভ্যর্থনা করিত, আজ কাহারও মুখে কথা নাই কেন? শুনিয়াছিলাম জামাতা পুরাতন হইলে, অনেকবার শ্বশুর-গৃহে বিনা-নিমন্ত্রণে আতিথ্য গ্রহণ করিলে, সময়ে সময়ে মাঠে শ্বশুরের গরু বাঁধিতে হয়, শিশু শ্যালককে ক্রোড়ে লইয়া 'ঘুম-পাড়ানি মাসি পিসি'র ছড়া আবৃত্তি করিতে হয়। হায়! হায়! এম্, এস্‌সি পাশ করিয়া শেষে আমার ভাগ্যে কি এই হইল?

আমার শ্বশুর পোষ্ট মাষ্টার—বেশ উচ্চ গ্রেডের পোষ্ট মাষ্টার। আপাততঃ

তিনি সোণামুখিতে ছিলেন। বাঁকুড়া জেলার লোকেরা সোণামুখি বলিতে একেবারে অজ্ঞান হইয়া যায়। বোধ হয় দেশের নামে 'সোণা' আছে বলিয়া। আমার কিন্তু মনে হইল সোণামুখি সূর্য্যিমামার দেশে। কি ভীষণ রাস্তা! আমি অশ্লেষা, মঘা মানি না, এমন কঠিন পথ জানিলে পাঁজি দেখিয়া যাত্রা করিতাম। পানাগড় ষ্টেশন হইতে এক পাকা রাস্তা দিয়া দুই দিকে ধরণীর শ্যাম শোভা দেখিতে দেখিতে নিদাঘ মধ্যাহ্নে প্রায় ষোল মাইল গো-শকটের উৎপীড়ন সহ্য করিয়া সেলামপুর নামক গ্রামে আসিয়া পড়িলাম। তাহার নিচেই এক নদী। জন্মান্ধের নাম পদ্মলোচন। নামে নদী বটে কিন্তু তাহার গর্ভে গরু, বাছুর, স্থলচর বিহঙ্গমকুল তৃষ্ণায় কাতর হইয়া তপ্ত বালুকার উপর ঘুরিতেছে। মধ্য স্থলে হাত দেড়েক একটু জলের রেখা। প্রস্থে এই "কুলু কুলু নাদিনী স্রোতস্বতী" (অবশ্য খাতিরে বলিতেছি) প্রায় এক মাইল। আহা কি বিমল আনন্দ! বুঝিলাম বাক্‌শক্তি থাকিলে কুলোয় চড়িয়া ললনা-করে দোল খাইবার সময় খুদ কুঁড়া প্রভৃতি এইরূপ আনন্দধ্বনি করিত। নদী পার হইয়া আবার সুদীর্ঘ পাকা রাস্তা। এ পথে সূর্য্যমামার বড় অনুগ্রহ। প্রাচীন পারসিক জাতি কেন সূর্য্য দেবের গুণে মুগ্ধ হইয়া তাঁহার পূজা করিতেন তাহা বেশ স্পষ্টভাবে বোধগম্য হইতেছিল। আরও বুঝিতেছিলাম কেন শ্বেতবর্ণ আর্য্যজাতি ভারতবর্ষে বাস করিয়া আমার মত "উজ্জ্বল শ্যামবর্ণ" রঙটা জাতীয় রঙে পরিণত করিয়া ফেলিয়াছিল। এত পরিশ্রমের পর শ্বশুরবাড়ী আসিয়া যখন উপযুক্ত অভ্যর্থনা পাইলাম না, তখন একটু নিরাশ হইলাম। বলিলাম—"মনরে, ঠিক হও। কাল্ বোধ হয় শ্বশুর মশায়ের গাভী দোহন করতে হ'বে, শালাবাবুকে ছড়া শুনাতে হ'বে।" দুই একটা ঘুম-পাড়ানো ছড়াও মনে করিয়া লইলাম।

আহারের সময় শাশুড়ি ঠাকুরাণী বলিলেন—পথে কোন কষ্ট হয়নি?

আমি বলিলাম—বিশেষ কিছু না। একবার গরু বোল্‌টু করেছিল, গাড়িখানা মাঠের মধ্যে চলে গিয়েছিল।

ইহাতেও সহানুভূতি পাইলাম না। তিনি একটা ছোট খাট "আহা!" বলিয়াই ক্ষান্ত হইলেন। ভাবিলাম—"যাহা হ'ক শেষ রক্ষা হলেই ভাল। শেষে না রাত্রে বৈটকখানায় একেলা নিদ্রা যেতে হয়।" কিন্তু দেখিলাম ভাগ্য অতটা মন্দ নয়।

অবশ্য রাণী প্রথমটা কথা কহিতে পারিল না। কিন্তু তাহার চক্ষে প্রগল্‌ভতার লক্ষণ বিদ্যমান। তাহাকে বক্ষে টানিয়া লইয়া বলিলাম—রাণী তোমা-

দের বাড়ীতে কি হ'য়েছে? সকলেই নিস্তব্ধ কেন? যেন দেশে বর্গী এসেছে, বুল্‌বুলিতে ধান খেয়ে গেছে।

বর্গীর উপমা দিবার এবং কোকিল, পাপিয়া, দোয়েল, শ্যামা প্রভৃতির নাম না লইয়া নায়িকার সম্মুখে বুল্‌বুলির উল্লেখ করার কারণ ছিল। শালাবাবুর জন্য ছড়া মুখস্থ করিতেছিলাম বলিয়া ঐ নামগুলা মুখে আসিল। রাণী বলিল —শোননি?

আমি ঘাড় নাড়িলাম। সে বলিল—বাবার বড় বিপদ। সরকারি দু হাজার টাকা চুরি গেছে, পুলিস এসেছে, সাহেব সুবো এসেছে, দুজন লোককে ধরেছে, বাবাকেও নাকি—

রাণী কাঁদিয়া ফেলিল। নিমেষ মধ্যে তাহাদের বিষাদের কারণ বুঝিলাম। আত্মীয়দিগের সৌজন্য সম্বন্ধে বৃথা সন্দেহ করিয়াছিলাম বলিয়া দুঃখিত হইলাম।

(২)

পোষ্ট অফিসের সনাতন প্রথা অনুসারে চিঠি পত্র, টাকা কড়ি, পার্শেল, প্যাকেট, রেজিষ্ট্রী, ইন্‌সিওরেন্স ভিন্ন ভিন্ন থলিতে ভরিয়া থলির মুখে মোহর করিয়া পাঠাইতে হয়। টাকা কড়ি বা রেজেষ্ট্রী চিঠি পত্রাদি পোষ্ট মাষ্টার নিজ তত্ত্বাবধানে ব্যাগের মধ্যে রাখিয়া ব্যাগের মুখ মোহরাঙ্কিত করেন। আমি সোণামুখি যাইবার দুই দিন পূর্ব্বে মনসারাম সেন নামক এক ব্যক্তি মনি অর্ডারের জন্য দুইখানি হাজার টাকার নোট দিয়া গিয়াছিল। আমার শ্বশুর মহাশয়ের সম্মুখে যোগেশবাবু নামক একজন কেরাণী সেই নোট দুইখানি ব্যাগের মধ্যে রাখিয়া যুগল পিয়নের দ্বারা মোহরাঙ্কিত করেন। একজন রানার সেই ব্যাগ বাঁকুড়া পোষ্ট অফিসে লইয়া যায়। বাঁকুড়ার পোষ্টমাষ্টার বাবু ব্যাগ খুলিয়া দেখেন ব্যাগে নোট নাই। তিনি তখনই সোণামুখিতে টেলিগ্রাফ করেন। একটা হুলস্থূল পড়িয়া যায়।

যে সময় বাঁকুড়ায় ব্যাগ খোলা হয় সে সময় তথায় সুপারিন্‌টেন্‌ডেণ্ট সাহেব উপস্থিত ছিলেন। এক রকম তাঁহার সম্মুখেই ব্যাগ খোলা হইয়াছিল। ব্যাগের শীলমোহর ঠিক ছিল। পোষ্ট অফিসের কর্ত্তৃপক্ষ এবং পুলিস সোণামুখির যুগল পিয়ন ও যোগেশবাবুর উপর সন্দেহ করিয়া তাঁহাদিগকে গ্রেপ্তার করিয়াছিল। আমার শ্বশুরের উপর তাহাদের সন্দেহ হইয়াছিল কিন্তু তিনি উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারী বলিয়া তাহারা হঠাৎ তাঁহাকে ধরিতে সাহস করে নাই। পুলিসের ইচ্ছা যে তিনি বলেন যোগেশ তাঁহার নিকট হইতে নোট

দুইখানি লইয়া একটু আড়ালে গিয়া ব্যাগ বন্ধ করিয়াছিল। আমার শ্বশুর কিন্তু বিনা অপরাধে যোগেশকে বিপদগ্রস্ত করিতে চাহেন নাই। তিনি সম্পূর্ণ দায়িত্ব গ্রহণ করিতেছিলেন।

জামাতার নিকট একথা বলিতে শ্বশুর মহাশয় লজ্জা বোধ করিতেছিলেন। আমি প্রভাতে উঠিয়া স্বয়ং তাঁহার নিকট একথা উত্থাপন করিলাম। তিনি শিরে করাঘাত করিয়া, অস্ফুট স্বরে অদৃষ্ট, প্রাক্তন, কর্ম্মফল প্রভৃতি কতকগুলা কথা বলিলেন। আমি বলিলাম—যোগেশবাবু কেমন লোক?

তিনি বলিলেন—যোগেশ লোক ভাল নয়। বাজারে সকলের কাছে দেনা। স্বভাব চরিত্রও শুনেছি ভাল নয়। নেশাটেশাও নাকি—

আমি বলিলাম—তবে আর সন্দেহ করছেন কেন?

তিনি বলিলেন—সন্দেহের কোন কারণ নেই। আমি নিজের চোখকে কেমন করে অবিশ্বাস করব? আমার সামনে সে নোট দু'খানা ব্যাগের মধ্যে রেখেছে।

রাখিবার সময় হাত ভরিয়া ধীরে ধীরে নোট দুইখানা বাহির করিয়া লওয়া অসম্ভব নহে। শীলমোহর করিবার সময়, থলের মুখ বন্ধ করিবার সময় কোন প্রকারে নোট দুইখানা বাহির করিয়া লইবার অবসর নিশ্চয়ই তাহার ছিল। কিন্তু শ্বশুর মহাশয় কিছুতেই সে কথা স্বীকার করিলেন না। তিনি একেবারে নিশ্চিতভাবে বলিতে পারেন যে নোট যোগেশের দ্বারা অপহৃত হয় নাই।

আমি বলিলাম—একটু হাতের তারিফ থাকলে কিছুই শক্ত নয়। কল্‌কাতার বাজিওয়ালারা কত রকম বাজি করে দেখেছেন তো। একজন নয়, একশত জন লোকের চোখের সামনে কাটের কৌটার ভেতর গুলি রেখে উড়িয়ে দেয়।

শ্বশুর মহাশয় একটু হাসিলেন। তিনি বলিলেন—পুলিসের ইন্‌স্‌পেক্টারও তাই বলে। কিন্তু আমি স্বচক্ষে দেখেছি—,

আমি বলিলাম—তা' হলে তো বিপদ।

তিনি স্বীকার করিলেন যে বিষম বিপদ তাঁহার সম্মুখে। কিন্তু কোন রকমে তিনি যোগেশের বিপক্ষে সাক্ষ্য দিতে সম্মত হইলেন না। তিনি যোগেশকে নির্দ্দোষ জানিয়া কিরূপে বলিবেন যে যোগেশের নোট তুলিয়া লইবার সুযোগ ছিল। পুলিস তাঁহাকেও চালান দিবে। তাহার পর বিচারে হাকিম যাহা

করেন। আমি বিস্মিত হইলাম। তাঁহাকে অনেক বুঝাইলাম। কিন্তু দেখিলাম, ভদ্রলোক অচল—অটল।

(৩)

ইন্‌স্‌পেক্টার বাবু বেশ ভদ্রলোক। তিনি আমাকে স্পষ্ট করিয়া বলিলেন যে শ্বশুর মহাশয় যদি শেষ অবধি বলেন যে যোগেশের নোট চুরি করিবার সুযোগ ছিল না, তাহা হইলে অগত্যা তাঁহাকে আসামী করিবেন। ফলতঃ ইংরাজ সুপারিন্‌টেনডেণ্ট ব্যক্ত করিয়াছেন যে তাঁহার মতে উভয়ে যোগ সাজস করিয়া এ কার্য্য করিয়াছেন। যুগল যে নির্দ্দোষ তাহা তাহাদের বিশ্বাস। বলা বাহুল্য, আমার ঋষিতুল্য শ্বশুরের উপর সন্দেহ করিয়াছিল বলিয়া সাহেবের ঘাড়টা মট্‌কাইয়া দিবার অথবা তাহার শুভ্রদেহে খানিকটা সালফিউরিক তেজ-আব ঢালিয়া দিবার একটা প্রবল বাসনা আমার হৃদয় মধ্যে অনুভূত হইতেছিল। ইনস্‌পেক্টর সাহেবের সহিত অনেক কথাবার্ত্তার পর তাঁহাকে বলিলাম—"আচ্ছা সেই ব্যাগটা একবার দেখ্‌তে পারি কি ?"

ভদ্রলোক ব্যাগ দেখাইতে সম্মত হইলেন। আমি ব্যাগটি হাতে লইয়া উত্তমরূপে উহা পরীক্ষা করিলাম। শীলমোহর ঠিক ছিল। চারিদিকের শিলাই দেখিলাম, কোন রকম সন্দেহের কারণ পাইলাম না। ব্যাগের ভিতর দেখিলাম ময়লা রহিয়াছে। হাতে কালো কালো ধুলা লাগিল। ব্যাগ যে কেহ খুলিয়াছে একথা কিছুতেই বিশ্বাস হইল না। ব্যাগে নোট পুরিবার সময় যে কেহই হউক নোট অপহরণ করিয়াছে।

ইনস্‌পেক্টার বাবু হাসিয়া বলিলেন—মশায় আমি এ কাজ বাইশ বছর করছি, আমি কি আর ব্যাগটা ভালরকম পরীক্ষা করিনি ?

আমি একটু অপ্রতিভ হইলাম। তাঁহাকে মিষ্টভাষে তুষ্ট করিয়া চুরি সম্বন্ধে আরও নানা কথা কহিলাম। আমার মনে একটা বিষয় সন্দেহ হইতেছিল। সে কথা বলিলে বয়োবৃদ্ধ পুলিস কর্ম্মচারীর নিকট হাস্যাস্পদ হইব বলিয়া তাঁহাকে সে কথা বলিলাম না। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম—মনসারাম সেনকে দুই সহস্র টাকা দিলে সমস্ত ব্যাপার মিটিয়া যায় কি না ?

ইনস্‌পেক্টর একটু চিন্তা করিয়া বলিলেন—বোধ হয় তা'তে সুবিধা হয় না। সরকারী টাকা চুরি হ'য়েছে, এ ব্যাপার কি কর্ত্তৃপক্ষ মেটাতে দেবে ?

আমি ভাবিয়াছিলাম শেষে না হয় শ্বশুর মহাশয়কে বলিয়া তাহাই করিব। একটু নিস্তব্ধ থাকিয়া তিনি বলিলেন—কেন রাজেন্দ্রবাবু কিছু বলছিলেন নাকি ?

আমি বলিলাম—না, শ্বশুর মশায় কিছু বলেন নি। তবে তিনি যোগেশকে উদ্ধার করবার জন্যে আক্কেল সেলামী হিসাবে কিছু দিতে পারেন।

ইনস্‌পেক্টর আপন মনে বলিল—অমনই কি আর কেউ দু'হাজার টাকা দিতে চায়?

আমি তাঁহার দিকে চাহিলাম। লোকটা একটু অপ্রতিভ হইল। বুঝিলাম, পুলিসের প্রায় সকলেই এক ছাঁচে গড়া।

(৪)

মনসারাম সেন অকস্মাৎ দুই হাজার টাকা কোথা হইতে পাইল তাহা জানিবার জন্য ব্যস্ত হইলাম। তাহার বাটী খুঁজিয়া বাহির করিলাম। গ্রামের লোকের মুখে যতদূর শুনিলাম তাহাতে তাহাকে খুব সম্ভ্রান্ত বলিয়া মনে হইল না। তাহার একখানা মনোহারীর দোকান আছে বটে, কিন্তু সে মাসের মধ্যে পনের দিন বাটী ছাড়িয়া বিদেশে থাকে। অনেক সময় কলিকাতা হইতে তাহার নিকট বন্ধু বান্ধবের শুভাগমন হয়। তখন দেশের বিষ্ণু সাহা দুই চারি বোতল উত্তম বিলাতী জিনিস বিক্রয় করিবার সুবিধা পায়।

আমি নানা কথা ভাবিতে ভাবিতে তাহার দোকানের সম্মুখে গিয়া দাঁড়াইলাম। মনসারাম বলিল—বাবু কি চান?

আমি এ প্রশ্নের উত্তর ঠিক করিয়া আসি নাই। হঠাৎ বলিলাম—অ্যাসিড্ আছে? সোণার গাদ কাটে—আরক।

মনসারাম একটু বিস্মিত হইয়া বলিল—এসিড্?

আমি বলিলাম—হ্যাঁ। এসিড্। হাতে দিলে হাত পুড়ে যায়। ফটোগ্রাফিতে লাগে। ছবি তোলা, ফটোগ্রাফি।

পড়িলে ভেড়ার শৃঙ্গে ভাঙ্গে হীরার ধার। গ্রাম্য মনোহারির নিকট এম্-এস্‌সি হতভম্ব হইয়া তাহাকে অ্যাসিডের স্বরূপ বুঝাইতে পারিল না। সে বলিল—আঁজ্ঞা আপনি কুথাকে থাকেন?

আমি একটা মিথ্যা ঠিকানা দিলাম। কেন দিলাম জানি না। সে বলিল—আরে ব্রাহ্মণের হুকাটা লিয়ে আয়।

আমি তামাক খাই না তাহাকে বলিলাম। সে বলিল—এসিড্ একটু দিতে পারি, কিন্তু আপনি তার দাম দিতে লাড়বেক।

আমার নিকট বাস্তবিক ফটোগ্রাফের সকল উপকরণ ছিল। তবু তাহাকে বলিলাম—তুমি বার করনা দেখি।

সে আমাকে আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করিয়া বাড়ীর ভিতর হইতে একটা শিশি বাহির করিল, তাহাতে কোন লেবেল ছিল না। আমি দেখিয়া চিনিলেও একটা পয়সার উপর দু' ফোটা ফেলিয়া বুঝিলাম তাহা নাইট্রিক অ্যাসিড্। আমি তাহাকে বলিলাম—এ অ্যাসিড্ না, হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড্।

সে বলিল—আর নাই।

আমি বলিলাম—দেখ না। যদি ছোট শিশির এক শিশি দিতে পার তো এক টাকা দিব।

একটু ইতস্ততঃ করিয়া সে বাটির মধ্যে প্রবেশ করিল। একটা শিশিতে স্পিরিট আনিয়া বলিল,—এই দেখ্যুন তো।

তাহার চোখ দেখিয়া বুঝিলাম মনসারাম আমার সহিত রঙ্গ করিতেছে। আমি তাহাকে বলিলাম—এ অ্যাসিডে হাতের খোস ভাল হয়। একটু লাগিও ভাল হ'বে।

সে বলিল—আপুনি দেখ্ছি ডাগ্তরের হ্যকেও সরস।

আমি তাহার রসিকতাটুকু পকেটস্থ করিয়া স্বস্থানে প্রস্থান করিলাম।

(৫)

পুলিস সাহেব বলিল—আপনি কে বাবু?

আমার শ্বশুর মহাশয় পরিচয় করিয়া দিলেন। সাহেব হাসিয়া বলিলেন—এখানে আমাদের মূর্খ লোকের আবশ্যক। এম্-এস্ সি বা সিনিয়ার র‍্যাঙ্গ-লারের আবশ্যক নাই।

আমি বলিলাম—সাহেব, পুলিসে দুই একজন র‍্যাঙ্গলার থাকলে—

সাহেব ভ্রূকুটি করিয়া বলিল—ধন্যবাদ। এখন অনুগ্রহ করিয়া বাহিরে যান।

আমি তাঁহাকে বলিলাম যে আমি চোর ধরিয়াছি। তাঁহারাও একটু চক্ষু মেলিয়া দেখিলে এতক্ষণ চোর ঘানি টানিত।

পোষ্ট অফিসের সাহেব বিরক্ত হইয়া বলিল—রাজেন্দ্র তোমার জামাই লেখা-পড়া শিখেছে, ভদ্রতা শেখে নি।

শ্বশুর মহাশয় একটু বিরক্ত হইয়া বলিলেন—ছিঃ বাবা কি পাগলাম করছ?

আমি বলিলাম—পাগলাম কি? আমি চোর ধরেছি।

একটা মহা বাদানুবাদ হইল। আমি পোষ্ট অফিসের সাহেবকে বলিলাম—বেশ আমি এখনি আপনাকে সব বোঝাচ্ছি, একটু অভিনয় করতে হ'বে।

সাহেব বলিল—বেশ বাবু, বলুন আপনার কি বল্বার আছে।

আমি সাহেবকে একটি থলি লইতে বলিলাম। পুলিস সাহেবের হস্তে আমার পকেট হইতে দুইখানি দশ টাকার নোট দিয়া বলিলাম, ইহার ভিতর নিজ হাতে নোট রাখুন।

সাহেব সুবোধ বালকের মত তাহাই করিল। সাহেবদের দ্বারা ব্যাগের মুখ বন্ধ করাইলাম। শীল করাইলাম। তাহার পর বলিলাম—রানারের দ্বারা ব্যাগটি বাঁকুড়ায় পাঠাইয়া দিন আর তাহাদিগকে হুকুম করুন যে তাহারা ব্যাগে কুড়ি টাকা পায় কি না যেন টেলিগ্রাফ করে।

পাগলামির অধ্যায় শেষ করিয়া দুইজন সাহেবে তদারক করিতে বসিল—বিষম তদারক। তাহারা এ ব্যাপার আজ শেষ করিবে। শ্বশুর মহাশয়ের আজ শেষ পরীক্ষার দিন। শ্বশুরবাড়ীতে আজ সকলেই বিষাদগ্রস্ত। আমি জামাতাদিগের আদি ও অকৃত্রিম বিধি অনুসারে ভাবিতেছিলাম কতক্ষণে সূর্য্যদেব অস্তাচলে যাবেন, কতক্ষণে লজ্জানম্রমুখে রাণী ঘরে আসিবে। কিন্তু এই নোট চুরির ব্যাপারে রাত্রি তিনটা বড় সুখে কাটে নাই।

সন্ধ্যা হইল, রাত্রি আটটা বাজিল। আর এক ঘণ্টা। ইতিমধ্যে শ্বশুর মহাশয় সম্বন্ধে সাহেবেরা কিছু সিদ্ধান্ত করিতে পারেন নাই। তিনি বাহিরের ঘরে বসিয়া তামাক টানিতেছিলেন। আমি পড়িতেছিলাম—পড়িতেছিলাম ছাই—কেবল জৃম্ভন করিতেছিলাম, ঘড়ি দেখিতেছিলাম। যদি ক্লান্ত ভাবিয়া শ্বশুর মহাশয় একটু সকাল সকাল ঘরে যাইতে বলেন। বাহিরে একটু শব্দ হইলেই তাকাইয়া দেখিতেছি যদি কর্কশকণ্ঠী সারদা দাসী ডাকিতে আসে। কিন্তু কুগ্রহ পড়িলে শ্বশুরেরও প্রাণে সহানুভূতি আসে না, দাসীও রমণী-সুলভ করুণা ভুলিয়া পাষাণী হয়।

পায়ের শব্দ হইল। হৃদ্‌পিণ্ড সবুর! একি শব্দ! সারদা কি বুট পায়ে দিতে আরম্ভ করিল নাকি? তবে তো দেশের আশা আছে। সর্ব্বনাশ, দুই সাহেব। মুখে একমুখ হাসি—হাতে কাগজ।

আমরা অভিবাদন করিলাম। পুলিস সাহেব বলিলেন—এম্‌-এস্‌সি বাবু এই দেখুন।

কাগজ পড়িলাম। তারের খবর—শূন্য থলি, টাকা পৌঁছায় নাই।

(৬)

প্রথমে ওজর করিলাম। শেষে যখন বুঝিলাম সাহেবদ্বয় নাছোড়বান্দা তখন অগত্যা সংক্ষেপে তাঁহাদিগকে বুঝাইতে আরম্ভ করিলাম।

আমি ফটোগ্রাফির জন্য কতকগুলা রাসায়নিক পদার্থ আনিয়াছিলাম বলিয়া এ ব্যাপারের মীমাংসা করিতে সক্ষম হইয়াছিলাম। যে রকম সাক্ষ্য দেখিলাম তাহাতে নোট চুরির কথাটা বড় প্রহেলিকাময় বলিয়া মনে হইল। মনসারামের নিকট হঠাৎ অ্যাসিড্ চাহিয়া কথাটা আমার মাথায় আসিল। মনসারাম নাইট্রিক অ্যাসিড লইয়া কি করে? তাহার নিকট হাইড্রক্লোরিক অ্যাসিড্ ছিল তাহাও বুঝিয়াছিলাম।

আমরা যখন কলেজে রাসায়নিক পরীক্ষা করিতাম তখন শিখিয়াছিলাম হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড্ ও সোডিয়াম মিশ্রিত করিয়া তাহাতে কোনও কাগজ ডুবাইলে কিছুক্ষণ পরে সে কাগজ আপনা আপনি ভস্মীভূত হইয়া যায়। আমার স্মরণ হইল ব্যাগের মধ্যে কালো কালো গুঁড়া পাওয়া গিয়াছে। নিশ্চয় ঐরূপ অ্যাসিডে ডুবান নোট ব্যাগে রাখা হইয়াছিল। পথে তাহা ভস্ম হইয়া গিয়াছে।

কিন্তু এরূপ ভাবে নোট ভস্ম করাইয়া কাহার কি স্বার্থসিদ্ধি হইতে পারে? আমি এইখানে সূত্র হারাইয়াছিলাম। সাহেবদেরও তাহাই হইল। তাঁহারা উভয়ে এক সঙ্গে আমায় ঐ কথা জিজ্ঞাসা করিলেন। আমি বলিলাম—সাহেব, জালনোট বাজারে চালালে হাতে হাতে ঘুরবার সময় ধরা পড়া সম্ভব। কিন্তু মনি অর্ডার করে জালিয়ে দিতে পারলে ধরা পড়বার সম্ভাবনা থাকে না অথচ সরকারের কাছে টাকার দাবী থাকে।

নয়টা বাজিতে পাঁচ মিনিট ছিল। সারদা দাসী ডাকিতে আসিয়া সাহেব দেখিয়া পলাইয়া গেল। অদৃষ্ট!

সাহেবেরা সিদ্ধান্ত করিলেন যে মনসারামের বাড়ী তল্লাস করিলে নিশ্চয় জাল নোট এবং ঔষধাদি পাওয়া যাইতে পারে। আমি বলিলাম—সাহেব আমার দু'খানা নোট আপনাদের জন্য অ্যাসিডে ডুবিয়ে নষ্ট করেছি।

পুলিস্ সাহেব হাসিয়া দুইখানি নোট আমার হস্তে প্রদান করিলেন। শ্বশুর মহাশয়ের ভ্রূকুটি সত্বেও আমি নোট দুইখানি পকেটস্থ করিলাম।

তাঁহাদের তাড়াইবার জন্য বলিলাম—সাহেব এই বেলা না গেলে মনসারাম সাবধান হ'তে পারে।

ইংরাজ গুণী বলিয়া গুণের আদর জানে। আমাকে পুনঃ পুনঃ ধন্যবাদ দিয়া তাঁহারা মনসারামকে ধরিতে গেলেন। বলা বাহুল্য, তাঁহারা তাহার ঘরে সমস্ত নোটজালের সরঞ্জাম পাইয়াছিলেন।

আমাকে সকলেই আশীর্ব্বাদ করিল। শেষে যখন গৃহে প্রবেশ করিলাম তখন উপযুক্ত পুরস্কার পাইলাম। দেখিলাম ঘরে যাইতে বিলম্ব হইয়াছে বলিয়া পতিপ্রাণা বিরহবিধুরা রাণী গভীর নিদ্রামগ্ন। আমি দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া মনসারাম, পোষ্ট অফিস, পুলিস সাহেব, নাইট্রিক অ্যাসিড্ প্রভৃতিকে অভিসম্পাত করিতে করিতে নিদ্রাদেবীর ক্রোড়ে আশ্রয়লাভ করিলাম।

শ্রীকেশবচন্দ্র গুপ্ত।

বিবেক-বাণী।

ভয়।—সকলকে শোনাও "মাভৈঃ মাভৈঃ"—ভয়ই মৃত্যু—ভয়ই পাপ—ভয়ই নরক—ভয়ই অধর্ম্ম—ভয়ই ব্যভিচার। জগতে যত কিছু negative thoughts, সব এই ভয়রূপ সয়তান থেকে বের হয়েছে; এই ভয়ই সূর্য্যের সূর্য্যত্ব—ভয়ই বায়ুর বায়ুত্ব—ভয়ই যমের যমত্ব যথাস্থানে রেখেছে—নিজের নিজের গণ্ডীর বাইরে যেতে দিচ্চে না। তাই শ্রুতি বল্‌ছেন,—"ভয়াদস্যাগ্নিস্তপতি ভয়াৎ তপতি সূর্য্যঃ। ভয়াদিন্দ্রশ্চ বায়ুশ্চ মৃত্যুর্ধাবতি পঞ্চমঃ।" যে দিন ইন্দ্র চন্দ্র বায়ু বরুণ ভয়শূন্য হবেন—সব ব্রহ্মে মিশে যাবেন—সৃষ্টিরূপ অধ্যায়ের লয় সাধিত হবে। তাই বলি—"অভিঃ" "অভিঃ"।

জ্ঞানালোক।—অদ্ভুত ব'লে একটা কিছু নাই। অজ্ঞতাই অন্ধকার। তাইতে সব ঢেকে রেখে অদ্ভুত দেখায়। জ্ঞানালোকে সব উদ্ভিন্ন হ'লে কিছুতে আর অদ্ভুতত্ব থাকে না। এমন যে অঘটন-ঘটন-পটিয়সী মায়া, তাও লুকিয়ে যায়। যাঁকে জান্‌লে সব জানা যায়, তাঁকে জান—তাঁর কথা ভাব—সেই আত্মা প্রত্যক্ষ হ'লে শাস্ত্রার্থ করামলকবৎ প্রত্যক্ষ হবে।

আত্মা।—আমিত্ব রূপ একটা মিথ্যাভাবে মানুষ hypnotised হয়ে আছে মাত্র। ঐ ভূতটা ছাড়্‌লেই সব স্বপ্ন ভেঙ্গে যায়। আর দেখা যায়, এক আত্মা আব্রহ্মস্তম্ব পর্য্যন্ত সকলে রয়েছেন। এইটি জান্‌তে হবে। এর জন্যই—যা কিছু সাধন ভজন—ঐ আবরণটা কাটাবার জন্য। ওটা গেলেই চিৎ-সূর্য্য আপনার প্রভায় আপনি জ্বলচে দেখ্‌তে পাবে। এই আত্মা স্বয়ং জ্যোতি—স্বসংবেদ্য।

সমাধি-অবস্থা।—সমাধিকালে আমি আর ব্রহ্মের ভেদ চলে যায়—সব এক হ'য়ে যায়—যেন মহাসমুদ্র—জল, জল, আর কিছু নাই;—ভাব আর ভাষা সব ফুরিয়ে যায়। 'অবাঙ্ মনস গোচরম্' কথাটা ঠিক ঠিক উপলব্ধি হয়।

পাপ।—যত প্রকার দুর্ব্বলতার অনুভবকেই পাপ বলা যায় (weakness is sin)। এই দুর্ব্বলতা থেকে হিংসা দ্বেষাদির (Jealousy, hatred) উন্মেষ হয়। তাই দুর্ব্বলতা বা weakness এরই নাম পাপ। ভিতরে আত্মা সর্ব্বদা জল্ জল্ করছে। সে দিকে না চেয়ে এই হাড়মাসের কিম্ভূত-কিমাকার একটা খাঁচা এই জড় শরীরের দিকেই সবাই নজর দিয়ে 'আমি' 'আমি' কর্‌ছে! ঐ হচ্চে দুর্ব্বলতার (weakness-এর) গোড়া। এই অধ্যাস থেকে জগতে ব্যবহারিক ভাব বেরিয়েছে। পরমার্থ ভাব এই সব দ্বন্দ্বের (duality) পারে।

ধ্যান।—কোন বিষয়ে মনের কেন্দ্রীকরণের নামই ধ্যান।

মহৎচিন্তা।—যদি কোন ব্যক্তি গুহায় বসিয়া উহার দ্বার অবরুদ্ধ করিয়া দিয়া যথার্থ একটি মাত্রও মহৎ চিন্তা করিয়া মরিতে পারে, সেই চিন্তা সেই গুহার প্রাচীর ভেদ করিয়া সমগ্র আকাশে বিচরণ করিবে, পরিশেষে সমগ্র মানবজাতির হৃদয়ে ঐ ভাব সংক্রামিত হইবে।

সংস্কারলব্ধ।—তুমি যদি প্রকৃত সংস্কারক হইতে চাও, তবে তোমার তিনটি জিনিষ থাকা চাইই চাই। প্রথমতঃ হৃদয়বত্তা। তোমার ভাইদের জন্য যথার্থই কি তোমার প্রাণ কাঁদিয়াছে? জগতে এত দুঃখ কষ্ট, এত অজ্ঞান, এত কুসংস্কার রহিয়াছে, ইহা কি তুমি যথার্থই প্রাণে প্রাণে অনুভব কর? সকল মানুষকে ভাই বলিয়া যথার্থই কি তোমার অনুভব হয়? তোমার সমগ্র অস্তিত্ব-টাই কি ঐ ভাবে পূর্ণ হইয়া উঠিয়াছে? উহা কি তোমার রক্তের সহিত মিশিয়া গিয়াছে? তোমার শিরায় শিরায় প্রবাহিত হইতেছে? উহা কি তোমার প্রত্যেক স্নায়ুর ভিতর, শিরার ভিতর দিয়া প্রবাহিত হইতেছে? তুমি কি এই সহানুভূতির ভাবে পূর্ণ হইয়াছ? যদি ইহা হইয়া থাকে, তবে বুঝিতে হইবে, তুমি প্রথম সোপানে মাত্র পদার্পণ করিয়াছ। তার পর চাই কৃতকর্ম্মতা—বল দেখি—তুমি দেশের কল্যাণের কোন নির্দ্দিষ্ট উপায় স্থির করিয়াছ কি?—জাতীয় ব্যাধির কোনরূপ ঔষধ আবিষ্কার করিয়াছ কি? হইতে পারে—প্রাচীন ভাবগুলি কুসংস্কারপূর্ণ, কিন্তু ঐ সকল কুসংস্কারের সঙ্গে সঙ্গে অমূল্য সত্য মিশ্রিত রহিয়াছে, নানাবিধ খাদের মধ্যে সুবর্ণ খণ্ড সমূহ রহিয়াছে। এমন কোন উপায় কি আবিষ্কার করিয়াছ, যাহাতে খাদ বাদ দিয়া খাঁটি সোনাটুকু মাত্র

লওয়া যাইতে পারে? যদি তাহাও করিয়া থাক, তবে বুঝিতে হইবে, তুমি দ্বিতীয় সোপানে মাত্র পদার্পণ করিয়াছ। আরও একটি জিনিষের প্রয়োজন—প্রাণপণ অধ্যবসায়। তুমি যে দেশের কল্যাণ করিতে যাইতেছ, বল দেখি তোমার আসল অভিসন্ধিটা কি? নিশ্চিত করিয়া কি বলিতে পার যে, কাঞ্চন, মান যশ বা প্রভুত্বের বাসনা তোমার এই দেশের হিতাকাঙ্ক্ষার পশ্চাতে নাই? তুমি কি নিশ্চিত করিয়া বলিতে পার, যদি সমগ্র জগৎ তোমাকে পিষিয়া ফেলিবার চেষ্টা করে, তথাপি তোমার আদর্শকে দৃঢ়ভাবে ধরিয়া কাজ করিয়া যাইতে পার? তুমি কি নিশ্চিত করিয়া বলিতে পার, তুমি কি চাও তাহা জান, আর তোমার জীবন পর্য্যন্ত বিপন্ন হইলেও তোমার কর্ত্তব্য এবং সেই কর্ত্তব্যমাত্র সাধন করিয়া যাইতে পার? তুমি কি নিশ্চিতরূপে বলিতে পার যে, যতদিন জীবন থাকিবে, যতদিন হৃদয়ের গতি সম্পূর্ণরূপে অবরুদ্ধ না হইবে, ততদিন অধ্যবসায় সম্পন্ন হইয়া তোমার উদ্দেশ্য সাধনে লাগিয়া থাকিবে? এই ত্রিবিধ গুণ যদি তোমার থাকে, তবেই তুমি প্রকৃত সংস্কারক, তবেই তুমি যথার্থ শিক্ষক, তবেই তুমি মানবজাতির পক্ষে মহামঙ্গল স্বরূপ।

সৃষ্টি ও স্রষ্টা।—যদি উপমা দ্বারা বুঝাইয়া দেওয়া দোষাবহ না হয়, তাহা হইলে সৃষ্টি ও স্রষ্টা এই দুইকে দুইটি অনাদি ও অনন্ত সীমান্তর রেখার সহিত তুলনা করা যায়।

ভারতের জাতীয় আদর্শ।—ত্যাগ ও সেবাই ভারতের জাতীয় আদর্শ—এই দুইটি বিষয়ে উহাকে উন্নত করুন, তাহা হইলে অবশিষ্ট যা কিছু আপনা-আপনি উন্নত হইবে। এদেশের ধর্ম্মের নিশান যতই উচ্চ করা হউক, কিছুতেই পর্য্যাপ্ত হয় না। কেবল ইহার উপরেই ভারতের উদ্ধার নির্ভর করিতেছে।

সন্ন্যাস।—'পরহিতায়' সর্ব্বস্ব অর্পণ—এরই নাম যথার্থ সন্ন্যাস।

সেবা ধর্ম্ম।—যদি প্রভুর অনুগ্রহে তাঁহার কোন সন্তানের সেবা করিতে পার, তবে তুমি ধন্য হইবে। নিজেকে একটা 'কেষ্ট বিষ্টু' ভেবো না। তুমি ধন্য যে, তুমি সেবা করিবার অধিকার পাইয়াছ, অপরে পায় নাই।

উচ্চ মঞ্চের উপর দাঁড়াইয়া, 'দুটো পয়সা নে রে বেটা' বলিয়া, গরীবকে উহা দিও না, বরং তাহার প্রতি কৃতজ্ঞ হও যে, সে গরীব হওয়াতে তাহাকে সাহায্য করিয়া তুমি নিজের উপকার করিতে সমর্থ হইতেছ। যে প্রতিগ্রহ করে, সে ধন্য হয় না, দাতাই ধন্য হয়। তুমি যে তোমার দয়া শক্তি জগতে প্রয়োগ করিয়া আপনাকে পবিত্র ও সিদ্ধ করিতে সমর্থ হইতেছ, তজ্জন্য তুমি

কৃতজ্ঞ হও। যাহাকে তুমি সাহায্য করিতেছ, তাহার প্রতি কৃতজ্ঞ হও, তাহাতে ঈশ্বর বুদ্ধি কর। মানবকে সাহায্যরূপ ঈশ্বরোপাসনা করিতে পাওয়া কি আমাদের মহা সৌভাগ্য নহে?

দেশ নায়ক।—Leader কি বানাতে পারা যায়? Leader জন্মায়! বুঝ্‌তে পার্‌লে কি না? লিডারি করা আবার বড় শক্ত—দাসস্য দাসঃ—হাজারো লোকের মন জোগান। Jealousy—selfishness আদপে থাকিবে না—তবে Leader. প্রথম by birth, দ্বিতীয় unselfish—তবে Leader.

ধর্ম্ম।—ধর্ম্ম কি? যা ইহলোকে বা পরলোকে সুখভোগের প্রবৃত্তি দেয়, ধর্ম্ম হচ্ছে ক্রিয়ামূল। ধর্ম্ম মানুষকে দিনরাত সুখ খোঁজাচ্ছে, সুখের জন্য খাটাচ্ছে।

মোক্ষ।—মোক্ষ কি? যা শেখায় যে, ইহলোকের সুখও গোলামি, পরলোকেরও তাই, এই প্রকৃতির নিয়মের বাইরে ত এলোকও নয়, পরলোকও নয়।

ভারতবাসীর অভাব।—যবনদিগের যাহা ছিল, যাহার প্রাণ-স্পন্দনে ইউরোপীয় বিদ্যুতাধার হইতে ঘন ঘন মহাশক্তির সঞ্চার হইয়া ভূমণ্ডল পরিব্যাপ্ত করিতেছে, চাই তাহাই। চাই সেই উদ্যম, সেই আত্মনির্ভর, সেই অটল ধৈর্য্য, সেই কার্য্যকারিতা, সেই একতাবন্ধন, সেই উন্নতিতৃষ্ণা; চাই—সর্ব্বদা পশ্চাদ্দৃষ্টি কিঞ্চিৎ স্থগিত করিয়া, অনন্ত সম্মুখ সম্প্রসারিত দৃষ্টি, আর চাই—আপাদমস্তক শিরায় শিরায় সঞ্চারকারী রজোগুণ।

ভগবান দর্শনে।—জগতের সকল অণু ও পরমাণু মধ্যে ভগবানের অস্তিত্ব বিদ্যমান আছে, এই জ্ঞানে প্রত্যেক বস্তু দর্শন করিলে সেই করুণাময় ভগবানের দর্শনই লাভ করা হয়।

ভগবানের পূজা।—যখন এই বিশ্বজগৎ মঙ্গলময় ভগবানের সৃষ্ট এবং যখন তিনি এই জগৎ হইতে কখনই ভিন্ন নহেন, তখন আপনাকে ভুলিয়া জগতের সকলের জন্য প্রাণপাত করিলে প্রকারান্তরে তাঁহারই পূজা ও তাঁহারই সাধনা করা হয়।

স্বাধীনতা।—সেই স্বাধীন, সেই প্রধান, যিনি ত্যাগী, সংসার-বিরাগী, ইন্দ্রিয়জয়ী ও শান্তিপ্রয়াসী।

শ্রীঅমরেন্দ্রনাথ রায়।

গুলু-গিন্নী।

সেবার বন্ধু মণিলালের আমন্ত্রণে পাহাড়িয়া দেশে বেড়াইতে গিয়াছিলাম। ৫।৭ দিনের মধ্যেই সেখানকার সরলচিত্ত জমীদারের সহিত হৃদ্যতা জমিয়া গেল। ফলে, জমীদার মহাশয় স্বয়ং আসিয়া আমাদিগকে ছেলের বিবাহে নিমন্ত্রণ করিলেন।

শুনিলাম, এই উৎসব উপলক্ষে জমীদার মহাশয় সার্কাসের পর্য্যন্ত ব্যবস্থা করিয়াছেন। যে-সে সার্কাস্ নহে—সর্দ্দার মঞ্জুখাঁর দল—সে অঞ্চলের লোকের মতে তেমন খেলা আর কোথাও দেখিবার সম্ভাবনা নাই। একটা প্রকাণ্ড মাঠে মঞ্জুখাঁ তাঁবু ফেলিয়াছিল। দুই বন্ধু সেখানে গিয়া পৌঁছিলাম।

মঞ্জুখাঁ ভারি ওস্তাদ লোক—দুইবার সহরে যাইয়া সাহেবদের বড় সার্কাস্ দেখিয়া আসিয়াছে। সুতরাং আজকাল যেমন অনেক যাত্রার দল থিয়েটারের ঢঙ্গ নকল করিতেছে, মঞ্জুখাঁও সেইরূপ বেদিয়া ক্রীড়কগুলিকে যথাসাধ্য সুসভ্য করিয়া তুলিয়াছে। এরূপ অবস্থায় তাহার সার্কাস্ যে সকলের আদরণীয় হইবে, তাহাতে আশ্চর্য্য কি?

অনুষ্ঠানের ক্রুটী নাই। সাহেবদের ক্লাউনের অনুকরণে একটা চূণকালী মাখা লোক আসিয়া হাজির হইল। তাহার দুই পার্শ্বে দুটো নেলিকুত্তা অনবরত ঘেউ ঘেউ করিয়া লাফাইতে লাগিল। লোকটা যত ঝরিয়া ফেলিতে চেষ্টা করে, কুকুর দুটা ততই তাহাকে কাম্‌ড়াইতে যায়। পাহাড়ে ছেলেমেয়েগুলি ব্যাপার দেখিয়া হাসিয়া খুন হইতেছিল। খানিকক্ষণ দেখিয়া আমি বলিলাম, "ও মণিলাল, এ যে সত্যসত্যই কাম্‌ড়াচ্ছে হে।" বন্ধু বলিলেন, "সে তো দেখ্‌তেই পাচ্ছি।" "কি রকম? এত কামড়ে ওর লাগ্‌ছে না—মাটীর মানুষ নাকি?" বন্ধু একটু হাসিয়া বলিলেন "যাহার সর্ব্বাঙ্গ অহরহ জ্বলিতেছে, তাহার আর এ কুকুরের কামড়ে কি হইবে?"

আমি অবাক্ হইয়া গেলাম—তাকাইয়া দেখিলাম, সত্যই লোকটা হতাশার চরমসীমায় উপস্থিত হইয়াছে। তাহার মুখের চাম্‌ড়া আল্‌গা হইয়া গিয়াছে—চোখ্ দুটা লাল অথচ ভাবহীন। আর সমস্ত শরীরে এমন একটা নির্জীবতার ভাব রহিয়াছে, যে দেখিলে চৈতন্য আছে বলিয়া মনে হয় না। আমি

শূন্যমনে তাহাকে দেখিতে লাগিলাম। মণিলাল আমার দৃষ্টিপথে দৃষ্টি মিলাইয়া বলিলেন—"দেখ্‌ছ কি? চিনিতে পারিলে? ঐ লোকটাই সেবার কলিকাতায় গিয়া সবাইকে অবাক্ করিয়া দিয়াছিল। গুলু সর্দ্দারের নাম শুনিয়াছ ত'?"

আমি বিস্মিত হইয়া বলিলাম—'এই কি গুলু সর্দ্দার নাকি?' বন্ধু বলিলেন, 'অবিশ্বাসের কোনও কারণ নাই। এই দুঃখের কাহিনীগুলা ভারি সত্য। সে কঠোর সত্য আজ ঐ গুলু সর্দ্দার হাড়ে হাড়ে বুঝিতেছে।'

"গুলু সর্দ্দার কুড়ানো ছেলে। বেদিয়ার দলে মানুষ হইয়া সে নানারূপ কস্‌রৎ শেখে। তাহার মত ডানপিটে ছেলে সে দলে আর ছিল না।

"ঠিক্ সেই দলেই আর একটী ডানপিটে মেয়ে ছিল—সকলে তাহাকে দুলিয়া বলিয়া ডাকিত। এই দুলিয়ার সংস্পর্শে বড় একটা কেহ আসিতে চাহিত না। শুধু গুলু সর্দ্দারই তাহাকে ঠিক বশ করিতে পারিয়াছিল।

"দুজনের সম্প্রীতি ক্রমে প্রণয়ে দাঁড়াইল। এই নূতন টানে পড়িয়া গুলুর টাকার দিকে মন হইল। টাকা না হইলে তো জীবনটা অকারণ শৃঙ্খলিত করিয়া লাভ নাই। এতদিন পরে গুলু এই প্রথম সর্দ্দারের নিকট টাকা চাহিয়া বসিল। বেগতিক দেখিয়া সর্দ্দার উভয়কেই তাড়াইয়া দিল।

"গুলুর সে একদিন গিয়াছে। শুধু দুলিয়ার মনের জোরে এক পয়সা সম্বল না করিয়া সে এক মাস কাটাইয়া দিয়াছে। ক্ষুধার সময় দুলিয়ার মুখ চাহিয়া সে জঠর জ্বালা ভুলিয়াছে—রাত্রে শুধু দুলিয়া কাছে ছিল বলিয়া সে নির্ম্মল সুষুপ্তি লাভ করিয়াছে। এত কঠিন নিগড়ে দু'খানা হৃদয় বিধাতা বোধ হয়, আর কখনও বাঁধেন নাই।

"তারপর গুলু বড় সার্কাসে কাজ পাইল। এখন তাহার আর্থিক কষ্ট ঘুচিল। কিন্তু এক নূতন বিপদ্ তাহাকে মুহ্যমান করিয়া ফেলিল। তাহার দুলিয়া এক পুত্র সন্তান প্রসব করিয়াই ইহলোক পরিত্যাগ করিল।

"শোকের প্রথম ঝাপটেই গুলু অজ্ঞাতসারে পুত্রকে কোলে টানিয়া লইল। তাহাকে সেই বিয়োগ বিধুর বুকে চাপিতেই বিচ্ছিন্ন হৃদয় দুটী যেন আবার জুড়িয়া গেল। একেলা দুজন হইয়া গুলু সমস্ত সুখ, সমস্ত ভালবাসা—সেই মাতৃহারা শিশুর উপর চাপাইয়া দিল।

"তেমন যত্ন বুঝি মা'তেও করিতে পারে না। ছেলে কথা শিখিয়াই গুলুকে 'মা' বলিতে লাগিল। সেই দিন হইতে গুলুর গুণানুরাগী বন্ধুরাও তাহাকে "গুলু গিন্নী" বলিয়া ডাকিতে আরম্ভ করিল।

"কুড়ি বৎসর কাটিয়া গেল। শুধু ছেলের প্রতি চাহিয়া গুলু দু'হাতে টাকা জমাইতে লাগিল, শরীরের প্রতি ভ্রূক্ষেপও করিল না। আবার, সে ছেলেও এমনি হইল যে, তাহাকে দেখিয়া গুলুর বুক দশ হাত হইয়া উঠিত। এইটুকু ছেলের সাহস দেখিয়া সকলেই অবাক্ হইয়া গেল। সুশী যখন প্রাণটাকে তুচ্ছ তাচ্ছিল্যের মধ্যে ফেলিয়া ট্রাপিজের এক বার হইতে অন্য বারে উদ্দামবেগে লাফাইয়া পড়িত, তখন গুলুর পর্য্যন্ত প্রাণ কাঁপিয়া উঠিত। এমন ছেলেকে কি করিয়া আদর করিবে, গুলু কিছুতেই তাহা ভাবিয়া পায় না!

"সেবারে মুলতানে গুলুর দল খেলা দেখাইতে গেল। আসরে নামিয়াই সুশী দেখিল—খুব পাত্‌লা পর্দ্দার আড়ালে এক অসামান্যা সুন্দরী নিবিষ্টচিত্তে খেলা দেখিতেছে ও তাহার দুই পার্শ্বে ৩।৪ জন সম্ভ্রান্তবেশী পুরুষ বসিয়া রসালাপ করিতেছেন। এক নূতন ভাব হৃদয়ে লইয়া সুশী কস্‌রৎ দেখাইতে লাগিল। সমবেত জনসঙ্ঘ তাহার খেলা দেখিয়া হুহুঙ্কার করিয়া উঠিল। স্বেদাপ্লুত-বদনে সুশী বক্সের দিকে তাকাইয়া দেখিল, সুন্দরী বিস্ময়-বিহ্বলনেত্রে তাহার প্রতি চাহিয়া আছে। দৃষ্টিবিনিময়ে সুশীর অঙ্গ কণ্টকিত হইয়া উঠিল। ভারাক্রান্ত হৃদয়ে সে আসর হইতে নিষ্ক্রান্ত হইল।

"বাহিরে আসিয়া সুশী দেখিল—একটী দরওয়ান তাহার অপেক্ষায় দাঁড়াইয়া আছে। অনুসন্ধানে জানিল, তাহার মনিব পিয়ারীবাঈ তাহাকে ডাকিয়াছে। স্বপ্নাবিষ্টের ন্যায় সুশী তাহার অনুসরণ করিল।

"বাড়ী আসিয়াই প্রথমে সে বাপকে ধরিয়া বলিল। কিরূপ বড় বাড়ীতে সে গিয়াছিল, সেখানে কিরূপ আদর পাইয়াছে, পিয়ারীবাঈ তাহাকে কিরূপ ভালবাসিয়াছে,—এই সকল তথ্য সে নানারূপে বাপকে বুঝাইয়া দিল। বেশী কথা তাহাকে বলিতে হইল না। দু' এক কথাতেই গুলু বুঝিতে পারিল—তাহার কপাল ভাঙ্গিয়াছে।

"বাপের মুখ অন্ধকার দেখিয়া ছেলে আপনি চুপ্ করিয়া গেল। ছেলের মুখের হাসিটুকু লুকাইতে দেখিয়া বাপের অন্তরোত্থিত সমস্ত ভর্ৎসনা-বাণী চাপা পড়িয়া গেল। সে রাত্রিটা নীরবেই কাটিয়া গেল।

"ছেলের সঙ্গে বাপে পারিয়া উঠিবে কেন? আব্দার করিয়া, কান্নাকাটী করিয়া সুশী পিয়ারীবাঈর নিকট যাইবার অনুমতি পাইল। গুলু দেখিল, বেশী আটক দিলে সবশুদ্ধ মারা যাইতে পারে; ভাবিল—নেশা বইত' নয়—শীঘ্রই কাটিয়া যাইবে।

"এদিকে ছেলের ক্রমাগত টাকার দরকার হইতে লাগিল। "ওরই জন্য টাকা, ওই খরচ করিতেছে, আমার ইহাতে বাধা দিবার কি অধিকার আছে?" গুলু একে একে সমস্ত সঞ্চিত টাকা ছেলের হাতে সঁপিয়া দিল। ছেলের মুখে হাসি আর ধরে না। 'বাবা, তুমি কি চিরকালই এইরূপে আমায় টাকা যোগাইবে?'

"সেদিন টাকা চাহিতে আসিয়া সুশী শুনিল, সমস্ত টাকা ফুরাইয়া গিয়াছে। ছেলে বাপের গলা জড়াইয়া ধরিল। "বাবা, টাকা আমাকে দিতেই হইবে। নহিলে, পিয়ারীবাঈ আজ বড় চটিবে।" বাপের কাছে এমন করিয়া তম্বী করে—এ ছেলেকে লইয়া কি করা যায়? গুলু বলিল—"যা', সর্দ্দারের কাছে টাকা ধার করিয়া নে।"

"সর্দ্দার ছুটিয়া আসিল—"গুলু, ছেলেটীর মাথা খাইতে বসিয়াছ?" গুলুর মুখ বিবর্ণ হইয়া গেল। "অমন কথা বলিস না ভাই—আমার ঐ ছেলেটীই সব।" সর্দ্দার একটু অপ্রস্তুত হইয়া বলিল—"তা জানি, কিন্তু তা বলিয়া এমন করিয়াই কি টাকা খরচ করিতে হয়?" গুলু বলিল "ভাই, আজ অবধি কখনও ওর কোন আবদার অগ্রাহ্য করি নাই। আজ তুচ্ছ টাকার জন্য ছেলেকে পর করিয়া দিব?" সর্দ্দার বিষণ্ণচিত্তে প্রস্থান করিল।

"ক্রমে টাকার জন্য গুলুকে তিন বছরের অগ্রিম মাহিনা বন্ধক রাখিতে হইল।

"এদিকে পিয়ারীবাঈএর আদরও ক্রমে কমিয়া আসিল। হঠাৎ খেয়াল বশে সে এই সার্কাসের ছেলেটীকে টানিয়া আনিয়াছিল ও সেইজন্য অনেক বড় বড় উমেদারকেও প্রত্যাখ্যান করিয়াছিল। এখন সেই খেয়াল ক্রমশই উপিয়া আসিল। শেষে একদিন স্পষ্টাক্ষরে সে সুশীকে বিদায় দিল। সুশীর সমস্ত শরীর অবসন্ন হইয়া আসিতেছিল—কোনওরূপে বাড়ী পৌঁছাইয়া সে বাপের কোলে মাথা লুকাইল।

"গুলু ভাবিল, ছেলে বুঝি এবার তাহাকে পরিত্যাগ করিল। কিন্তু এ মনোবৃত্তির সার্কাসেও সুশী বিজয় লাভ করিল। অমানুষিক পুরুষকারের সহিত সে তাহার ভাঙ্গা হৃদয়খানি কোনও রূপে জুড়িয়া রাখিল। সকলে ভাবিল, ছেলেটা এ যাত্রায় বাঁচিয়া গেল।

"এক বৎসর কাটিয়া গিয়াছে। আজ লাহোরে গুলুর দল সার্কাস দেখাইতেছে। সমুচ্চ করতালির মধ্যে গুলু চলিয়া গেল, সুশী ধীরে ধীরে আসরে

অবতরণ করিল। একবার কসরৎ করিয়াই সুশী দেখিতে পাইল—প্রশস্ত বক্সের ভিতর সেই অতীত স্মৃতি-সঞ্চিত দিনের মত আজও মহিমাময়ী পিয়ারী বায়ু বসিয়া আছে। আরও দেখিল—তাঁবু শুদ্ধ লোক উদগ্রীব হইয়া তাহার ক্রীড়া-চাতুর্য্য লক্ষ্য করিতেছে, কিন্তু পিয়ারী—পিয়ারী পিছন ফিরিয়া নিবিষ্ট-চিত্তে একটী অনুগ্রহাকাঙ্ক্ষীর সহিত গল্প করিতেছে! সুশীর শিরায় শিরায় আগুন জ্বলিয়া উঠিল। দুই হস্তে লৌহদণ্ড সাপটিয়া ধরিয়া সে প্রচণ্ডবেগে ঢলিতে লাগিল—উত্তেজনায় তাহার নীল শিরাগুলি ফুলিয়া উঠিল—উন্মত্তার আবেশে শরীরের সমস্ত শক্তি কেন্দ্রীভূত করিয়া শেষ একবার উদ্দামবেগে শূন্যে ঝাঁপা-ইয়া পড়িল—তারপর সংক্ষুব্ধ জনসংঘের হাহাকারের মধ্যে তাহার সুকুমার দেহ সশব্দে কঠোর মৃত্তিকায় প্রক্ষিপ্ত হইল!

"বাড়ীশুদ্ধ লোক সেইস্থানে ঝুঁকিয়া পড়িল! সুশীকে যখন সকলে তুলিয়া ধরিল—তাহার প্রাণ বাহির হইয়া গিয়াছে—বুকের সবগুলা পাঁজর ভাঙ্গিয়া গিয়াছে! সেই জনতার মধ্যে পিয়ারীও আসিয়া ঢুকিয়াছিল। ব্যাপার দেখিয়া সে তাহার পার্শ্বের লোকটীকে বলিল—"দেখেছো, একটু আমোদের জন্য এই-খানে আসা, তাও এই লোকগুলা বাহাদুরী দেখাইতে গিয়া ফাঁসাইয়া দিবে।" নিকটেই একখানা ভাঙ্গা পাথরের মত গুলু দাঁড়াইয়াছিল। কথাগুলা তাহার কানে গেল না—যাইলে কি হইত বলা যায় না।

"তারপর দুইদিন ধরিয়া সার্কাসের লোক গুলুর কোনও খোঁজ পাইল না, শেষে একটা মদের দোকানে তাহাকে খুঁজিয়া বাহির করিল। তাহাকে দেখিয়া কেহই অশ্রুসংবরণ করিতে পারিল না—ভাঁটার এককোণে সে নিঝুম হইয়া বসিয়া আছে—সম্মুখে ৩।৪টা খালি বোতল। এ দুদিন দিবারাত্র সে শুধু মদ খাইয়াছে। সেইদিন হইতেই গুলু বৃদ্ধ। মদের জন্য চারিটা পয়সা পাইলে সে এখন যমালয়ের ফটক অবধি যাইতে পারে।"

উন্মত্ত ক্রীড়কের প্রতি চাহিলাম, তাহার মুখে এ কাহিনী বিবৃত ছিল।

শ্রীসুহাসচন্দ্র রায়।

সাহিত্য-সমাচার।

প্রাচীন বাঙ্গালী নাবিক।

বাঙ্গালী নাবিক! বাঙ্গালার বিদেশী বাণিজ্য! বিশ্বাস হয় না, বিদ্রূপ বলিয়া মনে হয়। কিন্তু বাঙ্গালার সুসন্তান শ্রীযুত রাধাকুমুদ মুখোপাধ্যায় মহাশয় সপ্রমাণ করিয়াছেন,—বাঙ্গালী জাতি একদিন নৌবিদ্যায় যশস্বী হইয়াছিল। বাঙ্গালী নৌকা সাজাইয়া বাঙ্গালার বাহিরে নয়, ভারতবর্ষের বাহিরে যাইত, অসভ্য জাতিকে হিন্দু সভ্যতার গণ্ডীর মধ্যে আনিত, বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচার করিত। কবি গাহিয়াছিলেন—

"একদিন যার অর্ণবপোত ভ্রমিল ভারত সাগরময়।"

প্রত্নতত্ত্ববিদ্ রাধাকুমুদবাবু অকাট্য যুক্তির দ্বারা সপ্রমাণ করিয়াছেন যে, বাঙ্গালী ধর্ম্ম প্রচার করিবার জন্য, "হস্তে বৌদ্ধ মতের মশাল লইয়া" চীন, কোরিয়া ও জাপান যাত্রা করিত। এক্ষণে ব্রাহ্মণসভা বিধান দিতেছেন, সমুদ্রযাত্রা করিলে হিন্দুর পাতিত্যদোষ জন্মে। রাধাকুমুদ বাবুর অমূল্য গ্রন্থ ব্রাহ্মণসভার বিধানের উপযুক্ত উত্তর।

মহাকবি কালিদাস রঘুবংশে লিখিয়াছিলেন—

"বঙ্গানুৎখায় তরসা নেতা নৌসাধনোদ্যতান্।
নিচখান জয়স্তম্ভং গঙ্গা শ্রোতোঽন্তরেষু চ॥"

ইহা কবিসম্রাট 'কালিদাসের উপমা' নহে, ঐতিহাসিক সমাচার।

বৌদ্ধধর্ম্ম ভারতবর্ষে শিকড় গাড়িতে পারে নাই বটে, কিন্তু বৌদ্ধযুগে ভারতবর্ষের যশঃসৌরভ সাগর ও হিমালয়-পরিখা অতিক্রম করিয়া সমগ্র আসিয়ায় বিকীর্ণ হইয়াছিল। ভারতবর্ষের সকল প্রদেশের লোকই বৌদ্ধমন্ত্রে অনুপ্রাণিত হইয়াছিল। বাঙ্গালী পিছাইয়া পড়ে নাই। অতীশ, দীপাঙ্কর, শীলভদ্র প্রভৃতি বাঙ্গালী বৌদ্ধ মনীষির যশোগানে একদিন সমগ্র আসিয়া মুখরিত হইয়া উঠিয়াছিল। জ্ঞানশলাকা লইয়া বাঙ্গালীও ছুটিয়াছিল, অনেক দেশ গৌতমের জ্ঞানরশ্মিতে উদ্ভাসিত করিয়াছিল। জাপানের হোরিউজির মন্দিরে একখানি পুঁথি আছে। খৃষ্টীয় একাদশ শতাব্দীর বাঙ্গালা অক্ষরে এই পুঁথি লিখিত। যবদ্বীপের বুরবুদুর (Burobudur) মন্দির হিন্দুর কীর্ত্তিস্তম্ভ। তাহার গাত্রে অনেক ঐতিহাসিক চিত্র আছে। যাঁহারা স্থাপত্য-শিল্পের মাধুরী বুঝেন, তাঁহারা বলেন গুজরাটী ও কলিঙ্গবাসীর সঙ্গে বাঙ্গালী শিল্পকরও এ মন্দিরে চিত্র খোদাই করিয়াছে। বাঙ্গালীরা যে সকল অর্ণবপোত-সাহায্যে ভারতসাগরে বাণিজ্য করিবার জন্য ভ্রমণ করিত, সুমাত্রা, লঙ্কা, চীন ও জাপানে উপনিবেশ করিতে ছুটিত, সেই আকৃতির জাহাজের প্রতিকৃতি যবদ্বীপের হিন্দু মন্দিরে দেখিতে পাওয়া যায়। বাঙ্গালী ভিন্ন কে আর আদর করিয়া তথায় বাঙ্গালার নৌকা আঁকিবে? মহাবংশ ও অন্যান্য বৌদ্ধপুস্তক ব্যক্ত করিয়াছেন যে, আন্দাজ ৫৫০ খৃঃ অব্দে বাঙ্গালা দেশের রাজপুত্র বিজয় ৭০০ অনুচর লইয়া লঙ্কা জয় করিয়াছিলেন এবং তথায় বাঙ্গালীর উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছিলেন। তাঁহার বংশের নামে রাবণ রাজার সোণার লঙ্কার নাম হইয়াছিল—সিংহল। আধুনিক ভাগলপুরের সন্নিকটবর্ত্তী প্রাচীন চাম্পা হইতে বাঙ্গালীর দল কোচিন চীনায় গিয়া উপনিবেশ স্থাপন করিয়া-

ছিল, আপনাদের জন্মভূমির নামে উপনিবেশের নামকরণ করিয়াছিল। বাঙ্গালার শিল্পবিদ্যা নানা দেশে ব্যাপ্ত হইয়াছিল, বাঙ্গালী শিল্পকর ধীমান্ ও তাঁহার পুত্র বিট্পাল নবম শতাব্দীতে নেপালে শিল্পকলার প্রসার করিয়াছিল এবং ক্রমে সে বিদ্যা চীনদেশ প্রভৃতি অন্যান্য বৌদ্ধরাজ্যে প্রবেশলাভ করিয়াছিল।

প্রাচীন বাঙ্গালা সাহিত্যও এ বিষয়ে সাক্ষ্য প্রদান করে। মনসার গান ও চণ্ডীর গানের ভিতর কল্পনাপ্রসূত অনেক অমানুষিক ঘটনা বিবৃত থাকিলেও আখ্যায়িকার মূলে যে সত্য আছে সে বিষয়ে সন্দেহ থাকিতে পারে না। ধনপতি, শ্রীমন্ত ও চাঁদসওদাগরের কাহিনী হইতে বেশ সিদ্ধান্ত করিতে পারা যায় যে, বাঙ্গালী বণিকগণ এক সময় বিদেশ যাত্রা করিয়া অনেক ধনোপার্জ্জন করিয়া আনিত। শ্রীমন্ত সওদাগরের অর্ণবপোত মান্দ্রাজ উপকূলে যাইত, লঙ্কা, মলক্কা, যবদ্বীপ ও চীনদেশ হইতে পণ্য আহরণ করিয়া আনিত। পদ্মপুরাণ বা মনসামঙ্গলে অনেক সমুদ্রযাত্রার উপাখ্যান আছে। পদ্মপুরাণ ইংরাজী ষোড়শ শতাব্দীতে লিখিত হইয়াছিল। তখনও অবধি বাঙ্গালী সমুদ্রযাত্রার গর্ব্বে গৌরবান্বিত হইত। তখন পুরাতন গৌরব-গাথা বাঙ্গালীর প্রাণকে উদ্দীপিত করিত। ত্রয়োদশ শতাব্দীর কবি নারায়ণদেব চাঁদসওদাগরের সমুদ্রযাত্রার উজ্জ্বল ছবি আঁকিয়াছিলেন। বংশীদাসও এ বিষয়ে বিশ্বাসযোগ্য বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। পূর্ব্ববঙ্গ হইতে তখনও নাবিক সংগ্রহ করা হইত। কবিকঙ্কণ, কেতকদাস, ক্ষেমানন্দ প্রভৃতির রচনা হইতে তাহা বুঝা যায়।

তখনকার অর্ণবপোতের বেশ শ্রুতিমধুর নাম ছিল। ধনপতির সিংহলযাত্রার বর্ণনায় কবিকঙ্কণ চণ্ডীতে উক্ত আছে—

প্রথম তুলিল ডিঙ্গা নাম মধুকর—
শুধাই সুবর্ণে তার বসিবার ঘর।
আর ডিঙ্গা তুলিলেক নাম দুর্গাবর ॥
তবে তোলে ডিঙ্গাখানি নাম গুয়ারেখি।
দ্বিপ্রহরের পথে যার মাথা কাঠ দেখি ॥
আর ডিঙ্গা তুলিলেক নাম শঙ্খচূড়।
আশি গজ পানি ভাঙ্গি পাছে লয় কূল ॥
তবে ডিঙ্গাখান তোলে নাম সিংহমুখী।
সূর্য্যের সমান রূপ করে ঝিকিঝিকি ॥

আর ডিঙ্গা তুলিলেক নাম চন্দ্রপাল।
তাথে ভরা দিলে দুই কূলে হয় থাল ॥
আর ডিঙ্গা তুলিলেক নামে ছোটমুখী।
তাহে চালু ভরা চাহে হাজার এক পুটী ॥
সম ধুনা দিয়া তবে গাইল সাত নায়।
তড়িত সমান ডিঙ্গা সাজিয়া চালায় ॥
সাতখানি ডিঙ্গা ভাসে ভ্রমরার জলে।
গোছে বাঁধি রাখে ডিঙ্গা লোহার শিকলে ॥
তার পাছে চলে ডিঙ্গা নাম চন্দ্রপাট।
যাহার উপরে চাঁদ মিলায়েছে হাট ॥

(বিজয় গুপ্ত)

কি সুন্দর দৃশ্য! কি গরিমামণ্ডিত স্মৃতি!

প্রাচীন কালে সাতগাঁও ও সোণারগাঁও বাঙ্গালার বাণিজ্যপ্রধান নগর ছিল। সাতগাঁওকে চরিত্রপুর বলিত। চীন পরিব্রাজক ও টলেমী (Ptolemy) সাতগাঁও নগরের উল্লেখ করিয়াছেন। ভাগলপুরের সন্নিকটস্থ চম্পা সহরেরও বাণিজ্য-খ্যাতি ছিল। কিন্তু বৌদ্ধযুগে বাঙ্গালার সর্ব্বপ্রধান বাণিজ্যের সহর ছিল তাম্রলিপ্ত। মহাবংশ গ্রন্থে ইহাকে তমলিত্ত বলা হইয়াছে।

অশোকের অভ্যুদয়ের পূর্ব্বেই তাম্রলিপ্ত প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল। তাম্রলিপ্ত হইতেই চীন পরিব্রাজক জাহাজে উঠিয়া চতুর্দ্দশ দিন ও চতুর্দ্দশ রাত্রির পর সিংহলে উপনীত হইয়াছিলেন। ইহার সার্দ্ধ দুই শতাব্দী পরেও একজন চীন পরিব্রাজক তাম্রলিপ্তের উল্লেখ করিয়াছেন। তখনও এ নগরে জাহাজ আসিত, তখনও তাম্রলিপ্তে দশটি বৌদ্ধমঠ ছিল, দুই শত ফিট উচ্চ একটি অশোকস্তম্ভ বিদ্যমান ছিল। আর একজন চীন পরিব্রাজক লিখিয়াছেন—"চীন দেশ হইতে আসিয়া আমরা এস্থলে নামিয়াছিলাম।"

বাঙ্গালী নাবিক! বাঙ্গালী বণিক। বাঙ্গালীর অর্ণবপোত জলধিবক্ষে ভাসিতেছে, বিদেশী বাণিজ্যরত বাঙ্গালী বণিক

"শুক্তার বদলে মুক্তা দিল
ভেড়ার বদলে ঘোড়া।"

স্বপ্নচিত্র বলিয়া মনে হয়। কিন্তু সুখ-স্বপ্ন। এ স্বপ্নের জন্য আমরা রাধাকুমুদবাবুর * নিকট ঋণী। তাঁহার লেখনী ধন্য হউক! তাঁহার স্বদেশসেবা সার্থক হউক।

মানসী।—ফাল্গুন। মুখপাতেই শ্রীযুক্ত আর্য্যকুমার চৌধুরীর বহু বর্ণের আলোক চিত্র "বেণী রচনা"। চিত্রখানি অতি সুন্দর হইয়াছে। শ্রীযুক্ত আর্য্যকুমারের আলোক-চিত্র এখন সর্ব্বত্র প্রশংসিত। এ চিত্রখানি তাঁহার সে যশ অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছে। "বসন্ত সম্ভব" এক অপূর্ব্ব কবিতা। "পৌষের সঙ্গে বিবাহ আজিকে বোশেখ মাসের"—কাজেই ইহাতে "সর্ব্বনাশের" সহিত "অবিশ্বাসের" মিল্ আছে, প্রজাপতির খেয়াল আছে আরও আগড়ম-বাগড়ম অনেক ছাইভস্ম আছে—নাই কেবল মিষ্টতা ও কবিতা। "বিচিত্র প্রসঙ্গের আলোচনা" নামক প্রবন্ধে লেখক একটা নূতন কিছু করিয়াছেন—একটা নূতন ঢং বাহির করিয়াছেন বটে, কিন্তু কথাগুলা মোটেই গুছাইয়া ও সরস করিয়া বলিতে পারেন নাই। নিজের ডায়েরীতে নিজে মসগুল হইতে পারা যায় কিন্তু অপরকে আনন্দদান করিতে গেলে কথাগুলা মনোরম করিয়া বলিতে হয়, ভাবগুলাকে শ্রেণীবদ্ধ করিতে হয়। আচার্য্য ব্রজেন্দ্রনাথ শীল মহাশয়ের মুখে যে ভাষা দেওয়া হইয়াছে তাহাতে ঋষিতুল্য আচার্য্য মহাশয় হয়ত ক্রুদ্ধ না হইতে পারেন, কিন্তু অপর কোনও বিখ্যাত ব্যক্তির মুখে ঐ ইংরাজি ও বাঙ্গালার খিচুড়ি, ঐ এলোমেলো 'শিবসঙ্গীত' আরোপ করিলে, লেখককে কিছু দিনের জন্য তাঁহার দর্শনলাভে বঞ্চিত হইতে হইত।—"বাঙ্গালায় চিঠিলেখা" প্রবন্ধের যেমন লিখনভঙ্গী তেমনি যুক্তি-তর্ক। মফস্বলে জমিদারী সেরেস্তায়, থানায় ও ফাঁড়িতে রাশি রাশি বাঙ্গালা চিঠি লেখা হয়। তাহাতে কতক্ষণ সময় লাগে লেখক তাহা দেখিয়াছেন কি? লেখকের গুণের মধ্যে এই যে তিনি সত্যনিষ্ঠ—কারণ নিজ প্রবন্ধ সম্বন্ধে তিনি বলিয়াছেন—"এ যে দেখিতেছি ধান ভানতে শিবের গীত লইয়া বসিয়াছি।" 'রক্ত-কণিকা' বেশ হেঁয়ালি বর্জ্জিত সরল ভাষায় মনোরম রচনা হইয়াছে। "হিন্দুর মায়াবাদ।"—উৎকৃষ্ট প্রবন্ধ। লেখকের পুরাণো কথা নূতন করিয়া বলিবার ক্ষমতা আছে। লেখকের মতে আসল মায়াবাদ বিকৃত

* A History of Indian Shipping and Maritime Activity from the Earliest Time—By Radhakumud Mukerji.

হইয়া বিকৃত অদৃষ্টবাদে পরিণত হইয়াছে এবং এই অদৃষ্টবাদ কতকটা হিন্দুর অনিষ্টসাধন করিয়াছে। বুদ্ধদেবের মায়াবাদের ফলে দেশে মুণ্ডিত মস্তক ভিক্ষু, ভিক্ষুণীর আবির্ভাব হইল, কর্ম্ম গেল সঙ্গে সঙ্গে স্বেচ্ছাশক্তি বা পুরুষকার বিলুপ্ত হইল। ক্রমে হিন্দু সমাজ শিথিল হইয়া পড়িল। আমাদের মনে হয় লেখকের কথা আংশিক সত্য। সকল অপরাধ বৌদ্ধ বেচারাদের মুণ্ডিত মস্তকে ফেলিলে চলিবে কেন? অনেকগুলা কারণ মিলিয়া আমাদিগকে এরূপ শোচনীয় অবস্থায় দাঁড় করাইয়াছে। "ঋণ-পরিশোধ" কবিতায় রসিকতার চেষ্টা সফল হইয়াছে বলিয়া মনে হয় না। "মীমাংসা" গল্পে ছোট গল্পের "আর্ট" ও "নবীন বাঙ্গালা"র তারল্য দেখাইবার উল্লম্ফন নাই। গল্পটি মর্ম্মস্পর্শী হইয়াছে। "কাঙ্গাল হরিনাথের" কথা খুব শিক্ষাপ্রদ। লেখক বুঝাইতেছেনও ভাল। "জীবন" কবিতায় কিছু নূতন তথ্য পাইলাম না। ছন্দটা একেবারে নূতন। স্বাধীনতায় মানব-প্রাণের স্ফূর্ত্তি হইতে পারে; কিন্তু রচনা-নিয়মের গণ্ডী কাটিয়া স্বাধীনভাবে ছন্দ বাহির হইলে তাহা কবিতা নামের যোগ্য হয় কি না সে কথা বিবেচ্য। শ্রীমান্ কালিদাস রায়ের কবিতার শিরোনামাটি গদ্যে হইলেও পদ্যটি সুখপাঠ্য হইয়াছে। ইহাতে কবি-প্রাণের বন্ধু-প্রীতি ও বর্ণনা শক্তি বেশ ফুটিয়া উঠিয়াছে। কতকগুলি মুদ্রাকরের ভ্রমে স্থলবিশেষে কবিতার সৌন্দর্য্যহানি ঘটিয়াছে। মানসীর অন্যান্য স্থলেও আমরা মুদ্রাকর প্রমাদ দেখিয়াছি। কর্তৃপক্ষ এদিকে একটু মনোযোগ দিলে ভাল হয়। 'রত্ন-দীপ' ও "শশাঙ্ক" এখনও চলিতেছে। "অজ্ঞাতের অভিযান" কবিতা পড়িয়া এক রকম মানে বুঝা যায় কিন্তু নামের সহিত মিলাইলে আবার মনে সন্দেহ জন্মে। "নূরজাহান" বেশ চিত্তাকর্ষক হইতেছে, তবে ভাষাটা আর একটু প্রাঞ্জল হইলে বোধ হয় ভাল হয়। লেখক যথেষ্ট বর্ণনা শক্তির পরিচয় দিতেছেন। 'পূর্ণিমা' কবিতা "মাতোয়ারা মধু রজনী"র পরিচয়। কবিতাটি বেশ মধুর হইয়াছে। শ্রদ্ধেয় শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের "নীল পাখী" বড় মনোরম হইয়াছে। অনুবাদে তিনি সিদ্ধহস্ত। "সন্ধ্যা-সঙ্গীত" চিত্রের বর্ণ-বিন্যাস উত্তম হইয়াছে। উত্তরবঙ্গ সাহিত্য-সম্মিলনে সভাপতির অভিভাষণ ইতিপূর্ব্বে সর্ব্বত্র প্রশংসিত হইয়াছে। সমস্ত অভিভাষণটি মানসীতে প্রকাশিত হইয়াছে। বাঙ্গালী মাত্রেরই ইহা অবশ্য পাঠ্য। "জাগরণ" কবিতাটি সুললিত হইয়াছে বটে তবে "গীত-নগরী" 'গোলাপ-জাগান লগ্ন" প্রভৃতি বাঙ্গালী পাঠকের নিকট হাস্যাস্পদ হইতে পারে। "স্বপ্নলব্ধ বিজ্ঞাপনের নমুনা" বেশ সরল রচনা কিন্তু ইহা বড় একঘেয়ে হইয়া পড়িতেছে। যেখানে দু'পয়সার আশা আছে সেখানে সাহিত্যের কশাঘাতে কোনও ফল ফলিবে না। ""কোথায় আমরা যাই" প্রবন্ধে ভাবিবার কথা আছে। মোটের উপর বলিতে পারি কলেবর অনুপাতে মানসীর পাঠ্য বিষয়গুলি সুনির্ব্বাচিত হয় নাই এবং সেরূপ আশা করাও যায় না। আমরা তাহার নিজের কথায় বলি—"আর পৃষ্ঠার সংখ্যা অযথা বাড়াইলেই রাবিশ ছাপা অনিবার্য্য।"

স্বাস্থ্য-সমাচার।—ফাল্গুন—ডাক্তার শ্রীকার্ত্তিকচন্দ্র বসু এম্-বি মহাশয়ের স্বাস্থ্য-সমাচারের ইতিপূর্ব্বে আমরা সমালোচনা করিয়াছি। ইহার বার্ষিক মূল্য এক টাকা মাত্র। আমরা প্রত্যেক বাঙ্গালী গৃহে এ পত্রিকা দেখিলে সুখী হইব। ফাল্গুন সংখ্যায় ডাঃ বসুর

বৈদ্যনাথের স্বাস্থ্য নিবাসের প্রতিকৃতি এবং তাহার বর্ণনা আছে। ক্ষয় রোগীদিগের সুবিধার জন্য তিনি এ ব্যবস্থা করিয়াছেন। ভগবান তাঁহার মঙ্গল করুন। স্বল্প ব্যয়ে বোধ হয় ও স্থলে থাকিবার ব্যবস্থা আছে। "শিশু পালন" প্রবন্ধ আমাদিগের শিশু-জননীদিগের অবশ্য পাঠ্য। পূর্ব্বে বাটীর গৃহিণীরা শিশু-চিকিৎসা জানিতেন। এখন কথায় কথায় ডাক্তার কবিরাজ ডাকিতে হয়। "বসন্ত রোগের টীকা" তত্ত্ব বুঝান হইয়াছে ভাল। এ পত্রিকায় 'প্রেরিত পত্র' নামক অধ্যায়টি বিশেষ উপকারী ও সুখপাঠ্য। গ্রাহকগণ নানারূপ স্বাস্থ্য সম্বন্ধীয় প্রশ্ন করিয়াছেন এবং সম্পাদক মহাশয় সেগুলির উত্তর দিয়াছেন। প্রশ্ন পড়িয়া ডাক্তার বাবুর ধৈর্য্যচ্যুতি হয় না ইহা তাঁহার পক্ষে বিশেষ গুণের কথা। আমরা দুই একটি প্রশ্নের নমুনা দিব। 'লেঙ্গট ব্রহ্মচর্য্যের সহায়তা করে কি না?' 'স্বপ্ন দেখা ভাল না খারাপ?' "সাধারণতঃ কয় বৎসর বয়স্ক যুবকের সহিত কয় বৎসর বয়স্কা যুবতীর বিবাহ হওয়া যুক্তিসঙ্গত?" 'অধিক পরিমাণে তৈল মাখিলে কোন অপকার হয় কি না?' শেষ প্রশ্নের উত্তরটিও বেশ—"অধিক পরিমাণে তৈল মাখিলে তৈলের অপচয় হয় মাত্র।"

প্রশ্ন—ক্রন্দন করিবার সময় বেশী জল বাহির হইলে শরীরের কোন ক্ষতি হয় কি না?

উত্তর—যে কারণে জল নির্গত হয় তাহা শরীরের পক্ষে অনিষ্টকর হইতে পারে।

মিটাপুকুর, বর্দ্ধমান হইতে একজন ভদ্রলোক প্রশ্ন করিয়াছেন—"অশ্বের গাত্রের গন্ধে কিম্বা অশ্বের মল মূত্রের দুর্গন্ধে শারীরিক কোন অনিষ্ট হয় কি না?" ডাক্তার বাবু উত্তর দিয়াছেন—"সকল রকম দুর্গন্ধই স্বাস্থ্যহানিকর।" তাই বলিতেছিলাম কার্ত্তিক বাবুর মেজাজ খুব ঠাণ্ডা।

আমরা স্বাস্থ্য-সমাচারের উন্নতি কামনা করি।

Folk Tales of Hindusthan—By Shaikh Chilli—Panini Office, Allahabad—Rs 2. গ্রিমস্, এণ্ডারসন প্রভৃতির গল্প ইংরাজ বালক বালিকার মনোরঞ্জন করিয়া আসিতেছে। ইংরাজি শিক্ষিত বাঙ্গালী ছেলেমেয়েকে এতদিন ইংরাজি খোস্ গল্প পড়িতে হইত। এই পুস্তকখানিতে সে অভাব মোচন হইয়াছে। গল্পগুলি ইংরাজিতে লিখিত হইলেও ইহার ভাব হিন্দুস্থানী। ফলতঃ আমাদের দেশের প্রচলিত অনেক উপকথা এ পুস্তকে সন্নিবেশিত হইয়াছে। তাই এ পুস্তক ভারতবর্ষীয় ছেলেমেয়ের অধিক মনস্তুষ্টি করিতে পারে।

কেবল যে পুস্তকের গল্পগুলি সুখপাঠ্য তাহা নহে। অতি প্রাঞ্জল ইংরাজিতে পুস্তকখানি রচিত। এ পুস্তক পাঠ করিয়া বালক বালিকা বিশুদ্ধ ইংরাজি শিখিতে পারিবে, আমাদের ইহা বিশ্বাস।

পুস্তকের ছাপা ও কাগজ উৎকৃষ্ট। চিত্রগুলি বেশ মনোরম। এ পুস্তকের বঙ্গানুবাদ হইয়াছে।

আমরা পুস্তকখানির বহুল প্রচারে সুখী হইব।

শ্রীকেশবচন্দ্র গুপ্ত।

অর্চ্চনা, ১১শ বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা।

ভারবি ও বৃত্রসংহার।

'কিরাতার্জ্জুনীয়' মহাকবি ভারবি-প্রণীত একখানি ভাব-গম্ভীর কাব্যগ্রন্থ। এই সংস্কৃত কাব্যে বর্ণিত কতকগুলি ঘটনা ও কয়েকটী চরিত্রের সহিত অমর কবি হেমচন্দ্রের রচিত "বৃত্রসংহার" নামক মহাকাব্যে প্রদর্শিত আংশিক ঘটনা ও চরিত্রগত সাদৃশ্য পরিলক্ষিত হয়। 'কিরাতার্জ্জুনীয়ে'র কোন্ কোন্ ঘটনা ও কোন্ কোন্ চরিত্রের সহিত 'বৃত্রসংহারে'র কোন্ কোন্ ঘটনা ও কোন্ কোন্ চরিত্রের সাদৃশ্য পরিস্ফুট, তাহা এই প্রবন্ধে আমরা লিপিবদ্ধ করিলাম।

ঘটনা সাদৃশ্য।

ঘটনা, কিরাতার্জ্জুনীয়।

দুর্ব্বৃত্ত দুর্য্যোধনের কপটতায় হৃতরাজ্য ও হৃতসর্ব্বস্ব হইয়া ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির ভ্রাতৃ ও বধূ সমভিব্যাহারে 'দ্বৈতবনে' আসিয়া বাস করিতে লাগিলেন। শোক দুঃখে জড়িত হইয়া কতদিনই তাঁহাদের কাটিয়া গেল। অনন্তর একদিন তাঁহাদেরই কল্যাণ-পরতন্ত্র সমাগত মহর্ষি দ্বৈপায়নের পরামর্শে মহাবীর অর্জ্জুন ইন্দ্রকীল পর্ব্বতে তপস্যার্থ প্রেরিত হইলেন। উদ্দেশ্য, দিব্যাস্ত্র লাভ। ফল, কৌরবগণের গৌরব-রবির চিরদিনব্যাপী অন্তর্দ্ধান। কর্ম্মবীর অর্জ্জুন, বিঘ্নসহস্র পদদলিত করিয়া অনশনে সংযত মনে ইন্দ্রের তপস্যা করিতে লাগিলেন। বাহ্য প্রকৃতির কত যে বিভীষিকাময়ী মূর্ত্তির তিরোভাব হইল, কত যে মাধুর্য্যময়ী লীলা কেবল স্মরণমাত্রেই পর্য্যবসিত হইল, কে তাহার ইয়ত্তা করিবে? অর্জ্জুনের দৃষ্টি তপস্যায়। তাঁহার প্রাণ, মন, আত্মা সমস্তই ইন্দ্রের চরণে সমর্পিত। বাহ্য বিলাস মুহূর্ত্তের জন্যও তাঁহার হৃদয়ে প্রস্ফুরিত হয় না। অনন্তর পুত্রের এই উদাসীন তপস্যায় ইন্দ্রের হৃদয়ে প্রগাঢ় করুণা সঞ্চরিত হইল। ইন্দ্র তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া বলিলেন, তাত! তোমার তপস্যায় আমি প্রীত হইয়াছি। তুমি দেবাদিদেব মহাদেবের তপস্যা কর, অভিলাষ পূর্ণ হইবে, এই বলিয়া ইন্দ্র অন্তর্হিত হইলেন। কালে মহাদেবেরও হৃদয়ে তাঁহার সেই কঠোর তপস্যা-প্রসূত প্রীতি-সম্ভার বিকশিত হইল। মহাদেব তাঁহাকে দিব্যাস্ত্র 'পাশুপত' প্রদান করিলেন। অর্জ্জুনের অভিলাষ পূর্ণ হইল। তিনি সফলকার্য্য হইয়া

ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরের সমীপে আগমন করিলেন। ইহাই হইল কিরাতার্জ্জুনীয়ের ঘটনাংশ।

ঘটনা, বৃত্রসংহার।

দুর্ব্বৃত্ত বৃত্রাসুর কর্ত্তৃক হৃতসর্ব্বস্ব হইয়া দেবগণ নিবিড় তমসাচ্ছন্ন পাতালপুরীতে আসিয়া বাস করিতে লাগিলেন। অতীতের কত মর্ম্মদাহিনী ঘটনার সহিত কত দিনই তাঁহাদের কাটিয়া গেল। দেবরাজ ইন্দ্র দেবগণের সহিত পরামর্শ করিয়া সুমেরু পর্ব্বতে নিয়তির তপস্যায় ব্যাপৃত হইলেন। উদ্দেশ্য, বৃত্রের শান্তিময় তপোবনে চিরদিনের জন্য প্রচণ্ড দাবানল প্রজ্বলিত করা। কত দিন, কত মাস, কত বর্ষ, কত যুগ পর্য্যন্ত অতীত হইল, কিন্তু ইন্দ্রের ভ্রূক্ষেপ নাই, তাঁহার উৎসাহের বিন্দুমাত্র ত্রুটি নাই। সে গম্ভীরতা, সে হৃদয়ের প্রসন্নতা, সে মানসিক অনাবিলতা এ সমস্তই তাঁহার সমভাবে বর্ত্তমান। অনন্তর গুণগ্রাহিনী নিয়তি ইন্দ্রের এই কঠোর তপস্যায় প্রীত হইলেন এবং তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া বলিলেন, দেবরাজ! আমি আপনার তপস্যায় প্রীত হইয়াছি, কিন্তু আপনার অভিলাষ পূর্ণ করিবার শক্তি আমার নাই, আপনি মহাদেবের নিকট গমন করুন, কামনা পূর্ণ হইবে, এই বলিয়া নিয়তি অদৃশ্য হইলেন। দেবরাজ ইন্দ্রের হৃদয়ে মুহূর্ত্তের জন্য আনন্দের তটিনী বহিয়া গেল। তিনি ক্ষণমাত্র বিলম্ব না করিয়া মহাদেবের পাদপদ্মে আসিয়া উপস্থিত হইলেন, বাষ্পস্খলিতাক্ষরে তাঁহাকে প্রাণের বেদনা নিবেদন করিলেন। ভক্তবৎসল মহাদেব! তাঁহারও হৃদয় তখন কিঞ্চিৎ বিচলিত হইল। পরে কারুণিক মহাদেবের করুণায় ইন্দ্রের অভিলাষ পূর্ণ হইল। তিনি বিজয়াস্ত্র 'বজ্র' লাভ করিয়া দেবগণের সহিত আবার মিলিত হইলেন। ইহাই হইল বৃত্রসংহারের আংশিক ঘটনা।

দেখা যাইতেছে, দেববৃন্দ ও পাণ্ডবগণ উভয় পক্ষই শত্রুর প্রতাপে বিপর্য্যস্ত ও হতপ্রভ হইয়া রাজ্যচ্যুত ও স্থানভ্রষ্ট হইয়াছিলেন। "কিরূপে বৃত্রাসুরের গৌরব-রবি চিরদিনের জন্য অস্তমিত হইবে, আবার কিরূপে আমরা স্ব স্ব পদবীতে প্রতিষ্ঠিত হইতে পারিব", কি দিবা কি রাত্রি সকল সময়ে এই চিন্তাই কেবল দেবগণের হৃদয় পূর্ণমাত্রায় অধিকার করিয়াছিল এবং সেই চিন্তার ফলেই দেবগণ আবার স্ব স্ব স্থানে প্রতিষ্ঠিত হইবার যোগ্য হইয়াছিলেন। আর পাণ্ডবগণও, কেবল কিরূপে দুর্য্যোধনের উন্নত শির অবনত হইবে, কিরূপে তাঁহারা আবার হৃতরাজ্য উদ্ধার করিতে পারিবেন, এই চিন্তায় ব্যাপৃত হইয়া-

ছিলেন। আবার সে চিন্তাও তাঁহাদের প্রার্থিতফলপ্রসূ হইয়াছিল। সুতরাং দেখা যাইতেছে, চিন্তা উভয়েরই এক এবং তাহার ফলও উভয়েরই সমান। দেবরাজ ইন্দ্র কোন দিব্য শক্তি বা অস্ত্রান্তরের সহায়তা ব্যতীত বৃত্রাসুরকে নাশ করিতে অক্ষম। এইজন্য কোন দিব্যশক্তি বা অস্ত্রান্তরের লাভেচ্ছাই তাঁহার বলবতী। আবার অর্জ্জুনও কোনও দিব্যশক্তি বা অস্ত্রান্তরের সহায়তা ব্যতীত কুরুকুল নাশ করিতে অক্ষম এবং এইজন্যই তাঁহারও তল্লাভের ইচ্ছা নিতান্ত বলবতী। দেবরাজ ইন্দ্র শত্রুগণের উচ্ছেদ-বাসনা হৃদয়ে পোষিত করিয়া কঠোর তপস্যা আচরণ করিলেন, আর অর্জ্জুনও পরম শত্রু কুরুকুলের 'আয়ুঃ সূর্য্য অস্তমিত' করিবার জন্য কঠোর তপস্যায় ব্রতী হইলেন। নিয়তি ইন্দ্রের তপস্যায় প্রীত হইয়াও তাঁহার অভিলাষ সম্যকরূপে পূর্ণ করিতে পারেন নাই। আর ইন্দ্র, তিনিও অর্জ্জুনের তপস্যায় প্রসন্ন হইয়া তাহার কামনা পূর্ণমাত্রায় ফলবতী করিতে পারেন নাই। কেবল দেবাদিদেব মহাদেব হইতেই ইন্দ্র ও অর্জ্জুন উভয়েরই কামনা সফল হইল। সুতরাং মহাদেবের শ্রেষ্ঠতা, ভারবি ও বৃত্রসংহার উভয় গ্রন্থেই সম্যক্‌রূপে পরিস্ফুট। ইন্দ্রের তপস্যার স্থান পর্ব্বত আর অর্জ্জুনেরও তপস্যার স্থান পর্ব্বত। তবে পর্ব্বত দুইটীর নাম এক নহে। একটীর নাম সুমেরু, আর অপরটীর নাম ইন্দ্রকীল।

অর্জ্জুনের তপোবিঘ্নার্থ দেবরাজ ইন্দ্র কর্ত্তৃক স্বর্গ হইতে বিদ্যাধরী প্রভৃতি সুরকামিনীগণ প্রেরিত হইয়াছিলেন। স্বয়ং মহাদেব কিরাত মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া এবং সুরপতি ইন্দ্র বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের বেশ ধারণ করিয়া অর্জ্জুন-সমীপে সমাগত হইয়াছিলেন, কিরাতার্জ্জুনীয়ে এ ঘটনাগুলি অতিরিক্ত আছে। বৃত্র-সংহারে এ সব ঘটনা দেখিতে পাওয়া যায় না। ইন্দ্র দেবতা, সুতরাং দেবতার নিকট দেবতার ছলপ্রয়োগ ততটা সম্ভাবিত নহে। আমাদের মনে হয়, অমর কবি হেমচন্দ্র বোধ হয় এইজন্যই ঐন্দ্রজালিক ঘটনাগুলি 'বৃত্রসংহারে' পরিহার করিয়াছেন।

কিরাতার্জ্জুনীয়ে আরও কতকগুলি ঘটনা, অস্ফুটভাবে লিখিত হইয়াছে। কবি সেগুলিকে পূর্ণরূপে পরিস্ফুট করেন নাই। তথাপি তাহার যেরূপ আভাস পাওয়া যায়, ঘটনালোচনায় তাহাই পর্য্যাপ্ত। এ ঘটনাগুলির সহিতও বৃত্রসংহারের ঘটনার সাদৃশ্য আছে। আমরা নিম্নে তাহাও লিপিবদ্ধ করিলাম।

ক্রূরমতি দুর্য্যোধন দীর্ঘকাল ধরিয়া রাজ্যলক্ষ্মীর উপভোগ করিতে পান

নাই। স্বল্প দিনের মধ্যেই তাঁহাকে মহানিদ্রায় অভিভূত হইতে হইয়াছিল। আর বৃত্রাসুর, তিনিও অবিচ্ছিন্নভাবে রাজ্যভোগ করিতে পান নাই। তাঁহাকেও স্বল্প দিনের মধ্যেই কালের করাল কবলে পতিত হইতে হইয়াছিল।

পাপমতি দুর্য্যোধনের আজ্ঞায় দুরাচার দুঃশাসন কর্ত্তৃক পতিব্রতা দ্রৌপদী সবলে রাজসভায় নীত হইয়াছিলেন। আবার বৃত্রাসুরের আজ্ঞায় তদীয় পুত্র রুদ্রপীড় কর্ত্তৃক সাধ্বী ইন্দ্রাণীও বলপূর্ব্বক হৃত হইয়াছিলেন। "দ্রৌপদী দাস্য-বৃত্তি অবলম্বন করিয়া অবস্থিতি করুন" দুর্য্যোধনের এই ইচ্ছাই নিতান্ত বলবতী, আর ইন্দ্রাণী ঐন্দ্রিলার পদসেবা করুন, ইহাই দুর্ব্বৃত্ত বৃত্রাসুরেরও গূঢ় অভিপ্রায়।

উল্লিখিত কয়েক স্থলেই কিরাতার্জ্জুনীয় ও বৃত্রসংহারের ঘটনা-সাদৃশ্য পরিলক্ষিত হয়। দধীচির আত্মবিসর্জ্জন প্রভৃতি কয়েকটী ঘটনার সহিত কিরাতার্জ্জুনীয়ের সাদৃশ্য নাই।

চরিত্র—(ভীম ও বৈশ্বানর)।

অভিমানিনী দ্রৌপদী বনেচরকৃত শত্রুগণের অজস্র প্রশংসায় একেবারে বিপর্য্যস্ত ও হতপ্রভ হইয়া জলদ-গম্ভীর স্বরে বলিতে লাগিলেন,—

"ভবাদৃশেষু প্রমদাজনোদিতং	ভবাদৃশ গুরুজনে নারীর বচন
ভবত্যধিক্ষেপ ইবানু শাসনং।	হ'তে পারে এ সময়ে তিরস্কার সম—
তথাপি বক্তুং ব্যবসায়য়ন্তি মাং	ত্যজি লাজ মন মাঝে বেদনা বিষম
নিরস্তনারীসময়া দুরাধয়ঃ ॥"	চালিত করিছে মোরে বলিতে এখন ॥
ভারবি ১ম সঃ ২৮শ শ্লোঃ।	নবীনচন্দ্র কবিগুণাকর।

নিজের অবশ্য প্রতিপাল্য শালীনতা বিস্মৃতির জলে ডুবাইয়া দিয়া আরও কত কি বলিলেন (১) অতীতের কত দুঃখময়ী স্মৃতি উদ্বোধিত করিতে লাগিলেন। আর ভীম, তাঁহার হৃদয়ে তখন ঝটিকা বহিতে লাগিল। শিরায় শিরায় তীব্র তড়িৎ ঘন ঘন ছুটিতে লাগিল। চিন্তাস্তিমিত নেত্রে রোষ-দীপ্তি ফুটিয়া উঠিল। সে মার্জ্জিত বুদ্ধি, সে প্রদীপ্ত জ্ঞান, সে অনাবিল গম্ভীরতা এ সমস্তই তাঁহার মুহূর্ত্তের মধ্যে অন্তর্হিত হইয়া গেল। কেবল সেই শত্রুগণের অভ্যুন্নতির চিত্র তাঁহার নেত্রসম্মুখে প্রতিফলিত হইল। প্রতিফলিত হইল, সেই শত্রুগণের উদ্দাম উচ্ছৃঙ্খলতা। হৃদয়ের তন্ত্রীতে তন্ত্রীতে অনুরণিত হইল,—সেই রাজপুত্রী যাজ্ঞসেনীর উদ্দীপনী ভাষা। কর্ম্মবীর বৃকোদর হৃদয়ের তীব্র আবেগ, দারুণ

(১) ভারবির প্রথম সর্গ দ্রষ্টব্য।

উচ্ছ্বাস আর সম্বরণ করিতে পারিলেন না। কেবল অন্তঃসঞ্চিত চিন্তার সহিত দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়া বজ্রনির্ঘোষে বলিয়া উঠিলেন,—

"ইয়মিষ্টগুণায় রোচতাং রুচিরার্থা ভবতেঽপি ভারতী
নন্বু বক্তৃবিশেষনিঃস্পৃহা গুণগৃহ্যা বচনে বিপশ্চিতঃ।
ভাঃ ২য় সঃ ৫ম শ্লোঃ।

"গুণগ্রাহী তুমি, হেন রুচির বচন
শ্রবণে হউক তব চিত্ত পুলকিত,
সুবাক্যে সতত প্রীতি লভে বুধগণ
যদিও বালক কিম্বা রমণী ভাষিত।

"চতসৃষ্বপি তে বিবেকিনী নৃপ! বিদ্যাসু নিরূঢ়ি মাগতা।
কথমেত্যমতি র্বিপর্য্যয়ং করিণী পঙ্কমিবাবসীদতি।
ভাঃ ২য় সঃ ৬ষ্ঠ শ্লোঃ।

"চারি বিদ্যা-পারদর্শী তুমি, মহামতি,
মতি তব হিতাহিত জ্ঞানে সমুজ্জ্বল
ধরিয়াছে কেন হেন বিপরীত গতি,
করিণী যেমতি পঙ্কে পড়িয়া বিকল।

"দ্বিষতামুদয়ঃ সুমেধসা গুরুরস্বন্ততরঃ সুমর্ষণঃ
ন মহানপি ভূতিমিচ্ছতা ফলসম্পৎ প্রবণঃ পরিক্ষয়ঃ।
ভাঃ ২য় সঃ ৮ম শ্লোঃ।

"শত্রুর পতনোন্মুখী বৃদ্ধি অতিশয়
উন্নতি-প্রত্যাশী হ'য়ে সহে সুধী জন,
সহ্য নাহি যায় কভু বিপক্ষের ক্ষয়
ধরে যাহে আশু ফল অশুভ-কারণ।

"অবলং প্রতিপক্ষমুন্নতে রবলম্ব্য ব্যবসায়বন্ধ্যতাং
নিবসন্তি পরাক্রমাশ্রয়া ন বিষাদেন সমং সমৃদ্ধয়ঃ।
ভাঃ ২য় সঃ ১৫শ শ্লোঃ।

"কি ফল উদ্যোগ বিনা যাপিয়া সময়?
উদ্যোগ-অভাবে কভু না হয় উন্নতি;
সম্পদ সতত করে বিক্রম আশ্রয়
কভু তা বিষাদ সহ না করে বসতি।

"দ্বিষতা বিহিতং ত্বয়া থবা যদি লব্ধা পুনরাত্মনঃ পদং।
জননাথ! তবানুজন্মনাং কৃতমাবিষ্কৃতপৌরুষৈর্ভুজৈঃ।"
ইত্যাদি। ভাঃ ২য়ঃ ১৭ শ্লোঃ।

"অথবা আপন রাজ্য যদি নরপতি
শত্রুর অর্পণ মতে পাও পুনরায়,
অনুজগণের তব ভুজের শকতি
ব্যর্থ হ'বে, নহে যাহা অজ্ঞাত ধরায়।" (১)

আবার বৈশ্বানরের চরিত্রটী স্মরণ করুন। মহাবীর বৃত্রাসুর কর্ত্তৃক পরাজিত হইয়া দেব সকল নিবিড় অন্ধকারাচ্ছন্ন পাতালপুরে আসিয়া বাস করিতেছেন। কিরূপে বৃত্রাসুরের অচিরাৎ পতন হইবে, এই চিন্তায় তাঁহারা নিতান্ত ব্যাকুল হইয়া উঠিয়াছেন। দেব সেনাপতি কার্ত্তিকেয় স্তব্ধ নিবিড় পাতালবাসের কঠোর যন্ত্রণা আর সহ্য করিতে না পারিয়া গম্ভীর নির্ঘোষে বলিতে লাগিলেন,—

"দুর্ব্বিনীত, দেবদ্বেষী দনুজ প্রবেশে
পবিত্র অমরধাম কলঙ্কিত আজ,
অজর অমর শূর স্বর্গ-অধিকারী,
দেববৃন্দ স্বরভ্রষ্ট পড়িয়া পাতালে!
ভ্রান্ত কি হইলা সবে? কি ঘোর প্রমাদ!
চিরসিদ্ধ দেবনাম খ্যাত চরাচরে,
'অসুর-মর্দ্দন' আখ্যা, কি হেতু হে তবে
অবসন্ন আজি সবে দৈত্যের প্রতাপে?
চিরযোদ্ধা—চিরকাল যুঝি দৈত্যসহ
জগতে হইলা শ্রেষ্ঠ সর্ব্বত্র পূজিত;
আজি কিনা দৈত্যভয়ে ত্রাসিত সকলে
আছ এ পাতালপুরে অমরা বিস্মরি!
কি প্রতাপ দনুজের, কি বিক্রম হেন,
শঙ্কিত সকলে যাহে স্ববীর্য্য পাসরি?
কোথা সে শূরত্ব আজি বিজয়ী দেবের
শতবার রণে যায় দনুজে দলিলা?
ধিক্ দেব! ঘৃণাশূন্য অক্ষুব্ধ হৃদয়ে
এতদিন আছ এই অন্ধতম পুরে.
দেবত্ব, ঐশ্বর্য্য, সুধা, স্বর্গ তেয়াগিয়া
দাসত্বের কলঙ্কেতে ললাট উজলি!
ধিক্ হে অমর নামে, দৈত্যভয়ে যদি
অমরা পশিতে ভয় এতই পরাণে,
অমরতা পরিণাম পরিশেষে যদি
দৈত্যপদাঙ্কিত পৃষ্ঠ চির নির্ব্বাসন!
বল হে অমরগণ! বল প্রকাশিয়া
এইরূপে চিরদিন থাকিবে কি হেথা?
চির অন্ধতম পুরী এ পাতাল দেশে,
দনুজের পদচিহ্ন ললাটে আঁকিয়া?"
বৃত্রসংহার ১ম সর্গ।

আর বৈশ্বানর, তাঁহার হৃদয়ে তখন তীব্র তড়িৎ বহিয়া গেল। নাসারন্ধ্রে ঘন ঘন শ্বাস বহিতে লাগিল। মুখমণ্ডল আরক্ত হইল। চক্ষুর্দ্বয় বিঘূর্ণিত হইতে লাগিল। তাঁহার সর্ব্ব অবয়বে ক্রোধের চিহ্ন দৃষ্ট হইতে লাগিল। তিনি বলিয়া উঠিলেন,—

—হে সেনাপতি! এ মণ্ডলী মাঝে
কোন্ ভীরু আছে হেন ইচ্ছা নহে যার
অমর নিবাস স্বর্গ উদ্ধারিতে পুনঃ?
পুনঃ প্রবেশিতে তায় স্ববেশ ধরিয়া?

(১) বঙ্গপদ্যানুবাদগুলি নবীনচন্দ্র দাস কবি গুণাকরের 'কিরাতার্জ্জুন' হইতে উদ্ধৃত।

দানবে যুঝিতে, আর কি ভয় এখন ?
ভীরুতার হেতু আর আছে কিহে কিছু ?
অমরের তিরস্কার সম্ভব যতেক
ঘটেছে দেবের ভাগ্যে দৈব বিড়ম্বন।

* * * *

অমর করিয়া, সৃষ্টি করিলা যে দেবে
পিতামহ পদ্মাসন—সুমনস্ খ্যাতি,
ব্রহ্মাণ্ড ভিতরে যারা সর্ব্ব গরীয়ান্
অদৃষ্টের বশে হায় তাদের এ গতি!
দেবজন্ম লাভ করি অদৃষ্টের বশ,
তবে সে দেবত্ব কোথা হে অমর্ত্ত্যগণ ?
দেব অস্ত্রাঘাতে নহে দানব বিনাশ,
সে দেব বিক্রমে তবে কিবা ফলোদয় ?
নিয়তি স্বতঃ কি কভু অনুকূল কারে ?
দেব কি দানব কিম্বা মানব-সন্তানে ?
সাহসে যে পারে তার কাটিতে শৃঙ্খল,
নিয়তি কিঙ্কর তার, শুন দেবগণ!
ধর শক্তি, শক্তিধর, হও অগ্রসর,
জাঠা, শক্তি, ভিন্দিপাল, শেল, নাগপাশ,
সুরবৃন্দ, সুরতেজে কর বরিষণ
অদৃষ্ট খণ্ডন করি সংহার অসুরে।"

বৃত্রসংহার ৯ম সঃ।

দেখা যাইতেছে, ভীম ও বৈশ্বানর উভয়েই "পরপ্রত্যয়য়েনবুদ্ধি" হইয়া সবই ভুলিয়া গেলেন! সে বিমৃষ্যকারিতা, সে অতুল গম্ভীরতা এ সমস্তই তাঁহাদের বিস্মৃতির জলে ডুবিয়া গেল। দ্রৌপদীর উত্তেজনাপূর্ণ বচন-পরম্পরায় ভীম বিপর্য্যস্ত এবং হতপ্রভ! আবার দেব সেনাপতি কার্ত্তিকেয়ের উদ্দীপনী ভাষায় বৈশ্বানর বিপর্য্যস্ত এবং হতপ্রভ। শত্রুকৃত নিজেদের প্রকর্ষহীনতা ভীমের যেরূপ অসহ্য, বৈশ্বানরেরও তদ্রূপ। আবার দুর্দ্দমনীয় চিত্তরূপ অশ্বের বল্গা, ভীম ও বৈশ্বানর উভয়েরই হস্তে নিয়ন্ত্রিত। অথচ তাহার উন্মার্গগামিতার সংশোধনে ভীম ও বৈশ্বানর উভয়েই প্রতিহত শক্তি। কেন না, উদ্দীপ্তিকর বচনপরম্পরা কর্ণকুহরে প্রবিষ্ট হইবামাত্র উভয়েই দিগ্‌বিদিক্ জ্ঞানশূন্য হইয়া গেলেন।—উভয়েরই হৃদয়ে যেন তাড়িৎ প্রবাহ তীব্রবেগে বহিয়া গেল। অসাময়িক ক্রোধ যে কিরূপ বিষময় ফল উদ্গীরণ করে, ভীম ও বৈশ্বানর উভয়েই তাহা চিন্তা করা দূরে থাকুক, বাহ্য ঘটনার তীব্র তাড়নায় স্মৃতির পথেও উপস্থিত করিতে অসমর্থ হইলেন। এমনিই বাহ্য প্রকৃতির অপূর্ব্ব মাদকতা!

ক্রমশঃ।

শ্রীমৃত্যুঞ্জয় ভট্টাচার্য্য।

পরাজিত।

(১)

"অনেক বিদ্যে হ'য়েছে, এখন চল।"

নিদ্রোত্থিতের মত যুবক নলিনচন্দ্র অমিয়ার মুখের দিকে চাহিল। বাগানের যাতাবী লেবুর ফুলের গন্ধের সহিত অমিয়ার কোমল অঙ্গের বিলাতী এসেন্সের গন্ধ মিশিয়া নলিনচন্দ্রের পাঠাগারটিকে আমোদিত করিয়াছিল। নলিনের টেবিলের উপর একখানি ছবির বহি খোলা ছিল। নলিন পড়ে নাই, ছবি দেখিতেছিল। যুবতী বলিল—"ওঃ ছবি দেখা হ'চ্চে? আবার সকালে ছবি দেখো, এখন চল"।

নলিন তাহার কথার উত্তর দিল না। জানালার ভিতর দিয়া একবার পূর্ণচন্দ্রের দিকে চাহিল, চন্দ্রালোকদীপ্ত অশোকস্তবকের প্রতি দৃষ্টিনিক্ষেপ করিল, কৃষ্ণচূড়ার শোভা দেখিল, তাহার পর শূন্যমনে স্ত্রীর অনিন্দ্য-সুন্দর মুখখানি দেখিল—অভিসারিকার কটাক্ষ তাহাকে মাতাইতে পারিল না। তাহার মন ছিল ছবিগুলার উপর। সে আবার চিত্রে মন সমর্পণ করিল।

অমিয়ার কনক কপোল রক্তবর্ণ হইয়া উঠিল। এমন মনোরম বাসন্তী পূর্ণিমা, বাগানে এত ফুল ফুটিয়াছে, প্রাণের মধ্যে এত ভাব, এত রুদ্ধ উৎস গুমরাইয়া মরিতেছে, স্বামী এ সকলের অর্থ বুঝিতে পারিল না কেন? শূন্য দৃষ্টি! কি অপমান—ছিঃ ছিঃ কি বিষম উপেক্ষা! তাহার পক্ষে নিজ কক্ষে পলায়ন করাই বিধেয়।

উঁহু, তাহা অসম্ভব। স্ত্রীলোক অপমান সহ্য করিতে পারে, উপেক্ষা সহিতে পারে না। রণচণ্ডী তাহার স্কন্ধে চাপিলেন। সে স্বামীর সহিত কলহ করিবে, অমন উপেক্ষায় কটাক্ষ সহিয়া গৃহে যাইতে পারিবে না। সে স্বামীর পুস্তকখানা ধরিয়া টানিল, যেমন ঘৃণার সহিত সতীনের হাত ধরিয়া টানিতে হয়, ঠিক সেই ভাবে টানিল। নলিন বিরক্ত হইয়া বলিল—"ছিঃ, কি কর?"

অমিয়া একটু দৃঢ়স্বরে বলিল—ঘরে চল। আমি একেলা থাকিতে পারি না।

নলিন বলিল—তাই ত বলি লেখাপড়া শেখ, এখানে ব'সে পড়বে, আমার সাহায্য—

অমিয়া বলিল—ও সব পাগলের কথা ঢের শুনেছি, রোজ শুনি। হিন্দুর মেয়ে, অনেক কর্ত্তব্য আছে, তুমি পাগল—

নলিন একটু বিদ্রূপের স্বরে বলিল—হাঁা স্বামীকে গালাগালি দেওয়া হিন্দুর মেয়ের একটা প্রধান কর্ত্তব্য।

অমিয়া একটু অপ্রতিভ হইল। কিন্তু সে মর্ম্ম-যাতনায় দগ্ধ হইতেছিল। আজ সে স্বামীর সঙ্গে একটা বুঝাপড়া করিবে। সে বলিল—তোমার বিদ্যায় ধিক্। জমিদারের ছেলে, তোমার হাতে কত লোকের সুখ দুঃখের ভার। একবার বাহিরে গিয়ে দেখেছ দেশের কি অবস্থা? নিজের সুখের জন্যে পাগলের মত পড়ছ, বইগুলায় কি একথা লেখা থাকে না যে দয়ার চেয়ে বিদ্যে নেই। কাকেও এক পয়সা দান করেছ, কারও দুঃখ দেখেছ, নিজের কর্ত্তব্য—

নলিন বলিল—বিরক্ত ক'র না। তুমিও তো জমিদারের স্ত্রী, তুমি কেন এখন আমার ও সব কর না? বিরক্ত ক'র না।

অমিয়ার তাম্বুলরাগ-রঞ্জিত পাতলা ঠোঁট দুখানি কাঁপিতেছিল। তাহার নেত্র হইতে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ বাহির হইতেছিল। কম্পিত কণ্ঠে লজ্জার মাথা খাইয়া সে বলিল—আমাকে বিবাহ করেছিলে, আমার প্রতিও তোমার কর্ত্তব্য আছে।

নলিন স্ত্রীর অশিষ্ট ব্যবহারে বেশ উত্তেজিত হইয়াছিল। সে নিজের কথা ভাবিল না, অমিয়ার কথা ভাবিল। উচ্চশিক্ষার অভাবে অমিয়া ভদ্রোচিত ব্যবহার শিখে নাই। গ্রাম্য স্ত্রীলোকদিগের সহিত মিশিয়া সে তাহার স্নেহের অনুপযুক্ত হইয়া উঠিতেছিল। এখনও সময় আছে। এখনও তাহার শিক্ষার ব্যবস্থা হইতে পারে, এখনও তাহাকে অসভ্য গ্রাম্যললনাদিগের সঙ্গ বর্জ্জিত করিতে পারা যায়। নলিন বলিল—বেশ আমি কর্ত্তব্য পালন করব। তোমার শিক্ষয়িত্রী ও সহচরীর বন্দোবস্ত করিব। কালই কল্‌কাতা থেকে এক মেম আনাচ্চি।

অমিয়া হাসিল। স্বামীকে পাগল ভাবিয়া হাসিল, স্বামীকে উপেক্ষা করিয়া নির্য্যাতিত করিবার জন্য হাসিল। হাসিয়া বলিল—আমার দাসীকে দিয়ে ঝাঁটা মেরে তোমার মেমকে তাড়াব। তুমি তা'কে এখানে বসিয়ে রেখো, সাহায্য করবে—

নলিন অমিয়ার মুখে এরূপ কথা কখনও শুনে নাই। তাহার রূপ কেবল তাহার চিত্তবিনোদনের জন্য সে তাহাই জানিত। সে রূপ যে একটা উল্টা দাবী করিতে পারে পণ্ডিত নলিনচন্দ্রের মস্তিষ্কে সে কথাটা কখনও প্রবেশলাভ

করে নাই। সে প্রথম প্রথম স্ত্রীকে শিক্ষিত করিবার জন্য অনেক অনুনয় বিনয় করিয়াছিল। কিন্তু সে চেষ্টা ফলবতী হয় নাই। নলিন তাহার মানসিক অবস্থা ভাবিয়া হাসিত, নিজের অবসর মত তাহাকে ভালবাসিত। গাছ পালা, ফল ফুল, পাখী হরিণ প্রভৃতি লইয়া সে যেমন সময়ে সময়ে আনন্দলাভ করিত, সুন্দরী অমিয়ার রূপ যৌবন, হাসি ও প্রলাপও সেইরূপ উপভোগ করিত। এ সকল ব্যতীত যে তাহার একটা হৃদয় আছে, সে হৃদয় স্নেহমমতা প্রণয়-প্রীতিতে পূর্ণ, প্রতিদান পাইবার জন্য লালায়িত, একথা পণ্ডিত নলিনচন্দ্রের মনে কখনও উদিত হয় নাই। যে মন শিক্ষালাভ করে নাই সে মন আবার সুকোমল বৃত্তির আস্বাদন পাইবে কেমন করিয়া। সে বিস্মিত হইয়া স্ত্রীর কথায় বাধা দিয়া বলিল—ছিঃ ছিঃ! তুমি যে এত অভদ্র তা জানতাম না।

গর্ব্বিতা অমিয়া মরালগতিতে গৃহ হইতে চলিয়া গেল। সে কথার প্রত্যুত্তর করিল না।

(২)

সে রাত্রিতে নলিন শয়নকক্ষে একাকী বাস কবিল। অমিয়া সে গৃহে প্রবেশ করিল না। পরদিনও অমিয়া আসিল না। নলিন একবার ভাবিল উঠিয়া গিয়া পার্শ্বের গৃহ হইতে তাহাকে ডাকিয়া আনিবে। কিন্তু তাহার অবসাদ আসিয়াছিল। বিষম মানসিক পরিশ্রমে তাহার শরীর অবসন্ন হইয়া পড়িয়াছিল। যে চিত্রপুস্তক দেখিয়া অমিয়া তাহাকে পরিহাস করিয়াছিল, কেবল চিত্র-কলায় পরিতোষ লাভ করিবার জন্য নলিন সে পুস্তকের প্রতি চাহিয়া ছিল না। প্রাচীন হিন্দুদিগের কোন্ শ্রেণীর লোকের কিরূপ পোষাক পরিচ্ছদ ছিল, কয়েক দিন ধরিয়া সে তাহা সিদ্ধান্ত করিতে চেষ্টা করিতেছিল। অনেক গ্রন্থ পাঠ করিয়া সে এ বিষয়ের মীমাংসা করিয়া উঠিতে পারে নাই। তাই সে ইলোরা, এলিফাণ্টা, ভুবনেশ্বর, খণ্ডগিরি, উদয়গিরি প্রভৃতি নানা স্থলের গিরিখোদিত চিত্রাবলী দেখিয়া প্রাচীন হিন্দুর বেশবিন্যাস-পদ্ধতি আলোচনা করিতেছিল। আজ ছোট ছোট চিত্রের প্রতি বহুক্ষণ চাহিয়া থাকিয়া সে তাহার চক্ষুতে বেদনা অনুভব করিতেছিল। তাই ইচ্ছাসত্বেও, শয্যা ছাড়িয়া অভিমানিনী স্ত্রীর গৃহে উঠিয়া যাইতে পারিল না। ক্লান্তদেহে শয্যায় শয়ন করিবামাত্র নিদ্রাভিভূত হইল।

পার্শ্বের ঘরে শুইয়া প্রথমদিন অমিয়া দলিতা ফণিনীর মত মর্ম্মযাতনা ভোগ করিতে লাগিল। দ্বিতীয় রজনী প্রতীক্ষায় অতিবাহিত হইল। তৃতীয় রজনী

স্বামী স্ত্রী উভয়েরই লজ্জা বোধ হইতে লাগিল। স্বামী ভাবিল, অমিয়া অশিক্ষিতা সুতরাং শিশুর মত: নিশ্চয় কাহারও নিকট কুমন্ত্রণা পাইয়া সে তাহাকে অপমান করিতে আসিয়াছিল। তাহার সহিত তর্ক করিয়া, গত দুই রাত্রি তাহার নিকট উঠিয়া গিয়া তাহার চিবুক ধরিয়া তাহাকে দুইটা মিষ্ট কথা না বলিয়া সে বড় অন্যায় কার্য্য করিয়াছে। কিন্তু এখন সে কি বলিয়া তাহার নিকট মুখ দেখাইবে। নিশ্চয় অমিয়া আপনিই তাহার নিকট উঠিয়া আসিবে তখন সে তাহাকে সকল কথা বুঝাইয়া দিবে। মিষ্ট কথায় তাহাকে তুষ্ট করিয়া তাহার শিক্ষা ও সদাচারের জন্য শিক্ষিতা ব্রাহ্মিকা-সহচরী আনাইয়া দিবে। অমিয়ারও তৃতীয় রাত্রিতে বড় লজ্জা বোধ হইল। অমন ঋষিতুল্য স্বামী, সংসারে থাকিয়াও উদাসীন যোগী, সর্ব্বদা জ্ঞানার্জ্জনে উন্মত্ত আর সে অশিক্ষিতা মূর্খ বোকা। সে কেমন করিয়া তাহাকে অমন রূঢ় কথা বলিয়াছিল তাহা সে বুঝিতে পারিল না। এখন কোন্ মুখ লইয়া সে তাহার নিকট যাইবে। পার্শ্বের গৃহ হইতে সে প্রত্যেক শব্দটির অর্থবোধ করিতেছিল—ঐ আসিলেন—ঐ জামা খুলিলেন—এবার একটু জলপান করিলেন—এবার শয্যায় শুইলেন—একি আবার উঠিলেন যে—বোধ হয় আসিতেছেন। যুবতীর হৃদকম্প হইতে লাগিল, অভিমানিনী পুলক অনুভব করিল। কই না, আসিলেন না তো—জানালার নিকট গেলেন—জ্যোৎস্নার শোভা দেখিতে—এইবার আসিবেন —উঁহু শয্যায় গিয়া শয়ন করিলেন। নৈরাশ্য ঘনাইয়া আসিল, যুবতীর হৃদয় উদ্বেলিত হইল, প্রাণের লবণাম্বু চক্ষু বহিয়া উপাধান সিক্ত করিল।

(৩)

প্রথম কয়দিন উপেক্ষায়, লজ্জায়, প্রতীক্ষায়, বিষাদে কাটিয়া গেল। কিন্তু যত দিন যাইতে লাগিল তাহাদের জীবনের নির্জ্জনতা ততই বর্দ্ধিত হইতে লাগিল। তাহাদের বিশাল অট্টালিকায় দাসদাসী আত্মীয় কুটুম্ব অনেক ছিল কিন্তু তবু উভয়েই প্রাণে প্রাণে অনুভব করিতে লাগিল যে বাড়িটা ভয়ঙ্কর নির্জ্জন হইয়াছে। নলিনচন্দ্র রাম, যুধিষ্ঠির, চন্দ্রগুপ্ত, অশোক, বিক্রমাদিত্য ও কালিদাসের পোষাক লইয়াই ব্যস্ত ছিল। কেবল সময়ে সময়ে তাহার প্রাণে একটা কিসের অভাব অনুভব করিত। কিন্তু অমিয়া—সরলা অমিয়া। জীবনে তাহার স্বামী ভিন্ন অপর সুখতো ছিল না। সে বসনভূষণে দেহ সজ্জা করিত স্বামীর স্নেহ পাইবার জন্য, বাসগৃহ সজ্জিত করিত নলিনের নিকট সুখ্যাতি পাইবার জন্য। এমন কি নিজের সুকোমল প্রবৃত্তির বশে পাড়ার

দুঃস্থ বিধবাকে একখানি বস্ত্র বা একটি টাকা দিয়া মনে করিত এ সময় যদি তিনি দেখিতেন তো বুঝিতেন আমি মূর্খ হইলেও অপদার্থ নহি। এখন কিন্তু অমিয়ার আর সে চিন্তা ছিল না। এখন ইচ্ছা করিয়া সে নলিনকে ভুলিতে চেষ্টা করিতেছিল কিন্তু সেই নিষ্ঠুর কর্ত্তব্যজ্ঞানহীন, বিদ্যাভিমানীর চলা ফেরা পোষাক পরিচ্ছদ হাত পা মুখ যেন অহরহঃ তাহার স্মৃতিপটে উজ্জ্বলভাবে বিরাজ করিতে লাগিল, তাহার কথাগুলা তাহার কর্ণে ধ্বনিত হইতে লাগিল। কি দীর্ঘ দিনগুলা! কি ভীষণ রজনী! যুবতী কাতরা হইল, তাহার অভিমান শতগুণ বর্দ্ধিত হইল, স্বামীর নিষ্ঠুর ব্যবহারে তাহার প্রতি অমিয়ার কোপ দিন দিন বাড়িতে লাগিল। অমিয়ার গর্ব্বে নলিনচন্দ্রও বড় ক্ষুণ্ন হইল। তাই তাহাদের কলহের দুই সপ্তাহ পরে উভয়েই মনে মনে শপথ করিল পরস্পর পরস্পরের সংস্রব রাখিবে না, পরস্পর পরস্পরকে ভুলিবে। নলিন স্থির করিল, সে বিলাতী পণ্ডিতদিগের মত আপনাকে চিরকুমার বলিয়া মনে করিবে আর অমিয়া মনে মনে বুঝিল যে তাহার বিবাহ হয় নাই, পৃথিবীতে তাহার কেহ নাই, সে অনাথা, সে পথের ধূলা, সে অগাধ সমুদ্রের মাঝে এক টুকরা তৃণ।

সংকল্পমত স্ত্রীকে ভুলিবার জন্য নলিন কলিকাতায় অনেক নূতন নূতন পুস্তকের ফরমাস দিল, আর অমিয়া অনেক অশ্রু মোচন করিয়া, অনেকবার আকাশের দিকে চাহিয়া, বাগানের আমের বোলের উপর ভ্রমরার গুঞ্জন শুনিতে শুনিতে ভবিষ্যৎ জীবনের একটা পথ নির্ব্বাচন করিয়া লইল।

(৪)

কুবেরহাটি গ্রামের বাহিরে "চৌগাঁয়ের মাঠ"। চারিখানি গ্রামের মধ্য-স্থলে অবস্থিত বলিয়া এই বিস্তৃত শস্পশ্যামল মাঠের নাম হইয়াছিল চৌগাঁয়ের মাঠ। নলিনচন্দ্র এক একদিন অশ্বারোহণে ভ্রমণ করিত। এদিকটা জনাকীর্ণ বলিয়া সে গ্রামের অপর দিকে নির্জ্জন বনভূমির নির্জ্জনতা উপভোগ করিত। এখন আর নির্জ্জনতায় সে তেমন পুলক অনুভব করে না। তাই সে আজ অশ্বারোহণে চৌগাঁয়ের মাঠে আসিল। তখন উষালোকে এই বিস্তৃত প্রাঙ্গন বড় অপূর্ব্ব শোভা ধারণ করিয়াছিল। চারিদিকের চারিখানি গ্রাম তখনও সুষুপ্ত। তবে মাঠের মধ্যে অনেক লোকজন দেখিয়া নলিনচন্দ্র একটু বিস্মিত হইল। সে অন্যমনস্কভাবে তাহাদের দিকে অগ্রসর হইল। লোকগুলা শ্রমজীবী, ঠিক মাঠের মধ্যস্থলে তাহারা একটি বৃহৎ সরোবর খনন করিতে-ছিল। সরোবরের চারিদিকে নারিকেল ও সুপারী গাছের চারা বসাইতেছিল।

পুষ্করিণীর চারি কোণে চারিটি চাঁপার গাছ বসিয়াছিল। পুষ্করিণীর কার্য্য প্রায় অর্দ্ধেক শেষ হইয়াছিল।

স্বয়ং জমিদার বাবুর আগমনে কুলিদিগের মধ্যে একটা বড় হুড়াহুড়ি পড়িয়া গেল। কুলি সর্দ্দার ছুটিয়া আসিয়া আভূমি প্রণত হইল। তাহারা সকলে একবাক্যে তাঁহাকে বুঝাইল যে বর্ষা নামিবার পূর্ব্বেই কার্য্য সম্পূর্ণ হইবে। অবশ্য নলিন কিছু বুঝিল না, বিশ্বাসী ম্যানেজার মহাশয় জমিদারীর হিতের জন্য যেমন সকল ব্যবস্থা করিয়া থাকেন তেমনি এই প্রজা-হিতকর কার্য্য তাঁহারই উদ্যোগে হইতেছে, প্রথমে নলিনচন্দ্র তাহাই বুঝিয়া-ছিল। তাঁহার আগমন-সংবাদে অল্পক্ষণের মধ্যেই কিন্তু চারিদিকের গ্রামগুলি হইতে দলে দলে লোক আসিয়া জুটিল। তাঁহাকে ঘিরিয়া ধরিয়া এই শুভ-কার্য্যের জন্য তাহারা বৌরাণীর জয় জয়কার করিতে লাগিল। সঙ্গে সঙ্গে তাঁহারও সুখ্যাতি করিল। তখন আসল কথাটা নলিনচন্দ্রের মস্তিষ্কে প্রবেশ করিল। অমিয়ার সহিত সদ্ভাব থাকিলে নলিন এ ব্যাপারে আদৌ বিস্মিত হইত না, এ কার্য্যে যে একটা মাধুরী আছে তাহা উপলব্ধি করিতে পারিত না। কিন্তু লোকে শত্রুপক্ষের চরিত্র বড় বেশী বিশ্লেষণ করে। সমস্ত পথ পুষ্করিণী খননের কথা তাহার মনে তোলাপাড়া হইতে লাগিল। এক পুষ্করিণীতে চারি গ্রামের উপকার হইবে—কি সুন্দর অনুষ্ঠান! কিন্তু এ মতলব এতদিন তাহার মাথায় আসে নাই কেন? কৃতজ্ঞ প্রজাদের প্রসন্ন মুখগুলা তাহাকে আরও নির্য্যাতন করিল। যাহার চিন্তা অবধি তাহার পক্ষে নিষিদ্ধ, তাহার উপর নলিনের প্রথমে বড় রাগ হইল, শেষে হিংসা হইল। সে এই ছই মাস নিজে কিরূপে কাটাইয়াছে তাহা ভাবিয়াও একটু বিরক্ত হইল। তাহার প্রত্নতত্ত্বের দুরূহ সমস্যার এখনও মীমাংসা হয় নাই। তাহার নিজের পরাজয় আর—"তাহার"—উঁহু—না, এ তাহার অনুষ্ঠান নহে—ম্যানেজার মহাশয়ের।

নিজের পাঠাগারে গিয়াই সে ম্যানেজার মহাশয়কে তলব করিল। তাহাদের কলহের কথা কেহ জানিত না। সে বুদ্ধিমানের মত ম্যানেজারকে জেরা করিতে মনস্থ করিল।

নলিন বলিল—আজ পুকুর দেখে এলাম।

ম্যানেজার বলিল—আজ্ঞে হ্যাঁ, বৌরাণীর পুকুর—

নলিনের ধৈর্য্যচ্যুতি হইতেছিল। সম্মুখের ভূগোলকটা লইয়া ম্যানেজারের মস্তকে প্রহার করিতে তাহার প্রবৃত্তি হইতেছিল।

ম্যানেজার বলিল—আজ্ঞে হ্যাঁ, বৌরাণীর পুকুর বর্ষার আগেই হয়ে যাবে। বড় শুভ অনুষ্ঠান! চারটি গ্রামের লোক জল খেয়ে বাঁচবে।

নলিন বলিল—হুঁ, কত ব্যয় হ'বে?

ম্যানেজার বলিল—তা প্রায় সাত হাজার টাকা পড়বে। আমি সরকারী তহবিল থেকে টাকা দেবার জন্যে ঠিক করেছিলাম কিন্তু উনি পাঁচ হাজার টাকার নিজের কোম্পানীর কাগজ সহি ক'রে দিয়েছেন। বাকী টাকাও দিতে প্রস্তুত হ'য়েছেন।

ম্যানেজারটা নলিনের চক্ষুশূল হইয়াছিল। নলিন তাহাকে বিদায় দিল। শিক্ষা না থাকিলে লোকে ঝোঁকের উপর কত রকম আজগুবি কাজ করিতে পারে। এটা "তাহার" একটা ঝোঁকের কাজ মাত্র, এতে বাহাদুরী কিছু নাই।

তবু তাহার মনে হইল—এ মতলবটা প্রথমে আমার মাথায় আসিল না কেন?

(৫)

নূতন উদ্যমে নলিনচন্দ্র প্রত্নতত্ত্ব আলোচনা করিতে আরম্ভ করিয়া দিল। কুবেরহাটিতে সুবিধা হইবে না বলিয়া নলিনচন্দ্র কলিকাতায় চলিয়া আসিল। যাদুঘরের স্থাপত্যবিভাগে সে বারম্বার যাতায়াত করিতে লাগিল। বড় বড় প্রস্তর প্রাচীর খোদিত চিত্রগুলার অনেক ফটো তুলিল। মাসখানেক কলিকাতায় বাস করিয়া নলিন ভুবনেশ্বর যাত্রা করিল। সেখানে খণ্ডগিরি ও উদয়গিরির গুহায় বহুক্ষণ কালাতিপাত করিয়া নলিন শ্রীক্ষেত্রে চলিল। জগন্নাথদেবের মন্দির সংলগ্ন কুৎসিত চিত্রগুলা অবশ্য তাহার গবেষণার বিশেষ সাহায্য করিল না। অনেক পুস্তক পাঠ করিয়া, অনেক লোকের সহিত আলোচনা করিয়া নলিন তাহার পুস্তকের সমস্ত উপকরণ সংগ্রহ করিল। প্রতি পদে পদে সে আনন্দলাভ করিতেছিল বটে কিন্তু পূর্ণ তৃপ্তি কোথায়? কিসের একটা অভাব তাহার জীবনপথে ছায়া নিক্ষেপ করিতেছিল। সে একটা সামান্য গর্ব্বিতা স্ত্রীলোককে যত ভুলিতে চেষ্টা করিতেছিল তাহার প্রাণের ভিতর একটা গুপ্ত শত্রু যেন ততই সেই অজ্ঞ রমণী প্রকৃতি সম্যকরূপে বুঝিবার জন্য তাহাকে কুপরামর্শ দিতেছিল।

প্রায় দুইমাস কাল প্রবাস-বাসের পর প্রত্নতত্ত্ব-গবেষণায় সিদ্ধি লাভ করিয়া দেশে ফিরিতেছিল, তবু যুবক নলিনচন্দ্রের প্রাণে শান্তি ছিল না। গ্রামে প্রবেশ করিবামাত্র একটা ক্ষুদ্র বাটী হইতে কতকগুলা বালকের কণ্ঠস্বর তাহার

কর্ণে প্রবেশ করিল। নলিন দেখিল বাটীর উপর লেখা "অম্বিকা বিদ্যালয়।" অম্বিকা দেবী তাহার স্বর্গীয়া মাতার নাম। নলিন বিস্মিত হইল। একটা ঘোর অশান্তি তাহাকে বিপন্ন করিল। জয় লভিয়াও পরাজয়। প্রত্নতত্ত্বের গবেষণা বনাম স্বগ্রামে বিদ্যালয়-স্থাপন। প্রাচীন নরনারীর পোষাক পরিচ্ছদ বনাম প্রফুল্ল বালকবৃন্দের ভবিষ্যৎ আশার ভৈরবী তান। তাহার আর সন্দেহ রহিল না। তাহার গর্ব্বিতা স্ত্রী তাহার সহিত প্রতিযোগিতা করিয়া গ্রামে বিদ্যালয় স্থাপন করিয়াছে! তাহার অজ্ঞ স্ত্রীর উপর তাহার হিংসা হইল। প্রাণে সন্দেহ হইল তবে কি নীরস জ্ঞানার্জ্জন, মানসিক শক্তির স্ফুরণ অপেক্ষা প্রবৃত্তি-প্রণোদিত পরহিতকর কার্য্য শ্রেষ্ঠ? তাহার মন তাহাকে বুঝাইয়া দিল তাহা কখনও হইতে পারে না। যাহার জ্ঞান নাই, সে হৃদয়ের বৃত্তির উপর কার্য্য করে। সে বৃত্তি মন্দ হইলে অজ্ঞ ব্যক্তির দ্বারা জগতের যথেষ্ট ক্ষতি হইতে পারে। জ্ঞানী সকল কার্য্যের দোষ গুণ বিচার করিতে পারে। কিন্তু বাস্তবিক কি "সে" ঝোঁকে পড়িয়া এ কার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়াছে? ম্যানেজারকে ডাক পড়িল।

ম্যানেজার বলিল—বাবু, ভগবান আপনাকে চিরজীবী করুন। আপনি যেমন বিদ্বান্ তেমনি লক্ষ্মী পেয়েছেন।

নলিনচন্দ্রের মুখ গম্ভীর হইল। ম্যানেজার বলিল—বাবু আপনি ব'লে গিয়েছিলেন ব'লে বৌরাণী আমায় ডেকে বললেন—ম্যানেজার বাবু, উনি ঋষির মত লোক, লেখাপড়া বই আর কিছু জানেন না। ওঁর ইচ্ছা দেশে মার নামে স্কুল হয়।

নলিনচন্দ্রের ওষ্ঠ কাঁপিতেছিল। তাহার ভিতরের গুপ্ত শত্রু বলিতেছিল —"দেখিলে কত বুদ্ধিমতী, তার প্রাণটা কত মহৎ, কত উঁচু!"

(৬)

কিছুদিন দেশে থাকিয়া নলিনচন্দ্র কলিকাতায় ফিরিল। প্রভূত অধ্যবসায়ের সহিত "প্রাচীন হিন্দুর বেশভূষা" ছাপাইতে লাগিল। মনকে প্রবোধ দিয়া বলিল—"এবার যে কীর্ত্তি রাখিব চিরদিনের জন্য নাম থাকিবে।" কিন্তু তাহার অভিমানের মাত্রা খুব বাড়িয়া গেল। এখন সে স্ত্রীর কথা ভাবিত। তাহাকে জানিবার চেষ্টা করিত। তাহার প্রাণের মধ্যে তাহার অমিয়ার বেতনভোগী যে গুপ্ত শত্রু ছিল, সে এক প্রকার তাহার মনটি দখল করিয়া

বসিয়াছিল। তাই সে স্ত্রীকে জানিতে চাহিল, তাহার সদনুষ্ঠানের কারণ বুঝিতে উৎসুক হইয়াছিল।

অমিয়ার সদনুষ্ঠানের অভাব ছিল না। "বৌরাণীর দিঘী" ও "অম্বিকা বিদ্যালয়" ছাড়িয়া দিলে তাহার সহৃদয়তার ছোট ছোট প্রমাণে নলিনের জমিদারী ছাইয়া ফেলিয়াছিল। কত অচেনা লোক তাহাকে পথের মাঝে ধরিয়া তাহার কল্পিত উপকারের জন্য তাহার ধন্যবাদ করিত। কত বৃদ্ধা তাহাকে ও অমিয়াকে আশীর্ব্বাদ করিত। অমিয়া প্রত্যেক দানটি তাহার নামে করিত নলিনচন্দ্র তাহাও বুঝিয়াছিল। প্রথম প্রথম সে ভাবিত তাহাকে পরিহাস করিবার জন্য অমিয়া তাহার নামে দান করিয়া থাকে। কিন্তু শেষে সে একথা বিশ্বাস করিতে পারিল না। দুই একবার অলক্ষ্যে সে অমিয়াকে দেখিয়াছিল। অমিয়ার বেশভূষা একেবারে পরিবর্ত্তিত হইয়াছিল, তাহার করুণ চাহনিতে কেমন একটু বিষাদ জড়িত ছিল।

"প্রাচীন হিন্দুর বেশভূষা" প্রকাশিত হইল। আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া নলিনচন্দ্র বাহ্যজ্ঞান হারাইল। কিন্তু সাত দিনের মধ্যে যখন একে একে সমালোচকবৃন্দ তাহার কোমল অঙ্গে হুল ফুটাইতে আরম্ভ করিল তখন নলিনচন্দ্র যাতনায় কাতর হইয়া উঠিল। কলিকাতায় বাস করা তাহার পক্ষে অসহ্য হইয়া উঠিল। দেশেও তাহার শান্তি নাই। সে এত শাস্ত্র পড়িয়াছিল, এত বিষয়ে জ্ঞানার্জ্জন করিয়াছিল কিন্তু পৃথিবীতে বাস করিবার দুই একটা সামান্য কৌশল শিখে নাই বলিয়া আজ জ্ঞানী যুবক নরক-যন্ত্রণা ভোগ করিতে লাগিল। একটা ভীষণ নিরাশার করাল মূর্ত্তি তাহাকে গ্রাস করিতে আসিল।

(৭)

নৈরাশ্য-ব্যথিত প্রাণ, নির্জ্জনতার ভীম বিভীষিকা। আপনাকে পাঠাগারে আবদ্ধ করিয়া সকল জ্বালা জুড়াইবার জন্য ধীরে ধীরে নলিনচন্দ্র স্বদেশে ফিরিল। বাটীর ফটকের নিকট কিসের এত ভিড়, এত নরনারী এখানে কি করিতেছে? নলিনকে সকলে পথ ছাড়িয়া দিল, সকলের মুখে বিষাদের ছায়া, সকলে যেন বজ্রাহত। নলিন শিহরিয়া উঠিল। অমিয়া, অভিমানিনী অমিয়া, পরদুঃখে কাতরা সাধ্বী অমিয়া। তাহার তো কোন অমঙ্গল ঘটে নাই? কাহাকেও কোন কথা জিজ্ঞাসা করিবার সাহস হইল না। ক্ষিপ্তের মত নলিন বাটীর মধ্যে ছুটিল। আজ সকল বিষয়ে সে পরাজিত। প্রথমে

সে ক্ষমা চাহিয়া অমিয়ার নিকট হারি মানিবে কিন্তু অমিয়া আছে ত ? সমবেত নরনারীর মুখ দেখিয়া নলিনচন্দ্রের বুকের পাঁজরা ভাঙ্গিয়া গেল।

তাড়াতাড়ি তাহাকে গৃহে প্রবেশ করিতে দেখিয়া দুইজন বর্ষীয়সী বাহিরে আসিল। স্তম্ভিতা অমিয়া শয্যায় উঠিয়া বসিল। স্বামীর মুখের দিকে চাহিয়া অমিয়ার নয়নের বাঁধ ভাঙ্গিল, সে তাহার চরণ ধরিয়া কাঁদিয়া ফেলিল।

নিমেষে নলিন তাহাকে বক্ষে ধরিয়া বলিল—অমিয়া, দেবী, তোমারই জয়। শুধু নীরস পড়ায় কোন ফল নাই। তোমার মত পরদুঃখে—

অমিয়া তাহার মুখ টিপিয়া ধরিল। সে বলিল—কেন তুমি তো হুকুম দিয়েছিলে।

তাহার পরদিন যেস্থলে নলিন স্বহস্তে "প্রাচীন হিন্দুর বেশভূষা" পুড়াইয়াছিল, এক মাসের মধ্যে সেস্থলে দুইজনে স্মিতমুখে "অমিয়া হাঁসপাতালে"র ভিত্তি স্থাপন করিল।

শ্রীকেশবচন্দ্র গুপ্ত।

সৌন্দর্য্যের মূল।

সৌন্দর্য্যের দুইটী রূপ আছে—প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ। ইহারা বীজ ও ফলের ন্যায় পরস্পর যুক্ত হইয়াও বিযুক্ত এবং বিযুক্ত থাকিয়াও পরস্পর যুক্ত। বীজকে যখন বিস্তৃতভাবে অবলোকন করি—আকারে, বর্ণে, গন্ধে, রসে পরিপূর্ণ করিয়া লই, তখন যেমন তাহাকে ফল হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া দেখা যায় না, তেমনই যখন ফলকে সংহত বা সমষ্টিবদ্ধভাবে তাহার আদিমরূপে দর্শন করি—আকার, বর্ণ, গন্ধ, রসকে ঠেলিয়া ফেলিয়া অন্তরতম মূলাধারে দৃষ্টিপাত করি, তখন তাহাকে বীজরূপে দেখিতে পাই। পূর্ব্বোক্ত ভাবে দেখায় ফল অসীম এবং শেষোক্ত ভাবে দেখায় সসীম। কিন্তু গভীরতায় উভয়ই অতলস্পর্শ—যত জানা যায় তাহার শেষ পাওয়া যায় না; কারণ ভূমণ্ডলের নিখিল বস্তুর ন্যায় উভয়ই অনন্ত-জ্ঞানের, অনন্ত ইতিহাসের এবং অনন্তকালের সমষ্টি। পদার্থ-বিজ্ঞানে যেমন, সৌন্দর্য্য-বিজ্ঞানেও তেমনই এই সসীমত্ব ও অসীমত্ব বর্ত্তমান। তাহার একদিকে ব্যাপ্তি, অন্যদিকে সংহতি—একদিকে আত্ম-

বিশ্লেষণ (Analysis), অন্যদিকে আত্ম-সঙ্কোচন (Synthesis)। এই দুইএর মিলন ও সাহচর্য্যেই বিশ্বসৌন্দর্য্যের পূর্ণবিকাশ।

সৌন্দর্য্যের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ রূপের সহিত মানব-হৃদয় ও চিত্ত-বৃত্তির সম্বন্ধ অবধারণের পূর্ব্বে আমরা একটী বৈজ্ঞানিক উদাহরণ প্রয়োগ দ্বারা আমাদের তদ্বিষয়ক ধারণাকে সুস্পষ্ট করা আবশ্যক বলিয়া মনে করি।

বৈজ্ঞানিকগণ বলেন যে, জলের উপর কোন বস্তু নিক্ষেপ করিলে যেমন তৎক্ষণাৎ অসংখ্য বৃত্তের উদ্ভব হয়, তেমনই সঙ্গীতকালে গানের এক একটী ধ্বনির আঘাতে নিকটবর্ত্তী বায়ুমণ্ডলের উপরিভাগে ক্ষুদ্র বৃহৎ, হ্রস্ব দীর্ঘ, বক্র ঋজু, ক্ষণস্থায়ী এবং দীর্ঘস্থায়ী নানাবিধ তরঙ্গ উৎপন্ন হইয়া সেই আঘাত চেতনাকে চতুর্দ্দিকে প্রবাহিত করিয়া শ্রবণ-বিবরে স্বররূপে ব্যক্ত করে। এস্থলে শ্রোতার কর্ণে স্বরবোধ মাত্র প্রত্যক্ষ এবং অবশিষ্ট সমস্ত কার্য্য পরোক্ষ। অতএব সঙ্গীতের সৌন্দর্য্য বলিতে আমরা যে জিনিস বুঝিব তাহা এই প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষের সমন্বয়ঘটিত সমগ্র বিষয়টী। এই সৌন্দর্য্যের যে দিকটা আমাদের নিকট প্রত্যক্ষ সেটা তাহার Synthesis এবং যে দিকটা আমাদের নিকট পরোক্ষ সেটা তাহার Analysis। এবার বোধ হয় একথা অনায়াসে বলা যাইতে পারে যে, সৌন্দর্য্যের প্রত্যক্ষরূপ সৌন্দর্য্য-বিজ্ঞানের তত্ত্ব (Theory) এবং পরোক্ষরূপ তাহার বিজ্ঞান (Science)।

এক্ষণে বৈজ্ঞানিক উদাহরণের বলে সৌন্দর্য্যের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ রূপের যাথার্থ্য আমাদের উপলব্ধি হইল। এই প্রবন্ধের অবশিষ্ট ভাগে আমরা প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ রূপের পরস্পর সম্বন্ধ ও প্রকৃতি এবং মানব-হৃদয় ও চিত্তবৃত্তির ক্ষেত্রে তাহাদের কার্য্য সম্বন্ধে দুই চারিটি কথা বলিব।

সুমিষ্ট সঙ্গীত-শ্রবণে আমাদের হৃদয় যেরূপ মুগ্ধ ও পুলকিত হয়, একটি প্রস্ফুটিত পুষ্প-দর্শনে অথবা তাহার সুরভি-ঘ্রাণগ্রহণেও সেইরূপ হয় কেন? একটি বিলাপ শ্রবণ করিলে আমাদের হৃদয়ে যেরূপ কারুণ্যরসের উদ্রেক হয়, একটি করুণ দৃশ্য দর্শনেও সেইরূপ হয় কেন? একটি অত্যাশ্চর্য্য ঘটনা প্রত্যক্ষ করিলে যেরূপ বিস্ময়ের অভ্যুদয় হয়, একটি বিস্ময়পূর্ণ কাহিনী শ্রবণে সেইরূপ হয় কেন? একজনের সৌন্দর্য্য-পিপাসার পরিতৃপ্তিতে যেমন আনন্দ হয়, আর একজনের সুস্বাদু মিষ্টান্ন আহারে তেমনই হয় কেন? ইহার কারণ কি? ইহার কারণ এই যে, সৌন্দর্য্যের প্রত্যক্ষ সম্বন্ধের দিক হইতে দেখিলে দর্শন, আঘ্রাণ ও আস্বাদন প্রভৃতি একবস্তু নহে, কিন্তু পরোক্ষ সম্বন্ধের

দিক হইতে দেখিলে এই হর্ষ, বিষাদ বা বিস্ময় কেবল দর্শন, আঘ্রাণ বা আস্বাদনের সম্পত্তি নহে—তাহারা যেমন চক্ষুর, তেমনই কর্ণের, নাসিকা, জিহ্বা ও ত্বকের—তাহারা অপরিবর্ত্তনীয়, অদ্বিতীয় এবং বিশ্বজনীন। পক্ষান্তরে সৌন্দর্য্যের প্রত্যক্ষরূপে কি দেখিলাম?—অনন্ত পরিবর্ত্তনীয়তা—অনন্ত চাঞ্চল্য—অনন্ত বৈচিত্র্য। চক্ষুর পর কর্ণ, কর্ণের পর নাসিকা, নাসিকার পর জিহ্বা, জিহ্বার পর ত্বক্, ত্বকের পর আবার চক্ষু, আবার কর্ণ, আবার নাসিকা; বর্ণের পর গন্ধ, গন্ধের পর গান, গানের পর রস, রসের পর স্পর্শ, আবার বর্ণ, আবার গন্ধ, আবার গান! রংএর পর রং, বৈচিত্র্যের পর বৈচিত্র্য! এই আলোক, এই অন্ধকার! এই সজল জলদ, এই বজ্রপ্রসূ তড়িৎ! এই নূতন, এই পুরাতন! এই ভূত, এই ভবিষ্যৎ! এই শীত, এই গ্রীষ্ম! এই শরৎ, এই বসন্ত! এই বর্ষা, এই হেমন্ত! এই পর্ব্বত, এই সমুদ্র! এই রৌদ্র, এই মেঘ! এই জীবন, এই মৃত্যু! এই বাস্তব, এই আদর্শ! এই মায়া, এই মরীচিকা! এই ক্ষেত্র, এই মরু! এই পৃথ্বী, এই ব্যোম! এই সূর্য্য, এই চন্দ্র! এই বায়ু, এই অগ্নি! এই স্বর্ণ, এই মৃৎ! এই জীব, এই জড়! এ রূপের, এ বৈচিত্র্যের শেষ কোথায়?—আর সুখ, দুঃখ, আশা, বৈরাগ্য, প্রেম, ভয়, বিস্ময়—এ যে একতারার সপ্ত স্বর! ইহারই উপর সংসার কুহকভরা যাদুহস্তের পঞ্চ অঙ্গুলী অবিশ্রান্ত বুলাইয়া দিতেছে, অমনই বিচিত্র রাগিণী বাজিয়া উঠিতেছে! এ প্রত্যক্ষ না প্রকৃতি? পরোক্ষ না পুরুষ? অসীম চৈতন্য সমুদ্রে বুদ্বুদের ন্যায় অনন্ত বৈচিত্র্য একবার আসিয়া উঠিতেছে আবার পরক্ষণেই বিলীন হইয়া যাইতেছে। সৌন্দর্য্যের এই অনন্ত বৈচিত্র্যকে বা প্রত্যক্ষ রূপকে আমরা বলিব তাহার দ্বৈতবাদ এবং তাহার অন্তরাধিষ্ঠিত পরম ঐক্যকে বলিব তাহার অদ্বৈতবাদ। এই দ্বৈত ও অদ্বৈতবাদের সমন্বয়-ক্ষেত্রেই সৌন্দর্য্যের পূর্ণরূপ প্রকাশিত।

শশীতপন অযুত তারকার মাঝে, বসন্তকালীন বনরাজির সুস্নিগ্ধ শ্যামলতায়, জলভারাবনত-নবনীল কাদম্বিনীর স্মিতগাম্ভীর্য্যে, মলয়মারুতসেবিতা ব্রততীর ললিত নৃত্যে, মৃদুমন্দপ্রবাহিতা তটিনীর কুলুকুলু নিনাদে, অপাপবিদ্ধ শিশুর অনিন্দ্যসুন্দর শুভ্রহাস্যময় মুখচ্ছবিতে, মানব হৃদয়ের সুখ, দুঃখ, বেদনা, অভিমান, প্রেম ও ত্যাগের মধ্যে সৌন্দর্য্য আপনাকে ধরা দিয়াছে। রসে, স্পর্শে, দৃশ্যে, গন্ধে, গানে সৌন্দর্য্য যিনি আপনাকে এমন অপর্য্যাপ্তরূপে উচ্ছ্বসিত করিয়া রাখিয়াছেন তাঁহার স্তূপীকৃত অনন্ত বৈচিত্র্যের মধ্যে যখন তিনি দেখা

দেন তখন তিনি দ্বৈতরূপিনী এবং যখন ঐ বৈচিত্র্যরাশির অন্তঃপুরবাসিনীরূপে ঐক্য ও সামঞ্জস্যকে অন্তঃসলিলা ফল্গুধারার ন্যায় বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের নাড়ীতে নাড়ীতে সঞ্চারিত করিয়া দেন, তখনই তিনি অদ্বৈতরূপিনী। বিশ্ববৈচিত্র্যের মর্ম্মস্থানে যদি ঐক্য ও সামঞ্জস্য না থাকিত তাহা হইলে এমন একটা কথা কেহ বলিতেই পারিত না যে, truth is beauty and beauty is truth অর্থাৎ সত্যং সুন্দরং। এই বৈচিত্র্যের মধ্য হইতে ঐক্যকে টানিয়া বাহির করাই কবির কাজ। তাই কবি গাহিয়াছেন--

আমি রূপ-সাগরে ডুব দিয়েছি অরূপ রতন আশা করি।

কবির সৌন্দর্য্য-সাধনার আরম্ভ দ্বৈতবাদে এবং তাহার চরম পরিণতি ও সিদ্ধি অদ্বৈতবাদে।

এখন জিজ্ঞাসা করি—সৌন্দর্য্যের মূল কি? তাহার উত্তর বিশ্ব-হৃদয়। মানব-হৃদয় না বলিয়া বিশ্ব-হৃদয় বলিবার কারণ এই যে, সৌন্দর্য্যবোধ কেবল মানব-হৃদয়েই আবদ্ধ নহে, পশুপক্ষী প্রভৃতির মধ্যেও তাহা বিদ্যমান। অতএব সৌন্দর্য্যের মূল বিশ্বহৃদয়। *

শ্রীগুরুদাস দেব।

বামুণ ঠাকুর।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

"কল্‌কেতার একখানা টিকিট দাও ত।" ছিটের সার্ট গায়ে, টেরিকাটা কৃষ্ণবর্ণ এক জোয়ান মূর্ত্তি থার্ড ক্লাস টিকিটঘরের কাটা জানালার কাছে দাঁড়াইয়া একটা টাকা দিয়া বলিল "কল্‌কেতার একখানা টিকিট দাও ত।"

কথা শুনিয়াই টিকিটবাবুর আপাদমস্তক জ্বলিয়া গেল। তাঁহার প্রভাব বড় কম নয়। "আপনি" "মশাই" বলিয়াও যখন লোকে তাঁহার সাড়া পায় না, "অনুগ্রহ করে শীঘ্র দিন না" বলিলেও যখন তিনি অন্যদিকে মুখ ফিরাইয়া

---

* এই প্রবন্ধে সর্ব্বত্র প্রত্যক্ষ শব্দ "ইন্দ্রিয় জন্য জ্ঞান" এবং পরোক্ষ শব্দ "ইন্দ্রিয় জন্য জ্ঞানের অতীত" এই অর্থে বুঝিতে হইবে।—লেখক।

নিশ্চিন্তমনে সিগারেট্ টানিতে থাকেন, তখন একেবারে রূক্ষকণ্ঠে 'টিকিট্ দাও ত' শুনিয়া তাঁহার যে রাগ হইবে তাহা বিচিত্র নয়। আর পয়সাও নেহাৎ তিনি কম রোজগার করেন না। পঁচিশ টাকা মাহিনা, তার উপর রোজ এক টাকা দুই টাকা উপরি রোজগার হইয়াই থাকে। আনাড়ি লোক দেখিলেই একটাকা লইয়া চার আনার টিকিট দিয়া ছয় আনা ফেরৎ দিয়া থাকেন। বাকিটা নিজের পকেটেই পড়ে। এই উপরি রোজগারের জোরেই 'পানীয় বিশেষ' পান করিয়া শরীরকে একটু stimulate'ও করিয়া থাকেন। কাজেই রক্তবর্ণ চক্ষে তিনি তৎক্ষণাৎ টাকাটা ফেরৎ দিয়া বলিলেন "এ টাকা চল্‌বে না।"

ক্রেতাও ছাড়িবার পাত্র নয়। বলিল "চল্‌বে না কি রকম? গড়্‌গড়িয়ে চল্‌বে। চালাকি পেয়েছ? দু' কলম লিখে দিলে তোমার চাকরী পর্য্যন্ত ঘোচাতে পারি তা জান?"

টিকিটবাবু ক্রোধে অগ্নিশর্ম্মা হইয়া উঠিলেন। অবশ্য প্রথম এই চাকরিটি যোগাড় করিতে ছয়মাস হাঁটাহাঁটি করিয়া তাঁহার এক জোড়া জুতা ছিঁড়িয়াছিল ও কর্ম্মচারীবিশেষকে পরিবারের গয়না বন্ধক দিয়া পঞ্চাশ টাকা ঘুস দিতেও হইয়াছিল। কিন্তু "তে হি নো দিবসা গতাঃ"। তখন উমেদারের অবস্থা। আর এখন তিনি থার্ড ক্লাস যাত্রীর দণ্ডমণ্ডের কর্ত্তা—প্রবলপ্রতাপশালী টিকিট বাবু। চেয়ারে বসিয়া রহিয়াছেন, যাত্রী কি তাহাও দেখিতে পাইতেছে না?

টিকিটবাবু অন্য এক যাত্রীর পয়সা লইবার যোগাড় করিতেছেন, এমন সময় পূর্ব্বোক্ত যাত্রীটি সকলকে ঠেলিয়া টিকিট বিক্রয়ের জানালার সম্মুখ অধিকার করিল ও বলিল "চল্‌বে না। আচ্ছা লিখে দাও তুমি, টাকা চল্‌বে না। তোমায় মজা দেখাচ্ছি। অডিটার বাবুকে বলে তোমার চাকরী ঘুচিয়ে দোব।"

টিকিটবাবুর জ্বলন্ত ক্রোধে যেন বারিবর্ষণ হইল। লোকটা কে? ভাল করিয়া ঝুঁকিয়া পড়িয়া যাত্রীটির মুখখানা দেখিয়া, বহুকষ্টে ক্রোধ দমন করিয়া একটু কাষ্ঠ হাসি হাসিয়া বলিলেন "আরে বামুণ ঠাকুর তুমি! তামাসা বোঝ না।" এই বলিয়া সেই টাকাটিই লইয়া তাহাকে টিকিট ও বাকী পয়সা ফেরত দিলেন। অডিটার বাবুর বামুণ ঠাকুর সে, রেলওয়ে লাইনে তাহার প্রতাপও কম নহে।

প্লাটফর্ম্মে গাড়ী দাঁড়াইয়াছিল। বামুণ ঠাকুর একখানি গাড়ীতে উঠিয়া পড়িবার পরই গাড়ী ছাড়িয়া দিল।

কিয়ৎক্ষণ পরে অডিটার বাবু টিকিটঘরে দর্শন দিলেন। টিকিটবাবু তাড়াতাড়ি চেয়ার হইতে উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিলেন "আপনার রাঁধুনী ঠাকুর আজ যে কল্‌কেতা গেল।"

অডি। আরে সে বেটা ভয়ানক চোর। আজ তা'কে তাড়িয়ে দিলুম।

টিকিটবাবু তখন ভাবিলেন "ওঃ, বেটা কি পাজী! এখন একবার পাই ত বেটাকে সিধে করে দিই। একথা আগে জান্‌লে কি আর বেটাকে ভয় করতুম।" নিষ্ফল ক্রোধে টিকিটবাবু ফুলিতে লাগিলেন।

ইহার মাসখানেক পরে একদিন কলিকাতার এক বৃহৎ ত্রিতল বাটীর দ্বারে এক বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ আসিয়া উপস্থিত হইল। বাড়ীর ভিতরে ঢুকিয়াই দক্ষিণদিকে বৈটকখানা, সেখানে কর্ত্তা বসিয়াছিলেন। ব্রাহ্মণকে দেখিয়া বলিলেন "কে হে? কি চাও?"

কর্ত্তার পৈতৃক কিছু জমিদারী ছিল। সেইজন্য তাঁহার বসিয়া চলে। তিনি জমিদার বলিয়া নিজের পরিচয় দিতেন ও সগর্ব্বে সকলের উপর নিজের প্রভুত্ব দেখাইতেন। কাজেই ব্রাহ্মণকে দেখিয়া ঐরূপ মুরুব্বিয়ানা চালে সম্ভাষণ করিয়াছিলেন।

ব্রাহ্মণ বলিল—"আজ্ঞে, আমার একটু প্রয়োজন আছে।"

বাবু একখানি চেয়ারে বসিয়াছিলেন। তাঁহার পদতলে চার আঙ্গুল উঁচু একখানি তক্তপোষের উপর একটি বিছানা পাতা ছিল। তাহা দেখাইয়া দিয়া বলিলেন "বস।" বলিয়া এক উদ্‌গার তুলিয়া বলিলেন "ওঃ—পোলাওটাতে বামুণ ঠাকুর কাল এমন ঘি দিয়েছিল, এখনও হজম কর্‌তে পারি নি। খালি ঢেঁকুর উঠ্‌ছে।" পাশে এক শীর্ণকায় ভদ্রলোক একখানি টুলের উপর বসিয়া তামাক খাইতেছিলেন, তাঁহাকে লক্ষ্য করিয়াই এই কথা বলা হইল।

শীর্ণকায় ব্যক্তি বলিলেন "আর বলেন কেন? আমরা গরীব লোক। ভাত ডাল খাই। সাত টাকা দিয়ে এক উড়ে বামুণ রেখেছি তা সে ডাল ভাতই রাঁধতে জানে না।"

কর্ত্তা। আরে লোকও জোটে না। কাল তপ্‌সে মাছ ভাজা করেছে—সবগুলো চোঁয়া। সেদিন জলখাবারের লুচি ভেজেছিল তার অর্দ্ধেকটা কাঁচা। হাঁ—তোমার কি দরকার?

ব্রাহ্মণকে লক্ষ্য করিয়াই এই কথাগুলি বলা হইল। ব্রাহ্মণ অতি সঙ্কুচিত হইয়া পড়িতেছিলেন। বহু ক্লেশে বলিলেন "আজ্ঞে, আমার ছেলে আপনার

এখানে কাজ করে। সামনে যোগটা আছে, তাই মনে কর্‌লুম, একবার গঙ্গাস্নানটা করে আসি, ছেলেটাকেও দেখে আসি"।

কর্ত্তা। তোমার ছেলে? তার নাম কি?

ব্রা। রজনীকান্ত ভট্টাচার্য্য।

ক। ওঃ—আমাদের বামুণ ঠাকুরের বাপ তুমি? তা যাও ঐদিকে। ওরে রামা, বামুণ ঠাকুরকে ডেকে দে।

রামা চাকর ব্রাহ্মণকে সে কক্ষ হইতে চাকরদের ঘরে লইয়া গেল।

এদিকে কর্ত্তা শীর্ণকায় লোকটিকে বলিলেন "আচ্ছা গাঙ্গুলী মশায়, বাচ্ছা হাঁসের ডিমের কি 'কুসুম' (yolk) থাকে না?"

গা। কেন থাক্‌বে না?

ক। তবে সেদিন বামুণ ঠাকুর হাঁসের ডিমের ডান্‌লা করেছিল, আধখানা করে ডিমগুলোকে কেটেছিল। তার ত কই শাঁস পেলুম না। খালি সাদা সাদা গুলো। ঠাকুরকে জিজ্ঞাসা করতে বল্‌লে, এ বাচ্ছা হাঁসের ডিম। এতে 'কুসুম' থাকে না।

গাঙ্গুলী মহাশয় উচ্চহাস্য করিয়া উঠিলেন। বলিলেন "বেটা, আচ্ছা বদ্‌মাইস্ ত। নিজে খেয়ে মেরে দিয়েছে আর কি? হাঃ—হাঃ—হাঃ—বলে কি না বাচ্ছা হাঁসের ডিম—হাঃ—হাঃ হাঃ"। হাসির চোটে গাঙ্গুলী মহাশয় টুল হইতে উল্টাইয়া পড়িয়া যাইবার মত হইলেন।

কর্ত্তা নিজের অনভিজ্ঞতায় অপ্রস্তুত হইয়া একথা চাপা দিবার চেষ্টা করিলেন। নিজের মুর্খতা কেই বা স্বীকার করিতে চায়? বলিলেন, "দেখ, গাঙ্গুলী, গয়লা বেটা ভারী বদমায়েসি আরম্ভ করেছে। রোজ ওজনে কম দুধ দেয়।"

গা। সে কি? আপনার সামনে মেপে নেবেন।

ক। আরে তাত' নিই। কিন্তু খেতে বসে দেখি এক বাটিও হয় না।

গা। বামুণ বেটা মেরে দেয় না ত?

ক। নাহে না। সরশুদ্ধ দুধের কড়া সামনে আনিয়ে দুধ ঢালিয়ে নিই। আমায় কি তেমনি বোকা পেয়েছ? দুধ জ্বাল দেবার সময় নিজে দেখি। জ্বাল দেওয়া হয়ে গেলে সর পড়্‌লে দুধ চাপা দিয়ে রাখিয়ে দিই। সর পড়বার পর দুধ ঢালতে গেলে ত সর ঘেঁটে যাবে।

গাঙ্গুলী মহাশয় হুঁকা রাখিয়া উঠিলেন। বলিলেন "তা মৎলব করেছেন মন্দ নয়। বেলা হ'ল। এখন উঠি।"

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

বামুণ ঠাকুর পিতাকে দেখিয়া একটু বিপন্ন হইয়া পড়িল। তাহার পিতার অর্থ না থাকিলেও দেশে তাঁহার মান সম্ভ্রম বড় কম নয়। তিনি একজন অধ্যাপক। তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র পিতার সঙ্গে চতুষ্পাঠীতে অধ্যাপনা করেন। দ্বিতীয় পুত্র রজনী উচ্ছৃঙ্খল। লেখাপড়া কিছুই করে নাই। বাটী হইতে পলাইয়া আসিয়া রাঁধুনী বামুণ হইয়াছিল।

তাহার পলায়নের পর এই প্রথম পিতার সহিত সাক্ষাৎ। হঠাৎ পিতা আসিয়া পড়িবেন একথা সে স্বপ্নেও ভাবে নাই। এখন সেই 'টেরি'সমন্বিত ছোট বড় করিয়া ছাঁটা কেশশোভিত মস্তক লইয়া পিতার সম্মুখে বাহির হইতে তাহার পা উঠিতেছিল না। কিন্তু না আসিলেই নয়। কিছু আগে জানিতে পারিলে সে তাড়াতাড়ি মাথা কামাইয়া ফেলিয়া টেরী বিসর্জ্জন দিতেও প্রস্তুত ছিল।

তাহার পিতা বলিলেন "চ', গঙ্গাস্নান করিয়া আসি।"

রজনী প্রত্যহ কলের জলেই স্নান করিত। গঙ্গার উপর তাহার তত ভক্তি ছিল না। কাদামাখা জলে তাহার রং ময়লা হইয়া যাইবে। কলিকাতায় আসিয়া তাহার ফরসা হইবার বড় ইচ্ছা হইয়াছিল। সেইজন্য প্রত্যহ কলকেতায় তাহার মসীনিন্দিত দেহে বহুক্ষণ ধরিয়া সাবান ঘর্ষণও করিত। কিন্তু আজ পিতার কাছে আর আপত্তি করিতে পারিল না।

গঙ্গাতীরে আসিয়া তাহার পিতা বলিল "রজনী, তুই আমাদের মাথা হেঁট কর্‌লি। তোকে কিছু কর্‌তে হবে না। তুই বাড়ীতে বসে থাকবি চল। অখাদ্যগুলো খেয়েছিস্‌, একটা প্রায়শ্চিত্ত করিয়ে দোব। যাবি ?"

রজনী রাজী হইল না। সেই অজ পাড়াগাঁয়ে, মাটীর ঘরে খড়ের ছাউনি মনে পড়িতেই তাহার আত্মাপুরুষ শুকাইয়া উঠিল। সে এখন বাবু হইয়াছে। পম্প্‌স্‌ পায়ে দেয়। সিল্কের চাদরও একখানি সংগ্রহ করিয়াছে।

ব্রাহ্মণ অনেক অনুরোধ করিলেন, রজনী কিছুই শুনিল না। শেষে ব্রাহ্মণ বলিলেন "এখানেই তবে থাক্‌। খাওয়া দাওয়া ত শুন্‌ছি ভালই হয়।"

র। কি রকম ?

ব্রা। কর্ত্তা বলছিলেন পোলাও, লুচি, তপ্‌সে মাছ এই সব নাকি রান্না হয়।

র। কে বল্লে ? হাঃ—হাঃ—হাঃ। বাবুর সেদিকে অষ্টরম্ভা। পান্তাভাত নুন মেখে খেয়ে ঢেঁকুর তুলে বলেন, পোলাওটায় ঘি বেশী হয়েছিল হজম হয়নি

টেঁকুর উঠ্‌ছে। জলখাবারের সময় লুচি খান, তা আমার উপর হুকুম আছে টাকার মত ছোট ছোট চারখানি লুচি তৈরি করে [illegible] মধ্যে হাঁসের ডিম খাওয়া, তাও যখন তিন পয়সায় দুটো পাওয়া যায়।

ব্রা। খাওয়া দাওয়া তা হলে সুবিধে নয়?

র। সুবিধে? অনবরত টিক্ টিক্ করছে। এত খরচ হয়ে গেল। তত খরচ হয়ে গেল। একটা শিশিতে করে রাঁধবার তেল দেয়। তাতে ওষুধের শিশির মত দাগ মেরে দিয়েছে। রোজ এক দাগের ভেতর রান্না সারতে হবে। দুধ সামনে দাঁড়িয়ে থেকে জ্বাল দিয়ে রাখান। সর পড়্‌লে ঢাকা থাকে। পাছে আমি খেয়ে ফেলি। আর কথায় কথায় জরিমানা হচ্ছে। বাড়ীর সকলকার খাওয়া হয়ে গেলে কর্ত্তা এসে বলেন 'ঠাকুর! হাঁড়ী দেখি।' যদি এক মুটো ভাত পড়ে থাকে অমনি চার আনা জরিমানা। বলেন, ঠিক তুই আন্দাজ করে চাল নিস্‌নি। রোজ ভাত নষ্ট কচ্ছিস্।

ব্রা। সে কি রে? সবদিন কি সকলে সমান খায়? একদিন কেউ এক-মুটো বেশী খেলে, কেউ বা একমুটো কম খেলে।

র। তা কে জানে? বাবুর ঐ হুকুম। আর "বামুণ বেটা সব চুরি কচ্ছে" এ বুলি ত মুখে লেগেই আছে।

ব্রা। দেখ্ দিকি। এরকম অপমান সহ্য করে তোর থাকবার কি দরকার? চ' আমার সঙ্গে বাড়ী চ'।

কিন্তু রজনী বাড়ী কিছুতেই যাইবে না। তাহার প্রধান কারণ কলিকাতায় আসিয়া সে দুই একটি নেশা করিতে শিখিয়াছিল। আনুষঙ্গিক উপসর্গের কথাও মধ্যে মধ্যে শোনা যাইত।

উভয়ে গঙ্গাস্নান করিয়া ফিরিয়া আসিলেন।

ব্রাহ্মণ বাড়ী যাইবার দিন কর্ত্তার কাছে বিনীত ভাবে জানাইলেন যে কর্ত্তা যেন তাঁহার ছেলেটিকে দেখেন। সে একগুঁয়ে, কথা শোনে না। নহিলে তাহাকে দেশে লইয়া যাইত। কর্ত্তা মহৎ ব্যক্তি। মহদাশ্রয়ে সে যেন সুখে থাকে।

কর্ত্তা মুরব্বিয়ানা চালে বলিলেন "আচ্ছা, আচ্ছা। দেখ্‌ব বই কি! তোমার কোনও চিন্তা নাই।"

আশীর্ব্বাদ করিয়া ব্রাহ্মণ বিদায় হইলে কর্ত্তা গাঙ্গুলী মহাশয়কে বলিলেন "বুড়ো বেটা বদ্‌মাইসের ধাড়ী। মায়াকান্না কাঁদতে এসেছেল।"

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

সকলের খাওয়া দাওয়া হইয়া গেলে রজনী হুঁকাটি হাতে করিয়া বাবুর বাড়ী হইতে বাহির হইয়া যাইত ও সেই রাস্তার পার্শ্ববর্ত্তী এক গলির ভিতর এক মুদীর দোকানে গিয়া বসিত। সেখানে অনেকক্ষণ গল্পগুজব করিত। বেলা আড়াইটা বাজিলে আবার হুঁকা হস্তে বাবুর বাড়ীতে ফিরিয়া আসিত।

একদিন এইরূপ ফিরিয়া আসিতেছে এমন সময় গাঙ্গুলী মহাশয় তাহাকে ডাকিলেন। রজনী তাঁহার কাছে গেলে বলিলেন "ওহে! একলা খেও না। আমাদেরও কাঁটাটা আসটা দিও। নইলে টেঁক্‌তে পারবে না।"

র। আজ্ঞে সে কি?

গা। আহা, যেন ন্যাকা! বলি, বাবুর বাজার কর, কোন্ না কিছু উপরি মার? তা নাও, নাও কিন্তু আমাদের কিছু দিয়ে খেতে হয়, বুঝ্‌লে? আমরাও হামেসা বাবুর কাছে কাছে থাকি। বুঝ্‌লে? আর বাচ্ছা হাঁসের ডিমের কুসুম থাকে কি না এ কথার সাক্ষী তুমি পাবে কোথায়?

এই বলিয়া গাঙ্গুলী মহাশয় হাঃ-হাঃ করিয়া হাসিতে লাগিলেন।

র। আজ্ঞে আমাকে সে রকমের লোক মনে কর্‌বেন না। মনিবের পয়সা আমার গায়ের রক্ত।

গা। ওহে—ওরকম বুদ্ধি ক'র না। প্যাঁচে পড়্‌বে। আচ্ছা তোমার ধর্ম্ম তোমার কাছে।

এই বলিয়া গাঙ্গুলী মহাশয় চলিয়া গেলেন।

ইহার পর আরও দুই তিন দিন গাঙ্গুলী মহাশয় কিছু পাইবার প্রত্যাশা করিয়াছিলেন কিন্তু রজনীর চোটপাট জবাব শুনিয়া নিরস্ত হইয়া গেলেন।

ইহার পর কর্ত্তা ও গাঙ্গুলী মহাশয়ের মধ্যে কি চুপি চুপি পরামর্শ চলিতে লাগিল। বামুণ ঠাকুরের গতিবিধির উপর গোপনে লক্ষ্য রাখা হইল।

একদিন দুধ জ্বাল দিয়া সর পড়িলে কর্ত্তা তাহা ঢাকা দিয়া রাখিতে হুকুম দিয়া বাহিরে আসিলেন। খানিকক্ষণ পরে দেখা গেল বামুণ ঠাকুর রান্নাঘরের কপাট ভেজাইয়া দিল। কর্ত্তা ও গাঙ্গুলী মহাশয় অমনি জানালার পাশে আড়ি পাতিয়া দাঁড়াইলেন। দেখিলেন, বামুণ ঠাকুর একটা পাঁকাটি বাহির করিয়া দুধের কড়ার ঢাকনি খুলিল ও সর একটু সরাইয়া পাঁকাটি দুধে ডুবাইয়া দিয়া মুখ দিয়া টানিতে লাগিল। সর যেমন তেমনি রহিল, দুধ পাঁকাটির ভিতর দিয়া বামুন ঠাকুরের মুখে উঠিতে লাগিল।

সহসা কর্ত্তা ডাকিলেন "ঠাকুর!" রজনী ত্রস্ত হইয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। কর্ত্তা বলিলেন "বেটা হারামজাদ। তাই ত বলি, দুধ যায় কোথা? তুমি যে হেথা বক-যন্ত্রের সাহায্যে ফিলটার কর্‌তে বসেছ তা বুঝ্‌ব কি করে? গাঙ্গুলী, দাও বেটাকে ঘা কতক দিয়ে দাও।" গাঙ্গুলী মহাশয় সানন্দে গায়ের ঝাল মিটাইয়া লইলেন।

পরদিন যথানির্দ্দিষ্ট সময়ে রজনী হুঁকাটি লইয়া দ্বিপ্রহরে বাহির হইতেছে এমন সময় গাঙ্গুলী আসিয়া পথ রোধ করিল। কর্ত্তাও কোথা হইতে আসিয়া পড়িলেন। সঙ্গে রামা চাকর। তাহার হাতে তামাকের কলিকা সাজা। সেই কলিকায় সে ফুঁ দিতেছে।

গাঙ্গুলী মহাশয় বলিলেন "ঠাকুর! তোমার হুঁকাটা একবার দাও ত। একটান তামাক খেয়ে নিই।"

রজনী। সেকি? এ হুঁকোয় আপনি কি করে খাবেন? আমি আপনার হুঁকো এনে দিচ্ছি।

গা। না-না। দাও না এইটেই।

এই বলিয়া তাড়াতাড়ি তাহা রজনীর হাত হইতে কাড়িয়া লইলেন। রামা কলিকা পরাইয়া দিল। রজনী চলিয়া যায়, কর্ত্তার ইঙ্গিতে রামা তাহার হাত ধরিল।

গাঙ্গুলী বলিলেন "বাঃ—ঠাকুরের থেলো হুঁকোটি ত বেশ। অনেক জল ধরে, মালাটি খুব বড়। তা ঠাকুর মালার ভেতর জল না পুরে ঘি পুরেছ কেন? কলাপাতার ঠোঙ্গা করে গরম ঘি রোজ হুঁকোর মালায় ঢেলে নিয়ে গিয়ে ছিদাম মুদীর দোকানে বেচে এস, আমরা বুঝি তা বুঝতে পারি না?"

বাস্তবিকই হুঁকার মালার ভিতর ঘৃত রহিয়াছে।

তখন কর্ত্তার আজ্ঞায় ভীষণ প্রহার দিয়া বামুণ ঠাকুরকে দূর করিয়া দেওয়া হইল। গাঙ্গুলী মহাশয়ও চটিজুতা খুলিয়া দুই এক ঘা মারিলেন। রজনী প্রহৃত হইয়া লজ্জায় মুখ ঢাকিয়া পলাইয়া গেল।

রামা বলিল "ওঃ—এত বড় চোর ত আমি ত কখনও দেখিনি। আগে যে বামুণটা ছিল সেও চুরি করত বটে কিন্তু সে সামান্য। হয়ত একটা বাটিতে ঘি ঢেলে ভাতের ভেতর লুকিয়ে রাখ্‌লে কি দুখানা মাছ খেয়ে ফেল্‌লে। কিন্তু এরকম—বাপ্‌—আমার চোদ্দপুরুষেও কেউ কখন দেখেনি।"

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

দ্বিপ্রহরের রৌদ্রতাপে ক্লিষ্ট হইয়া দলে দলে গ্রামস্থ ব্রাহ্মণেরা শশিকান্ত ভট্টাচার্য্যের চতুষ্পাঠীতে উপস্থিত হইতেছিলেন। শশিকান্ত ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের কনিষ্ঠ পুত্রের আজ উপনয়ন, নিমন্ত্রণ-রক্ষা করিবার জন্যই দলে দলে ব্রাহ্মণগণ চতুষ্পাঠীতে আগমন করিতেছিলেন।

উপনয়ন হইয়া গেল। বৃহৎ আটচালায় ব্রাহ্মণভোজনের উদ্যোগ হইতে লাগিল। আসন পাতা ও জল দেওয়া হইল। ভট্টাচার্য্য মহাশয় এতক্ষণ উপনয়ন সংস্কার পর্য্যবেক্ষণ করিতেছিলেন। এবার আসিয়া নিমন্ত্রিত ব্যক্তি-বর্গের অভ্যর্থনা করিতে লাগিলেন। সকলেই প্রীতিপ্রফুল্লমুখে সম্বর্দ্ধনা গ্রহণ করিলেন। কেবল গদাধর ভট্টাচার্য্য একটু বিদ্রূপের হাসি হাসিয়া বলিলেন "কই, রজনীকে দেখছি না যে? সে কি আসে নি?"

গদাধর ভট্টাচার্য্যেরও সেই গ্রামে একখানি চতুষ্পাঠী ছিল। তাহার সহিত শশিকান্ত ভট্টাচার্য্যের চতুষ্পাঠীর প্রতিযোগিতা চলিত। কিন্তু শশিকান্তের চতুষ্পাঠীর সুনাম ছিল কাজেই ছাত্রসংখ্যা অধিক। পরীক্ষার ফলও সন্তোষজনক হইত। গদাধর তাই হিংসায় দগ্ধ হইতে থাকিতেন। শশিকান্তের ছিদ্রান্বেষণ ও নিন্দা তাঁহার জীবনের ব্রত ছিল। শশিকান্তের পুত্র রজনীর উচ্ছৃঙ্খলতা লইয়াই গদাধর যখন তখন বিদ্রূপ করিতেন।

শশিকান্তও পুত্রের জন্য লোকের কাছে মুখ দেখাইতে পারিতেন না। তিনি দরিদ্র বটে কিন্তু তাঁহার হৃদয় বড়ই অভিমান-প্রবণ। কেহ যে কোন সূত্র ধরিয়া তাঁহার নিন্দা করিবে ইহা তিনি সহ্য করিতেন না। তাই তিনি এ প্রশ্নের উত্তর না দিয়া মুখুয্যে মহাশয়কে বলিলেন "কই আপনার ছেলেকে আন্‌লেন না?"

মুখুয্যে মহাশয় বলিলেন "না, আজ সে তা'র দিদির বাড়ী গেছে।"

গদাধর এই সময় আবার বলিল "শুন্‌ছেন ভট্‌চায্‌ ম'শায়! রজনী এয়েছে কি?"

শশিকান্ত সংক্ষেপে বলিলেন "না"।

গ। সে এখন কোথায় আছে?

শ। কলিকাতায়।

গ। কি করছে?

শ। চাকরী।

গ। কত মাহিনা? কোথায় কর্ম্ম করে?

শশিকান্ত বড় বিপদে পড়িলেন। তাঁহার পুত্র রাঁধুনীগিরি করে এ কথা বলিতে তাঁহার মাথা কাটা যাইতে লাগিল। একবার মনে করিলেন মিথ্যা কথা বলিবেন, কিন্তু তখনই স্মরণ হইল জ্ঞানতঃ ইচ্ছাপূর্ব্বক তিনি কখনও মিথ্যা কথা বলেন নাই। তিনি কি করিবেন? পাড়ার আর আর সকলে কৌতূহলে তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া আছে।

মুখুয্যে মশায় তাঁহাকে রক্ষা করিলেন। হঠাৎ তিনি বলিলেন "রজনীকে খবর দিয়েছেন কি? সে আজ আস্‌বে ত? গাড়ীর সময় ত প্রায় হয়ে এল।"

শশিকান্ত রজনীকে পত্র দিয়াছিলেন। সে পত্র কলিকাতায় পৌঁছিলে কর্ত্তা গাঙ্গুলী মহাশয়কে তাহা দিয়াছিলেন। বলা বাহুল্য রজনী তাহার পূর্ব্বেই সেখান হইতে বিতাড়িত হইয়াছিল, কাজেই সে পত্রও পায় নাই।

শশিকান্ত বলিলেন "হাঁ"। প্রকারান্তরে ইহা মিথ্যা হইল। তিনি পত্র দিয়াছিলেন এ কথাটা সত্য কিন্তু রজনী আজ আসিবে কি না এ কথাটা তিনি জানিতেন না। এই 'হাঁ' কথাটি বলিয়া তাঁহার মনে অত্যন্ত কষ্ট হইতে লাগিল।

এই সময় শশিকান্তের জ্যেষ্ঠ পুত্র আসিয়া বলিল "আপনারা গা তুলুন। খাওয়ার যায়গা হয়েছে।"

ব্রাহ্মণগণ দলে দলে ভোজন স্থানে উপস্থিত হইতে লাগিলেন। এই সময় নিকটবর্ত্তী রেল ষ্টেশনে বংশীধ্বনি শ্রুত হইল। কলিকাতার গাড়ী আসিয়া গিয়াছে।

শশিকান্ত ব্রাহ্মণ-ভোজনের তত্ত্বাবধান করিতে লাগিলেন। বৃহৎ আটচালা ভরিয়া দলে দলে ব্রাহ্মণগণ ভোজনে নিরত। চতুষ্পাঠীর ছাত্রবৃন্দ পরিবেশন করিতেছে। ব্রাহ্মণমণ্ডলীর ভোজন যখন প্রায় অর্দ্ধেক সমাপ্ত তখন সহসা একটা কোলাহল শ্রুত হইল। অল্পক্ষণ পরেই দুইজন কনষ্টেবল ও একজন জমাদার হাতকড়িবদ্ধ রজনীকে লইয়া শশিকান্তের গৃহপ্রাঙ্গণে আবির্ভূত হইলেন, রজনীকে এই অবস্থায় দেখিয়া পরিবারস্থ রমণীগণ রোদন করিয়া উঠিল। শশিকান্ত অগ্রসর হইয়া বলিলেন "এ কি? কি হয়েছে?"

জমাদার রুক্ষস্বরে বলিল "আমরা কল্‌কেতা থেকে আসছি। এ কি আপনার ছেলে? কল্‌কেতায় যদুবাবুর বাড়ী রাঁধুনী ছিল। একখানা রূপার বাসন চুরি করে বেচ্‌তে গিয়ে ধরা পড়েছে। আরও ত একটা জিনিস চুরি গেছে। আপনার বাড়ী খানাতল্লাস হবে।"

এই সময় গ্রামস্থ দারোগা দুইজন চৌকীদার সহ দর্শন দিলেন। যে ব্রাহ্মণগণ ভোজনে বসিয়াছিলেন, তাঁহারা তাড়াতাড়ি উঠিয়া পড়িবার উদ্যোগ করিলেন। তখন শশিকান্ত যোড়হাত করিয়া তাঁহাদের বলিলেন "আপনারা উঠবেন না। আমার কর্ম্ম তা'হলে পণ্ড হবে। আমার মিনতি রক্ষা করুন।"

ব্রাহ্মণগণ তাঁহার কাতর মিনতিতে কোনও প্রকারে ভোজন সমাপন করিয়া উঠিয়া পড়িলেন। গদাধর ভট্টাচার্য্য বিদ্রূপের হাসি হাসিয়া জনান্তিকে বলিলেন "ব্রাহ্মণের কথা কি মিথ্যা হয়? সত্যই রজনী এসে পড়েছে।"

গদাধরের চতুষ্পাঠীর এক ছাত্র বলিল "আপনি কি এসেছে? পেয়াদায় এনেছে।"

শশিকান্তের বড় ছেলে তখন ছুটিয়া আসিয়া বলিল "মুখুয্যে মশায়! মুখুয্যে মশায়! শীগগির আসুন। বাবা মূর্চ্ছা গেছেন।"

গদাধর ভোজনান্তে পান চিবাইতে চিবাইতে বাড়ী ফিরিয়া বলিল "আবার ঢং করে মূর্চ্ছা গেছেন। চোরাই মাল বাড়ীতে রাখা চালাকী নয়। বাছাধনকে শ্রীঘর দেখ্‌তে হবে।"

ইহার একমাস পরে গদাধরের চতুষ্পাঠীতে সমবেত ছাত্রবৃন্দের নিকট গদাধর বলিল "ওহে তোমরা শুনেছ, আজ রজনীর তিন মাস মেয়াদের হুকুম হয়েছে। ভট্‌চায মশায় বহুকষ্টে অব্যাহতি পেয়েছেন বটে কিন্তু তাঁর অবস্থা সঙ্কটাপন্ন। একে ত সেই পৈতের দিন থেকেই ভুগ্‌ছেন, তার পর আবার এই সকল হাঙ্গাম। কবিরাজ বলেছে আজ রাত কাটে কি না সন্দেহ।"

এই সময় গ্রামের অপর প্রান্তে শশিকান্ত ভট্টাচার্য্যের বাড়ী হইতে শব্দ উঠিল "বল হরি! হরিবোল।"

শ্রীশরচ্চন্দ্র ঘোষাল।

সাহিত্য-সমাচার।

দার্শনিক শাখা।

(সভাপতি শ্রীযুক্ত প্রসন্নকুমার রায় মহোদয়ের অভিভাষণের সারাংশ।)

দার্শনিক সাহিত্যের উন্নতি করিতে হইলে পরিভাষার অভাব দূর করিতে হইবে। বাঙ্গালায় কোনও দার্শনিক আলোচনা করিতে গেলে প্রথমেই শব্দের অভাব অনুভব করিতে হয়। বঙ্গসাহিত্যের শব্দ-সম্পদ্ যে এখনও আশানুরূপ বর্দ্ধিত হয় নাই, তাহা সকলেই স্বীকার

করিবেন। এই শব্দ-সম্পদ্ বাড়াইয়া না লইলে দর্শনের ন্যায় গভীর ও জটিল বিষয়ের আলোচনায় পদে পদে ভাষার দৈন্য অনুভব করিতে হয়। এ সম্বন্ধে হয়ত আপনারা বলিবেন যে সংস্কৃত সাহিত্যের অক্ষয় ভাণ্ডার উন্মুক্ত থাকিতে আমরা ভাষার দৈন্য স্বীকার করিব কেন? কিন্তু আমার বোধ হয় এইখানে একটু উদারতা থাকা চাই। জ্ঞানের সাম্যনৈতিক ক্ষেত্রে সংকীর্ণতা থাকা একেবারেই বাঞ্ছনীয় নহে। সংস্কৃত ভিন্ন অন্য ভাষার নিকটে প্রয়োজন হইলে ঋণ গ্রহণ করিতে কুণ্ঠিত হইলে চলিবে না। অবশ্য সংস্কৃতকে সাধারণতঃ ভিত্তি-স্বরূপে গ্রহণ করিতে হইবেই; কিন্তু মনে রাখিতে হইবে যে মানবের চিন্তা-জগৎ গতিশীল; ইহার ক্রম বিবর্ত্তনে নূতন নূতন ভাব, নূতন নূতন প্রণালী জন্মলাভ করে। সেই সকল ভাব ও প্রণালী সংস্কৃত সাহিত্যে না থাকিলেও কিছু অগৌরবের কথা নহে। এ সকল স্থলে পৃথিবীর অন্যান্য ভাষা হইতে শব্দ সংগ্রহ করিবার রীতি অন্য সমস্ত ভাষায় দেখিতে পাওয়া যায়। পাশ্চাত্য দার্শনিক সাহিত্য নানা ভাষা হইতে সংগৃহীত শব্দে পরিপূর্ণ।

দার্শনিক সাহিত্যের উন্নতির আর একটি উপায় পরস্পরের ভাব বিনিময়ের ব্যবস্থা। যাঁহারা দর্শন শাস্ত্রের আলোচনায় তৃপ্তি লাভ করেন, তাঁহারা যদি সম্মিলিত হইয়া পরস্পরের মনোভাব ও অনুশীলন প্রণালী জানিবার সুযোগ প্রাপ্ত হন, তাহা হইলে যে শুধু তাহার দ্বারা অনেক দার্শনিক তত্ত্বের উদ্ঘাটন ও মীমাংসা হইতে পারে তাহা নহে; সেই সঙ্গে আমাদের দেশে দার্শনিক সাহিত্যেরও উন্নতি হইতে পারে। কতকটা এইরূপ উদ্দেশ্য লইয়া কয়েক বৎসর হইল (Calcutta Philosophical Society) নামে একটি সমিতি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। মৌলিক অনুসন্ধান ও শ্রেষ্ঠ দার্শনিকদিগের গ্রন্থ অধ্যয়নের দ্বারা দার্শনিক জ্ঞানের উন্নতি সাধন করা, ভারতীয় দর্শনের অনুশীলন এবং অভিনব বিজ্ঞান-সম্মত প্রণালীর দ্বারা ভারতীয় দর্শন-সমূহের আলোচনা, দার্শনিক সত্যের আলোকে আমাদের ব্যবহার ও চরিত্রের উৎকর্ষ-সাধনের উপায় স্থিরীকরণ প্রভৃতি ঐ সমিতির উদ্দেশ্যের অন্তর্গত। আমার মনে হয় এইরূপ সমিতি দর্শন-সাহিত্যের উন্নতির পক্ষেও বিশেষ সহায়তা করিতে পারে।

কিন্তু এস্থলে একটি কথা এই, অনেকে হয়ত মনে করিবেন যে দর্শন সম্বন্ধে আমাদের ভাবপ্রকাশের পক্ষে ইংরেজী ভাষাই অধিকতর উপযোগী। ইংরেজী ছাড়িয়া বাঙ্গালার সাহায্য লইতে যাইব কেন? ইংরেজী ভাষা যে আমাদের ভাব প্রকাশে বেশী সহায়তা করে, তাহাতে অগৌরবের কিছু আছে বলিয়া বোধ হয় না। কারণ ইংরেজী ভাষার মধ্য দিয়াই বর্ত্তমান কালে আমাদের শিক্ষা প্রদত্ত হইয়া থাকে। ইংরেজি ভাষা পৃথিবীর এক বিপুল সাহিত্যের দ্বার আমাদের নিকট উন্মুক্ত করিয়া দিয়াছে। ইহা কদাচ উপেক্ষার বস্তু নহে। পরন্তু আমরা যে এই অপূর্ব্ব সুযোগ লাভ করিয়াছি, ইহা গৌরবের বিষয়। ইয়ুরোপে মধ্যযুগে ভিন্ন ভিন্ন জাতিরা লাটিন ভাষায় ভাব প্রকাশ করিতে সুবিধা বোধ করিতেন, লাটিন ভাষায়ই পুস্তক লিখিতেন। পরে যখন ভিন্ন ভিন্ন জাতির মাতৃভাষা (Vernacular) উন্নতি লাভ করিল, তখন লাটিনের আর প্রয়োজনীয়তা রহিল না। বাঙ্গালা ভাষা যখন পরিপুষ্ট হইবে, ইহার শব্দ-দৈন্য যখন ঘুচিবে, বাঙ্গালা ভাষার পুস্তক যখন অন্য ভাষায় অনূদিত হইবে, তখন হয়ত আর ইংরেজির সহায়তা আবশ্যক হইবে না। কিন্তু যতদিন তাহা না হয়, ততদিন

ইংরেজি ভাষায় আমাদের চিন্তার ফল সাধারণের নিকট উপস্থিত করিতে সংকুচিত হইবার কোনও কারণ নাই। কারণ জগতের বিচারালয়ের সমক্ষে সেগুলিকে উপস্থিত করা, ভারতের বিভিন্ন অংশের মধ্যে এইরূপ চিন্তার প্রচার করা আপাততঃ কেবল ইংরেজি ভাষার দ্বারাই হইতে পারে। আপাতদৃষ্টিতে এরূপ প্রণালী বঙ্গভাষার উন্নতির অন্তরায় বলিয়া মনে হইতে পারে, কিন্তু আমি মনে করি যে পরোক্ষভাবে ইহার দ্বারাও বঙ্গসাহিত্য লাভবান হইবে। দেশে দার্শনিক চিন্তার প্রসার হইলেই বাঙ্গালা দার্শনিক সাহিত্য তাহার দ্বারা নিশ্চয়ই উপকৃত হইবে। ইংরেজি ভাষার সাহায্যেই হউক, বা অন্য ভাষার সাহায্যেই হউক, যাঁহারা নিষ্ঠার সহিত দর্শন শাস্ত্রের আলোচনা করিবেন, তাঁহারা যদি বুঝিতে পারেন যে তাঁহাদের চিন্তা ও গবেষণার ফল জানিবার জন্য তাঁহাদের স্বদেশবাসিগণ ব্যগ্র, তাহা হইলে তাঁহারা বঙ্গসাহিত্যকে অবলম্বন করিতে বাধ্য হইবেন।

এই স্থলে অনুবাদের উপকারিতা সম্বন্ধেও দুই একটি কথা বলা আবশ্যক মনে করি। কোনও জাতির দার্শনিক সাহিত্য পরিপুষ্ট করিতে হইলে কেবল মৌলিক অনুসন্ধানের উপর নির্ভর করিলে চলিবে না। অনুবাদের মূল্যও এস্থলে স্বীকার করা কর্ত্তব্য। ভিন্ন ভিন্ন জাতির মধ্যে এইরূপেই ভাবের আদান প্রদান হইয়া থাকে। এইরূপ বিনিময়ের দ্বারা জগতের সমস্ত সাহিত্য সর্ব্বকালে উন্নতি ও বিস্তৃতি লাভ করিয়া থাকে।

প্রাচীনকালে দার্শনিক বিদ্যা ভারতে জন্মলাভ করিয়া প্রাচ্য দেশ-সমূহে বিস্তৃত হইয়াছিল। এইরূপ পশ্চিমে দার্শনিক বিদ্যা গ্রীসে জন্মলাভ করিয়া পাশ্চাত্য দেশে বিস্তৃতি লাভ করিয়াছিল। এবং এক সময়ে প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের মধ্যে, ভারত এবং গ্রীসের মধ্যে, পণ্যদ্রব্যের বাণিজ্যের ন্যায় চিন্তারও বাণিজ্য যে প্রচলিত ছিল, তাহা ইতিহাস হইতে জানিতে পারা যায়। পাইথাগোরাসের (Pythagoras) জন্মান্তরবাদ ও সাধন-প্রণালী যে ভারতীয় দর্শন ও সাধনের নিকট ঋণী, সে সম্বন্ধে প্রমাণ পাওয়া যায়। সুতরাং পরস্পর আদান প্রদানে ভাবসম্পদ্ অনেক বাড়িয়া যায়, আমাদিগের দার্শনিক সাহিত্যের পক্ষে এরূপ ঋণগ্রহণ যে নিতান্ত স্বাভাবিক ও শুভাবহ সে বিষয়ে সন্দেহ নাই।

ভাব-প্রবাহ কোনও সময়ে কোনও এক স্থানে স্থির হইয়া থাকিতে পারে না। মানবের চিন্তা সর্ব্বদা গতিশীল। গতিশূন্যতা বা জড়ত্বই চিন্তার অভাব সূচনা করে। বিভিন্ন দেশ হইতে বিভিন্ন জাতির চিন্তাপ্রবাহ পরস্পর সম্মিলিত হইয়া তাহারই ঘাত প্রতিঘাতে নূতন নূতন ভাব প্রবাহের সৃষ্টি করে। সুতরাং কোন একটি ভাবের ধারা বা আদর্শ চিরকালের জন্য কোনও জাতির নিজস্ব সম্পত্তি হইয়া থাকিতে পারে না। প্রাচীনকালে ভারতীয় দর্শন-সমূহের একটি সাধারণ গতি বা আকাঙ্ক্ষা ছিল। ব্যক্তিগত আত্মার মুক্তি সাধনই সাধারণতঃ ভারতীয় দর্শনের মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল। দুঃখের অত্যন্ত নিবৃত্তিই হউক, নির্ব্বাণই হউক, আর ব্রহ্মস্বরূপপদ-প্রাপ্তিই হউক, যে কোন উপায়ে মানবাত্মার মোক্ষ-সাধনই পরমপুরুষার্থ। ইহাই একমাত্র কাম্য; ইহাই একমাত্র শ্রেয়ঃ। তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিতে হইবে, আত্মাকে ভাল করিয়া জানিতে হইবে, মায়ার বিনাশ-সাধন করিতে হইবে, উপাধিশূন্য হইতে হইবে, অনাদি বাসনা-সন্তান ধ্বংস করিতে হইবে। কেন? মুক্তির জন্য; সংসার-বন্ধন-মোচনের জন্য; আত্মার কল্যাণের

জন্য; নিঃশ্রেয়স-লাভের (Summum bonum) জন্য। সাধারণতঃ ইহাই ভারতীয় দর্শনের মূল সূত্র।

গ্রীক দর্শনের গতি ছিল স্বতন্ত্র। ব্যক্তিগতভাবে ও সমগ্রভাবে জীবনের সৌন্দর্য্য ও মঙ্গল-বিধান করাই গ্রীক দর্শনের প্রধান আকাঙ্ক্ষা ছিল। সৌন্দর্য্যের উপলব্ধিতেই গ্রীকদিগের জাতীয় প্রতিভা স্ফুরিত হইয়াছিল। দর্শনেও তাহাদের এই সৌন্দর্য্য-স্পৃহা আত্মবিকাশ করিতে ছাড়ে নাই। মানব-জীবনকে সর্ব্বতোভাবে একটি সুস্থ সামঞ্জস্যের ভাবে গঠন করিয়া লইতে তাহারা তাহাদের চিন্তা-প্রণালী নিয়োজিত করিয়াছিল। প্রথম হইতেই গ্রীকদিগের ব্যক্তিগত জীবন সমাজের সহিত অতি নিবিড় ভাবে জড়িত দেখিতে পাই। আদিম অধিবাসীর বিরুদ্ধে সশস্ত্র সতর্কতা অবলম্বন করিতে গিয়াই হউক, অথবা পার্শ্ববর্ত্তী নগর বা সমাজ হইতে নিজ নিজ বৈশিষ্ট্য বজায় রাখিবার জন্যই হউক, গ্রীকেরা ব্যক্তিগত ও সামাজিক জীবনের মধ্যে একটি সুন্দর সামঞ্জস্য স্থাপন করিয়া লইয়াছিল। এই জন্য ভারতীয় দর্শনে যেরূপ মানবাত্মার কল্যাণ অথবা ব্যক্তিগত মোক্ষের সন্ধান দেখিতে পাওয়া যায়, গ্রীক দর্শনে সেইরূপ প্রধানতঃ সমাজ বা রাষ্ট্রের হিতের জন্য আকাঙ্ক্ষা দেখিতে পাওয়া যায়। অবশ্য ভারতীয় ও গ্রীক উভয় দর্শনের মূল কথা আত্মা ও জগৎকে জানিবার আকাঙ্ক্ষা। ভিন্ন ভিন্ন আকারে ভিন্ন ভিন্ন ভাষায় এই একই আকাঙ্ক্ষা জাগ্রত হইয়া উঠিয়াছে। ভারতীয় দর্শন আত্মার ও বিশ্বের জ্ঞানকে মোক্ষের উপযোগী করিয়া তুলিবার চেষ্টা করিয়াছিল—দুঃখ নিবৃত্তি, পুনরাবর্ত্তন-রাহিত্য বা নির্ব্বাণের অভিমুখে নিয়োজিত করিয়াছিল। গ্রীক দর্শন আত্মা ও জগতের জ্ঞানকে মানবজীবনের সুখ, সৌন্দর্য্য ও কল্যাণ-বিধানের জন্য এবং রাষ্ট্রের হিতের ও উন্নতির উপায়স্বরূপ ব্যবহার করিয়াছিল। ভারতীয় চিন্তার গতি হইল ব্যক্তিগত আত্মার হিতের দিকে, শ্রেয়ের দিকে, যোগের দিকে, সন্ন্যাসের দিকে। গ্রীসীয় চিন্তার গতি হইল—রাষ্ট্রের মঙ্গলের দিকে, সৌন্দর্য্যের দিকে, সামঞ্জস্যের দিকে, কর্ম্মের দিকে।

বর্ত্তমান সময়েও পাশ্চাত্য জগতে গ্রীক ভাবের প্রভাব দেখা যায় এবং আমাদের দেশেও প্রাচীন ভাবের প্রভাব এখনও রহিয়াছে। গ্রীকভাবের প্রভাবে পাশ্চাত্যজগৎ বাহ্য প্রকৃতির নিয়ম ও গূঢ় তত্ত্ব সকল আবিষ্কার করিয়া মানব জীবনের সুখ ও আধিপত্যের উপাদান সংগ্রহ করিতেছে। এবং রাষ্ট্রে সুশাসন স্থাপন করিয়া সকলের মঙ্গল সাধন করিতেছে। আর আমরা এখনও মুক্তি পথ কোন্ দিকে তাহার বার্ত্তা জানিবার জন্য সেই প্রাচীনকালের তপোবনের স্বপ্ন লইয়া বসিয়া আছি।

(অভ্যর্থনা-সমিতির সভাপতি শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহোদয়ের অভিভাষণের এক অংশ)

আমার বিশ্বাস বাঙ্গালী একটা আত্মবিস্মৃত জাতি। বিষ্ণু যখন রামরূপে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, তখন কোন ঋষির শাপে তিনি আত্মবিস্মৃত হইয়াছিলেন। তিনি ধরাধামে আসিয়া ঈশ্বরেরই লীলা করিয়া গিয়াছেন; কিন্তু তিনি যে ঈশ্বর এ কথা তিনি কখনও বলেন নাই,

কাব্যে বা কর্ম্মে কখনও দেখান নাই এবং কখনও তিনি স্মরণ করেন নাই। বাঙ্গালীও তেমনি। দেড় শত বৎসর পূর্ব্বে একজন সাহেব বলিয়া গিয়াছেন, বাঙ্গালার জমি এত উর্ব্বরা, বাঙ্গালায় এত শস্য উৎপন্ন হয়, বাঙ্গালায় এত বড় বড় নদী আছে, নৌকাযোগে বাঙ্গালার এক প্রান্ত হইতে আর এক প্রান্ত পর্য্যন্ত এত সহজে যাওয়া যায়, ইহার জঙ্গলে এত অদ্ভুত পদার্থের উৎপত্তি হয়, ইহাতে এত লোক আছে, তাহারা এইরূপ পরিশ্রমী ও মিতাচারী যে বোধ হয়, বাঙ্গালা অতি প্রাচীনকালে সভ্যতার অতি উচ্চ শিখরে আরোহণ করিয়াছিল। যে কেহ মন দিয়া বাঙ্গালার কথা ভাবিয়াছে, বাঙ্গালাকে ভাল করিয়া বুঝিবার চেষ্টা করিয়াছে, তাহাকেই বলিতে হইবে বাঙ্গালা একটি অতি প্রাচীন সভ্যদেশ। বাঙ্গালার ইতিহাস এখনও তত পরিষ্কার হয় নাই যে, কেহ নিশ্চয় করিয়া বলিতে পারে বাঙ্গালা Egypt হইতে প্রাচীন অথবা নূতন। বাঙ্গালা Nineva ও Babylon হইতেও প্রাচীন অথবা নূতন। বাঙ্গালা চীন হইতেও প্রাচীন অথবা নূতন। কিন্তু এ কথা স্থির, বাঙ্গালা নূতন দেশ নহে। যখন আর্য্যগণ মধ্য-এসিয়া হইতে পঞ্জাবে আসিয়া উপনীত হন, তখনও বাঙ্গালা সভ্য ছিল। আর্য্যগণ আপনাদের বসতি বিস্তার করিয়া যখন এলাহাবাদ পর্য্যন্ত উপস্থিত হন, তখন বাঙ্গালার সভ্যতায় ঈর্ষাপরবশ হইয়া তাঁহারা বাঙ্গালীকে ধর্ম্মজ্ঞানশূন্য এবং ভাষাশূন্য পক্ষী বলিয়া বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন। মহাভারতে বাঙ্গালাকে ঘটোৎকচের লীলাক্ষেত্র বলা হয়।

বুদ্ধদেবের জন্মের পূর্ব্বে বাঙ্গালীরা জলে ও স্থলে এত প্রবল হইয়াছিল যে, বঙ্গরাজের একটি ত্যজ্যপুত্র সাত শত লোক লইয়া নৌকাযোগে লঙ্কাদ্বীপ দখল করিয়াছিলেন। তাঁহারই নাম হইতে লঙ্কাদ্বীপের নাম হইয়াছে সিংহলদ্বীপ। রামায়ণে লঙ্কাদ্বীপের নাম সিংহল দ্বীপ কোথায়ও নাই, কিন্তু ইহার পরে উহার লঙ্কা নাম উঠিয়া গিয়া ক্রমে সিংহল নাম সংস্কৃত সাহিত্যে ফুটিয়া উঠিয়াছে। প্রাচীন গ্রন্থে দেখিতে পাওয়া যায় যে, বড় বড় খাঁটি আর্য্যরাজগণ, এমন কি যাঁহারা ভারতবংশীয় বলিয়া আপনাদের গৌরব করিতেন, তাঁহারাও বিবাহসূত্রে বঙ্গেশ্বরের সহিত মিলিত হইবার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করিতেন। কিন্তু বঙ্গদেশের শ্রীবৃদ্ধি রাজার জন্য নহে, রাজনীতিতে বঙ্গ কখনই তত প্রবল হয় নাই। খ্রীষ্টীয় পূর্ব্ব ষষ্ঠ শতাব্দীতে ও আর একবার খ্রীষ্টীয় নবম শতাব্দীতে বাঙ্গালা নানা দেশ জয় করিবার চেষ্টা করিয়াছিল, এবং অনেকটা কৃতকার্য্যও হইয়াছিল। তাই বলিতেছিলাম বাঙ্গালার গৌরব রাজনীতিতে নহে, যুদ্ধবিগ্রহেও নহে। বাঙ্গালার গৌরব শিল্পে, বাণিজ্যে, কৃষিকার্য্যে এবং উপনিবেশ সংস্থাপনে। যখন লোকে লোহার ব্যবহার করিতে জানিত না, তখন বেতে বাঁধা নৌকায় চড়িয়া বাঙ্গালীরা নানা দেশে ধান চাউল বিক্রয় করিতে যাইত। সে নৌকার নাম ছিল 'বালাম নৌকা'। তাই সে নৌকায় যে চাউল আসিত তাহার নাম বালাম চাউল হইয়াছে; বালাম বলিয়া কোন ভাষার কথা আছে কি না জানি না; কিন্তু তাহা সংস্কৃতমূলক নহে। তমলুক বাঙ্গালার প্রধান বন্দর। অশোকের সময় এমন কি বুদ্ধের সময়ও তমলুক বাঙ্গালার বন্দর ছিল। তমলুক হইতে জাহাজ সকল নানা দেশে যাইত। ফাহিয়ান তমলুক হইতেই গিয়াছিলেন, একথা সকলেই জানেন। অনেক প্রাচীন গ্রন্থেও তমলুকের নাম পাওয়া যায়। তমলুকের সংস্কৃত নাম তাম্রলিপ্তি। তাম্রলিপ্তি শব্দের অর্থ কি, সংস্কৃত হইতে তাহা বুঝা যায় না। সংস্কৃতে তাম্রলিপ্তির মানে

তামার লেপা। কিন্তু তমলুকের নিকট কোথাও তামার খনি নাই। তমলুক হইতেই যে তামা রপ্তানী হইত তাহার কোন নিদর্শন পাওয়া যায় না। বহু প্রাচীন সংস্কৃতে উহার নাম দামলিপ্তী অর্থাৎ উহা দামলজাতির একটি প্রধান নগর। বাঙ্গালায় যে এককালে দামল বা তামল জাতির প্রাধান্য ছিল, ইহা হইতে তাহাই কতক বুঝা যায়। এখনকার anthropologistরা স্থির করিয়াছেন যে, বাঙ্গালা মঙ্গল ও দ্রাবিড় জাতির মিশ্রণে উৎপন্ন হইয়াছে। আর্য্যগণ এখানে অতি অল্প দিনই আসিয়াছেন। এই কথায় অনেকেই অত্যন্ত বিরক্ত হইবেন, সন্দেহ নাই। কারণ বাঙ্গালীরা কয়েক শত বৎসর ধরিয়া যেরূপ শিক্ষা পাইয়াছে, তাহাতে আপনাদিগকে আর্য্যজাতির বংশ বলিয়া গৌরব করে এবং আর্য্যদিগের গৌরবে আপনাদিগকে গৌরবান্বিত মনে করে। সেদিক হইতে দেখিতে গেলে ত দেখা যায় যে, আর্য্যগণ আবর্ত্তে আবর্ত্তে সরস্বতী তীর হইতে সমুদ্রের উপকূল পর্য্যন্ত আসিয়া উপস্থিত হইয়াছিলেন। যেমন নিবাতনিষ্কম্প পুষ্করিণীর জলের এক কোণে একটি ঢিল ফেলিয়া দিলে চারিদিকে আবর্ত্ত হইতে থাকে; প্রথম আবর্ত্ত যত উঁচু হয়, পরেরটি তাহা অপেক্ষা নীচু, তাহার পরেরটি তাহা অপেক্ষা নীচু; আর কোণে উপস্থিত হইবার সময় সে আবর্ত্ত অতি অল্পই দেখা যায়। সেইরূপ আর্য্য-আবর্ত্ত সমুদ্রের উপকূল বঙ্গদেশে অতি অল্পই প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল বলিয়া বোধ হয়। এমন কি অনেক আর্য্যগ্রন্থে দেখা যায় যে, বাঙ্গালা দেশে আসিলে প্রায়শ্চিত্ত করিতে হয়। সেকালে শ্রাদ্ধ করিতে বসিলে সর্ব্বাপেক্ষা বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণকে পাত্রান্ন খাওয়াইতে হইত; অর্থাৎ তিনি যেন শ্রাদ্ধকারীর পিতৃপুরুষগণের স্থান গ্রহণ করিয়াছেন এবং পিতৃপুরুষগণকে যে সকল খাদ্যদ্রব্যাদি দেওয়া যাইতেছে, তিনি তাহা খাইতেছেন। এখনও অনেক দেশে জীবন্ত ব্রাহ্মণ দিয়াই শ্রাদ্ধ করে। ভারতের পূর্ব্বাঞ্চলে ঐ কার্য্য দর্ভময় ব্রাহ্মণের করিতে হয়। অর্থাৎ এক গোছা কুশ লইয়া তাহাকে মানুষের আকার করিয়া গাঁথিতে হয়। তাঁহাকেই ব্রাহ্মণ বলিয়া কল্পনা করিয়া লইতে হয় এবং পিতৃপুরুষের উদ্দেশে প্রদত্ত সকল জিনিষ তাঁহাকে প্রদান করিতে হয়। বলা বাহুল্য বাঙ্গালাদেশে বহুকাল পূর্ব্ব হইতেই দর্ভময় ব্রাহ্মণে শ্রাদ্ধ করিতে হইয়াছিল। জীবন্ত ব্রাহ্মণে শ্রাদ্ধ করিতে হইলে ব্রহ্মাবর্ত্তের ব্রাহ্মণই সর্ব্বাপেক্ষা প্রশস্ত। বাঙ্গালা দেশের ব্রাহ্মণ একেবারেই প্রশস্ত নহে। ইহার কারণ অনুধাবন করিলে দেখা যায় যে, আর্য্য ভিন্ন অন্য কোন জাতি বঙ্গদেশে প্রবল ছিল। এখানে যে সকল ব্রাহ্মণ বাস করিত তাহারা ব্রাহ্মণের মধ্যেই গণ্য হইত না। বেদে লেখা আছে, যদি কোন ব্রাহ্মণ মগধ দেশে বাস করেন তাহা হইলে তিনি ব্রাহ্মণ সমাজে নিকৃষ্ট হইয়া যান। বাঙ্গালা ত আরও দূরে। এখানে বাস করিলে তিনি যে আরও নিকৃষ্ট হইবেন, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই।

৭৩২ খ্রীঃ অব্দে যখন যশোবর্ম্মদেব কনৌজের রাজা, বৈদিকচূড়ামণি ভবভূতি তাঁহার রাজ-কবি, সেই সময়ে বঙ্গদেশের কোন রাজা বৈদিকযজ্ঞের জন্য তাঁহার নিকটে ব্রাহ্মণ চাহিয়া পাঠান। সেই যে পাঁচজন ব্রাহ্মণ বাঙ্গালা দেশে আসেন, তাঁহাদের হইতেই বাঙ্গালাদেশে ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মের দৃঢ়ভিত্তি স্থাপিত হয়। ইহার পূর্ব্বেও অনেকবার এদেশে ব্রাহ্মণ আসিয়াছিলেন বলিয়া শুনিতে পাওয়া যায়, কিন্তু তাঁহাদের দ্বারা ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মের বিশেষ উপকার হওয়ার কথা শুনিতে পাওয়া যায় না। পঞ্চব্রাহ্মণের সন্তানসন্ততিগণ এদেশে আসিয়া প্রথম প্রথম বড়

একটা প্রভাব বিস্তার করিতে পারেন নাই। তাঁহাদের আসিবার পরেই বাঙ্গালাদেশে এক প্রবল বৌদ্ধ রাজবংশ স্থাপিত হয়। তাঁহারা ব্রাহ্মণদিগের বিদ্যা, বুদ্ধি ও নিষ্ঠাদিতে মুগ্ধ হইয়া তাহাদিগের হস্তে নানাবিধ রাজকর্ম্মের ভার দিতেন। তথাপি বৌদ্ধগণই এদেশে প্রবল ছিল। কুলগ্রন্থে দেখিতে পাওয়া যায়, বৌদ্ধদিগের সহিত ব্রাহ্মণদিগকে প্রাণপণ করিয়া বিচার করিতে হইত। মুসলমানেরা বৌদ্ধমঠগুলিকে ধ্বংস করিয়া ফেলিবার পর এদেশে পঞ্চব্রাহ্মণ-সন্তান-দিগের প্রভাব বিস্তার হয় এবং দাক্ষিণাত্য ও পাশ্চাত্য দেশসমূহ হইতে অনেক ব্রাহ্মণ আসিয়া তাঁহাদিগকে সাহায্য করেন।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি বাঙ্গালার গৌরব শিল্পে বাণিজ্যে কৃষিকার্য্যে ও উপনিবেশে। শিল্প শাস্ত্র সম্বন্ধে যে সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন পুস্তক পাওয়া গিয়াছে তাহাতে দেখা যায় যে খৃঃ পূঃ ৪র্থ শতাব্দীতে বাঙ্গালাদেশে নানা প্রকার রেশমের কাপড় প্রস্তুত হইত। সর্ব্বোৎকৃষ্ট পত্রোর্ণা কেবল বাঙ্গালায়ই পাওয়া যাইত। তদ্ভিন্ন নিজ বঙ্গে এবং পৌণ্ড্রদেশে অর্থাৎ উত্তরবঙ্গে উৎকৃষ্ট ক্ষৌম প্রস্তুত হইত। ভারতবর্ষে অন্য দুই একটী দেশেও রেশম শিল্প ছিল, কিন্তু তাহা তত ভাল নহে। ঐ গ্রন্থেই আরও দেখিতে পাওয়া যায় যে তুলার কাপড়ও বাঙ্গালায় প্রচুর পরিমাণে উৎপন্ন হইত এবং অতি উৎকৃষ্ট ছিল।

মগধসাম্রাজ্যে দুইটী মাত্র প্রধান বন্দর ছিল। একটি ভরতকচ্ছ ভড়োচি ও আর একটি তমলুক। ভরতকচ্ছ হইতে আরব্‌সাগর পার হইয়া লোকে বাণিজ্য করিতে যাইত। এবং তমলুক হইতে পূর্ব্ব উপদ্বীপ চীন ও ভারতসাগরীয় দ্বীপপুঞ্জে যাইত। ভরুচ্ছের সহিত আমাদের বড় সম্পর্ক নাই, কিন্তু বাঙ্গালা হইতে বহুসংখ্যক লোক জাহাজে সমুদ্র পার হইয়া নানা দেশে যাইত, তাহার অনেক প্রমাণ পাওয়া যায়। বৌদ্ধদের দশ ভূমীশ্বর নামক গ্রন্থে লেখা আছে, "তোমরা নির্ব্বাণের পথে অগ্রসর হইতেছ, কর্ম্ম কর, শীলব্রত লও, কিন্তু কিছুদিন পরে দেখিবে এ সকলে কিছু উপকার হইতেছে না। যখন পাটলীপুত্র হইতে কেহ সমুদ্রের পারে ব্যবসা করিতে যাইত, সে ঘোড়া গাড়ী উট বোঝাই দিয়া নানাবিধ দ্রব্য লইয়া যাইতে লাগিল ; কিন্তু তাম্রলিপ্তিতে উপস্থিত হইয়া দেখিল এ সকলে কোন কাজই হইবে না। সমুদ্রে উট্‌ও যাইবে না, ঘোড়াও যাইবে না, গাড়ীও যাইবে না। তখন নূতন প্রকার যান বাহনের আবশ্যক হইবে।" সেইরূপ কিছুদূর অগ্রসর হইয়া দেখিল শীলব্রতাদির দ্বারা কিছুই হইতেছে না। তখন যানের আবশ্যক। এই দৃষ্টান্তে দেখা যায় যে, সমুদ্রযাত্রা সেকালে অভ্যস্থ ছিল। খৃঃ পঞ্চম শতাব্দীতে ফাহিয়ান তমলুকে জাহাজে আরোহণ করিয়া স্বদেশযাত্রা করিয়াছিলেন।

দশকুমারচরিতে লেখা আছে, তমলুক হইতে জাহাজে গিয়া তিনি রাক্ষসদের দ্বীপে উপস্থিত হন এবং তথায় রামেষু নামক এক যবনের সহিত যুদ্ধ হয়। অতদিনের কথায় দরকার নাই ; মুসলমান অধিকারের পরে ১২৭৬ সালেও তমলুকের কয়েকজন বৌদ্ধ ভিক্ষু পেলানে গিয়া বৌদ্ধধর্ম্মের সংস্কার করিয়াছিলেন। এবং পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষভাগে রামচন্দ্র কবিভারতী সিংহলে গিয়া তথাকার বৌদ্ধ নামে চক্রবর্ত্তী হইয়াছিলেন।

ষোড়শ শতাব্দীর মধ্যভাগে দ্বিজবংশীদাস লিখিতেছেন যে, চাঁদ সওদাগর সিংহল দ্বীপেরও দক্ষিণে চৌদ্দ দিনের পথ গেলে পর, সমুদ্রে মহা ঝড় উঠে। তাঁহার চৌদ্দখানি জাহাজ ছিল।

ঝড়ের মধ্যে তাহার একখানিও দেখা গেল না। তখন তিনি ব্যস্ত হইয়া নাবিককে বলিলেন, আমার সর্ব্বনাশ হইল, ইহার কিছু উপায় কর। নাবিক কতকগুলি তেলের পিপা খুলিয়া জলে ফেলিয়া দিল। অল্প সময়ের মধ্যে তেলে সমুদ্র ব্যাপ্ত হইয়া গেল। তখন দূরে দূরে দেখা গেল চাঁদের একখানিও নৌকা ডুবে নাই।

প্রাচীনকালে কৃষি বিষয়ে বাঙ্গালীর কৃতিত্বের কথা সকলেই জানেন। সে কথা বিশেষ করিয়া বলিবার প্রয়োজন নাই। কৃষিকার্য্যে শ্রীবৃদ্ধি হইলেই দেশ সুভিক্ষ হয়। সুভিক্ষ হইলেই ভিক্ষুকের সংখ্যা বৃদ্ধি হয়। হিয়ান্‌সাং বাঙ্গালার তিনটি নগরীতে দশ সহস্র সঙ্ঘারাম দেখিয়া গিয়াছেন। তিনি শুদ্ধ বৌদ্ধদের কথা বলিয়া গিয়াছেন, তাহা ছাড়া হিন্দু ও জৈন ভিক্ষুও যথেষ্ট ছিল। কার্পাস তুলার চাষের জন্য বঙ্গদেশ বহুকাল হইতেই প্রসিদ্ধ। তুতের চাষ ভিন্ন রেশম হয় না। তুতের চাষ প্রভূত পরিমাণে না থাকিলে বাঙ্গালাদেশ রেশমশিল্পে এরূপ প্রসিদ্ধি লাভ করিতে পারিত না। শন, পাট, ধঞ্চে এখনও বাঙ্গালায় একচেটিয়া, চিরদিনই একচেটিয়াই ছিল।

সিংহলে উপনিবেশ স্থাপনের কথা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। যাবা, বালি, মালয় উপদ্বীপ, পেগান প্রভৃতি দ্বীপে হিন্দুদিগের যে উপনিবেশ হইয়াছিল তাহা কোথা হইতে গিয়া হইয়াছিল, ঠিক জানা যায় না। ভারতবর্ষের পূর্ব্ব উপকূলে তিনটি প্রধান বন্দর ছিল, মাদুরা কলিঙ্গনগর ও তমলুক; এই তিনটীর মধ্যে তমলুক অধিক প্রসিদ্ধ। তমলুক হইতে নানাদিকে জাহাজ যাইবার কথা পূর্ব্বে বলিয়াছি। অনেকে মনে করেন সমুদ্রযাত্রা যখন এতই নিষেধ, তখন বাঙ্গালীরা কি করিয়া উপনিবেশ স্থাপন করিল। কিন্তু বাস্তবিক সমুদ্রযাত্রা নিষেধ নহে। কল্পসূত্রকার ঋষি বৌধায়ন বলিয়া গিয়াছেন যে আর্য্যাবর্ত্তবাসীর পক্ষে সমুদ্রযাত্রায় কোন দোষ নাই। যদি কোন দোষ থাকে, সে দাক্ষিণাত্যে। সুতরাং আর্য্যাবর্ত্তবাসীরা প্রাচীনকালে অবাধে সমুদ্রযাত্রা করিত এবং বিদেশে গিয়া মোকাম করিত এবং তথায় বাস করিত। প্রত্নতত্ত্বের প্রভাবে জানিতে পারা যায় যে, মগধদেশ হইতে ব্রহ্মদেশ কাম্বোডিয়া আনাম প্রভৃতি অঞ্চলে অনেকবার উপনিবেশ এমন কি সাম্রাজ্যও স্থাপিত হইয়াছে। ফরাসীদিগের অধিকৃত কাম্বোডিয়া ও আনামে যে সকল প্রাচীন শিলালিপি পাওয়া গিয়াছে তাহাতে দেখা যায় যে, খৃষ্টীয় ৪র্থ, ৫ম শতাব্দীতেও সেখানে ব্রাহ্মণদিগের রাজত্ব ছিল এবং শৈব ধর্ম্মের প্রচার ছিল। গত বৎসর ব্রহ্মদেশের যে Archaological Report বাহির হইয়াছে, তাহাতে পেগানে এককালে হিন্দুদিগের রাজত্ব ছিল, তাহার বিশেষ প্রমাণ পাওয়া যায়। Dr. Annandale বলেন যে ব্রাহ্মণেরা একসময়ে মালয়দ্বীপে খুব প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল। ঐ দ্বীপে ব্রাহ্মণদিগকে 'প্রা' বলিত। প্রায়েরা তাহাদিগের প্রভাবের যথেষ্ট নিদর্শন রাখিয়া গিয়াছেন। এই সকল উপনিবেশ কোথা হইতে গিয়াছিল, ঠিক বলিতে পারা যায় না। সকলে বলে মগধ হইতেই গিয়াছিল। মগধসাম্রাজ্য বহুদূর বিস্তৃত ছিল, বাঙ্গালা মগধের মধ্যে ছিল। সমুদ্রযাত্রায় বাঙ্গালাই অগ্রণী ছিল। সুতরাং এই সকল উপনিবেশের অধিকাংশই যে বাঙ্গালীর দ্বারাই স্থাপিত হইয়াছিল, ইহা অনায়াসেই বিশ্বাস করা যায়।

একবার বলিয়াছি, বাঙ্গালী আত্মবিস্মৃত জাতি। প্রাচীনকালে বাঙ্গালার যে এত প্রভাব,

এত আত্মগৌরব ছিল, বাঙ্গালীরা এখন সে কথা ভুলিয়া গিয়াছে। এখন বাঙ্গালী সমুদ্রে যাইতে চায় না, উপনিবেশ স্থাপন ত দূরের কথা। শিল্পবাণিজ্যেও বাঙ্গালীর যথেষ্ট অবনতি হইয়াছে। আছে কেবল চাষ, তাহাও ক্রমে একমাত্র পাট ও ধানের চাষে পরিণত হইতেছে। সাহিত্য-চর্চ্চায় যদি আবার শিল্পবাণিজ্যের উন্নতি হয়, সাহিত্যসেবিগণ যদি আবার বাঙ্গালীদিগকে শিল্পী ও বণিক করিয়া তুলিতে পারেন, সাহিত্যেরও উন্নতি হইবে, বিজ্ঞানেরও উন্নতি হইবে, শিল্প-বাণিজ্যেরও উন্নতি হইবে। যদি সাহিত্যব্যবসায়ীদিগকে সংস্কৃতব্যবসায়ীদিগের ন্যায় ভিক্ষাজীবী হইতে হয় এবং সে ভিক্ষাও না মেলে, তাহা হইলে আমরা যেমন আছি তেমনই ভাল, সাহিত্য-চর্চ্চায় কাজ নাই। এইবার বাঙ্গালার প্রাচীন বাঙ্গালীর সাহিত্যচর্চ্চার কথা কিঞ্চিৎ বলিব।

আবর্ত্তে আবর্ত্তে আর্য্যগণ অগ্রসর হইয়াছেন, একথা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। যত অগ্রসর হইয়াছেন, ততই এদেশীয়দিগের আচারব্যবহার, সমাজনীতি, রাজনীতি, সাহিত্যবিজ্ঞান তাঁহাদের সমাজে মিশিয়া গিয়াছে। ঋগ্বেদে যে খাঁটী আর্য্যদের কথা দেখিতে পাওয়া যায়, কিছুকাল পরে ব্রাহ্মণে এবং অন্য বেদে সে খাঁটিটুকু আর দেখিতে পাওয়া যায় না, দেখিতে পাওয়া যায় যে আর কিছুর সঙ্গে যেন মিশিয়াছে। একটা মোটা কথা দেখুন ; ঋগ্বেদে শূদ্রের কথা একটিবার মাত্র আছে, কিন্তু ব্রাহ্মণাদিতে শূদ্রেরা সমাজের একটা অঙ্গ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। ঐতরেয় ব্রাহ্মণ যিনি লিখিয়াছেন সেই ঋষি মহিদাস জাতিতে শূদ্র ছিলেন, কিন্তু নিজগুণে ব্রাহ্মণ এবং ঋষি হইয়া গিয়াছেন। যদি কেহ নিপুণ হইয়া বহুকাল ধরিয়া ঋগ্বেদ ও ব্রাহ্মণ গ্রন্থ সকলের চর্চ্চা করে, সেই দেখিতে পাইবে যে ব্রাহ্মণে যে সকল নূতন জিনিষ প্রবেশ করিয়াছে তাহা কতটা ঋগ্বেদের পরিণাম এবং কতটা বাহির হইতে আসিয়াছে। যাহা বাহির হইতে আসিয়াছে তাহার কতটা পূর্ব্ব হইতে আসিয়াছে, কতটা বা পশ্চিম দিক্ হইতে আসিয়াছে। সেই খুঁজিয়া বলিয়া দিতে পারিবে যে, আর্য্যেরা এতগুলি জিনিষ ভারতবর্ষীয়দিগের নিকট হইতে লইয়াছিলেন ও এতগুলি তাঁহাদের নিজস্ব ছিল। এইরূপে আবার দ্বিতীয় আবর্ত্ত খুঁজিতে হইবে। ব্রাহ্মণগুলি তন্ন তন্ন করিয়া খুঁজিয়া ও সূত্রগুলি তন্ন তন্ন করিয়া খুঁজিয়া দেখিতে হইবে, ব্রাহ্মণ হইতে সূত্রে বেশী কি আছে। সে বেশীর মধ্যে কোন্ গুলি ব্রাহ্মণের পরিণাম, কোন্ গুলি একেবারে নূতন। এই নূতন জিনিষগুলি কোথা হইতে আসিল? দেখা যায় যে অনেকগুলিই ভারতবর্ষের প্রাচীন সম্পত্তি, আর্য্যদিগের আনা নয়। এইরূপ আবর্ত্তে আবর্ত্তে ঘুরিতে ঘুরিতে দেখা যায় যে, আর্য্য-দিগের উপর যেমন শূদ্রবর্ণ জুটিয়াছিল, তেমনি আবার ইহাদের উপর আর একটি বর্ণ জুটিয়াছিল, তাহাদের নাম অন্ত্যজ। আর্য্য অভিধানে যত শব্দ ছিল নূতন অভিধানেও অনেক শব্দ জুটিয়াছে। সে সকল শব্দ কোথা হইতে আসিল? সে সকল ভারতবর্ষের প্রাচীন সম্পত্তি, আর্য্য অভিধানে প্রবেশলাভ করিয়াছে। এইরূপ আচারে বল, ব্যবহারে বল, উপাসনায় বল, দর্শনে বল, ধর্ম্মে বল, অধর্ম্মে বল, আহারে বল, অনেক নূতন নূতন জিনিষ আসিয়া এই মিশ্রিত সমাজে প্রবেশ করিয়াছে। এই সকল আবর্ত্তে ঘুরিতে ঘুরিতে যখন বাঙ্গালায় আসিয়া উপনীত হইবে, তখন দেখা যাইবে আর্য্যের মাত্রা বড়ই কম, দেশীর মাত্রা অনেক বেশী।

জীবজন্তুর বাসস্থান।

রাজকুমারীর প্রমোদকুঞ্জের হেমপিঞ্জরে অবশ্য শুকসারী বাস করে, কিন্তু সে কুঞ্জগৃহে তাহাদের মনে সম্পূর্ণ শান্তি বিরাজ করে কি না সে কথার মীমাংসা হয় নাই। পশুশালার পিঞ্জরাবদ্ধ কেশরী, শার্দ্দূল, বানর ও ভল্লুক সৌধ-বাস ছাড়িয়া বনে পলাইতে পারিলে সুখী হয় তাহা চোখ রাঙ্গাইয়া, হুঙ্কার ছাড়িয়া, মুখভঙ্গি করিয়া তাহারা আমাদের এক রকম স্পষ্ট বুঝাইয়া দেয়। "জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী" কেবল আমাদের কথা নয়, জীবজন্তু সকলেই বোধ হয় সংস্কৃত ভাষা জানিলে তারস্বরে চিৎকার করিয়া ঐ কথার অনুমোদন করিত।

সুবিধামত নানা স্থানে জীবজন্তু বসবাস করে, নানা রকম কৌশলে বাসস্থান নির্ম্মাণ করিয়া কীট, পতঙ্গ, পশু, পক্ষী, নর, বানর সন্তানাদি পালন করে, শক্রর আক্রমণ প্রতিরোধ করে, বাসস্থানে আশ্রয় গ্রহণ করিয়া ক্ষিপ্তা প্রকৃতির অত্যাচারের কবল হইতে আত্মরক্ষা করে। অবশ্য মানুষ বুদ্ধির বলে বড় বড় প্রাসাদ নির্ম্মাণ করে ; দুর্গ, পরিখা, সৌধ ও কুটীরে ধরণীর শ্যাম অঙ্গের রূপান্তর ঘটায়। নিকৃষ্ট জীবের মানবের সহিত তুলনা না হইলেও তাহারা নিজ নিজ বাসস্থান নির্ব্বাচনে যথেষ্ট বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দিয়া থাকে।

কোন কোন জীবজন্তু বাসস্থান নির্ব্বাচন করে। কোন কোন প্রাণী বাসস্থান নির্ম্মাণ করে। আদিম মানব যেমন গিরিগুহায় আশ্রয় গ্রহণ করিত, অনেক শ্রেণীর জীব তেমনি উপযুক্ত তরুকোটর বা গিরিগুহা, মেদিনীবিবর বা কুঞ্জকুটীর নির্ব্বাচন করিয়া তথায় বাস করে। কিন্তু অনেক জীবজন্তুর সেরূপ বাসস্থানে মনস্তুষ্টি হয় না, তাহারা ভগবদ্দত্ত অঙ্গ প্রত্যঙ্গ লইয়া অদ্ভুত কৌশলে বাসস্থান নির্ম্মাণ করিয়া থাকে। মানুষ এত শিল্পী, এত বুদ্ধিমান তবু উত্তমরূপে মধুচক্র পরীক্ষা করিয়া, বাবুই পাখীর বাসার বুনানীর বাহাদুরী দেখিয়া, খরগোসের গর্ত্তের কারিগরী বুঝিয়া চমৎকৃত হয়।

জীবজন্তু কীট পতঙ্গ সাধারণতঃ মৃত্তিকা খনন করিয়া, গাছে গর্ত্ত কাটিয়া, তরুশাখায় বাহিরের দ্রব্য রাখিয়া বা নিজ দেহের নিঃসরণ লইয়া বাসা নির্ম্মাণ করে। নানা রকমের বাসা প্রত্যহ আমরা চতুর্দ্দিকে দেখিতে পাই। কিন্তু সচরাচর আমরা তাহাদের কারুকার্য্য দেখি না। আমি এ প্রবন্ধে কতকগুলি জীবের বাসস্থানের পরিচয় দিব মাত্র।

আমাদের নিত্য-সহচর তীক্ষ্ণ-হুল, মিষ্টান্ন-লোভী পিপীলিকাগুলার অত্যাচারে আমরা তাহাদের সহিত সখ্যতা স্থাপন করি না বটে, কিন্তু একবার বন্ধুভাবে তাহাদের লক্ষ্য করিলে, তাহাদের সঙ্গে একটু মাঠে মাঠে ঘুরিয়া বেড়াইলে তাহাদের গুণে আমাদের মুগ্ধ হইতে হয়। বিলাতের অনেক মেধাবান পণ্ডিত পিপীলিকা-চরিত্র অধ্যয়ন করিয়া পুস্তক প্রণয়ন করিয়াছেন। সে সকল বহি না পড়িয়া কেবল একটু ধৈর্য্য ধরিয়া পিপীলিকার কার্য্যকলাপ পর্য্যবেক্ষণ করিলেও আমরা অনেক শিক্ষা পাই। আমাদের সাধারণ পিপীলিকারা তিন রকম বাসা নির্ম্মাণ করে। ছোট ছোট হরিদ্রাবর্ণের পিপীলিকারা গর্ত্ত খুঁড়িয়া মৃত্তিকাতলে বসবাস করে। যে রকম অধ্যবসায় ও কৌশলের সহিত ইহারা দুর্গ নির্ম্মাণ করে তাহার প্রশংসা না করিয়া থাকিতে পারা যায় না। এক সঙ্গে তিন চারিজন কাজ করিতে আরম্ভ করে। এক একজন এক এক টুকরা মাটি কাটিয়া সেই মৃত্তিকা খণ্ডকে বর্ত্তুলাকার করিয়া মুখে করিয়া আনিয়া গর্ত্তের বাহিরে নিক্ষেপ করে। সে মাটির গুলি এক একটি সাবুদানার মত। বাসস্থানের চতুর্দ্দিকে প্রায় দুই ইঞ্চি ধরিয়া সেই ছোট ছোট সাবুদানার মত মাটীর গুলি দিয়া তাহারা পরিখা নির্ম্মাণ করে। ভিতরে অনেক দূর অবধি খুঁড়িয়া সুরঙ্গ কাটিয়া আবাসস্থানটি বেশ অপেক্ষাকৃত প্রশস্ত করিয়া লয়। সুরঙ্গ খননের কারিগরী যেমন উচ্চদরের, মাটি বহিয়া বাহিরে আনিয়া রাখিবার কৌশলও তেমনই প্রশংসনীয়। এক দানা মাটি সযত্নে বাহিরে রাখিয়া আবার ছুটিয়া গিয়া আর এক দানা মাটি আনিয়া ক্ষুদ্র পিপীলিকা তাহার পার্শ্বে রাখিয়া দেয়। বিবরের মুখের কাছে একটির পর একটি করিয়া এমন সুন্দরভাবে মাটির দানাগুলি সাজাইয়া রাখে যে তাহাদের অপেক্ষা ঈষৎ ভারী জীবের ভার পড়িলেই গর্ত্তের দ্বার একেবারে বন্ধ হইয়া যায়। আমি একবার একটি ঝাউগাছের কাঁটা লইয়া গর্ত্তের প্রবেশ দ্বার স্পর্শ করিয়া এই কৌশলটি বুঝিয়াছিলাম। স্পর্শ করিবামাত্র ঝুর ঝুর করিয়া মাটি পড়িয়া বিবর দ্বার বন্ধ হইয়া গেল। তখন বাসার মধ্যে পিপীলিকা ছিল। তাহারা প্রায় দুই ঘণ্টা কাল স্থির থাকিল। শেষে সতর্কভাবে মাথা ঠেলিয়া বাহিরে আসিয়া চতুর্দ্দিক পরীক্ষা করিল। কোনও শত্রু দেখিতে না পাইয়া আবার মাটির দানাগুলি যথাস্থানে সাজাইয়া রাখিল।

কাটপিঁপড়া গাছের ছাল কাটিয়া নিজেদের দেহের লালা লাগাইয়া লম্বা লম্বা বাসা নির্ম্মাণ করে। এক একটা বাসা লম্বে সাত আট ফুট অবধি দেখিয়াছি।

যে গাছগুলার উপর বালকদিগের একটু সুদৃষ্টি যেন তাহাদের সহিত বাদ সাধিবার জন্যই সেই সকল বৃক্ষের প্রধান স্কন্দে রাস্তা বন্ধ করিয়া ইহারা বাসা রচনা করে। এমন অনেক লিচু গাছে এই শ্রেণীর পিপীলিকার বাসা দেখিতে পাওয়া যায়। পেয়ারা গাছেও ইহাদের যথেষ্ট অত্যাচার।

ইহাদের জ্ঞাতি ভ্রাতারাও সকল রকম ফলের গাছে বাসা নির্ম্মাণ করে। এক একটা গাছের ডালে কতকগুলা প্রশস্ত পত্র-গঠিত এক একটা পাতার ফানুষ দেখিতে পাওয়া যায়। তিন ইঞ্চি হইতে পাঁচ ছয় ইঞ্চি অবধি এক একটার ব্যাস। কলিকাতার ছেলে গ্রীষ্মাবকাশে পাড়াগাঁয়ে আত্মীয়ের বাড়ী গিয়া অজ্ঞানতা বশতঃ যখন ইট ছুঁড়িয়া বা খোঁচা মারিয়া একটা ঐ রকম ফানুষ ছিঁড়িয়া ফেলে তখন পালে পালে বড় বড় হরিদ্রাবর্ণের পিপীলিকা বাহির হইয়া ক্ষিপ্তের মত ছুটাছুটি করে। যে দুই একটা বালকের দেহে পতিত হয় তাহারা ভগবান-দত্ত অস্ত্রের যথেষ্ট সদ্ব্যবহার করে। দূর হইতে এইরূপ পর্ণগৃহ নির্ম্মাণ-প্রণালী লক্ষ্য করা মোটেই বিপদসঙ্কুল নহে। পিপীলিকাদের দেহ হইতে এক প্রকার পদার্থ নিঃসরণ হয়। প্রথমে সেই নিঃসরণ দ্বারা তাহারা গাছের ডালের কোণে খুব সূক্ষ্ম একটা স্বচ্ছ গোল ফানুষের মত বাসা বয়ন করে। গাছের দুই একখানা পাতাও তাহার সহিত আটকাইয়া দেয়। ক্রমে আরও পাতা আনিয়া তাহাতে সংবদ্ধ করে। এইরূপে গোলাকার পাতার বাসা সম্পূর্ণ হয়। বাহিরে পাতা থাকে বটে কিন্তু পাতার তলায় সেই মাকড়সার লালার মত পদার্থের কাটমা থাকে। বাসার একটি মাত্র প্রবেশ-দ্বার।

অবশ্য পিপীলিকার বাসা যৌথ-পরিবারের। উই পোকার বাসাও যৌথ-পরিবারের। সেগুলাও লম্বা। কিন্তু যেমন শরীরের লালায় পাতা গাঁথিয়া পিঁপড়ার দল বাসা করে, তুলসী বৃক্ষে ও মেদিগাছে এক রকমের পোকা থাকে তাহারা নিজেদের জন্য শুষ্ক শাখা ও শরীরের লালা দিয়া বেশ এক রকম ছোট ছোট গৃহ নির্ম্মাণ করে। এক ইঞ্চি আধ ইঞ্চি দশ বারোটা শুকান কাটি লম্বা ভাবে পাশাপাশি গাঁথিয়া বাসা বাঁধে। কচ্ছপের খোলার মত এই বাসাও এক রকম তাহাদের শরীরের অংশবিশেষে পরিণত হয়। এই কীটেরা ছোট মুখ ও পদ বাহির করিয়া বাসার ভিতর থাকিয়া গাছের ডালে ডালে ঘুরিয়া বেড়ায়, শত্রুর আগমনে শামুক গুগলির মত মুখ লুকাইয়া নিরাপদ হয়। আমি আজকাল অনেক চেষ্টা করিয়াও ঐরূপ বাসা সংগ্রহ করিতে পারি নাই। সুতরাং বাসার ভিতরের পোকাটির ঠিক বর্ণনা দিতে পারিলাম না।

এই শ্রেণীর এক প্রকার কীট শশার বীজের ন্যায় বাসার মধ্যে থাকিয়া স্যাঁত্‌সেতে দেওয়ালে ঘুরিয়া বেড়ায়।

সাম্প্রদায়িক পতঙ্গদিগের মধ্যে ভ্রমর ও ভীমরুল মাটি লইয়া বাসস্থান নির্ম্মাণ করে। তাহারা মাটি কাটিয়া আনিয়া একস্থলে প্রথমে খানিকটা কাদা লাগাইয়া রাখে, তাহার পর দেহের নিম্নভাগ দিয়া চাপিয়া চাপিয়া নলের মত একটি বাসা করে। আবার তাহার পার্শ্বে খানিকটা মাটি আনিয়া ঠিক ঐরূপে অপর একটি নল রচনা করে। ক্রমে একটির পর একটি নল বসাইয়া মস্ত মাটির চাক তৈয়ারি করে। আবার ডিম রাখিয়া এক একটি নলের মুখ বন্ধ করিয়া দেয়।

এই শ্রেণীর পতঙ্গ এত বিভিন্ন রকমের বাসস্থান নির্ম্মাণ করে, সে সকল বাসস্থানে এত অদ্ভুত রচনা-কৌশল পরিলক্ষিত হয় যে, এস্থলে তাহাদের বর্ণনা দেওয়া অসম্ভব। বোল্‌তা প্রভৃতি পতঙ্গ গাছের ছাল চিবাইয়া গুঁড়া করিয়া উহা কর্দ্দমের মত নরম করিয়া ফেলে। সেইরূপ কর্দ্দম দিয়া উহারা আপনাদের চাক নির্ম্মাণ করে। এক শ্রেণীর বোল্‌তা অশ্বত্থ, বট, ডুম্বুর প্রভৃতি ফলের ভিতর প্রবেশ করিয়া ডিম পাড়িয়া রাখে, ক্রমে ফল বৃদ্ধির সহিত, ইহাদের শাবকগুলিও পুষ্ট হয়। শেষে বোল্‌তা ঐ সকল ফলের পরাগ লইয়া বাহির হইয়া যায়। অন্যান্য ফলের মধ্যেও আমরা কীট দেখিতে পাই।

আমরা কিন্তু এস্থলে মধুচক্রের মোটামুটি বর্ণনা দিবার লোভ সম্বরণ করিতে পারিব না। যে জীব মধু দান করে, যাহার গৃহ ভাঙ্গিয়া মোমবাতি প্রস্তুত হইয়া হিন্দু, মুসলমান, রোমান ক্যাথলিকদিগের পূজার সময় ব্যবহৃত হয়, তাহার প্রতি পক্ষপাতিত্ব মার্জ্জনীয়।

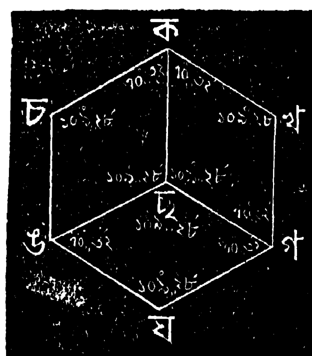
আমি পূর্ব্ব দুইটি প্রবন্ধে মৌমাছির সামাজিক জীবনের মোটামুটি আভাস দিয়াছি। যেমন মৌমাছির দলে রাণী, তাঁহার বিলাসের জন্য অলস পুরুষ ও শ্রমজীবী এই তিন শ্রেণীর মক্ষিকা থাকে, ইহাদের বাসাতেও তেমনি তিন শ্রেণীর ঘর থাকে। ইহাদের মধ্যে শ্রমজীবী ক্লীবদিগের ও অলস পুরুষদিগের ঘর ছয় কোণা, তবে পুরুষদের ঘরগুলা একটু আকারে বড়। চাকের ধারে ধারে বিভিন্ন আকারের যে সব ঘর থাকে সেগুলা রাজকুমারীদের জন্য। সেই সকল ঘরে যে ডিম ফুটে সেগুলা হইতে স্ত্রীজাতীয় মধুমক্ষিকা উৎপন্ন হয়। ঐ ঘরের শাবকগুলিকে একটু অধিক পরিমাণে খাইতেও দেওয়া হয়।

মধুচক্রগুলা দুমুখো, দুই দিকেই ঘর। অবশ্য সোজাসুজি দুইটা ঘরের মধ্যে

যোগ নাই। একটির দ্বার যদি হয় পূর্ব্বমুখে, অপরটি পশ্চিম দুয়ারী। এমন দুমুখো চাক আর কোন পতঙ্গের নাই।

মধুচক্র মধুত্থ-নির্ম্মিত। এই মোম মৌমাছির দেহ হইতে বহিষ্কৃত হয়। অনেক মধু খাইলে, বিশ্রাম করিলে, উষ্ণস্থানে থাকিলে তবে মধুমক্ষিকার দেহ হইতে মোম ক্ষরণ হয়। তাই বড় হিসাব করিয়া ইহারা বাসা নির্ম্মাণ করে। বিলাতের বড় বড় গণিতশাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিতেরা হিসাব করিয়া দেখিয়াছেন যে, কোন প্রকারে মৌচাক আরও অল্প মোমে নির্ম্মিত হইতে পারে না। সে গল্প পরে বলিব।

মৌচাকের ছয় কোণা ঘরগুলা যে মেজের উপর নির্ম্মিত সে মেজের বড় বাহাদুরী আছে। একটা ঘর ভাঙ্গিয়া দেখিলে বুঝা যায় যে, তাহার মেজেতে রম্বাস (অসমকোণ চতুর্ভুজ) আকারের তিনখানি টালি পাতা। সেই এক একটি রম্বাসের চারিটি কোণের মধ্যে বড় দুইটি কোণ ১০৯ ডিগ্রি ২৮ মিনিট করিয়া এবং ছোট দুইটি কোণ ৭০ ডিগ্রি ৩২ মিনিট করিয়া। আর যেখানে তিনখানি টালি মিশিয়াছে অর্থাৎ ছয়কোণা ঘরের মেজের ঠিক মধ্যস্থলের তিনটি কোণ বড় অর্থাৎ ১০৯ ডিগ্রি ২৮ মিনিট করিয়া। কখ, খগ প্রভৃতি এক একটি বাহুর উপর প্রাচীর তুলিয়া দিলে মৌচাকের এক একটি ষড়ভুজ গৃহ সম্পূর্ণ হয়। অবশ্য মৌমাছি প্রাচীর গাঁথে না। কতকটা মোম রাখিয়া দেহের নিম্নভাগ দিয়া টিপিয়া ঐরূপ গৃহ নির্ম্মাণ করে।



চিত্রের ছ চিহ্নিত স্থানের তিনটা কোণের প্রত্যেক কোণটা এবং চ, খ ও ঘ চিহ্নিত স্থলের প্রত্যেক কোণ ১০৯ ডি ২৮ মি এবং বাকী প্রত্যেক ছোট কোণের পরিমাণ ৭০ ডি ৩২ মিনিট। মরলডি সাহেব বহুদিন পূর্ব্বে এই সত্য

দিগের গৃহনির্ম্মাণবৃত্তির পূর্ণ পরিচয় লাভ করিবার জন্য একটি বড় অভিনব উপায় উদ্ভাবন করিলেন। তিনি কিনিগ (Kœnig) নামক প্রসিদ্ধ গণিতাচার্য্যকে একটি বিচিত্র অঙ্ক কসিতে দিলেন। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, একটি ছয়কোণা ঘর যদি তিনটি লজেঞ্জ আকারের টালির উপর নির্ম্মিত হয় তাহা হইলে উহার কোণগুলি কি পরিমাণের হইলে সর্ব্বাপেক্ষা কম মাল-মসলা দিয়া সর্ব্বাপেক্ষা অল্প জায়গায় নির্ম্মিত হইতে পারে?

গণিতাচার্য্য হিসাব করিয়া বলিলেন—বড় কোণ ১০৯ ডি ২৮ মিনিট এবং ছোট কোণ ৭০ ডি ৩৪ মি হওয়া আবশ্যক। জীবতত্ত্ববিদেরা আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন। মরলডি (Maraldi) সাহেব মৌমাছির ঘরের মেজে মাপিয়া যে পরিমাণ পাইয়াছিলেন তাহার সহিত এ গণনা প্রায় মিলিয়া গেল। কেবল দুই মিনিটের কম বেশী হইল। সকলে বুঝিল মৌমাছি গণিতাচার্য্য ভুল করিয়াছে, আমাদের গণিতশাস্ত্র পড়িলে তাহারা কোণগুলা দুই মিনিটের কম বেশী করিলে আদর্শ মধুচক্র রচিতে পারিত। বহুদিন লোকের এইরূপ ধারণা ছিল।

শেষে ম্যাকলরিণ নামক একজন স্কচ গণিতবিদ্ পণ্ডিত মৌমাছির হিসাব শক্তির শ্রেষ্ঠত্ব সপ্রমাণ করিলেন। তিনি হিসাব করিয়া দেখিলেন যে, মৌমাছির হিসাবই নির্ভুল, কিনিগের হিসাব ভুল। তখন পণ্ডিত-সমাজে মহা হুলস্থূল পড়িয়া গেল। কিসে কিনিগের ভুল হইল তাহার অনুসন্ধান চলিতে লাগিল। শেষে দেখা গেল যে, যে লগারিথম তালিকা হইতে কিনিগ সাহেব হিসাব করিয়াছিলেন, সে তালিকাটায় ভুল ছিল।

যাহা হউক মৌমাছি মধুচক্রের মধ্যে লালিত হয়। যখন তাহারা বড় হয় তখন শ্রমজীবীরা তাহাদের পরিত্যক্ত গৃহগুলি পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করিয়া তাহাতে মধু সঞ্চয় করিয়া রাখে। একটু অপ্রাসঙ্গিক হইলেও এস্থলে বলিয়া রাখি যে, আমরা মধুচক্র হইতে যে মধু পাই, যে মধু না হইলে আমাদের দেবসেবা হয় না, সে মধু ঠিক ফুলের মধু নহে। মৌমাছি ফুল হইতে মধু (nectar) আহরণ করিয়া গলার নীচের থলিতে ভরিয়া রাখে। তাহার শরীরের মধ্যে থাকিয়া রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় সেই ফুলের মধু চাকের মধুতে পরিণত হয়। তখন চাকে আসিয়া মৌমাছি সেই মধু উদ্গার করিয়া বাসায় সঞ্চিত করিয়া রাখে এবং যেমন এক একটি ঘর মধুতে পূর্ণ হয় অমনি মোম দ্বারা সে গৃহের মুখ বন্ধ করিয়া দেয়। মৌমাছি পায়ে মাখিয়া ফুলের রেণু লইয়া আসে। মধুর সহিত সেই রেণু মাখিয়া উহারা শাবকদের খাইতে দেয়।

অনেক পতঙ্গ মাটিতে গর্ত্ত করিয়া বাস করে, একথা পূর্ব্বে বলিয়াছি। কেঁচো পচা গাছ-পালাপূর্ণ স্থলে সুরঙ্গ নির্ম্মাণ করে। "কেঁচোর মাটি" তাহার শরীরের ভিতর দিয়া বাহিরে আসে। ইহাতে তাহার আহারও হয় বাসস্থানও নির্ম্মাণ হয়। কেঁচোর ভিতর ফস্‌ফরাস নামক পদার্থ আছে। অন্ধকারে ফস্‌ফরাস জ্বলে। "কেঁচোর মাটি" অন্ধকারে ঘসিলে চিক্ চিক্ করিয়া জ্বলে।

একটু স্যাঁত্‌সেতে জায়গায় ফুলগাছের টবের তলায় বৃশ্চিকদের বাসস্থান। ছাদের প্রাচীরের উপর অনেকদিন একখানা ইট বা অপর কোনও মাটির জিনিস রাখিয়া দিলে তাহার নীচে বিছার বাসা হওয়া অনিবার্য্য। সমুদ্রের বা নদীর ধারের বালির ভিতর অনেক কীট-পতঙ্গ বাসা নির্ম্মাণ করে। অনেক শামুক ও এক রকমের নারিকেলভোজী কাঁকড়া এইরূপ গর্ত্তে বাস করে।

রেশম কীট, তসর কীট যেরূপ কোয়া বা কুকুন নির্ম্মাণ করে তাহা অনেকেই দেখিয়াছেন। ঐরূপ কুকুন ঠিক উহাদিগের বাসস্থান বলিতে পারা যায় না। পরিবর্ত্তনশীল পতঙ্গদিগের (Holometabolic Insect) জীবন তিন অধ্যায়ে বিভক্ত। রেশম কীট বা পলু পোকা এই শ্রেণীর জীব। ডিম ফুটিয়া ইহার কীটাকার প্রাপ্ত হয়,খুব ছোট ছোট পোকা ডিম হইতে বাহির হইয়াই রাক্ষসের মত তুঁতপাতা খাইতে আরম্ভ করে। এইরূপ ভূরিভোজনের দ্বারা পোকাগুলা লম্বায় প্রায় এক ইঞ্চি বাড়িয়া যায় এবং বেশ মোটা হয়। তখন ইহাদের অনেকগুলি পদ থাকে। ক্রমে পলু পাকে অর্থাৎ পলু পোকা হরিদ্রাবর্ণ ধারণ করে। তখন সুবিধা গোছের পাতা ও ডালের মধ্যে স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া মুখ হইতে লালা বাহির করিয়া মাথা নাড়িয়া একবার এ ডালে একবার ও ডালে সংবদ্ধ করিয়া নিজের চারিদিকে জাল বুনিতে আরম্ভ করে। আমি গত ইষ্টারের ছুটিতে ইসলামপুরে ছয়টি পলু লইয়া জাল বয়ন দেখিয়াছিলাম। সন্ধ্যার সময় হইতে বুনিতে আরম্ভ করিয়া পাঁচ ছয় ঘণ্টার মধ্যে এক একটি পলু আপনার চারিদিকে রেশম বুনিয়া তাহার মধ্যে অদৃশ্য হইয়া গেল। আমি সেই গুটিগুলা কলিকাতায় আনিয়াছিলাম। সাত দিন পরে দুইটা কোয়া কাটিয়া তাহাদের ভিতর হইতে একেবারে সুন্দর সাজে দুইটি সাদা প্রজাপতি বাহির হইল। তাহারা কোয়া হইতে বাহির হইয়াই পরস্পরের সহিত মিলিত হইল এবং পরদিন সাদা সাদা অনেক অণ্ড প্রসব করিল। আর একটি গুটি কাটিয়া আর একটি প্রজাপতি বাহির হইয়াছিল। অবশিষ্ট তিনটিকে আমি দুই একদিন অন্তর কাটিয়া দেখিয়াছিলাম

কিরূপে তাহারা কোয়ার ভিতর বেশ পরিবর্ত্তন করে। অনেকগুলি ডিম ফুটিয়াছিল কিন্তু তুঁতপাতার অভাবে শাবকগুলি মরিয়া গেল। প্রজাপতি তিনটি তিন চারি দিন মাত্র বাঁচিয়াছিল

মৎস্যজাতির বাসা- নর্ম্মাণের কথা শুনি না। ইহাদের মধ্যে অনেকে জলাশয়ের মধ্যস্থিত বিবরের মধ্যে বাস করে। কৈ, মাগুর, শোল, লাটা প্রভৃতি মাছ মাটির তলায় লুকাইয়া থাকে। আহারের চেষ্টায় এক একবার ভাসিয়া উঠে। ট্যাঙ্গরা মাছও মাটির মধ্যে অন্ধকার স্থলে লুকাইয়া থাকিতে ভালবাসে। আমার পাঠাগারে একটি স্ফটিক পাত্রে প্রায় চারিমাস একটি ছোট ট্যাঙ্গরা মাছ পুষিয়া রাখিয়াছি। সে দিবাভাগে প্রায়ই পাত্রের নিম্নে ঝিনুকের তলায় শয়ন করিয়া থাকে। মাঝে মাঝে এক একবার উপরে উঠিয়া সন্তরণ করে। কিন্তু রাত্রে বাসা ছাড়িয়া প্রায়ই ঘুরিয়া বেড়ায় এবং শৈবাল ও জলজ-বৃক্ষের পত্র ভোজন করে।

ভেকজাতি ছোট ছোট গর্ত্ত খুঁড়িয়া তাহার মধ্যে বাস করে। লাঙ্গুলহীন হইয়া জল ছাড়িয়া উঠিবার পর স্থলচর ভেকশাবককে মাঠের মধ্যে ছোট ছোট বিবরে থাকিতে দেখা যায়।

সরীসৃপদিগের মধ্যে গর্ত্ত খুঁড়িয়া মাটির নীচে বাস করিবার প্রবৃত্তিই অধিক। সর্পজাতি প্রায় সকলেই গর্ত্তের মধ্যে বাস করে। ইহাদিগের স্বভাব-শত্রু নকুলও বিবর বাসী। এক শ্রেণীর স্থলচর কচ্ছপ আছে। ইহাদিগকে স্থলভেদে কেটো, কাছিম, সুদি প্রভৃতি বলিতে শুনা যায়। ইহারা গর্ত্ত খুঁড়িয়া অল্প মৃত্তিকার নিম্নে বাস করে। কুমীরগণও সময়ে সময়ে নদীর কূলের নরম মাটি খুঁড়িয়া তাহার ভিতর বিশ্রাম করে।

চতুষ্পদ জন্তুদিগের মধ্যে শৃগাল, খরগোস, মেঠো ইঁদুর, সজারু প্রভৃতির বাসস্থান সুরঙ্গে। ইহারা মাটি কাটিয়া দুর্গ নির্ম্মাণ করে। খরগোসের বিবর সর্ব্বাপেক্ষা নিভৃতস্থলে নির্ম্মিত হইয়া থাকে। গাছের ঝোপের ভিতর গর্ত্ত খুঁড়িয়া ইহারা বাসা নির্ম্মাণ করে। বাসার একাধিক নির্গমনপথ থাকে। খরগোস প্রসব করিবার পুর্ব্বে বুকের লোম ছিঁড়িয়া বাসার উপর বিছাইয়া তাহার উপর শাবকদের রাখিয়া লালন-পালন করে। ইঁদুরের গর্ত্তের অনেক গল্প শুনিতে পাওয়া যায়। ইন্দুর সঞ্চয়ী জীব। ইহারা খাদ্যাদি সংগ্রহ করিয়া বাসার মধ্যে ভরিয়া রাখে। অনেক সময় সোণারূপার অলঙ্কার, খোকার দুধ পান করিবার রূপার ঝিনুক, নব বধূর মাথার [illegible]

করিয়া লইয়া বাসার মধ্যে রাখিয়াছে এরূপ গল্প শুনিতে পাওয়া যায়। আমি কিন্তু ইঁদুরের গর্ত্ত হইতে ধান, নানা প্রকার শস্য এবং বস্ত্রখণ্ড ব্যতীত অপর কিছু বাহির হইতে দেখি নাই।

গৃহের ছোট ছোট মুষিকগুলা কিন্তু গর্ত্ত খুঁড়িয়া বাস করে না। তাহারা চালার খড়ে, চালের জালা, কাসুন্দির হাঁড়ির পার্শ্বে জীর্ণ বস্ত্র কাগজ প্রভৃতি তাল পাকাইয়া তাহার উপর সন্তান পালন করে। অবশ্য কলিকাতার সজ্জিত গৃহের আলমারির মাথায় এবং তৈলচিত্রের পশ্চাতে ইঁদুরের বাসা দেখা গিয়াছে।

ব্যাঘ্র, ভল্লুক গাছের ঝোপে নিভৃত স্থলে বাসস্থান নির্ব্বাচন করিয়া লয়। বড় বড় ঘাসের মধ্যে বাঘ শুইয়া থাকে। ইহারা বাসস্থান নির্ব্বাচন করে, বাসা বাঁধে না। একটা বৃহৎ অশ্বত্থ বৃক্ষের নিম্নস্থিত স্বাভাবিক গর্ত্তের ভিতর এক বন্য কুক্কুরীকে সন্তান পালন করিতে দেখিয়াছি।

জঙ্গলের মধ্যে হরিণের দল থাকে, কিন্তু তাহারা বাসা রচনা করে একথা কেহ বলে না। তাহারাও ব্যাঘ্রাদির মত নিভৃত স্থলে বাসস্থান নির্ব্বাচন করে, তথায় শাবকাদি লালন-পালন করে। হনুমান, বাঁদর, উল্লুক প্রভৃতি গাছের ডালে থাকে কিন্তু তাহারাও বাসা নির্ম্মাণ করে না। যেখানে পাতার ঝোপ সেইখানে লুকাইয়া থাকে। সহরের বানর, হনুমান অনেক সময় অট্টালিকার ছাদের উপর বসিয়া থাকে। বনমানুষগণ গাছের শাখায় শুইয়া থাকে। ইহারাও বাসা বাঁধে না। আদিম মানুষও এ বিষয়ে একরকম বানরজাতির পন্থা অবলম্বন করিত। তাহারাও বাসা নির্ম্মাণ করিত না, তবে বৃক্ষশাখেও বসবাস করিত না, গিরিগুহায় আশ্রয় গ্রহণ করিত।

আমাদের দেশের চতুষ্পদ জীবের মধ্যে বোধ হয় কেবল কাঠবিড়ালী বৃক্ষ-শাখায় বাসস্থান নির্ম্মাণ করে। গাছের উচ্চ ডালে শুষ্ক শাখা-পল্লবাদি সংগ্রহ করিয়া কাঠবিড়ালী পাখীর মত বাসা নির্ম্মাণ করিতে পারে। অনেক সময় আবার ইহারা তরুকোটরে বাস করে। এক শ্রেণীর মুষিক বৃক্ষের স্কন্ধে গর্ত্ত কাটিয়া বাস করে।

নদীর ধারের গর্ত্তের ভিতর মাংসাশী ভোঁদড়গণ বাস করে। তবে তাহারা সে সকল বিবর আপনারা খনন করে কি না তাহা ঠিক বলিতে পারি না। এক সঙ্গে পাঁচ সাতটি ভোঁদড়কে নদীর জলে সন্তরণ করিতে দেখা যায়। কেবল ছোট ছোট গুম্ফশোভিত মুখ তুলিয়া ভোঁদড়গণ দল বাঁধিয়া সন্তরণ করিয়া বেড়ায় এবং ছোট ছোট মাছ ধরিয়া আহার করে।

উভচর জীবের মধ্যে বীবর (Beaver) নামক জন্তুর বাসস্থান নির্ম্মাণে বিশেষ দক্ষতা দেখিতে পাওয়া যায়। ইহারা শীতপ্রধান দেশে বাস করে। শুনা যায়, সাঁতার কাটিতে পাইলে বীবরেরা হাঁটিতে চাহে না। ইহারা নদীর ধারে বাসস্থান নির্ম্মাণ করে এবং নদী শুকাইয়া গেলে তাহাদের বাসস্থান জল হইতে দূরে সরিয়া যাইবে এই আশঙ্কায় তাহারা নদীতে বাঁধ বাঁধিয়া নদীর জল আটক করিয়া রাখে। যে সকল নদী মন্দস্রোত সে সকল নদীতে সোজাসুজি এক পার হইতে অপর পার অবধি বাঁধ বাঁধে। যে সকল নদী খরস্রোতা, সে সকল নদীতে জলের স্রোত কাটাইবার জন্য ইহারা অর্দ্ধচন্দ্রাকারে বাঁধ নির্ম্মাণ করে। কিরূপে ইহারা বাঁধ নির্ম্মাণ করে, প্রাণিতত্ত্ববিদ্ পণ্ডিতগণ তাহা বিশেষরূপে লক্ষ্য করিয়াছেন।

বীবরগণ সামাজিক জীব। ইহারা দলবদ্ধ হইয়া বাস করে। সকলে মিলিয়া গাছ কাটিয়া সেই গাছ নদীর জলে ভাসাইয়া যথাস্থানে সন্নিবেশিত করে। একটির পর একটি বৃক্ষ সাজাইয়া সেগুলিকে মৃত্তিকা ও পাথরের দ্বারা পরস্পরের সহিত সংবদ্ধ করিয়া ইহারা বাঁধ রচনা করে। এই সকল মাটির সঙ্গে অনেক বৃক্ষের বীজ চলিয়া আসে। ক্রমে সেই সকল বীজ হইতে গাছ জন্মায় এবং সেই গাছের শিকড় দ্বারা আবার বাঁধ দৃঢ় হয়। এক একটা বাঁধ লম্বে দুই তিন শত গজ। ইহারা আপনাদের বাঁধের ধারে নদী তীরে গর্ত্ত খুঁড়িয়া বাসা নির্ম্মাণ করে। বাসার উপর গোলাকার ছাদ থাকে। বাসা হইতে একটি পথ জল অবধি চলিয়া যায় অপর নির্গমনের পথে তাহারা তীরে উঠিতে পারে। যখন বরফ পড়িয়া স্থলপথ বন্ধ হইয়া যায় তখন তাহারা জলপথে যাতায়াত করে।

(আগামীবারে সমাপ্য।)

শ্রীকেশবচন্দ্র গুপ্ত।

কে তুমি ?

পাপিয়ার কলস্বন
থেমে গেছে বহুক্ষণ
মাতাইয়া বন উপবন,
মুগ্ধ মাধবীর সনে
খেলা ক'রে সঙ্গোপনে
লুকায়েছে প্রভাত পবন ;
জাগাইয়া পদ্ম-বন
তপন অনেকক্ষণ
অস্তাচলে পড়িয়াছে ঢ'লে,
চুমি' মকরন্দ ভার
ঘুমা'য়ে নাই ত' আর
লুব্ধ অলি কমলের কোলে !

জীবনের যত আশা,
যত কিছু ভালবাসা
ছিল যত পুণ্য মধুরিমা,
সব গুলি একে একে
ফুরায়েছে চিহ্ন রেখে,
স্মৃতিটুকু আছে শুধু সীমা !
কেগো আজ যত ব্যথা
যত কিছু ব্যাকুলতা
মুছাইতে চায় ধীরে ধীরে,
জীবনের সন্ধ্যাকালে
আনন্দের দীপ জ্বালে
কে গো শূন্য হৃদয়-মন্দিরে !

শ্রীহরিহর ভট্টাচার্য্য।

ভারবি ও বৃত্রসংহার।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

যুধিষ্ঠির ও প্রচেতা।

আবার বিবেচনা করিতে হইবে যে, দ্রৌপদী ও বৃকোদর উত্তেজিত হইয়া ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরকে উত্তেজিত করিতে লাগিলেন, অতীতের কত মর্ম্মদাহিনী স্মৃতি উদ্‌ঘাটিত করিয়া উত্তেজিত করিতে লাগিলেন, কিন্তু যুধিষ্ঠির অটল অচল। তাঁহার শরীরে বা মুখাবয়বে কোনও রূপ রোষ-চিহ্ন পরিলক্ষিত হইল না। তিনি পূর্ব্বেও যেমন ছিলেন, এখনও ঠিক সেই ভাবেই রহিলেন। এখনও তাঁহার মন, প্রশান্ত, গম্ভীর ও দৃঢ়তাসম্পন্ন। হৃদয়-প্রধানের হৃদয়ে এখনও স্বচ্ছতা, গম্ভীরতা পূর্ণমাত্রায় পরিস্ফুট। তিনি উদ্ধত বৃকোদরকে বলিলেন,—

"সহসা বিদধীত ন ক্রিয়া	"না ভাবি সহসা কার্য্য করা অনুচিত
মবিবেকঃ পরমাপদাং পদং	অবিবেক হয় সদা বিপদ-কারণ,
বৃণতে হি বিমৃষ্যকারিণং	বিবেচনা করি কার্য্য করে যে বিহিত
গুণলুব্ধাঃ স্বয়মেব সম্পদঃ।" *	গুণলোভে তারে লক্ষ্মী করেন বরণ।"
ভাঃ, ২য় সঃ, ৩০ শ্লোঃ।	নবীনচন্দ্র।

কি স্বচ্ছ উপদেশ! কি গভীর বিমৃষ্যকারিতা! বিবেচনার সহিত কর্ত্তব্য কর্ম্ম কর, সম্পদ্ যশ আপনা আপনিই আসিবে, এ কথা কয় জনের মুখে শুনা যায়? এ কথা আর যে বলিতে পারে, বলুক, কিন্তু শত্রুগণের কপটতায় হৃতরাজ্য ও হৃতসর্ব্বস্ব রাজ-রাজড়ার মুখে এমন শুনিতে পাওয়া বড় সম্ভাবিত নহে। যে রাজা এমন কথা বলিতে পারে, সে রাজা অবস্থা ও অভ্যাসের দাস নহে। তাহার চিত্ত স্বাধীন। সে চিত্ত-অশ্বের বল্গা তাহার নিজের হস্তেই নিয়ন্ত্রিত। তাই বলিতেছিলাম, কর্ম্মবীর ধর্ম্মবীর যুধিষ্ঠিরের চিত্ত বাহ্যজগতের অনুশাসক। বাহ্যঘটনার ক্ষুদ্র মারুতে কখনও তাঁহার চিত্ত বিচলিত হয় নাই। তাই আজ এইরূপ দুর্দ্দিনেও হইল না।

আবার এস্থলে প্রচেতার চরিত্রটী স্মরণ করিতে হইবে।

---

* ভারবির ২য় সর্গে যুধিষ্ঠিরের আরও অনেক উক্তি আছে।

কার্ত্তিকেয় ও বৈশ্বানর উত্তেজিত হইয়া দেবসকলকে উত্তেজিত করিবার প্রয়াস পাইলেন, বৃত্রাসুরের অতুল বীর্য্য এবং নিজেদের হীনতা ক্ষণে ক্ষণে প্রকটিত করিতে লাগিলেন। কিন্তু শান্ত, ধীর প্রচেতার হৃদয় বিন্দুমাত্র বিচলিত হইল না। সে হৃদয় পূর্ব্বের ন্যায় ঠিক সমভাবেই রহিল। হৃদয়-প্রধানের হৃদয়ে এখনও স্বচ্ছতার পূর্ণ বিকাশ অব্যাহত। তখনও তাঁহার শরীরে বা মুখাবয়বে বিন্দুমাত্র রোষের চিহ্ন পরিলক্ষিত হয় নাই। তখনও তাঁহার নির্ম্মল প্রতিভা অক্ষুণ্ণ ভাবে বর্ত্তমান। তিনি উদ্ধত দেবগণকে যাহা বলিলেন, সেগুলি তাঁহার ঐ নির্ম্মল প্রতিভা এবং তাৎকালিক হৃদয়ের প্রসন্নতারই পরিচায়ক। তিনি বলিলেন,—

"তিষ্ঠ দেবগণ, ক্ষণকাল শান্তভাবে,
হেন প্রগল্‌ভতা নহে মহতে উচিত,
এ ঔদ্ধত্য অল্পমতি প্রাণীরে সম্ভবে।
যুদ্ধে দৈত্য বিনাশিয়া স্বর্গ উদ্ধারিতে
অনিচ্ছা কাহার দৈত্যঘাতী দেবকুলে ?
কে আছে নারকী হেন দেবনামধারী
দ্বিরুক্তি করিবে হেন পবিত্র প্রস্তাবে ?
* * *
দেব-তেজ, দেব-অস্ত্র, দেবের বিক্রম
বার বার এত যার কর অহঙ্কার,
এতদিন কোথা ছিল অসুরের সনে
যুঝিলে যখন রণে করি প্রাণপণ ?
কোথা ছিল সে সকল যবে দৈত্যশূল
নিক্ষেপিল সুরবৃন্দে এ পুরী পাতালে ?
সমর্থ কি হয়েছিলা করিতে নিস্তেজ
দুর্জ্জয় বৃত্রের হস্ত দেব অস্ত্রাঘাতে ?
অস্ত্র সেই, বীর্য্য সেই, সেই দেবগণ,
অক্ষুণ্ণ অসুর(ও) সেই সুপ্রসন্ন বিধি
এখনো রক্ষিছে তারে অনিবার্য্য তেজে ;
কি বিশ্বাসে পুনঃ চাহ পশিতে সংগ্রামে ?
ভাগ্য নাই। ভাগধেয় মূঢ়ের প্রলাপ।
সাহস যাহার সদা সেই ভাগ্যধর।
তবে কেন ইন্দ্রবাণ তেজঃ দুর্নিবার
অক্ষত শরীরে দৈত্য ধরিলা বক্ষেতে ?
কেন ইন্দ্র সুরপতি সর্ব্বজয়ী রণে
অসুরমর্দ্দন নিত্য, শূলের প্রহারে
অচেতন রণস্থলে হইলা আপনি,
চেতন-বিরতি যার নহে ক্ষণকাল ?
কেন বা সে ইন্দ্র আজি নিয়তির ধ্যানে,
সঙ্কল্প করিয়া দৃঢ় প্রগাঢ় মানসে,
সুমেরু শিখরে একা কাটাইছে কাল,
কেন সুরপতি বৃথা এ ধ্যানে নিরত ?
দেবগণ, মম বাক্য অকর্ত্তব্য রণ,
যত দিন ইন্দ্র আসি না হয় সহায়।"

বৃত্রসং, ১ম সঃ।

দেখা যাইতেছে, যুধিষ্ঠির ও প্রচেতা উভয়েই 'পরতন্ত্র-প্রজ্ঞ' নহেন। ভাল মন্দ, সদসৎ বিচার করিবার শক্তি তাঁহাদের উভয়েরই তুল্যমাত্রায় বর্ত্তমান। দ্রৌপদী ও বৃকোদরের উদ্দীপনী ভাষা যুধিষ্ঠিরের হৃদয় মুহূর্ত্তের জন্যও বিচলিত করিতে অসমর্থ, আবার কার্ত্তিকেয় এবং বৈশ্বানরের উদ্দীপ্তিকর বচনপরম্পরা প্রচেতার হৃদয় বিচলিত করিতে অসমর্থ। সুতরাং হৃদয়বান্ উভয়েই তুল্য।

যাহা সুকর্ত্তব্য, যুধিষ্ঠির তাহা নিজের প্রতিভার বলে ভীম ও দ্রৌপদীকে উপদেশ দিলেন, আবার প্রচেতাও দেবগণকে বিহিত কার্য্যের জন্য উপদেশ দিলেন। সুতরাং উপদেষ্টাও উভয়ে সমান। "ইন্দ্র এখনও বজ্র লইয়া ফিরিয়া আসেন নাই, আর আমরাও বৃত্রের নিকট অনেকবার পরাজিত হইয়াছি, বৃত্রকে পরাজিত করিবার শক্তি আমাদের নাই, সুতরাং এ সময়ে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হওয়া উচিত নহে" এরূপ বিচার-বুদ্ধি প্রচেতার হৃদয়ে পূর্ণমাত্রায় বর্ত্তমান। দেবগণকেও তিনি এই ভাবে উপদেশ দিয়াছেন। আর যুধিষ্ঠির, তাঁহারও হৃদয়ে এইরূপ বিচার-বুদ্ধি সমভাবে বর্ত্তমান। এ সময়ে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলে দুর্য্যোধনের অনেক সহায় জুটিবে, ভীষ্ম প্রভৃতি অমিততেজা বীরগণও দুর্য্যোধনের পক্ষপাতী, আর আমরা নিরবলম্বন, সুতরাং তুল্যবল, তুল্যসহায় না হইলে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হওয়া উচিত নহে, সময়ের প্রতীক্ষা করাই উচিত, যুধিষ্ঠিরও এইরূপ উপদেশ ভীমকে দিয়াছেন *। সুতরাং কেমন করিয়া বলিব যে, বিচারশক্তি উভয়ের তুল্য নহে।

প্রচেতা দেবগণকে বলিলেন,—

"হেন প্রগল্‌ভতা নহে মহতে উচিত,
এ ঔদ্ধত্য অল্পমতি প্রাণীয়ে সম্ভবে।" বৃত্রসং, প্রথম সর্গ।

আর যুধিষ্ঠির ভীমকে বলিলেন,—

"কিমসাময়িকং বিতন্বতা
মনসঃ ক্ষোভ মুপাত্তরংহসঃ। †
ক্রিয়তে পতিরুচ্চকৈ রপাং
ভবতা ধীরতয়াধরীকৃতঃ॥"
ভাঃ, ২য় সঃ, ৫০ শ্লোঃ।

"ধীরতায় বারিধিরে করি পরাজয়
কেন এবে বাড়াইছ গৌরব তাহার?
কেন হ'য়ে রোষভরে অধীর হৃদয়
অকালে মনের ক্ষোভ করিছ বিস্তার?"
নবীনচন্দ্র।

এই উপদেশ দুইটীও একার্থক। মনে হয়, প্রচেতা যেন যুধিষ্ঠিরের হৃদয়ের কথা ভাষান্তরে ব্যক্ত করিলেন।

দ্রৌপদী ও ঐন্দ্রিলা।

দ্রৌপদী বিজিতের পত্নী, আর ঐন্দ্রিলা বিজেতার পত্নী, সুতরাং উভয়ে

* ভারবির ২য় সর্গ দ্রষ্টব্য।

† বৈদ্যনাথপুরের প্রসিদ্ধ নৈয়ায়িক শিহাড়শোল রাজসভা-পণ্ডিত স্বর্গীয় সর্ব্বেশ্বর তর্করত্ন মহোদয়ের হস্তলিখিত পুস্তকে 'অবাপ্তরংহসঃ' এইরূপ পাঠ আছে। এই পাঠটাই আমাদের বিশুদ্ধ বলিয়া মনে হয়।

তুল্যাবস্থ না হইলেও উভয়ের চরিত্রগত সাদৃশ্য বেশ পরিস্ফুট। দ্রৌপদী ও ঐন্দ্রিলা উভয়েই সমান-মানিনী। কথাটী আমরা একটু পরিষ্কার করিতেছি।

ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির প্রেরিত ছদ্মবেশী বনেচর শত্রুগণের গূঢ় অভিপ্রায় অবগত হইয়া দ্বৈতবনে ফিরিয়া আসিল এবং মহারাজ যুধিষ্ঠিরের অনুমতিক্রমে যথার্থ তত্ত্ব বর্ণনা করিল। কর্ম্মবীর দুর্য্যোধন শৌর্য্যে, বীর্য্যে ও গাম্ভীর্য্যে পুনঃ পুনঃ প্রশংসিত হইলেন। সম্প্রতি তাঁহার রাজ্য যে নির্ব্বোধ এবং অচিরেই তিনি যে কপটার্জ্জিত পৃথ্বীর মহতী কলঙ্ক রেখা সংগ্রামে অজস্র বাণবৃষ্টিপাতে ক্ষালিত করিবেন, তৎকালে ইহাও স্ফুটীকৃত হইল। আর দ্রৌপদী, তাঁহার হৃদয় তখন উদ্বেলিত হইয়া উঠিল। কি যেন এক অনির্ব্বচনীয় শক্তি তাঁহার শিরায় শিরায় সঞ্চরিত হইল। তিনি অমিততেজা দ্রুপদরাজের কন্যা। ক্ষত্রিয় শোণিত তাঁহার প্রত্যেক ধমনীতে প্রবাহিত। যে শোণিতের বিন্দুমাত্র শিরায় প্রবাহিত হইলে শত্রুর গৌরব-কাহিনী মুহূর্ত্তের জন্যও শুনিতে পারা যায় না, আজ দ্রৌপদীর শিরায় শিরায় সেই উত্তপ্ত রুধিরধারা প্রতিমুহূর্ত্তে প্রবাহিত। তিনি কি শত্রুর গৌরব-কাহিনী শুনিতে পারেন? দ্রৌপদী, বিশ্বজয়ী বীরগণের অতি স্নেহের, অতি আদরের কুলবধূ। 'বীরপত্নী' বলিয়া যে একটা অভিমান, সে তাঁহারই আছে। তিনি অপরের উদ্দৃপ্ত গৌরব শুনিতে পারিবেন কেন? যে দ্রৌপদী মহাবীর কর্ণকে 'সূতপুত্র' বলিয়া উপেক্ষা করিতে মুহূর্ত্তের জন্যও কুণ্ঠা বোধ করেন নাই, আজ তাহাদেরই গৌরবের কথা! আর বিশ্বজয়ী বীরপতিগণ নির্ব্বাক্ নিশ্চেষ্ট হইয়া সেই গৌরব কথায় পবিত্র কর্ণকুহর কলুষিত করিতেছেন! অভিমানিনী দ্রৌপদীর হৃদয় কি ইহা সহ্য করিতে পারে? তাঁহার হৃদয় ফাটিয়া গেল। মর্ম্ম ছিন্ন ভিন্ন হইয়া গেল। তিনি উচ্ছ্বসিত শোকাবেগ কিঞ্চিৎ স্তম্ভিত করিয়া গম্ভীর স্বরে বলিতে লাগিলেন,—

"ভবন্তমেতর্হিমনস্বিগর্হিতে বিবর্ত্তমানং নরদেব! বর্ত্ম নি।
কথং ন মন্যুর্জ্জ্বলয়ত্যুদীরিতঃ শমীতরুং শুষ্কমিবাগ্নিরুচ্ছিখঃ॥"

ভাঃ, ১ম সঃ, ৩২ শ্লোঃ।

"আপনি চলিছ পথে মনস্বি-ঘৃণিত—
এ হেন দুর্দ্দশা, দেব, ভাবি মনে মনে
কেমনা উঠিছ জ্বলি, ক্রোধে প্রজ্বলিত
জ্বলে যথা শুষ্ক শমী জ্বলন্ত আগুনে।" নবীনচন্দ্র।

"অবন্ধ্যকোপস্য বিহন্তুরাপদাং ভবন্তি বশ্যাঃ স্বয়মেব দেহিনঃ।
অমর্ষশূন্যেন জনস্য জন্তুনা ন জাতহার্দ্দেন চ * বিদ্বিষাদরঃ॥"

ভাঃ, ১ম সঃ, ৩৩ শ্লোঃ।

"অব্যর্থ যাহার কোপ বিপদ বিনাশে,
আপনি তাহার বশে আ'সে জীবগণ ;
কোপহীন সুহৃদেরে কেবা ভালবাসে ?
রিপুরাও কোপহীনে না করে গণন।" নবীনচন্দ্র।

"পরিভ্রমঁল্লোহিত চন্দনোচিতঃ পদাতিরন্তর্গিরিরেণুরূষিতঃ।
মহারথঃ সত্যধনস্য মানসং দুনোতি নো কচ্চিদয়ং বৃকোদরঃ॥"

ভাঃ, ১ম সঃ, ৩৪ শ্লোঃ।

"মহারথী ভীম এবে ধূলিতে ধূসর,
হ'ত যাঁর দেহ রক্তচন্দনে চর্চ্চিত,
ভ্রমিছেন পদব্রজে পর্ব্বত ভিতর ;
মন তব, সত্যধন, নহে কি ব্যথিত ?'' নবীনচন্দ্র।

"পুরাধিরূঢ়ঃ শয়নং মহাধনং বিবোধ্যসে যঃ স্তুতিগীতিমঙ্গলৈঃ।
অদভ্রদর্ভামধিশয্য স স্থলীং জহাসি নিদ্রামশিবৈঃ শিবারুতৈঃ॥''

ভাঃ, ১ম সঃ, ৩৮ শ্লোঃ।

"মহামূল্য শয্যা হ'তে জাগিতে রাজন্,
পূর্ব্বে তুমি সুমঙ্গল সঙ্গীত শ্রবণে
শিবার অশিব রব ভাঙ্গিছে এখন
নিদ্রা তব, তৃণময় ভূতল শয়নে।'' নবীনচন্দ্র।

"দ্বিষন্নিমিত্তা যদিয়ং দশা ততঃ সমূলমুন্মূলয়তীব মে মনঃ।
পরৈরপর্য্যাসিতবীর্য্যসম্পদাং পরাভবোঽপ্যুৎসব এব মানিনাং॥"

ভাঃ, ১ম সঃ, ৪১ শ্লোঃ।

"আনিয়াছে রিপু তোমা এরূপ দশায়—
ভাবিলে সমূলে মম বিদরে হৃদয়!
বিপদ্ মানীর পক্ষে উৎসবের প্রায়
নহে যদি শত্রুহস্তে ধনবীর্য্য ক্ষয়।" নবীনচন্দ্র।

"বিহায় শান্তিং নৃপ! ধাম তৎপুনঃ প্রসীদ সন্ধেহি বধায় বিদ্বিষাং।
ব্রজন্তি শত্রূনবধূয় নিঃস্পৃহাঃ শমেন সিদ্ধিং মুনয়ো ন ভূভৃতঃ॥''

ভাঃ, ১ম সঃ, ৪২ শ্লোঃ।

---

* বৈদ্যনাথপুরবাসী নৈয়ায়িক স্বর্গীয় সর্ব্বেশ্বর তর্করত্ন মহোদয়ের হস্তলিখিত পুস্তকে 'চ' এই পাঠ আছে।

"শান্ত ভাব ত্যজি অরি বধের কারণ
ধর পুনঃ তেজোগুণ, এ মম মিনতি,
দমি রিপু শমগুণে লভে মুনিগণ
কামনাবিহীন শান্তি, না পারে নৃপতি।" নবীনচন্দ্র।

"অথ ক্ষমামেব নিরস্ত বিক্রমশ্চিরায় পর্য্যেষি সুখস্য সাধনং।
বিহায় লক্ষ্মীপতিলক্ষ্ম কার্ম্মুকং জটাধরঃ সন্ জুহুধীহপাবকং॥"
ভাঃ, ১ম সঃ, ৪৪ শ্লোঃ।

"ত্যজি নিজ পরাক্রম চিরকাল তরে
যদি মনে কর ক্ষমা সুখের সাধন,
রাজ-শৌর্য্য-চিহ্ন ধনু নিক্ষেপিয়া দূরে
জটাধারী হ'য়ে বনে সেব হুতাশন।" নবীনচন্দ্র।

আবার ঐন্দ্রিলার চরিত্রটী স্মরণ করিতে হইবে। অমিততেজা বৃত্রাসুরের প্রচণ্ড প্রতাপে দেবগণ বিপর্য্যস্ত এবং বিতাড়িত। বৃত্র এখন স্বর্গের অধীশ্বর, আর ঐন্দ্রিলা তাঁহার মহিষী। কিন্নরী বিদ্যাধরী প্রভৃতি সুরবালাগণ প্রত্যহই ঐন্দ্রিলার পদসেবা করিয়া থাকে। কামপ্রিয়া রতি স্বয়ং সাজ সজ্জা লইয়া ঐন্দ্রিলাকে সুসজ্জিত করে। স্বর্গের পারিজাত, স্বর্গের নন্দন কানন এ সমস্তই এখন ঐন্দ্রিলার আয়ত্তে। ছয় রাগ ছত্রিশ রাগিণী মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া ঐন্দ্রিলার মনস্তুষ্টি সাধনে ব্যাপৃত। কিন্তু এত বিভব, এত ঐশ্বর্য্যের অধীশ্বরী হইয়াও ঐন্দ্রিলা তৃপ্ত নহেন। তাঁহার স্ফূর্ত্তি নাই, সুখ নাই, শান্তি নাই। সর্ব্বশরীরে তাঁহার বিষাদের রেখা পরিস্ফুট। সত্য বটে,—স্বামীর অতুল বিক্রমে ইন্দ্রাদি সমস্ত দেবগণ সন্ত্রস্ত এবং পলায়িত।—কিন্তু সেই গৌরবিনী পতিব্রতা ইন্দ্রাণীর গৌরব এখনও ত অক্ষুন্ন হইয়া রহিয়াছে; স্বামী, পুত্র, আত্মীয় সমস্তই হারা হইয়া এখনও ত সে গৌরবিনী, এখনও ত সে স্বর্গের রাণী, ত্রিভুবনের ঈশ্বরী ঐন্দ্রিলার পদসেবায় ব্যাপৃত নহে? অভিমানিনী স্ত্রী কখনও কি ইহা সহিতে পারে? ঐন্দ্রিলার ইহা অসহ্য হইল। তাহার হৃদয়ে শত বৃশ্চিক দংশন করিতে লাগিল। অভিমানে তাহার হৃদয় ভরিয়া গেল। তিনি স্বামীকে বলিলেন,—

"শুন দৈত্যেশ্বর, শুন শুন বলি,
বৃথা এ বিলাস বৃথা এ সকলি,
এখনও আমরা বিজেতা নয়।
বিজিত যে জন, বিজয়ী চরণ
নাহি যদি সেবা করিল কখন,
সে হেন বিজয়ে কিবা ফলোদয়!

তুমি স্বর্গপতি আজি, দৈত্যেশ্বর,
আমি তব প্রিয়া খ্যাত চরাচর,
ধিক্ লজ্জা তবু সাধ না পূরে!
কটাক্ষে তোমার আশু প্রাপ্য যাহা,
তব প্রিয় নারী নাহি পায় তাহা,
তবে সে কি লাভ থাকি এ পুরে?

ভাল ভেবে যদি বাসিতে হে ভাল,
সে বাসনা পূর্ণ হ'ত কত কাল,
সহিতে হ'ত না লালসা-জ্বালা।
ভালবাসা এবে কিসে বা জানাই,
দিয়াছি যা ছিল সে যৌবন নাই,
ভালবেসে বেসে হয়েছি * * ।
* * * দিয়াছ যে সব,
জানি হে সে সব বিভব, গৌরব,
তবু সর্ব্বজন পূজিতা নই।
মণিকুলে যথা কৌস্তুভ মহৎ,
নারীকুলে আমি তেমতি মহৎ,
বল, দৈত্যপতি, হয়েছি কই?

ইন্দ্রাণী যদি সে করিত বাসনা,
না পূরিতে কাল পূরিত কামনা,
মরি সে ইন্দ্রের ল'য়ে বালাই।
প্রণয়ী যে বলে প্রণয়ী ত সেই,
না চাহিতে আগে হাতে তুলি দেই,
সে প্রণয়ে এবে পড়েছে ছাই।
এখনও ইন্দ্রাণী জগতের মাঝে,
গৌরবে তেমতি সুখেতে বিরাজে,
এখনও আয়ত্ত হলো না সেহ।
স্বর্গের ঈশ্বরী আমি সে থাকিতে,
কিবা স্বরগ কিবা সে মহীতে,
শচীর মহত্ব ভুলে না কেহ।"

বৃত্রসং, ২য় সঃ।

আবার ঐন্দ্রিলার তেজঃপূর্ণ ভাষা শুনুন,—
মহাদেবের রোষ-শঙ্কায় সন্ত্রস্ত বৃত্রকে তিনি বলিলেন,—

"শুন, ওহে দৈত্যনাথ, সত্য বামা আমি
ঐন্দ্রিলা ত্রিলোকখ্যাত গন্ধর্ব্ব-দুহিতা,
সামান্যা অবলা নহে দানবী ঐন্দ্রিলা,
ঐন্দ্রিলা তোমার ভার্য্যা, শুন হে দানব!
সত্যই যদ্যপি শচী-হরণে ত্র্যম্বক
ক্রুদ্ধ হয়ে ক্রোধানল জ্বালিলা গগনে,
সত্যই যদ্যপি হয় সে উচ্চ নিনাদ
প্রলয় বিষাণ শব্দ—স্তব্ধ কেন তায়?

দৈত্যেশ,—
দানবেন্দ্র নামে ঘোর কলঙ্ক লেপিতে
বাসনা যদ্যপি থাকে, স্বর্গজয়ী নাম
ঘুচাইতে চাও যদি, শচী ফিরে দাও!
ফিরে দাও শচী তার পতির নিকটে,
নিজে ভেটবাহী হ'য়ে নিঃশঙ্ক দানব!
নহে কহ, আমি তার দাসী হ'য়ে যাই,
করযোড়ে ইন্দ্রাণীরে সঁপি ইন্দ্রকরে।"

* * *

বৃত্রসং, দ্বাদশ সর্গ।

দেখা যাইতেছে, দ্রৌপদী ও ঐন্দ্রিলা উভয়েই সম-অভিমানিনী ও সম-তেজস্বিনী। বিপক্ষের উন্নতি, বিপক্ষের গৌরব উভয়েরই অসহ্য। অথচ উভয়েই সমান অভিমান ও সমতেজস্বিতার পাত্র। দ্রৌপদী দ্রুপদ রাজের কন্যা এবং বিশ্বজয়ী বীরগণের আদরের পত্নী, আবার ঐন্দ্রিলা গন্ধর্ব্বরাজের কন্যা, ত্রিভুবনজেতা বৃত্রাসুরের পত্নী। সুতরাং তেজো-গর্ব মনস্বিতা যে কি তাহা উভয়েই বিশেষরূপে অবগত আছেন। মানবিপর্য্যয় পর্য্যালোচনা করিয়া মানিনী দ্রৌপদীর ন্যায় ঐন্দ্রিলাও মণিহারা ফণিনীর ন্যায় উদ্দৃপ্ত হইয়া উঠিলেন, ওজঃপূর্ণ গম্ভীর ভাষায় বাত্যাবিতাড়িত বারিধির ন্যায় স্বামীর হৃদয় বিলোড়িত

করিবার জন্য অগ্রসর হইলেন। সুতরাং দ্রৌপদী ও ঐন্দ্রিলা উভয়েই তুল্য-মাত্রায় মানপরতন্ত্র।

দুর্য্যোধন ও বৃত্র।

এইবার দুর্য্যোধন ও বৃত্রাসুরের কথা। দুর্য্যোধনের চরিত্র যদিও ভারবিতে মুখ্য ভাবে চিত্রিত হয় নাই, তথাপি কবি তাঁহার সম্বন্ধে যে যে কথাগুলি বলিয়াছেন, তাহাই আমাদের চরিত্র-আলোচনায় পর্য্যাপ্ত।

দুর্য্যোধন ও বৃত্রাসুর উভয়েই মহাদাম্ভিক এবং কদর্য্যাচারী। সাধ্বী স্ত্রীর কেশ গ্রহণ ও বলপূর্ব্বক হরণাদি কার্য্যাবলী যে কিরূপ ভয়াবহ, সে বিষয়ে উভয়েই জ্ঞান-শূন্য। দাম্ভিক বৃত্রাসুর পতিব্রতা ইন্দ্রাণীকে বলপূর্ব্বক হরণ করিবার জন্য পুত্র রুদ্রপীড়কে অনুমতি করিল, আর দুর্য্যোধন, তিনিও সাধ্বী দ্রৌপদীকে কেশাকর্ষণ করিয়া হরণ করিবার জন্য দুঃশাসনকে অনুমতি করিলেন। ভীষ্ম প্রভৃতি পূতচরিত্র মহাত্মগণ জ্ঞানালোক বিস্তৃত করিয়াও দুর্য্যোধনের মদান্ধকারিতা বিদূরিত করিতে পারেন নাই। আর প্রজ্ঞাবান্ অমাত্য প্রভৃতি বন্ধুবর্গের মার্জ্জিত যুক্তিতর্কও বৃত্রাসুরের ক্রমস্ফীত কদর্য্যাচারিতা উন্মূলিত করিতে পারে নাই। সুতরাং দুর্য্যোধন ও বৃত্রাসুর উভয়েরই চিত্তবৃত্তি নিতান্ত দুর্দ্দমনীয়।

অর্জ্জুন ও ইন্দ্র।

অর্জ্জুন ও ইন্দ্র উভয়েই তুল্য-হৃদয়, তুল্য-বুদ্ধি ও তুল্য-প্রতিভা। অর্জ্জুন অনাহারে অনিদ্রায় দীর্ঘকাল ধরিয়া তপস্যা করিলেন। কেহই তাঁহার কোনওরূপ বিঘ্ন উৎপাদন করিতে সমর্থ হইল না, আবার ইন্দ্রও অনশনে অবিচলিত মনে কত যুগ যুগান্ত ধরিয়া তপস্যা করিলেন। বিঘ্নের কথা দূরে থাকুক, তাহার নাম গন্ধ পর্য্যন্ত আমরা শুনিতে পাইনাই। সুতরাং মানসিক প্রসন্নতা, গম্ভীরতা, অনাবিলতা উভয়েরই তুল্য। ফল লাভে কালবিলম্ব দেখিয়া তপস্যার প্রতি যে একটা বীতস্পৃহতা, তাহা উভয়েরই হৃদয়ে স্বল্প পরিমাণেও পরিস্ফুট হয় নাই। একাগ্রচিত্তে উভয়েই 'আফলোদয়' তপস্যা করিয়াছিলেন। সুতরাং ধৈর্য্যবান্‌ও উভয়েই তুল্য। অর্জ্জুন পূর্ণ ভোগী ও পূর্ণ বিলাসী হইয়াও সহসা ভোগ-বিলাস-বিরোধিনী কঠোর তপস্যা আচরণ করিয়াছিলেন এবং তৎকালে মুহূর্ত্তের জন্যও বৈষয়িক বিকারে তাঁহার চিত্ত বিক্ষোভিত হয় নাই, আবার ইন্দ্রও হঠাৎ আপনার চিত্তকে নিরুদ্ধ করিয়াছিলেন। ভোগবিলাসের

ছায়ামাত্রও সে হৃদয়ে তখন প্রতিফলিত হয় নাই। সুতরাং ইন্দ্র ও অর্জ্জুন উভয়েই 'যথাকাল স্তম্ভিত চিত্তবৃত্তি'।

দুর্য্যোধন ও বৃত্রাসুরের আত্মনাশের হেতু।

কেবল দুইটী রমণীই, দুর্য্যোধন ও বৃত্রাসুর পরস্পরেরই আত্মনাশের হেতু। দ্রৌপদী ও ইন্দ্রাণী উভয়েই বিপক্ষদ্বয়ের আত্মনাশের মূলে বর্ত্তমান। কেন না, ইন্দ্রাণীকে হরণ না করিলে, ইন্দ্রাণীর বক্ষঃ লক্ষ্য করিয়া ঐন্দ্রিলা পদ উত্তোলন না করিলে বৃত্রের প্রতি মহাদেব ও পার্ব্বতী রুষ্ট হইতেন না। আবার মহাদেব রুষ্ট না হইলে বৃত্রের আয়ুঃসূর্য্য চিরদিনের জন্য অস্তমিত হইত না। কেবল মহাদেব রুষ্ট হইয়াই ত বৃত্রের পতনোপায় ইন্দ্রের নিকট বর্ণনা করিলেন। মহাদেব রুষ্ট না হইলে কি ইন্দ্র 'বজ্র' লাভ করিতে পারিতেন? কখনই না। সুতরাং ইন্দ্রাণী হইতেই যে বৃত্রের পতন ইহা নিঃসংশয়েই বলা যাইতে পারে। আর দুর্য্যোধন, তাঁহারও আত্মনাশের হেতু কেবল দ্রৌপদী। দ্রৌপদী সবলে দুর্য্যোধনের রাজসভায় নীত না হইলে ভীম ও অর্জ্জুন কখনই কঠোর প্রতিজ্ঞা-পাশে আবদ্ধ হইতেন না। অর্জ্জুনের তপস্যার প্রতি এত আসক্তি কেন? কেবল অভিমানিনী দ্রৌপদীর অভিলাষ পূর্ণ করিবার জন্য, কেবল স্ত্রীহরণজনিত যে একটা কলঙ্ক রেখা, তাহা প্রক্ষালিত করিবার জন্য (১)। সুতরাং বুঝা যাইতেছে যে, একমাত্র দ্রৌপদী হইতেই দুর্য্যোধনের অধঃপতনের পথ সম্যক্‌রূপে পরিষ্কৃত।

আমরা যে কয়েকটী ঘটনা ও চরিত্র উদ্ধৃত করিলাম, তাহাদের পরস্পর-সাদৃশ্য অতি প্রস্ফুট ভাবেই পরিলক্ষিত হয়। ইন্দুবালা প্রভৃতি কয়েকজনের চরিত্রের সহিত 'কিরাতার্জ্জুনীয়ে'র ব্যক্তিগত সাদৃশ্য নাই।

'ভারবি'র সহিত 'বৃত্রসংহারে'র সর্ব্বাংশের সাদৃশ্য সমালোচনা করা আমাদের এ প্রবন্ধের লক্ষ্য নহে। উভয় গ্রন্থের কোন্ কোন্ ঘটনা ও কোন্ কোন্ চরিত্রে সাদৃশ্য লক্ষিত হয়, তাহা প্রদর্শন করাই ইহার উদ্দেশ্য।

ঘটনা ও চরিত্রে ভারবির অনুকরণ করিয়াই যে হেমচন্দ্র 'বৃত্রসংহার' প্রণয়ন করিয়াছেন, এমন বলা যায় না। কেন না, গ্রন্থকার বিশেষের অজ্ঞাতসারে তাঁহার কল্পিত ঘটনায় ও চরিত্রে প্রাচীন গ্রন্থবিশেষের ছায়াপাত নিতান্ত অসম্ভাবিত নহে।

---

(১) ভারবির ১১শ সর্গ দ্রষ্টব্য।

পক্ষান্তরে হেমচন্দ্র যদি একখানি সংস্কৃত গ্রন্থের অনুকরণ করিয়া 'বৃত্র-সংহারে'র ন্যায় একটী কবিত্ব পূর্ণ কাব্যগ্রন্থ প্রণয়ন করিয়া বঙ্গ-সাহিত্যের গৌরব বৃদ্ধি করিয়া থাকেন, তাহা হইলে তাঁহার কোনও অগৌরবের কথা নহে, প্রত্যুত গৌরবেরই কথা। 'বৃত্রসংহারে'র ন্যায় সরস সুখপাঠ্য মনোমদ কাব্য বঙ্গভাষায় আর আছে কি?

পণ্ডিত শ্রীযুক্ত হরিহর ভট্টাচার্য্য মহোদয় 'বিষবৃক্ষে'র সহিত 'রত্নাবলী' নাটিকার সাদৃশ্য দেখাইয়াছেন। সংস্কৃত সাহিত্যের প্রতি অমর কবি বঙ্কিমচন্দ্রের যে একটা প্রগাঢ় অনুরাগ ছিল, তাহাই প্রদর্শিত হইয়াছে। বঙ্কিমচন্দ্রের কি ইহা অগৌরবের কথা?

শ্রীমৃত্যুঞ্জয় ভট্টাচার্য্য।

সাহিত্যে সঙ্গীত।

চট্টগ্রামে বিগত সাহিত্য-সম্মিলনে, সুকবি শ্রীযুক্ত বিহারিলাল সরকার মহাশয় বাঙ্গালা সাহিত্যে গানের ও কবিতার প্রভাব সম্বন্ধে প্রবন্ধ পাঠ করিয়া উপেক্ষিতা গীতি-কবিতার প্রয়োজনীয়তা এবং সাহিত্যের সহিত তাহার কতদূর ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ, এই বিষয়ে আলোচনা করিয়া, সঙ্গীতকে গৌরবান্বিত করিয়াছিলেন। এস্থলে আমি "গীতি-কবিতা" মৌলিক অর্থেই ব্যবহার করিয়াছি।

গীতি-কবিতার কথা উঠিলে জটিল সৃষ্টিতত্ত্বের কথা আসিয়া পড়ে।

সঙ্গীত বলিতে সঙ্গীত-বিজ্ঞান বুঝায়, তাহা জানি। গীত, বাদ্য ও নৃত্য এই তিন লইয়া সঙ্গীতশাস্ত্র! আমি এখানে সঙ্গীত বলিতে গীতি-কবিতা বা গান বুঝাইতেছি। গীতি কবিতা বা গানের কথা বলিতে গেলে অবশ্য বিজ্ঞানের কথা আসিয়া পড়িবে। সুতরাং আমি সৃষ্টিতত্ত্বের একটু ক্ষীণ আভাষ প্রথমেই দিতেছি।

যখন বিশ্ব-সৃষ্টির অঙ্কুর পর্য্যন্ত চাক্ষুষ গোচরে আইসে নাই, তখন সব একাকার, জলে জলময়। নারায়ণ সেই মহার্ণবে শয়ন ক'রে সৃষ্টি-রহস্যের কথা ভাবিতেছেন, পদতলে কমলা বসে পদসেবা কচ্ছেন, আর মাঝে মাঝে বলছেন "নারায়ণ"। মার মুখের শ্রীবাণী দিগ্ দিগন্তে ধ্বনিত হয়ে, প্রতিধ্বনি যখন ফিরে আসছে, তখন কাঁপ্তে কাঁপ্তে এসে সুরের শেষটা যখন

নারায়ণের কাণে পৌঁছাচ্ছে তখন নার+অয়ন=অ উ ম অর্থাৎ ওঁ এই প্রণব ধ্বনি হচ্ছে।

তখন স্থষ্টির ভাবনা আর রইল না, যখন স্পন্দন হয়েছে, জলে সেই ধ্বনির ধাক্কা লেগেছে, নীর উদ্বেল হয়েছে, ক্রিয়ারম্ভ হয়েছে, শক্তির বিকাশ হয়েছে। তখন অজর অমর পুরাতন ঋষি মার্কণ্ডেয়, নারায়ণের উদরের মধ্যে বসে এই স্থষ্টি-রহস্যের সাক্ষী দেবার জন্য মহল্লা দিচ্ছেন। ব্রহ্মা জাগরিত হলেন, তার পর প্রবোধিত হয়ে যখন উঠে বস্‌লেন, তখন স্থষ্টিকার্য্য আরম্ভ হল। তখন পীতবাসা, আদিদেব, জনার্দ্দন, আকাশ, পৃথিবী, বায়ু প্রভৃতি স্থাবর জঙ্গম ও অবশিষ্ট সমুদায় স্থষ্টি কল্লেন।

এসব কথা পরাশরাত্মজ বেদের বিভক্তা ব্যাস, সহজ করে, গানে আমাদের উপহার দিয়ে গিয়েছেন। ওঁকার রূপী ছায়া সাতটী সুরের কায়া গঠন করে গোপনে প্রণবে প্রকট হয়ে আছেন। সোমেশ্বর সেই সাতটী সুরকে বিশ্লেষণ করে দেখালেন, যে, বাদী সম্বাদী অনুবাদী হিসাবে পরস্পরের সঙ্গে সম্বন্ধ। সঙ্গীতের স্থষ্টিকর্ত্তা মহাদেব এই সাতটীর নামকরণ কল্লেন, ষড়জ, ঋষভ, গান্ধার, মধ্যম, পঞ্চম, ধৈবত ও নিষাদ, আর এই সাতটীর আদ্যক্ষর নিয়ে সারিগামা-পাধানি বলে সাধন হতে লাগল। সাধনার সুবিধা হল।

সামবেদে গানের চরম পুষ্টিলাভ হল। সঙ্গীতের ঐশ্বর্য্য, অলঙ্কার, তান, গমক, মিড়, মূর্চ্ছনাদির স্থষ্টি হয়ে সঙ্গীতের ধারাবাহিক নিয়ম বিধিবদ্ধ হল। সঙ্গীতের স্রষ্টা হর প্রথম রাগ ভৈরবের স্থষ্টি কল্লেন। এই প্রথমজাত রাগই প্রথম গানের প্রাণ প্রতিষ্ঠা কল্লে। তার পর যত রাগ রাগিণীর স্থষ্টি হল, তারা ভৈরবের কাছে থেকে কিছু না কিছু ঋণ গ্রহণ কল্লে। এ সব সঙ্গীত-শাস্ত্রের আদি কথা। একটু বলা আবশ্যক বিবেচনায় উল্লেখ করিলাম।

ছন্দোময় জগৎ। ভাষা বর্ণের সাহায্যে যখন প্রকাশমান হন, তখন ছন্দের নিগড়ে আবদ্ধ হয়ে পড়েন। কারণ জগতে সবই ছন্দের অধীন।

এই যে আমরা কথা কই, মাত্রা গুণে দেখলে বুঝ্‌তে পারা যায়, সে ছন্দের গণ্ডীমধ্যে বাঁধা পড়ে আছে।

যখন মনে কোন উদ্বেগ নাই, মন পরিষ্কার থাকে, তখন ২, ৪, ৬, ৮, মাত্রায় সমপদী, আবার যখন হঠাৎ সুখে, শোকে, ক্রোধে, স্নেহে আক্রান্ত তখন ভাষা বিষমপদীর আকার ধারণ করে ১, ৩, ৫, ৭, ৯ মাত্রায় প্রকাশ-মান। তবে ভাব প্রকাশের ভাষা গদ্য অপেক্ষা পদ্যে হৃদয়গ্রাহিনী।

স্পন্দন যখন স্থূল তখন সবক'টী সুর কানে পৌঁছায়, যখন সূক্ষ্ম তখন মোটামুটী কানে ধাক্কা লাগে।

বিরোধের বা বিতর্কের কথা নয়, একবার শ্বাস প্রশ্বাসের অভিনয়টা প্রণিধান কল্লে বেশ বুঝতে পারা যায়, সবই যেন তালে তালে (Rhythmical) কেমন ছন্দে উঠছে পড়্ছে। এটা নিশ্চিত বিজ্ঞান, স্বয়ংসিদ্ধ সত্য, প্রত্যক্ষ অনুভূতি এর জবর সাক্ষী, সুতরাং সে কখনও বব্‌বুলে হতে পারে না। যত রকম জেরার মার প্যাঁচ হোক না কেন, তাকে এক চুল হঠাতে পারা যায় না। তবে কি বিকৃতি হয় না? হয়।

যখন আধিব্যাধি এসে পাকড়াও করে, তখন ছন্দের বিচ্যুতি ঘটে। তেম্‌নি সব কাযেই। আবার এই শ্বাস-প্রশ্বাস-ওয়ালা মানুষের দ্বারা তৈয়ারী যে সব কল কব্জা আছে, যেমন রেলের গাড়ী, ষ্টীমার, ঘড়ি ইত্যাদি, এদেরও প্রাণশক্তি ছন্দের কারাগারে কয়েদী।

ধ্বন্যাত্মক ছন্দ দুই প্রকার। নার্থ ও সার্থ। নার্থ হচ্ছে কোন রকম দ্রব্যের আঘাত বা পতন। আর সার্থ হচ্ছে, খোল, পাখওয়াজ বা তবলার বাজনা। ধ্বন্যাত্মক ছন্দে রেলের গাড়ী চলছে, মৃদঙ্গ বাজছে, ঘোড়া ছুট্‌ছে, ষ্টীমার এগোচ্ছে, কানে ছন্দের একটা মনোমদ ধ্বনি এসে লাগছে; ঘোড়া যে চালে ছুট্‌ছে, তার সেই রকম ছন্দ বাজ্‌ছে, দুল্‌কি বল্‌ছে ঃ—'তেরে কেটে'। রেলের গাড়ী আওয়াজ দিচ্ছে ঃ—ধা ধিণ্‌ ধাগেতেটে, তরপর একটু দুন্‌ ঃ—তাকা তাকা ধুমাকেটে, চৌদুনে ঃ—ধেরেকেটে কৎ ইত্যাদি। ঘড়ি পটতালে, ঠক্‌ঠক্‌ করে কেবল একতাল দিয়ে যাচ্ছে। এই রকম করে জগতের সকলেই ছন্দ আওড়াচ্ছে। ভগবানের রাজ্যে ছন্দ ছাড়া কিছুতেই চলতে পারে না।

সেই ছন্দ যখন বর্ণাত্মক, তখনই গান, স্তব, "পাখী সব করে রব" কবিতার আকারে ছন্দের মধ্যে বাঁধা। এই কবিতা আবার চার প্রকারে সম্পদশালিনী, তারা হচ্ছে, ভাব, রাগ, ভাষা ও অলঙ্কার। যেমন ধ্রুপদ গাইতে হলে, চারটী জিনিসের উপর নজর রাখ্‌তে হয়, যথা—রাগাঙ্গ, ভাষাঙ্গ, ক্রিয়াঙ্গ ও উপাঙ্গ। সেই রকম কবিতার ঐশ্বর্য্য চার প্রকার। এই কবিতা দুই ধারায় নিবদ্ধ, গীতি-কবিতা ও পদ্য-কবিতা। পদ্য-কবিতার অক্ষর গুণে ঠিক ঠিক সাজিয়ে বসাতে হয়, ইহাকে অক্ষরাবৃত্ত বলে। কিন্তু গীতি-কবিতার ঝোঁক, যাকে যতি বলে, গানের সমের মত মাত্রার উপর বেশী নজর রাখতে হয়, অতএব অক্ষরাবৃত্ত ও মাত্রাবৃত্ত এই দুই দিকেই বিশেষরূপে সাবধান্‌ হতে হয়। প্রতি

ছন্দের অক্ষরে অক্ষরে মিল না হইলেও, 'মাত্রা ও লয়ে' মিল থাকা একান্ত আবশ্যক। এবং সময়ে সময়ে লয় বোধের উপর ছন্দের জীবন নির্ভর করে। তখন অক্ষর ও মাত্রার সমাংশ তত আবশ্যক হয় না, ভগ্নাংশ ও আড়ি মাত্রার উপর দিয়া চলে, তাহাকে বাট বলে। ইহাই গীতি-কবিতার চরম উন্নতি, তবে দুঃখের বিষয়, এরূপ গীতি-কবিতা আমাদের ভাষায় বড় কম চলে।

পদ্য-কবিতায় যখন ভাব, রাগ, ভাষা ও অলঙ্কার প্রতিষ্ঠাবান, তখন দৃশ্য-কাব্য ও উপন্যাসের নায়ক নায়িকার মত প্রাণের তারে ঘা মারিয়া যেন কথা কয় ও মন্ত্রের মত কার্য্য করে।

বাবরের বৈজু, হুমায়ুনের গোপাল, ও আকবরের তানসেন যখন চারি জাতি ধ্রুপদের সৃষ্টি কল্লেন তখন গীতি-কবিতার পূর্ণ অবয়ব দৃষ্টিগোচর হল, এবং সেই সব ধ্রুপদ সনন্দ পেলে, অর্থাৎ দরবারে গাইবার উপযুক্ত হল। আর আর যা সব আছে, তার তত কদর নাই। নওল কিশোরের ধ্রুপদ এই জাতীয়। তার পর মহাম্মদ শার দরবারে সদারঙ্গ যখন খেয়ালের সৃষ্টি কল্লেন, তখন আর একটী নূতন গীতি-কবিতার ছক বাঁধা হল। তার কিছু-দিন পরে শোরী মিঞা যখন পাঞ্জাবী ভাষায় টপ্পার সৃজন কল্লেন, তখন গীতি-কবিতার উৎকর্ষের আর কিছু বাকী রইল না।

উল্লাসে, বিলাসে, উৎসবে, ধর্ম্মে, কর্ম্মে ও সামাজিক ব্যাপারে সঙ্গীত না হলে তখন মোটেই চল্‌তো না। এখনও আমরা তার ক্ষীণ অনুকরণ ধারাটা বজায় রেখেছি, এটী সুখের কথা বল্‌তে হবে।

মুসলমানের আমল থেকে, এদেশে যাত্রা, পাঁচালী, হাফ আখ্‌ড়াই, কবি ইত্যাদি ছিল। ইংরাজ আস্‌বার পরে, রঙ্গালয়ের এখনকার আকৃতি ও অবয়ব না থাক্‌লেও পৌরাণিক সম্রাট ও রাজাদের যে নাট্যশালার অস্তিত্ব ছিল, পুরাণে তাহা পাই ও পরবর্ত্তী কালে রাজা রাজড়াদের সময়ে অভিনয়াদি যে হইত ইতিহাসে তার প্রমাণ পাই। নেপালে এখনও নাট্যশালা বিদ্যমান।

এখনকার মত পিলু বারোঁয়ায় বা পাহাড়ীতে আবৃত্তি না থাক্‌লেও ভরত-প্রবর্ত্তিত আইন কানুনে বিধিবদ্ধ ছিল। একবগ্‌গা সমালোচনা ছিল না, কেননা, সমালোচকেরা সর্ব্ববিষয়ে বিজ্ঞ ছিলেন। সব দিক দেখে শুনে তার উন্নতির জন্য তাঁরা প্রাণপণে খাট্‌তেন, তার প্রমাণ এখনও ভূরি ভূরি পাওয়া যায়। সঙ্গীত শাস্ত্রের ষোলকলা উজ্জ্বল ছিল। ৯৭ খানি বিভিন্ন প্রকারের গীত, বাদ্য ও নৃত্যের সংস্কৃত গ্রন্থ তখন প্রচলিত ছিল। কালের মায়া বা কালধর্ম্মে তার

অধিকাংশ এখন কালের কবলে লীন। যদি কখনও এমন দিন আসে তা'হলে আবার সেই সব গ্রন্থের পুনরাবাহন হয়ে বহুল প্রচলন হবে।

ত্রিবাঙ্কুরে ও তাঞ্জোরে এখনও সংস্কৃতে নাটকাভিনয় হয়। সেখানে এখনও দক্ষিণী সঙ্গীতের বিদ্যালয় আছে। প্রতিবৎসরে পরীক্ষায় বহু বহু ছাত্র উপাধিধারী হইতেছে। তাহাদের রঙ্গালয়ে শাস্ত্রসঙ্গত রাগ রাগিণী গানের প্রাণ প্রতিষ্ঠা করে।

দুরদৃষ্ট আমাদের, আধুনিক নাট্যশালায় মদন বর্ম্মণ ও বেণীবাবুর সঙ্গে সঙ্গে প্রায় সে সব মুছে গেছে, আর গানের সুর মর্ম্মে প্রবেশ করে না। দিন কতক বেণীবাবুর আমলে, নব-রস-সুধা-ক্ষরিত, নাট্যসম্রাট গিরিশবাবুর দৃশ্যকাব্য ও গীতি-নাট্যের গানে রাগ রাগিণীর চল্‌বার ফেরবার রাস্তা পাওয়া যাচ্ছিল, এখন সে রাস্তার পাত্তা পাওয়া যায় না। কিযে একটা জগাখিচুড়ী হয়েছে, তার না আছে স্বাদ, না আছে গন্ধ। সময়ান্তরে বিশদরূপে বিশ্লেষণ করে দেখাবার ইচ্ছা রইল।

এখনকার তথা কথিত সঙ্গীতাচার্য্য ও সঙ্গীত শিক্ষকদের বিদ্যাবত্তা দেখ্‌লে বোধ হয় এঁরা অধিকাংশই জলটুঙ্গিতে বাস করেন, আর সবাই যেন তানসেনের অন্তরঙ্গ।

কিছুদিন পূর্ব্বে ৩৭ রকম ছন্দ প্রচলিত ছিল। এখন বড় জোর ১৪।১৫ রকম চল্‌ছে। গানের তালও প্রায় সেই অনুপাতে কম হয়ে গেছে। একটী আদর্শ না থাক্‌লে তার অনুকরণ হবে কোথা থেকে! কেন না আবিষ্করণের ক্ষমতায় যবনিকা পতন হয়েছে।

তিনটী যুগে আমাদের স্বরগ্রাম যেমন সম্পূর্ণ হয়েছে, সেই রকম তিনটী যুগে আমাদের সঙ্গীত সম্পূর্ণ হয়েছে। ইউরোপে ছয়টী যুগে সপ্তক শুধু কড়ি ও কোমল নিয়ে নাড়াচাড়া কচ্ছে, এখনও শ্রুতির হিসাব তারা পায় নি। সে সব অনেক কথা।

একালের প্রথম সৃষ্টি ধ্রুবপদ বা ধ্রুপদ, দ্বিতীয় খেয়াল, তৃতীয় টপ্পা। ধ্রুপদে শ্রীভগবানের স্তব স্তুতি, পূজা আরাধনা, খেয়ালে বাদশাহের বা রাজার স্তুতি ও টপ্পায় প্রেম সঙ্গীত। টপ্পার শ্রীঅঙ্গে ঠুংরী ও গজল স্থান পেয়ে একটু ধন্য হয়েছে। এখন অনেকেই টপ্পার সুরে শ্যামা বা সাধন-সঙ্গীতের প্রাণ-প্রতিষ্ঠা করে কৃতার্থ হচ্ছেন, আর সঙ্গে সঙ্গে থাক বা স্তর থেকে গড়িয়ে গিয়ে কোথায় যে পড়্‌ছেন, সেকথা সময় পাইত বলর।

শ্রীশরৎচন্দ্র সিংহ।

জৈন তীর্থঙ্কর মহাবীর স্বামী।

বৌদ্ধ মতের অনুপাতে বঙ্গভাষায় জৈন মতের আলোচনা অল্পই হইয়া থাকে। কিন্তু ভারতীয় সাহিত্য ও ইতিহাসের অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইলে জৈন গ্রন্থের পরিশীলন অবশ্য-কর্ত্তব্যের মধ্যে গণ্য হইয়া পড়ে। জৈন শাস্ত্রে 'জৈন' শব্দের এইরূপ ব্যুৎপত্তি কথিত হইয়াছে ;—"রাগদ্বেষাদিদোষাণ্ বা কর্ম্মশত্রূন্ জয়তীতি জিনঃ, তস্যানুযায়িনো জৈনাঃ।" অর্থাৎ যাঁহারা রাগদ্বেষাদি অষ্টাদশবিধ দোষ অথবা জ্ঞানাবরণীয়াদি কর্ম্মশত্রু সমূহকে জয় করিতে পারিয়াছেন, তাঁহারাই 'জৈন' আখ্যা প্রাপ্ত হন, আর যাঁহারা এই জিনের মতানুযায়ী উপাসক, তাঁহাদের নাম জৈন।

আজ পর্য্যন্ত ২৪ জন জিনের প্রাদুর্ভাব হইয়াছে। ইহাঁদিগকে তীর্থঙ্কর বলা হয়। ঋষভদেব প্রথম তীর্থঙ্কর, ইনিই জৈন ধর্ম্মের সংস্থাপক। ঋষভদেবের পর ক্রমশঃ—অজিত, সম্ভব, অভিনন্দন, সুমতি, পদ্মপ্রভ, সুপার্শ্ব, চন্দ্রপ্রভ, পুষ্পদন্ত, শীতলনাথ, শ্রেয়াংস, বাসুপূজ্য, বিমল, অনন্ত, ধর্ম্ম, শান্তি, কুন্থু, অরহ, মল্লিনাথ, মুনিসুব্রত, নমিনাথ, অরিষ্টনেমী ও পার্শ্বনাথ—এই দ্বাবিংশতি তীর্থঙ্করের প্রাদুর্ভাব হয়। পার্শ্বনাথের আড়াইশত বৎসর পরে অন্তিম তীর্থঙ্কর মহাবীর স্বামী আবির্ভূত হন।

রাজার ঔরসে মহাবীরের জন্ম। ইহাঁর পিতার নাম সিদ্ধার্থ। জৈনেরা বলিয়া থাকেন, রাজা সিদ্ধার্থ, পবিত্র রঘুবংশে উৎপন্ন হইয়াছিলেন। মহাবীর স্বামী উত্তর হিন্দুস্থান কুণ্ডলপুরে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। ইহাঁর মাতা ত্রিশলা নামে অভিহিত হইয়াছেন। "আর্য্যবিদ্যাসুধাকর" নামক গ্রন্থে মহাবীরের আবির্ভাব-কাল সম্বন্ধে কথিত হইয়াছে,—

"ততঃ কালেনাত্র খণ্ডে ভারতে বিক্রমাৎ পুরা।
খমুখস্তোধি (৪৭০) মিমিতে বর্ষে বীরাহ্বয়ো নরঃ।
প্রাচারয়জ্জৈন ধর্ম্মং বৌদ্ধধর্ম্ম সমপ্রভম্।"

অর্থাৎ বিক্রম সম্বতের ৪৭০ বর্ষ পূর্ব্বে (খৃঃ পূঃ ৫২৬) মহাবীর স্বামী জৈন ধর্ম্মের প্রচার করিয়াছিলেন।

পিতা সিদ্ধার্থ, ইহাঁর 'বর্দ্ধমান' নাম রাখিয়াছিলেন, কিন্তু ইহাঁর ঐশ্বর্য্য-

বস্থায় মহাবীর স্বামী নামই অধিক বিখ্যাত। মহাবীর পিতার মধ্যম পুত্র; ইহাঁর জ্যেষ্ঠের নাম, নন্দিবর্দ্ধন, কনিষ্ঠের নাম সুপার্শ্ব। সুদর্শনা নামে ইহাঁর এক ভগিনীও বর্ত্তমান ছিল।

মহাবীর স্বামী সংস্কৃত ও প্রাকৃত ভাষায় ব্যুৎপন্ন ছিলেন। পিতা ইহাঁকে রাজকার্য্যে আসক্ত করিবার জন্য যত্ন করিতেন, কিন্তু বাল্যকাল হইতেই ইহাঁর চিত্ত বৈরাগ্যের পথে অগ্রসর হইতে চলিল। মহাবীর, পার্থিব রাজত্বের প্রলোভন পরিত্যাগ করিয়া ঋষভদেব-প্রদর্শিত জৈন ধর্ম্মের অবাধ রাজত্ব করিবার জন্ম ব্যাকুল হইয়া উঠিলেন। রাজা সিদ্ধার্থ, পুত্রের এইরূপ সংসার-বিরক্তি লক্ষ্য করিয়া মহাবীরের বিবাহের আয়োজন করিতে লাগিলেন। পিতার সনির্ব্বন্ধ আদেশে মহাবীর, যশোদা নামক এক পরমা সুন্দরী কন্যার পাণিগ্রহণ করিলেন। কালে এই যশোদার গর্ভে মহাবীরের ঔরসে প্রিয়দর্শনা নাম্নী এক কন্যার জন্ম হয়। মহাবীর স্বীয় এক শিষ্যের সহিত এই কন্যার বিবাহ দিয়াছিলেন (১)।

অষ্টাবিংশতি বর্ষ বয়সের সময় মহাবীরের চিত্ত সংসারের প্রতি একেবারেই বীতশ্রদ্ধ হইয়া পড়িল। সংসারি-জীবনের দুরন্ত যন্ত্রণা তিনি মর্ম্মে মর্ম্মে অনুভব করিলেন। জ্যেষ্ঠ সহোদর নন্দিবর্দ্ধনের ইচ্ছা, লোকপ্রিয় মহাবীর, সর্ব্বদা রাজকার্য্যে ব্যাপৃত থাকেন। নন্দিবর্দ্ধন একদিন কনিষ্ঠকে বলিলেন.—"ভাই বর্দ্ধমান, রাজকার্য্যে চিত্ত নিবিষ্ট করাই ক্ষত্রিয়ের স্বাভাবিক ধর্ম্ম। তুমি রাজ্যের উন্নতির জন্য চেষ্টা কর, প্রজাবর্গকে বশীভূত কর। এমন কাজ কর, যাহাতে আমাদের রাজবংশ সর্ব্বজনপ্রসিদ্ধি লাভ করিয়া উন্নতির চরম সোপানে আরোহণ করিতে সমর্থ হয়।"

মহাবীর একটু হাসিয়া বলিলেন, "দাদা, তুমি এই পার্থিব দেশের রাজা হও, আমি আর এক পথে রাজত্ব করিবার চেষ্টা করিব। তুমি শত্রুদমনের

(১) জৈন সম্প্রদায় দ্বিবিধ ;—শ্বেতাম্বর ও দিগম্বর। যে সম্প্রদায়ের আচার্য্য শুভ্র বস্ত্র পরিধান করে, তাহাদিগকে শ্বেতাম্বর, আর যাহাদিগের আচার্য্য নগ্ন, তাহাদিগকে দিগম্বর সম্প্রদায় বলে। মহাবীরের জন্ম এবং বিবাহাদি সম্বন্ধে এ পর্য্যন্ত যাহা লিখিত হইয়াছে, তাহা শ্বেতাম্বর সম্প্রদায়ের গ্রন্থাবলী পাঠে অবগত হওয়া যায়। দিগম্বর সম্প্রদায়ের মতে মহাবীর, রাজা সিদ্ধার্থের একমাত্র পুত্র,—তাঁহার ভ্রাতা ভগিনী ছিল না; এবং তিনি বিবাহও করেন নাই—বাল্যাবধি ব্রহ্মচর্য্য প্রতিপালন করিয়াছিলেন। দিগম্বর মতে মহাবীরের জন্মও রঘুবংশে নহে—'নাথ' বংশে।

জন্য আজীবন ব্যর্থ আয়োজন কর, আর আমি কাম ক্রোধাদিকে জয় করিয়া সংসারে শান্তির পবিত্র ধারা বহাইব। তুমি রত্নসিংহাসনে উপবেশন কর, আমি জীববৃন্দের হৃদয়-সিংহাসন অধিকার করিয়া থাকিব। তুমি প্রাদেশিক রাজ্য ভোগ কর, আমি জগতের সকল লোককে বশীভূত করিয়া লইব।"

জ্যেষ্ঠ নীরব হইলেন—মহাবীরের এই উত্তেজনাময়ী ভাষার তিনি প্রতিবাদ করিতে পারিলেন না। ত্রিংশৎবর্ষ বয়ঃক্রম পূর্ণ হইলেই মহাবীর সংসারাশ্রম পরিত্যাগ করিলেন। পিতার বাৎসল্য, মাতার স্নেহ, ভ্রাতার প্রণয়, পত্নীর প্রেম—কিছুই তাঁহাকে বাঁধিয়া রাখিতে পারিল না।

মহাবীর গৃহ ত্যাগ করিয়া অরণ্যে গিয়া সন্ন্যাস গ্রহণ করিলেন—কঠিন ব্রত পালন করিয়া তপস্যায় লিপ্ত হইলেন। মহাবীর অনাহারে বহুদিন কঠোর তপশ্চর্য্যা করিলেন। অংশুমালী পূর্ব্বদিকে উদিত হইয়া পশ্চিমে ঢলিয়া পড়িলেন, তাঁহার শরীরের বিন্দুমাত্র স্পন্দন নাই, মস্তকের উপর কত অবিশ্রান্ত বৃষ্টিপাত হইল, তাঁহার চৈতন্য নাই। এই ভাবে মহাবীরের তপঃকাল পূর্ণ হইলে একদিন এক যক্ষ আসিয়া তাঁহাকে বলিল, "প্রভু, আপনি তপস্যায় সিদ্ধিলাভ করিয়াছেন; এখন দেশের হিতের জন্য, ধর্ম্মের উন্নতির জন্য আপনার মহার্ঘ জীবন নিয়োজিত করুন।"

অতঃপর মহাবীর স্বামী শ্রাবস্তী নগরে আসিয়া জৈনধর্ম্মের প্রচার করিলেন। শ্রাবস্তী হইতে মহাবীর কুশালী নগরীতে উপনীত হইলে রাজা শ্রেণিক, তাঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করিলেন। এই সময়ে বহুলোক তাঁহার অনুগামী হইয়া উপদেশ-প্রার্থী হইলেন। মহাবীর অল্প কথা বলিতেন, কিন্তু যাহা বলিতেন, তাহা বহুমূল্য। ইহাঁর সুন্দর উপদেশরাজি লোকচিত্তকে মুগ্ধ করিয়া ফেলিত। মাধি দেশেও মহাবীর স্বামীর অনেক শিষ্য হইয়াছিল। ইহাঁর শিষ্যগণের মধ্যে ইন্দ্রভূতি ও সৌধর্ম্ম প্রধান। মহাবীরের নির্ব্বাণলাভের পর ইহাঁদের উভয়ের চেষ্টায় জৈনধর্ম্মের প্রচার-বাহুল্য সংঘটিত হয়।

মহাবীর স্বামী ৩০ বৎসর পর্য্যন্ত সংসারে ছিলেন, ইহার পর বার বৎসর কাল তপস্যা করেন। ৭২বর্ষ বয়ঃক্রমের সময় বিহার প্রদেশে ইহাঁর দেহত্যাগ হয়। গৌতম বুদ্ধ মহাবীরের সমসাময়িক ছিলেন।

মহাবীর স্বামীর তিরোধানের পর জয়ধবল, তত্ত্বার্থসূত্র, ন্যায়কুমুদ চন্দ্রোদয়, প্রমেয়কমলমার্ত্তণ্ড প্রভৃতি বহু জৈন দার্শনিক গ্রন্থ প্রণীত হয়। আমাদের ন্যায়দর্শনের মতন জৈনদর্শন নানাবিধ যুক্তিতর্কে পরিপূর্ণ। জৈনদর্শনের আলোচনা করিলে অনেক নূতন বিচার-পদ্ধতি জানিতে পারা যায়।

জৈনদর্শন বেদবিরুদ্ধ হইলেও চার্ব্বাকাদি দর্শনের ন্যায় "ভস্মীভূতস্য দেহস্য পুনরাবর্ত্তনং কুতঃ"—এইরূপ দেহাত্মবাদ প্রচার করে না, জৈনাচার্য্যগণ "বৈরাগ্যং ভজ ভাবয় নিয়তং ভেদং শরীরাত্মনোঃ" (যোগপ্রদীপ, ৪২।২) এই ভাবে শরীরের সহিত জীবের পারমার্থিক ভেদচিন্তারই উপদেশ দিয়াছেন। অনাদি অবিদ্যায় মুগ্ধ হইয়াই প্রাণিবৃন্দ শরীরাদির সহিত আত্মার অভেদ মনে করিয়া থাকে। শুভচন্দ্রাচার্য্য লিখিয়াছেন—

"অনাদি প্রভবঃ সোঽয়মবিদ্যা বিষমগ্রহঃ।
শরীরাদীনি পশ্যন্তি যেন স্বমিতি দেহিনঃ॥"

—যোগপ্রদীপ, ৩২।১৯

জৈনদর্শনকারদিগের মতে আত্মা ত্রিবিধ;—বহিরাত্মা, অন্তরাত্মা ও পরমাত্মা। যে পুরুষ মোহনিদ্রার প্রভাবে চেতনাশূন্য হইয়া শরীরাদিকে আত্মা বলিয়া মনে করে, তাহারই নাম বহিরাত্মা। যিনি বাহ্য ভাব সমূহ অতিক্রম করিয়া আত্মাতেই আত্মনিশ্চয় করিতে পারিয়াছেন, তিনিই অন্তরাত্মা। আর যিনি নির্লেপ, নিরবয়ব, রাগদ্বেষাদিশূন্য, সর্ব্বসম্পন্ন, নিত্যসুখময় ও নির্ব্বিকল্প, তাঁহাকেই পরমাত্মা বলিয়া কীর্ত্তন করা হয়।

"ত্রিপ্রকারং স ভূতেষু সর্ব্বেষাত্মা ব্যবস্থিতঃ।
বহিরন্তঃ পরশ্চেতি বিকল্পৈর্বক্ষ্যমাণকৈঃ॥
আত্মবুদ্ধিঃ শরীরাদৌ যস্য স্যাদাত্মবিভ্রমাৎ।
বহিরাত্মা স বিজ্ঞেয়ো মোহনিদ্রাস্তচেতনঃ॥
বহির্ভাবানতিক্রম্য যস্যাত্মন্যাত্মনিশ্চয়ঃ।
সোঽন্তরাত্মা মতস্তজ্জ্ঞৈর্বিভ্রমধ্বান্ত ভাস্করৈঃ॥
নির্লেপো নিষ্কলঃ শুদ্ধো নিষ্পন্নোঽত্যন্তনির্বৃতঃ।
নির্ব্বিকল্পশ্চ শুদ্ধাত্মা পরমাত্মেতি বর্ণ্যতে॥"

—যোগপ্রদীপ, ৩২।৫-৮

জৈন দার্শনিকগণ ছয় প্রকার পদার্থ স্বীকার করিয়াছেন;—জীব, পুদ্গল, ধর্ম্ম, অধর্ম্ম, কাল ও আকাশ। সংসারী ও মুক্তভেদে জীব দ্বিবিধ। সংসারী জীব আবার দুই প্রকার,—ত্রস ও স্থাবর। দ্বীন্দ্রিয়, ত্রীন্দ্রিয়, চতুরিন্দ্রিয় ও পঞ্চেন্দ্রিয় জীব 'ত্রস' নামে অভিহিত। মনুষ্য, পশু, পক্ষী প্রভৃতি 'ত্রস' জীব। যে জীব একেন্দ্রিয়, তাহার নাম 'স্থাবর'। পৃথিবীকায়, জলকায়, তেজঃকায়, বায়ুকায় ও বনস্পতিকায়—এই পাঁচ প্রকারের জীবকে স্থাবর বলা হয় (১)।

---

(১) "সংসারিণস্ত্রস স্থাবরাঃ"
"পৃথিব্যপ্তেজো বায়ুবনস্পতয়ঃ স্থাবরাঃ"
"দ্বীন্দ্রিয়াদয়স্ত্রসাঃ"—তত্ত্বার্থসূত্র, ২।১২-১৩

জৈনাচার্য্যগণ পঞ্চেন্দ্রিয়বাদী, রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ ও শব্দ—এই পাঁচটী গুণ ক্রমিক ভাবে চক্ষু, জিহ্বা, নাসিকা, ত্বক ও কর্ণের বিষয় হইয়া থাকে (১) উমাস্বামী "নিত্যাবস্থিতান্যরূপাণি" (৫।৪)—এই সূত্রে জীব, কাল, আকাশ, ধর্ম্ম ও অধর্ম্ম—এই পাঁচটী পদার্থের নিত্যত্ব ও অমূর্ত্তত্ব ব্যবস্থাপন করিয়াছেন। এ বিষয়ে ন্যায়দর্শনের সহিত জৈনদর্শনের মতসাম্য আছে। মহর্ষি গৌতম ও মহর্ষি কনাদের মতেও জীব, কাল ও আকাশ নিত্য এবং অমূর্ত্ত।

যে পদার্থে রূপ, রস, গন্ধ ও স্পর্শ—এই চতুর্ব্বিধ গুণ থাকে, তাহাকে পুদ্গল (Matter) বলা হয় (২)। পুদ্গল দ্বিবিধ—স্কন্ধ ও পরমাণু। পুদ্গলের সর্ব্বাপেক্ষা যে ক্ষুদ্র অংশ, অর্থাৎ যাহার আর ভাগ হয় না, তাহার নাম পরমাণু (Atom)। দ্ব্যণুক হইতে আরম্ভ করিয়া পরমাণুপিণ্ড স্কন্ধনামে অভিহিত হয়। স্থূল ও সূক্ষ্ম ভেদে স্কন্ধ নানাবিধ।

যে বস্তু জীব ও পুদ্গলের গমনাদি ক্রিয়ার সহায়ক, তাহার নাম ধর্ম্ম। ধর্ম্মদ্রব্য সর্ব্বব্যাপী, নিরবয়ব, নিষ্ক্রিয় ও এক।

যে পদার্থ জীব ও পুদ্গলের স্থিতির সহায়ক, তাহার নাম অধর্ম্ম। অধর্ম্ম দ্রব্যও এক, বিশ্বব্যাপী এবং নিরবয়ব।

যে পদার্থ সকল বস্তুর অবস্থাপরিবর্ত্তনের কারণ, তাহার নাম কাল। কাল নিরবয়ব, কিন্তু অসংখ্য।

যে দ্রব্য জীব পুদ্গলাদির থাকিবার স্থান প্রদান করে, তাহার নাম আকাশ। আকাশ সর্ব্বব্যাপী, নিরবয়ব, নিষ্ক্রিয় ও এক (৩)।

অতি সংক্ষেপে জৈনদর্শনের অবতরণিকা প্রসঙ্গক্রমে কথিত হইল। প্রবন্ধান্তরে জৈনদর্শনের বিস্তৃত বিবরণ লিখিবার ইচ্ছা রহিল।

শ্রীহরিহর শাস্ত্রী।

---

(১) "স্পর্শনরসন ঘ্রাণচক্ষুঃ শ্রোত্রাণি"
"স্পর্শরসগন্ধবর্ণশব্দাস্তদর্থাঃ"—তত্ত্বার্থসূত্র, ২।১৯-২০

(২) "স্পর্শরসগন্ধবর্ণবন্তঃ পুদ্গলাঃ"—তত্ত্বার্থসূত্র, ৫।২৩

(৩) "আ আকাশাদেক দ্রব্যাণি"
নিষ্ক্রিয়াণি চ"—তত্ত্বার্থসূত্র, ৫।৬-৭

স্বপ্ন-বিবাহ।

(১)

"কিসের গোল বাহিরে?"

"আজ্ঞে ব্রাহ্মণ।"

ব্রাহ্মণ কি? গোপাল চিরকালের মূর্খ, অথচ দুষ্ট। বাবা কেন অমন চাকর আমার সঙ্গে কলিকাতায় পাঠাইয়াছিলেন জানি না। জ্যৈষ্ঠমাসের কাঠ-ফাটা রৌদ্র, একটু বিশ্রাম করিবার জন্য চক্ষের পাতা বুজিয়াছি, আর অমনই গোলমাল—হৈ চৈ!

আমি বলিলাম—তোমার মাথা! ব্রাহ্মণ কি?

গোপাল ছুটিয়া ঘরে আসিল। বড় বিব্রত। তাহার নির্ব্বোধের মত মুখ-খানা হইতে জ্ঞানের শেষ রশ্মিটুকু অবধি লুপ্ত হইয়াছিল। আমি বিস্মিত হইয়া বলিলাম—বেটা জানোয়ার! কথা কইতে পারিস নি? বল্‌না কি হ'য়েছে?

গোপাল বলিল—আজ্ঞে একজন ব্রাহ্মণ এই দারুণ রোদে পথ চল্‌তে চল্‌তে—কি ঝলসান রদ্দুর দাদাবাবু!

আমি বলিলাম—তোর মুণ্ডু! ব্রাহ্মণ কি বলে বল্‌না।

সে বলিল—ব্রাহ্মণ আর কি বলবে, দাদাবাবু, তার কি আর সংজ্ঞি আছে—

আরও দুই একটা প্রশ্ন করিয়া বুঝিলাম, একটি ভদ্রলোকের সর্দ্দিগর্ম্মির মত হইয়াছে। তিনি আমার বাটীতে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন। তাড়াতাড়ি 'স্মেলিং শল্টে'র শিশিটা লইয়া বাহিরে গেলাম। দ্বারবান, পাচক ও গোপাল তাঁহার মুখে চোখে জলের ঝাপ্‌টা দিয়া তাঁহাকে একটু সুস্থ করিয়াছিল। ভদ্রলোকের পোষাক পরিচ্ছদ জীর্ণ হইলেও মুখে বেশ সম্ভ্রান্ততার লক্ষণ বিদ্যমান ছিল। আমি তাঁহাকে ধরিয়া ধীরে ধীরে আমার নিজের কক্ষে লইয়া আসিলাম।

আমাদিগের শুশ্রূষায় ব্রাহ্মণ সুস্থ হইলেন। আমি ভৃত্যদিগকে বিদায় দিয়া তাঁহাকে একটু বিশ্রাম করিতে বলিলাম। আমি স্বয়ং একখানা সংবাদপত্র লইয়া বিজ্ঞাপন পাঠ করিতে লাগিলাম। মাত্র পাঁচ সাত মিনিট বিশ্রাম করিয়া

ভদ্রলোক বিদায় চাহিলেন। আমি আপত্তি করিলাম। এত রৌদ্রে আবার তিনি অসুস্থ হইতে পারেন। তাঁহার বিশেষ কার্য্য থাকিলে গাড়ি আনাইবার প্রস্তাব করিলাম।

তাঁহার নাম বলিলেন গোলকনাথ চট্টোপাধ্যায়। গাড়ির কথায় গোলক বাবু হাসিয়া উঠিলেন। তিনি বলিলেন,—ভগবান আপনার ভাল করুন। গাড়ি চড়ব? হাঃ অদৃষ্ট! মশায় কি ব্রাহ্মণ?

আমি বলিলাম—আজ্ঞে হ্যাঁ। আমার নাম শ্রীনলিনীমোহন মুখোপাধ্যায়। আমার বাড়ী নিস্তারপুর। এখানে আমি পড়ি।

গোলকবাবু দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিলেন—মশায় পড়েন? কিন্তু মাপ করবেন, লেখা পড়া শিখে এদেশের লোক মানুষ হয় না কেন বলতে পারেন?

আমি একটু বিস্মিত হইলাম। ভদ্রলোক একটু অপ্রস্তুত হইয়া বলিলেন—অবশ্য সবাই যে মানুষ হয় না তা' বলছি না। এই মশায় আজ যে রকম ভদ্রতা ও মহত্ত্বের—

আমি বাধা দিয়া বলিলাম—আপনি সংসারের ওপর একটু বিরক্ত হ'য়েছেন বুঝছি, বিশেষ শিক্ষিত সমাজের ওপর—

তিনি বলিলেন—শুনুন। বিরক্তির কারণ শুনুন। কুলীনের ছেলে,—আজই আমার এরকম অবস্থা হ'য়েছে। আমার একটি পরমাসুন্দরী মেয়ে আছে—কিন্তু টাকা নেই।

আমি বুঝিলাম। কিছু বলিতে পারিলাম না। তিনি বলিলেন—কুলে কি হয়? সৌন্দর্য্যে কি হয়—টাকা নেই—শিক্ষিত বাঙ্গালী কি আর আমার মেয়েকে ঘরে নেবে? টাকা নেই, মশাই, টাকা নেই।

আমি বলিলাম—কেন কম টাকাতেও তো বিয়ে হয়।

তিনি বলিলেন—হয়। কিন্তু ভুলে যাচ্চেন, আমি বাপ। যার তার হাতে তো আর মেয়ে দিতে পারিনি। মেয়ে তো আর শত্রু নয় যে গলা টিপে বার করে দিতে হ'বে।

আমি চিন্তিত হইলাম। দেশের কথা ভাবিলাম। বিবাহ ব্যাপারে সমাজের কি ভীষণ অত্যাচার! সভ্যতা-গর্ব্বিত জাতির কি পৈশাচিক ব্যবহার! তিনি বলিলেন—"একেবারে সবাই যে পত্রপাঠ বিদেয় ক'রে দেন তা নয়। অনেকে ভদ্রতার ভাণ ক'রে দু'চার দিন হাঁটাহাঁটি করান, শেষে যখন বোঝেন যে কিছু পাবার আশা নেই, তখন বলেন, কোষ্ঠি মিল্‌ল না।

বিদায় লইবার জন্ত ভদ্রলোক উঠিলেন। আমি বলিলাম—কত টাকা হ'লে বিয়ে হয়?

তিনি বলিলেন—একটি গরীব বিধবার বি, এ পাশ করা একটি ছেলে আছে—হাজার দুই টাকা হ'লে হয়। খুব সস্তা। কিন্তু ছেলের খাবার পরবার সংস্থান নেই। তাও দু'হাজার টাকা। অনেক বুঝিয়ে সুঝিয়ে ফিরছিলাম। কিন্তু তাঁর ধনুকভাঙ্গা পণ!

আমি বলিলাম—আপনার কত টাকা আছে?

কথাটা বলিয়াই লজ্জিত হইলাম। গোলকবাবু অপরাধ গ্রহণ করিলেন না। তিনি বলিলেন—আমার নিজের তো বিষ খেয়ে মরবার সঙ্গতি নেই। তবে ব্রাহ্মণীর কাছে শ' পাঁচেক টাকার অলঙ্কার আছে।

তিনি নমস্কার করিয়া ঘরের বাহির হইলেন। বিষম আত্মগ্লানি উপস্থিত হইল। সমগ্র বাঙ্গালী সমাজের পাপের জন্ত আমিই যেন ষোল আনা দোষী এইরূপ একটা ভাব মনে আসিল। আমি তাড়াতাড়ি তাঁহাকে ডাকিয়া বলিলাম—দেখুন অপরাধ গ্রহণ করবেন না। আমার পিতা নিস্তারপুরের জমিদার। তাঁর খুব উদার প্রকৃতি। যদি বলেন তো তাঁকে লিখে—

গোলকবাবু বলিলেন—শ্রীবিষ্ণু! শ্রীবিষ্ণু! ভিক্ষয়া নৈব নৈব চ। মাটি কেটে খেটে রোজগার করতে পারি ত হ'বে। না হয় মা লক্ষ্মী রহিলেন। কুলীনের ঘরে অমন আগে থাকত।

আমি আর কোন কথা বলিলাম না। ব্রাহ্মণের ঠিকানা জানিয়া লইলাম। তিনি আমায় আশীর্ব্বাদ করিয়া বিদায় গ্রহণ করিলেন।

(২)

তাঁহাদের পাড়াতে গোলকবাবুকে কেহ চিনিত না। গোলকবাবুর জীর্ণ কঙ্কালসার ক্ষুদ্র অট্টালিকার পার্শ্বে একখানি বৃহৎ বাটীতে একটী সম্ভ্রান্ত পরিবার বাস করিত। তাহাদিগের একটী যুবককে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলাম যে গোলকবাবু এক সময় অনেক অর্থ উপার্জ্জন করিয়াছেন। আপাততঃ ব্যবসায় ক্ষতিগ্রস্ত হইয়া আপনি, স্ত্রী ও একমাত্র কন্যা লইয়া তিনি সেই জীর্ণ অট্টালিকায় বাস করিতেছিলেন।

পিতার উপর অভিমান করিয়া আমি গ্রীষ্মের ছুটীতে কলিকাতায় অবস্থান করিতেছিলাম। তাঁহার এক বাল্যবন্ধু ধনী জমীদারের কন্যার সহিত আমার বিবাহ দিবার জন্য তিনি বড় ব্যস্ত হইয়াছিলেন। আমি অন্ততঃ পাঠ সমাপন

না করিয়া বিবাহ করিব না, এইরূপ ধনুর্ভাঙ্গা পণ করিয়া মাতাকে বুঝাইয়া দিয়াছিলাম যে পিতার কার্য্যে আমার মোটেই সহানুভূতি নাই। তাহাতে পিতা অত্যন্ত মর্ম্মাহত হইয়াছিলেন। তিনি আধুনিক শিক্ষার উপর অনেক কঠিন মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছিলেন এবং কলেজ খুলিবার অব্যবহিত পূর্ব্বেই প্রায় তিন চারি দিন আমার সহিত বাক্যালাপ করেন নাই। তাহাতেও কিন্তু আমি সঙ্কল্পচ্যুত হই নাই। তবে তাঁহার রোষদীপ্ত চক্ষুর ভয়ে আমি গ্রীষ্মাবকাশে কলিকাতায় বাস করিতেছিলাম। এক্ষেত্রে কিরূপে পিতার নিকট হইতে গোলকবাবুর জন্য দুই সহস্র মুদ্রা ভিক্ষা করিব তাহা ভাবিয়া ঠিক করিতে পারিলাম না। টাকা সংগ্রহ করিতে পারিলে গোলকবাবুর হস্তে সমর্পণ করা তত কঠিন হইবে না। ভাবিয়াছিলাম ঋণ স্বরূপ অর্থ দান করিয়া তাঁহাকে কন্যাদায় হইতে উদ্ধার করিব। কন্যাদায়! কথাটা স্মরণ করিতে বুকের পাঁজরা ভাঙ্গিয়া যাইত। হায় বঙ্গদেশ! হায় উচ্চ শিক্ষা! মাড়োয়াড়ির গীত বাদ্যে যেমন সমন্বয় হয় না, বাঙ্গালীর শিক্ষায় ও চরিত্রে তেমনি একটা পরস্পর বিরোধী ভাব লক্ষিত হইত।

কলিকাতার নিজ কক্ষে বসিয়া সমাজের কথা ভাবিতেছিলাম, এমন সময় স্বয়ং পিতা আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তাঁহার চক্ষে ক্রোধের রেখামাত্র ছিল না। তাঁহার মুখের স্নেহের হাসিটুকু দেখিয়া দেহে বলসঞ্চার হইল। আমি বিস্মিত হইয়া বলিলাম—বাবা, হঠাৎ?

পিতা বলিলেন—বোধ হয় পড়াশুনার ব্যাঘাত হয় ব'লে ছুটিতে বাড়ী যাওনি। দেখতে এলাম কেমন আছ।

আমি বড় মর্ম্মাহত হইলাম। পিতাকে বলিলাম—বাড়ী যাইনি পড়ার জন্যে বটে, তবে বাড়ীর জন্য বড় মন কেমন করে।

পিতা হাসিয়া বলিলেন—তা আর করবে না।

আমি বলিলাম—মার শরীর বেশ ভাল?

তিনি এবার বসিলেন। গোপাল তাড়াতাড়ি তাঁহার জুতা খুলিতে বসিয়া গেল। তিনি বলিলেন—টাকা কড়ি খরচ পত্রের অভাব নেই?

আমি এ সুযোগের সদ্ব্যবহার করিবার জন্য একেবারেই বলিলাম,—না বিশেষ কিছু না। তবে হাজার দুই টাকা পেলে—

পিতৃদেব একেবারে বিস্মিত হইলেন। তিনি বলিলেন—হাজার দুই টাকা কি হ'বে?

আমি যথা সম্ভব গোলকবাবুর ব্যাপারটা বুঝাইলাম। কোমল-হৃদয় হইলেও পিতার বহুদর্শিতা ছিল। তিনি বলিলেন,—ও রকম পাগলামির দান আরম্ভ করলে—

আমি বলিলাম—না বাবা পাগলামি না।

তিনি একটু হাসিয়া বলিলেন—কল্‌কাতা বড় জুয়াচোরের জায়গা।

আমি গোলকবাবু সম্বন্ধে তদন্ত করিয়াছিলাম তাহা পিতাকে বলিলাম। তাঁহার সন্দেহ তিলার্দ্ধ অপনোদিত হইল না। তিনি বলিলেন—মেয়ে আছে কি না নিজের চোখে দেখেছ?

আমি হাসিয়া বলিলাম—তা' কি ক'রে দেখব?

তিনি বলিলেন—তোমার কোন পাশ করা বন্ধু বান্ধবের সঙ্গে বিয়ে দাও না আরও কিছু টাকা লাগে আমি দিব। আর কিছু না, ভয় হয়।

আমি সে চেষ্টা পূর্ব্বেই করিয়াছিলাম। কিন্তু কাহারও স্বাধীনতা ছিল না। কিছুক্ষণ চিন্তা করিয়া তিনি বলিলেন—তোমার সখের জন্যে দু'হাজার টাকা খরচ করতে আমি কাতর নই। গরীবের জন্যে প্রাণ কাঁদা, এক লাইব্রেরী বই পড়ার চেয়ে ভাল। এ কাজে ঠক্‌লেও ক্ষতি নেই।

আমি আজীবন পিতৃদেবের সে বাক্য বিস্মৃত হইব না। এমন ঋষিতুল্য পিতার অবাধ্য হইয়াছিলাম বলিয়া মনে বড় আত্মগ্লানি উপস্থিত হইল।

(৩)

একদিনের পরিচয়ে গোলকবাবুর জন্য আমার কেন এতটা প্রাণ কাঁদিয়াছিল আত্ম-পরীক্ষা করিয়া এখন সে প্রশ্নের উত্তর পাইয়াছি। তাঁহার সেই সহায়হীন অবস্থা, সেই মলিন মুখে তেজের কথা, সেই দারিদ্র্যেও স্বাবলম্বন প্রয়াস আমার প্রাণে সহানুভূতির উদ্রেক করিয়াছিল। কিন্তু তাঁহার জন্য এত অধিক মর্ম্মপীড়িত হইয়াছিলাম, বাঙ্গালীর বিবাহব্যাপারে শিক্ষিত সমাজের প্রতি তিনি দোষারোপ করিয়াছিলেন বলিয়া। পূর্ব্বেই বলিয়াছি বঙ্গবাসী হিন্দুর জাতীয় পাপের জন্য আমি আপনাকে খুব বেশী রকম দোষী মনে করিয়াছিলাম। কোনও প্রকারে অন্ততঃ একজন নিঃস্ব ভদ্রলোকেরও কন্যার বিবাহ দিতে পারিলে যেন সে পাপের প্রায়শ্চিত্ত হয়, মনের মধ্যে এমনই একটা ভাব বিরাজ করিতেছিল। তাই পিতার প্রত্যাগমনের পরদিনই আমি গোলকবাবুর বাটীতে গিয়া উপস্থিত হইলাম।

গৃহের চতুর্দ্দিকে দৈন্যের চিহ্ন। খুব পুরাতন একখানি তৈলচিত্র স্থানে

স্থানে উই-ভুক্ত। বোধ হয় পূর্ব্ব-সমৃদ্ধির স্মৃতিরক্ষার জন্য তিনি চিত্রখানি এখনও রাখিয়াছিলেন। ঘরের তক্তপোষের উপর একখানি জীর্ণ শাল পাতিয়া তিনি আমায় বসিতে দিলেন। আমার আগমনে ভদ্রলোক যেন হাতে স্বর্গের চাঁদ পাইয়াছিলেন। আমি তাঁহাকে ব্যস্ত হইতে নিষেধ করিয়া বলিলাম—মশায় পাত্রের কি হ'ল ?

তিনি বলিলেন—সে পাত্রের ধনুকভাঙ্গা পণ। দু'হাজারের কম নয়। আরও দুই চারিটি পাত্র পেয়েছি—যাক্ ও কথা যাক্। মেয়ের জগন্নাথের সঙ্গে বিয়ে দ'ব।

আমি একটু ইতস্ততঃ করিয়া বলিলাম—আমার বাবা এসেছিলেন। তিনি কিছু টাকা সুদে খাটাতে চান। আপনি যদি হাজার দুই টাকা ধার নেন—

গোলকবাবু খুব হাসিলেন। তিনি বলিলেন—পুরুষের ভাগ্যের কথা বলা যায় না। তবে এ জন্মে যে আপনার দেনা শুধতে পারব তা বোধ হয় না।

আমি তাঁহাকে আশ্বস্ত করিলাম। বুঝিলাম ঋণস্বরূপ দুই সহস্র মুদ্রা গ্রহণ করিতে ভদ্রলোকের কোনও আপত্তি নাই। তবে তিনি সমাজের উপর গালি-বর্ষণ করিতে বেশ উৎসাহ প্রদর্শন করিলেন।

আমি বিদায় লইয়া উঠিলাম। কি ভাবিয়া তিনি বলিলেন—নলিনবাবু একটু বসুন।

আমি বসিলাম। তিনি বাহিরে গেলেন। পরক্ষণে এক অতি সুন্দরী বালিকাকে লইয়া গৃহে ফিরিলেন। বুঝিলাম কুমারী মমতা—তাঁহার কন্যা।

কি স্নিগ্ধ কান্তি! দরিদ্রের ঘরে কি বিলাস-বিলোল চক্ষু—কি যত্ন-বর্দ্ধিত নধর দেহ। হাঃ অধঃপতিত কষাইয়ের সমাজ! নির্ব্বাচনের স্বাধীনতা থাকিলে দেশের গণ্য মান্য সকল পরিবারের যুবকগণ ইহার জন্য লাঠালাঠি করিত, দেশে অস্ত্র-আইনের প্রচলন না থাকিলে, ইহার জন্য দুই একটা যুবক নিশ্চয়ই প্রতিদ্বন্দ্বীর পিস্তলের গুলিতে প্রাণত্যাগ করিত। যে পাষণ্ড এরূপ রত্নের সহিত আবার তুচ্ছ রজত মুদ্রার দাবী করে তাহাকে বর্ষাকালে কচুবনে লইয়া গিয়া জলবিচুটি প্রহার করা কর্ত্তব্য। বালিকা—বালিকা কেন কিশোরী—কিশোরী পিতার হাত ধরিয়া মুখের দিকে চাহিয়া বলিল—কই ?

তাহার কথার স্বরে বুঝিলাম মমতা দরিদ্র গোলকবাবুর বড় আদরের মেয়ে। তিনি বলিলেন—এই যে মা।

মমতা আমার দিকে চাহিল। লজ্জায় আমি চোখ সরাইয়া লইলাম, সেও

লজ্জিতা হইল। ঘর ছাড়িয়া পলাইবার জন্য ব্যস্ত হইলাম। কি জানি গোলকবাবু কি বলিয়া আমার পরিচয় করিয়া দিয়াছিলেন। যদি টাকার কথা —ঋণের কথা—ছিঃ ছিঃ কি লজ্জার কথা! ইহার কর্ণে তুচ্ছ টাকার কথা! মমতা বলিল—না—

গোলকবাবু বাধা দিয়া বলিল—আচ্ছা যাও।

সে তাহাই চাহিতেছিল।

(৪)

গোলকবাবু প্রায় প্রত্যহই আসিতেন। বিবাহের ফর্দ্দ লইয়া, কখনও বা দুই একখানা অলঙ্কার হাতে করিয়া, তিনি আমার সহিত পরামর্শ করিতে আসিতেন। আমিও যথাসাধ্য তাঁহাকে সাহায্য করিতাম। বেশ উৎসাহের সহিত এ কার্য্যে যোগদান করিয়াছিলাম। অবশ্য তাঁহার বাটীতে আর যাই নাই। একবার বাসনা ছিল পাত্রীটিকে দেখিব। কিন্তু মুখ ফুটিয়া সে কথা তাঁহাকে বলিতে পারি নাই।

আজ কন্যার বিবাহের দুকুল বাস দেখাইবার জন্য তিনি আসিয়াছিলেন। উঠিবার সময় বলিলেন—বাবা তোমার বিয়ের সময় খবর দিও।

আমি হাসিলাম। অবশ্য তাঁহাকে বলিলাম না যে আমি একপ্রকার কৌমার্য্য গ্রহণে কৃতসংকল্প। তিনি চলিয়া গেলে সেই কথাই ভাবিতেছিলাম। কেন চিরকুমার থাকিব? আমার কিসের অভাব? বিবাহে পিতা পণ লইবেন না, জননী কত আনন্দিতা হইবেন, সুন্দরী জীবন-সঙ্গিনী—ঐ ঐখানেই আপত্তি। এবার মনের ভাবটাকে বেশ কায়দা করিয়া ধরিলাম। বুঝিলাম আপত্তিটা স্বাধীনতার অভাব। মমতার সুন্দর সরল মুখখানা মনে পড়িতে লাগিল। পিতামাতা আত্মীয়স্বজন দেখিয়া পাত্রী-নির্ব্বাচন করিলে যে ঐরূপ একটি স্বর্গীয়-সুষমা-মণ্ডিত লাবণ্যময়ীর সহিত আমার বিবাহ দিবেন তাহার সম্ভাবনা কোথা? পিতার বাল্যবন্ধুর কন্যা। নিজের বন্ধুত্বের অনুরোধে তিনি—না না পিতার সম্বন্ধে ওরূপ চিন্তা ভীষণ। তাঁহাকে মুখ ফুটিয়া বলিতে পারিব না যে আমি আপনি পাত্রী-নির্ব্বাচন করিয়া বিবাহ করিব।

অপরের কন্যাকে পুত্রবধূ করিয়া ঘরে আনিলে পিতার বন্ধুর নিকট অপযশ হইবে। না তাঁহার এরূপ অনিষ্ট কেমন করিয়া করিব? চিরকুমার থাকিব, এম্‌-এ পাশ করিয়াই প্রফেসারি করিব, জ্ঞানার্জ্জন করিব, পরের সুখের জন্য—আবার সেই দারিদ্র্য-মলিন গৃহের পারিজাত-মুখখানি মনে পড়িল। কি ভীষণ

চিন্তা—এখনও পিতাকে সমস্ত কথা বলি না—না না বন্ধুবিচ্ছেদ হইবে। চির-কুমার থাকিব। প্রফেসার মুখার্জ্জি—বেশ নাম। বিবাহিত জমিদার অপেক্ষা শত গুণে শ্রেষ্ঠ।

(৫)

আজ মমতার বিবাহ। সমস্ত দিন গোলকবাবু একবারও আসেন নাই। আমাকে সন্ধ্যার সময় যাইতে অনুরোধ করিয়াছিলেন। আমি সেই ভাগ্যবান যুবকটিকে দেখিবার জন্য বড় উদ্বিগ্ন হইয়াছিলাম। ভাগ্যবান যুবক! মমতা আবার দুই হাজার টাকা! নিজের বি,এ উপাধিটার উপর শ্রদ্ধা হারাইতেছিলাম।

সন্ধ্যার সময় গোপাল আমার বেশভূষার সাহায্য করিতেছিল। কেন বলিতে পারি না, সে হাসিতেছিল। বোধ হয় আমার বেশভূষার পারিপাট্য দেখিয়া। আমি বিরক্ত হইয়া বলিলাম—বেটা মার খাবি? হাসছিস্ কেন?

গোপাল বলিল—দাদাবাবুর বিয়ের দিন এই রকম ক'রে সাজিয়ে দ'ব।

আমি বলিলাম—তুই বোকা বদমায়েস, বাবাকে ব'লে তোর জমি কেড়ে ন'ব। বজ্জাত বেটা।

তাড়াতাড়ি গোলকবাবু গৃহে প্রবেশ করিলেন। এলোথেলো পরিচ্ছদ, মুখে বিপদের চিহ্ন, মাথায় রুক্ষকেশ, চক্ষে এক অপূর্ব্ব দৃষ্টি।

শিরে করাঘাত করিয়া তিনি বলিলেন—বাবা! সর্ব্বনাশ! সব গেল, সব গেল! জাত, কুল, মান—সব গেল!

আমি বিস্মিত হইয়া বলিলাম—কি ব্যাপার?

"কলকাতার জুয়াচোর, বাবা কলকাতার জুয়াচোর। বেটা বি,এ, ফি,এ কিছু না। দমবাজি ক'রে নগদ হাজার টাকা নিয়ে সরে পড়েছে।"

আমি বলিলাম—অঁ্যা!

গোলকবাবু ভূমিতে বসিয়া বলিলেন—সরে পড়েছে, বাবা নলিনী, সরে পড়েছে, সাফ সরেছে, বেমালুম সরেছে বাবা! বেটার চিহ্নটি অবধি নাই।

আমি স্তম্ভিত হইলাম। অন্যমনে বলিলাম—এখন উপায়?

"উপায় সেঁকো বিষ! বাবা জাত গেল—এক ঘণ্টার মধ্যে পাত্র না পেলে জাত গেল—নিকষ কুলীন্ বাবা—বড় বংশ—বড় বংশ।"

আমি তাঁহাকে সান্ত্বনা দিতে চেষ্টা করিলাম। তাঁহার বিলাপ থামিল না। আমি আরও অর্থ দিতে রাজী হইলাম। সমাজ তো পয়সার দাস। আরও কিছু অর্থ ঢালিলে এখান কত এম্-এ পাশ করা ব্রাহ্মণসন্তান মিলিবে।

তিনি বলিলেন—"বেশ কথা বলেছ বাবা! কিন্তু আর যে সময় নেই। আবাগের বেটারা একটা প্রকাশ্য হাট করে না কেন? যেমন গরু, ছাগল কিনতে পাওয়া যায়, তেমনি বেরিয়েই পাত্তর কিনে আনা যায় তো হয়। বেটাদের ভণ্ডামির জ্বালায় দেশটা গেল।"

বন্ধু বান্ধবদের কথা ভাবিলাম, আধ ঘণ্টার নোটিসে বিবাহ করিয়া ব্রাহ্মণের জাতি কুল মান রক্ষা করিতে পারে এমন তো কাহারও কথা স্মরণ হইল না। ভদ্রলোকের বিলাপ-কাতর মুখ দেখিয়া বড় কষ্ট হইল। গোপালের মুখের দিকে চাহিলাম। নির্ব্বোধ হইলেও সে ব্যাপারটা বুঝিয়াছিল। সে বলিল—দাদাবাবু আমি এক কথা বল্‌ব?

আমি বলিলাম—কি কথা?

সে বলিল—কথা আর কি? ঠাকুরের জাতটা রাখ্‌তে হ'বে। আপনি নিজে কেন—

এবার তাহাকে চপেটাঘাত করিলাম। বেয়াদব, পাজি, নির্ব্বোধ গোয়ালা!

সে চড় খাইয়া থামিল না। বলিল—কর্ত্তাবাবু থাক্‌লে ঠাকুর আপনার জাত বাঁচত। দাদাবাবু ইন্‌জিরি পড়ে—

তাহাকে মারিতে উদ্যত হইলাম। গোপ-নন্দন গৃহ ছাড়িয়া পলাইল। গোলকবাবু কাতর দৃষ্টিতে আমার মুখের পানে চাহিয়াছিলেন। তবে কি তিনিও—

মাতার পত্র মনে পড়িল। তিন দিন পূর্ব্বে তিনি লিখিয়াছিলেন—"যেখানে হ'ক বিবাহ কর। বাবা তোমার বউ ঘরে এলে বড় আনন্দ হ'বে। তুমি আমাদের একমাত্র ছেলে।" মমতা মাতার পদসেবা করিবার উপযুক্ত, পিতা রুষ্ট হইবেন না—

গোলকবাবু বলিলেন—কি করি বাবা! না হয় একটা রাঁধুনি বামুন টামুন—

আর স্থির থাকিতে পারিলাম না। রাঁধুনি বামুন! আমি বলিলাম—চলুন।

গোলকবাবু বলিলেন—কোথা?

আমি বলিলাম—মানে হচ্চে—এখনই আর পাত্র কোথা পাব? অর্থাৎ মানে, যদি আমার সঙ্গে—মানে হ'চ্চে, অর্থাৎ আপত্তি। মোট কথা, আমি আপনাকে অর্থাৎ আপনার কন্যাকে বিবাহ করব।

ধীরে ধীরে গোলকবাবু উঠিলেন। দৃঢ় স্বরে বলিলেন—বেশ বাবা! জমিদারের ছেলে, বি, এ পাশ করেছ, প্রাণে দয়া আছে, আর এই বিপদের সময় ব্রাহ্মণের সঙ্গে পরিহাস!

আমি তাঁহাকে বুঝাইয়া বলিলাম যে বিদ্রূপ করিতেছি না, প্রকৃতই তাঁহার কন্যাকে পরিণয় করিয়া তাঁহার জাতিরক্ষার জন্য সংকল্প করিয়াছি। তিনি যখন বুঝিলেন আমি তাঁহাকে পরিহাস করি নাই, তখন তিনি যেরূপে কৃতজ্ঞতা জানাইলেন, যেরূপে দুই হাত তুলিয়া ভগবানের নিকট হইতে আমার জন্য আশীর্ব্বাদ ভিক্ষা করিলেন, সে দৃশ্য আমি ইহজীবনে বিস্মৃত হইব না। আমি যেরূপ সুপুরুষ, মমতা যেরূপ সুন্দরী, আমাদের বিবাহে যে রাম-সীতার মিলন হইবে সে কথাও তিনি ব্যক্ত করিলেন। কিন্তু তিনি আমার প্রস্তাবে সম্মত হইলেন না। আমার পিতা জমিদার, তাঁহার সম্মতি না লইয়া বিবাহ করিলে তিনি পুত্রবধূকে গৃহে প্রবেশ করিতে দিবেন না, আমার জননী আমার আবার বিবাহ দিবেন, সে বিষয়ে তাঁহার সন্দেহ ছিল না।

আমি বলিলাম—মশায়, আমার মা বাপ তেমন নন্। মা আমাকে পত্র লিখেছেন—যেখানে ইচ্ছে বিবাহ করতে বলেছেন—

বাধা পাইয়া আমার সংকল্পটা দৃঢ় হইয়াছিল। লোভ ছিল কি না বলিতে পারি না। সমস্ত পথ মমতার পারিজাতের মত মুখখানি আমার স্মৃতিপটে বিরাজ করিতেছিল।

(৬)

নিশ্চয় স্বপ্ন! আলবাৎ স্বপ্ন! বরসভার কি সাজসজ্জা! সেই জীর্ণ অট্টালিকার পার্শ্বের বৃহৎ বাটীতে বরের আসর হইয়াছিল। ললিত সঙ্গীত প্রাণে সুধা ঢালিয়া দিতেছিল। লোকজন, গোলমাল—ঠিক যেন ধনী লোকের বিবাহ। স্ত্রী আচারের সময় পুরাঙ্গনাদিগের বেশভূষা দেখিয়া তাহাদিগকে ধনী ঘরণী বলিয়া মনে হইল। মমতার আপাদমস্তক কি সুন্দর অলঙ্কারে ভূষিত! শেষে সভাস্থলে যখন পিতাকে দেখিলাম, ম্যানেজারকে দেখিলাম, দেশের দুই চারিজন আত্মীয়কে দেখিলাম· তখন বুঝিলাম ব্যাপারটা একেবারে স্বপ্নরাজ্যের। স্বপ্ন-পরিণয়! মন্দ নয়। খোস খবরের ঝুটাও ভাল। সুখ-স্বপ্ন বেশ উপভোগ্য। মন্দ কি? চলুক না। ইহাতে কাহারও তো কষ্ট নাই। কন্যাকর্ত্তা-পীড়ন করিয়া পণও গৃহীত হইতেছে না, দুঃখ বাড়াইবার জন্য দরিদ্র সংসারে বধূও যাইতেছিল না। কেবল ভয় হইতেছিল 'যদি স্বপ্নটা হঠাৎ ভাঙ্গিয়া যায়, বিষয়টা পরিবর্ত্তিত হইয়া যায়।

সম্প্রদানের সময় শুনিলাম—মমতা শ্রীশবাবুর কন্যা। মন্দ কি? শ্রীশবাবু পিতার বাল্যবন্ধু। তাঁহারই কন্যাকে বিবাহ করিতে চাহি নাই। বেশ্ কথা। এক স্বপ্নে সকল দিক্ রক্ষা হইল। পরোপকার, পণ-ত্যাগ, পিতৃ-আজ্ঞা পালন। তবে ঘুমটা না ভাঙ্গে। গোলকবাবু আশীর্ব্বাদ করিলেন। দরিদ্র গোলকবাবু, দুস্থ গোলকবাবু। নগদ দুই হাজার টাকা যৌতুক! যথা লাভ!

বিবাহের পর বাসরঘর। বহুত আচ্ছা! একত্র অনেক সুন্দরীর সমাগম। একজন মুখরা। তিনি মমতার জ্যেষ্ঠা ভগ্নী। নাম শুনিলাম—মায়া। বেশ্ কিন্তু 'মায়ামমিদম্ অখিলং হিত্বা' ঘুমটা না পলায়। মায়া বলিল—কি নলিনী বাবু, পরোপকার হ'ল?

হ'লেই বা স্বপ্ন। রসিকতা করিবার অবসরটা ছাড়ি কেন? আমি বলিলাম —শুধু পরোপকার? হাতে হাতে প্রত্যুপকার! দেখুন দেখি কেমন লাভ করেছি।

মমতা সঙ্কুচিতা হইল। সকলে হাসিল। একটা ছোট বালিকা কাণ মলিয়া দিল। স্বপ্নের কাণমলায় কর্ণে বিলক্ষণ আঘাত লাগে তাহা উপলব্ধি করিলাম।

মায়া বলিল—গোলক কাকার কেমন বুদ্ধি দেখলেন। আপনার বাবার সঙ্গে বাজি রেখেছিলেন আষাঢ় মাসের মধ্যে আপনাদের বিয়ে দিবেন। আপনি রাজি হ'ন্নি অথচ বিবাহের সব বন্দোবস্ত হ'য়েছে, প্রথমটা সকলের বড় ভয় হ'য়েছিল। কিন্তু গোলক কাকা বুঝেছিলেন আপনি মনে মনে বিয়ে পাগলা।

স্বপ্নটা আরও ভাল লাগিতেছিল। স্বপ্ন-পরিণয় না হইলে এটা বাস্তব জগতের ব্যাপার হইলে আমি কি নিবুর্দ্ধিতারই কাজ করিয়াছি।

মায়া বলিল—আজ কালকার ছেলেদের মজা দেখলেন। যদি নিজে নিজে বেছে বিয়ে করে তা হ'লে আর পণ লাগে না। এই মমতাকে পিতৃ আজ্ঞায় বিয়ে করতে রাজি হন নি, আর নিজে একবার দেখে—

আমি জোড়হাত করিলাম।

এবার মায়া হাসিতে লাগিল। সে বলিল—যেদিন আপনি পাশের ভাঙ্গা বাড়িতে আসেন, গোলক কাকা কি ব'লে মমতাকে আপনার সামনে নিয়ে গিয়েছিলেন জানেন?

আমি বলিলাম—কি বলে?

মমতা একেবারে গুটিয়ে সুটিয়ে তাল পাকাইতেছিল। আমার ভয় হইতে-

ছিল তাহার মেরুদণ্ড ভাঙ্গিয়া যাইবে। মায়া বলিল—গোলক কাকা বল্লেন—মনি একটা বাজিওয়ালা এসেছে। মনি অমনি ছুট্‌লো। মনি বাজি দেখ্‌তে পেলে না, লজ্জা পেয়ে ছুটে এলো। আমরা বাঁদর নাচ দেখ্‌লাম।

বুঝিলাম স্বপ্নেও অপ্রস্তুত হওয়া সুখকর ব্যাপার নহে। যে যুবকটি গোলকবাবু সম্বন্ধে সঠিক খবর দিয়াছিল সে আমার শ্যালক। সে আজিও আমাকে পরিহাস ক'রে।

বিবাহের দিন তাহাকে চপেটাঘাত করিয়াছিলাম বলিয়া বাবা গোপালের এক টাকা বেতন বৃদ্ধি করিয়া দিয়াছিলেন। পরে জানিয়াছিলাম, সেও গোলক বাবুর সহিত ষড়যন্ত্রে লিপ্ত ছিল।

শ্রীকেশবচন্দ্র গুপ্ত।

কবিতার সন্ধান।

রে কবিতা সুভাষিণী, নাচিস্ কোথায় ছন্দে?
খুঁজে বেড়াই বন-বাদাড়ে, খিড়কি-ঘাটে আর পাহাড়ে,
লোলুপ শেয়াল বেড়ায় যেমন কাঁঠাল পাকার গন্ধে।

ঘুরিয়ে নিয়ে বেড়ায় শনি ব'সে আমার রন্ধ্রে।
যখন আমি ভাবে মেতে, বেরিয়ে পড়ি দুপুর রেতে,
লোকে বলে আস্ত দানো আছে আমার স্কন্ধে।

ঘরের লোকে পাগল বলে; সময় কাটে দ্বন্দ্বে।
আহার খোঁজাই সেরা কর্ম্ম? বোঝে না কেউ তোমার মর্ম্ম!
চুপি চুপি খুঁজব তোমায় এবার পূজার বন্ধে।

ঘরে যারা আনে টাকা,—ভাবে মহানন্দে
এ সংসারে তারাই কর্ম্মা— ও পথে না চলেন শর্ম্মা!
আহাম্মকেই সোণা কুড়ায় খনির খানা খন্দে।

শুনে আমার তত্ত্বকথা চক্ষু পেলে অন্ধে।
কিন্তু 'কারও' পদ্মপলাশ নেত্র হল জলের গেলাস!
ঐ কবিতা দিল ধরা নারীর আঁখিচ্ছন্দে।

শ্রীবিজয়চন্দ্র মজুমদার।

সাময়িক সাহিত্য।

কাশ্মীরের মুসলমান।

ভারতবর্ষের মুসলমানের সহিত অন্যান্য দেশের মুসলমানের উদ্দেশ্য ও ধর্ম্ম এক হইলেও আচার ব্যবহারে অনেক পার্থক্য দৃষ্ট হয়। অনেক স্থানের মুসলমানেরা মহম্মদের নিষিদ্ধ অনেক কার্য্য করে। কাশ্মীরের মুসলমানগণের আচার পদ্ধতি তাহারই প্রকৃষ্ট প্রমাণ। ছয় শতাব্দী পূর্ব্বে বর্ত্তমান অনেক মুসলমানের পূর্ব্বপুরুষ হিন্দু ছিলেন, সেইজন্য এখনও তাহাদের মধ্যে মূর্ত্তিপূজা, সাধু সন্ন্যাসীর প্রতি প্রবল ভক্তি এবং জাতি বিভাগের কিয়দংশ দেখিতে পাওয়া যায়। এই মুসলমানদের মধ্যে কাহাকেও যদি বলা যায় তুমি তো হিন্দুর মত, তোমাকে আমরা পুনরায় হিন্দু করিয়া লইব, তাহা হইলে সে বলিবে—না মশায়। আপনাদের হিন্দু ও খৃষ্টানদের জ্বালাতেই তো আমরা মুসলমান হইয়াছি। আর হিন্দু হইতেছি না।

শ্রীনগরের বার মাইল নিম্নে ঝিলাম নদীর ধারে প্যাগোডাকৃতির একটী মসজীদ আছে। এই গ্রামের সব অধিবাসীরাই মুসলমান। এই মসজিদটীকে তাহারা জিয়ারত কহে। প্রায় প্রতি মুসলমান অধ্যুষিত গ্রামেই জিয়ারত দৃষ্ট হয়। এই জিয়ারতই কাশ্মীরের মোস্লেম বিশ্বাসের কেন্দ্রস্থল। কাশ্মীরে পীর উপাসনাই মুসলমানদের প্রধান কাজ। তাহাদের ভয়, ভক্তি, আমোদ, আহ্লাদ সবই এই জিয়ারতে সন্নিবিষ্ট।

জিয়ারত মন্দির কাশ্মীরের মুসলমান শিল্পের প্রকৃষ্ট নিদর্শন। এই জিয়ারতগুলির মধ্যে শ্রীনগরের ঝিলামনদীর তটে সাহী হামেদান নামক কাষ্ঠনির্ম্মিত জিয়ারতই দেখিতে সব চেয়ে সুন্দর। আলোক চিত্রণ ইহার সৌন্দর্য্য ব্যাখ্যা করিতে অক্ষম। এইখানে যাইতে হইলেই পয়সার দরকার; একবার দ্বারে দিতে হয়, আর ভিক্ষুকের অসম্ভব উৎপাত—এই দুই জ্বালায় সেখানে যাইতেই ইচ্ছা হয় না, কিন্তু এ জ্বালা সহিয়াও সৌন্দর্য্য-পিপাসু জনসাধারণ যাইয়া থাকে। জিয়ারতের অভ্যন্তর মধ্যাহ্নকালেও ঘোরতর তমসাবৃত। পর্ব্বদিনে অনেক আলো দেওয়া হয়; অন্য দিনে সামান্য কএকটী আলোক জ্বালিয়া রাখা হয়, কিন্তু তাহাতে অন্ধকার দূরীভূত হয় না। এই জিয়ারতে মুসলমানদের জন্য একটী অবৈতনিক পাঠশালা আছে। লোকে বলে মুসলমান পীর সাহী হামেদান সাহেবের আগমনের পূর্ব্বে এখানে একটী হিন্দু-দেবীর মন্দির ছিল, দেবীকে বাহিরে ফেলিয়া দেওয়া হয়। সেই মূর্ত্তিটী এখনও জিয়ারতের মেঝের তলায় প্রোথিত আছে। ভিত্তির উপর নদীর দিকে মুখ করা একটী প্রকাণ্ড পাথর আছে; হিন্দুরা ইহাকে পূজা করে।

শ্রীনগর হইতে তিন মাইল দূরে ডালহ্রদের তীরে হজরৎ নামক আর একটী জিয়ারত আছে। অন্যান্য জিয়ারত হইতে আকৃতি ও অভ্যন্তরে রক্ষিত দ্রব্যসম্ভারের তুলনায় ইহার যথেষ্ট পার্থক্য আছে। জ্যৈষ্ঠ মাসের শেষ ভাগে 'হজরৎ' উৎসব হয়। এখানে যাইতে হইলে খানিকটা জলপথে, খানিকটা স্থলপথে যাইতে হয়। যখন ভক্তেরা আনন্দ উল্লসিতচিত্তে জিয়ারত

অভিমুখে গমন করে, তখন তাহাদের কি উৎসাহ! সে দৃশ্য কি সুন্দর! সহর হইতে অধিকাংশ লোকেই নৌকাযোগে যায়, আর সহরতলীর লোকেরা পায়ে হাঁটিয়া ঘাটে আসে এবং উৎসাহের বশে খেয়া নৌকায় একেবারে এত লোক চাপিয়া বসে যে নৌকা ডুবিয়া যাইবার ভয়ে অনেককে নিরাশ করিয়া নামাইয়া দিতে হয়। কথিত আছে যে, এই জিয়ারতের অভ্যন্তরে একটী কাচের নলে মহম্মদের শ্মশ্রুর একটী কেশ রক্ষিত আছে। উহা দেখিতেই এখানে এতলোকের সমাবেশ হয়। জিয়ারতের সেবাইত মোল্লা একটী উচ্চবেদীর উপর দাঁড়াইয়া সেই সংক্ষুব্ধ জনসমুদ্রের সম্মুখে কাচের নলটী ধরেন আর সেই সঙ্ঘের প্রত্যেকেই উহা দেখিবার জন্য উদগ্রীব হইয়া উঠে আর মোল্লাও সেই সুযোগে ইহার পবিত্রতার কথা তাহাদের মনে দৃঢ়রূপে অঙ্কিত করিয়া দেন। মোল্লার বক্তৃতাকালে সকলেই যুক্তকরে বসিয়া এক একটী পার্শীমন্ত্র আবৃত্তি করে। কেহ কেহ আবার নিকটে যাইয়া কাচের নলটী স্পর্শ করিয়া ধন্য হয়। এই আধারটী স্পর্শ করিলেই না কি অন্ধের অন্ধত্ব পর্য্যন্ত ঘুচিয়া যায়। নানারূপ দ্রব্য সম্ভার উপহার প্রদত্ত হয়। উৎসবের দিন একটী মেলা বসে।

শ্রীনগর সহরে উপাসনার আরও স্থান আছে। এই সব মসজিদে প্রতি শুক্রবার ভিড় হয়। শ্রীনগর হইতে ২৯ মাইল উত্তরে বেজথেহারাই উৎসবের প্রধান স্থল। এখানে বাৎসরিক উৎসব, এই উৎসব সপ্তাহকাল ধরিয়া চলে। এই প্রকার বৃহৎ মুসলমান উৎসব ভারতবর্ষে খুব কমই হইয়া থাকে এবং অধুনা ইহা শীর্ষস্থান অধিকার করিয়াছে। মেলার মধ্যে রাস্তা দিয়া মুসলমান রমণীগণ গাহিতে গাহিতে যায়। সংলগ্ন গ্রাম হইতে তাহারা উৎসব দেখিতে আসে। উৎসবের ছয় দিনের দিন প্রধান উৎসব। ক্ষীর ভবানীতেও আর একটী প্রকাণ্ড হিন্দু মেলা বসে।

শ্রীনগরের জুম্মামসজিদটিও প্রকাণ্ড। এত বড় মসজিদ সহজে দৃষ্টিগোচর হয় না। বড় বড় মোটা মোটা স্তম্ভের উপরে প্রকাণ্ড ছাদ। মসজিদে প্রবেশ করিলে মনে হয় স্তম্ভবনে ঢুকিয়াছি। শুনিলাম ১৮০টী স্তম্ভ আছে। এই প্রকাণ্ড মসজিদ এখন ধ্বংসের পথে। আর বোধ হয় বেশী দিন ইহা বৃদ্ধ পঙ্গু দেহ লইয়া দাঁড়াইতে পারিবে না।

কাশ্মীরের মুসলমানেরা বিশ্বাসী, ধর্ম্মপরায়ণ এবং কুসংস্কারাপন্ন। ইহার প্রমাণ মুসলমান পণ্ডিতদের পাঠশালাটী ও প্রচলিত গানে পাওয়া যায়। *

শ্রীনলিনীমোহন রায় চৌধুরী।

জীবজন্তুর বাসস্থান।

(শেষাংশ।)

বাসস্থান-নির্ম্মাণে পক্ষীজাতি যেরূপ দক্ষতার পরিচয় দেয় চতুষ্পদ সেরূপ দক্ষতার পরিচয় প্রদান করিতে পারে না। শিল্পের হিসাবে এক একটি পক্ষীর বাসায় অনেক দেখিবার ও শিখিবার বিষয় আছে। কতকগুলি বিহঙ্গমকুলায় বড় দৃষ্টিসুখকর। যে বৃক্ষে সেরূপ বাসা নির্ম্মিত হয়, সে বৃক্ষের শোভা বর্দ্ধিত হয়।

* Modern Review হইতে গৃহীত।

পক্ষী-নীড় সাধারণতঃ ত্রিবিধ। কোন কোন পাখী মৃত্তিকা-বিবরে বাস করে, কেহ বা তরুকোটরে আশ্রয় গ্রহণ করে, আর অনেক বিহঙ্গম বৃক্ষশাখায় বা নিবিড় বনের ঝোপের মধ্যে বাসা নির্ম্মাণ করে। সহরের বৃহৎ অট্টালিকার অংশবিশেষে সুবিধামত অনেক পক্ষী সন্তানাদি পালন করিয়া থাকে।

আমাদের দেশের গাঙ্‌শালিখগুলা মৃত্তিকা-বিবরে বাস করে। ময়না পাখীও বিবরবাসী। অবশ্য মাঠের গর্ত্তে সাপ বা খরগোসের মত তাহারা বাস করে না। পক্ষী যেরূপ দুর্ব্বলদেহ তাহাদের পক্ষে শত্রু-পরিবেষ্টিত হইয়া ভূমিতে বাস করা একেবারে অসম্ভব। নদীর যখন এক কূল ভাঙ্গিতে থাকে, অপরদিকে তখন চড়া পড়ে। নদীর যেদিকে ভাঙ্গন আরম্ভ হয় জলের উপর হইতে দেখিলে সেদিকটা এক উচ্চ প্রাচীরের মত প্রতিভাত হয়। নদীবক্ষ হইতে একেবারে বিশ ত্রিশ হাত উচ্চ মাটির দেওয়ালের পদ ধৌত করিয়া তটিনীর জলরাশি ছুটিতে থাকে। পক্ষীরা বুঝিতে পারে সেদিক হইতে শত্রুর আক্রমণ অসম্ভব। শৃগাল, কুকুর, ভাম, খট্টাস কোন প্রকারে সেদিকে আসিতে পারে না। এক এক স্থলে নদীর পাড় এত দুরারোহ যে, অহিজাতিও বুকে হাঁটিয়া পক্ষীশাবক বা ডিম্ব চুরি করিবার জন্য সেস্থলে গমনাগমন করিতে পারে না। নদীর সেই সকল পাড়ে, গভীর গর্ত্তে গাঙ্‌শালিখ বাস করে। কৃষ্ণনগর হইতে নবদ্বীপ যাইতে জলঙ্গীর ধারে এক একস্থলে ঐরূপ গাঙ্‌শালিখের উপনিবেশ আছে। ঠিক কিরূপ উপায়ে উহারা বাসা নির্ম্মাণ করে, তাহা বলিতে পারি না। কিন্তু বাঙ্গালা দেশের অনেক খরস্রোতা প্রবাহিনীর ধারে গর্ত্তের ভিতর গাঙ্‌শালিখের বাসা দেখিয়াছি। নদীর জল হইতে প্রায় দশ বারো ফুট উপরে ইহাদের বাসস্থান নির্ম্মিত হয়।



গাঙ্‌শালিখের বাসা

গাঙ্‌শালিখের জাতি ভ্রাতা সোণাকাণী ময়না ঐরূপ গর্ত্তের ভিতর বাস

করে। পাহাড়ের গায়েই সাধারণতঃ উহারা বাসা নির্ম্মাণ করে। কেবল কঠিন পাহাড়ে ইহাদের মনস্তুষ্টি হয় না, ইহাদের বাসস্থানের সন্নিকটে জল থাকা আবশ্যক। গৃহে ময়নাপাখী পুষিলে, দেখিতে পাওয়া যায় যে, ইহারা নিত্য স্নান করিতে ভালবাসে।

বিলাতী কিংফিসার পক্ষী গর্ত্ত খুঁড়িয়া বাস করে। কিন্তু আমাদের দেশের মাছরাঙ্গা পাখীর সহিত বিলাতী কিংফিসারের জ্ঞাতিত্ব থাকিলেও আমাদের দেশের মাছরাঙ্গা গর্ত্তে বাস করে না। ইহারা গাছের উপর বাসা করিয়া সন্তানাদি পালন করে। আমি কলিকাতা সহরে আমাদের পল্লীতে স্বনামধন্য ৺কালীপ্রসন্ন সিংহ মহাশয়ের বাগানে একটি মাছরাঙ্গার বাসা দেখিয়াছিলাম। বায়সের উৎপীড়নে একটি শাবক রাস্তায় পড়িয়া গিয়াছিল। আমি তাহাকে পালন করিয়াছিলাম। কিন্তু বেচারা অধিক দিন জীবনধারণ করে নাই। বলা বাহুল্য, কলিকাতার ঠিক মধ্যস্থলে বাস করিয়া মাছরাঙ্গাকে আহার্য্য সংগ্রহ করিতে বহুদূর যাইতে হইত। বোধ হয়, জীবন-সংগ্রামের কঠোরতায় মৎস্যবহুল জলাশয়ের সন্নিকটবর্ত্তী স্থান ছাড়িয়া এই পক্ষী-মিথুনকে কলিকাতার জনতার মধ্যে বাস করিতে হইয়াছিল।

বিলাতের মাছরাঙ্গার কথা বলিতেছিলাম। ইহারা নদীর ধারে মৃত্তিকা-বিবরে বসবাস করে, ঘরের নীচেই মাছের ঝাঁক, আবশ্যকমত এক একটিকে ধরিয়া বেশ মনের সুখে বাসায় লইয়া গিয়া আহার করে। মৎস্যদেহে জঠরাগ্নি প্রশমিত করিয়া ইহারা অস্থিগুলি অনাবশ্যক বলিয়া ফেলিয়া দেয় না। সেগুলি বাসায় পাতিয়া শয্যা নির্ম্মাণ করে। বোধ হয়, হাড় থাকিলে অনেকক্ষণ মৎস্যের গন্ধ উপভোগ করিতে পারিবে বলিয়া ইহারা প্রথমে মৎস্যের কঙ্কাল সংগ্রহ করিয়া রাখিত। ক্রমশঃ সেগুলির দ্বারা গৃহসজ্জা করিয়া সৌন্দর্য্যস্পৃহা চরিতার্থ করিতে আরম্ভ করিয়াছে। বিলাতী মাছরাঙ্গা নাকি অনেক ডিম প্রসব করে। একটি পক্ষিণীর সকল ডিম পাশাপাশি সাজাইলে সেগুলি পক্ষিণীর দেহের আয়তন অতিক্রম করে।

পাফিন (Puffin) নামক একজাতীয় বিলাতী পক্ষী নদীর ধারে মাটির গর্ত্তে বাস করে। ইহাদের বাসা একেবারে ভূমির নিম্নে নির্ম্মিত হয়। তাই সময়ে সময়ে এক একটা শশক ইহাদের বিবরে প্রবেশ করিয়া শান্ত বিহঙ্গম পরিবারে দারুণ অশান্তির সৃষ্টি করিয়া থাকে।

পূর্ব্বে বলিয়াছি, অনেক পক্ষী তরুকোটরে বাস করে। আমাদের দেশের

কাঠঠোকরা তাহার উদাহরণ। ইহারা দুই পায়ে গাছের ডাল ধরিয়া ডানার ও লেজের পালক বিস্তার করিয়া গাছের মোটা ডালে ঠোকর মারিয়া গর্ত্ত খনন করে। ইহারা গাছের সার অবধি পঁহুছিতে পারে না। কাজেই কাঠঠোকরা বাসা খনন করিলে বৃক্ষ শুষ্ক হইয়া নষ্ট হইয়া যায় না। সেদিন কলিকাতার সন্নিকটবর্ত্তী সাঁতরাগাছি গ্রামে এক বন্ধুর প্রমোদোদ্যানে একটি বজ্রাহত নারিকেল বৃক্ষের স্কন্দে একটি ছোট সুরঙ্গ দেখিতে পাইয়াছিলাম। গর্ত্তটি বেশ গোল; তাহার ব্যাস চারি ইঞ্চি হইবে। কিছুক্ষণ লক্ষ্য করিয়া তাহাতে এক শালিখ পাখীকে প্রবেশ করিতে দেখিলাম। পরে বুঝিলাম, একটি শালিখ মিথুন সেই কোটরে বাস করে। অবশ্য শালিখ পাখীর বৃক্ষে ছিদ্র করিবার ক্ষমতা নাই। ইহা অন্য কোনও পশু বা পক্ষীর পরিত্যক্ত বাসস্থান।

এক শ্রেণীর পক্ষী মনুষ্যালয়ে বাস করে। পারাবতদিগকে বৃক্ষশাখায় বসিয়া থাকিতে দেখিয়াছি, কিন্তু বৃক্ষশিরে তাহাদিগকে বাসা বাঁধিতে দেখি নাই। ভগ্ন অট্টালিকার কার্ণিস, উচ্চ স্তম্ভের উপরিভাগ—এই সকল স্থলে ইহাদের বাসস্থান নির্ম্মিত হয়। মহাকবি মাইকেল লিখিয়াছিলেন—

কপোত কপোতী যথা উচ্চবৃক্ষ শিরে
বাঁধে নীড়, থাকে সুখে—

তিনি বোধ হয় ঘুঘু ও ঘুঘু-বধূ অর্থে কপোত-কপোতী শব্দ দুইটি ব্যবহার করিয়াছিলেন। হরিয়াল ঘুঘুরা খুব উচ্চ বৃক্ষশিরে নীড় রচনা করিয়া থাকে।



ঘুঘুর বাসা।

অপরাপর ঘুঘুও বৃক্ষশাখায় বাসা বাঁধিয়া থাকে, কিন্তু আমি একাধিক স্থলে মেটে ঘুঘুদের পায়রার মত গৃহস্থের কার্ণিসে বাসা করিতে দেখিয়াছি। সম্প্রতি কলিকাতা সহরের ভিতর মাণিকতলা ষ্ট্রীটে একটি বাটীর বারান্দায় এক জোড়া ঘুঘু বাসা রচনা করিয়াছিল। পায়রার বাসা দেখিলেই বুঝিতে পারা যায় যে, উহারা বৃক্ষশাখায় বাসা বাঁধিতে অক্ষম। কেবল কতকগুলি কাঠি সাজাইয়া ইহারা বাসস্থান নির্ম্মাণ করে। কাক চিল প্রভৃতির

বাসা গভীর—সেগুলিতে যেমন গর্ত্ত থাকে ইহাদের বাসায় সেরূপ গর্ত্ত থাকে না।

ঘুঘুর বাসাও তদনুরূপ। ইহাদের বাসা মোটে গভীর নহে কেবল কতকগুলা সোজাসুজি কাঠির তৈয়ারী বিছানার মত নীড়। তবে ইহাদের বাসা খুব নিবিড় ঝোপের মধ্যে অবস্থিত থাকে। অনেক সময় নির্জ্জন বনে নীচু ঝোপের মধ্যে ঘুঘুর বাসা দেখিয়াছি। আবার অনেকগুলা নীড় উচ্চ বৃক্ষশাখায় রচিত হয়। ঘুঘু বড় প্রেমিক, নেহাৎ স্বভাব-কবি। কিন্তু ইহাদিগের স্বর বড় করুণ।

মনুষ্যালয়ে বা ভগ্ন অট্টালিকার নিভৃত স্থলে কেবল পারাবত জাতি বাসস্থান নির্ব্বাচন করে না। টিয়াপাখীর ঝাঁক গৃহস্থের অট্টালিকার অংশবিশেষে দাবী রাখিয়া উহা সুখে স্বচ্ছন্দে ভোগ দখল করে। বাটীর উচ্চ প্রাচীরে একটু সুরঙ্গ, একটু কোটর পাইলেই শুক-সারী সন্তুষ্ট। দুই চারিটা কাঠি আনিয়া গর্ত্তের মধ্যে বিছাইয়া তাহারা সস্নেহে সন্তান পালন করিতে আরম্ভ করিয়া দেয়। ছাদের জল পড়িবার নলের মধ্যে টিয়া পাখীকে চৈত্র মাসে বাসা রচনা করিয়া "কাল বৈশাখী"র সান্ধ্য বরিষণে বিব্রত হইতে দেখিয়াছি।

সহরে শালিখগুলাও টিয়া পাখার মত আমাদের গৃহের নিভৃত কোটরে বাস করে। অবশ্য এইরূপ স্বেচ্ছায় প্রজা হইয়া মাঝে মাঝে তাহাদের বড় বেশী কর প্রদান করিতে হয়। শালিখ-শাবক যখন স্বাবলম্বন করিতে সমর্থ হয়, যখন চিঁ চিঁ শব্দ করিয়া তাহারা পল্লীর বালকদিগকে আপনাদের অস্তিত্ব জ্ঞাপন করে, তখন দুষ্ট বালক নানারূপ কৌশলে শালিখের বাসা হইতে "বৈশাখী বাচ্চা" অপহরণ করিয়া পক্ষীদম্পতিকে পুত্রশোকে বিহ্বল করিয়া তুলে।

চড়াই পাখী আমাদের গৃহের সহচর। একটু সুবিধা পাইলেই কড়ি কাঠের পার্শ্বে, দেওয়ালের ফাটা ফুটায় দুই চারি গাছা খড় কুটা, তাসা সুতা, নিজের পালক প্রভৃতি দিয়া গৃহসজ্জা করিয়া চড়াই যুবক নববধূ লইয়া বসবাস করিতে আরম্ভ করে। ইহাদের উপর বালক বালিকাদের তত কৃপাদৃষ্টি নাই। এক প্রকারের কাল কুৎসিত পক্ষীও জীর্ণ ঠাকুরদালানের কার্ণিসে বাস করে। ইহারা নিশাচর। ঝাঁক বাঁধিয়া জ্যোৎস্নার সময় ইহারা আকাশে উড়িয়া বেড়ায়। চামচিকেও অট্টালিকার মধ্যে পালকের বাসা করিয়া বসবাস করে। হুতোম পেঁচা দিবাভাগে কখন কখন গাছের ঝোপে লুকাইয়া থাকে বটে, কিন্তু সাধারণতঃ জীর্ণ অট্টালিকার নিভৃত অংশই ইহাদের আশ্রয় স্থল। লক্ষ্মী

পেচক ও তাহার কুটুম্ব কাল-পেঁচা, তরুকোটরে এবং অট্টালিকা-বিবরে বাস করে।

অনেক পাখী ঝোপের মধ্যে কিম্বা ভূমির উপর অণ্ড প্রসব করে। ইহারা বাসা গড়িবার উপাদান সংগ্রহ করিয়া গাছে উঠিয়া বৃক্ষশাখায় বাসস্থান নির্ম্মাণ করিবার কৌশল জানে না। ময়ূর, তিতির, সারস নানা রকম ফেজাণ্ট (pheasant) এই শ্রেণীর জীব। ইহারা শস্যক্ষেত্রেরই মধ্যে বেশ নিরাপদ স্থল বাছিয়া লইয়া সামান্য পরিশ্রম করিয়া সেই স্থলকে বাসোপযোগী করিয়া লয়। আমার বোধ হয় ইহার একটি বিশেষ কারণ আছে। ময়ূর বা সারস যেরূপ বৃহদায়তন বিহঙ্গম তাহাদিগকে বৃক্ষশাখায় বাসা করিতে গেলে রীতিমত বৃহৎ বাসভবন নির্ম্মাণ করিতে হইবে। ছোট শ্বাপদও সহজে ইহাদের সম্মুখীন হইতে পারে না। তাই নীচু ঝোপের মধ্যে বাস করিয়া ইহারা শাবক পালন করে। কেবল প্রসবকালে ইহাদের বাসস্থান আবশ্যক হয়, অপর সময় ইহারা মাঠের উপর বা গাছের ডালে বসিয়া সময়াতিবাহিত করে।

বাঙ্গালা দেশে এক প্রকার ছোট পাখী বাঁশঝাড়ের তলায় বাস করে। ইহাদিগকে নাচ্‌নী পাখী বলে। বেশ ছোট ছোট কৃষ্ণবর্ণের পক্ষী; লম্বে দুই তিন ইঞ্চি, লেজ লম্বা পায়রার মত। ইহারা নৃত্য-কলায় বিশেষ পারদর্শী। বনের ভিতর বোধ হয় ছোট ছোট পোকা ধরিয়া আহার করে, আর সুবিধা পাইলেই নৃত্য করে। পূর্ব্বে এ পক্ষী যত দেখিতাম এখন আর তত দেখিতে পাই না। বোধ হয় বৃক্ষমূলে বাসস্থান রচনা করে বলিয়া অনেক ক্ষুধার্ত্ত জীব ইহাদের অনায়াসলব্ধ দেহে জঠরাগ্নি নির্ব্বাপিত করে। যদি ইহারা পারিপার্শ্বিক অবস্থার সহিত আপনাদের স্বভাবের সামঞ্জস্য করিয়া না চলে, তাহা হইলেই ইহাদের উচ্ছেদ হইবে।

আমার বোধ হয় অধিকাংশ পক্ষীজাতিই বৃক্ষশাখায় বাসা বাঁধিয়া থাকে। সে বাসা নানাজাতীয়। যখন

ফাগুন মাসে দখিণ হতে হাওয়া
বকুল বনে মাতাল হ'য়ে এল।
বোল ধরেছে আম্র বনে বনে,
ভ্রমরগুলো কে কার কথা শোনে,
গুনগুনিয়ে আপন মনে মনে
ঘুরে ঘুরে বেড়ায় এলোমেলো।

তখন প্রতি তরুতে দুই চারিটা নূতন পাখীর বাসা দৃষ্টিগোচর হয়। এমন মনুষ্যপ্রধান কোলাহলপূর্ণ কলিকাতা সহরেও যে বৃক্ষটি দশ হস্ত অপেক্ষা অধিক উচ্চ তাহাদের মধ্যে কতকগুলিতে বসন্তে দুই চারিটা কাকের বাসা, কাহারও মগডালে একটা চিলের বাসা, কোথাও বা একটা 'নেকড়ে' শালিখের বাসা দৃষ্টিপথে পতিত হয়। আমি এই তিন রকম পাখীর নাম একত্র করিলাম, কারণ ইহাদের বাসা প্রায় একই উপাদানে গঠিত। 'নেকড়ে' শালিখের বাসা একটু গভীর হয়, কাকের বাসা গভীরতায় একটু কম, চিলের বাসা একটু উচ্চে অবস্থিত, অপেক্ষাকৃত কম গভীর। এ সকল বাসার উপকরণ এক—ঝাঁটার কাঠি, বাঁশের কঞ্চি, ছোট খাট লম্বা শিক, তার, নারিকেল রজ্জু, খোকার ঝিনুক, যুবতীর মাথার কাঁটা বা বুটজুতার ফিতা। তবে এই জাতীয় শালিখ জীর্ণ বস্ত্রখণ্ড পাইলেও বাসস্থানে বিছায় বলিয়া ইহাদের নাম নেকড়ে শালিখ। নেকড়ে বাঘের সহিত ইহাদের কোনও কুটুম্বিতা নাই।

একটু বন জঙ্গলে ঘুরিয়া বেড়াইলে দেখিতে পাওয়া যায় আমাদের দেশে ঐ শ্রেণীর পাখীর বাসাই অধিক। শকুনির বাসা খুব উচ্চে স্থিত—চিলের বাসার মত। বকের বাসারও গঠন ঐ রকম তবে উহা চক্ষুরন্তরালে অবস্থিত। নানা-জাতীয় হংসের বাসস্থানেরও আকৃতি ঐ প্রকারের। তবে সাধারণতঃ সেগুলি জলের ধারের নীচু ঝোপে রচিত হয়। ঈগলপক্ষী বৃহৎ মহীরুহের উচ্চ শিখরে চিলের বাসার মত নীড় রচনা করে।

কিন্তু বৃক্ষশাখার উপর গঠিত না হইলেও বৃক্ষশাখায় সংবদ্ধ বাবুই পাখীর বাসার নির্ম্মাণ-কৌশল বড় উচ্চদরের। এক প্রকার তৃণ দ্বারা ইহারা এই বাসা নির্ম্মাণ করে। সাধারণতঃ ঠিক সাপুড়ের তুবড়ী বাঁশীর মত এই ঘাসের বাসাগুলি তাল গাছে ঝুলিতে দেখা যায়। বাতাসের তালে তালে সেগুলি দুলিতে থাকে। যে গাছে এক জোড়া বাবুই বাসা করে, সেই গাছে অনেক বাবুই বাসা নির্ম্মাণ করে।

বাবুই পাখীর বাসার প্রবেশ-দ্বার নীচের দিকে। সুরঙ্গের মত প্রবেশ দ্বার দিয়া ভিতরে অঙ্গুলি দিয়া দেখিলে বুঝা যায় বাসার এক পার্শ্বে বেশ একটি গর্ত্ত আছে। পাখী ভিতরে ঢুকিয়া সেই গর্ত্তের মধ্যে বসে। বাসার প্রাচীরই সেই গৃহের তিন দিকের প্রাচীর। প্রবেশ-দ্বারের দিকে দুই তিন ইঞ্চি উঁচু একটি ছোট প্রাচীর। বাসার উপর দিকটি তালবৃন্তে সংবদ্ধ থাকে।

ঐরূপ দৃষ্টিসুখকর কৌশল-নির্ম্মিত নানাপ্রকার পাখীর বাসার কথা আমরা

ইংরাজী পুস্তকে পাঠ করি। অবশ্য সে সকল বাসার পরিচয় দিবার স্থান আমাদের নাই। দর্জ্জি পাখী নাকি ভারতবর্ষে দেখিতে পাওয়া যায়। আমি তো অদ্যাবধি এ পক্ষী দেখি নাই বা কেহ স্বচক্ষে ইহাদের দেখিয়াছে, এমন ব্যক্তির সহিত পরিচিত নহি। ইংরাজ জীবতত্ত্ববিদেরা নানা স্থলে এ পক্ষী দেখিয়াছেন। উড্ সাহেবের পুস্তক হইতে নিম্নের চিত্রখানি সংগ্রহ করিয়া দিলাম।



দর্জ্জি পাখী।

দর্জ্জি পাখীর বাসা প্রধানতঃ পত্র-নির্ম্মিত। পাখীগুলি ছোট ছোট। ইহারা প্রথমে বৃক্ষের একখানি শক্ত পাতা বাছিয়া লয়। মুচিরা যেমন চামড়ায় গর্ত্ত করিয়া শেলাই করে, ইহারাও তেমনি তীক্ষ্ণ চঞ্চু দ্বারা সেই পাতার ধার ফুঁড়িয়া গর্ত্ত করে, এক রকম ঘাস আনিয়া সেই পাতার সঙ্গে অপর একখানি পাতা সেলাই করে। আবার পাতাখানি মুড়িয়া অপর দিকটি সেলাই করে, এইরূপে চারিদিক সেলাই করিয়া লম্বা আকারের পাতার বাসা সম্পূর্ণ করে। অবশ্য সমস্ত দিক তৃণ দ্বারা সেলাই করিয়া উপরে কতকটা প্রবেশের পথ রাখিয়া দেয়। তাহার ভিতর দিয়া গৃহে প্রবেশ করিয়া নিজের গাত্রের পালক বিছাইয়া

দর্জ্জি পাখী (Tailor Bird) বাসাটিকে বেশ আরামপ্রদ ও গরম করিয়া লয়। ইহার বাসস্থান বড় নিরাপদ। বাহির হইতে সহজে কেহ সন্দেহ করিতে পারে না যে, এইরূপ যুক্ত পত্রগুলার মধ্যে পাখীর ছানা প্রতিপালিত হইতেছে।

এইরূপ উচ্চ শিল্পের পরিচায়ক অনেক রকম বাসার উল্লেখ ইংরাজি গ্রন্থে পাওয়া যায়। আমাদের দেশে কিন্তু বাসা নির্ম্মাণে বাবুই পাখী অপেক্ষা অধিক শিল্পকুশলতা কোন পক্ষী প্রদর্শন করিতে পারে না। নিম্নে আর একটিমাত্র দৃষ্টিসুখকর কারুকার্য্যের পরিচায়ক বিহঙ্গম-নীড়ের বর্ণনা করিয়া এ প্রবন্ধ সমাপ্ত করিব। বিলাতের প্রসিদ্ধ পক্ষীতত্ত্ববিদ্ পণ্ডিত গোল্ড,উড্ প্রভৃতি সাহেব অশেষ প্রকার পক্ষীর বাসার প্রতিকৃতি সংগ্রহ করিয়াছেন। সেগুলি দেখিতে বড় সুন্দর, বড় চারুশিল্পবিশিষ্ট। সাধারণতঃ এগুলি অষ্ট্রেলিয়ার পক্ষী। নিম্নে



মধুভুক্ পক্ষী।

যেরূপ চিত্র সন্নিবেশিত হইল, প্রায় ঐরূপ আকারের বাসা এক শ্রেণীর পক্ষী পাহাড়ের ভিতর শৈবালের মধ্যে নির্ম্মাণ করিয়া থাকে। এক শ্রেণীর পাখী বাবুই পাখীর বাসার মত দোদুল্যমান নীড় নির্ম্মাণ করিয়া পাহাড়ের ঝরণার

নিকট বাস করে। ইহাদিগকে "নির্ঝর পক্ষী" (Cataract Bird) বলা হয়। ইহাদের বনের মধ্যে দেখিতে পাওয়া যায় না। নানা প্রকার মধুভুক্ পক্ষীর বাসায় বেশ শিল্পচাতুর্য্য দেখিতে পাওয়া যায়। চিত্রের মধুভুক্ পক্ষার বাসাটি গোল্ড সাহেব বিলাতের লিভারপুল প্লেন্‌স্ নামক স্থলে আবিষ্কার করিয়াছিলেন। পক্ষীর নাম Lanceolate Honey Eater। বাসাটি ছোট, শিশুর দোলনার মত, গাছের শাখার প্রান্তে রচিত। ইহার নিম্নে স্রোতস্বিনী। নদীর উপর বৃক্ষের বিস্তৃত শাখায় চারুশিল্পযুক্ত পক্ষী-নীড় দেখিতে বড় সুশোভন। বাসাটি অপেক্ষাকৃত ছোট। পক্ষিণী অতি সন্তর্পণে কুলায় প্রবেশ করে। ঘাস, পশম, গাছের সূতায় এ নীড় নির্ম্মিত।

সকল শ্রেণীর জীবজন্তুর বাসস্থানের পরিচয় দিবার স্থান আমাদের নাই। যতগুলি জীবের বাসস্থানের বর্ণনা দিলাম, তাহা হইতেই বুঝা যায় জগদীশ্বরের সৃষ্টি কি মধুর! তাঁহার সৃজিত জীবগণকে পালন করিবার জন্য তিনি তাহাদিগকে কত প্রকারেরই কৌশল শিখাইয়াছেন।

শ্রীকেশবচন্দ্র গুপ্ত।

কাব্য-কথা।

ছেলে নিরেট্ মূর্খ হইলেও, তাহার পক্ষে এখন যেমন বনিতা পাওয়া শক্ত নয়, আধুনিক মাসিকও তেমনি যদি একেবারে ত্রয়োদশ শ্রেণীর হয়, তবু তাহার কি সংখ্যায় অন্ততঃ পাঁচ ছয়টি কবিতার অভাব হয় না। বনিতা ও কবিতা,—এ দুইই খুব সহজলভ্য হইয়াছে। তবে সাধারণ লেখক বুঝেন না—"কবিতা বনিতাশ্চৈব সুখদাঃ স্বয়মাগতাঃ।"

শুনিয়াছি, দৈবপ্রেরণা (Inspiration) না আসিলে কবিতা লেখা যায় না। আলোচনা করিয়া দেখিয়াছি, মাসিকের কবিদের প্রাণে দৈবপ্রেরণা আসে, চারিবার। যথা :—

১। নব বর্ষে

২। বসন্তকালে

৩। বর্ষায়

৪। বর্ষ-শেষে

কবিরা আরও একবার দৈব-প্রেরণার বশীভূত হন,—তাহা বিবাহের প্রীতি-উপহার রচনাকালে। বাঙ্গালী পাঠকের পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত বিরাট পুণ্যফলেই হউক, কিংবা অন্য কোনও কারণেই হউক,—বিবাহের কবিতা মাসিকে ছাপানো একটা ফ্যাসান্ দাঁড়াইয়া যায় নাই। কারণ, তৎফলে বন্ধুর উদ্বাহ, পাঠকের পক্ষে উদ্বন্ধনে পরিণত হইবার প্রচুর ভয় ছিল।

প্রত্যেক জিনিষেরই একটা না একটা সার্থকতা থাকে। সুতরাং মাসিকের তথা-কথিত কবিতাগুলির সার্থকতা কি, তাহা দেখা দরকার। প্রথমেই ত' দেখিতে পাই, এ সকল 'কাব্যি'তে পাঠক ভুলেন না এবং এ ধরণের কবিতা না ছাপাইলেও তাঁহারা বার্ষিক মূল্য পাঠাইতে আদৌ কৃপণতা প্রকাশ করেন না। অতএব দেখা গেল যাঁহাদের জন্য কাগজ,—সেই পাঠকশ্রেণীর দিক হইতে ইহার কোন সার্থকতা নাই।

দ্বিতীয়তঃ দেখি, প্রবন্ধ ও গল্প ছাপাইয়া, কাগজের মাঝে মাঝে যে একটু আধ্টু জায়গা খালি থাকে, সম্পাদকেরা তাহা 'ভর্ত্তি' করিয়া দিবার জন্য কিছু ব্যস্ত হইয়া উঠেন। তখন এই শ্রেণীর কবিতা আবশ্যক হয়। অতএব, এক্ষেত্রে মাসিকের কবিতার একটী চমৎকার সার্থকতা আছে—তাহা সাদা কাগজ কালো করা।

তৃতীয়তঃ—আর একটী সার্থকতা আছে। যাত্রার দলে 'জুড়ী' যেমন মাঝে মাঝে দাঁড়াইয়া উঠিয়া নানান্ রকম কস্রৎ দেখাইয়া গান সুরু করিয়া দেয়,—(অথচ তাদের গান অভিনয় পক্ষে একেবারে অবান্তর—সময়ে সময়ে শ্রোতার পক্ষে প্রাণহানিকর।) এ শ্রেণীর কবিতাও তেমনি একটী বাঁধা-গৎ বজায় রাখিবার খাতিরেই মাসিক-পত্রের শোভা সম্বর্দ্ধনের চেষ্টা করে।

অতঃপর, করযোড়ে মাসিকের সম্পাদকগণকে জিজ্ঞাসা করি, এই বিষম 'জুড়ীর গান',—এই সাদা কাগজ কালো করিবার ফিকির, আর কত দিনে বন্ধ হইবে? স্কুল পলাইয়া অনেক দুগ্ধপোষ্য শিশুকে 'ইডন গার্ডেনে'র ঝোপে-ঝাপে বসিয়া পদ্য লিখিতে দেখিয়াছি, বেজায় বাদলে বৃষ্টি ও রাস্তার কাদা'র ভয়ে 'আড্ডা'য় যাইতে না পারিয়া কার্য্যাভাবে অনেক কবিকে ঘরে বসিয়া নাচার হইয়া 'বর্ষা-মঙ্গল' লিখিতে দেখিয়াছি। সাগর দর্শন না করিয়াও অনেক কল্পনা-কুশল মহাকবিকে "মহাসাগর" নামধেয় মহাকাব্য লিখিতে দেখিয়াছি, কিন্তু কোন পাঠককে ঐরূপ অপরূপ কাব্যসুধাপানে ভোর হইতে দেখি নাই। তাই বলিতেছি তাঁহাদেরই পরিশ্রমলব্ধ অর্থে পুষ্ট মাসিকপত্রে আর কতদিন এই সকল রাবিশ বাহির হইবে?

আধুনিক কবিতার কতকগুলি লক্ষণ আছে। তাহাতে থাকিবে :—

১। মিঠা, মোলায়েম শব্দ

২। হেঁয়ালি

৩। 'নাচুনি ছন্দ'

৪। রবীন্দ্রনাথের অনুকরণ

এগুলি আধুনিক কবিতার শীলমোহর। এই মোহরের ছাপ্ না থাকিলে কোন কবিতা মাসিকের উপযুক্ত বলিয়া নির্ব্বাচিত হইবে না। অতঃপর, আধুনিক কাব্যে কি থাকিবে না, সেটাও বলা উচিত :—

১। ভাব

২। আন্তরিকতা

৩। মৌলিকতা

৪। গভীরতা

যিনি 'কবি' খেতাব্ চান, তিনি যেন এগুলি বর্জ্জন করেন।

আজকাল আবার আর একদল কবি জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। তাঁহারা ভগবদ্ভক্ত। ঈশ্বরভক্তি জিনিষটা যে অত্যন্ত মধুর,—কোন্ পাষণ্ড তাহা অস্বীকার করিয়া সিধা নরকে যাইবে? তবে, কবিরা যদি 'আঁতুড় ঘর' হইতেই 'ঈশ্বর! ঈশ্বর!' বলিয়া গর্জ্জন সুরু করিয়া দেন, তাহা হইলে আমরা পাষণ্ডের দল ত' যথেষ্ট পরিমাণে দমিয়া যাইবই; পরন্তু, খোদ্ ভগবানও যে কিঞ্চিৎ স্তম্ভিত হইতে বাধ্য, তাহাতে সন্দেহ নাস্তি!

এই ভক্ত কবির দল একান্ত আকস্মিক ভাবেই আত্মপ্রকাশ করিয়াছেন। রবীন্দ্রনাথের "নৈবেদ্য" ও "গীতাঞ্জলি" প্রকাশের আগে বাঙ্গলা কাব্যে কেবল পীরিতি, চাঁদিনী ও মলয় বাতাসের বাড়াবাড়ি ছিল, এরূপ ঈশ্বরভক্তি তখন বড় একটা নজরে ঠেকিত না। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ যেমনি ঈশ্বর-বন্দনা ধরিলেন, তথাকথিত কবির শ্রেণীও অমনি আকাশ হইতে সদ্যপতিতের মত বাঙ্গলার কাব্য-কুঞ্জ ভরিয়া ফেলিলেন। রবীন্দ্রনাথের ভক্তি আছে। ইঁহাদের আছে, "অতি ভক্তি"। প্রবাদ বলে, এটা "চোরের লক্ষণ।"

এই নকলনবীশদের অত্যাচারে আসল কবিত্ব ক্রমেই চাপা পড়িয়া যাইতেছে। রবীন্দ্রনাথের অবলম্বিত ছন্দের অক্ষর, যতি ও মাত্রা ঠিক্ বজায় রাখিয়া, অনুকারিগণ সেই 'ফরমা'য় ফেলিয়া কথার হের ফের ওলট পালট করিয়া বর্ষা-স্ফীত নদীস্রোতের মত কবিতাস্রোতে মাসিক পত্রিকাগুলিকে প্লাবিত করিতে-

ছেন। ফলে অবস্থা এমন শোচনীয় করিয়া তুলিয়াছেন যে, মূল রবীন্দ্রনাথের ছন্দ পর্য্যন্ত একান্ত 'একঘেয়ে' হইয়া উঠিয়াছে। রবীন্দ্রনাথ শক্তিধর। তাঁহার মত প্রতিভা শতবর্ষের ভিতর বড়জোর একটী হওয়া সম্ভব,—হয় ত' তাহাও সকল সময়ে হয় না। তিনি ভাব-সাগরের ভিতরে ডুব দিতে পারিয়াছেন,—কিন্তু তাঁহার অনুকারিগণ তেলের মত উপরেই ভাসিয়া আছেন,—ডুব দিয়া রত্ন তোলা তাঁদের কাজ নয়।

তাঁহারা 'রবীন্দ্রীয়' ছন্দঃ ও শব্দ-লালিত্য অনেকটা দখল করিতে পারিয়াছেন বটে,—এমন কি তাঁহাদের এক-একজনের কবিতা সময়ে সময়ে মিষ্টত্বে রবীন্দ্রনাথকেও ছাড়াইয়া উঠে—কিন্তু ঐ পর্য্যন্ত। এই নকলিয়ার দল, আর এক পা অগ্রসর হইতে পারেন নাই। রবীন্দ্রনাথের মিষ্টত্ব আর আমরা চাহি না—আমরা এখন চাহি, রবীন্দ্রনাথের চিন্তাশক্তি, সূক্ষ্মদর্শন ও ভাবাভিব্যক্তি। কিন্তু হায়, এঁদের কাছে এগুলি চাওয়া, আর বনে বসিয়া-কাঁদা—এই দুই এক কথা। কারণ, বাঙ্গলার আধুনিক কাব্য হইয়াছে,—ঠিক গ্রামোফনের রেকর্ডের মত। পুরানো গানই তাহাতে বাজে—নূতন সুর তাহা শুনাইতে পারে না, কখনও পারিবে কি না, কে জানে!

নূতন সুর শুনাইতে না পারুন,—তাহা শুনাইবার চেষ্টা করিতেও ত' বড় কাহাকেও দেখি না। এমন চেষ্টা দেখিলেও আনন্দ হয়। কিন্তু এ আনন্দেও আমরা বঞ্চিত। আধুনিক কাব্যে বাহিরের আদব-কায়দা প্রায়ই ঠিক বজায় থাকে। তাহার ছন্দঃবন্ধ নির্দ্দোষ, তাহার অক্ষরগুলি গুনিয়া গুনিয়া বসানো। তাহার শব্দসম্পদ অতুল এবং তাহার মিল কোথাও রীতিছাড়া নয়—আজকালকার অধিকাংশ নব্য কবি এ গুণগুলি ঠিক দখল করিয়াছেন। কিন্তু "যা কিছু দুঃখ অন্নবস্ত্রে"র, যা কিছু অভাব, ভাবের আন্তরিকতার, প্রাণের। দেখিয়াছি, কোন কোন সমালোচক ভাবশূন্য কবিতাকেও অনায়াসে ক্ষমা করেন, কিন্তু মিলের একটু ত্রুটী, ছন্দের একটু খুঁৎ, মিষ্ট বাছা বাছা শব্দের সামান্য অভাব দেখিলেই একেবারে রক্তচক্ষুঃ ও রুদ্রমূর্ত্তি হইয়া উঠেন।

তবে ইহাদের মধ্যে কয়েকজন নূতন কবি, এই দুর্ভিক্ষের দিনেও মাঝে মাঝে দু'এক মুষ্টি তণ্ডুল বিতরণ করিতেছেন—এই যা আশার কথা। বস্তাপচা মাল লইয়া সাহিত্যের হাটে তাঁহারা বিকিকিনি করেন না—এখনও দুই একটী নূতন ঝঙ্কার দিয়া তাঁহারা আমাদিগকে আশান্বিত করিয়াছেন। কিন্তু সময়ে সময়ে মাসিকপত্রের সম্পাদকের তাগাদায় তাঁহারাও অনেকস্থলে গন্তব্য পথ

হইতে দূরে সরিয়া গিয়া কৃত্রিমতার সৃষ্টি করিয়া বসেন। কিন্তু, একথা তাঁহাদের ভুলিলে চলিবে না যে,—সম্পাদকের অনুরোধই যথার্থ সত্য না—তাহাই সত্য, যাহা কাব্যলক্ষ্মীর আশীর্ব্বাদে পবিত্র। সাময়িক বুদ্বুদ হইতে, অন্তরঙ্গ বন্ধুর 'বাহবা' পাইতে তাঁহারা সাহিত্যব্রত গ্রহণ করেন নাই; পরন্তু, তাঁহাদের কার্য্যের উপরে জন-সাধারণের আশার সফলতা নির্ভর করিতেছে। তাঁহারা কবি,—তাঁহারা "স্বর্গের পুরোহিত।"

বাঙ্গালা কাব্যে যদি কোন কবি-যশঃপ্রার্থী নাম কিনিতে চান, তবে তাঁহাকে টপ্পার চটুলতা ভুলিতে হইবে। শ্রোতা এখন ধ্রুপদ শুনিতে চায়। কামিনীর আঁচলের ছায়া ছাড়িয়া, এখন জগতের কর্ম্মক্ষেত্রে গিয়া দাঁড়াইতে হইবে। স্বপ্নের যুগ চলিয়া গিয়াছে, এখন জাগরণের সময় আসিয়াছে। বাঙ্গালীর চিত্ত এখন নানাদিকে বিক্ষিপ্ত। জীবন-সংগ্রামে, দারিদ্র্যে, হীনতায়, সামাজিক সমস্যায় সমগ্র বঙ্গদেশের ভিতরে এখন এক নূতন প্রেরণা জাগ্রৎ হইয়াছে। এই প্রেরণার ফলে আমরা এমন একজন কবি দেখিতে চাই, যিনি সিন্ধুকাফি ভুলিয়া গায়িবেন দীপকরাগ, যিনি নারী-সুলভ পেলবতা ফেলিয়া,—দিবেন বজ্রাদপি কাঠিন্য, যিনি প্রকৃতির নৈশ কুহেলী মুছিয়া, দেখাইবেন প্রভাতের নব সূর্য্যালোক!

যিনি স্বদেশের, স্বজাতির সম্মুখে নূতন আদর্শ, নূতন চরিত্র, নূতন ভাব আনিয়া দিতে না পারিবেন, যিনি মানবের জীবন-সমস্যার সমাধান করিতে, যুগ-ধর্ম্মের প্রকৃত বিশেষত্ব বুঝাইয়া দিতে অক্ষম, যিনি তাপীর ব্যথা নিবারণ করিতে, শোকাতুরের অশ্রু মুছাইতে, হতাশকে আশার কথা শুনাইতে অক্ষম, তাঁহাকে 'কবি' বলিলে কবিনামের অপমান করা হয়। বিজ্ঞাপন তাঁহাকে 'কবি' বলিয়া ঘোষণা করিলেও, সে ঘোষণায় রসগ্রাহী সাড়া দিবেন না—কারণ, তিনি বিলক্ষণই বুঝেন যে, "কাকো ন চ রাজহংসঃ।"

বাঙ্গলার কাব্যকুঞ্জে বসিয়া যে কবি এখন রাগিণীশূন্য বংশীতানে—ভাবশূন্য শব্দলীলায় মস্‌গুল, তাঁহার দিকে কেহ যেন ফিরিয়া না চান। কারণ, শিশুর মত অর্থহীন ভাষা লইয়া, আজ পর্য্যন্ত কোন দেশের কোন কবি নাম কিনিতে পারেন নাই। কাব্য-পটে একটা জাতির প্রাণের কথা, মানসিক ইতিহাস, হৃদয়ের ঘাত-প্রতিঘাত এবং সাময়িক শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও সভ্যতা বিকসিত হইয়া উঠে। আজ যদি আমরা কেবল অনুকরণ করিয়া, আন্তরিকতাশূন্য শব্দের ঝঙ্কার লইয়া এবং কামকলুষিত বাহুরূপে বিলম্বিত হইয়া থাকি,—তাহা হইলে

ভবিষ্যতের সাহিত্যের ইতিহাসে আমাদের যে চরিত্র লিখিত থাকিবে,—তাহা দেখিয়া আমাদের বংশধরদের ঘৃণা ও অপমানে জগতের সম্মুখে মস্তক অবনত করিবে।

যে নদীর স্রোত বদ্ধ, যাহাতে নূতন ধারা নাই, তাহা বিবিধ ব্যাধির কারণ হইয়া দাঁড়ায়। যে ফুলের গাছে আর ফুল ফুটে না, যাহা শুখাইয়া গিয়াছে, তাহা উদ্যানকে অশোভন করে। সাহিত্যও এইরূপ হইলে আশঙ্কার যথেষ্ট কারণ থাকে। যে সাহিত্যে নূতন সৃষ্টি নাই, যাহা পুরাতনের পুনরাবৃত্তি মাত্র, তাহা কখনও কাহারও উপকারে আসে না। এরূপ সাহিত্য, স্রোতঃশূন্য বদ্ধ নদীর জলের মত অস্পৃশ্য। শুষ্ক পুষ্পতরুর মত অবহেলার যোগ্য। যাঁহার নূতন কিছু বলিবার আছে, তিনি দশের মাঝে আসিয়া দাঁড়ান, সকলে তাঁহার সমাদর করিবে। কিন্তু যিনি কেবল বলা-কথা আবার বলিয়া নাম কিনিতে চান, জন-সাধারণ তাঁহাকে সরাইয়া দিয়া তাঁহার স্থানে অপর কোন যোগ্য ব্যক্তিকে আনিয়া বসাইবে। ইহাই চিরন্তন বিধি। মাসিক-সাহিত্যের সূত্রপাত এদেশে অতি অল্পদিনই হইয়াছে। এই অল্পদিনের ভিতরেই মাসিকের আসরে প্রতিভাশূন্য কত কবি আত্মপ্রকাশ করিয়াছে, কত প্রলাপ বকিয়াছে, কিন্তু কেহই তাহাদের বালকতায় কর্ণপাত করে নাই; ফলে, স্রোতের শৈবালের মত তাহারা কোথায় ভাসিয়া গিয়াছে, আজ কেহ সে খোঁজ রাখে না। অল্প প্রতিভা লইয়া অধিক বাক্যব্যয় করিয়াছিলেন বলিয়া শতাধিক পুস্তক-প্রণেতা ৺ রাজকৃষ্ণ রায়কে লোকে আজ ভুলিয়া যাইতেছে—কিছুদিন পরে তিনি শুধু ইতিহাসের দুটী পংক্তিতেই হয় ত' বিরাজ করিবেন। আধুনিক যুগের নবীন কবিরা যেন এই কথাগুলি একটু তলাইয়া বুঝেন। তাহা হইলে, তাঁহারাও অনর্থক পরিশ্রম ও নিরাশা হইতে নিস্তার পাইবেন এবং বাঙ্গালী পাঠক-সমাজও আর তুচ্ছ আবর্জ্জনার ভারে অতিষ্ঠ হইয়া উঠিবেন না। অমরতা,—বালকের ক্রীড়নক নয়, শক্তিহীনের হস্তগত নয়; পরন্তু, তাহা মহা-মনীষার, অতুল প্রতিভার আদেশ-নমনীয়া। পৃথিবীর ইতিহাস, ইহার সাক্ষী।

উপসংহারে নিবেদন, আমার এই প্রবন্ধ সমালোচনা নয়; ইহাকে ইঙ্গিত বলিতে হয়, বলুন, ইহাকে ক্রন্দন বলিতে হয়, বলুন,—কিন্তু এই যৎকিঞ্চিৎ রচনাকে কেহ যেন ব্যক্তিগত খেয়াল বলিয়া মনে না করেন। ইহা দেশের প্রাণের আকাঙ্ক্ষা, ইহা সমগ্র জাতির বাসনার প্রতিধ্বনি।

শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায়।

শোক সংবাদ।

আমরা শোক-সন্তপ্ত চিত্তে প্রকাশ করিতেছি যে, বিগত [illegible]শে জ্যৈষ্ঠ মঙ্গলবার, বঙ্গদর্শন সম্পাদক শৈলেশচন্দ্র মজুমদার মহাশয় বসন্ত রোগাক্রান্ত হইয়া অকালে ইহলোক ত্যাগ করিয়াছেন। তিনি সুলেখক ও সৎসাহিত্যিক ছিলেন,—বিনয় ও পরোপকার তাঁহার ভূষণ ছিল, অনেক নিরাশ্রয়ের তিনি আশ্রয়দাতা ছিলেন। তাঁহার মৃত্যুতে অনেকেই তাঁহার অভাব অনুভব করিবে। ভগবান তাঁহার শোক-সন্তপ্ত পরিবারবর্গকে সান্ত্বনা প্রদান করুন।

ঠাকুরবাড়ীর একটি বিরাট স্তম্ভ খসিয়া পড়িল। ২২শে জ্যৈষ্ঠ শুক্রবার, বেলা দ্বিপ্রহরের পর রাজা স্যার সৌরেন্দ্রমোহন ঠাকুর ৭৪ বৎসর বয়সে ইহধাম ত্যাগ করিয়াছেন। গানে, গুণে, জ্ঞানে, শিষ্টাচারে, সামাজিকতায় তাঁহার মত বাঙ্গালায় আর কেহ ছিল না। তিনি ১৮৪০ খৃষ্টাব্দে জন্ম গ্রহণ করেন। পরলোকগত হরকুমার ঠাকুর মহোদয়ের ইনি কনিষ্ঠ পুত্র। লোকান্তরিত মহারাজ স্যার যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর ইঁহার অগ্রজ ছিলেন। রাজা স্যার সৌরেন্দ্রমোহন ১৮৭১ খ্রীষ্টাব্দে বেঙ্গল একাডেমী অব মিউজিক নামক দুইটি সঙ্গীত বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। উভয় বিদ্যালয়ই তাঁহার ব্যয় এবং তত্ত্বাবধারণে পরিচালিত হইত। রাজা স্যার সৌরেন্দ্রমোহন সঙ্গীত শিল্প-কলায় অসাধারণ কৃতিত্ব প্রদর্শন করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার সঙ্গীত নৈপুণ্যের পরিচয় প্রাপ্ত হইয়া প্রাচ্য এবং পাশ্চাত্য জগৎ অসংখ্য উপাধি প্রদান করিয়া তাঁহাকে সম্মানিত করিয়াছিল। তিনি ভারতীয় বিভিন্ন রাগ রাগিণী সংযোগে ইংরাজী জাতীয় সঙ্গীত গাহিবার পন্থা উদ্ভাবন এবং ইংরাজী জাতীয় সঙ্গীতের বাঙ্গালা অনুবাদ করিয়া লণ্ডনের জাতীয় সঙ্গীত সমিতির নিকটে বিশেষরূপে সম্মানিত হইয়াছিলেন। ১৮৮০ খ্রীষ্টাব্দে রাজা স্যার সৌরেন্দ্রমোহন কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফেলো মনোনীত হন এবং সি. আই. ই, ও রাজা উপাধি প্রাপ্ত হন। ১৮৮৪ খ্রীষ্টাব্দে তিনি নাইট উপাধি লাভ করেন। বাঙ্গালীদিগের মধ্যে ইনিই সর্ব্বপ্রথমে এই উপাধি লাভ করেন। শুক্রবার বেলা চারি ঘটিকার সময়ে তাঁহার শবকে কুসুমদাম এবং কারুকার্য্য খচিত মূল্যবান ভেলভেটে আবৃত করিয়া সমারোহে সৎকার করিবার জন্য গঙ্গাতীরে আনয়ন করা হইয়াছিল। মৃত মহাত্মার ইচ্ছানুসারে তাঁহার প্রিয় সেতারটিকে তাঁহার শবের সহিত চিতানলে ভস্মীভূত করা হইয়াছিল। সঙ্গীত-শিল্প-বিশারদ রাজা স্যার সৌরেন্দ্রমোহনের মৃত্যুতে কেবল বাঙ্গালার নহে, সমগ্র ভারতের বিষম ক্ষতি হইল। তাঁহার পুত্র মহারাজ স্যার প্রদ্যোৎকুমার ঠাকুর, রাজকুমার শ্যামকুমার ঠাকুর এবং শোকসন্তপ্ত পরিবারবর্গ এই দুঃসহ শোকে শান্তি লাভ করুন ইহাই আমাদিগের কামনা।

আমরা গভীর শোকের সহিত প্রকাশ করিতেছি যে, বিগত ২৯শে জ্যৈষ্ঠ শুক্রবার কলিকাতার বিখ্যাত ঔষধের ব্যবসায়ী "বটকৃষ্ণ পাল কোং"র প্রতিষ্ঠাতা স্বনাম পুরুষধন্য বটকৃষ্ণ পাল মহাশয় শ্রীশ্রী৺কাশীধামে নশ্বর দেহ ত্যাগ করিয়া সাধনোচিত ধামে প্রস্থান করিয়াছেন। সামান্য ব্যবসায়ে তিনি জীবন-যাত্রা আরম্ভ করিয়াছিলেন এবং অধুনা উহা ভারতবর্ষের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করিয়াছে। ভারতবর্ষে এমন কোনও বিলাতী ঔষধালয় নাই যাহা বটকৃষ্ণ পাল মহাশয়ের ঔষধের কারবারের সমকক্ষ হইবার উপযুক্ত। তাঁহাকে সম্মান দেখাইবার জন্য তাঁহার মৃত্যু-দিবসে কলিকাতার যাবতীয় ঔষধের ব্যবসায় বন্ধ হইয়াছিল। তাঁহার মৃত্যুতে আমরা একজন আদর্শ ব্যবসায়ী হারাইয়াছি। দুঃখের সময়ও সান্ত্বনার কথা যে, তাঁহার উপযুক্ত জ্যেষ্ঠ পুত্র ভূতিবাবুও পিতৃগুণের অধিকারী, বিনয়ী ও মিষ্টভাষী। ভগবান তাঁহার শোকসন্তপ্ত পরিবারবর্গকে শান্তিবারি প্রদান করুন।



স্বর্গীয় হরিদাস গুপ্ত

Engraved & Printed by
THE FINE ART PRINTING SYNDICATE,
Jorasanko, Calcutta.

বাঙ্গলার সঙ্গীত।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর।)

বাঙ্গালায় যখন এই ত্রিধারার সমন্বয় করিয়া শ্রীচৈতন্যদেব, সমস্ত রাগ-রাগিণীর মধুরতা মথিয়া, ছাঁকিয়া, নিঙ্ড়াইয়া লইলেন, তখন বাঙ্গালীর নিজস্ব বলিবার এক পরম উপাদেয় অমৃত প্রস্তুত হইল, এ অমৃতে বাঙ্গালীর অজীর্ণতা কখনও হয় নাই, হইবার নয়। পরম দার্শনিক, পরম বৈজ্ঞানিক ও চরম আধ্যাত্মিক শ্রীচৈতন্যদেবের উপহার, আমাদের দেশ ও বাঙ্গালী, যতদিন বাঁচিবে ততদিন মাথায় করিয়া রাখিবে।

প্রথম বা আদি বৈষ্ণব-সঙ্গীত জয়দেবের থাক, তাহা হইতে পরে কীর্ত্তন পর্য্যন্ত পৌছিবে। তখন বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস, জ্ঞানদাস, বদন, মনোহর, মধু, ইত্যাদি মহাজনেরা রকমফের করিয়া কীর্ত্তনানন্দের উল্লাসে গা ভাসাইয়াছেন।

তার পর সদারঙ্গী খেয়ালের সুরের অনুকরণে ভারতচন্দ্র, রামপ্রসাদ, আজু গোঁসাই, দেওয়ান মশাই, দাশরথি, কমলাকান্ত, শিবচন্দ্র, হরচন্দ্র, নবচন্দ্র, গোবিন্দ, হরেন্দ্র, ব্রজকিশোর, নন্দকুমার, রামমোহন ইত্যাদি কত নাম করিব— রাজা মহারাজা থেকে ছোট খাট সাধক ভক্ত শক্তি বা সাধন গীত গাহিয়া তাহার অংশ হইতে বঞ্চিত হন নাই।

তার পর শোরী মিঞার দৌলতে নিধুবাবু, শ্রীধর কথক, রাম বসু, রাধামোহন, গোপাল হইতে রবিবাবু পর্য্যন্ত তার বখ্‌রাদারী করিতেছেন।

বাঙ্গালায় যখন সঙ্গীতের বহুল চর্চ্চা ছিল, তখন অনেকেই অল্পবিস্তর ধ্রুপদ, খেয়াল, টপ্পা, ঠুংরী, গজল ইত্যাদি কিছু না কিছু জানিতেন।

ধর্ম্মচর্চ্চা হইতে সামাজিক সমস্ত ব্যাপারে সঙ্গীত উচ্চস্থান অধিকার করিয়া অধিষ্ঠান ছিল। রাজা বাদসা হইতে জমীদারবর্গ সঙ্গীতের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন, সুতরাং সঙ্গীত সহানুভূতির স্বাতি নক্ষত্রের জল পাইয়া যাহা প্রসব করিত, তাহা খুব দরে বিক্রয় হইত। অনেক সুবিখ্যাত গায়ক, তন্ত্রকার ও বাদক স্বেচ্ছায় বাঙ্গালায় আসিতেন, তাঁহাদের কৃপায় বাঙ্গালী অনেক শিক্ষা করিতে পারিয়াছিল, তার পর সভ্যতার প্লাবনে যখন বাঙ্গালা তোলপাড়, তখন ক্রমে এই সঙ্গীত-সাধনায় ভাঁটা পড়িতে লাগিল, কালে স্মৃতি ক্ষীণ রেখা

মাত্রে পর্য্যবসিত হইল অভিভাবকেরা আর তেমন স্ন…জরে দেখিতে পারিলেন না। তার অনেক কা…ণও ছিল।

যখন সঙ্গীতের শ্রেষ্ঠ আসন ছিল… সেই সুযোগ ও সুবিধার মাহেন্দ্রক্ষণে অনেকগুলি সাধক ভক্ত ক বি বাঙ্গালায় আবিভূ‍ত হইয়া এখানকার মাটী পবিত্র করিয়াছিলেন, তাঁহাদের দয়ায় তখন অনেকে যথার্থ জ্ঞান ও ভক্তি লাভ করিয়া ধন্য হইয়াছিলেন। বন্যার প্লাবনের ন্যায় …প সব যেন ধুইয়া মুছিয়া গেছে। সে সংযোগ ধ্বংস হইয়া গিয়াছে,তার সঙ্গে… প্রকৃত জ্ঞানলাভের বিশেষ বৈলক্ষণ্য ঘটিয়াছে, তবে একেবারে যে মুছিয়া গিয়াছে তা বলা যায় না। সুদূর ইংলণ্ড বা ফ্রান্স হইতে যেমন বায়স্কোপের ছবি আসে আর আমরা তাই দেখে আনন্দে অধীর হই, সেইরূপ আমরা যখন সেই অতীত ধ্বংসাবশেষের মধ্য হইতে আমাদের পূর্ব্ব-প্রণষ্ট সৌন্দর্য্য-গৌরবের প্রতিচ্ছায়া প্রতিফলিত দেখিয়া আনন্দে আত্মহারা হই।

সুচিন্তিত সুলিখিত বিষয় বা প্রবন্ধের শীর্ষদেশে আমাদের মহাপ্রিয় প্রাচ্য বা পাশ্চাত্য কবির দুই এক ছত্র তুলিয়া না দিয়া যখন থাকিতে পারি না, তখন আমরা ধন্য হই—সুতরাং ধনী হইয়া পড়ি, ধনী হইতে গেলেই ঋণী হইতে হইবেই। সেই ঋণ আমাদের অজ্ঞাতে অসতর্ক মুহূর্ত্তে কথঞ্চিৎ শোধ হয়, আর তখন মহামহিম পাট লিখিয়া রাজকর প্রদান করি ও তখনই বুঝিতে পারি পদ্য-সাহিত্য গদ্য-সাহিত্যের জনয়িতা ও রাজা, কেন না এক একটী শ্লোক ব্যাখ্যা করিতে গিয়া গদ্য-সাহিত্যের জন্মলাভ হইয়াছে। আবার অপর পক্ষে এক একটী গানে রাশিকৃত গদ্য-সাহিত্যের মাল-মস্লা সঞ্চিত আছে। আমাদের যাত্রা, পাঁচালী, কবি, তরজা, থিয়েটার তাহার স্বতঃসিদ্ধ প্রমাণ। তবেই দেখা যায় ও বুঝা যায় কে কাহার প্রজা।

আর বৈষ্ণব-সাহিত্যই আমাদের আদি গুরু, পূর্ব্বেই বলিয়াছি যেমন ভৈরব রাগ সকলের আদি, সেইরূপ এমন কোন ভাব নাই যাহা বৈষ্ণব সাহিত্য হইতে লওয়া না যায়। মহাজনের পদাবলীর আদর তাই চিরকালই আছে ও থাকিবে। আবার কালে এই বৈষ্ণব-সাহিত্যের আদর সমগ্র পৃথিবী-পরিব্যাপ্ত হইবে। কেন না তাহাতে কৃত্রিমতারূপ মখমলের তালি পড়ে নাই। ভাবে, ভাষায়, অলঙ্কারে, রাগে, বৈষ্ণব-সাহিত্যের মাহাত্ম্য অতুলনীয়।

এখন এই যুগের কথা ধরা যাক্। কম্পাস ও দাঁড়িপাল্লা করিয়া যে সব কবিতা রচনা হয় বা গীতি-কবিতার ভাস্বর ভাতি মধ্যাহ্ন ভাস্করের ন্যায় চক্ষু

ঝলসিয়া দেয়, তাহাদের একটা নূতন প্রদর্শনী-ক্ষেত্রে (museumএ) স্থান করিয়া দিলে ভাল হয়, কেন না তাহাতে কবিতার নূতন বন্দেজের একটা শ্রেণী বিভাগ হইয়া থাকে'। দেখিতে পাই; কোন কোন কবিতার ভাব-বাহুল্য ঠিক যেন গম্ভীর মেজাজী মাতব্বর মাষ্টারের মত হইয়া পড়ে। কোথাও বা শব্দ-সম্পদের পরিচ্ছদে আধুনিক রঙ্গালয়ের মত পরিচয়-গৌরবে হীন, কেহ বা রাগরঙ্গকে নিমন্ত্রণ করিয়া আনে, ভোজ্য-পানীয়ের তারতম্য করিয়া ফেলেন, কোন কোন কবিতা বনেদী অলঙ্কারের ঔজ্জ্বল্যে লজ্জিত হইয়া আশু চটকদার গীল্টি ও পালিশ চড়ান।

সংহত, শোভন ও সংযত সীমার মধ্যে ভাব, রাগ, ভাষা ও অলঙ্কার বিষয়ের তারতম্য অনুসারে কীর্ত্তিমান্ হইয়া আকার ধারণ করে। যুক্তি, মত ও বিশ্বাস সেখানে সন্দেহ আনিতে দেয় না।

সঙ্গীতের ইতিহাস-আলোচনায় বুঝিতে পারি, গীতি-কবিতা রচনা করিতে গেলে সঙ্গীতজ্ঞ হইলে ভাল হয়। রচয়িতাকে যে সুকণ্ঠ সুগায়ক হইতেই হইবে এমন কোন কথা নাই। সকলকেই যে বৈজু, গোপাল, তানসেন বা ঈশ্বাবরষ, সদারঙ্গ বা শোরী হইতে হইবে, এমন কোন কথা নাই, তবে সঙ্গীত-বিজ্ঞানে বৈদ্য হইলে ভাল হয়, চিকিৎসক না হইলেও চলে।

এখনকার অধিকাংশ রচয়িতা অপরের হস্তে সুর দিবার ভার দেন। অনেকে এখন তাহার দোষ দেখিতেই পাইতেছেন। কেন না একজনে গান বাঁধিবে, অপরে তাহার মনের ভাবের সঙ্গে ঐক্য করিয়া সামঞ্জস্য রাখিয়া সুর দিবে, এরূপ লোক অতি বিরল। সাহিত্যে সব দিকে দখল আছে, অথচ সুর, লয়, তাল জ্ঞান আছে, এমন লোক যদি থাকেন তবে তাঁহার হাতে সুর দিবার ভার দিলে গানের প্রতি কথা প্রাণে বাজে, কথা ভাঙ্গে না। ভাঙ্গা কথার দৃষ্টান্ত অনেক আছে।

রবিবাবু তাঁহার নিজের গানে নিজেই সুর বসান, তাই তাঁহার গানের কথা সুরের সঙ্গে খাপ খাইয়া যায়। প্রাণে ধাক্কা লাগে। গান বাঁধিবার আগে তিনি সুরটা আগে ভাঁজিয়া লইয়া একটী মনোমত ছন্দে কথা সাজাইয়া দেন। আবার তাঁহার গান ভাঙ্গিবার পদ্ধতিও চমৎকার, যথা "ফুলি বন ঘন" ধ্রুপদের নকল "আজি মম মন" ইত্যাদি। কোন ধ্রুপদ বা খেয়ালের ছন্দ যতি ও কথার হিসাব বজায় রাখিয়া নিজের ভাষায় গান রচনা করিবার তাঁহার অদ্ভুত ক্ষমতা।

রজনীবাবুর গানে সুর কথার সঙ্গে তালে তালে নাচিয়া চলিয়া যায়, সুতরাং

মধুর। তিনি নিজে বাঁধিয়া গায়িয়া গিয়াছেন, তাঁহার গানের কবিতাও চৌকাবন্দী, পরন্তু খাঁটী বাঙ্গালা।

দ্বিজেন্দ্রলাল নিজের গানে সুর বসাইবার যেকৃমই কতকটা রাখিতেন, তবে একটু যেন বিলাতী ঢং আসিয়া পড়িত, ইহা আমার বিশ্বাস।

বিহারীবাবু তাঁহার নিজের মনগড়া সুরের ছকে গান বাঁধিয়া পরে বড়ই সন্দিগ্ধ হইয়া পড়েন,কেমন একটা হাঁকু-পাকু ভাব আসিয়া পড়ে। তাঁহার নিজের গান কোন সভায় আমরা তাঁহাকে গাহিতে শুনিয়াছি, তবে যে সুরে তিনি গায়িয়াছিলেন, সঙ্গীতাচার্য্য রায় বৈকুণ্ঠনাথ বসু বাহাদুর সে গানের প্রাণ-প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। কি ধ্রুপদ, কি খেয়াল, কি কীর্ত্তন, এমন মন-প্রাণ-মাতান সুর-সংযোজনায় তিনি অদ্বিতীয়। অনেক গুণ তাঁহার অধিকারে, তিনি সুলেখক, নাট্যকার, সমালোচক, সঙ্গীতজ্ঞ, সুরের ও তালের যন্ত্র তাঁহার আয়ত্ত। বিহারীবাবুর বহু গানে ও কীর্ত্তনে তিনি প্রাণ-প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন, সে সুর যে শুনিয়াছে সে মজিয়াছে, ইহা আমার বিশ্বাস। বৈকুণ্ঠবাবুর সুরে কথার ওলট-পালট হয় না, কথা ভাঙ্গে না। যন্ত্রী না হইলে, ইহা বুঝিবার, বুঝাইবার—শুনিবার, শুনাইবার অধিকার বড় একটা আসে না।

এখন একটা কথা আমার বলিবার আছে। আমার বিশ্বাস যদি গান-রচয়িতাগণ একটু সুরের চর্চ্চা করেন, আমার বলিবার উদ্দেশ্য যে, তাঁহারা একটু আধটু (রাগ-রাগিণীর হিসাবে না হউক) সামান্য রকম গায়িতে পারেন ও তার পর গান বাঁধেন, তাহা হইলে ভাল হয়। ইহা একটু চেষ্টা ও যত্ন-সাপেক্ষ।

কোন সভায় রজনীবাবু ও দ্বিজেন্দ্রলালের স্মৃতি-সম্মান-রক্ষার্থ, বিহারীবাবু একটী সঙ্গীত-বিদ্যালয়-স্থাপনের প্রস্তাব উত্থাপন করিয়াছিলেন, আমার মনে আছে। উদ্দেশ্য সাধু। কিন্তু হইলে কি হয়, আমরা যে ভাক্ত।

ইংলণ্ডে,জার্ম্মাণিতে ও অন্যান্য দেশে আজকাল সঙ্গীতটা শিক্ষার মধ্যে পরি-গণিত। এক জার্ম্মাণিতে তিন লক্ষেরও অধিক লোক গান-বাজনা জানে,সেখানে যে যাহার গানে সুর বসায় ও অল্প-বিস্তর সঙ্গীতের আলোচনা করে। ভারতীয় সঙ্গীতকে তাহারা সুনজরে দেখিতে আরম্ভ করিয়াছে, কালে জার্ম্মাণি যেরূপ সর্ব্ব বিষয়ে উন্নতি করিতেছে, হয় ত একদিন আমাদেরই জীবদ্দশায় শুনিতে পাইব, রত্নাকর, দামোদর, পারিজাত, নিবোধ ইত্যাদি তাহাদের ভাষায় তর্জ্জমা হইতেছে এবং তৎপরে ফ্রান্স ও ইংলণ্ড সে প্রবাহে গা ঢালিয়া দিয়াছে। তখন

আমরাই তাহাদের লিখিত টিপ্পনি পুস্তকের সাহায্যে আমাদের সঙ্গীতের নকলে দখলীকার হইব। সে দিনের আর বড় বেশী দেরী নাই, দেখিয়া শুনিয়া এই রকমটা বোধ হয়।

Halley's comet আসা অবধি হাওয়া বদ্‌লাইয়াছে, সঙ্গীতের চর্চ্চার আরম্ভ হইয়াছে। রাজা সৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুরের সঙ্গীত-বিদ্যালয় উঠিয়া গিয়াছে, সে আজ বহুদিনের কথা। "সঙ্গীত সঙ্ঘ" নামে বিদ্যালয় সুদূর বালিগঞ্জের কোলে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, এখন কলিকাতার মধ্যে একটী বিদ্যালয়ের বিশেষ প্রয়োজন। জন কতক শিক্ষক তৈয়ার করিয়া লইতে হইবে, তাহার পরে নারায়ণ মুখ তুলিয়া অবশ্যই চাহিবেন।

সময়-সংক্ষেপের অনুমান-অনুপাতে আমি যথাসাধ্য আমার আলোচ্য বিষয় সংক্ষেপের গণ্ডীমধ্যে আনিতে চেষ্টা করিয়াছি। আমার সাধ্যানুসারে "সাহিত্যে সঙ্গীত" সম্বন্ধে মোটামুটি কয়েকটী কথা বলিলাম; এত সংক্ষেপে যখন আমারই তৃপ্তি হইল না, তখন সুধী সজ্জনগণের তৃপ্তিসাধন করিবার আশা আমি আদৌ করিতে পারি না; তবে আমার এইমাত্র ভরসা যে, গত বৎসর হইতে সাহিত্য-সম্মিলনে এ সম্বন্ধে আলোচনা হইতেছে এবং অনেকেই এ বিষয়ে আগ্রহ প্রকাশ করিতেছেন, দিকে দিকে স্পন্দনারম্ভ হইয়াছে, তখন আমাপেক্ষা যোগ্যতর ব্যক্তি এ বিষয়ের বিশদ আলোচনা করিয়া সাহিত্যে সঙ্গীতের অবনতি-অবসাদ ঘুচাইবার পক্ষে তৎপর হইবেন। এ সম্বন্ধে যেমন করিয়া বুঝান উচিত, আমি তেমন করিয়া বুঝাইতে না পারিলেও, ইহা অবশ্য স্থির যে, আমাদের মাতৃভাষার সাহিত্যাঙ্গে অন্য সকল বিভাগের ক্রমোন্নতি-সাধন সন্তোষদায়ক হইলেও সঙ্গীত-বিভাগটা বড় আশাপ্রদ নহে।

শ্রীশরৎচন্দ্র সিংহ।

আক্ষেপ।

আমি আপনার তরে ডাকি যে তোমারে,
তোমারে ত' আমি চাহি না;
তোমারে দেখিতে আকুলিত চিতে
তোমার কাছে ত' আসি না!

আমি অনুরাগ দিয়া ডালি সাজাইয়া
তোমার তরে ত' আনি না;
ভক্তি-বারি দিয়া ও পদ ধুইয়া
প্রেম-বসনে ত' মুছি না।

আমি হৃদয়-লতার কুসুম-সম্ভার
ও পদতলে ত' ঢালি না;
মানস-চন্দন করিয়া লেপন
পা দু'খানি বুকে ধরি না।

আমি ভিখারীর মত দ্বারে অবিরত
যাহা চাই তাই মাগি যে;
আসি তারি তরে তোমার দুয়ারে,
আসি না তোমার লাগি যে।

আমি যে বেদনা, তুমি সে সান্ত্বনা,—
এই জানি, আর জানি না;
নিশিদিন তাই, তব দয়া চাই,
তোমাকে ত' কই চাহি না!

আমি যে অকূলে. তুমি নেবে তুলে,
ডাকিলে, তোমার তরীতে;
সে তরী আনিতে পারি ত' ডাকিতে,
কই পারি ভালবাসিতে?

কবে, সুখ দুঃখ ফেলে, আপনাকে ভুলে,
তোমার সকাশে আসিব;
শুধু তোমা' তরে ডাকিব তোমারে,
ভালবাসি ব'লে, চাহিব!

শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র মিত্র।

আর্য্যজাতির সামাজিক জীবন।*

প্রাচীনকালে যে জাতি সাহিত্য, দর্শন প্রভৃতি বিভিন্ন বিভাগে উন্নতির পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়াছিল, এই প্রবন্ধে সেই আর্য্যজাতির প্রাচীন সামাজিক অবস্থা বা রীতিনীতির আলোচনা করা হইল।

গবর্ণমেণ্ট।—প্রাচীনকালে আর্য্যজাতির মধ্যে কোনও জাতিভেদ ছিল না। তাহারা পরিব্রাজকের ন্যায় ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিয়াও বেড়াইত না, পরন্তু গৃহীর ন্যায় কুটীরে বাস করিয়া কৃষিকার্য্য দ্বারা জীবিকানির্ব্বাহ করিত (?) গো, মেষ, ছাগল চারণ করিত। তাহারা ভূমিকর্ষণ, খাল, বিল প্রভৃতি পয়ঃপ্রণালীর কর্ত্তন, এবং অগ্নি, বরুণ প্রভৃতি দেবতাগণের আরাধনায় দিনাতিপাত করিত। ইহাদের মধ্যে এক শ্রেণীর লোক ছিলেন তাঁহারা আত্মার উন্নতির জন্য সর্ব্বদাই ধ্যানমগ্ন থাকিতেন। কৃষি, বাণিজ্য প্রভৃতির বিভিন্নতা হেতু একটি কেন্দ্রশক্তির প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি হওয়ায় সমাজ একজন যুদ্ধবিদ্যাবিশারদ, রণনিপুণ ব্যক্তিকে নৃপতিত্বে বরণ করিবার প্রস্তাব করে। ফলে সৈনিক-শ্রেণীস্থ লোকেরা "ধনুর্ব্বেদ"-পাঠের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করে। তাহারা যে শুধু তরবারি, ঢাল প্রভৃতি লইয়া যুদ্ধ করিতে শিক্ষা করিত তাহা নহে, পরন্তু ইতিহাস, পুরাণ প্রভৃতিও তাহাদিগকে শিখিতে হইত। 'দশকুমার চরিতে' রাজার কর্ত্তব্য-সম্বন্ধে বিশেষ উল্লেখ আছে। দশকুমার চরিতের উক্তি এই যে, রাজার পক্ষে বিবিধ ভাষা, যুদ্ধবিদ্যা, অশ্বচালনা, শাসন-কৌশল, ধর্ম্মতত্ত্ব, সঙ্গীত, বেদ, জ্যোতিষ, চিকিৎসাশাস্ত্র প্রভৃতি শিক্ষা ও অধ্যয়ন করা উচিত। শ্রীমদ্ভাগবতে উল্লেখ আছে যে, শ্রীকৃষ্ণ এবং বলরাম বেদ, উপনিষদ, ধনুর্ব্বেদ, মনু এবং অন্যান্য স্মৃতি, দর্শন, যুদ্ধবিজ্ঞান এবং রাজকীয় নৈতিক কর্ত্তব্যাদি শিক্ষা করিয়াছিলেন। নৃপতিবৃন্দকে কৃষি ও বাণিজ্য প্রভৃতিও শিক্ষা করিতে হইত। মনুসংহিতা বলেন, যে রাজা মানসিক বৃত্তির দৌর্ব্বল্য-নিবন্ধন প্রকৃতিপুঞ্জকে নিপীড়ন করে সেই রাজাকে সপরিবারে রাজত্ব-সুখলাভে বঞ্চিত করা কর্ত্তব্য। মনুসংহিতা, বিষ্ণুপুরাণ ও মুদ্রারাক্ষসে এরূপ

---

* Calcutta Review পত্রে প্রকাশিত "The Social Life of the Aryas" নামক প্রবন্ধাবলম্বনে লিখিত।—লেখক

কয়েকজন নরপতির নামোল্লেখ আছে, যাঁহারা প্রজাবর্গের উপর অত্যাচার করায় সিংহাসনচ্যুত হইয়াছিলেন। গবর্ণমেণ্ট রাজতন্ত্র থাকিলেও যথেচ্ছাচার-মূলক ছিল না। প্রজাবর্গ কোনও রাজাকে সিংহাসনচ্যুত বা সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করিতে পরস্পর পরামর্শ করিত; সুতরাং রাজা সম্পূর্ণরূপে প্রজাবৃন্দের মতামতের অধীন ছিলেন, একথা বলিলে বোধ হয় অত্যুক্তি হয় না। রাজা যযাতি যখন তদীয় কনিষ্ঠ পুত্রকে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করিতে মনস্থ করিলেন, প্রজাসাধারণ একত্র হইয়া রাজার প্রস্তাবে আপত্তি উত্থাপন করেন। অবশেষে যখন রাজা যযাতি তাহাদের নিকট তাঁহার অভিপ্রেত বিষয় বর্ণনা করিলেন তখন তাহারা সকলে রাজার প্রস্তাবে সম্মত হইল। রাজা দশরথ শ্রীরামচন্দ্রকে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করিবার পূর্ব্বে প্রজাবর্গকে আহ্বান করিয়া তাহাদের মতামত গ্রহণ করিয়াছিলেন। আদিপর্ব্বে দেখিতে পাওয়া যায় যখন পাণ্ডবগণ দ্রৌপদীকে বিবাহ করিয়া হস্তিনাপুরে প্রত্যাগমন করিলেন তখন প্রজাবর্গ সম্মিলিত হইয়া কে হস্তিনাপুরের রাজা হইবেন, সেই প্রশ্ন সম্বন্ধে তর্ক-বিতর্ক করিয়াছিলেন। তাহারা সকলেই একবাক্যে বলিল যে, যুধিষ্ঠির পাণ্ডবদিগের মধ্যে জ্যেষ্ঠ বলিয়া, তিনি রণবিদ্যায় সুনিপুণ বলিয়া এবং আদর্শ চরিত্রবান বলিয়া তাঁহাকেই হস্তিনার রাজসিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করা হউক্। পরীক্ষিতের মৃত্যুর পর তাঁহার শিশুপুত্রকে রাজসিংহাসনে স্থাপন করিতে নাগরিকগণ দেশের অধিবাসিবৃন্দকে আহ্বান করিয়াছিলেন।

উল্লিখিত কতিপয় উদাহরণ পাঠে স্পষ্ট প্রতীতি হইতেছে যে, রাজ-সিংহাসনের উত্তরাধিকারী-নির্ব্বাচনে প্রজাবর্গের মতামত সবিশেষ মূল্যবান ছিল।

শঙ্কর বলেন, রাজা অপেক্ষা রাজকীয় আইনই অধিকতর শক্তিশালী ছিল। রাজা রাজ্যশাসনব্যাপারে মন্ত্রণা-সভার সভ্যগণের সহিত পরামর্শ করিতেন।

যুধিষ্ঠিরের রাজ্যাভিষেকের সময় বৈশ্য, শূদ্র প্রভৃতি নিমন্ত্রিত হইয়াছিল এবং যথোচিত যত্নসহকারে অভ্যাগতগণকে জাতিবর্ণনির্ব্বিশেষে আহার ও বাসস্থানাদিও দেওয়া হইয়াছিল। যুধিষ্ঠির বা ভীষ্মের সময়ে "জাতিভেদ প্রথা" পূর্ণ মাত্রায় বিদ্যমান ছিল।

বৈদিক যুগ হইতে ভারতীয় গ্রাম্যসমিতির আরম্ভ হয়। এই সময়ে প্রতি গ্রামে গ্রামের 'মাতব্বর' বা মণ্ডল ছিল। করসংগ্রহ ও শাসনবিষয়ে গ্রামের সহিত সহরের এবং সহরের সহিত অর্থ-সচিবের পত্র ও সংবাদাদি

আদান-প্রদান চলিত। গ্রীক্ লেখকগণ বলেন যে, তাঁহারা আলেকজান্দারের ভারতাক্রমণের সময় এদেশে ভিন্ন ভিন্ন বিভাগে ভিন্ন ভিন্ন কর্ম্মচারী দেখিয়াছিলেন। এই কর্ম্মচারিবৃন্দ আপন আপন কর্ত্তব্যানুসারে কেহ বা নদী আবর্জ্জনা পরিষ্কার করাইতেন, কেহ করসংগ্রহ করিতেন, কেহ শ্রমজীবিদিগের কার্য্যের তত্ত্বাবধারণ করিতেন, আবার কেহ বা জন্ম-মৃত্যুর তালিকা সংগ্রহ করিতেন। এতদ্ব্যতীত বিদেশাগত ব্যক্তির প্রতি যথোচিত আতিথ্যসৎকারের জন্যও এক শ্রেণীর লোক ছিল। লোকহিতকর কার্য্যের জন্য দেশের হিতৈষী ব্যক্তিবর্গ রাজার সহিত কথোপকথন করিতেন, কোন কোন গ্রন্থে এরূপ উল্লেখও দেখিতে পাওয়া যায়। রাজ্যের মন্ত্রণা-সভার সভ্যগণের শাসনকর্ত্তা, প্রাদেশিক শাসনকর্ত্তা, সহকারী শাসনকর্ত্তা, কোষাগারের পর্য্যবেক্ষক, সৈন্যাধক্ষ, নৌবিভাগীয় অধ্যক্ষ প্রভৃতির নিয়োগে সম্পূর্ণ অধিকার ছিল। রাজা, দৈনন্দিন ভগবদুপাসনা সমাপনান্তে প্রাসাদে প্রবেশ করিয়া মিষ্ট সম্ভাষণে সমবেত প্রজাবর্গকে প্রীত করিতেন। রামায়ণে শ্রীরামচন্দ্রের প্রজাবর্গের কুশলাদি জিজ্ঞাসার ভূরি ভূরি উল্লেখ আছে। প্রজাবর্গের সহিত কথাবার্ত্তার পর রাজা প্রাসাদের একটী নিভৃত কক্ষে বসিয়া কাজকর্ম্ম করিতেন। তদনন্তর তিনি সৈনিক-জন-সুলভ ব্যায়াম করিতেন। সন্ধ্যাগমে তিনি সন্ধ্যা-বন্দনাদি করিতেন। তারপর পুনরায় সংবাদ-প্রেরকবর্গের সংবাদাদি পাঠ করিতেন। নৈশ-ভোজনের সময় রাজার সম্মুখে গায়কগণ সুমধুর সঙ্গীত করিত। মধ্যরাত্রে তিনি নিভৃতে বসিয়া রাজ্যসংক্রান্ত অত্যাবশ্যক গূঢ় বিষয়াদির পরামর্শ করিতেন।

মনুর মতে, রাজার পরামর্শের জন্য সাতজন কিংবা আটজন পরামর্শদাতার প্রয়োজন ; এতদ্ব্যতীত রাজার দূত ও প্রধান সৈন্যাধ্যক্ষও ছিল। মহাভারতের শান্তিপর্ব্বে দৃষ্ট হয়, ভীষ্ম, বেদজ্ঞ আটজন ব্রাহ্মণ, রণদক্ষ আটজন ক্ষত্রিয়, একবিংশতিজন বৈশ্য, তিনজন শূদ্রদ্বারা একটি পরামর্শ-সভা গঠন করিবার প্রস্তাব অনুমোদন করিতেছেন। রাজনীতিক ক্ষেত্রে মহাভারতীয় যুগে কোনও প্রকার জাতিভেদ প্রথা বিদ্যমান ছিল না।

মহাভারতের শান্তিপর্ব্বে রাজধর্ম্মবর্ণনপ্রসঙ্গে রাজার যে সমস্ত কর্ত্তব্য বর্ণিত হইয়াছে তদপেক্ষা মহত্তর আদর্শ আর কোন দেশের কোন গ্রন্থে দৃষ্ট হয় কি না সন্দেহ। উত্তর রামচরিতের পাঠকগণ জানেন রামচন্দ্র প্রজাবর্গের মনস্তুষ্টির জন্য রাজধর্ম্মপালন করিবার অভিপ্রায়ে বলিয়াছিলেন—

"স্নেহং দয়াঞ্চ সৌখ্যঞ্চ যদি বা জানকীমপি
আরাধনায় লোকানাং মুঞ্চতো নাস্তি মে ব্যথা।"

প্রজাতন্ত্র—গ্রাম্য রীতিনীতি-অনুসারে দেশ শাসিত হইত। গ্রামসমূহ স্বায়ত্ত শাসন ভোগ করিত। গ্রীক্ লেখকগণ উল্লেখ করিয়াছেন যে, তাঁহারা ভারতে স্বায়ত্ত শাসনাধিষ্ঠিত গ্রামসমূহ দেখিয়াছিলেন। টমাস্ বলেন, "প্রাচীন ভারতে প্রজাতন্ত্র বিদ্যমান ছিল।"

বিচার-পদ্ধতি—রাজার রাজধানীস্থ বিচারালয়ই প্রধান বিচারালয় ছিল। রাজা স্বয়ং বিচারপতির কার্য্য করিতেন। পাঁচ সাতজন করনির্দ্ধারক, একজন ব্রাহ্মণ, একজন প্রধান বিচারপতি এবং একজন পুরোহিত এই কার্য্যে রাজাকে সহায়তা করিতেন। এই সমস্ত সহায়তাকারীকে বিচারকার্য্যে দক্ষ ও নিরপেক্ষ হইতে হইত। যদি কোন করনির্দ্ধারক স্নেহ, লাভাশা বা ভয়ের বশীভূত হইয়া আপন কর্ত্তব্য কার্য্যে অবহেলা করিতেন তাহা হইলে তাঁহাদিগকে অর্থদণ্ডে দণ্ডিত করা হইত। রাজা যদি আপন কর্ত্তব্য কার্য্যে অবহেলা করিতেন, তাহা হইলে পুরোহিত তাঁহাকে ভর্ৎসনা করিতেন ও সদুপদেশ দিতেন।

রাজার বিচারালয়ের অব্যবহিত পরে প্রধান বিচারপতির বিচারালয় ছিল। প্রধান বিচারপতিও সাতজনের অনধিক কর-নির্দ্ধারকের সহায়তায় বিচার কার্য্য নির্ব্বাহ করিতেন। প্রধান বিচারপতি রাজার প্রতিনিধিস্বরূপও বিচার করিতেন। এতদ্ব্যতীত ছোট ছোট আদালতও ছিল। এই সমস্ত ছোট আদালতের বিচারের বিরুদ্ধে প্রধান আদালতে আপীল চলিত।

পঞ্চায়তগণ ফৌজদারী ও দেওয়ানী মোকদ্দমার বিচার করিতেন। তাঁহাদিগের কোন স্থায়ী আদালত ছিল না। কেবল মাত্র সহর ও গ্রাম্য আদালত, প্রধান বিচারপতির আদালত এবং রাজার আদালত স্থায়ী ছিল।

কোলব্রুক্ বলেন যে, "পুরাকালে ভারতবর্ষে আইন-আদালতাদি যৎপরোনাস্তি সুনিয়মিত ছিল। বিশেষ পরিশ্রম ও যত্নসহকারে বিচার করা হইত এবং যদি কোন বিচারক বিচার-বিষয়ে পক্ষপাতিত্ব প্রদর্শন করিতেন, তবে তাঁহার দোষের গুরুত্ব ও লঘুত্ব-হিসাবে তাহার অর্থদণ্ড অথবা নির্ব্বাসন হইত। কোন কোন স্থলে তাঁহাদের সম্পত্তি সরকারে বাজেয়াপ্ত করিয়া লওয়া হইত।" মনুর অনুশাসনই আইনরূপে পরিগণিত ছিল।

"মিতাক্ষর"-পাঠে পুরাকালীন আইন-সম্বন্ধে অনেক কথা জানা যায়।

যদি কোন ব্রাহ্মণ নরহত্যা করিত, তবে সেই ব্রাহ্মণকেও মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত হইতে হইত। মহাভারতের শান্তিপর্ব্বে "শঙ্খ ও লিখিতে"র উপাখ্যান-পাঠে জানা যায়, চৌর্য্যাপরাধে একজন ব্রাহ্মণের হস্ত কর্ত্তন করা হইয়াছিল।

হিন্দু আইন তিনভাগে বিভক্ত—যথা (১) আচার (২) ব্যবহার (৩) প্রায়শ্চিত্ত। বঙ্গদেশের বিচারালয়সমূহের স্বর্গীয় প্রধান বিচারপতি স্যর ম্যাক্‌ন্যাটেন্ হিন্দু আইনের মুক্তকণ্ঠে প্রশংসা করিয়াছেন।

সৈন্যবিভাগ—এইবার আর্য্যজাতির সৈন্যসম্বন্ধে গুটিকয়েক কথা বলা যাউক। যদিও আর্য্যেরা ধর্ম্মভীরু জাতি, তথাচ তাহাদের প্রতিবেশীর সহিত নিয়ত কোলাহলের জন্য আর্য্যদিগের মধ্যে একটি সৈনিক শ্রেণীর সৃষ্টি হয়। ঋগ্বেদে যুদ্ধরথ,তীর, ধনুক, পতাকা, বল্লম, তরবারি প্রভৃতির উল্লেখ আছে। রামায়ণেও রণসম্বন্ধীয় অস্ত্রশস্ত্রের বিস্তৃত বর্ণনা দেখিতে পাওয়া যায়। সৈন্যগণ তরবারি, কুঠার, বল্লম প্রভৃতি লইয়া যুদ্ধ করিত এবং ঢাল, শিরস্ত্রাণ, লৌহবর্ম্ম প্রভৃতিতে আত্মরক্ষা করিত। সৈন্যগণ গজারোহী, রথারোহী, অশ্বারোহী ও পদাতিক-ভেদে চারি শ্রেণীতে বিভক্ত ছিল। বড় বড় যোদ্ধারা বৃহদাকার হস্তী অথবা রথে চড়িয়া যুদ্ধ করিত। সমতল ভূমিতে অশ্বে চড়িয়া যুদ্ধ হইত, জলের মধ্যে নৌকা ও হস্তীতে চড়িয়া যুদ্ধ হইত এবং বৃক্ষাদি-পরিবেষ্টিত স্থানে তীর ধনুক দিয়া এবং পরিষ্কার স্থানে তরবারি লইয়া যুদ্ধ হইত। যুদ্ধ আরম্ভ হইবার পূর্ব্বে রাজা উত্তেজনাপূর্ণ ভাষায় বক্তৃতা করিয়া সৈন্যগণকে উত্তেজিত ও উৎসাহিত করিতেন।

উপরে যে কয়েকটী যুদ্ধাস্ত্রের নাম করা হইয়াছে তাহা ছাড়া অনেক প্রকারের অস্ত্র আর্য্যগণ কর্ত্তৃক যুদ্ধে ব্যবহৃত হইত। এই সমস্ত অস্ত্রের মধ্যে "অগ্নি অস্ত্র" সমধিক প্রসিদ্ধ। এই আগ্নেয় অস্ত্রের বর্ণনা পাঠ করিলে বোধ হয় আর্য্যেরা পুরাকালে কামান, বন্দুকাদির ব্যবহার করিতেন। ব্রাগ্‌ডন্ তদীয় ভারতবর্ষের সংক্ষিপ্ত ইতিহাসে লিখিয়াছেন যে, "মাসিদনপতি আলেক্‌জান্দারের ভারতাক্রমণের বহু পূর্ব্বে আর্য্যেরা আগ্নেয়াস্ত্র যেমন কামান, বন্দুক প্রভৃতির ব্যবহার উত্তমরূপে জানিতেন।"

অধ্যাপক উইলসন্, মিঃ ইলিয়ট্ প্রভৃতি ঐতিহাসিক বহুস্থানে স্পষ্টাক্ষরে বলিয়াছেন যে, আর্য্যেরা কামান,বন্দুকাদি আগ্নেয়াস্ত্র নির্ম্মাণ করিতে জানিতেন; অগ্নিপুরাণে সৈন্যের শ্রেণী, তাহাদের অগ্রসর হইবার রীতি, যুদ্ধে জয়লাভের নীতি প্রভৃতির বিশেষ উল্লেখ আছে।

মহাভারতের দ্রোণপর্ব্বে যুধিষ্ঠিরের শিবিরে অবস্থানকালীন জীবনের বর্ণনা আছে। প্রাতঃকালে রাজা যুধিষ্ঠির যখন শয্যা হইতে গাত্রোত্থান করিতেন, তখন চারণ ও গায়কগণ সুকণ্ঠে সঙ্গীত করিতেন। তদনন্তর মহারাজ স্নানাগারে প্রবেশ করিয়া সুগন্ধি জলে স্নান করিতেন। ইহার পর তিনি "চন্দন" দ্বারা সর্ব্বাঙ্গ লেপন করিতেন, গলদেশে মাল্যধারণ করিতেন এবং যুক্তকরে পূর্ব্বাভিমুখে দাঁড়াইয়া প্রার্থনাদি করিতেন। প্রার্থনান্তে তিনি কক্ষান্তরে প্রবেশ করিয়া তিন বার অগ্নির পূজা করিতেন। পূজা-সমাপনান্তে তিনি আর একটি কক্ষে গমনপূর্ব্বক শিক্ষিত ব্রাহ্মণদিগের সহিত সাক্ষাৎ করিতেন। সেই সমস্ত ব্রাহ্মণদিগকে তিনি ঘৃত, মধু, ফল, দূর্ব্বা, সুবর্ণ, সুসজ্জিত অশ্ব এবং বস্ত্রাদি দান করিতেন। তদনন্তর তিনি বহিঃপ্রকোষ্ঠে আগমন করিয়া মূল্যবান সুবর্ণবিনির্ম্মিত সিংহাসনে উপবেশন করিতেন এবং অনুচরবর্গ তাঁহাকে চামর ব্যজন করিত। এখানে পুনরায় চারণ ও গায়কগণ গান গায়িত। অশ্বের হ্রেষারব, ঘণ্টার সঘনধ্বনি, সৈন্যগণের কোলাহলের মধ্যে তিনি তখন ভ্রাতৃগণসমভিব্যাহারে যুদ্ধক্ষেত্রাভিমুখে অগ্রসর হইতেন।

যুদ্ধক্ষেত্রে যোদ্ধার সাহসিকতা বিশেষ প্রশংসনীয় ছিল। সম্মুখযুদ্ধে প্রাণত্যাগ করিলে যে নিশ্চয়ই স্বর্গে গমন করিত, পক্ষান্তরে যুদ্ধে ভীরুতা সর্ব্বজন কর্ত্তৃক নিন্দিত ও গর্হিত কর্ম্ম বলিয়া পরিগণিত ছিল। শত্রুর প্রতি নিষ্ঠুরতা-প্রদর্শন মহাপাতকের কার্য্য বলিয়া পরিগণিত ছিল। সমানে সমানে যুদ্ধই সর্ব্বজনানুমোদিত ছিল। ভীত, ক্লান্ত, আত্মসমর্পিত, নিদ্রিত, আহত, উলঙ্গ, দুর্ব্বল, অস্ত্রহীন ব্যক্তি ও দর্শক অথবা ভগ্নঅস্ত্রবিশিষ্ট ব্যক্তির প্রতি অস্ত্র-নিক্ষেপ নিতান্ত নীতিবিগর্হিত কার্য্য বলিয়া গণ্য ছিল।

মনুর সময়ে কুরুক্ষেত্র, মৎস্য, বিরাট, পাঞ্চাল এবং কান্যকুব্জ প্রভৃতি রাজ্যের যোদ্ধারা শ্রেষ্ঠ যোদ্ধা বলিয়া পরিকীর্ত্তিত ছিল। দ্রোণপর্ব্বে অর্জ্জুন নিম্নলিখিত যুদ্ধের বিষয় উল্লেখ করিয়াছেন,—(১) রথযুদ্ধ (২) অশ্বযুদ্ধ (৩) মল্লযুদ্ধ (৪) অসিযুদ্ধ (৫) বাহুযুদ্ধ (৬) গদাযুদ্ধ (৭) মুষ্টিযুদ্ধ।

যখন কুরু ও পাণ্ডবেরা যুদ্ধ করিয়াছিলেন, তখন রণবিজ্ঞানশাস্ত্রের বিশেষ উৎকর্ষ সাধিত হইয়াছিল। বীরদিগকে রথী, অতিরথী বা মহারথী বলা হইত। ক্রমশঃ

শ্রীশ্যামলাল গোস্বামী।

সাময়িক-সাহিত্য।

টলষ্টয়-সাক্ষাতে।*

১৯০০ খৃঃ ফেব্রুয়ারী মাসে আমার সহিত কাউণ্ট টলষ্টয়ের প্রথম সাক্ষাৎ হয়। আমি তখন সেণ্টপেটার্সবর্গে "Northern Courier" পত্রের সম্পাদক ও পরিচালকের কার্য্য করিতাম। আমার পত্রিকার প্রতি রাজপুরুষদের শুভদৃষ্টি ছিল না। মিঃ সিপিয়ান তখন রুষ গভর্ণমেণ্টের স্বরাষ্ট্রসচিব (Home Secretary)। তিনি প্রায়ই আমাকে নিমন্ত্রণ করিয়া লইয়া গিয়া আমার মুখে রাজকার্য্যের দোষগুণ ইত্যাদি শ্রবণ করিতেন।

আমি একদিন মস্কোতে যাই; কাউণ্ট সে সময় সেইখানে অবস্থান করিতেছিলেন। সকালে মস্কোতে পৌঁছিয়া তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিবার সময়-নির্দ্দেশের জন্য একখানি পত্র পাঠাইয়া দেই। এক ঘণ্টা পরে অধুনামৃত টলষ্টয়কন্যা প্রিন্সেস্ ওবলেনস্কির নিকট হইতে এক উত্তর পাই। তাহাতে লেখা ছিল যে, আমি ৪টার সময় দেখা করিলে কাউণ্ট্ অতিশয় আহ্লাদিত হইবেন। আমি নির্দ্দিষ্ট সময়ই গেলাম। একজন চাকচিক্যময় বহুমূল্য পোষাক-পরিহিত দ্বারবান দরজা খুলিয়া আমাকে একটী প্রকাণ্ড হলে লইয়া গেল। টলষ্টয়ের আদেশে আমাকে তাঁহার private roomএ লইয়া গেল। চাকরের অনুগমন করিয়া একটী ছোট সিঁড়ি বাহিয়া উপরে উঠিলাম। চাকরটী তৎপরে দরজা বন্ধ করিয়া দিয়াছিল।

"ভিতরে আসুন" বলিয়া ঘর হইতে গম্ভীর স্বরে আমাকে আহ্বান করিলেন। আমি টলষ্টয়ের ঘরে প্রবেশ করিলাম। দেখিলাম,—বৃদ্ধ ঋষিপ্রতিম কাউণ্ট একখানি হাতলযুক্ত চেয়ারে বসিয়া আছেন। ভ্রুর নীচে চক্ষু দুইটী যেন জ্বলিতেছিল। বোধ হইতেছিল যেন লোকের অন্তরের কথা ঐ অন্তরভেদী দৃষ্টির সাহায্যে পড়িতে পারেন। চেয়ার হইতে উঠিয়া আমার দিকে অগ্রসর হইয়া বার্দ্ধক্যে কুঞ্চিত অথচ স্বাস্থ্যশ্রীমণ্ডিত হস্ত প্রসারিত করিয়া আমার সহিত করমর্দ্দন করিলেন, আমাকে বসিতে বলিলেন; তারপর কথাবার্ত্তা আরম্ভ হইল। আমি

---

* Modern Review হইতে সঙ্কলিত।

তখন, আমি যে প্রবন্ধের আশায় আসিয়াছি, তাহা বলিলাম ও ঘরের চতুর্দ্দিক তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে ভাল করিয়া দেখিয়া লইলাম।

সাদাসিদা একখানি ছোট ঘর—একখানি লৌহের ছোট পালঙ্ক ও লিখিবার মেজ ছিল। আসবাবের মধ্যে ইহাই সব। তাঁহার দৃষ্টি যেরূপ তীক্ষ্ণ, স্বভাব ও ব্যবহার সেরূপ মৃদু ও মধুর! সে ব্যবহার, সে দৃষ্টি, জীবনে ভুলিবার নহে।

যে সময় আমি গৃহে প্রবেশ করিলাম, তখন তিনি একখানি ফরাসীদেশীয় সাময়িকপত্র পড়িতেছিলেন। আমাকে আশ্চর্য্যান্বিত হইতে দেখিয়া কহিলেন, "আমাকে একজন এখানি পড়িতে দিয়াছে। যুবতীদের পক্ষে কি ভাল ও উপদেশদায়ক সেই সম্বন্ধে ইহাতে একটী প্রবন্ধ বাহির হইয়াছে, আমি সেইটা পড়িতেছিলাম।" দেখিলাম, তুচ্ছ হইতে মহৎ সকল বিষয়ই তিনি অতিশয় আগ্রহের সহিত পড়েন।

আমাদের কথাবার্ত্তা শ্রমজীবী-সম্প্রদায় সম্বন্ধে হইতেছিল। তখন এই বিষয় লইয়া কাগজে যথেষ্ট লেখালেখি করিতেছিলাম, আধঘণ্টা ধরিয়া আমাদের আলোচনা চলিয়াছিল। তারপর তিনি আমাকে নীচে Drawing roomএ তাঁহার সহিত চা-পানে যোগ দিতে অনুরোধ করিলেন। চা'য়ের টেবিলে তাঁহার স্ত্রী ও পুত্রকন্যাদিগের সহিত পরিচিত করিয়া দিলেন। ঘরের প্রায় এক-তৃতীয়াংশ জুড়িয়া সেই টেবিলখানার কথা ও শুভ্রশ্মশ্রু কাল কামিজপরা গম্ভীর মুখখানা এখনও আমার চক্ষের সম্মুখে ভাসিতেছে। তিনি পুনরায় আমার কাগজের প্রসঙ্গ উত্থাপন করিলেন। তখন সংবাদপত্র দমনবিধি-অনুসারে কোনও সংবাদপত্রে আপত্তিজনক প্রবন্ধ প্রকাশিত হইলে প্রথম তিনবার সাবধান করিয়া ছাড়িয়া দেওয়া হইত, কিন্তু তারপর পত্র বন্ধ করিয়া দেওয়া হইত। আমার সংবাদপত্রকেও একবার সাবধান করিয়া দেওয়া হইয়াছিল, টলষ্টয় তাহা জানিতেন এবং আমার পত্রিকার ভবিষ্যৎ-সম্বন্ধে সন্দেহ প্রকাশ করিলেন। তিনি কহিলেন, "আপনি এরূপভাবে আর বেশী দিন চলিলে শীঘ্রই আপনাকে দ্বিতীয়বার সাবধানতাসূচক আজ্ঞা পাইতে হইবে। আপনার কাগজের সহিত আমার সহানুভূতি আছে, আমি প্রবন্ধ দিলে আপনার বিশেষ উপকার হইবে না, বরং গভর্ণমেণ্টের বিষদৃষ্টিতে পড়িবেন। কাগজের কোনওরূপ অনিষ্ট আমাদ্বারা হয় আমার এরূপ অভিপ্রায় নাই।"

আমি তখন যৌবনোচিত বলে বলীয়ান্। আমার দৃঢ় বিশ্বাস যে ন্যায়

ও সত্যের জয় অবশ্যম্ভাবী। আমি পীড়াপীড়ি করিতে লাগিলাম। তিনি পিতৃজনোচিত গাম্ভীর্য্যের সহিত বলিলেন "বেশ! কাল আপনি আমার এখানে খাইতে আসিবেন; তখন একটী প্রবন্ধ দিব।"

তাঁহাকে ধন্যবাদ দিয়া পুলকিতমনে গৃহে ফিরিলাম।

পরদিন তাঁহার নিমন্ত্রণরক্ষা করিতে যাইবার সময় মনে হইতেছিল, নিরামিষভোজী টলষ্টয়ের সহিত খাইলে পেট ভরিবে না, এদিকে ক্ষুধাও লাগিয়াছে কিন্তু যৌবনের উত্তেজনায় না খাইয়াই গেলাম। গিয়া দেখি আমার জন্য আমিষের বন্দোবস্ত করা হইয়াছে। টলষ্টয়ের এই সামান্য বিষয়েও সূক্ষ্মদর্শিতা দেখিয়া অবাক্ হইলাম। লোকে ভালই বলুক আর মন্দই বলুক, তিনি স্বমত ব্যক্ত করিতে কুণ্ঠিত হইতেন না।

কাউণ্টেস্, তাঁর দুই পুত্র ও প্রিন্সেস ওবলস্স্কি ও আমি এক সঙ্গে খাইলাম ও টলষ্টয় স্বতন্ত্র বসিয়া নিরামিষ ভোজন করিলেন। খাবার পর হজমী একপ্রকার পানীয় গ্রহণ করিতে তাঁহাকে দেখিলাম। ভোজের পর আমি, কাউণ্ট ও কাউণ্টেস্ এক গৃহে রহিলাম। টলষ্টয় আমার শিল্পানুরাগের কথা ও আমার স্ত্রীশিল্পচাতুর্য্যের কথা জ্ঞাত ছিলেন। সেইজন্য শিল্প সম্বন্ধে আলোচনা আরম্ভ হইল। তিনি আমাকে তাঁহার "শিল্প কি?" নামক পুস্তক-সম্বন্ধে মত জিজ্ঞাসা করিলেন। আমি সাহস-সহকারে বলিলাম যে, Utilitarian role জাতীয় শিল্প যাহা কাউণ্ট পছন্দ করেন, সে সম্বন্ধে আমার মতের ঐক্য নাই। আমি যখন মত ব্যক্ত করিতেছিলাম সে সময় তিনি খুব আগ্রহপূর্ণলোচনে আমার দিকে তাকাইয়াছিলেন। আমিও আলোচনা করিতে করিতে অতিশয় উত্তেজিত হইয়া পড়িয়াছিলাম। এইরূপে কিছুক্ষণ চলার পর কাউণ্টেস্ আমার পক্ষ সমর্থন করিতে লাগিলেন ও মিলের অঙ্কিত ভেনাস চিত্রের কথা উল্লেখ করিলেন। এতক্ষণ পর্য্যন্ত কাউণ্ট ধীরভাবে আমাদের কথা শুনিতেছিলেন, কিন্তু ভেনাস চিত্রের কথা উল্লেখ করায় যেন মনে মনে একটু রুষ্ট হইলেন, বাহ্যতঃ তাহা বুঝা গেল না। তিনি কহিলেন—"আমার কাছে ভেনাসের কথা কহিও না" তারপর বাল্যকাল হইতে আমাদের কিরূপ নারীচিত্রের কথা ভাবা উচিত তৎসম্বন্ধে উপদেশ দিতে লাগিলেন।

তারপর আমরা বসিবার গৃহে গমন করিলাম ও তিনি দাবা খেলিতে অনুরোধ করিলেন। দাবাখেলায় আমার সখ ছিল কিন্তু ভাল খেলিতে জানিতাম না। তাঁহাকে বলিলাম—"আমার বুদ্ধি কম সেজন্য বোধ হয় আমি ভাল

খেলিতে পারি না।" শুনিয়া তিনি হাসিয়া অস্থির। এই সময় এক টেলিগ্রাম আসিল; পড়িয়া অতিশয় দুঃখব্যঞ্জকস্বরে কহিলেন—"এখানা আপনার স্ত্রীর নিকট হইতে আসিয়াছে। আপনার পত্রিকাকে দ্বিতীয়বার সাবধানতাসূচক আজ্ঞা দেওয়া হইয়াছে।"

আমি অতিশয় মর্ম্মাহত হইয়াও আত্মসংযমের চেষ্টা করিতেছিলাম। টলষ্টয় বন্ধুভাবে আমার হাত ধরিয়া ঘরের মধ্যে ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। আমি যে দুঃখ গোপন করিতে চেষ্টা করিতেছি বুঝিতে পারিয়া বলিতে লাগিলেন—"কাল আপনি এই সংগ্রামে বিজয়ের কথা ভাবিতেছিলেন কিন্তু আজ দেখুন সম্পূর্ণ এক বিপরীত কাণ্ড। আমাদের নিজেদের শক্তির উপর এত বড় অগাধ বিশ্বাস স্থাপন করা ঠিক নহে। একটী কার্য্য, প্রথম যে উপায় ধরা হইয়াছে তাহাতেই সিদ্ধ হইবে এমনও নহে। অকৃতকার্য্য হইলে নূতন পথাবলম্বন করা আবশ্যক।" ইহার পর করুণাদ্রস্বরে আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, এখনও আমি তাহার প্রবন্ধ পাইতে ইচ্ছুক কি না,আমি সম্মতিসূচক বাক্য দিলে পাঠগৃহে লইয়া গিয়া একটী প্রবন্ধ দিলেন। সেইদিনই সেণ্টপেটার্সবর্গে ফিরিয়া আসিয়া প্রবন্ধ ছাপাইতে দিলাম ও প্রুফ মস্কোতে পাঠাইয়া দিলাম। তিন বার প্রুফ পাঠাই, তিনবারই আরও কিছু কিছু লিখিয়া তিনি পাঠান। ইহার প্রকাশের একটী দিন ঠিক করিলাম, কিন্তু হায়! ইহার মধ্যে এক অপ্রত্যাশিত ঘটনা ঘটিয়া গেল।

সে দিন প্রধান রাজকর্ম্মচারী আমাকে গোপনে ডাকিয়া বলিলেন যে, টলষ্টয়ের প্রবন্ধ বাহির হইলেই আপনাকে তৃতীয়বার সাবধানতাসূচক আজ্ঞা দেওয়া হইবে। আপনাকে গোপনে বলিয়া দিলাম, এখন আপনার যাহা ইচ্ছা করুন।

তারপর কাগজের কর্ম্মচারীদিগের সহিত যুক্তি করিয়া স্থির করিলাম যে, কাউণ্টের একটী প্রবন্ধের জন্য কাগজ বন্ধ করা উচিত নহে। টলষ্টয়কে ইহা জানান হইল। কিন্তু কিছুদিন পরেই আমার পত্রিকাকে জোর করিয়া বন্ধ করিয়া দেওয়া হয়। টলষ্টয় আমাকে যে প্রবন্ধটী দিয়াছিলেন তাহা পরে Modern Slavery নাম দিয়া প্রকাশিত হয়।

আমার স্ত্রীর টলষ্টয়ের সহিত সাক্ষাৎ করিতে ইচ্ছা হওয়ায় দুই বৎসর পর পুনরায় তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করি। আমি সপরিবারে মস্কোতে যাই—আমি সস্ত্রীক তাঁহার অতিথি হইলাম। তিনি আমার স্ত্রীকে দেখিয়া অতিশয় আহ্লাদিত হইলেন।

বিখ্যাত শিল্পী মুবেটজ্‌কস তখন তাঁহার বাড়ীতে অতিথি ছিলেন, তাঁহার সহিত আমার আলাপ হয়। টলষ্টয় ইংরাজী, ফরাসী, জর্ম্মণ ও রুশীয় ভাষায় লিখিতে ও কহিতে পারিতেন। গীত-বাদ্য ও নাটক-সম্বন্ধে আমাদের আলোচনা হয়। যখনই তাঁহার কথা ভাবি তখনই তাঁহারই বাণী "Learn life from life. No useless strife to the clouds. Love life. Life is true God" আমার কাণের কাছে বাজিতে থাকে।

কাশ্মীরের মুসলমান কৃষক।

কৃষিপ্রধান দেশে কৃষকদিগকে জাতীয় জীবনের মেরুদণ্ডস্বরূপ বলিলেই হয়। বোধ হয়, হিমালয় প্রদেশের অধিকাংশ লোকই কৃষিজীবী। কাশ্মীরে কৃষকের সংখ্যাই অধিক। এই ভূস্বর্গে তাহাদের প্রাধান্যও কম নহে।

কৃষি।—এখানকার লোকদের কৃষিই প্রধান কাজ। ইহা ঠিক, সে দেশের ভূস্বামীরা প্রায়ই পণ্ডিতশ্রেণীভুক্ত; কিন্তু তাহারা আমাদের দেশের উচ্চবর্ণের লোকদিগের মত নিজে হাতে চাষ করাকে অপমানজনক মনে করে, সেইজন্য অধিকাংশ ভূভাগই মুসলমান কৃষকেরা করে। এইহেতু হিন্দু ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণকে ভূমির মালিক হইয়াও উদরান্নের জন্য মুসলমান কৃষকদের অনুগ্রহের উপর নির্ভর করিতে হয়। মুসলমানদের কৃষিকার্য্য একচেটিয়া ব্যবসায় বলিলেই হয়।

হিমালয় প্রদেশের অন্যান্য স্থানের মত এখানেও কৃষিকার্য্য স্ত্রীলোকদিগের সাহায্য ব্যতিরেকে পুরুষেরাই সম্পন্ন করিয়া থাকে। স্ত্রীলোক মাঠে দেখিতে পাওয়াই যায় না। এমন নয় যে, নারীরা পরদার আড়ালে বসিয়া আলস্যভাবে দিন কাটায়; গৃহে তাহারা কঠিন পরিশ্রমের কার্য্য করিয়া থাকে। লোকের একটা সংস্কার আছে যে, স্ত্রীলোক ক্ষেতে কাজ করিলে ভাল শস্য জন্মে না।

কৃষিকার্য্যে সেই প্রাচীনকালের জরাজীর্ণ প্রথা এখনও অনুসৃত হইয়া থাকে। কর্ষণ, বপন, কর্ত্তন, সিঞ্চন সবই পুরুষেরা করে। জ্যৈষ্ঠ মাসের মাঝামাঝি দেখিতে পাওয়া যায় যে, বিশ ত্রিশ জন অর্দ্ধনগ্ন লোক দল বাঁধিয়া সমস্বরে গান করিয়া নিড়াইতেছে। সেই পরিশ্রমের মধ্যেও তাহারা কেমন আনন্দ উপভোগ করিতেছে। আর কর্ষণের সময়ও ঠিক এরূপ দৃশ্য দেখিতে পাওয়া যায়।

ডাল হ্রদের জলের উপর কৃষিকার্য্য করা হয়। জলের উপর মাদুর বিছাইয়া তাহার উপর মাটী ছড়াইয়া কৃত্রিম ভূমি প্রস্তুত করতঃ বীজ বপন করা হয়। আবার অনেক সময় এইরূপ ভাসমান ক্ষেত্র রাত্রিতে চুরী হইয়া যায়।

ইহা ব্যতীত কৃষকদিগকে বহু পরিশ্রম করিয়া শস্যক্ষেত্রে জলসেচন করিতে হয়।

রেশমের চাষ।—কাশ্মীরের হিন্দু পণ্ডিতেরা গুটীপোকা রক্ষা করাও ঘৃণিত কাজ মনে করেন। পণ্ডিতেরা এইরূপ লাভজনক প্রত্যেক কার্য্যকে ঘৃণার চক্ষে দেখিয়া লাভবান হইতে পারেন না, কিন্তু মুসলমান কৃষকেরা ঐ সব কার্য্য একচেটিয়া করিয়া লইয়া বেশ দু'পয়সা উপার্জ্জন করিয়া লয়। গুটীপোকা-পোষা কাশ্মীরে অনেক দিন হইতে চলিয়া আসিতেছে। ইহা দেশের একটী প্রাচীন শিল্প। পূর্ব্বে এখানে রেশম বাহির করিয়া রেশমের কাপড় প্রস্তুত হইত, কিন্তু সে শিল্প এখন নষ্ট হইয়া গিয়াছে। এক্ষণে শুধু গুটীপোকাই 'পালা' হইয়া থাকে। এই সামান্য শিল্পটুকুও নষ্ট হইয়া যাইবার যোগাড় হইয়াছিল, কিন্তু রাজসরকার যখন বুঝিতে পারিলেন যে ইহা বেশ লাভের ব্যবসায়, তখন তাঁহারা উৎসাহ দিতে লাগিলেন। সেই উৎসাহের জন্য শিল্পটী আবার জাগিয়া উঠিতেছে। এখন উক্ত ব্যবসায়ে রাজসরকারের বেশ মনোযোগ আছে; রাজসরকার প্রতি বৎসর ফরাসীদেশ হইতে বীজ আনাইয়া বিনামূল্যে কৃষকদিগকে দেন, কিন্তু একটী সর্ত্তের অধীন হইতে হয় সে অন্যের নিকট গুটী বেচিতে পারিবে না; শুধু রাজসরকারের নিকট বেচিতে হইবে এবং কেহই বীজ রাখিতে পারিবে না। সরকার হইতে ১৫৲ টাকা মণ দরে গুটী ক্রয় করিয়া লওয়া হয়; কৃষকেরা কল-বাড়ীতে আসিয়া গুটী দিয়া যায়; রাজসরকারের বহিবার খরচটাও বাঁচিয়া যায়। অন্যের নিকট যদি তাহারা বিক্রয় করিতে পারিত, তবে ইহার দ্বিগুণ নিশ্চয়ই পাইত, কারণ অন্যদেশে ঐ একই রকম একই পরিমাণ রেশম উহার ত্রিগুণ মূল্যে বিক্রীত হয়। বৈদ্যুতিক কলে সূতা বাহির করিয়া বস্তাবন্দী করিয়া সরকার হইতে ইউরোপে রপ্তানী করা হয়। বৎসর বিশ পঁচিশ লক্ষ টাকার রেশম রপ্তানি করা হয় ও সরকারের বাৎসরিক লাভ প্রায় সাত লক্ষ টাকা। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয়, কাপড় প্রস্তুতের কল থাকা সত্বেও এখন আর কাপড় প্রস্তুত করা হয় না ও সে চেষ্টাও লক্ষিত হয় না। প্রতি বৎসর প্রায় ৪০০০ মণ গুটী কলে আসে।

কৃষকদের গুটী পালন করিতে বিশেষ খরচ হয় না। অন্য কেহ গাছের

পাতা সংগ্রহ করিয়া আনিয়া দিলে গৃহের অকর্ম্মণ্য বৃদ্ধেরাই বসিয়া বসিয়া পালন করিতে পারে। বাড়ীর একটী গৃহে 'গুটী' পালা হয়; ঘরটী সর্ব্বদা উত্তপ্ত রাখিতে হয়। কেবল কয়েকটী জেলাতে গুটীপোকা পালা হয়।

কুলীর কাজ ও ভিক্ষাবৃত্তি।—যখন ক্ষেতে কাজ থাকে না তখন কৃষকেরা কুলীর কাজ করে। কাশ্মীরে বাধ্যতন্ত্রতামূলক কার্য্যপ্রণালী প্রচলিত। সরকারের কাজের জন্য সরকার যে সময় ইচ্ছা সেই সময়ই যত লোক ইচ্ছা তত লোক বেগার ধরিতে পারেন। এজন্য শুনিতে পাওয়া যায় তাহাদিগকে কিছু দেওয়া হয়। তাহারা এই সময় ভিক্ষাবৃত্তিও করিয়া থাকে।

মেষ চড়ান।—কাশ্মীরের কোনও কোনও প্রদেশে কৃষকেরা মেষ চড়ায়। প্রধানতঃ যাহারা পাহাড়ের ঢালুর উপর অথবা পাহাড়ের সন্নিকটে থাকে তাহারাই মেষ চড়ায়। নিয়মিত মেষপালকও আছে। মেষ প্রায়ই পশমের জন্য পালন করা হয়। গরু কাশ্মীরে তেমন হয় না। প্রায়ই দুর্ব্বল, ক্ষীণ ও ক্ষুদ্রাকৃতি। তথাপি টাকায় ১৬ সের দুধ।

বয়নকার্য্য।—বয়নকার্য্য কৃষকদের আর একটী কাজ। ক্রমশঃ ইহা তাহাদের হস্তস্খলিত হইয়া পড়িতেছে। দুইটী মুখ্য কারণে গৃহবয়ন-প্রথা নষ্ট হইয়া যাইতেছে। তাহারা সস্তাদরে বিলাতী কাপড় পায়, আর সহরের লোক অনেক লোক রাখিয়া মূলধন দিয়া রীতিমত কাপড় ইত্যাদি বুনিতেছে। কিন্তু গৃহবয়ন কার্য্যেও তাহারা বিলাতী সূতা ব্যবহার করে।

কৃষকবনিতাদের কার্য্য।—কৃষকবনিতারা যে গৃহের কার্য্য করে, তাহা তো বলাই বাহুল্য। কৃষক ক্ষেত্র হইতে ধান কাটিয়া গৃহে আনে, কৃষক-বনিতা পরিশ্রম করিয়া 'মাড়াই' করে ও ধান হইতে তুষ ছাড়াইয়া চাল বাহির করে। সকাল ও বৈকাল বেলায় দল বাঁধিয়া স্ত্রীলোকেরা এই কার্য্য করে। বাড়ীতে যদি বেশী স্ত্রীলোক না থাকে, তবে তাহারা অন্য বাড়ী হইতে স্ত্রীলোক ডাকিয়া আনিয়া কাজ করে ও গল্পগুজব করিতে করিতে কাজ করে।

ঘুমের (দার্জ্জিলিঙ্গের পূর্ব্বের রেলওয়ে ষ্টেশন) তিব্বতীয় রমণীদের মত কোনও কোনও স্ত্রীলোক ছোট ছোট ডালি গলায় ঝুলাইয়া বেড়ায়। সেই ডালিতে সেখানকার তৈয়ারী বিস্কুট, কেক, শাক সবজী ইত্যাদি রাখিয়া বিক্রয় করে। আর একটী কাজ তাহারা করে—বয়ন। শীতের সময় প্রায় সকলেই চরকা ঘুরাইয়া সূতা কাটে। ইহাতে তাহাদের আর একটী উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়।

চরকা ঘুরাইবার পরিশ্রম-জনিত উত্তাপে শরীরকে শীতের প্রকোপ হইতে রক্ষা করে।

বালকবালিকা ও তাহাদের কার্য্য।—এমন অনেক কাজ আছে যাহা ছেলেদের সাহায্যে সম্পাদিত হয়, যেমন গরু চরান, ঘানি ঘুরান, মাঠে কৃষকের খাবার লইয়া যাওয়া। এই সব কাজ সব দেশেই বালকবালিকাদের একচেটিয়া কাজ। একটু বড় ছেলেরা সময়ে সময়ে শারীরিক পরিশ্রমের কাজও করিয়া থাকে। শ্রীনগরের নিকটের অনেক বালক রেশমের কলে কাজ করে। দুঃখের বিষয়, গুটী ছাড়ান প্রভৃতি নোঙরা, অস্বাস্থ্যকর কার্য্যও তাহাদিগকে করিতে হয় এবং তাহারা সেইহেতু যথাযোগ্য পারিশ্রমিকও পায় না। রেশমের কলে হিন্দু ও মুসলমান পণ্ডিতের ছেলেরাও কাজ করিতে কুণ্ঠিত হয় না। আশ্চর্য্যের বিষয়, কাশ্মীরের ছেলেরা অনেকদিন পর্য্যন্ত কাপড় পরে না; এমন কি ১২ বৎসরের বালকও নগ্নাবস্থায় নির্লজ্জভাবে ঘুরিয়া বেড়ায়। স্নান কিম্বা খেলিবার জন্য জলে নামিবার সময় তাহারা কাপড়, কামিজ খুলিয়া নগ্নাবস্থায় জলে নামিয়া পড়ে।

কানগারী বা অগ্নিসমন্বিত ডালি।—দুইজন বালক দুইটী অদ্ভুত রকমের ছোট ডালি ধরে। এই ডালিতে আগুন থাকে। শীতকালে প্রায় সকল লোকের কাছেই এইরূপ অগ্নি থাকে। স্ত্রীলোকেরা এমন কি জামার মধ্যে এই ডালি বহিয়া লইয়া যায়।

ক্রীড়ারত বালক ও তাহাদের ভীরুতা।—কৃষক-পুত্রেরা অনেক রকম ক্রীড়া করে। কাশ্মীরের বালকেরা সাধারণতঃ লাজুক ও ভীরু এবং সহজে ক্রীড়ারত হইতে চাহে না। একটা মাঠে কতকগুলি ছেলে গোল হইয়া দাঁড়ায়। প্রত্যেক ছেলেই সম্মুখে বৃত্তের কেন্দ্রে একটী করিয়া ঢিল মারে। একজনের চক্ষু বাঁধিয়া রাখা হয়। তাহাকে ঢিলের শব্দ হইতে বাহির করিতে হয় ঢিলটী কোন্ দিক হইতে আসিতেছে। যদি সে ধরিতে পারে তবে যে ঢিল ছুড়িয়াছিল তাহার পিঠে আরোহণ করিয়া বেড়ায়।

জলের মধ্যে বা জল লইয়া খেলিতেও তাহারা পটু। খেলিবার সময় অপরিচিত লোক দেখিলে তাহারা ছুটিয়া পলায়। প্রায় সকল লোকই একটু ভীরু। একদল লোক যাইতেছে,তাহাদের সামনে যাইয়া যদি বল বেগার খাটিতে হইবে অমনি সকল লোক ছুটিয়া পলায়। বাধ্যতন্ত্রতামূলক শ্রম-প্রথাকে তাহারা কি চক্ষে দেখে ইহা হইতেই তাহা স্পষ্ট বুঝা যায়।

তাহাদের এইরূপ অস্বাভাবিক ভীরুতার যথেষ্ট কারণ আছে। নবম শতাব্দী হইতে তাহাদের উপর দিয়া অত্যাচার ও অবিচারের শত শত ঝঞ্ঝাবাত বহিয়া যাইতেছে। প্রায় চারি শতাব্দী ধরিয়া তাহাদের নিজেদের দেশের শাসনকর্ত্তারাই তাহাদিগের প্রতি অত্যাচার, অবিচার করিয়াছে। তারপর মুসলমান আসে; মুসলমানদের অত্যাচার ত্রয়োদশ খৃষ্টাব্দ হইতেই আরম্ভ হয়। তাহাদের এই ভীরুতার সম্বন্ধে প্রবাদ পর্য্যন্ত চলিয়া যাইতেছে। এক সময় ছিল যখন কাশ্মীরীরা সৈন্যশ্রেণীভুক্ত হইত। তারপর একবার সীমান্ত-প্রদেশে যুদ্ধ বাধিল; কাশ্মীরীরা যুদ্ধে গেল। যেই শত্রুসৈন্য আসিল, অমনি তাহারা বন্দুক, কামান ইত্যাদি ফেলিয়া দেশে এমন ভাবে ফিরিল যেন কিছুই ঘটে নাই। যদিও ইহা ইতিহাসের পৃষ্ঠায় পাওয়া যায় না, কিন্তু অধুনা ব্যাপার প্রায় এইরূপই দাঁড়াইয়াছে। এই ভীরুতার জন্য সরকারী সৈন্যবিভাগে ইহাদিগকে লওয়া হয় না।

অতিথি-সৎকার।—সে দেশের লোক এখন পর্য্যন্ত প্রতীচ্য সভ্যতার সংস্পর্শে আসে নাই। এইজন্যই বোধ হয় অতিথি-সৎকার তাহাদের মধ্য হইতে অন্তর্হিত হয় নাই। কাশ্মীরীরা অতিশয় অতিথিবৎসল। তাহারা প্রত্যেক অতিথিকেই জিজ্ঞাসা করে, কুতগতসা (কুত্র গচ্ছসি?) ও খ্যাৎসা খবর? (ক্যা খবর?)। যখন সমস্ত দেশ অত্যাচারের ভয়ে আড়ষ্ট হইয়া উঠিয়াছিল, সেই সময় হইতে ক্যা খবর কথা জিজ্ঞাসা করিবার প্রথা প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। সেই প্রথা এখন পর্য্যন্ত চলিয়া আসিতেছে। এখনকার লোকে অনেকেই হিন্দী বলিতে পারে। স্ত্রীলোকেরাও পারে, কিন্তু বলিতে সবিশেষ লজ্জিত হয়।

কৃষক-বধূ।—ইহারা সাদাসিদা সুন্দর। গৃহকার্য্যেও বেশ পটু। তাহারা বেশ সুখী ও পরিতৃপ্ত। বর্ত্তমান জীবন অপেক্ষা আরও কোনও উচ্চতর সুখসম্পদময় জীবনের কথা তাহাদের মনে স্থান পায় না। পণ্ডিত-বনিতারা সহুরে লোকের মত বেশভূষাপ্রিয় নহে। মেলা বা ধর্ম্মোৎসব তাহাদের অতিশয় প্রিয়বস্তু। মেলা ইত্যাদিতে কৃষকবধূরা দল বাঁধিয়া গমন করে। মেলায় যাইবার সময় বামাগণ ললিতকণ্ঠে গান গায়িতে গায়িতে পথ-ঘাট মুখর করিয়া যায়। ব্রহ্ম ও তিব্বতের স্ত্রীলোকদের মত তাহাদের স্বাধীনতা আছে।

গ্রাম ও বাস-গৃহ।—সাধারণতঃ তিন প্রকার গ্রাম ও অনেক প্রকার গৃহ আছে। এমনও গ্রাম আছে, দৈর্ঘ্যে প্রস্থে তাহারা সহরের সমতুল্য। এই সকল গ্রামে দ্বিতল দারুময় ভবন দেখিতে পাওয়া যায়। এই সকল গ্রামগুলি দেখিতে অতিশয় রমণীয়। পাহাড়ের ঢালুর উপর গাছের ছায়ায় ঢাকা বাড়ীগুলি দৃশ্যপটের মত প্রতীয়মান হয়। দ্বিতীয় শ্রেণীর গ্রামে সব কুটীর—মুসলমান-প্রধান গ্রামই এই প্রকার কুটীর-সমাচ্ছন্ন। বাড়ীর তিন তলাটীতে জ্বালানি কাষ্ঠ সঞ্চিত রাখা হয় ও গুপ্তগৃহরূপে ব্যবহৃত হয়। বাড়ীর নিকটে একটী ছোট কাঠের ঘর গোলারূপে ব্যবহৃত হয়। তৃতীয় শ্রেণীর গ্রামও মুসলমান-প্রধান ও কুটীর-সমাকুল। এক গ্রামে তিন প্রকার গৃহও লক্ষিত হয়, সাধারণতঃ পৃথক্ পৃথক্ গ্রামেই ঐরূপ তিন প্রকার গৃহ দেখিতে পাওয়া যায়।

রাজধানী শ্রীনগর ঘোরতর অপরিষ্কার। রাজধানী যখন এইরূপ অপরিচ্ছন্ন, তখন গ্রামের কথা কি? এত অপরিচ্ছন্নতার মধ্যে কিরূপে লোকের বিকাশ হয় ভাবিয়া পাওয়া কঠিন। কাশ্মীরের ঐরূপ সুন্দর জলবায়ুর গুণ না থাকিলে এতদিন সকলে মরিয়া নিঃশেষিত হইয়া যাইত। সরকারের এদিকে সুতীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখা বিধেয়।

শ্রীনলিনীমোহন রায়-চৌধুরী।

সৌন্দর্য্য।

আদিম মানব-দম্পতী যেদিন ধরাপৃষ্ঠে প্রথম বিচরণ করিতে আরম্ভ করিয়াছে, সেইদিন হইতেই তাহারা সৌন্দর্য্যের উপাসক। তীব্র সৌন্দর্য্যানুরাগ না থাকিলে অসভ্য নগ্ন নরখাদক তাহার মুখমণ্ডল চিত্র-বিচিত্র করিত না, তাহার অঙ্গে 'উল্কি' পরিত না অথবা শিরস্ত্রাণে পক্ষি-পক্ষের সংযোগ করিত না। আর এই সৌন্দর্য্যানুভূতির প্রাখর্য্য আছে বলিয়াই বর্ত্তমান যুগের সুসভ্য ইউরোপীয় এবং আমেরিকাবাসিগণ বিজ্ঞান ও শিল্পকলার সাহায্যে সৌন্দর্য্যবৃদ্ধির নিত্য নূতন আয়োজন করিতেছে। এই তথাকথিত সভ্যতা-সম্মত নূতন নূতন ধরণের পোষাক-পরিচ্ছদ, চাল-চলন, গন্ধদ্রব্য ও সাবান, অঙ্গরাগ প্রভৃতির সৃষ্টি যে সেই অনন্ত সৌন্দর্য্য-সম্ভোগের উদ্দেশ্যেই, ইহা একরূপ নিঃসংশয়ে বলা যাইতে পারে।

প্রাচীন গ্রীকজাতি সৌন্দর্য্যকে ঈশ্বরের শ্রেষ্ঠ দান বলিয়া বিবেচনা করিত। সৌন্দর্য্যের পরেই তাহারা স্বাস্থ্যের আসন নির্দ্দেশ করিয়াছিল। তাহাদের মতে স্বাস্থ্য সৌন্দর্য্যেরই হাত-গড়া ছিল। পুরাতন রোমকজাতিও গ্রীকদিগের এই মতেরই সমর্থন করিত। তাহারা যে কেবল আপনাদের অঙ্গসৌন্দর্য্যের শ্রীবৃদ্ধি-সাধনেই অনুরাগী ছিল তাহা নহে, তাহারা আপনাদের পারিপার্শ্বিক সামগ্রীগুলি যাহাতে সুন্দর হয়, তাহার দিকে সবিশেষ লক্ষ্য রাখিত। নিজেরা ত সুন্দর হইবই, আমাদিগের নিকটে যাহারা থাকিবে তাহাদের মূর্ত্তিও সৌন্দর্য্যশালিনী হইবে; এমন কি পরিধেয় বসনভূষণ, গৃহসজ্জার সামগ্রী কিছুই অ-সুন্দর হইবে না। এই ধারণাটুকু রোমক জাতির হৃদয়ে বদ্ধমূল ছিল। সেইজন্য ইউরোপের প্রাচীন যুগের গ্রীক ও রোমক স্থপতি, চিত্রকর ও ভাস্করগণের হস্ত-সৃষ্ট শিল্পকলায় এবং মধ্যযুগের মাইকেল,এঞ্জেলো,র‍্যাফেল প্রভৃতি খৃষ্টান্ শিল্পকরগণের খোদিত বা অঙ্কিত মূর্ত্তি বা চিত্রাবলীতে আমরা সৌন্দর্য্যানুভূতির প্রকট প্রমাণ পাই।

আমরা দরিদ্র বটে, কিন্তু সৌন্দর্য্যের কাঙ্গাল। বৈদিক যুগের প্রারম্ভ হইতে অদ্যাবধি ভারতবর্ষীয় আর্য্যগণ, প্রাচীন গ্রীক ও রোমকদিগের মত সৌন্দর্য্যেরই ভিখারী। এই সৌন্দর্য্যের পিপাসা—তাহার ধর্ম্মে, কর্ম্মে, আচার-অনুষ্ঠানে, শিল্পকলায় পরিস্ফুট। এই তীব্র সৌন্দর্য্যানুভূতি এবং সৌন্দর্য্যের পিপাসা এই জাতিকে সত্য ও শিবের আদর্শ দেখাইয়া অধ্যাত্ম জগতের শ্রেষ্ঠ সম্পদ্ প্রদান করিয়াছিল। সৌন্দর্য্যের কাঙ্গাল বলিয়াই ত এই জাতি সুন্দরতম দেবমূর্ত্তি কল্পনা করিতে পারিয়াছিল। আমাদের বৈষ্ণবধর্ম্মে চিরসুন্দরের যে পূজা-পদ্ধতি প্রচলিত, তাহা অপেক্ষা সৌন্দর্য্যের অধিকতর সত্য ও আদর্শ পূজা পৃথিবীর আর কোথাও নাই।

প্রসিদ্ধ খৃষ্টীয় ভক্ত সাধু পল একবার গ্রীক ও রোমকদিগকে বলিয়াছিলেন,—"তোমরা কি জান না,—আমাদের এই দেহ-মন্দিরে শ্রীভগবান বাস করেন?" কথাটা খৃষ্টানদিগের নিকটে নূতন হইতে পারে, কিন্তু একথাটা হিন্দুর নিকট অতি প্রাচীন। দেহকে ভগবানের আবাসভূমি জানিয়াই হিন্দু চিত্তশুদ্ধির পূর্ব্বে দেহশুদ্ধি করে। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ গীতায় বলিয়াছেন,—"যিনি রক্তমাংসের দেহকে ক্লেশ প্রদান করেন, তিনি দেহমধ্যস্থ আমাকেই ক্লেশপ্রদান করেন।" এইজন্যই বৈষ্ণবেরা আপনার দেহকে সযত্নে ভূষিত করেন। এ সাজ-সজ্জা নিজের সৌন্দর্য্য-পিপাসা শান্তির জন্য নহে,—ভগবানের তৃপ্তির জন্য। কারণ

তাঁহাদের দেহ যে ভগবানের লীলাক্ষেত্র, ইহা তাঁহারা বুঝেন। তিনিই জগতের একমাত্র পুরুষ; অন্য সকল নর-নারী প্রকৃতি। যেমন কোন প্রণয়ী তাহার প্রণয়ভাজনের সৌন্দর্য্য দেখিতে ভালবাসে, তেমনই শ্রীকৃষ্ণ আমাদিগের সকলকে সৌন্দর্য্য ও প্রেমের সরসী-নীরে মগ্ন দেখিতে ভালবাসেন। আমাদের শ্রীভগবানও সৌন্দর্য্যের কাঙ্গাল।

আজকাল ইউরোপে এবং দেখাদেখি কতকটা এদেশেও কৃত্রিম ঔষধাদির সাহায্যে দেহের সৌন্দর্য্য-বৃদ্ধির চেষ্টা হইতেছে। এই দেহগত চর্ম্মশরীরের সৌন্দর্য্য-বৃদ্ধি কৃত্রিম ঔষধ ব্যবহারে হইবে না। বর্ত্তমান যুগে আমাদের জীবনে যে দুঃখ-ক্লেশের সঞ্চার হইয়াছে, তাহার অর্দ্ধেকের উপর স্বাস্থ্যরক্ষার স্বাভাবিক নিয়মগুলির প্রতি আমাদের তীব্র বিরাগ আর এই চর্ম্মদেহের সৌন্দর্য্যবৃদ্ধির তীব্র অনুরাগ হইতেই জন্মিয়াছে। কিন্তু পূর্ণ স্বাস্থ্য না থাকিলে পূর্ণ সৌন্দর্য্য যে কোথা হইতে আসিবে, তাহা রূপ-বিলাসীরা একবারও বুঝিয়া দেখে না। সুন্দর নিটোল আকৃতি, প্রত্যেক অঙ্গপ্রত্যঙ্গের আকৃতি ও পরিমাণের সামঞ্জস্য—এ সকল কোন কৃত্রিম ঔষধ বা কসরৎ দ্বারা লাভ করা যায় না। ইহার জন্য সাধনা আবশ্যক। দেহকে শুদ্ধ-সংযত রাখিতে না পারিলে পূর্ণ স্বাস্থ্য লাভ করা অসম্ভব। যে দেহ-শুদ্ধি করিতে সমর্থ, সেই পরিপূর্ণ স্বাস্থ্যের অধিকারী; আর যিনি স্বাস্থ্যসম্পন্ন, তিনিই সুন্দর। স্বাস্থ্য ও সৌন্দর্য্য একত্রই থাকে। জীবনের এমন ধন আর কিছুই নহে। স্বাস্থ্য ও সৌন্দর্য্য অর্থ ও মান অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ।

সুন্দর চিরদিনই লোকের অনুরাগ আকর্ষণ করে। সুন্দরকে চিরকালই লোকে ভালবাসে। ইংরাজ কবি স্যর ওয়াল্টার স্কট্ বলিয়াছেন:—"কি রাজ-সভায়, কি শিবিরে, কি কুঞ্জবনে সর্ব্বত্রই ভালবাসার জয়।" আর আমাদের উপনিষদ্‌কারগণও বলিয়াছেন,—"প্রেম হইতেই এই জগতের উৎপত্তি হইয়াছে, প্রেমবলেই ইহা চলিতেছে, প্রেমের অভিমুখেই এই জগৎ নানা বিবর্ত্তনের মধ্য দিয়া চলিয়াছে, আর জগতের শেষ পরিণতিও হইবেও প্রেমে।" কিন্তু প্রেম কি সৌন্দর্য্য ব্যতীত থাকিতে পারে? কখনই না। প্রেম ও সৌন্দর্য্য—এক অপরকে ছাড়িয়া থাকিতে পারে না। সৌন্দর্য্য প্রেমকে গাঢ় করে, প্রেম সৌন্দর্য্যকে বাড়াইয়া তুলে। সৌন্দর্য্যের ঐন্দ্রজালিক স্পর্শে প্রেম সঞ্জীবিত হয়। সৌন্দর্য্যের সহায়তা না পাইলে প্রেম আত্মপরিচয় লাভ করে না, আর প্রেম না থাকিলেও সৌন্দর্য্য আত্মবিস্মৃত। প্রেমহীন সৌন্দর্য্য এবং সৌন্দর্য্যহীন প্রেম

উভয়ই তুল্যমূল্য, লোকে উহার কোনটীই চায় না। সৌন্দর্য্য না থাকিলে প্রেম মৃত এবং প্রেম না থাকিলে সৌন্দর্য্যও মৃত। সুন্দরের দর্শনেই প্রেমের উদ্ভব এবং প্রেমের মোহনস্পর্শেই সৌন্দর্য্যের অনুভূতি, সুন্দরের আত্মপ্রকাশ। প্রেম ও সৌন্দর্য্যের এই দ্বন্দ্বই পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ উপন্যাস, শ্রেষ্ঠ কলা। ইহাদের দ্বন্দ্বের আরম্ভ জগৎ-সৃষ্টির দিন হইতে, এ দ্বন্দ্বের আজও বিরাম নাই, কখনও হইবে না; ইহা অনন্তকাল চলিবে।

প্রেমহীন জীবন জীবনই নহে। প্রেমহীন জীবনে বড় কষ্ট, বড় দুঃখ।

ইউরোপের মধ্যযুগে খৃষ্টান সন্ন্যাসীরা (Monk) প্রেমকে প্রলোভন এবং সৌন্দর্য্যকে "ফাঁদ" বলিয়া উহাদের তীব্র নিন্দা করিয়াছেন। কিন্তু প্রেম ও সৌন্দর্য্যের এই গ্লানি সে যুগের নৈতিক চরিত্রের উৎকর্ষ সাধন করিতে পারিয়াছিল কি ? প্রেম ও সৌন্দর্য্যের আদর্শ হারাইয়া, উহাদের প্রকৃত অর্থ উপলব্ধি করিতে না পারিয়া ইউরোপের মধ্যযুগের কঠোর-ব্রত সন্ন্যাস-প্রথা আপনার চরণে আপনিই কুঠারাঘাত করিয়াছিল। তাহাতেও সমস্ত চুকে নাই,—সমাজ ও ধর্ম্ম কেবল রক্ত-মাংসেরই—কেবল ঐহিকতারই পূজা করিতে লাগিল। প্রকৃত সৌন্দর্য্যানুভূতির অভাবই ইউরোপের এই দুর্দ্দশার কারণ।

সৌন্দর্য্যকে উহার নিজস্ব উচ্চ আসন হইতে নামাইয়া দাও, প্রেমের আদর্শ ক্ষুণ্ণ হইবে এবং তাহা হইলে জগদীশ্বরও শয়তানের সম-শ্রেণীতে নামিয়া আসিবেন। সৌন্দর্য্য ও প্রেমকে তাহাদের প্রকৃত প্রাপ্য প্রদান কর, ভগবানও পুনরায় স্বীয় আসন অধিকার করিবেন।

রূপজীবিনীরা রূপের ঔজ্জ্বল্য সাধন করে,—অপরের ধন হস্তগত করিতে। তাই বলিয়া কি গৃহলক্ষ্মীরা রূপের উৎকর্ষ-সাধনের, আপনাদের সৌন্দর্য্য-বৃদ্ধির প্রয়াস পাইবেন না। রূপজীবিনীরা আপনাদের রূপ ঘষিয়া-মাজিয়া থাকে বলিয়া সে কার্য্যটা হেয় হইল, এমন মনে করিবার কারণ নাই। বরং তাঁহাদের প্রতিকূলে এইরূপ একটী অভিযোগ শুনিতে পাওয়া যায় যে, গৃহলক্ষ্মীরা সৌন্দর্য্যের উৎকর্ষ সাধন করেন না বলিয়া রূপজীবিনীরা এখন আপনাদের অধিকার বিস্তার করিতে পারিতেছে। এ অভিযোগের মূলে যে একেবারেই সত্য নাই, এমন কথা বলিতে আমরা পারিব না। বাহিরের রূপেই তো চোখের নেশা জন্মে, তার পর প্রাণের নেশা। যে কুললক্ষ্মী আত্মরূপের ঔজ্জ্বল্যসাধনে অবহেলা করিয়া স্বামীর এই নেশা ছুটাইয়া দেন, তিনি ভ্রান্ত স্বামীর সম্পূর্ণ পাপভার নিজ মস্তকে গ্রহণ করেন। কারণ তিনিই তাঁহার স্বামীকে

অবৈধ সৌন্দর্য্যস্পৃহা চরিতার্থ করিতে দিয়া সমগ্র জাতির দৈহিক, মানসিক এবং নৈতিক অধঃপতনের পথ মুক্ত করিয়া দেন। পূর্ব্বেই ত বলিয়াছি, স্বাভাবিক সৌন্দর্য্যকে বিকৃত করিতে গেলে বিপদ অবশ্যম্ভাবী।

সুন্দর হইতে সকলেই চায়; কিন্তু শুধু চাহিলেই ত সৌন্দর্য্যের অধিকারী হওয়া যায় না। ইহার জন্যও সাধনা আবশ্যক। অভ্যাস ও কার্য্যের দোষে অনেকে সৌন্দর্য্যহীন হইয়া পড়ে, এরূপ শ্রেণীর নরনারীর অভাব পৃথিবীতে নাই। ইহারা আপনাদের অভ্যাস ও আচরণ ভাল করিলে আবার সুন্দর হইতে পারে।

ইদানীং সৌন্দর্য্যের অধিকারী হইতে গিয়া বহু নরনারী স্বাস্থ্যরক্ষার স্বাভাবিক নিয়মগুলিকে অবহেলা করিয়া থাকে। স্বাস্থ্যই যে সৌন্দর্য্যের মূল,—এ কথাটা তাহারা বিস্মৃত হয় এবং সৌন্দর্য্যের উৎকর্ষ-সাধনের জন্য উগ্র অঙ্গরাগ, সাবান, পোমেড ব্যবহার করিয়া গাত্রচর্ম্মকে অধিকতর অমসৃণ ও কর্কশ করিয়া তুলে। ইহাতে সৌন্দর্য্যের বৃদ্ধি দূরে থাকুক, সৌন্দর্য্যের মূলোৎপাটনই হয়।

সাধারণতঃ সৌন্দর্য্যকে বিশ্লেষণ করিলে এই কয়টী বিষয় পাওয়া যায়:—(১) অঙ্গপ্রত্যঙ্গের সহিত আকৃতির সামঞ্জস্য; (২) ত্বকের কোমলতা ও লাবণ্য; (৩) অঙ্গপ্রত্যঙ্গের স্থিতিস্থাপকতা; (৪) মনোমধ্যে যে সকল কোমল ভাবের উদয় হয়, শরীরস্থ অঙ্গপ্রত্যঙ্গগুলির সেই ভাব-প্রকাশ ক্ষমতা। ইহাদের প্রথমটী আমরা জনক-জননী হইতে প্রাপ্ত হই। অপর কয়েকটীর উৎকর্ষ-সাধন সাধনা-সাপেক্ষ। উপযুক্ত ব্যায়াম এবং বিজ্ঞান ও স্বাস্থ্যরক্ষার নিয়ম-সম্মত অঙ্গচালনার ফলে অঙ্গপ্রত্যঙ্গ স্থিতিস্থাপক হইতে পারে। অতীত যুগের শিল্পকলা—চিত্র ও ভাস্কর্য্য হইতে আমরা কোমল মনোভাবের কিরূপ বাহ্য বিকাশে কোন্ অঙ্গ সুন্দর দেখায়, তাহা শিক্ষা করিতে পারি। উন্মুক্ত বায়ু-সেবনাদি সহজসাধ্য ব্যায়াম দ্বারা ত্বকের কোমলতা ও লাবণ্য বৃদ্ধি পাইতে পারে। সৌন্দর্য্যবৃদ্ধি করিবার আগে এগুলি বেশ করিয়া লক্ষ্য করিয়া দেখিবেন।

জগৎ সৌন্দর্য্যময়। বিশ্বের প্রতি অণুতে সৌন্দর্য্য। যেখানে সৌন্দর্য্য, সেখানেই প্রেম। যিনি চিরসুন্দর, তিনি চিরপ্রেমময়। প্রেম এবং সৌন্দর্য্যের পূর্ণ পরিণতি, পূর্ণ মিলন ভগবানে। *

শ্রীঅমূল্যচরণ সেন।

---

* "Hindu Review" পত্রে প্রকাশিত "On Beauty" নামক প্রবন্ধাবলম্বনে।

অনাথ বালক।

(১)

"কি অনা এখনও শুয়ে রয়েছিস্ যে, জল আন্‌তে গেলি না? আজ খেতে হ'বে না বুঝি?" এই বলিয়া একটী ত্রয়োবিংশতিবর্ষীয়া যুবতী আলুলায়িত-কুন্তলা হইয়া দরজার নিকট আসিয়া গর্জ্জিয়া উঠিলেন। এই রণরঙ্গিনী মূর্ত্তি দেখিয়া বালক বড় ভীত হইল।

অনা ওরফে অনাদি একটি পঞ্চদশবর্ষ বয়স্ক পিতৃমাতৃহীন অনাথ বালক, যুবতী তাহার বিমাতা।

অনাদির পিতা শরচ্চন্দ্র রায় প্রথম স্ত্রীবিয়োগের পর শোকে অভিভূত হইয়া পড়িলেন। ধন-ধান্য পরিপূর্ণ শস্যশ্যামলা প্রান্তর তাঁহার নিকট মরুভূমিবৎ প্রতীয়মান হইতে লাগিল। পত্নী-বিরহে তিনি অধীর হইয়া পড়িলেন। তাঁহার কাছে জ্যোৎস্না-আঁধারে আর প্রভেদ থাকিল না। তিনি উদাসীন হইয়া পড়িলেন! তখন ভীষণ শোকোচ্ছ্বাসের প্রবল তরঙ্গ 'শোকগাথা,' 'উদ্দেশে', 'উচ্ছ্বাস' ইত্যাদি কয়েকখানি গ্রন্থ নিবিষ্ট হইল। জীবনের অবশিষ্টাংশ এই মাতৃহারা বালককে বক্ষঃস্থলে রাখিয়া সকল শোকতাপ নিবারণ করিবেন স্থির করিলেন।

দিন গেল, দিন এল। কয়েকমাস অতীত হইল। হঠাৎ সমস্ত শোকতাপ শরতের মেঘের ন্যায় উড়িয়া যাইয়া তাঁহার হৃদয়াকাশ উন্মুক্ত করিয়া দিল। শরচ্চন্দ্র বড় 'একা' অনুভব করিতে লাগিলেন। তাহার পর যখন আম্রবৃক্ষ হইতে পঞ্চমস্বরে কোকিল ডাকিয়া উঠিল, বেল, চম্পক, মল্লিকাফুল ফুটিয়া উঠিল, শরচ্চন্দ্র থাকিতে পারিল না, সেই মধুমাসে এই তরুণীকে বিবাহ করিলেন। সে আজ ১০ বৎসরের কথা।

বিবাহের দুই বৎসর পরে শরচ্চন্দ্রের একটি পুত্র সন্তান হইল, ফলে ক্রমশঃ অনাদি পিতৃস্নেহ হইতে বঞ্চিত হইতে লাগিল। এই পুত্র জন্মগ্রহণ করিবার এক বৎসর পরে শরচ্চন্দ্রের মৃত্যু হয়।

তরুণীর ভ্রাতা শিবনাথ একটি কন্যা লইয়া এই পরিবারভুক্ত হইলেন। এই কন্যাটির নাম সুভা। সুভা সামান্য বালিকা হইলেও অনাদির দুঃখে দুঃখী, ব্যথায় ব্যথী।

শিবনাথ সামান্য বেতনের একটা চাকুরী করিয়া, এবং শরচ্চন্দ্র যাহা রাখিয়া গিয়াছিলেন তাহা হইতে এই সংসার প্রতিপালন করিতে লাগিলেন। গৃহে অনাদি অবিরত তাহার বিমাতার ফরমাইস খাটিত। সাধ্যাতিরিক্ত পরিশ্রম করিয়াও কিছুতে তাহার মন পাইত না।

তাহার বিমাতা যখন তাহাকে তাড়না করিতেন অথবা নির্দ্দয়ভাবে প্রহার করিতেন, তখন বালক একান্ত নিঃসহায় ভাবে অশ্রুপূর্ণলোচনে তাহার দিকে চাহিয়া রহিত।

দুইদিন হইতে অনাদির শরীর অত্যন্ত অসুস্থ; সে কিছুই খায় নাই। একটি ছেঁড়া মাদুরে শুইয়া আছে—পার্শ্বে সুভা। অনাদি তাহার বিমাতার এত যন্ত্রণা, অবমাননা, প্রহার সমস্তই সহ্য করিত, কেবল চারিটি অন্নের জন্য! কতদিন বালক অর্দ্ধাশনে বা অনশনে কাটাইয়াছে কিন্তু মুখে কোন কথা কহে নাই! সে নীরবে সমস্তই সহ্য করিত।

অনাদি তাহার বিমাতার গর্জ্জন দেখিয়া উপাধানে মুখ লুকাইয়া কাঁদিতেছিল, আর সুভা তাহাকে আস্তে আস্তে সান্ত্বনা দিতেছিল। এমন সময় ছোট খোকা আসিয়া অনাদির হাত ধরিয়া টানিতে লাগিল। খোকাকে অনাদি বড় ভালবাসিত সেই জন্য তাহার উপর অভিমান হইল। সে খোকাকে একটি ছোট চড় মারিল। তরুণী বাহির হইতে এ ঘটনা দেখিল।

অগ্নিতে ঘৃতাহুতি পড়িল। একটা সামান্য অনাথ বালকের এতাদৃশ স্পর্দ্ধা দেখিয়া তরুণী ভবিষ্যত না ভাবিয়া রোষকষায়িত নয়নে ভৈরবী-মূর্ত্তিতে গর্জ্জন করিতে করিতে অনাদির হাত ধরিয়া বাড়ির বাহির করিয়া দিল।

অনাদি ক্রন্দন করিতে করিতে রাস্তায় আসিয়া দাঁড়াইল।

বর্ষাপ্লাবিত নদীর ন্যায় সুভার চক্ষু অশ্রুপরিপ্লুত হইল, সে পবন বিকম্পিত বেতস-লতার মত ঘরের কোনে দাঁড়াইয়া কাঁদিতে লাগিল।

জন্মের মতন পিতৃভবন ত্যাগ করিয়া যে দিকে দুই চক্ষু যায় সেই দিকে যাইতে অনাদি প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইল। ভবিষ্যতের বিষয় কিছুই ভাবিল না।

অল্পক্ষণ পরেই সুভা দৌড়িয়া আসিয়া অনাদিকে বাড়িতে ফিরিবার জন্য অনুরোধ করিতে লাগিল। সুভাকে অনাদি অত্যন্ত স্নেহ করিত। সুভা যতদিন তাহাদের বাড়ি আসিয়াছে সেই সময় হইতে অনাদি কদাপি তাহার অনুরোধ উপেক্ষা করে নাই। কিন্তু আজ সুভার কাতরোক্তি, তাহার প্রার্থনা, তাহার অনুনয়-বিনয় সমস্তই বৃথা হইল। অনাদির হৃদয় আজ মর্ম্মন্তুদ বেদনায় স্ফীত,

অনাদি আজ স্থিরপ্রতিজ্ঞ। তাহার চক্ষু এখন অশ্রুসিক্ত নহে, বদনমণ্ডল আরক্তিম, শরীর কম্পবান।

সুভার হাত ধরিয়া অনাদি বলিল—"সুভা, ফিরিয়া যা, আমি আর ফিরিব না। তোর মায়া মমতা কখন ভুলিতে পারিব না। আনন্দপুরে আর আমার স্থান নাই। আমি চলিলাম, কোথায় যাইব জানি না। যদি বাঁচিয়া থাকি তাহা হইলে হয়ত আবার দেখা হবে।" এই বলিয়া অনাদি উত্তরের প্রতীক্ষা না করিয়া সম্মুখের রাস্তা ধরিয়া চলিতে লাগিল।

যতক্ষণ দেখা যায় ততক্ষণ সুভা একদৃষ্টে চাহিয়া রহিল, পরে ধীরে ধীরে আবার বাড়ি ফিরিল।

সুভার নয়ন অশ্রুসিক্ত ও তাহাকে বিষণ্ণ দেখিয়া তাহার পিসিমা জিজ্ঞাসা করিলেন "এতক্ষণ কোথায় ছিলি?" ভীত হইয়া বালিকা বলিল "এই বাহিরেই ছিলুম।" তাহার পর সভয়ে পিসিমার আরও নিকটে গিয়া অস্ফুটস্বরে বলিল—"পিসিমা! দাদাকে ডাকবো?"

"না, আর ডাকতে হ'বে না। দেখে আসুক কে খেতে দেয়—" এই বলিয়া পিসিমা পুনরায় রাগে কাঁপিতে কাঁপিতে অন্যত্র উঠিয়া গেলেন। বালিকা বুঝিল অগ্নি এখনও নির্ব্বাপিত হয় নাই।

সুভা তাহার পিসিমার সন্তোষার্থ খোকাকে কোলে লইয়া আবার বাহিরে আসিল। কিন্তু অনাদিকে আর দেখিতে পাইল না।

(২)

ক্রমে সন্ধ্যার অন্ধকার গ্রামখানি ঢাকিয়া ফেলিল।

বৃক্ষের উপর পক্ষিগণ আপন আপন কুলায় চীৎকার করিতে লাগিল; গরুর পাল স্ব স্ব গৃহাভিমুখে চলিতে লাগিল; গ্রাম্যবধূগণ সান্ধ্যপ্রদীপ জ্বালিয়া মঙ্গল শঙ্খধ্বনিতে নির্জ্জীব গ্রামখানিকে ক্ষণতরে সজীব করিয়া তুলিলেন। গ্রাম্য চাষাগণ দাওয়ায় বসিয়া তাম্বুল খাইতে খাইতে খোসগল্প আরম্ভ করিয়া দিল।

অনাদির নিকট যে আনন্দপুর এক সময় সুখের লীলাভূমি ছিল তাহা এখন ঘোর অশান্তির আবাসস্থলে পরিণত হইল। সংসারানভিজ্ঞ বালক এই বাত্যা-বিক্ষুব্ধ সংসার-সমুদ্রে তরী ভাসাইল,—জানে না সে কূল পাইবে কি না!

অনাদিকে দেখিয়া গ্রাম্য-কুকুরেরা চীৎকার করিয়া উঠিল, কিন্তু সে কোন দিকে লক্ষ্য না করিয়া আপনার মনে চলিতে লাগিল। অবশেষে গ্রামের প্রান্তরে

আসিয়া অত্যন্ত ক্লান্তি বোধ হওয়ায় বিশ্রামের নিমিত্ত একটি বটবৃক্ষের নিম্নে বসিয়া পড়িল। ক্ষুধায় তাহার অত্যন্ত কষ্ট হইতেছিল, কিন্তু কি করিবে, উপায় নাই।

সপ্তমীর শুভ্ররজত ধবল চন্দ্র-কিরণ ঝাউ গাছের পাশ দিয়া আম্রকাননের মধ্য দিয়া রামনিধি ময়রার চালের উপর দিয়া অনাদির সেই ক্লান্ত, ম্লান ছোট মুখখানির উপর আসিয়া পড়িল।

রামনিধি ময়রা অনাদিকে এইখানে এই অবস্থায় একাকী বসিয়া থাকিতে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিল "কি ঠাকুর, এত রাত্রে এখানে ব'সে কেন?"

সহসা রামনিধিকে দেখিয়া অনাদির হৃদয় একটু চঞ্চল হইয়া উঠিল। মাতার রূঢ় ব্যবহার গোপন করিয়া বলিল "কার্য্যবশতঃ নদীর ওপারে গিয়েছিলুম ব'লে বড় ক্লান্ত হ'য়ে পড়েছি, তাই একটু বিশ্রাম করছি।"

একটু সন্দিহান হইয়া রামনিধি বলিল—"বাড়ী হ'তে রাগ করে আসনিত?"

অনাদি এবার একটু বিচলিত হইল, কিন্তু তথাপি বালক তাহার গৃহ-কলঙ্ক অধিকতর যত্নে গোপন রাখিয়া একটু ম্লান হাসি হাসিয়া বলিল—"আমার বাড়ী, আমার মা, আবার রাগ করবো কার উপর? একি তোমা? দেখ্ রামনিধি কিছু খাবার দেত, বড় ক্ষিধে পেয়েছে।"

রামনিধি অনাদিকে অত্যন্ত ভালবাসিত; সে তৎক্ষণাৎ ঘরের ভিতর হইতে তাহাকে খাবার আনিয়া দিল।

দুইদিনের পর অনাদি আজ সন্তোষের সহিত আহার করিতে পাইল। শরীরে বল পাইয়া আবার সে চলিতে আরম্ভ করিল। যদিও তাহার হৃদয়টি এক একবার সেই ক্ষুদ্র কুটীরখানির জন্য লালায়িত হইতেছিল কিন্তু তাহার আর গৃহে ফিরিতে সাহস হইল না। মাতার রূঢ় ব্যবহার তাহার হৃৎপিণ্ড স্পন্দিত করিয়া তুলিতেছিল।

রাত্রি প্রায় দ্বিপ্রহর। গ্রামবাসিগণ সুখে আপন আপন কুটীরে নিদ্রা যাইতেছে। প্রকৃতি নিস্তব্ধ, জ্যোৎস্নালোকে চতুর্দ্দিক পরিপ্লুত। নীল নভমণ্ডলে অনন্ত তারা ফুটিয়াছে, নিম্নে অনন্ত প্রান্তর, অনাদির চিন্তাও অনন্ত—বিস্তৃত। দূরে খরস্রোতা ভাগীরথী কুলু কুলু নাদে প্রবাহিতা।

অনাদি গঙ্গা-সৈকতে আসিয়া দাঁড়াইল। চতুর্দ্দিক একবার স্থিরনেত্রে অবলোকন করিয়া ভাবিল "কেহই ত এখন নাই; তবে গঙ্গার জলে আমার এই ক্ষুদ্র প্রাণ বিসর্জ্জন দিয়া সমস্ত জ্বালা যন্ত্রণার অবসান করি না কেন? আমার

মৃত্যুতে পৃথিবীর কাহারও অনিষ্ট হইবে না, আমার নিজেরও ইষ্ট ব্যতীত অনিষ্ট হইবে না।” বালক শিহরিয়া উঠিল। তাহার তৎক্ষণাৎ মনে হইল, আত্মহত্যা মহাপাপ! মৃত্যুতেও তাহার অধিকার নাই! সে কাঁদিয়া ফেলিল। তখন আইনের এক সূক্ষ্ম কথা তাহার মস্তিষ্কে প্রবেশলাভ করিল। স্বেচ্ছায় আত্মহত্যা না করিলেই ত হইল! এই ভাবিয়া সে গঙ্গাবক্ষে একখানি ক্ষুদ্র ‘পার’ করিবার নৌকায় সাহসে ভর দিয়া উঠিয়া ছাড়িয়া দিল। বিধাতার ইচ্ছা অন্যরূপ। অনাদি নির্ব্বিঘ্নে ওপারে পৌঁছিয়া পুনরায় চলিতে আরম্ভ করিল।

বিপদের সময় ভগবান বালকের ক্ষুদ্র হৃদয়ে অসীম শক্তি দিলেন। নিদ্রা-দেবী আসিয়া পথশ্রান্ত বালককে ক্রোড়ে স্থান দিলেন। অল্পক্ষণ পরেই রাত্রি প্রভাত হইল।

অনাদিও ব্যস্তভাবে উঠিয়া বসিল। শিশিরসিক্ত বৃক্ষপত্র সমূহ বালভানুর কোমল কিরণে বিভাসিত হইয়া বড় মনোহর শোভা সৃজন করিয়াছে। গঙ্গার বারিরাশির ক্ষুদ্র উর্ম্মিগুলিকে কে যেন হীরক খচিত করিয়াছে। কিন্তু অনাদি এ সমস্ত প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য কিছুই দেখিতে পাইল না; আর তাহার এ দেখি-বার সময় ত নহে। সে দেখিল যে আনন্দপুর ত্যাগ করিয়া দৌলতবাদ আসি-য়াছে। সহসা তাহার মনে পড়িল যে এই গ্রামে তাহার পিতৃবন্ধু সতীশবাবু বাস করেন। অনাদির লক্ষ্যশূন্য ঘনতমসাবৃত হৃদয়ের মধ্যে একটি ক্ষীণ আলোকরেখা ফুটিয়া উঠিল!

নূতন উৎসাহে উদ্দীপিত হইয়া বালক এবার চলিতে লাগিল, কিন্তু কি করিয়া গৃহ-কলঙ্কের কথা তাহার পিতৃবন্ধুকে জ্ঞাপন করিবে এই ভাবিয়া সে একটু চঞ্চল হইয়া উঠিল।

হাতে চাঁদ পাইল। অল্পদূর গিয়া দেখিল সতীশবাবু গ্রামান্তর হইতে গরুর গাড়ী করিয়া ফিরিতেছেন। অনাদিকে দেখিয়া তিনি গাড়ী থামাইয়া বলিলেন—“কি গো অনাদি খবর কি, সমস্ত কুশল ত?”

আজ্ঞে আপনার আশীর্ব্বাদে শারীরিক সমস্ত কুশল।”

“এ দিকে কোথায় যাচ্ছ?”

অনাদি হঠাৎ বলিয়া ফেলিল—“আজ্ঞে এ দিকে একটু কাজ আছে—”

“তা বেশ ত এই গাড়িতে এস”।

অনাদি গাড়িতে উঠিল। সে ভাবিল এইবার সমস্ত বলিব।

গাড়ী চলিতে লাগিল। দুই ঘণ্টার ভিতর গাড়ীখানি সতীশবাবুর বাড়ীতে পৌঁছিল।

(৩)

দৌলতবাদ। সতীশবাবুর গৃহখানি দ্বিতল। সম্মুখে একটু ছোট ফুলের বাগান আছে। দক্ষিণ দিকে একটি বড় পুষ্করিণীও রহিয়াছে। এ গ্রামের ভিতর তিনি একজন সঙ্গতিপন্ন ব্যক্তি।

গৃহে তাঁহার স্ত্রী আর একটি দশম বর্ষীয়া কন্যা ব্যতীত অপর কোন আত্মীয় নাই।

সতীশবাবু আপনার কক্ষে বসিয়া অনাদির নিকট সমস্ত ঘটনা শ্রবণ করিতে লাগিলেন। পুত্রের প্রতি মাতার এই প্রকার নৃশংস ব্যবহার শুনিয়া বৃদ্ধ এক একবার শিহরিয়া উঠিতেছিলেন।

পিতার মৃত্যুর পর অনাদি কাহারও নিকট কখনও কোন সহানুভূতি পায় নাই; একজন ব্যতীত তাহার দুঃখে কাহারও নয়নসিক্ত হয় নাই। সতীশবাবুর স্নেহে বালক কাঁদিয়া ফেলিল।

সতীশবাবু তাহাকে সান্ত্বনা দিয়া গৃহে ফিরিয়া যাইতে অনুরোধ করিলেন, কারণ বোধ হয় তিনি ভাবিয়াছিলেন যে, এ অভিমান ক্ষণিকের।

পুনরায় গৃহে প্রত্যাগমনের কথা শুনিয়া অনাদির হৃৎপিণ্ড কাঁপিয়া উঠিল। লজ্জা, মান, অপমান সমস্ত দূরীভূত হইল, সে সতীশবাবুর পা ধরিয়া ক্রন্দন করিতে করিতে জড়িত কণ্ঠে বলিল—"আমাকে বাড়ী রাখিয়া আসা অপেক্ষা হাত পা বাঁধিয়া ঐ গঙ্গার বক্ষে ফেলিয়া দিন, সুখে মরিতে পারিব।"

দুয়ারের পার্শ্ব হইতে সতীশবাবুর স্ত্রী স্থির হইয়া সমস্ত ঘটনা দেখিতেছিলেন। কোমলপ্রাণা আর স্থির থাকিতে পারিল না। তিনি স্নেহ-উৎসে বিদ্যুত-প্রবাহের ন্যায় সেই গৃহে প্রবেশপূর্ব্বক অনাদিকে সতীশবাবুর নিকট হইতে টানিয়া নিজের বক্ষে টানিয়া লইয়া বলিলেন—"আজ হ'তে তুই আমার ছেলে।"

অনাদি স্তম্ভিত হইয়া স্থিরনেত্রে রমণীর মুখপানে চাহিয়া রহিল। আশৈশব মাতৃস্নেহে বঞ্চিত অনাদির চক্ষু হইতে দুই ফোঁটা জল পড়িল!

সতীশবাবু বলিলেন—"বেশ, তাই হউক। ভগবান আজ আমাদের পুত্রের সাধ মিটাইলেন।"

গিন্নি ডাকিলেন—"ওরে কমলা, তোর দাদা এসেছে দেখবি আয়।"

কমলা সতীশবাবুর একমাত্র কন্যা,—অন্ধের যষ্টি, জীবনের ধ্রুবতারা।

কমলা 'দাদা' নামক একটা বস্তুর কথা শুনিয়া দৌড়িয়া আসিল, কিন্তু

অদ্যাবধি সে কি প্রকার তাহা দেখে নাই। সেইজন্য দ্রুত বাহিরে আসিয়া মায়ের অঞ্চল ধরিয়া বলিল—"দাদা কৈ?" তিনি অনাদিকে তাহার নিকট দিয়া বলিলেন,—"এই তোর দাদা, বাড়ীর ভিতর নিয়ে যা।"

কমলা বিস্ফারিত নেত্রে অনাদির দিকে চাহিয়া বলিল—"এই দাদা? দাদা দাদা, বাড়ীর ভিতর আমার বিড়ালের একটা ছানা হয়েছে দেখ্‌বে এস।" অনাদি কাষ্ঠপুত্তলিকার ন্যায় নিশ্চল হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল; তাহার যেন সমস্ত ছায়াবাজীর মত বোধ হইতেছিল!

সেই দিন হইতে সতীশবাবু অনাদিকে পুত্রাধিক স্নেহ করিতেন, অনাদিও সতীশবাবুকে পিতার ন্যায় দেখিত। স্নেহ-নিগড়ে পরের ছেলে আপনার হইল!

(৪)

সতীশবাবুর বাসায় থাকিয়া অনাদি গ্রাম্যস্কুলে লেখাপড়া শিখিতে লাগিল। কমলা তাহাকে অত্যন্ত স্নেহ করে। প্রত্যহ স্কুলের ছুটি হইবার সময় সে অনাদির জন্য জলখাবার প্রস্তুত করিয়া বাহিরে তাহার প্রত্যাশায় পথ চাহিয়া থাকে।

অনাদি বৈকালে পায়রা লইয়া কমলার সহিত খেলা করে, আবার কখনও বা একখানি বই লইয়া তাহাকে একটু একটু পড়ায়। কমলা পড়িতে খুব ভালবাসে কিন্তু কিছুতেই অনাদির উপদেশ তাহার মনে থাকে না, অথবা মনোযোগ দিয়া শুনে না।

সতীশবাবু জীবনের শেষ সীমায় উপস্থিত হইয়া অনাদির মতন একটি শান্ত শিষ্ট ভগবানদত্ত পুত্র পাইয়া অনেকটা আশ্বস্ত হইয়াছিলেন। তিনি অনাদির বিনয়-নম্র সদা হাস্যময় মুখখানি দেখিয়া বড়ই আনন্দ অনুভব করিতেন। তাঁহার বোধ হইত যেন 'অনাদি ও কমলা এক বৃন্তে দু'টি ফুল।'

*　　*　　*　　*　　*

সুখে দুঃখে চারি বৎসর কাটিয়া যাইল। সতীশবাবু স্বাস্থ্যের জন্য স্বগ্রাম ত্যাগ করিয়া সৈয়াদবাদে আসিয়াছেন।

কমলা এখন আর সেই দশমবর্ষীয়া বালিকা নহে। তাহার নীল চক্ষু দু'টি বাল্যসুলভ চপলতা ছাড়িয়া ধীর ভাব ধারণ করিয়াছে। লজ্জা আসিয়া চপলতার স্থান অধিকার করিয়াছে। সে অনাদির সহিত আর বড় খেলা করে না, সমস্ত দিন গৃহ-কার্য্যে ব্যাপৃত থাকে।

অনাদিও এখন আর সেই গ্রাম্যস্কুলের ছাত্র নাই। সতীশবাবু তাহাকে সেখানকার জমীদার জ্যোতিষবাবুর নায়েব করিয়া দিয়াছেন।

জ্যোতিষবাবু বেশ সঙ্গতিপন্ন। প্রজাবৎসল জমিদার। তাঁহার একটি পুত্র নাম অতীন্দ্র ও একটি কন্যা নাম মাধবী। অতীন্দ্র, অনাদির প্রায় সমবয়স্ক। সে কলিকাতায় কলেজের পড়া শেষ করিয়া অধুনা গৃহে আসিয়া বাস করিতেছে।

মাধবীর বয়স প্রায় পঞ্চদশ বৎসর। ঠিক মাধবীলতার ন্যায় ক্ষীণ ও সদা হাস্যময়ী। কিন্তু সে হাসির ভিতরেও যেন একটা বিষাদের চিহ্ন লুক্কায়িত আছে। জমিদারের একমাত্র পুত্রী হইলেও তাহার অঙ্গে বিলাসের চিহ্ন নাই। তাহাকে দেখিলে বোধ হয় যেন কেমন একটা পবিত্র ভাব তাহার মুখমণ্ডলে প্রতিভাত হইতেছে। যখন সে বেড়াইয়া বেড়ায়, তখন বোধ হয় যেন, নীলনীরদমণ্ডিত চন্দ্রমা।

* * * * *

কয়েক মাস গত হইল। একদিন প্রাতে অনাদি শুনিল যে পরদিন তাহাকে তাঁহার নিজের গ্রামে আনন্দপুরে দুইটি গোয়ালার বাড়ী মাল ক্রোক্ করিতে যাইতে হইবে।

এই সংবাদে অনাদির হৃদয়ে সহসা বিদ্যুৎ খেলিল। বহুকালের সমস্ত ঘটনা আবার তাহার মানসপটে উদিত হইয়া তাহাকে বৃশ্চিক-দংশন করিতে লাগিল। সে একবার ভাবিল—'যখন জন্মের মতন আনন্দপুর ত্যাগ করিয়াছি, তখন এ কার্য্য ত্যাগ করিতে প্রস্তুত তবু স্বগ্রামে আর যাইব না। পিতার মৃত্যুর সহিত স্বদেশ আমার বৈরী হইয়াছে।' অনাদির নয়নপল্লব জলভারাক্রান্ত হইয়া কাঁপিতে লাগিল, হৃদয় ধীরে ধীরে স্পন্দিত হইতেছিল। সে আবার ভাবিল—"আনন্দপুর আমার জন্মস্থান,—আমার শৈশবের ক্রীড়াভূমি, আমার বাল্যের সমস্ত সুখ দুঃখ তাহার প্রত্যেক পত্রপুষ্পলতার সহিত বিজড়িত! আত্মীয়-স্বজনেরা ত আমায় ত্যাগ করিয়াছে—সুভা আমায় বিস্মৃত হইয়াছে, কিন্তু আনন্দপুর ত আমায় ত্যাগ করেনি—"

সহসা কমলা বীণানিন্দিত স্বরে পিছন হইতে ডাকিল,—"অনাদি দাদা?"

কমলাকে দেখিয়া অনাদি বলিল—"কমলা, জমিদারী কার্য্যের জন্য কাল আমাকে আনন্দপুর যাইতে হইবে।"

অনাদির অশ্রুসিক্ত নয়ন ও জড়িতকণ্ঠ দেখিয়া বালিকার সমস্ত আনন্দ

যেন শরতের মেঘের ন্যায় উড়িয়া গেল। সে অনাদির নিকট গিয়া বলিল "তুমি যে সেদিন বলিলে আনন্দপুরে আর কখনও যাবে না?"

"কমলা, সে বড় অভিমানে, বলেছিলুম।"

একটি দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া কমলা বলিল "তারা যদি আসতে না দেয়?"

"কে আসতে দেবে না কমলা? তোমরা ছাড়া আমার আর কে আছে কমলা? তোমার পিতার এতাদৃশ স্নেহ, মায়া, মমতা না পাইলে অনাদির নাম এতদিন এ জগৎ হইতে বিলুপ্ত হইত। মনে করে দেখ সেই দিন, যে দিন স্বগৃহ হইতে বিতাড়িত হইয়া একটি শৈবালের ন্যায় ভাসিতে ভাসিতে তোমাদের নিকট আশ্রয় পাইলাম—" অনাদি আর বলিতে পারিল না, সামান্য বালকের ন্যায় ক্রন্দন করিয়া তথা হইতে উঠিয়া যাইল। কমলা একদৃষ্টে তাহার দিকে চাহিয়া রহিল। তাহারও নয়নকোণে অশ্রুবিন্দু দেখা দিল, সে মনে মনে ভাবিল "মানুষ কেন পূর্ব্বদুঃখের কথা একেবারে ভুলতে পারে না।"

(৫)

জ্যোৎস্নাময়ী রজনী। দীর্ঘ পাঁচ বৎসর পরে অনাদি আবার আনন্দপুরে আসিয়াছে। রাত্রি প্রায় দশটা। একাদশীর চন্দ্র আকাশে উঠিয়াছে। আনন্দপুরের প্রায় কিছুই পরিবর্ত্তন হয় নাই। গ্রামখানির ভিতর তখন একটা মহা নিস্তব্ধতা বিরাজ করিতেছিল।

বাড়ীর কথা মনে হইয়া তাহার প্রাণ আকুল হইয়া উঠিল। দুঃখে ও সুখে হৃদয় তোলপাড় হইতে লাগিল; অনাদি অন্যমনস্কভাবে স্বগৃহের দিকে যাইতে লাগিল। ধন্য আবাসভূমির আকর্ষণী শক্তি!

দূর হইতে অনাদি দেখিল গৃহের অনেকাংশ পড়িয়া গিয়াছে, উঠানে বন জন্মাইয়াছে, স্থানটি শার্দ্দূলের আবাসভূমিতে পরিণত হইয়াছে।

আরও একটু নিকটে গিয়া অনাদি শুনিল যে গৃহাভ্যন্তর হইতে করুণস্বরে কে ক্রন্দন করিতেছে।

অনাদি অনেকক্ষণ ধরিয়া ক্রন্দনধ্বনি শুনিল; তাহার সমস্ত মান অভিমান মুহূর্ত্তের মধ্যে ভাসিয়া গেল! দ্রুতপাদবিক্ষেপে সে গৃহের দিকে চলিল।

গৃহাভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়া দেখিল যে তাহার বিমাতা মৃত্যু-শয্যায় শায়িত, পার্শ্বে সুভা আর খোকা।

অনাদিকে এ অবস্থায় অকস্মাৎ দেখিয়া সকলে চমকিত ও আশ্চর্য্যান্বিত হইল। ক্রন্দনধ্বনি আরও বাড়িয়া উঠিল।

অনাদি তাহাদিগকে আশ্বস্ত করিতে করিতে বিমাতার নিকট গিয়া বলিল—"মা ভয় কি, এই যে আমি এসেছি!"

বিমাতা পুনঃ পুনঃ চক্ষু অঞ্চল দিয়া মুছিয়া, মুক্ত বাতায়ন দিয়া শুভ্র চন্দ্রালোকে অনাদির মুখটি দেখিয়া বলিলেন "এ সব কি স্বপ্ন!" অনাদিও দেখিলেন যে তাঁহার বিমাতার জীবন-সূর্য্য অস্তমিত প্রায়!

অনাদির গায় হাত দিয়া রমণী বলিলেন—"বাবা আমায় মার্জ্জনা করিও, ভগবান আমায় উপযুক্ত শাস্তি দিয়াছেন—সুভার নিকট সমস্ত শুনিও—মৃত্যুর পর ইহাদের কি হ'বে? অনাদি এতদিন কোথায় ছিলে বাবা?"

"মা তোমার কিছু ভয় নাই। যতদিন জীবিত থাকিব সুভার ও খোকার কোনও কষ্ট হ'বে না।"

সুভা কাঁদিতে কাঁদিতে অনাদির নিকট আসিয়া বসিল।

অনাদি কাতরকণ্ঠে বলিল—"মা বড় অভিমান করেছিলুম, কিন্তু এতদূর যে হবে তা' ত ভাবিনি!"

"দাদার মৃত্যুর পর হইতে কত দিন তোমার কত সন্ধান করিয়াছিলুম, কত লোককে বলেছিলুম কিন্তু এ হতভাগ্যদের কেহ সাহায্য করিল না। বাবা একটু জল—"

অনাদি মুখে জল দিল। রমণীর শরীর স্থির হইয়া যাইল, জীবন-প্রদীপ নির্ব্বাপিত হইল। অনাদিকে একবার দেখিবার জন্যই যেন তাহা এতক্ষণ জ্বলিতেছিল।

মাতৃদেহের সংকারাদির পর সুভার মুখে তাহার পিতার মৃত্যু, তাহাদিগের দুরবস্থার বিষয় সমস্ত শ্রবণ করিয়া অনাদি অনুতাপানলে দগ্ধ হইতে লাগিল।

(৬)

অনাদি সুভাকে ও খোকাকে সৈয়াদবাদ লইয়া আসিয়া সতীশবাবুর অনুমতিক্রমে একটা বাড়ী ভাড়া করিয়া বাস করিতে লাগিল।

কমলা প্রত্যহ বৈকালে সুভার নিকট বেড়াইতে আইসে; অতি অল্প সময়ের মধ্যে তাহাদের দুইজনের প্রগাঢ় বন্ধুত্ব হইল।

সুভা আর সে বালিকা নহে; সে এখন নবযৌবনে পদার্পণ করিয়াছে। কমলার রূপ স্ফুটনোন্মুখ গোলাপের ন্যায়, বসন্তের পূর্ণ শশধরের অনাবিল জ্যোৎস্নার ন্যায়। সুভার রূপ প্রস্ফুটিত শেফালিকার ন্যায়, হেমন্তের ঊষার ন্যায়। একজন 'আশা' অপরটী 'প্রীতি'।

দুইজনেই এখনও অবিবাহিতা। সুভার বিবাহ হয় নাই অর্থের জন্য, কমলার বিবাহ হয় নাই কেন তাহা সতীশবাবু ব্যতীত অন্য কেহ জানেন না।

* * * * *

প্রজাপতি নির্ব্বন্ধ। অঘটন ঘটিল।

জমিদার-পুত্র অতীন্দ্রনাথ সুভার রূপে আকৃষ্ট হইয়া তাহাকে স্বীয় অঙ্কলক্ষ্মী করিয়া সুরম্য হর্ম্ম অট্টালিকায় লইয়া গিয়াছেন। এ শুভ-মিলনের প্রধান উদ্যোগী অনাদি। সুভাকে ভাবী জমিদার-ঘরণী হইতে দেখিয়া অনাদির আনন্দের সীমা রহিল না।

অনাদিকে দেখিয়া মাধবী হাসিতে হাসিতে বলিল—"কি শুভক্ষণেই আপনি আনন্দপুর গিয়াছিলেন, তাই এমন বউ পেয়েছি!"

অনাদিও রহস্য করিয়া মাধবীর 'শুভক্ষণে'র কথা উত্থাপন করিতে যাইতে-ছিল এমন সময় সুভা সেই ঘরে প্রবেশ করিয়া ইঙ্গিতে অনাদিকে বুঝাইল যে মাধবী বাল্যবিধবা। অনাদি স্তম্ভিত হইল!

* * * * *

যে আশা-আলোক অনাদির আঁধার-হৃদি আলোকিত করিতেছিল, তাহা সহসা আজ নির্ব্বাপিত হইল। অকালে পুষ্প শুকাইয়া যাইল। বিসূচিকা রোগে কমলার মৃত্যু হইল। মৃত্যুর পূর্ব্বে অনাদির হাত ধরিয়া কমলা বলিয়াছিল—"দাদা আমার বৃদ্ধ পিতা মাতাকে দেখিও। না জানিয়া কত দোষ করিয়াছি, মার্জ্জনা করিও।"

কিন্তু অনাদির আর তাঁহাদিগকে অধিক দিন দেখিতে হয় নাই। কন্যা-শোকে অধীর জনক জননী অল্প দিনের মধ্যেই এ জগৎ ছাড়িয়া কন্যার সহিত মিলিত হইবার জন্য পরজগতে গিয়াছেন। অনাদি এখন তাঁহাদের সকল ধনের অধীশ্বর। কিন্তু অনাদির হৃদয়ের সমস্ত সুখ, সমস্ত আশা, আনন্দ অপসারিত হইয়াছে। তাহার এখন বিষম বৈরাগ্য, সংসারে তাহার বিশেষ বিতৃষ্ণা।

সতীশবাবুর সমস্ত অর্থ দিয়া অনাথ বালকবালিকাদিগের আশ্রয়ের জন্য অনাদি একটা প্রকাণ্ড প্রাসাদ নির্ম্মাণ করাইল, তাহার নাম দিল কমলা আশ্রম। প্রবেশ-দ্বারের শীর্ষোপরি সতীশবাবুর একটি প্রস্তর-মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করিয়া তাহার নিম্নে লিখিয়া দিল অনাথের প্রতিপালক।

মাধবীকে এই আশ্রমের তত্ত্বাবধান করিতে অনুরোধ করিয়া মাধবী, সুভা, অতীন্দ্র ও খোকার নিকট চির বিদায় গ্রহণপূর্ব্বক সৈয়দাবাদ ত্যাগ করিয়া জন্মের মত অনাথ বালক অনাদি কোথায় চলিয়া গেল!

শ্রীভূপেন্দ্রলাল রায়।

আঁধারে।

১

যখন সন্ধ্যা নেমে এসেছিল—
আঁধারিয়াছিল ধরণী,
অন্ধ নয়নে চলেছিনু বাহি'
বাঁধিনি ঘাটেতে তরণী;
ভাবিনি তখন ঘটিবে এমন—
এখন মাগিছি আলোকে,
এস সখা তুমি আঁধারের মাঝে
আলোকিত কর পলকে।

২

তখন তটিনী কত ধীর ছিল—
মেঘ নাহি ছিল আকাশে,
এখন এ উর্ম্মি কোথা হ'তে এল—
কেন মেঘ রোষ প্রকাশে!
এস, এস সখা, আলোকিত কর
ফেলিয়া রেখোনা আঁধারে,
তোমারি অমল প্রেম-ভরা করে
তুলে লও সখা আমারে।

শ্রীমতী রেণুকাবালা দাসী।

মিলন!

(১)

তটিনী হইয়া আমি যাইব বহিয়া,
হ'য়ো তুমি উচ্ছ্বসিতা লহরী-হিল্লোল;
তোমারে করিয়া বুকে বহিব চলিয়া,
গেয়ো তুমি মৃদু মধু সঙ্গীত-কল্লোল!

(২)

আমি হব প্রস্ফুটিতা কুসুম-কলিকা,—
থেকো তুমি বুকে মোর মধু গন্ধ লয়ে;
হ'ব আমি পল্লবিত বিটপী-বিথীকা
পুষ্প হয়ে সাথে মোর রহিয়ো ফুটিয়ে!

(৩)

সুনীল আকাশ মম অনন্ত হৃদয়,
হয়ো তুমি পূর্ণচন্দ্র সুন্দর শোভন;
জ্যোছনা কিরণ ঢালি হইয়ো উদয়!
আমি নিদ্রা তুমি হও আশার স্বপন!

(৪)

আমি চাঁদ তুমি হও কলঙ্ক আমার!
জীবন-সরসী মাঝে ফুল্ল কমলিনী!
আমি হব শুধু বীণা, তুমি তন্ত্রী তার,
ছন্দে গাঁথা কথা আমি,তুমি ভাব-রাণী!

(৫)

আমি দেহ তুমি প্রাণ, মিলন আত্মায়
প্রাণের স্পন্দন মোর অন্তরেতে তুমি!
নাহি কোন ভেদাভেদ তোমায় আমায়
চিরদিন আমি তব, মোর হ'য়ো তুমি!

শ্রীবলাই দেবশর্ম্মা।

শোক-সংবাদ।

আমরা গভীর শোকসন্তপ্ত চিত্তে প্রকাশ করিতেছি যে বাঙ্গালার একজন কৃতীসন্তান, যুক্ত-প্রদেশের সহকারী একাউণ্টেণ্ট্ জেনারেল, অর্চ্চনা-সম্পাদক শ্রীযুক্ত কেশবচন্দ্র গুপ্তের অগ্রজ, আমাদের অগ্রজপ্রতিম হরিদাস গুপ্ত মহোদয় আর ইহজগতে নাই! বিগত ১৬ই আষাঢ় মঙ্গলবার পুণ্যাত্মা গুপ্ত মহোদয় বৃদ্ধা মাতৃদেবীকে পাগলিনী করিয়া, পত্নীপুত্রবর্গের মমতাপাশ ছিন্ন করিয়া সাধনোচিত দিব্যধামে প্রস্থান করিয়াছেন।

১২৭৭ সালে কার্ত্তিক মাসে কলিকাতা চাষাধোপাপাড়ায় হরিদাসবাবু জন্মগ্রহণ করেন। প্রবেশিকা-পরীক্ষায় বিশ্ববিদ্যালয়ের তৃতীয় স্থান অধিকার করিয়া এফ্-এ পাঠ করিবার সময় তাঁহার মস্তিষ্কের পীড়া হওয়ায় চিকিৎসকের পরামর্শে তিনি বিদ্যালয়ের সহিত সম্পর্ক রহিত করিতে বাধ্য হন। তিনি লোয়ার গ্রেড্ এবং অপার গ্রেড্ ক্লার্কশিপ্ পরীক্ষায় সর্ব্বপ্রথম স্থানাধিকার করিয়া বহুদিবস উচ্চরাজপদে দক্ষতার সহিত কার্য্য করিয়াছিলেন। অসাধারণ মেধা, অধ্যবসায় এবং চরিত্রবলে তিনি ছোট বড় সকলকে মুগ্ধ করিয়াছিলেন। তাঁহার ন্যায় কর্ম্মকুশল কর্ম্মচারী বিরল। তাই গতবর্ষে ভারত গবর্ণমেণ্টের রাজস্বসচীব গুণগ্রাহী স্যর গাই ফ্লিট্উড্ উইলশন্ বজেট্-বক্তৃতা-প্রসঙ্গে তাঁহার যথেষ্ট প্রশংসাবাদ করেন এবং তাঁহাকে যুক্তপ্রদেশের সহকারী একাউণ্টেণ্ট জেনারেলের পদে নিয়োগ করেন। সুখ্যাতি, যশঃ ও কৃতিত্বের সহিত তিনি এই নব নিযুক্ত পদে কার্য্য করিয়া আসিতেছিলেন, এবং ডেরাডুনে রাজকার্য্য-পরিদর্শনে গমন করিয়া বিগত ১৬ই আষাঢ় তারিখে ৪৪ বৎসর বয়সে বিসূচিকা রোগে তিনি ইহলোক ত্যাগ করিলেন। তিনি কথায় কথায় প্রায় বলিতেন যেন আত্মীয়স্বজন হইতে দূরে তাঁহার মৃত্যু হয়। মৃত্যুর সময় তাঁহাকে কেহ বিব্রত না করেন, ইহা তাঁহার আন্তরিক অভিলাষ ছিল। তাঁহার জীবনের এই সাধ মিটিল।

হরিদাসবাবুর জীবন ধর্ম্মপ্রবণ ছিল। তিনি ভোগী হইয়াও ত্যাগী ছিলেন। তাঁহার নিরাকাঙ্ক্ষ, নিষ্কলঙ্ক নিরাবিল জীবনযাত্রা আদর্শস্বরূপ। পরের জন্য তাঁহার প্রাণ কাঁদিত—

পরের হিতসাধন করা তাঁহার জীবনের মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল—দয়া তাঁহার অঙ্গের ভূষণ ছিল। তাঁহার অমায়িকতায় মুগ্ধ ছিল না, এমন লোক ত দেখি না। তাঁহার সাহায্যপুষ্ট কত সংসারে ইতিমধ্যেই হাহাকারের রোল উঠিয়াছে—কে তাহার নিরাকরণ করিবে? মৃত্যুর কুড়ি দিবস পূর্ব্বে তিনি যে স্বপ্নকাহিনী বলিয়াছিলেন তাহা শুনিয়া স্তম্ভিত হইতে হয়—তাহা নাস্তিককেও আস্তিক করিয়া তুলে! গত বৎসর তাঁহার পরলোকগত দীক্ষাগুরু তাঁহাকে স্বপ্নে দেখা দিয়া বলেন—'হরিদাস সংসারের কাজ ত অনেক করলি এইবার আমার কাজে আয়।' তাঁহাকে নিরুত্তর দেখিয়া গুরুদেব বলিলেন—'আচ্ছা আর এক বৎসর তুই সংসারে থাক।' এই স্বপ্নলব্ধ গুরু-আজ্ঞা বেদবাণী জ্ঞান করিয়া এবং এক বৎসর পূর্ণ হয় হয় দেখিয়া গত মে মাসে হরিদাসবাবু স্বজনবর্গের সহিত সাক্ষাৎ-মানসে ছুটি লইয়া বাটী আইসেন এবং বাটীত্যাগের পূর্ব্বরাত্রিতে গোপনে তাঁহার পত্নীকে এই স্বপ্নবৃত্তান্ত বলেন। তাঁহার সহধর্ম্মিণীর সহস্র নিষেধ উপেক্ষা করিয়া তিনি কলিকাতা হইতে—তথা, ইহলোক হইতে জন্মশোধ বিদায় লইলেন।

এখনও যেন তাঁহার সেই সরল সহাস্য শুভ্র বদনমণ্ডল আমাদের নয়ন-সমক্ষে প্রতিভাত হইতেছে—এখনও যেন তাঁহার মধুর বিনয়ভাব আমাদের কর্ণকুহরে ঝঙ্কৃত হইতেছে—এখনও তাঁহার অমায়িক ভাব আমাদিগকে মুগ্ধ করিয়া তুলিতেছে।

আমরা যাহা হারাইলাম তাহা আর পাইব কি? আমাদের যে ক্ষতি হইল তাহা পূর্ণ হইবে কি? যিনি শত শত ব্যক্তির সহিত মিশিয়াছেন, কার্য্য করিয়াছেন—তাঁহাদের কাহারও মুখে ত ভুলক্রমে তাঁহার নিন্দা শুনি নাই! তাঁহার নিন্দুক মিলিল না—তাঁহার শত্রু ছিল না—তিনি অজাতশত্রু ছিলেন, ইহা কি আমাদের পক্ষে কম শ্লাঘার কথা? যে একটানা পবিত্র যশঃধারা দেবভাগ্যে দুর্লভ, হরিদাসবাবুর ভাগ্যে তাহা ঘটিয়াছে। তাই আজ মর্ম্মন্তুদ শোকোচ্ছ্বাস নয়ন ভেদিয়া বাহির হইতেছে—এক একখানি পঞ্জর-অস্থি খসিয়া পড়িতেছে!

আমরা কি বলিব, বলিবার ত কিছু নাই—সান্ত্বনা দিবার ত কথা নাই! বিধাতার ইচ্ছা পূর্ণ হইল, তিনিই হরিদাসবাবুর উন্মাদিনীপ্রায় মাতৃদেবী ও সহধর্ম্মিণীকে শোক সহ্য করিবার শক্তি দিবেন, শোকগ্রস্ত পরিবারবর্গের শান্তিবিধান করিবেন।

শ্রীকৃষ্ণদাস চন্দ্র।

মহাভারতের এক পৃষ্ঠা।

মহাকবি বাল্মীকি যেমন রামায়ণের মহাকাব্যত্বের কুঞ্চিকা মন্থরার হস্তে অর্পণ করিয়াছেন, কবিগুরু বেদব্যাসও তেমনই শকুনির কার্য্যকলাপের দ্বারা ঘটনা-পরম্পরার ঘাতপ্রতিঘাতে মহাভারতকে মহাকাব্যরূপে পরিণত করিয়াছেন। মন্থরা না থাকিলে রামায়ণ মহাকাব্য হইত না, শকুনির চরিত্র-সৃষ্টির অসদ্ভাব হইলে মহাভারতেরও মহাকাব্যত্বের ব্যাঘাত ঘটিত।

যুধিষ্ঠিরের অমিত রাজ্য-সমৃদ্ধি, অতুলনীয় সম্মান, অপ্রতিহত প্রভাব দেখিয়া রাজা দুর্য্যোধন যখন কোনও প্রতীকারেরই উদ্ভাবন করিতে না পারিয়া অন্তরের অরুন্তুদ যন্ত্রণায় দগ্ধ হইতেছিল, তখন কুটিল-প্রকৃতি শকুনি বলিল,—

"যাং ত্বমেতাং শ্রিয়ং দৃষ্ট্বা পাণ্ডুপুত্রে যুধিষ্ঠিরে।
তপ্যসে তাং হরিষ্যামি দ্যূতেন জয়তাং বর॥"

"দুর্য্যোধন, পাণ্ডুপুত্র যুধিষ্ঠিরের যে রাজ্যসম্পদ্দর্শনে তোমার অন্তঃকরণ সর্ব্বদা সন্তাপিত হইতেছে, আমি অক্ষক্রীড়ার চাতুর্য্যে তাহা হরণ করিয়া লইব—তুমি শান্ত হও।"

স্বার্থান্ধ দুরাত্মারা কুপরামর্শ পাইলে ভবিষ্যৎ শুভাশুভ বিবেচনা করে না, তৎক্ষণাৎ তদনুরূপ কার্য্য সম্পন্ন করিবার জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠে। দুর্য্যোধন শকুনির মুখে স্বার্থসংসাধক ঐরূপ মন্দ উপায়ের কথা শুনিয়া দ্যূতক্রীড়ার উদ্দেশে সভা নির্ম্মাণে কৃতসঙ্কল্প হইল। প্রকৃত মঙ্গলকামী পিতার হিতোপদেশ পর্য্যন্ত তাহার হৃদয়ে বিবেক আনয়ন করিল না। সভানির্ম্মাণের আজ্ঞা প্রদান করিবার জন্য দুর্য্যোধন পিতাকে নানাভাবে প্ররোচিত করিল। তথাপি ধৃতরাষ্ট্র বলিলেন,—

"বাক্যং ন মে রোচতে যৎ ত্বয়োক্তং যৎ তে প্রিয়ং তৎ ক্রিয়তাং নরেন্দ্র।
পশ্চাৎ তপ্যসে তদুপাক্রম্য বাক্যং ন হীদৃশং ভাবি বচো হি ধর্ম্ম্যম্॥"

"নরেন্দ্র, তোমার অভিরুচি হয়,—যদি ভাল বলিয়া মনে হয়, কর; কিন্তু তুমি যাহা ইচ্ছা করিয়াছ, তাহা আমার বিবেচনায় শ্রেয়স্কর নহে। শকুনির এই কুমন্ত্রণা স্মরণ করিয়া ভবিষ্যতে তুমি অনুতপ্ত হইবে; ঈদৃশ অসৎ পরামর্শ নিশ্চয়ই কল্যাণকর বা ধর্ম্মসঙ্গত নহে।"

স্বার্থসিদ্ধির প্রত্যাশায়—অসহনীয় ঈর্ষ্যায় দুর্য্যোধন অধীর হইয়া উঠিয়াছে, পিতার—হিতৈষী পিতার সদুপদেশ, তাহার সঙ্কল্পচ্যুতি ঘটাইতে পারিল না।

তখন অগত্যা ভাগ্যে যাহা আছে, তাহাই ঘটিবে, মনে করিয়া ধৃতরাষ্ট্র পুত্রের ঈপ্সিত দ্যূতক্রীড়োপযুক্ত সভা প্রস্তুত করিবার আদেশ প্রদান করিলেন।

অল্প সময়ের মধ্যেই বিচিত্র রত্নাদির সমাবেশে সভামণ্ডপ সুসজ্জিত হইলে যুধিষ্ঠিরকে আনিবার জন্য বিদুরকে ইন্দ্রপ্রস্থে প্রেরণ করা হইল।

অনর্থের হেতু দ্যূতক্রীড়ায় যুধিষ্ঠিরের ইচ্ছা ছিল না। কিন্তু কি করিবেন, তিনি আহূত হইয়াছেন। কোনও বিষয়ে আহূত হইলে সত্যনিষ্ঠ মানধন যুধিষ্ঠির তাহা হইতে প্রতিনিবৃত্ত হন না। তাই তিনি বিদুরকে বলিলেন,—

"আহূতোঽহং ন নিবর্ত্তে কদাচিৎ
তদাহিতং শাশ্বতং বৈ ব্রতং মে।"

"প্রতিপক্ষরূপে আহূত হইলে আমি কদাপি পশ্চাৎপদ হই না; ইহাই আমার জীবনের সনাতন ব্রত।"

যুধিষ্ঠির তখন অনুজবৃন্দ, দ্রৌপদী এবং অন্যান্য পরিজনবর্গের সহিত হাস্তিনপুরে ধৃতরাষ্ট্র-ভবনে উপনীত হইলেন। সকলকে যথাযোগ্য প্রণাম, সাদর সম্ভাষণ ও আশীর্ব্বাদাদির পর যুধিষ্ঠির ভ্রাতৃগণ সমভিব্যাহারে ক্রীড়াসভামণ্ডপে সমাগত হইয়া পবিত্র আসনে উপবেশন করিলেন। শকুনি যুধিষ্ঠিরকে সম্বোধন করিয়া বলিল, "রাজন্, এই সভায় বহু লোকের সমাগম হইয়াছে, সকলেই তোমার প্রতীক্ষা করিতেছিলেন। এখন তবে অক্ষনিক্ষেপ করিয়া দ্যূতক্রীড়া আরম্ভ করা যাউক।"

ধর্ম্মপ্রাণ যুধিষ্ঠির বলিলেন, "ছলনাপূর্ণ দ্যূতক্রীড়ায় পাপরাশিই সঞ্চিত হইয়া থাকে, ইহা ক্ষত্রোচিত বিক্রম-পরীক্ষার ব্যসন নহে। ধর্ম্মসঙ্গত রাজনীতির সঙ্গেও ইহার কোনও সংস্রব নাই; সুতরাং কেন তুমি দ্যূতের প্রশংসা করিতেছ? ধূর্ত্ততা অবলম্বন পূর্ব্বক জয়লাভ করিলে সে সম্মান—সে গৌরব কদাপি প্রশংসার্হ নহে। হে শকুনে, তুমি এইরূপ নৃশংসের ন্যায় অসৎপথ আশ্রয় করিয়া আমাদিগকে পরাজিত করিও না।"

যুধিষ্ঠির দ্যূতক্রীড়ার জন্য প্রস্তুত হইয়াই আসিয়াছিলেন। কিন্তু এই দ্যূতক্রীড়ার ভবিষ্যৎ বিষময় ফল স্মরণ করিয়া তিনি অত্যন্ত শঙ্কিত হইলেন। সেই জন্য যুধিষ্ঠির নানা যুক্তিপূর্ণ বাক্যের দ্বারা শকুনিকে এই অসাধু উপায় পরিত্যাগ করিতে বলিলেন। শকুনিও সহজে নিবৃত্ত হইবার লোক নহে; সে তখন নানা ভাবের বাক্‌চাতুর্য্যে যুধিষ্ঠিরকে প্ররোচিত করিবার চেষ্টা করিল। কিন্তু কোনও রূপেই মনীষী যুধিষ্ঠিরকে কুহকে ফেলিতে পারিল না। অবশেষে শকুনি যুধিষ্ঠিরকে উত্তেজিত করিবার জন্য গম্ভীরভাবে বলিল,—

"দেবনাদ্ বিনিবর্ত্তস্ব যদি তে বিদ্যতে ভয়ম্।"

"যদি তুমি আমার নিকট পরাজয়ের আশঙ্কায় পাশা খেলিতে ভীত হইয়া থাক, তবে খেলিও না।"

মানুষকে কোনও বিষয়ে উত্তেজিত করিতে হইলে ইহাই হইল এক সর্ব্বপ্রধান কৌশল। 'তুমি যদি না পার, তবে করিও না' এরূপ কথায় মানুষের আত্মসামর্থ্যের উপর আঘাত লাগে, কাজেই তাহার হৃদয়ে উত্তেজনা আসিয়া দেখা দেয়। তখন সে নিজের সহস্র অনিষ্টের আশঙ্কা থাকিলেও উত্তেজনার বশে সে কার্য্যে প্রবৃত্ত হয়। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণও অর্জ্জুনকে যুদ্ধক্ষেত্রে উত্তেজিত করিবার জন্য বলিয়াছিলেন,—

"ভয়াদ্ রণাদুপরতং মংস্যন্তে ত্বাং মহারথাঃ।"

যুধিষ্ঠির, শকুনির এই শেষ কথার আর প্রতিবাদ করিলেন না। তখন তিনি ভাগ্যের উপর নির্ভর করিয়া বলিলেন, "আচ্ছা তবে খেলা আরম্ভ করা হউক; কিন্তু সভাবৃন্দের মধ্যে কে আমার সহিত খেলিবেন?" যুধিষ্ঠিরের সম্মতি-বাক্যে দুর্য্যোধনের মুখ প্রফুল্ল হইল; তিনি তখন বলিলেন, "পণের জন্য ধনরত্ন আমি দিব, আমার হইয়া আমার মাতুল শকুনি খেলিবেন।" এরূপ ব্যবস্থা যুধিষ্ঠিরের চিত্তে সমীচীন বলিয়া প্রতিভাত হইল না,—তিনি বলিলেন, "এক-জনের প্রতিনিধিরূপে আর একজন খেলিবেন, ইহা আমার বিবেচনায় সঙ্গত বলিয়া মনে হয় না। তবে যাহাই হউক, খেলা আরম্ভ করা যাউক।"

ধূর্ত্তচূড়ামণি শকুনির কাপটিক পাশক্রীড়ার চাতুর্য্যে রাজা যুধিষ্ঠির সব হারি-লেন,—ধন, রত্ন, অশ্ব, হস্তী, সৈন্য, সামন্ত হইতে আরম্ভ করিয়া নিজেরা পাঁচ ভাই পর্য্যন্ত পরাজিত হইলেন,—আর তাঁহার পণ রাখিবার কিছুই রহিল না। পাপিষ্ঠ শকুনি ইহাতেও সন্তুষ্ট হইল না, সে বলিল, "রাজন্, অন্য পণ অবশিষ্ট থাকিতে আত্মপরাজয় পাপকর। সুতরাং—

"অস্তি তে বৈ প্রিয়া রাজন্ গ্লহ একোঽপরাজিতঃ।
পণস্ব কৃষ্ণাং পাঞ্চালীং তয়াত্মানং পুনর্জ্জয়।"

"আপনার পত্নী দ্রৌপদী এখনও পরাজিত হন নাই, তাঁহাকে পণ রাখিয়া নিজে মুক্ত হউন।"

ক্রীড়ার মাদকতায় যুধিষ্ঠির আত্মবিস্মৃত হইয়া শকুনির কথায় দ্রৌপদীকেই পণ রাখিলেন। তখন সভাস্থ বৃদ্ধগণ ধিক্কার দিয়া উঠিলেন, বিক্ষুব্ধ সভাস্থলে রাজবৃন্দের হৃদয়ে শোক-ব্যাকুলতার আবির্ভাব হইল। ভীষ্ম, দ্রোণ, কৃপাচার্য্য প্রভৃতির শরীর ঘর্ম্মসিক্ত হইয়া উঠিল। বিদুর মাথায় হাত দিয়া পন্নগবৎ নিশ্বাস ফেলিতে ফেলিতে হতচেতনের মত অধোমুখে চিন্তা করিতে লাগিলেন।

এ সময়কার বৃদ্ধ ধৃতরাষ্ট্রের পাপ-চরিত্রের চিত্র দেখিয়া চিত্তে ঘৃণার উদ্রেক হয়, বিস্ময়ে অভিভূত হইয়া থাকিতে হয়। মনে হয়, জ্যেষ্ঠতাত হইয়া বার্দ্ধক্যের চরম-সীমায় উপনীত ধৃতরাষ্ট্র কেমন করিয়া এই খেদাবহ ঘটনায় সন্তুষ্ট হইল। মোহাপহত-বুদ্ধি যুধিষ্ঠির দ্রৌপদীকে পণ রাখিলে ধৃতরাষ্ট্রের আর আনন্দের সীমা নাই, তিনি আনন্দে এতই অধীর হইলেন যে, আর আত্মগোপন করিতে পারিলেন না,—জিজ্ঞাসা করিয়া উঠিলেন, "এ বাজীতেও কি জিত হইল ?"

"ধৃতরাষ্ট্রস্তু সংহৃষ্টঃ পর্য্যাপৃচ্ছৎ পুনঃ পুনঃ।
কিং জিতং কিং জিতমিতি হ্যাকারং নাভ্যরক্ষত ॥"

ভাগ্যদেবতার বিড়ম্বনায় যুধিষ্ঠির এবারেও হারিলেন। দুর্য্যোধনের হৃদয় আনন্দে স্ফীত হইয়া উঠিল। পাপমতি দুর্য্যোধন দ্রৌপদীকে সভাস্থলে আনিবার জন্য বিদুরকে অনুরোধ করিলেন। বিদুর, দুর্য্যোধনকে এই কলুষিত অভিলাষ হইতে নিবৃত্ত করিবার চেষ্টা করিলেন,—অনেক বুঝাইলেন, কিন্তু কিছুতেই কোনও ফল হইল না। বিদুরের হিতোপদেশে দুর্য্যোধনের চৈতন্য হইল না, সে আপনার সর্ব্বনাশ আপনি ডাকিয়া আনিল,—দ্রৌপদীকে আনিবার জন্য সারথি প্রাতিকামীকে পাঠাইল।

প্রাতিকামী দ্রৌপদীর নিকট গিয়া বলিল,—"ভদ্রে যাজ্ঞসেনি, রাজা যুধিষ্ঠির দ্যূতক্রীড়ার উন্মাদনায় জ্ঞানশূন্য হইয়া তোমাকে 'পণ' রাখিয়াছিলেন ; দুর্য্যোধন তোমাকে জয় করিয়াছেন। সুতরাং তুমি ধৃতরাষ্ট্র ভবনে চল, আমি তোমাকে লইতে আসিয়াছি।" প্রাতিকামীর এই অসম্ভব কথা শুনিয়া দ্রৌপদী বিস্মিত হইল,—বলিল,

"কথং ত্বেবং বদসি প্রাতিকামিন্ কো বৈ দীব্যেদ্ ভার্য্যয়া রাজপুত্রঃ।
মূঢ়ো রাজা দ্যূতমদেন মত্তো হ্যভূন্নান্যৎ কৈতবমস্য কিঞ্চিৎ ॥"

"প্রাতিকামিন্ কেন তুমি এমন কথা বলিতেছ ? রাজকুলে জন্মগ্রহণ করিয়া পত্নীকে 'পণ' রাখিয়া কে খেলা করে ? রাজা ক্রীড়ার মাদকতায় অতিমাত্র উন্মত্ত হইয়াছেন সত্য, কিন্তু তাঁহার কি 'পণ' রাখিবার অন্য কোনও বস্তু ছিল না ?"

প্রাতিকামী।—"সমস্ত সম্পদ্, ভ্রাতৃচতুষ্টয় এবং নিজে পর্য্যন্ত যখন পরাজিত হইলেন, রাজা যুধিষ্ঠির তখন তোমাকে 'পণ' রাখিয়াছিলেন।"

দ্রৌপদী।—"আচ্ছা তুমি যাও, সেই ক্রীড়াসভায় গিয়া ধর্ম্মপুত্রকে জিজ্ঞাসা কর যে, রাজার আত্মপরাজয় আগে হইয়াছে, না আমি আগে পরাজিত হইয়াছি। তুমি এই কথা জানিয়া আসিয়া আমাকে লইয়া যাইও।"

প্রাতিকামী সভাক্ষেত্রে আসিয়া যুধিষ্ঠিরের নিকট দ্রৌপদীর প্রশ্ন বিবৃত করিল। কিন্তু যুধিষ্ঠির তাহার উত্তরে কোনও কথাই বলিলেন না, তিনি প্রাণহীন নিঃস্পন্দবৎ বসিয়া রহিলেন। দুর্য্যোধন প্রাতিকামীর দিকে চাহিয়া বলিলেন,—"যুধিষ্ঠিরের নিকট দ্রৌপদীর যাহা জিজ্ঞাসা হয়, তাহা তিনি এই-খানে আসিয়া বলুন, তাহা হইলে সভ্যবৃন্দও তাঁহাদের উত্তর প্রত্যুত্তর শুনিতে পাইবেন।

প্রাতিকামী আবার গেল, কিন্তু দ্রৌপদীর আর এক প্রশ্ন লইয়া আবার ফিরিয়া আসিল। দুর্য্যোধন এবারে দ্রৌপদীকে বলপূর্ব্বক আনয়নের জন্য দুঃশাসনকে পাঠাইল। দুঃশাসন দ্রুপদরাজ-নন্দিনীর নিকট গিয়া বলিল, "তুমি আমাদিগের নিকট দ্যুতক্রীড়ায় পরাজিত হইয়াছ, সুতরাং ধর্ম্মতঃ এখন তুমি আমাদিগের অধীন। তুমি লজ্জা ত্যাগ করিয়া সভাস্থলে চল, রাজা দুর্য্যোধনের আদেশে আমি তোমাকে লইতে আসিয়াছি।"

ভীতিবিহ্বলা দ্রৌপদী, আরক্ত-দৃষ্টি দুঃশাসনের এই কথা শুনিয়া দুই হাতে অশ্রুমলিন মুখমণ্ডল মুছিতে মুছিতে যেখানে বৃদ্ধ ধৃতরাষ্ট্রের স্ত্রীগণ বসিয়াছিলেন, সেই স্থানে পলায়ন করিবার জন্য দ্রুতপদে প্রস্থান করিলেন। দুরাত্মা দুঃশাসন ক্রোধে তর্জ্জন করিতে করিতে বেগে গিয়া পাঞ্চালীর তরঙ্গায়িত সুনীল কেশ-রাশি স্পর্শ করিল। যে কুন্তলশ্রেণী অল্প দিন পূর্ব্বে রাজসূয় যজ্ঞাবসরে অবভৃথ স্নানের মন্ত্রপূত সলিল-সেচনে অভিষিক্ত হইয়াছিল, আজ পাপাত্মা দুঃশাসন সেই পবিত্র কেশরাশি স্পর্শ করিয়া অনাথার ন্যায় দ্রৌপদীকে সভাসমীপে আনয়ন করিল। দ্রৌপদী কত অনুনয় করিলেন,—বলিলেন, "আমি একবস্ত্রা, রজস্বলা, এ অবস্থায় আমাকে সভায় লইয়া যাইও না।" দুঃশাসন বলিল,—

"রজস্বলা বা ভব যাজ্ঞসেনি একাম্বরা বাপ্যথ বা বিবস্ত্রা।
দ্যূতে জিতা চাসি কৃতাসি দাসী দাসীষু বাসশ্চ যথোপজোষম্॥"

"যাজ্ঞসেনি, তুমি রজস্বলাই হও, অথবা একবস্ত্রা বা বিবস্ত্রাই হও, তুমি যখন দ্যূতে পরাজিত হইয়া আমাদিগের দাসী হইয়াছ, তখন আমাদের ইচ্ছানুসারে দাসীদিগের মধ্যেই তোমার বাসস্থান নির্দ্দিষ্ট হইবে।"

পাপিষ্ঠ দুঃশাসন তখন লজ্জাবনতা স্খলিতবসনা দ্রৌপদীকে আকর্ষণ পূর্ব্বক সভাস্থলে লইয়া আসিল। দ্রৌপদী সভায় উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, ভীষ্ম, দ্রোণ, কৃপাচার্য্য, বিদুর প্রভৃতি কেহই এই অনার্য্যোচিত আচারের প্রতিবাদ করিলেন না;—সকলেই নীরব। সভাসদ্‌গণের এই অন্যায় ব্যবহার দেখিয়া

দ্রৌপদী অনেক আক্ষেপ করিলেন। কিন্তু দুঃশাসন তখন বৈরনির্য্যাতনের উত্তেজনায় হিতাহিত বিবেকশূন্য, দ্রৌপদীর কাতর ক্রন্দনে তাহার চৈতন্যোদয় হইল না,—সে তাহার বসনাঞ্চল আকর্ষণ করিতে লাগিল। দ্রৌপদী বলিলেন,—

"ইমে সভায়ামুপনীতশাস্ত্রাঃ ক্রিয়াবন্তঃ সর্ব্ব এবেন্দ্রকল্পাঃ।
গুরুস্থানা গুরবশ্চৈব সর্ব্বে তেষামগ্রে নোৎসহে স্থাতুমেবম্॥
নৃশংসকর্ম্মং ত্বমনার্য্যবৃত্ত মা মাং বিবস্ত্রাং কুরু মা বিকার্ষীঃ।
ন মর্ষয়েয়ুস্তব রাজপুত্রাঃ সেন্দ্রা হি দেবা যদি তে সহায়াঃ॥"

"এই সভায় ইন্দ্রতুল্য শাস্ত্রদর্শী ক্রিয়াবান্ রাজবৃন্দ বর্ত্তমান রহিয়াছেন, ইঁহারা সকলেই আমার গুরুজন; ইঁহাদিগের সম্মুখে এ অবস্থায় আমি থাকিতে পারিতেছি না। রে নৃশংস, আমার বসনপ্রান্ত আকর্ষণ করিয়া আমাকে বিবস্ত্রা করিবার চেষ্টা করিস্ না; যদি ইন্দ্রাদি দেবতাগণও তোর সহায় হন, তথাপি পাণ্ডবেরা কদাপি তোর এই ভীষণ অপরাধ ক্ষমা করিবেন না।"

সভায় কেহই যখন এই অকার্য্যের প্রতিবাদ করিতে সাহসী হইলেন না, দ্রৌপদী তখন সভাস্থ রাজবৃন্দকে লক্ষ্য করিয়া অনেক তিরস্কার করিলেন, কিন্তু কিছুতেই কোনও ফল হইল না,—সভাস্থ রাজন্যগণ নীরব ও নিঃস্পন্দভাবেই রহিলেন। এই সময়ে পাণ্ডবদিগের অন্তরে দারুণ ক্রোধবহ্নি জ্বলিয়া উঠিল; কিন্তু আগ্নেয় গহ্বরের বিষম উত্তাপের মত সে সন্তাপে তাঁহারা নিজেই পুড়িয়া মরিতে লাগিলেন,—পতিপ্রাণা ধর্ম্মপত্নীর সভাস্থলে এই দুঃসহ অবমাননার কোনই প্রতিশোধ লইতে পারিলেন না। দ্রৌপদী একবার বক্রগ্রীবায় স্বামিগণের প্রতি করুণ দৃষ্টিপাত করিলেন। ধন, রত্ন, সাম্রাজ্য—সমস্ত সম্পত্তি হইতে বঞ্চিত হইয়াও পাণ্ডবদিগের এত কষ্ট হইয়াছিল না, কিন্তু দ্রৌপদীর কাতর সাশ্রু নয়নের ভাষাহীন তিরস্কারে তাঁহাদের অন্তস্তল ছিঁড়িয়া গেল। এ অবস্থায় নৃশংস দুঃশাসন, আবার নানা কটূক্তি বর্ষণ করিয়া একবস্ত্রা, রজস্বলা দ্রৌপদীকে আকর্ষণ করিল।

ভীম এতক্ষণ নীরবে ছিলেন, কিন্তু আর তাঁহার সহ্য হইল না। তিনি যুধিষ্ঠিরকে সম্বোধন করিয়া বলিতে লাগিলেন,—

"ভবন্তি গেহে বন্ধকাঃ কিতবানাং যুধিষ্ঠির।
ন তাভিরুত দীব্যন্তি দয়া চৈবাস্তি তাস্বপি॥
কাশ্যো যদ্ধনমাহার্ষীদ্ দ্রব্যং যচ্চান্যদুত্তমম্।
তথান্যে পৃথিবীপালা যানি রত্নান্যুপাহরন্॥

বাহনানি ধনঞ্চৈব কবচান্যায়ুধানি চ।
রাজ্যমাত্মা বয়ঞ্চৈব কৈতবেন হৃতং পরৈঃ॥
ন চ মে তত্র কোপোহভূৎ সর্ব্বস্যেশোহি নো ভবান্।
ইমং ত্বতিক্রমং মন্যে দ্রৌপদী যত্র পণ্যতে॥
এষা হ্যনর্হতী বালা পাণ্ডবান্ প্রাপ্য কৌরবৈঃ।
ত্বৎকৃতে ক্লিশ্যতে ক্ষুদ্রৈর্নৃশংসৈরকৃতাত্মভিঃ॥
অস্যাঃ কৃতে মন্যুরয়ং ত্বয়ি রাজন্ নিপাত্যতে।
বাহূ তে সম্প্রধক্ষ্যামি সহদেবাগ্নিমানয়॥"

"দ্যূতক্রীড়াব্যবসায়ীদিগের গৃহে অনেক বেশ্যা থাকে, কিন্তু তাহারা সেই বেশ্যাদিগকেও পণ রাখিয়া খেলা করে না,—গণিকাদিগের প্রতিও তাহাদিগের একটু দয়া মায়া থাকে। নানাদেশীয় ভূপালবৃন্দ যে সকল ধন, রত্ন, বাহন, আয়ুধ প্রভৃতি উপহার দিয়াছিলেন, তাহা সমস্ত এবং রাজ্য পর্য্যন্ত আপনি হারিয়াছেন; এমন কি, শত্রুরা এই কাপটিক পাশক্রীড়ার চাতুর্য্যে আমাদের চারি ভাইকে এবং আপনাকে পর্য্যন্ত জয় করিয়া লইয়াছে। ইহাতেও আমার হৃদয়ে বিন্দুমাত্র কোপের সঞ্চার হয় নাই, কেন না, আপনি আমাদের সকল বিষয়েরই অধীশ্বর। কিন্তু আপনি যে দ্রৌপদীকে পণ রাখিয়াছেন, ইহাতে আপনার ক্ষমতার সীমা লঙ্ঘিত হইয়াছে। এই অবলা কখনই এরূপ শোচনীয় দুরবস্থার যোগ্য নহেন,—পাণ্ডবদিগকে পতিত্বে লাভ করিয়া আজ কেবল আপনার জন্যই এই রাজদুহিতা, নীচাশয় নৃশংস কৌরবগণ কর্ত্তৃক এইরূপ অচিন্তনীয় কষ্ট উপভোগ করিতেছেন। রাজন্, কেবল এই দ্রৌপদীর দুঃখ নিরীক্ষণ করিয়াই আজ আপনার উপর আমার অত্যন্ত ক্রোধ হইয়াছে। যে হাত দিয়া খেলিয়াছেন, আজ আপনার সেই হাত আমি দগ্ধ করিয়া ফেলিব; সহদেব, তুমি অগ্নি আন।"

মহাভারতে ধর্ম্মপুত্র যুধিষ্ঠিরের পর্য্যন্ত অন্যায় আচরণের কথা কীর্ত্তিত হইয়াছে, তিনি রাজ্যলোভে বিশ্বাসঘাতকতা পূর্ব্বক ব্রাহ্মণ—গুরু দ্রোণাচার্য্যের বধের হেতু হইয়াছিলেন। কিন্তু ভীম কখনও ন্যায়সঙ্গত পথ হইতে একপদও বিচলিত হন নাই। তিনি অন্যায় সহিতে পারেন না, অন্যায়াচরণ দেখিলে তিনি গুরুজনের শাসনেও পরাঙ্মুখ নহেন। রাজা দশরথ, রামচন্দ্রকে বন গমনের আদেশ করিলে লক্ষ্মণ বলিয়াছিলেন,—

"গুরোরপ্যবলিপ্তস্য কার্য্যাকার্য্যমজানতঃ।
উৎপথপ্রতিপন্নস্য যুক্তং ভবতি শাসনম্।"

ভীমও এই চরিত্রের লোক। তিনি জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার কর্ত্তব্যের ত্রুটি দেখিয়া ক্রোধে জ্বলিয়া উঠিলেন, যুধিষ্ঠিরের হস্ত দগ্ধ করিতে উদ্যত হইলেন। পরে ধীর স্থির অর্জ্জুনের সান্ত্বনা-বাক্যে তিনি তাৎকালিক শান্তি লাভ করিলেন সত্য,

কিন্তু দুর্য্যোধনাদির প্রতি দারুণ প্রতিহিংসা তাঁহার অন্তরের স্তরে স্তরে অনুস্যূত হইয়া রহিল।

এই ঘটনার সূচনা হইতেই মহাভারত, মহাকাব্যে পরিণত হইল। দ্রৌপদীর প্রতি এই অমানুষিক অত্যাচারই মহাভারতের মহাযুদ্ধের হেতু। শকুনির কুমন্ত্রণায় দুর্য্যোধন আজ যে গর্হিত কার্য্য করিলেন, তাহার প্রতিফল তিনি মরণ-কাল পর্য্যন্ত মর্ম্মে মর্ম্মে অনুভব করিয়া গিয়াছেন।

শ্রীহরিহর ভট্টাচার্য্য।

বিবেক-বাণী।

দৈব ও পুরুষকার।—জগৎ যা' ইচ্ছে বলুক, আমার কর্ত্তব্য কার্য্য করে চলে যাব, এই জানবি বীরের কায। নতুবা এ কি বলছে, ও কি লিখছে, এসব নিয়ে দিন রাত থাকলে, জগতে কোন মহৎকার্য্য করা যায় না। লোকে তোর স্তুতিই করুক বা নিন্দাই করুক, তোর প্রতি লক্ষ্মীর কৃপা হোক্ বা না হোক্, আজ বা যুগান্তে তোর দেহপাত হোক্, যেন ন্যায়পথ থেকে ভ্রষ্ট হোস্‌নি। কত ঝড় তুফান এড়িয়ে গেলে তবে শান্তির রাজ্যে পৌছান যায়। যে যত বড় হয়েছে, তার উপর তত কঠিন পরীক্ষা হয়েছে। পরীক্ষার কষ্টি পাথরে তার জীবন ঘসে দেখে তবে তাকে জগৎ বড় বলে স্বীকার করেছে। যারা ভীরু, কাপুরুষ, তারাই সমুদ্রের তরঙ্গ দেখে তীরে নৌকা ডুবায়। মহাবীর কি কিছুতে দৃকপাত করে রে বাপ্? যা'হবার হোক্‌গে, আমার ইষ্টলাভ আগে করবোই করবো, এই হচ্ছে পুরুষকার। এ পুরুষকার না থাকলে শত দৈবও তোর জড়ত্ব দূর করতে পারে না।

দৈবে নির্ভরতা।—শাস্ত্রে নির্ভরতাকে পঞ্চম পুরুষার্থ ব'লে নির্দ্দেশ করেছে। কিন্তু আমাদের দেশে লোকে যে ভাবে দৈব দৈব করে, এটা মৃত্যুর চিহ্ন, মহাকাপুরুষতার পরিণাম; কিম্ভূত-কিমাকার একটা ঈশ্বর কল্পনা করে তার ঘাড়ে নিজের দোষ চাপানর চেষ্টা মাত্র। ভালোর বেলা "আমি" আর মন্দের সময় "তুমি"—বলিহারি তোদের দৈব নির্ভরতা! পূর্ণ প্রেম বা জ্ঞান না হ'লে নির্ভরের অবস্থা হতেই পারে না। যার ঠিক ঠিক নির্ভর হয়েছে, তার ভাল মন্দ ভেদবুদ্ধি থাকে না।

মানসিক শক্তি।—মানুষ যদি তৈয়ারি হয়, ত লাখ্ বক্তৃতার ফল হবে। মন মুখ এক হয়ে idea (ভাব) গুলি জীবনে ফলাতে হবে। এর নামই ঠাকুর বল্‌তেন, ভাবের ঘরে চুরী না থাকা। সব দিকে practical হতে (কর্ম্মের ভিতর দিয়ে মতের বা ভাবের বিকাশ দেখাতে) হবে। Theoryতে Theoryতে (মতে, মতে) দেশটা উচ্ছন্ন হয়ে গেছে। "নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ" শরীরে, মনে বল না থাক্‌লে এই আত্মাকে লাভ করা যায় না। পুষ্টিকর উত্তম আহারে আগে শরীর গড়তে হবে; তবে ত মনে বল হবে। মনটা শরীরেরই সূক্ষ্মাংশ। বুঝলি? দেশ কাল পাত্র ভেদে আহারের ব্যবস্থা ভিন্ন। কিন্তু সর্ব্বকালে সর্ব্বদেশেই পুষ্টিকর খাদ্যের প্রয়োজন। ডাল ভাত চচ্চড়িতে কি আর এখন জীবন-সংগ্রাম চলতে পারে রে বাপ?

হীন হীন বল্‌তে বল্‌তে মানুষ হীন হয়ে যায়। যার মুক্ত অভিমান সর্ব্বদা জাগরূক সেই মুক্ত হয়ে যায়, যে ভাবে আমি বদ্ধ, জন্মে জন্মে জানবি তার বন্ধন দশা। এই ভাব জানবি, ঐহিক পারমার্থিক উভয় দিকে। ইহ-জীবনেও যা'রা সর্ব্বদা হতাশ চিত্ত, তাদের দ্বারা কোন কাজ হতে পারে না; তারা জন্মে জন্মে হা হুতাশে দেহ বদলায়। "বীর ভোগ্যা বসুন্ধরা" বীরই বসুন্ধরা ভোগ করে। বীর হ—সর্ব্বদা বল্ "অভিঃ" "অভিঃ"। সকলকে শোনা "মাভৈ" "মাভৈঃ"—ভয়ই মৃত্যু, ভয়ই পাপ, ভয়ই নরক, ভয়ই অধর্ম্ম, ভয়ই ব্যভিচার। এই দেহ ধারণ করে কত সুখে দুঃখে, কত সম্পদ বিপদের তরঙ্গে আলোড়িত হবি। কিন্তু জানবি, ওসব মুহূর্ত্তকাল স্থায়ী। আমি অজর অমর চিন্ময় আত্মা—এই ভাবে জীবন অতিবাহিত কত্তে হবে। আমার জন্ম নাই, আমার মৃত্যু নাই, আমি নির্লেপ আত্মা, এই ধারণায় তন্ময় হয়ে যা।

জীবন সংগ্রাম।—ভেতরে অদম্য শক্তি রয়েছে। 'শুধু আমি কিছু নয়' ভেবে ভেবে বীর্য্যহীন হয়ে পড়েছিস্। তুই কেন?—সব জাতটা তাই হয়ে পড়েছে! একবার বেড়িয়ে আয়, দেখবি ভারতেতর দেশে লোকের জীবনপ্রবাহ কেমন তর তর করে প্রবল বেগে বয়ে যাচ্ছে। আর তোরা কি কচ্ছিস্? এত বিদ্যা শিখে পরের দোরে ভিখারীর মত "চাকরী দাও, চাকরী দাও" বলে চেঁচাচ্ছিস্। ঝাঁটা জুতো খেয়ে খেয়ে—দাসত্ব করে করে—তোরা কি আর মানুষ আছিস্ রে বাপ! তোদের মূল্য এক কাণা কড়িও নয়। এমন সজলা সফলা দেশে জন্মে যেখানে প্রকৃতি অন্য সকল দেশের চেয়ে কোটি গুণে ধন ধান্য প্রসব করেছেন সেখানে দেহ ধারণ করে তোদের পেটে অন্ন নেই—

পিঠে কাপড় নাই! যে দেশের ধন ধান্য পৃথিবীর অপর সকল দেশে civilisation (সভ্যতা) বিস্তার কর্‌ছে সেই অন্নপূর্ণার দেশে তোদের এমন দুর্দ্দশা! ঘৃণিত কুকুর অপেক্ষা যে তোদের দুর্দ্দশা হয়েছে। তোরা আবার তোদের বেদ বেদান্তের বড়াই করিস্। যে জাত সামান্য অন্ন-বস্ত্রের সংস্থান কর্ত্তে পারে না, পরের মুখাপেক্ষী হয়ে জীবন ধারণ করে সে জাতের আবার বড়াই!

সাহায্য।—তোদের শ্রদ্ধা নাই, আত্মপ্রত্যয়ও নাই। কি হবে তোদের? না হবে সংসার, না হবে ধর্ম্ম। হয় উদ্যোগ উদ্যম করে সংসারে successful (গণ্য, মান্য, শ্রীমান) হ—নয় তো সব ছেড়ে ছুড়ে দিয়ে আমাদের পথে আয়। দেশ বিদেশের লোককে ধর্ম্ম উপদেশ দিয়ে তাদের উপকার কর। তবে তো আমাদের মত ভিক্ষা মিলবে। আদান প্রদান না থাকলে কেউ কারোর দিকে চায় না। দেখছিস্ তো আমরা দুটো ধর্ম্মকথা শুনাই, তাই গৃহস্থেরা আমাদের দু'মুটো অন্ন দিচ্ছে। তোরা কিছুই করবিনি, তোদের লোকে অন্ন দিবে কেন?

শিক্ষা।—কয়েকটা পাশ দিলে বা ভাল বক্তৃতা করতে পারলেই কি শিক্ষিত হলো? যে বিদ্যার উন্মেষে ইতর-সাধারণকে জীবন-সংগ্রামে সমর্থ করতে পারা যায়, যাতে মানুষের চরিত্রবল, পরার্থপরতা, সৎসাহসিকতা এনে দেয়, সেই ত শিক্ষা। যে শিক্ষায় জীবনে নিজের পায়ের উপরে দাঁড়াতে পারা যায়, সেই ত শিক্ষা। আজ কালকার এই সব স্কুল কলেজে পড়ে তোরা কেমন এক প্রকারের একটা dyspeptic (অজীর্ণ-রোগাক্রান্ত) জাত তৈরি হচ্ছিস্। কেবল Machineএর (কলের) মত খাটছিস; আর "জায়স্ব" "ম্রিয়স্ব" এই বাক্যের সাক্ষী হয়ে দাঁড়িয়েছিস্। এই যে চাষা ভূষা মুদি মুদ্দফরাস—আমি জানি এদের কর্ম্মতৎপরতা, আত্মনিষ্ঠা তোদের চেয়ে ঢের বেশী। এরা নীরবে চিরকাল কাজ করে যাচ্ছে—দেশের ধন ধান্য উৎপন্ন করছে—মুখে কথাটী নেই। তোদের মত তাদের অভাবের জন্য তাড়না নাই। বর্ত্তমান শিক্ষায় তোদের বাহ্যিক হাল চাল বদলে দিচ্ছে; অথচ নূতন নূতন উদ্ভাবনী শক্তির অভাবে তোদের অর্থাগমের উপায় হচ্ছে না। তোদের মত তা'রা কতকগুলা বই-ই না হয় না পড়েছে। তোদের মত সার্ট কোট্ পরে সভ্য না হয় না-ই হ'তে শিখেছে, তাতে আর কি এলো গেলো। কিন্তু এরাই হচ্ছে জাতের মেরুদণ্ড। সব দেশে। এদের তোরা ছোট লোক ভাবছিস্? আর নিজেদের শিক্ষিত বলে বড়াই কচ্ছিস! এই massএর (সাধারণ শ্রেণীর) ভেতর বিদ্যার

উন্মেষ যাতে হয়, তাইতে লেগে যা। এঁদের বুঝিয়ে বলগে "তোমরা আমাদের ভাই—শরীরের একাঙ্গ—আমরা তোমাদের ভালবাসি—ঘৃণা করি না। তোদের এই শিক্ষা পেলে এরা শত গুণ উৎসাহে কার্য্যতৎপর হবে। ইতিহাস, ভূগোল, বিজ্ঞান, সাহিত্য—সঙ্গে সঙ্গে ধর্ম্মের গূঢ়তত্ত্বগুলি এদের শেখা।

আমাদের জীবনের আদর্শ।—মহাবীরের চরিত্রকেই তোদের এখন আদর্শ কত্তে হবে। দেখনা রামের আজ্ঞায় সাগর ডিঙ্গিয়ে চলে গেল!—জীবনে মরণে দৃকপাত নেই—মহা জিতেন্দ্রিয়, বুদ্ধিমান! দাস্যভাবের ঐ মহা আদর্শে তোদের জীবন কত্তে হবে। ঐরূপ হলেই অন্যান্য ভাবের স্ফুরণ, কালে আপনা আপনি হয়ে যাবে। দ্বিধাশূন্য হ'য়ে গুরুর আজ্ঞা পালন, আর ব্রহ্মচর্য্য রক্ষা—এই হচ্ছে secret of success (কৃতী হবার একমাত্র গূঢ়োপায়) নান্যঃ পন্থা বিদ্যতে-ঽয়নায় (অবলম্বন করার আর দ্বিতীয় পথ নাই)। হনুমানের একদিকে যেমন সেবাভাব—অন্যদিকে তেমনি ত্রিলোক-সংত্রাসী সিংহ-বিক্রম। রামের হিতার্থে জীবনপাতে কিছুমাত্র দ্বিধা রাখে না। রামসেবা ভিন্ন অন্য সকল বিষয়ে উপেক্ষা—ব্রহ্মত্ব শিবত্ব লাভে পর্য্যন্ত উপেক্ষা! শুধু রঘুনাথের আদেশ পালনই জীবনের একমাত্র ব্রত! ঐরূপ একাগ্র নিষ্ঠা হওয়া চাই। খোল করতাল বাজিয়ে লম্ফ ঝম্ফ করে দেশটা উচ্ছন্ন হ'য়ে গেল। একে ত এই dyspeptic রোগীর দল—তাতে লাফালে ঝাঁপালে সইবে কেন? কামগন্ধহীন উচ্চ সাধনার অনুকরণ কত্তে গিয়ে দেশটা ঘোর তমসাচ্ছন্ন হয়ে পড়েছে। দেশে দেশে, গাঁয়ে গাঁয়ে যেখানে যাবি, দেখবি, খোল করতালই বাজছে! বলি ঢাক ঢোল কি দেশে তৈয়িরি হয় না—তূরী ভেরী কি ভারতে মিলে না? ঐ সব গুরু গম্ভীর আওয়াজ ছেলেদের শোনা না! ছেলেবেলা থেকে মেয়ে মানষি বাজনা শুনে শুনে, কীর্ত্তন শুনে শুনে, যে মেয়েদের দেশ হ'য়ে গেল। হায় হায়! এর চেয়ে আর কি দেশ অধঃপাতে যেতে পারে? ডমরু শিঙ্গা বাজাতে হবে, ঢাকে ব্রহ্ম রুদ্র তালের দুন্দুভি তুলতে হবে, "মহাবীর মহাবীর" ধ্বনিতে এবং হর হর ব্যোম ব্যোম শব্দে দিগ্দেশ কম্পিত কর্ত্তে হবে। যে সব গীতবাদ্যে মানুষের হৃদয়ের কোমল ভাব সমূহ উদ্দীপিত করে, সে সকল কিছুদিনের জন্য এখন বন্ধ রাখতে হবে।—বীণা, খোল, বেয়ালা, বাঁশী ভেঙ্গে ফেলতে হবে।—খেয়াল টপ্পা বন্ধ করে, ধ্রুপদ গান শুনতে লোককে অভ্যাস করাতে হবে। বৈদিক ছন্দের মেঘমন্দ্রে দেশটার প্রাণসংস্কার কত্তে হবে। সকল বিষয়ের বীরত্বের কঠোর মহাপ্রাণতা আনতে হবে। এইরূপ আদর্শের অনুসরণ করলে তবে এখন জীবের কল্যাণ—জগতের কল্যাণ।

শ্রীঅমরেন্দ্রনাথ রায়।

আর্য্যজাতির সামাজিক জীবন।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর।)

অট্টালিকাদি।—প্রাচীনকালে আর্য্যদিগের অট্টালিকাদি অদগ্ধ ইষ্টক দ্বারা বিনির্ম্মিত হইত। ইহা হইতে কেহ মনে করিবেন না যে আর্য্যেরা স্থাপত্য ও ভাস্কর্য্য বিদ্যায় অপারদর্শী ছিলেন। ঋগ্বেদে স্থাপত্য ও ভাস্কর্য্য বিদ্যার যেরূপ উল্লেখ আছে তাহা পাঠে জানা যায় যে আর্য্যেরা আধুনিক সভ্য সমাজ অপেক্ষা স্থাপত্য ভাস্কর্য্য বিদ্যায় কোন অংশে হীন ছিলেন না। ঋগ্বেদে দেবমন্দির, বধ্যমঞ্চ, প্রাকার, ত্রিতল প্রাসাদ প্রভৃতির বর্ণনা আছে। ঐতিহাসিক ফার্গুসন্ তাঁহার Indian Architecture নামক গ্রন্থে লিখিয়াছেন,—"সম্রাট্ অশোকের সিংহাসনারোহণের বহুপূর্ব্বে ভারতীয় অধিবাসিগণের প্রাসাদ, মিলন-মন্দির এবং দেবমন্দিরও ছিল।" কাণিংহাম বলেন,—"প্রস্তর নির্ম্মিত অট্টালিকার প্রচলন ছিল।" জরাসিন্ধুর সিংহাসন প্রস্তর নির্ম্মিত ছিল।

আস্‌বাব পত্র।—বিষ্ণুপুরাণে কাষ্ঠাসনাদির উল্লেখ আছে। ঋগ্বেদে 'বেঞ্চে'র বর্ণনা দেখা যায়। কোন্ কাষ্ঠ দ্বারা কাষ্ঠাসন বা বেঞ্চ প্রস্তুত হইতে পারে, বৃহৎ সংহিতায় তাহার উল্লেখ আছে। টুল, টেবেল প্রভৃতিরও বর্ণনা মনুসংহিতায় দৃষ্ট হয়। মেগাস্থিনিস লিখিয়াছেন যে, প্রত্যেক ভারতবাসীর সম্মুখে তাহার ভোজনের সময় টেবেল স্থাপিত হইত। এই টেবেলের উপরে সুবর্ণপাত্রে আহার্য্য রক্ষিত হইত। বলা বাহুল্য, কদলীপত্রে বা থালায় আহার্য্যাদি গ্রহণের প্রথা অল্পদিন হইল ভারতে প্রচলিত হইয়াছে।

খাদ্য ও পানীয়।—সুপেয় জল অত্যন্ত আদরণীয় ছিল। সিদ্ধ দুগ্ধ, সিদ্ধ যব, শাক সব্‌জী প্রভৃতি সচরাচর খাদ্য ছিল। তাঁহারা গো মহিষাদির মাংস ভক্ষণ করিতেন। এবং সেইজন্য তাহাদিগকে অতি যত্নে লালনপালনও করিতেন। অতিথি বা বন্ধুকে "গোঘ্ন" এই বাক্যের দ্বারা সম্ভাষিত করা হইত।*

অবশ্য ধার্ম্মিক লোকেরা পশুবধ করিতেন না। কাজেই মনু পশুবধ নিষেধসূচক অনুশাসন প্রচার করেন।

---

* আর্য্যাবর্ত্ত পত্রে মল্লিখিত "প্রাচীন ভারতে মাংস ভক্ষণ" শীর্ষক প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য—(লেখক)

সুরাপানের ভূরি ভূরি উল্লেখ ঋগ্বেদে দেখিতে পাওয়া যায়। মনুসংহিতায়ও বিভিন্ন প্রকারের মদ্যের বর্ণনা আছে। মনুসংহিতা পাঠে জানা যায় যে, পুরাকালে ভারতবর্ষেই নানা প্রকারের মদ্য প্রস্তুত হইত, অবশেষে তাহাতেও আর্য্যদিগের তৃপ্তিসাধন না হওয়ায় ইজিপ্ট হইতে ভারতে মদ্য আমদানী হয়। বৈদিক যুগে প্রত্যেক আর্য্যই মদ্যপান করিতেন।

যান।—আধুনিক কালের ন্যায় চতুর্চক্র, ত্রিচক্র, দ্বিচক্র, একচক্র বিশিষ্ট গাড়ী ছিল। নানাবিধ রথ, পাল্কী, শিবিকা, ডুলী প্রভৃতির উল্লেখও পুরাণাদিতে দৃষ্ট হয়। এতদ্ব্যতীত জিনিষ-পত্র ও পশ্বাদি বহনোপযোগী যানেরও অপ্রতুল ছিল না।

পশ্বাদির প্রতি দয়া।—গো মেষাদি পশুর প্রতি অনুকম্পা-প্রদর্শন আর্য্যজাতির চরিত্রের একটি বিশেষ গুণ ছিল। সামবেদের একটি সঙ্গীতের মর্ম্ম এই যে, নিজের আনন্দের জন্য পশুবধ করিও না, পশুদিগকে যাতনা দিও না, তাহাদিগকে অত্যধিক পরিশ্রান্ত করাইও না, অথবা বৃদ্ধ বয়সে তাহাদিগকে পরিত্যাগ করিও না।

মনু পশুবধ নিষেধ করিয়াছিলেন। মনুর অনুশাসনের মর্ম্ম এই যে, গরুকে জল পানের সময় বাধা দিবে না। যদি কোন শকটচালক অবহেলা প্রযুক্ত গরু মারিয়া ফেলিত তবে তাহার শাস্তি হইত। প্রত্যেক গৃহস্বামী অত্যন্ত যত্ন সহকারে গোপালন করিতেন। শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং বাল্যকালে গো-চারণ করিতেন। উত্তর ভারতে ঘোষ যাত্রা এবং দক্ষিণ ভারতে পিঙ্গুল উৎসব, প্রাচীন ভারতে গো-জাতির প্রতি অপরিসীম যত্নের জাজ্বল্যমান উদাহরণ। সম্রাট্ অশোক তাঁহার একটি খোদিত লিপিতে পশ্বাদির প্রতি দয়াশীল হইতে বলিয়াছেন। বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বিগণ একেবারেই পশুবধ করিতেন না।

স্ত্রীলোক।—হিন্দু সাহিত্যাদি পাঠে জানা যায় যে, হিন্দু মহিলারা প্রাচীন ভারতে যেমনই সুশিক্ষিতা তেমনি সম্মানিত ছিলেন। তাঁহারা বেদের সূক্তাদি রচনা করিতেন এবং প্রকাশ্য স্থানে প্রকাশ্যভাবে মুনি ঋষিবৃন্দের সহিত আধ্যাত্মিক তর্ক বিতর্ক করিতেন। এই শ্রেণীস্থ স্ত্রীলোকেরা কখনও বিবাহ করিতেন না। কিরূপে স্বাস্থ্যের উন্নতি হয়, কি ভাবে অতিথি সৎকার করিতে হয়, ইত্যাদি বিষয় ইঁহারা শৈশবাবধি শিক্ষা করিতেন। অন্য এক শ্রেণীর স্ত্রীলোক ছিল তাহারা অন্য ধরণে শিক্ষালাভ করিত। উইল্-

সনের দশকুমার চরিতের একস্থলে আছে, এক কন্তার মাতা বলিতেছেন,—"আমরা তাহাদিগকে (কন্যাদিগকে) বৈদেশিক সাহিত্য শিক্ষা দি, আমরা তাহাদিগকে লিখিতে ও পড়িতে শিখাই, তাহারা যাহাতে চিত্রাঙ্কন, নর্ত্তন, সঙ্গীত প্রভৃতি বিদ্যায় পূর্ণতা লাভ করে আমরা তাহারও চেষ্টা করিয়া থাকি। যখন এই সমস্ত সম্পন্ন হয় তখন যাহাকে তাহারা ভালবাসে তাহার সহিত আমরা কন্যাকে পরিণয়-সূত্রে আবদ্ধ করি।"

ক্ষত্রিয়-কন্যাগণ গীতবাদ্য ও নর্ত্তনাদি শিক্ষা করিতেন। অর্জ্জুন অজ্ঞাত জীবন যাপনকালে বিরাটরাজের অন্তঃপুরে সঙ্গীত ও নৃত্যবিদ্যা শিক্ষা দিতেন। ডাঃ উইল্‌সন্ বলেন, হিন্দু রমণীবৃন্দ স্বাধীনভাবে সাধারণ সভা-সমিতিতে যোগদান করিতেন। ছান্দগ্য উপনিষদে যে কয়েকটি উদাহরণ দেখিতে পাই তাহা পাঠে বুঝা যায় যে বৈদিক যুগে আধুনিক পাশ্চাত্য-সমাজ-সুলভ "কোর্টসিপ্" প্রথা ছিল। অযোধ্যায় যুবতী স্ত্রীলোক ও যুবা পুরুষগণ অপরাহ্নে উদ্যানে ভ্রমণ করিত। পুরাণে কয়েকজন প্রসিদ্ধা রমণীর বৃত্তান্ত পাঠে জানা যায় যে, তাঁহারা স্বামী-নির্ব্বাচনে স্বাধীনা ছিলেন। দেবযানী যযাতিকে বিবাহ করিতে অভিলাষিণী হইয়াছিলেন, সুভদ্রা অর্জ্জুনকে বিবাহ করিতে অগ্রসারিণী হইয়াছিলেন, রুক্মিণী, তাহাকে বলপূর্ব্বক লইয়া যাইবার জন্য শ্রীকৃষ্ণকে পত্র লিখিয়াছিলেন।

ইহার পরবর্ত্তী গান্ধর্ব্ব ও স্বয়ম্বর প্রথাদির প্রচলন স্বামী-নির্ব্বাচন বিষয়ে অধিকতর স্বাধীনতা প্রদান করে।

একমাত্র বিবাহই সর্ব্বাপেক্ষা প্রশংসনীয় ছিল। স্বামী নির্দ্দিষ্ট সময় ব্যতীত স্ত্রীর সহিত সহবাস করিতে পারিতেন না; ইহা হইতেই বুঝা যাইতেছে, পুরাকালে পবিত্র ভালবাসা, পবিত্র আত্মার বিনিময়ই স্বামী স্ত্রীর সম্বন্ধ ছিল। বহু বিবাহ প্রথা প্রচলিত থাকিলেও অপ্রশংসনীয় ছিল।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, হিন্দুরমণীগণ সভা সমিতি, থিয়েটার, শবশোভাযাত্রা, মৃগয়া প্রভৃতিতে যোগদান করিতেন। কখন কখন তাঁহারা যুদ্ধ শিবিরে অবস্থান করিতেন এবং প্রয়োজন হইলে যুদ্ধ করিতেও পরান্মুখা ছিলেন না। তাঁহারা অশ্ব বা গজে আরোহণ করিতেন। তাঁহারা সিংহাসনেও উপবেশন করিতেন। মুসলমান আক্রমণের পূর্ব্বে প্রেম দেবী দিল্লীর সিংহাসন অলঙ্কৃতা করিয়াছিলেন। হুয়েন্থ সাং যমুনা ও গঙ্গা নদীর উৎপত্তিস্থলে স্ত্রীরাজ্য দেখিয়াছিলেন বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন।

ক্ষত্রিয় রমণীগণ সাহসিকতাকে প্রশংসা ও ভীরুতাকে নিন্দা ও ঘৃণা করিতেন। কুন্তী তাঁহার পুত্রগণকে সম্বোধন করিয়া বলিয়াছিলেন—"তোমরা ক্ষত্রিয় বংশোদ্ভব, যুদ্ধক্ষেত্রে প্রাণত্যাগই তোমাদের গৌরব।" টড্ প্রণীত 'রাজস্থানে' সাহসিকতার পক্ষপাতিনী স্ত্রীলোকের উদাহরণ বিরল নহে।

পোষাক-পরিচ্ছদ।—আর্য্যেরা চন্দনকাষ্ঠ নির্ম্মিত পাদুকা ব্যবহার করিতেন। স্ত্রীলোকেরা শ্বেত পরিচ্ছদ, হার, বলয় প্রভৃতি পরিধান করিতেন। হিন্দুরমণীগণ ঘাঘ্‌রা, দুপাটা প্রভৃতিও ব্যবহার করিতেন। * তাঁহারা পাদুকাও ব্যবহার করিতেন।

আমোদ-প্রমোদ।—পশু শীকার, রঙ্গমঞ্চে অভিনয়, ব্যায়াম প্রভৃতি আর্য্যজাতির সাধারণ ক্রীড়া ছিল। নৃপতিগণ অক্ষক্রীড়া অধিকতর ভালবাসিতেন। কোন রাজা, অক্ষক্রীড়ায় কোন ক্ষত্রিয়কে আহ্বান করিলে তিনি যদি রাজার আহ্বান না শুনিতেন তবে তাঁহার জাতি যাইত। নল, যুধিষ্ঠির এবং অন্যান্য ক্ষত্রিয় নৃপতিগণ এই অক্ষক্রীড়ায় রাজ্য ধনাদি হারাইয়াছিলেন। ঋগ্বেদ ও মনুসংহিতা কিন্তু অক্ষক্রীড়াকে অন্যায় বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন।

বন-ভোজন।—ক্ষত্রিয়গণ সস্ত্রীক্ বন-ভোজন করিতেন। মহাভারতের আদিপর্ব্বে আছে যে, শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জ্জুন এবং অন্যান্য কতিপয় স্ত্রীলোক যমুনাতীরে বনভোজন করিয়াছিলেন। তাঁহাদের মধ্যে কেহ বা বনমধ্যে বিচরণ করিতে লাগিলেন—কেহ বা নদীতে সন্তরণ করিতে লাগিলেন; এইরূপে কেহ নৃত্য, কেহ সঙ্গীতে আত্মহারা হইলেন। এমন কি বৃদ্ধ নারদ মুনিও এইরূপে বনভোজনের আমোদ-উপভোগে আগ্রহ ভিন্ন ঔদাসীন্য প্রকাশ করিতেন না বলিয়া পুরাণে উল্লেখ আছে।

শিক্ষা।—প্রত্যেক শ্রেণীকে সাধারণ শিক্ষা ব্যতীত বিশেষ রকম কিছু শিক্ষা দেওয়া হইত। ক্ষত্রিয় জাতির শিক্ষা সম্বন্ধে পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। মনুসংহিতা বলেন, বৈশ্যদিগকে ব্যবসায় বিষয় সম্বন্ধীয় যথা, দ্রব্যাদির ওজন পরিমাণ নির্দ্ধারণাদি শিক্ষা প্রদান করা হইত এবং শূদ্রদিগকে চিত্রাঙ্কন, ভাস্কর্য্য, স্থাপত্যাদি শিক্ষা দেওয়া হইত।

আতিথ্য।—মহারাজ যুধিষ্ঠির, রাজসূয় যজ্ঞের সময় জাতি নির্ব্বিশেষে আতিথ্য-সংকারের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন ইহা পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে। মনু

* Cunningham's Archæological Survey of India.

বলেন—"শ্রেষ্ঠকে শ্রেষ্ঠ ভাবে, সমানকে সমান ভাবে এবং ইতরকে ইতর ভাবে অতিথি সৎকার করিয়া গৃহস্বামী গৃহাগতের প্রতি আতিথ্য-সৎকার প্রদর্শন করিবেন।"

মানসিক উন্নতি।—প্রাচীন ভারতে আর্য্যজাতি দুরূহ গণিত, বীজ-গণিত, জ্যামিতি, জ্যোতিষ প্রভৃতি সর্ব্বপ্রথম উদ্ভাবন ও আলোচনা করেন। উইলিয়ম জোন্ বলেন,—"আমি সাহস পূর্ব্বক বলিতে পারি আমাদের অক্ষয় যশাঃ নিউটনের সমস্ত বৈজ্ঞানিক বা জ্যোতিষিক উদ্ভাবন বেদে ও সুফী-দিগের গ্রন্থে দেখিতে পাওয়া যায়।"

পরিচারকবৃন্দ।—ভৃত্যগণের প্রতি আর্য্যেরা বিশেষ সদয়ভাবে ব্যবহার করিতেন। মহাভারতে দেখা যায় যুধিষ্ঠির তাঁহার মহিলা-পরিচারিকা-বৃন্দকে "ভদ্রমহিলা" বলিয়া সম্বোধন করিতেছেন।

ধর্ম্মসম্বন্ধীয় অনুষ্ঠান।—আর্য্যেরা যখন পাঞ্জাবে অবস্থিতি করিতে-ছিলেন তখন তাঁহাদের মধ্যে জাতিভেদ প্রথা, পুরোহিত, দেবমন্দির প্রভৃতি ছিল না। প্রত্যেক পরিবারের কর্ত্তা আপন আপন পরিবারস্থ লোক লইয়া ভগবদুপাসনা করিতেন। প্রত্যেক গৃহস্থই প্রজ্বলিত অগ্নি সম্মুখে রাখিয়া দৈনিক তিনবার ভগবদারাধনা করিতেন। তখন আর্য্যেরা মনে করিতেন ঈশ্বর এক, তিনি সর্ব্বজ্ঞ ও সর্ব্বশক্তিমান।

গৃহ-জীবন।—আর্য্যজাতির সাংসারিক জীবন অত্যন্ত মনোরম ছিল। যাঁহাদের অবস্থা স্বচ্ছল ছিল তাঁহারা সর্ব্বাগ্রে একটি সুন্দর বাসগৃহ, একটী সুন্দরী স্ত্রী ও সুন্নার বন্দোবস্ত করিতেন। আর্য্যজাতির 'গৃহ' কেবল আপনার পরিবারভুক্ত লোক লইয়াই আবদ্ধ ছিল না, প্রতিবেশী ও দেশবাসিগণের প্রতি সহানুভূতি বা সমবেদনা প্রদর্শন আর্য্যজাতির নিত্য কর্ত্তব্য ছিল। অথর্ব্ববেদে এই মর্ম্মে একটি সূক্ত আছে,—"এই পরিবার শান্তিতে বাস করুক। এই পরিবারের পুত্র পিতাকে ভক্তি করুক, স্ত্রী স্বামীকে শ্রদ্ধা করুক, এই পরিবারের লোক হিংসা দ্বেষশূন্য হউক।"

শ্রীশ্যামলাল গোস্বামী।

ভুল।

---

(১)

বিশ্ববিদ্যালয় হইতে বি-এ, উপাধির ফাঁস পরিয়া আজ তিন বৎসর হইতে গৃহে বসিয়া চাকুরীর চেষ্টা করিতেছি, কিন্তু এতাবৎকাল জুটাইতে পারি নাই।

একদিন প্রচণ্ড মার্ত্তণ্ডতাপে দগ্ধ হইয়া চাকুরীর জন্য পদব্রজে কলিকাতার এক আপিস্ হইতে অন্য আপিস্ ঘুরিয়া বৃষ্টির আগমনবার্ত্তা জানিয়া নিজের ছোট গৃহখানিতে ফিরিয়া আসিয়া মনে মনে ভাবিতেছি যে "মা ভারতী, তোমার যদি বিদ্যা দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে একটা চাকুরী দেওয়ার নিশ্চয়তা থাকিত তাহা হইলে আমার মতন আরও অনেক বুদ্ধিমান, তাহাদের পিতৃ উপার্জ্জিত সমস্ত ধন সম্পত্তি তোমার ঐ রাঙ্গা পায়ে উপঢৌকন দিত।" এইরূপ নানাপ্রকার ভাবিতেছি, এমন সময়ে সহসা কে দরজায় ঘা দিল। ফিরিয়া দেখি, নীরদ।

নীরদ কলিকাতার একটি স্কুলের তৃতীয় শিক্ষক। সে আমার শৈশবের সহচর, বাল্যের বন্ধু, কলেজের সহপাঠী, জীবনের ধ্রুবতারা, এই সঙ্কটাপন্ন অবস্থায় আমার একমাত্র সহায়।

নীরদ ঘরের ভিতর প্রবেশ করিয়া বলিল—"ওহে, একটা চাকুরীর সন্ধান হয়েছে।"

লাফাইয়া উঠিয়া বলিলাম "কোথায়, মাহিনা কত, কবে থেকে ?"

"দাঁড়াও, ব্যস্ত হ'লে হ'বে না। একটা নূতন বীমা কোম্পানীতে ; মাহিনা প্রথমে ২৫৲ টাকা, পরে উন্নতি হ'বে।" এই বলিয়া নীরদ বিজ্ঞাপনের একটা কর্ত্তিতাংশ আমার হস্তে প্রদান করিল। পড়িয়া দেখি ১০ জন কেরাণীর প্রয়োজন। মনে মনে ভাবিলাম "নূতন হইলে কি হয় আপিসটি বড় নিশ্চয়।"

তাহার পর নানা কথাবার্ত্তার পর নীরদ যাইবার সময় বলিল,—"আগামী কল্য দরখাস্ত লইয়া আপিসে যাইও। তুমি গ্রাজুয়েট্, তোমার হওয়াই সম্ভব।" আমি জোর করিয়া বলিলাম—"নিশ্চয়ই।"

আশাদেবী নানা রূপ ধারণ করিয়া আমার মানসপটে আসিয়া উদিত হইতে লাগিলেন। ভাবিলাম, এত দিনে ভগবান এ দীনের প্রতি কৃপা করিলেন।

প্রাতঃকাল। যত শীঘ্র সম্ভব আহারাদি শেষ করিয়া ইষ্টদেবতার নাম

জপ করিতে করিতে বীমা কোম্পানীর আপিস অভিমুখে রওনা হইলাম। আজ হৃদয় কত আশায়, কত আকাঙ্ক্ষায় উদ্বেলিত হইতেছিল।

কম্পিত পদে ত্রস্ত হৃদয়ে আপিসের ভিতর প্রবেশ করিয়া বিনীতভাবে দরখাস্তখানি বড় সাহেবের শ্রীহস্তে অর্পণ করিয়া উদ্বিগ্নচিত্তে উত্তরের প্রতীক্ষায় রহিলাম। হৃদয় ধীরে ধীরে স্পন্দিত হইতে লাগিল।

সাহেব দরখাস্তখানি পড়িয়া বলিলেন "বাবু, লোক হইয়া গিয়াছে, আমি বিশেষ দুঃখিত।" সাহেবের 'দুঃখে' আমি চক্ষে অন্ধকার দেখিলাম!

ভগ্ন হৃদয়ে বাহিরে আসিয়া একখানি বেঞ্চির উপর বসিয়া নিজের অদৃষ্টকে ধিক্কার দিতে লাগিলাম।

এক নূতন বিপদে পড়িলাম। আমাকে একাকী চুপ করিয়া বসিয়া থাকিতে দেখিয়া কালীঘাটের পাণ্ডাদিগের মত—শস্যক্ষেত্রে পঙ্গপালের ন্যায়—দলে দলে লোক আসিয়া ব্যস্তভাবে বলিল—"মহাশয় কি জীবন বীমা করিবেন? জীবন বীমা করিবার এই ত উপযুক্ত সময়। আমার সঙ্গে আসুন, খুব কম Premiumএ ক'রে দিব, আর মহাশয়ের বয়সও ত বেশী নয়।" আবার কেহ বলিল—"আমার সঙ্গে আসুন ডাক্তারের সার্টিফিকেট যোগাড় ক'রে দিচ্ছি, তাহার দরুণ কেবল দুই টাকা দিলেই হ'বে।" আর একজন অগ্রসর হইয়া বলিল "আসুন ওজনটা ক'রেনি।"

তাহাদের বাধা দিয়া বলিলাম—"মহাশয়গণ, আমার অপরাধ মার্জ্জনা করিবেন, আমি আপনাদিগের অনুরোধ রক্ষায় অক্ষম। জীবন-বীমার প্রার্থী হইয়া এখানে আসি নাই, তবে জীবন বিক্রয় করিয়া দাসত্বের শৃঙ্খল পরিতে এখানে আসিয়াছিলাম।"

নিরুৎসাহ হইয়া তাহারা ফিরিয়া গেলেন। অবশেষে একটি বৃদ্ধের নিকট শুনিলাম যে আপিসটির নাম করিবার নিমিত্ত তাহাদের এইরূপ বিজ্ঞাপনের অবতারণা। আমার চমক ভাঙ্গিল। ভগ্নহৃদয়ে গৃহে ফিরিলাম।

(২)

সায়াহ্নে নীরদ আসিলে তাহাকে সমস্ত বলিলাম। নীরদ শুনিয়া বড়ই দুঃখিত ও আশ্চর্য্যান্বিত হইল। পরে আমায় আশ্বস্ত করিয়া বলিল "আচ্ছা কোনও ভয় নাই, আমাদের স্কুলে শীঘ্রই দ্বিতীয় শিক্ষকের পদ খালী হইবে। তুমি সে চাকুরী নিশ্চয় পাইবে। আর এক মাস অপেক্ষা কর।"

বিশ্ববিদ্যালয়ের নিকট বিদায় লইয়া কত মাস চুপ করিয়া বসিয়া রহিয়াছি, এক মাস ত সামান্য। নীরদকে খুব ধন্যবাদ দিলাম।

ভগবান সদয় হইলেন। নীরদের উদ্যোগে আমি সেই দ্বিতীয় শিক্ষকের পদটী লাভ করিয়া সুখে মাষ্টারী করিতেছি। এত দিন পরে বোধ হইল, যেন লেখাপড়া সার্থক হইয়াছে।

দিন গেল। আজ হৃদয় আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া উঠিতেছে, মুখে সদা হাসির রেখা ফুটিয়া রহিয়াছে,—কারণ আজ আমাদিগের Pay day, অর্থাৎ মাহিনা দিবার দিন।

বেলা একটা বাজিল। প্রধান শিক্ষক মহাশয় আমায় ডাকিয়া আমার হস্তে মাহিনা দিলেন। গণিয়া দেখি ২৪৸৵০। আমি একটু আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া বলিলাম—"মহাশয়, শুনিয়াছিলাম ত্রিশ টাকা মাহিনা, কিন্তু ৫৵০ কি জন্য কাটিয়া লওয়া হইল?"

হেড্ মাষ্টার মহাশয় একবার চতুর্দ্দিক নিরীক্ষণ করিয়া চুপি চুপি বলিলেন—"মহাশয়, পাঁচ টাকা সেক্রেটারী মহাশয়কে দিতে হয়, নতুবা চাকরী থাকে না! আর এক আনা রসীদের।"

"এখন বুঝিলাম" এই বলিয়া নীরদের দিকে চাহিলাম। নীরদ একটু হাসিলেন! হাসির অর্থ বোধ হয় "তুমি এ চির প্রচলিত প্রথাটিও জানিতে না!" কিন্তু আমার দোষ কি? চরিত্র-গঠনের কেন্দ্রস্থল, ন্যায়পরায়ণতা ও সাধুতার একমাত্র স্তম্ভ যে বিদ্যামন্দির, সেস্থলে যে এ প্রকার কুপ্রথা প্রচলিত তাহা আমার কল্পনার অতীত, আমার চিন্তার বহির্ভূত।

আমাকে চিন্তামগ্ন দেখিয়া হেডমাষ্টার মহাশয় বলিলেন, "মহাশয় কি ভাব্ছেন?"

"আজ্ঞে না, তা নহে; একটা গল্প মনে পড়ে গেল।"

"কি বলুন না।"

আমি আরম্ভ করিলাম—"একজন বর্দ্ধিষ্ণু ও সঙ্গতিপন্ন ব্যক্তির মৃত্যুর পর তাঁহার অপোগণ্ড জ্যেষ্ঠ পুত্র তাহার পিতা যে চাকুরীটা করিতেন সেই পদ পাইবার জন্য সরকার বাহাদুরের নিকট প্রার্থনা করিল। সরকার বাহাদুর ঐ ব্যক্তিকে বড় স্নেহ করিতেন, সেইজন্য দরখাস্তের উত্তর গেল—"তোমার পিতা অনাহারী ম্যাজিষ্ট্রেট ছিলেন, তাঁহার ত মাহিনা ছিল না, তবে সম্মান আছে—তুমি ঐ পদ লইয়া কি করিবে?" ইহার উত্তরে ঐ যুবক লিখিল যে 'হুজুর আমার স্বর্গীয় পিতা উহা হইতেই সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করিতেন। অতএব তাঁহার গরীব সন্তানকে ঐ পদটী দিলে সে অত্যন্ত বাধিত হইবে।' সরকার বাহাদুর সমস্ত বুঝিলেন এবং ভবিষ্যতের জন্য সতর্ক হইলেন!

সকলে হাসিয়া উঠিল। সহসা পিছন দিকে চাহিয়া দেখি যে আমাদিগের মর্ত্ত্যের চাকুরীর দেবতা সেক্রেটারীর রূপ ধারণ করিয়া আসিতেছেন। সকলে স্ব স্ব স্থানে সরিয়া পড়িলেন। মনে মনে ভাবিলাম আজ যে শুভ ১লা সেইজন্য স্কুলগৃহে মহাশয়ের পদার্পণ।

(৩)

সুখে দুঃখে কয়েক মাস কাটিয়া যাইল। যখন বি-এ উপাধি লইয়া বিস্তালয় ত্যাগ করি তখন কত আশায়, কত আকাঙ্ক্ষায় হৃদয় উদ্বেলিত হইয়াছিল। তখন কি মুহূর্ত্তের জন্য ভাবিয়াছিলাম যে এই ৩০৲ টাকা বেতনের চাকুরী করিয়া জীবনের অবশিষ্টাংশ কাটাইতে হইবে? এই সমস্ত বিষয় লইয়া লাইব্রেরী-ঘরে বসিয়া আলোচনা করিতেছি, এমন সময় শুনিলাম যে পার্শ্বের প্রথম শ্রেণীর কক্ষ হইতে দুইটি বালক বলাবলি করিতেছে যে "কাটাকাটি না করলে হ'বে না, তাহা না হইলে ক্রমেই বাড়িবে।"

বলিতে ভুলিয়াছি যে, যখন এই কার্য্যে প্রথম নিযুক্ত হই তখন সেক্রেটারী মহাশয় বিশেষ করিয়া বলিয়া দিয়াছিলেন যে রাজবিদ্রোহজনক কোন কথা যেন এখানে ছেলেদিগের ভিতর আলোচনা না হয়।

ছেলে দুইটির এই গুরুতর পরামর্শ শ্রবণ করিয়া আর স্থির থাকিতে পারিলাম না। অচিরাৎ প্রধান শিক্ষক মহাশয়ের কর্ণগোচর করাইলাম।

নীরদ এই ঘটনা শ্রবণ করিয়া একটু বিস্মিত হইয়া, গোপনে বলিল— "কাজটা ভাল হ'ল না—প্রথমে ভাল করে অনুসন্ধান করে পরে রিপোর্ট করলেই হ'ত, যদি ছেলে দু'টো নির্দ্দোষ হয়!"

বাস্তবিকইত কাজটা ভাল হয়নি,—বলিলাম—"নীরদ, এখন উপায়?"

"উপায় আর কি, উপায় ভগবান" হতাশভাবে বলিলাম "বেশ।"

আজ বিচারের দিন। অপরাধের দণ্ড দিবার নিমিত্ত সেক্রেটারী ও প্রধান শিক্ষক মহাশয় ব্যস্ত হইয়া উঠিয়াছেন। অন্যান্য ছাত্রেরা ফলাফল জানিবার জন্য উদ্বিগ্ন হইয়া পড়িয়াছে।

সকলেই নিস্তব্ধ। বিচারে বালক দুইটি স্কুল হইতে তাড়িত হইল।

যাইবার সময় তাহাদিগের মধ্যে একজন বলিল "মহাশয় একটা অঙ্ক কসিবার সময় আমার এই বন্ধুকে দুইটি রাশিতে 'কাটাকাটি' করিতে বলিতেছিলাম নতুবা উত্তর 'অত্যন্ত বাড়িয়া যাইবে'। একথা আপনাদের বিশ্বাস করাইতে চাহি না, কারণ আমরা দয়ার প্রার্থী নহি" এই বলিয়া তাহারা নিস্ক্রান্ত হইল।

তাহাদিগের কথায় কেহই কর্ণপাত করিলেন না। আমার চক্ষু অশ্রুভারাক্রান্ত হইল—আমার সম্পূর্ণ প্রত্যয় জন্মাইল। হায়, আমার সামান্য একটা নির্ব্বুদ্ধিতার জন্য দুইজন বালকের সমস্ত জীবনটি মাটি হইয়া গেল। অপরিণামদর্শিতার নিমিত্ত নিজের জীবনের সুখ শান্তিকে বিনষ্ট করিলাম,—অনুশোচনার অভিনয় আরম্ভ হইল। তাহাদিগের সেই নির্ভীকতা, সেই তেজস্বী মুখমণ্ডল আমার অন্তরে শতবৃশ্চিক দংশন-জ্বালায় অভিভূত করিল। তাহারা চলিয়া গেল, লইয়া গেল আমার শান্তি !

*　　*　　*　　*　　*

(৪)

আরও দুই বৎসর কাটিয়া গেল। দাসত্বের মোচন হইল। নীরদের সহিত পরামর্শ করিয়া এক সঙ্গে দুইজনে দাসত্ব বন্ধন ছিন্ন করিয়া জনকোলাহল-মুখরিতা সৌভাগ্য-গর্ব্বিতা কলিকাতা মহানগরী ত্যাগ করিয়া মলিনা, দীনা স্বদেশে—পল্লীকুটীরে প্রত্যাগমন করিয়া কৃষিকর্ম্মে নিযুক্ত হইলাম।

তিন চারি মাসের ভিতর আমাদিগের বেশ আয়ও হইয়া উঠিল।

সায়াহ্নে যখন ক্ষীণ সূর্য্যালোক দিগন্তপ্রসারী সবুজ মাঠের উপর পড়িয়া এক অপূর্ব্ব শোভা বিস্তার করিত তখন মনে হইত 'এই শস্য শ্যামলা স্বর্ণপ্রসূ ভারতবর্ষে যাহাদিগের জন্মস্থান তাহাদিগের আবার কিসের অভাব ?'

আমাদিগের বাগানের অনতিদূরে আর একটি কাহার প্রকাণ্ড বাগান আছে। প্রায় সকল প্রকার শস্য ও অন্যান্য উপযোগী বৃক্ষ তথায় বিদ্যমান রহিয়াছে। মালীর মুখে শুনিলাম যে বাগানের মালিক শস্য ও অন্যান্য দ্রব্যাদি লইয়া বিক্রয়ার্থ বিদেশে গিয়াছেন। মনে মনে ভাবিলাম, যাঁহারা এই বাগানের মালিক তাঁহারাই সুখী।

বিস্ময়কর ঘটনা ঘটিল। নিশীথিনী বিদায়ের সঙ্গে সঙ্গে অরুণময়ী লজ্জাবনত উষাদেবী আসিয়া গ্রামখানিকে জাগাইয়া তুলিলেন। শিশিরসিক্ত ধানগাছগুলির উপর হইতে বালভানুর ক্ষীণ কিরণ প্রতিফলিত হইয়া সহস্র সহস্র মুক্তাবলীর ন্যায় শোভা পাইতেছিল। প্রকৃতি সুন্দরী এক অপূর্ব্ব মনোহর সাজে সজ্জিতা।

প্রাতঃকালে নীরদের সহিত বাগানে যাইবার সময় যাহা দেখিলাম তাহাতে আমার মস্তিষ্ক বিঘূর্ণিত হইল। নীরদের খুব নিকটে গিয়া বলিলাম—"ঐ দুইটি যুবক আসিতেছে দেখিতেছ ?"

"হাঁ, তা ত দেখছি। কিন্তু উপায় ?" নীরদ আমার বিপদের সহায়, তাহাকে এখন ভীত দেখিয়া আমার প্রাণপাখী দেহপিঞ্জরে ছট্‌ফট্‌ করিতে লাগিল, হৃদয়ে স্পন্দন আরম্ভ হইল। জড়িতকণ্ঠে বলিলাম—"উপায়—তুমি আর ভগবান।"

"ভয় পাইও না, স্থির হইয়া দাঁড়াও, দেখি উহারা কি করে।"

"আর কি ক'রবে নীরদ, আমার প্রাণটি নিয়ে চলে যাবে; আর খুব জোর তোমাকে একটা চড়্‌ মাড়বে।"

যুবক দুইটি আরও নিকটে আসিল।

"ভীত হইও না।" নীরদ আমার কর্ণে মৃদুস্বরে বলিল—"ভীত হইও না!"

যুবকদ্বয় আরও নিকটে আসিল।

"বিপদে অধৈর্য্য হইও না। স্থির হও।"

অর্দ্ধস্ফুটস্বরে বলিলাম—"এখনই চির স্থির হইতে হইবে। ঐ এলো—" এই বলিয়া যেমন প্রস্থানোদ্যত হইলাম অমনই নীরদ আমার হাত ধরিল।

গদগদস্বরে বলিলাম—"নীরদ শেষে তুমিই আমার বৈরী হ'লে ?"

যুবকদ্বয় নিকটে আসিয়া একমুখ হাসিয়া বলিল—"মাষ্টার মশায় নমস্কার।"

আমার কোন কথা বলিবার অগ্রেই নীরদ একগাল হাসিয়া বলিল "তোমাদের দেখিয়া ইনি পলাইয়া যাইতেছিলেন।" মনে মনে ভাবিলাম, নীরদ এ কথাটি না বলিলেও পারিত; কারণ কি জানি ইহাদের কি অভিপ্রায়!

যুবক দুইটি হাস্য করিয়া বলিল "কিসের জন্য মাষ্টার মশায় ?"

আমি নিস্তব্ধ। নীরদ বলিল,—"ইনি সেই গর্হিত কার্য্যের জন্য এত অনুতপ্ত হইয়াছেন যে তোমাদিগের নিকট মুখ দেখাইতেও লজ্জা বোধ করিতেছেন।" তৎপরে একটু মৃদুভাবে বলিল "মর্ম্মান্তিক অনুশোচনার জন্য মস্তকও বোধ হয় একটু বিকৃত হইয়াছে।" ধন্য নীরদের উপস্থিত বুদ্ধি!

যুবকদ্বয় আমার পদধূলি লইয়া বলিল—"মাষ্টার মহাশয়, পৃথিবীতে ভ্রম সকলেরই হয়, তাহার জন্য এত অনুশোচনা কেন? আপনার নিকট আমরা ঋণী। আপনার জন্যই আমরা দেখুন ঐ স্বর্ণপ্রসূ বাগানের অধিকারী হইয়া এই বয়স হইতে দু'পয়সা উপার্জ্জন করিতে পারিতেছি।"

সেই প্রকাণ্ড বাগানটির পানে একবার চাহিলাম। মনে মনে ভাবিলাম, 'হায়, এত দিন জানিলে ত সমস্ত গোল মিটিয়া যাইত।'

তাহারা আবার বলিল—"কল্য এখানে আসিয়া শুনলুম আপনারাও এখানে

চাষ করছেন। শুনে বড় আহ্লাদ হ'ল, তাই আজ প্রাতে আপনার বাড়ী যাচ্ছিলুম।"

অধোবদনে বলিলাম—"পূর্ব্ব ঘটনা বিস্মৃত হও, এস গুরু শিষ্যে মিলিয়া ব্যবসা বাণিজ্য করিয়া দেশের উন্নতি সাধন করি। আমি তোমাদের গুরু হইলেও এই সংসারক্ষেত্রে তোমরাই আমার গুরু।"

অতঃপর নীরদ চাকুরী করার বিরুদ্ধে মস্ত একটা গবেষণাপূর্ণ বক্তৃতা দিয়া, আমার দিকে চাহিয়া হাস্যমুখে বলিল—"অজয়, তোমার একটা সামান্য অথচ মারাত্মক ভুলের জন্য বোধ হয় গুরু শিষ্যের উন্নতি হইবে।" আমি বলিলাম —"এই পৃথিবীই একটি ভুল। ভুলেই উন্নতি হয়, ভুলেই অবনতি হয়।" সকলে হাসিয়া উঠিল।

শ্রীভূপেন্দ্রলাল রায়।

ভ্রমর।

(সমালোচনা।)

বঙ্কিমবাবু বলিয়া গিয়াছেন, "ভ্রমর" কাল বলিয়াই তাহার নাম ভ্রমর। বর্ণসাদৃশ্য এই নাম-সঙ্কলনের অন্যতম কারণ হইলেও ইহার গূঢ়তর কারণও আছে। ভ্রমর নিরন্তরই মধুপানে মত্ত, মধুপান করা আর গুণ গুণ করা ভিন্ন তাহার অন্য কোনও কার্য্য নাই। পরিণামে কি হইবে, মধুতে জড়িত, বদ্ধ থাকিয়া প্রাণ হারাইবে কি না, তাহা তাহার বোধ নাই। বর্ত্তমানের সুখ, আনন্দ ও প্রীতি লইয়াই সারা বসন্তকাল কাটাইয়া দেয়। নাচিয়া নাচিয়া গুণ গুণ করিয়া হাসিয়া খেলিয়া বেড়ানই তাহার সুখ। বঙ্কিমবাবু স্বয়ং নাই বলুন, আদর্শ ভক্ত সমালোচক ৺গিরিজা বাবু তাহার বিশেষ বিশ্লেষণ নাই করুন, আমরা কিন্তু ভ্রমর-চরিত্রে ভ্রমরের সহিত বর্ণসাদৃশ্য ব্যতীত উপরিউক্ত সাদৃশ্যও দেখিতে পাই। ভ্রমরে নানাফুলে মধু খাওয়ারূপ বিশেষ ভ্রমর-ধর্ম্ম যে পরিত্যাগ করিতে হইবে, ইহা বোধ হয় কাহাকেও বুঝাইয়া দিতে হইবে না। আর উপমান উপমেয়ে সকল সাধর্ম্ম কখন মিলিতে পারে না।

গোবিন্দলালের খেলার ক্রীড়নী, প্রাণের সহচরী, নর্ম্মসখী শ্রীমতী ভ্রমর সুন্দরী প্রথমতঃ কাল ত বটেই; নাচিয়া নাচিয়া গোবিন্দলালের পার্শ্বে ভ্রমরেরই

মত দাঁড়াইয়া থাকে ত নিশ্চয়ই! আদরের প্রণয়িনী ভ্রমরও নিরন্তরই গোবিন্দলালের আদর ও ভালবাসার মধুপানে উন্মত্ত নহে কি? রাতদিন গোবিন্দলালের সঙ্গসুখরসে রসিকা নহে কি? ব্যঙ্গ পরিহাস, মান অভিমান, সোহাগ আব্দারের গাঢ়রস-মোহে আচ্ছন্না থাকে না কি? ভ্রমর গোবিন্দলালের বালিকা বধূ ক্রীড়নক স্থানীয়া হইয়া, কৃষ্ণকান্তের আদরের পুত্রবধূ পদ পাইয়া, সকলের সমাদরের স্নেহের পাত্রী হইয়াই রায়পরিবারে আসিয়াছিল। গৃহিণীপণা করিতে হয় নাই, জীবনে গৃহিণীপণা করিবার সুযোগ পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে স্বামি-বিরহিতা হইয়া তাহাকে থাকিতে হইয়াছিল। বধূর মত কাল কাটাইয়া বাপের আদুরে কন্যা ভ্রমর শ্বশুরের বিশেষ স্নেহের পাত্রী, গোবিন্দলালের একান্ত ভালবাসার সামগ্রী হইয়া সংসারের কর্ত্তব্য কিছুই শিক্ষা করিতে পারে নাই। ভ্রমর জানিত, স্বামী। স্বামীর ভালবাসা, আদরে সোহাগেই তাহার জীবনটাকে মধুময়ী করিয়াছিল। তাহার স্থির ধারণা ছিল, এইভাবেই দিন কাটিবে. সংসারের গুরুভার স্কন্ধে পড়িবে না, কঠোর সংগ্রামে যুঝিতে হইবে না। কাজেই ভ্রমর ঠিক সংসারিণী, প্রকৃত সহধর্ম্মিণী হইয়া গঠিত হয় নাই। গঠিত হইয়াছিল —প্রণয়িনী ভাবে, সখীভাবে, ক্রীড়নীরূপে।

ভ্রমরেরও পরিণাম-জ্ঞান ততদূর পরিপক্কতা লাভ করে নাই। গৃহিণীপদ পাইয়া সংসার করিলে, কঠোর সংগ্রামে যুঝিবার মত শক্তি সংযম করিলে, দুঃখ কষ্ট নৈরাশ্যের মধ্য দিয়া জীবনকে গঠিত করিতে পাইলে ভ্রমর যে প্রকৃত গৃহিণী হইত না, এমন কথা নিশ্চয় বলা যায় না।

নিরভিমানিতা আদর্শ প্রণয়ের প্রকৃষ্ট লক্ষণ বটে কিন্তু সাধারণতঃ প্রণয়ের লক্ষণ নিরভিমানিতা নহে। আদর্শ প্রণয় লইয়া আমরা সংসার করি না, আদর্শ প্রেমে গঠিত পত্নীও সংসারে মেলে না, কাজেই আমরা যে প্রণয় দেখি, সে প্রণয়ের সহিত অভিমান ওতঃপ্রোত ভাবে বিরাজমান। প্রেম আর অভিমান দুইই যেন এক সূত্রে গ্রথিত। অভিমানই প্রেমের লক্ষণ বা ধর্ম্ম। অভিমান প্রেম-সাগরের কল্লোল। কল্লোল নাই—সে সমুদ্র স্থির। অভিমান নাই, সে প্রেম স্থির শান্ত। কিন্তু এরূপ স্থির শান্ত প্রেম লইয়া নাটক উপন্যাস হয় না, জীবনের ঘাত-প্রতিঘাত দেখান হয় না, বৈচিত্র্যময় গার্হস্থ্যভাবের সহিত বেশ মিশও খায় না। যে প্রেমে অভিমান নাই, আবেগ নাই, উন্মত্ততা নাই, তাহা সাংসারিক প্রেম নহে। সাংসারিক প্রেমে কিছু কাম, কিছু মোহ, কিছু ধর্ম্ম, কিছু কর্ত্তব্যতা, কিছু বা স্বার্থ থাকিবেই থাকিবে।

অভিমান আপাততঃ দুইটি প্রেমময় হৃদয়ের বিযোজক হইলেও পরিণামে সংযোজকই হইয়া থাকে। যখনই প্রেমে অরুচি, প্রেমে তন্ময়তার অভাব, প্রেমে একাত্মতার অল্পতা, প্রেমে অনৈক্যভাব দেখা যাইবে, তখনই অভিমান সংযোজক। অভিমানই সামঞ্জস্য দ্বারা প্রেমে নবীনতা, মধুরতা ও একাত্মতা আনিয়া দেয়। সেই অভিমান মন্দ—এমন কথা আমরা বলি না। রাধার অভিমান ছিল—কিন্তু সে অভিমান স্পৃহনীয় নহে কি?

ভ্রমরে রাধার মত অভিমান নাই থাকুক, যেটুকু অভিমান থাকা আবশ্যক, তাহা অপেক্ষা অধিক অভিমান ভ্রমরে ছিল। অভিমান ভাল দ্রব্য হইলেও আতিশয্য ভাল নহে। ভ্রমরে অভিমানের আতিশয্য ছিল, সেই আতিশয্যের ফলে অভিমানান্ধতা দেখা গিয়াছিল, অভিমানে সময় সময় প্রেম আচ্ছাদিতবৎ হইয়া যায়। ভ্রমরেও সেই অভিমান এমতই প্রবল ভাব ধারণ করিয়াছিল যে, ভ্রমরের পতিভক্তি, পতিপ্রাণতা, প্রেম-তন্ময়তা সমস্ত যেন আচ্ছাদিত মত হইয়াছিল। ইহাই ভ্রমরের দোষ। অজ্ঞান বালিকার হিসাবে, গৃহস্থ বঙ্গ রমণীর হিসাবে ভ্রমরের দোষ তত অধিক নহে, কিন্তু হিন্দু আদর্শের দিক্ দিয়া দেখিলে, সীতা সাবিত্রী দময়ন্তীর লীলাভূমি মনে করিলে ভ্রমরকে দোষী না বলিয়া থাকা যায় না।

ভ্রমর ও রাধা অভিমানের দুইটি দিক। রাধার অভিমান ভঙ্গুর, কোমল, বেদনাময়। ভ্রমরের অভিমান সাধারণতঃ ভঙ্গুর, তীব্র, ঈর্ষা জ্বালা বেদনাময়। ভ্রমরে সাময়িক উত্তেজনা এত প্রবল যে, তজ্জন্য ভ্রমর অভিমানিনীর কুদৃষ্টান্ত স্থল। রাধার সাময়িক কারুণ্য এত মর্ম্মস্পর্শী যে, তজ্জন্য অভিমানিনী রাধা সু-উদাহরণ স্থান। রাধা ধর্ম্ম অপেক্ষা, কর্ত্তব্য অপেক্ষা,—সকল অপেক্ষা কৃষ্ণপ্রেমানুরাগিনী ছিল। ভ্রমরের তাহা ছিল না। তথাপি রাধার অভিমানের সহিত ভ্রমরের অভিমানের অসীম পার্থক্য থাকিলেও অভিমানের দুইটী ধারা দুইজন রাখিয়াছিল। বাস্তবিক অভিমানের বিশ্লেষণ করিলে যে দুইটী উপাদান পাওয়া যায়, তাহার একটি রাধায়, অপরটি ভ্রমরে সমধিক ছিল।

ভ্রমর স্বামীর ধর্ম্ম, পবিত্রতা, ভালবাসাকে স্বামী অপেক্ষা বড় করিয়া দেখিত। স্বামীর উন্নত আদর্শ, স্বামীর আদর সোহাগ—উভয়ই আপনার জীবনের অবলম্বন করিয়াছিল। অবশ্য সে উন্নত আদর্শ ও স্বামীর ভালবাসা, এই উভয়ের সঙ্ঘর্ষ হইলে কি হইত, তাহা আমরা বলিতে পারি না, আর বলাও নিরাপদ নহে। রাধা ও ভ্রমর দুইটি দিক রক্ষা করিয়া যাইলেও উভয়ের উপ-

যোগিতা যে কাহারও অধিক, কাহারও অল্প, ঠিক বলা যায় না। রাধার অভিমানে প্রণয়ী কখন রাধার উপর প্রেমশূন্য হয় না, কিন্তু আবার তাহার অন্যাসক্তির বাধাও ঘটে না। রাধার অভিমান প্রণয়ীর সে অন্যাসক্তির সহিত কঠোর যুদ্ধ করে না। জয়লক্ষ্মী আলিঙ্গন করুক, না হয় প্রাণ যাউক—এ ভাব থাকে না। পত্নীর আদর্শই পতির উপর সর্ব্বতোভাবে সত্তা লোপ করা। পতি যাহাই করুক, তাহার সমালোচনা, বিরুদ্ধতা সাধ্বীর কর্ত্তব্য নহে, স্বামীর মনোরঞ্জন স্বামীর মনোনুবর্ত্তনই পতিপ্রাণার ধর্ম্ম, ইহাই ভারতীয় আদর্শ।

কিন্তু আরও একটি আদর্শের দিক আছে। পত্নী যদি পতিকে রক্ষা না করিবে, তবে কি সে পতির শয্যাসঙ্গিনী, কেবল কি নর্ম্মসহচরী? পতিকে নরক হইতে টানিয়া আনিতে পত্নীই পারে। পাপ পথ হইতে সবলে আকর্ষণ করিবার সময় যদি মান অভিমান, ঈর্ষা ক্রোধের ভীষণ সংগ্রাম ঘটে, তাহা কি পত্নীর কর্ত্তব্য নহে? কষ্ট হইবে, পতি ত্যাগ করিয়া যাইবে, পত্নীর জীবন ব্যর্থ হইবে—হউক, তথাপি পতীকে ভাল করিতে হইবে। ভাল করিবার জন্য যদি পরস্পরের বিচ্ছেদ ঘটে, আপনার জীবনাহুতি দিতে হয়, কেন না দিবে? আপনার স্বার্থ অপেক্ষা পতির মঙ্গল স্পৃহনীয় হওয়াই উচিত।

পতির ধর্ম্মই পত্নীর ধর্ম্ম—ইহা ভারতীয় নারীধর্ম্ম, ইহা সতীর আদর্শ, আবার ধর্ম্মত্যাগী বলিয়া যদি আপনি স্বামীর সহিত পৃথক থাকিয়া মানস-কল্পিত পতির পূজায়, পতির ধ্যানে মন নিমগ্ন রাখিতে পারে, তাহা কি পত্নীর অধর্ম্ম?

সর্ব্বতোভাবে পতির চিত্ত অনুবর্ত্তনের যতই প্রশংসা থাকুক না কেন; কিন্তু ইহাও সত্য যে, এ অনুবর্ত্তনে পতিকে পাপের পথ হইতে টানিয়া আনার শক্তি থাকে না। স্বীকার করি—পতির চিত্তানুবর্ত্তন করিলে পতি সাধারণতঃ কুপথে যান না; কিন্তু মনের গতি যে বাস্তবিক পাপের পথে যাইতে পারে না, তাহা নহে। যদি যায়, তখনও অনুবর্ত্তন না করাই কি পত্নীর কর্ত্তব্য নহে? পরিণামে পতি ফিরিবেন বলিয়া বর্ত্তমানে পতির পাপের পথে বাধা উৎপাদন না করা সহধর্ম্মিণী পত্নীর ধর্ম্ম নহে। বাধা উৎপাদনের ফল,—এক, স্বামী পাপপথ হইতে প্রত্যাগত হউন, নচেৎ তাঁহার সহিত ইহজীবনের দৈহিক সম্বন্ধ লোপ পাউক, আপনার জীবন দুঃখময় হউক, নশ্বর পৃথিবী চিরদিনের মত পরিত্যক্তা হউক, ক্ষতি নাই, স্বামীর রক্ষা করিতে হইবে।

রাজপুতনার যশোবন্তের রাণী যুদ্ধ পরাজয়ান্তে প্রত্যাগত স্বামীকে যে তীব্র

ভৎ‍র্সনা ও অপমান করিয়াছিলেন, তাহা ক্ষত্রিয়ানীর তেজস্বিতা, ক্ষত্রিয়ের রণধর্ম্মপালনের কি অনুরূপ নহে?

গোবিন্দলাল আসিবার পূর্ব্বে ভ্রমরের বালিকা স্বভাবসুলভ পত্রলেখা প্রভৃতি কার্য্য ভারতীয় আদর্শের নিকট যতই নিকৃষ্ট হউক, কিন্তু সেই বিরোধিতা, সেই অভিমান, সেই জ্বলিয়া পুড়িয়া মরা, সেই অধর্ম্মের প্রতি ঘৃণা, পত্নীর যে ধর্ম্ম নহে—ইহা আমরা বলি না।

ভ্রমর যাহা করিয়াছিল—তাহা সর্ব্বাংশে সমর্থনযোগ্য না হইলেও, ইহারও যে নির্দ্দোষ আদর্শ আছে, ইহাও যে পত্নীর ধর্ম্ম, সতীরও কর্ত্তব্য—এ কথাও আমরা বলিব।

অবশ্য প্রথমে যদি ভ্রমরের অভিমানে বাপের বাড়ী যাওয়া প্রভৃতি ব্যাপার না ঘটিত, তাহা হইলে গোবিন্দলাল পাপপথে যাইতেন না, রোহিণীর রূপ-তৃষা, রূপমোহ সংযম দ্বারা দূরীকৃত করিতে পারিতেন—এই জন্যই ভ্রমরের অপরাধ গুরুতর। ভ্রমর যদি সূর্য্যমুখীর মত হইত, তাহা হইলে গোবিন্দলাল কখনই পাপপথের পথিক হইতেন না, এত ব্যাপার কিছুই ঘটিত না—এইজন্য গোবিন্দলালের সুখ্যাতি করিতে হয়।

আমাদের সর্ব্বোৎকৃষ্ট আদর্শ লইয়া ভ্রমর গঠিত নহে কিন্তু অপর আদর্শে যে গঠিত, সে পক্ষে সন্দেহ নাই। তবে সর্ব্বতোভাবে ঐ দ্বিতীয় আদর্শ যে ভ্রমরে অক্ষুণ্ণ ছিল, তাহাও বলি না।

ভ্রমর গোবিন্দলালকে তেজের সহিত বলিতে পারিয়াছিল যে, "তুমি আবার আসিবে, আবার ভ্রমর বলিয়া ডাকিবে"—ইহা সতীরই তেজ। সতী ব্যতীত এমন তেজের সহিত, এমন দৃঢ় বিশ্বাসের সহিত কে বলিতে পারে? এরূপ সিংহীর মত গর্জ্জিয়া, হংসীর মত গ্রীবা তুলিয়া, রাণীর মত দাঁড়াইয়া ভ্রমর ব্যতীত কে বলিতে পারে? ঐ দর্প ছিল, ঐ অভিমান ছিল, ধর্ম্মে বিশ্বাস, পাপে ঘৃণা ছিল—তাই ভ্রমর অমিত তেজের সহিত পাপ-পথ-গমনোদ্যত পতিকে বলিতে পারিয়াছিল, "তুমি আবার আসিবে, আবার ভ্রমর বলিয়া ডাকিবে"। আমরা সূর্য্যমুখী চাহি, কিন্তু তাহার গৃহত্যাগ চাহি না; প্রফুল্ল চাহি, কিন্তু তাহার ডাকাইতি চাহি না, তদ্রূপই ভ্রমর চাহি, তাহার অভিমান চাহিতে পারি, তাহার দুর্জ্জয় অভিমান কিন্তু চাহি না। বালিকা সুলভ অবিবেচনাও ঐ দুর্জ্জয় অভিমানের বহির্বিকাশ মাত্র।

মৃত্যুকালে সতীর মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হইয়াছিল। গোবিন্দলাল অনুতপ্ত,

ক্ষমার ভিখারী হইয়া পূর্ব্বেকার গোবিন্দলাল হইয়াই আবার ভ্রমর বলিয়া ডাকিয়াছিল। গোবিন্দলাল পার্শ্বে বসিল, ভ্রমর মাথার কাছে বসিতে বলিল। পতির নিকট তাহার আশ্রিতা শিষ্যা দাসানুদাসী ভ্রমর প্রার্থনা জানাইল—"যেন জন্মান্তরে সুখী হই"। অবশ্য গোবিন্দলালকেই ভর্ত্তারূপে চাহিয়াছিল, ইহাই সতীর ধর্ম্ম। তথাপি মুখ ফুটিয়া বলে নাই, বা বলিতে পারে নাই, বা বলিবার মত অধিকার পায় নাই। "ত্বমেব ভর্ত্তা ন চ বিপ্রযোগঃ" তুমিই পরজন্মে স্বামী হইবে, কিন্তু যেন বিরহ-কষ্ট ভুগিতে না হয়—সীতার মত এমন কথা ভ্রমর বলে নাই। বোধ হয়, উহা না বলাই ভ্রমরের পক্ষে শোভন। গোবিন্দলালের স্পষ্টতঃ তাহা না শোনাই বোধ হয় ভাল হইয়াছিল।

স্বামীকে কেমন করিয়া বাঁচাইতে হইবে—এই আকুল ক্রন্দন তাহার স্বামী সহ বসবাস করিবার নিমিত্ত নহে। ভ্রমর তখন সধবা হইয়াও এক প্রকার পতি সুখাশা ত্যাগ করিয়াছিল. যৌবনে যোগিনী সাজিয়া সকল সাধই বিসর্জ্জন দিয়াছিল, ক্ষয়রোগে মরণের পথে তিল তিল অগ্রসর হইতেছিল। কোন প্রকারে প্রাণকে কে ধরিয়া রাখিয়াছিল, সতীত্বের বলে কোনরূপে শেষ নিশ্বাস ধরিয়া রাখিয়াছিল, তাহার বড় আশা মৃত্যুকালে স্বামীর ক্রোড়ে প্রাণত্যাগ করিবে।

অমর কবির ভাব ভ্রমর দোষে গুণে সৃষ্ট। তিনি ইহা এক প্রকার স্বীকার করিয়া যাইলেও আমরা কবির গুপ্ত অন্তস্তলে যদি প্রবেশ করিতে পারিতাম, তাহা হইলে দেখিতাম, ভ্রমরের উপর তাঁহার কি গভীর ভালবাসা, কি কোমল সহানুভূতি, কি আন্তরিক শ্রদ্ধা ছিল। ভ্রমরে কোন দোষ ছিল, কোন পাপ ছিল, তাহা মনে করিতে তাঁহার প্রাণ কাঁদিয়া উঠিত। তিনি পিতার মত স্নেহ করিতেন, আর কঠোর বিচারকের মত দোষের উল্লেখ করিতে সঙ্কুচিত হয়েন নাই। যাহা দোষ ছিল, তাহা কেবল বালিকাসুলভ অবিবেচনা, গভীর প্রণয়োত্থ স্বাভাবিক অভিমান, গোবিন্দলালের প্রণয়িনীর অনুরূপ ভ্রমরের অনুরূপ দুর্ব্বলতা মাত্র। গোবিন্দলাল ভ্রমরকে যেমন গঠিত করে ভ্রমর তেমনই ঠিক হইয়াছিল। গোবিন্দলাল রোহিণীর কথা গোপন রাখিয়া আপনার কর্ত্তব্যরক্ষা করে নাই, তজ্জন্য গোবিন্দলালই দোষী। ভ্রমরের গঠন-কর্ত্তার দোষে ভ্রমর সাজা পাইল। অতএব ভ্রমরের দোষ নিজস্ব নহে, আর বালিকা বধূ আদরের ভ্রমর বলিয়া তাহা মার্জ্জনীয়।

তবে ইহা সত্য যে, ভ্রমর সীতা সাবিত্রীর আদর্শে গঠিত নহে, ভারতীয়

সতীর উন্নত উপাদানে নির্ম্মিত নহে।' তাহার উপাদান তাহারই নিজস্ব। দোষে গুণে ভ্রমর ভ্রমরই। তবে সাধারণতঃ ভ্রমরের ঐ দুর্জ্জয় অভিমান অবশ্য অনুকরণ করিতে চাহি না। এরূপ দুর্জ্জয় অভিমানের কি ফল তাহা অবশ্য অমর কবি ভালরূপই দেখাইয়াছেন। তবে ঐ দুর্জ্জয় অভিমানকে হৃদয়ের কুবৃত্তি বলিতে পারি না। ইহা ভালবাসা হইতেই জাত, পতির ধর্ম্ম, অকলঙ্ক চরিত্র, সুযশ রক্ষার জন্যই অত তীব্র। ভ্রমরের সদর্প উক্তি "তুমি আমারই, রোহিণীর নহ। তুমি আবার আসিবে, আবার ভ্রমর বলিয়া ডাকিবে—আবার আমার জন্য কাঁদিবে, যদি একথা নিষ্ফল হয় তবে জানিও, দেবতা মিথ্যা, ধর্ম্ম মিথ্যা, ভ্রমর অসতী।" এমন করিয়া সতীর তেজ দেখাইতে, এমন আত্মনির্ভরতা, আত্মবিশ্বাস যে ভ্রমরে থাকিতে পারে, দুর্জ্জয় অভিমান দোষ হউক তাহাতেই সম্ভবে। সতীর এমত বল কোথায় দেখিতে পাওয়া যায়? বঙ্কিমবাবু আপনার সৃষ্টা নারীচরিত্রগুলির মধ্যে ভ্রমরকে সর্ব্বাপেক্ষা ভালবাসিতেন। কবির সহানুভূতি, ভোমরাই অধিক পাইয়াছিল —ইহা নিঃসন্দেহ।

শ্রীরামসহায় কাব্যতীর্থ।

পাদ্রী কেরী।

জানি না,—কি ভাগ্য যে সে দিন 'সাহিত্য পরিষদে' প্যারীচাঁদের জন্ম-দিনের শতবর্ষ পূর্ণ উপলক্ষে এক সভা হইয়া গিয়াছে! নহিলে, নবাঙ্কুর বঙ্গ গদ্যের যাঁহারা পথপ্রদর্শক, তাঁহাদের বড় একটা কেহই এ পরিষদে আজ পর্য্যন্ত 'কল্কে' পান নাই। মৃত্যুঞ্জয় এখানে অনাদৃত, উপেক্ষিত। অথচ, এই মৃত্যু-ঞ্জয়ের মত প্রতিভাশালী পণ্ডিত যদি অপোগণ্ড বঙ্গ গদ্য ভাষাকে "তুমি সমস্ত প্রাকৃত ভাষার মধ্যে উৎকৃষ্ট ভাষা" বলিয়া আদর করিয়া, গৌরব বাড়াইয়া, মুখ চুম্বন করিয়া, কোলে না লইতেন এবং ক্রমাগত শৈশবকাল কোলে পীঠে করিয়া মানুষ না করিতেন, তাহা হইলে আজি এই সাগর-তরঙ্গের তেজধারিণী, অক্ষয়ভূষণে ভূষিতা, হেম ভূষণে জড়িতা, বঙ্কিম-ভঙ্গিমা-শালিনী অপূর্ব্ব দেবী-মূর্ত্তি দর্শন করিয়া পবিত্র শ্রীচরণে ভক্তির পুষ্পাঞ্জলি প্রদান করিয়া আপনা-

দিগকে কৃতার্থ করিতে পারিতাম না।" হ্যালহেড্ ও কেরী, এই দুই সাহেবের উদ্দেশেও পরিষদ কখনও কিছু করে নাই। অথচ, এই বিদেশী মনীষীদ্বয় যদি 'অপোগণ্ড বঙ্গ গদ্যের লালনপালন ভার' স্বহস্তে গ্রহণ না করিতেন, তাহা হইলে, সাহিত্যক্ষেত্রে মৃত্যুঞ্জয়ের, ও 'আলালে'র আবির্ভাব হইত কি না সন্দেহ।

পরিষদের কথা দূরে থাকুক ;—দুঃখের কথা বলিব কি, যিনি 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্যে'র রচয়িতা, তিনিই কেরী সাহেবকে আদৌ আমল দেন নাই! "কয়েকখানি প্রাচীন বাঙ্গালা ব্যাকরণ" শীর্ষক এক প্রবন্ধে তিনি লিখিয়াছেন, —"হ্যালহেডের ব্যাকরণের পরে রাজা রামমোহন রায় এবং ভগবানচন্দ্র সেন বাঙ্গালা ব্যাকরণ প্রণয়ন করেন। সম্ভবতঃ ইঁহাদের পরে কীথ সাহেব ও ব্রজকিশোর গুপ্তের ব্যাকরণ প্রকাশিত হইয়াছিল।"—দীনেশবাবুর এই উক্তিতে কিন্তু একটা মস্ত ভুল রহিয়া গিয়াছে। হ্যালহেডের ব্যাকরণের পরে রাজা রামমোহন বা ভগবানচন্দ্র বাঙ্গালা ব্যাকরণ প্রণয়ন করেন নাই ;—যিনি করিয়াছিলেন, তাঁহার নাম—পাদ্রী কেরী। হ্যালহেড্ সাহেবের ব্যাকরণ ১৭৭৮ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত হইয়াছিল। ইহাই বঙ্গভাষার আদি ব্যাকরণ। তারপর ১৮০১ খৃষ্টাব্দে কেরী সাহেব "A Grammar of the Bengali Language" নাম দিয়া একখানি বাঙ্গালা ব্যাকরণ প্রণয়ন করেন। ইহাই বঙ্গভাষার দ্বিতীয় ব্যাকরণ। ইহার পর, ১৮৩০ খৃষ্টাব্দে রাজা রামমোহন রায়ের "গৌড়ীয় ব্যাকরণ" নামক বাঙ্গালা ব্যাকরণখানি সাহিত্য-বাজারে দেখা দিয়াছিল।

আসল কথা, কেরী সাহেবকে বাঙ্গালা দেশ ঠিক মত চিনে না। সাত সমুদ্র তেরো নদী পার হইয়া তিনি যে এ দেশে কেন আসিয়াছিলেন, এবং এ দেশে আসিয়া কি বা করিয়া গিয়াছেন, সে সংবাদ বঙ্গদেশের বোধ করি, শতকরা সাড়ে নিরনব্বই জন জানে না। এমন অবস্থায় পাঠক-সাধারণের সহিত কেরী সাহেবের পরিচয় সাধন করিয়া দেওয়া একান্ত কর্ত্তব্য বলিয়া বিবেচনা করি। বঙ্গদেশ তাঁহার নিকট অশেষ ঋণে ঋণী। সে ঋণ যে কিসের —সে কথাও এই অবসরে বলিয়া যাইব স্থির করিয়াছি।

বহুবাজার হইতে লালবাজার যাইবার পথে—উহার প্রায় মাঝামাঝি স্থানের দক্ষিণাংশে যে একটি অতি প্রাচীন গৃহ আছে, এবং এই গৃহের সম্মুখেই যে তৃণশষ্প শোভিত এক অতি ক্ষুদ্র বাগান আছে,—তাহা আপনারা কেহ কি লক্ষ্য করিয়া দেখিয়াছেন ? যদি না দেখিয়া থাকেন; তবে একবার ভাল করিয়া

দেখিবেন। তাহা হইলে দেখিতে পাইবেন যে, সেই গৃহের ফটকে একটি প্রস্তর ফলক আঁটা আছে; এবং সেই ফলকে লেখা আছে—"কেরীর বাপ্‌টিষ্ট চেপল, ১৮০৯ খৃষ্টাব্দে নির্ম্মিত।" শতাধিক বর্ষ পূর্ব্বেকার এই ইষ্টক নির্ম্মিত চেপলটি কলিকাতার রাজপথে কেরী সাহেবের স্মৃতিচিহ্ন স্বরূপ বিরাজ করিতেছে। ইহা ছাড়া, কলিকাতায় তাঁহার আর কোনও স্মৃতিচিহ্ন দেখিতে পাওয়া যায় না। শুনিতে পাওয়া যায়, পাদ্রী কেরী যে সময়ে কলিকাতায় পদার্পণ করেন, সে সময়ে এই লালবাজার অতি কদর্য্য স্থান ছিল। বিদেশী বদ্‌মায়েসদের ইহা একটি আড্ডা স্থান বলিয়া বিখ্যাত ছিল। লালবাজারে তখন সরাপের দোকান ছাড়া অন্য কোনও কিছুর দোকান বড় একটা দেখিতে পাওয়া যাইত না। মগ, পর্ত্তুগীজ, কাফ্রী, মেটে ফিরিঙ্গী প্রভৃতি নানা জাতের গুণ্ডা সে সময়ে এখানে মদ খাইয়া নিরীহ পথিকদের উপর বিষম অত্যাচার করিত—মারিয়া-ধরিয়া টাকাকড়ি কাড়িয়া লইত। কথিত আছে, এই সকল ধর্ম্ম-জ্ঞান-বিবর্জ্জিত পশু-প্রকৃতির খ্রীষ্টানদের মধ্যে খ্রীষ্টীয় ধর্ম্মভাব জন্মাইবার জন্যই কেরী সাহেব লালবাজারে, ১৮০৯ খৃষ্টাব্দে এই 'চেপল' বা গির্জ্জা নির্ম্মাণ করেন।

১৭৬১ খৃষ্টাব্দের ১৭ই আগষ্ট তারিখে, বিলাতের নর্দাম্‌টন্‌ সহরের নিকট-বর্ত্তী পলার্স পিউরি নামক এক গণ্ডগ্রামে, এক তন্তুবায়ের বংশে উইলিয়ম কেরী জন্মগ্রহণ করেন। বাল্যকাল হইতেই তাঁহার বিদ্যানুরাগ ও ধর্ম্মানুরাগ খুব প্রবল ছিল। তিনি গোঁড়া খ্রীষ্টান ছিলেন। তাঁহার ধারণা ছিল যে, পৃথিবীতে যাঁহারা খ্রীষ্টান ধর্ম্মাবলম্বী নহেন, তাঁহারা নিতান্ত অভাগা; শুধু অভাগা নহে,—অসভ্য ও বর্ব্বর।

আটাশ বৎসর বয়সে কেরী ধর্ম্মযাজকের পদপ্রাপ্ত হন। ইহার কিছুকাল পরে, বিলাতে একটা প্রস্তাব উঠে যে, পৃথিবীর যেখানে যেখানে 'হিথেন' অর্থাৎ পৌত্তলিক আছে, সেই সকল স্থানে তাহাদিগকে খ্রীষ্টান ধর্ম্মে দীক্ষিত করিবার জন্য বিলাত হইতে খ্রীষ্টান মিশনরী প্রেরিত হউক। এই প্রস্তাব অনুযায়ী, কেটারীং সহরের ব্যাপ্টিষ্ট মিশনারী-সমিতি, ১৭৯৩ খৃষ্টাব্দের ১৩ই জুন তারিখে, উইলিয়ম কেরী এবং জন্ টমাস নামক একজন ডাক্তার পাদ্রীকে ভারতবর্ষে পাঠাইয়া দেন। কেরী যখন ভারতবর্ষে আসেন, তখন তাঁহার বয়ঃক্রম বত্রিশ বৎসরের বেশী হইবে না। তিনি ১৭৯৩ খৃষ্টাব্দের ১১ই নভেম্বর তারিখে কলিকাতায় আসিয়া পদার্পণ করেন।

কেরীর পূর্ব্বে যে এদেশে কখনও কোনও মিশনারী আসেন নাই, এমন

নহে। লর্ড ক্লাইভ স্বয়ং একজন সুইডেন দেশীয় পাদ্রীকে এখানে আনাইয়াছিলেন। সে পাদ্রীর নাম—কিরাণাণ্ডার। এই কিরাণাণ্ডার ব্যতীত আরও এক-আধজন পাদ্রী বঙ্গদেশে কেরীর পূর্ব্বে আগমন করিয়াছিলেন। কিন্তু ইহাদের কেহই এদেশে আসিয়া খ্রীষ্টীয় ধর্ম্ম-প্রচার-কার্য্যে একটুও সফলতা লাভ করিতে পারেন নাই। না পারিবার অবশ্য একটু কারণ ছিল। কারণ এই যে, সে সময়ে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী নিজেই এ কার্য্যের ঘোর প্রতিবন্ধকস্বরূপ ছিলেন।

এ দিকে কেরীও কলিকাতায় আসিয়া বিষম বিপদে পড়িলেন; সে সময়ে কেহই এখানে তাঁহার বন্ধু ছিলেন না। কেহই তখন তাঁহাকে সাহায্য করিতে অগ্রসর হন নাই। তিনি আসিয়া দেখিলেন যে, লর্ড কর্ণওয়ালিস এখানে নাই —বিলাত চলিয়া গিয়াছেন। তাঁহার স্থানে স্যর জন্ সোর গবর্ণর জেনারেল হইয়া বসিয়াছেন। স্যর জন্ সোর কিছু কড়া মেজাজের লোক ছিলেন। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর বাঁধাবাঁধি আইন ছাড়িয়া তিনি একপদও এদিক ওদিক অগ্রসর হইতে চাহিতেন না। কোম্পানীও পাদ্রীদের সম্বন্ধে বিশেষ কড়া আইন গড়িয়াছিল। কাজেই কেরীর পক্ষে গবর্ণরের নিকট হইতে সাহায্য পাওয়া একরূপ অসম্ভব ব্যাপার হইয়া দাঁড়াইল। অবশেষে কেরী ভয়ঙ্কর অর্থকষ্টে পড়িলেন। দারিদ্র্য আসিয়া তাঁহাকে ঘিরিয়া দাঁড়াইল। এই সময়ে তিনি বাগবাজারের বিখ্যাত কবিওয়ালা রামবসুকে শিক্ষক রাখিয়া তাঁহার নিকট বাঙ্গালা ভাষা শিখিতে আরম্ভ করেন। কিন্তু দারুণ অর্থকষ্টের দরুণ তাঁহার পক্ষে কলিকাতায় বাস করা ক্রমে দুরূহ হইয়া উঠিল। অনন্যোপায় হইয়া তিনি স্থির করিলেন যে টমাস সহ সপরিবারে ব্যাণ্ডেলে গিয়া থাকিবেন। কলিকাতার চেয়ে ব্যাণ্ডেলের খরচ তখন খুব কম ছিল। তিনি সেখানে একটি ছোট বাড়ী ভাড়া লইয়া টমাসের সহিত বাস করিতে লাগিলেন। কিন্তু এখানে বেশী দিন তাঁহার ভাল লাগিল না। নদীয়ায় গিয়া বাস করিতে তাঁহার ইচ্ছা হইল। নদীয়া তখন হিন্দু শাস্ত্র শিক্ষার কেন্দ্রস্থল। এই নদীয়ায় বাস করিয়া নদীয়ার পণ্ডিতগণের নিকট হিন্দু শাস্ত্রাদির মর্ম্ম বুঝিয়া হিন্দু ধর্ম্মকে আক্রমণ করিবে—ইহাই কেরীর তখন সাধ হইল। কিন্তু কেরীর মনের সাধ মনেই চাপা রহিল—নদীয়ায় বাস করিবার মত জায়গা তাঁহার ভাগ্যে জুটিল না। এমন সময় কেরী সাহেব শুনিলেন, কলিকাতার আশে-পাশে বিস্তর পতিত জমী বিলি হইতেছে। এই কথা শুনিবামাত্র কেরী সাহেবের সাধ হইল যে, কলিকাতায়

আসিয়া পতিত জমি জমা রাখিয়া আবাদ করিব। কিন্তু সে সাধও তাঁহার পূর্ণ হইল না। লাভের মধ্যে কলিকাতায় আসিয়া তিনি পুনর্ব্বার বিষম দারিদ্র্য কষ্টে পড়িলেন।

এই সময়ে কেরীর বাঙ্গালা শিক্ষক রামবসু কেরী সাহেবকে বিশেষরূপে সাহায্য করিয়াছিলেন। নেলু দত্ত নামক এক ধনী বাঙ্গালীর নিকট হইতে কিছু অর্থ চাহিয়া তিনি তাহা পাদ্রী সাহেবকে প্রদান করেন এবং তাঁহাকে ঐ অর্থ লইয়া সুন্দরবনে চাষ করিতে পরামর্শ দেন। এই পরামর্শ অনুযায়ী কেরী সপরিবারে নৌকাযোগে সুন্দরবনের দিকে যাত্রা করেন। কলিকাতার দক্ষিণ পূর্ব্বে ধাপাজলার পার্শ্বস্থ 'বিদ্যাধরী' নদী দিয়া তখন সুন্দরবনে যাইবার পথ ছিল। কেরী হোসেনাবাদের লবণ কুঠিয়াল সাহেবের আশ্রয়ে থাকিয়া কৃষি-কার্য্য করিবেন স্থির করিয়াছিলেন। হোসেনাবাদ টাকীর নিকট ইচ্ছামতী নদীতীরে অবস্থিত। এ স্থানটি ঠিক সুন্দরবন নহে,—ইহার আরও দক্ষিণ হইতে সুন্দরবন আরম্ভ হইয়াছে। কেরীর সহকারী উইলিয়াম ওয়ার্ড লিখিয়া গিয়াছেন যে, হোসেনাবাদের কুঠিয়াল সাহেবের আশ্রয়ে কেরী চাষ করিতে গিয়াছিলেন। এই স্থানে বাঙ্গালা ভাষায় তিনি বিশেষ ব্যুৎপন্ন হন। এই স্থানে প্রায় প্রত্যহই তিনি বাঙ্গালায় বক্তৃতা করিয়া বাঙ্গালী হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে খৃষ্টান ধর্ম্ম প্রচার করিতেন।

হোসেনাবাদে থাকিয়াও কেরী সাহেব বিশেষ কিছু সুবিধা করিতে পারিলেন না। উড্নি সাহেব সেই সময়ে মালদহে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর 'কমার্শাল এজেণ্ট' ছিলেন। মালদহে তাঁহার নীলকুঠি ছিল। ১৭৯৪ খৃষ্টাব্দে কেরী ও টমাস দুইজনে বার্ষিক আড়াই হাজার টাকা বেতনে উডনি সাহেবের সহকারী কর্ম্মচারীরূপে নিযুক্ত হন। মালদহে ও দিনাজপুরে নীলের কাজে তাঁহারা নিযুক্ত হইয়া কাজ করিতে লাগিলেন বটে, কিন্তু সেখানকার জলবায়ু তাঁহাদের একটুও সহ্য হইল না। ম্যালেরিয়া জ্বর তাঁহাদিগকে মালদহ হইতে বিতাড়িত করিল। ইহার পর অল্পদিনের জন্য কলিকাতায় থাকিয়া কেরী ১৮০০ খৃষ্টাব্দের প্রথমেই শ্রীরামপুরে গিয়া বাস করিতে আরম্ভ করেন। দিনাজপুরে অবস্থান কালে কেরী সাহেব সংস্কৃত ভাষায় জ্ঞানলাভ করিয়াছিলেন। ১৭৯৮ খৃষ্টাব্দের প্রথম হইতেই তিনি একখানি ইংরেজী, সংস্কৃত ও বাঙ্গালা অভিধান প্রণয়ন করিতে প্রবৃত্ত হন। ১৭৯৮ খৃষ্টাব্দে কেরী সাহেব বাইবেলের একটি গল্পের বঙ্গানুবাদ করেন। এইটিই তাঁহার প্রথম বাঙ্গালা রচনা।

[আগামীবারে সমাপ্য।]

শ্রীঅমরেন্দ্রনাথ রায়।

হাতী-জোবড়ার লাঠি।



হাতী-জোবড়ার লাঠি! পদার্থটা মনোরম না হইলেও এখন বিশেষ মূল্যবান। অপর লাঠির মত এই লগুড়-রত্ন আকারে তেমন সুদর্শন নহে—বরং ইহার আকৃতি একেবারে জঙ্গলী। যে পৃষ্ঠে একবার ইহার চুম্বন-রস আস্বাদন করিয়াছে সে ইহাকে নিশ্চয় ঘৃণা করে। আমি কিন্তু অতি সযতনে হাতী-জোবড়ার লাঠিটি নিজ গৃহে রাখিয়া দিয়াছি—মধুর স্মৃতি না হইলেও স্মৃতির জন্য। আমাকে সে যে শিক্ষা দিয়াছে তাহাতে মনে হয় যে, যদি আর্য্যদের জন্মান্তরবাদের মূলে সত্য নিহিত থাকে, যদি প্রফেসার জে, সি, বসু মহাশয়ের বৈজ্ঞানিক গবেষণা "ভানুমতীর খেল" না হইয়া সত্যমূলক হয়, যদি উদ্ভিদের আত্মা থাকে তাহা হইলে পরজন্মে হাতী-জোবড়ার লাঠি নিশ্চয় সৌখীন ছড়ি-জন্ম লাভ করিবে, এমন কি সাফ্রেগেট সুন্দরীদের যষ্টি অস্ত্রে পরিণত হইবারও ইহার সম্ভাবনা আছে।

হাতী-জোবড়া এমন কিছু রহস্যময় পদার্থ নহে। ইহা একটি স্বল্পতোয়া গিরিনদী। ঘাটশিলার সন্নিকটে পাহাড়কাটা নামক শৈলে জন্মলাভ করিয়া ঘুরিয়া ফিরিয়া বক্রগতিতে অনেক শালবনের পদ ধৌত করিয়া হাতী-জোবড়া সুবর্ণরেখায় পড়িয়াছে। পথে একবার এক পাহাড়ের ধারে আসিয়া সমস্ত নদীটি একেবারে প্রায় পনের ফুট নিচু পাহাড়ের উপর উল্টাইয়া পড়িয়াছে। আবার সে স্থল হইতে নিম্নের অপর শৈলখণ্ডে পড়িয়াছে। এইরূপে বার কতক আছাড়াইয়া আবার পাথরের উপর দিয়া বহিয়া সুবর্ণরেখায় অদৃশ্য হইয়াছে।

যেখানে হাতী-জোবড়া বিষম শব্দ করিয়া ঐরূপে ঝরিয়া পড়িতেছে সেই ঝরণায় আমি এই লগুড়ের প্রথম সাক্ষাৎ পাই মনোহরের হস্তে। ঘাটশিলায় সুরেশবাবুর অতিথি হইয়াছিলাম। তাঁহার বাসায় অপরিচিত যুবক মনোহর বাবু আশ্রয় লইয়াছিলেন। মনোহর গম্ভীর, উদাসীন, চিন্তাশীল; আত্মপরিচয় দিতে মোটেই সম্মত ছিল না। আমরা তিন দিনের ছুটিতে ভ্রমণ করিতে গিয়াছিলাম, অপরিচিতের উপস্থিতি একেবারে অসহ্য বোধ হইতেছিল। তাহাকে বিরক্ত করিবার জন্য তাহার নাম ভুলিয়া গিয়াছি এইরূপ ভাণ করিয়া তাহাকে জগজ্জ্যোতি, করুণাপ্রসাদ, বিরিঞ্চিপদ প্রভৃতি নানা প্রকার নামে ডাকিতে-

ছিলাম। তিনি প্রত্যেক বার গম্ভীরভাবে আমাদিগকে শুধ্‌রাইয়া দিয়া বলিতে-ছিলেন—'আজ্ঞে আমার নাম মনোহর।'

আমার এখন মনে হয় যে, হাতী-জোবড়ার জলপ্রপাত দেখিতে দেখিতে আমাদের ধর্ম্মচিন্তা করা উচিত ছিল। সে মনোরম স্থলে কিন্তু আমাদের বালস্বভাব ফিরিয়া আসিয়াছিল। কেহ লাফাইতেছিল, কেহ বিকট শব্দ করিয়া গান গাহিতেছিল, কেহ ঝরণার জলে স্নান করিতেছিল। কেবল এক-দিকে একখানা পাথরের উপর অর্দ্ধশায়িত অবস্থায় মনোহর চিন্তা করিতেছিল।

কিরূপে কথাটা উঠিল তাহা বলিতে পারি না। কিন্তু আমার বেশ স্মরণ আছে যে, প্রিয়দাস প্রথমে বলিল—"ভাই কে কত রকম মজা করেছ বল, শুনি।" তাহার পর কে কত রকম অনিষ্ট করিয়াছে সকলে তাহার তালিকা দিতে আরম্ভ করিল। ললিত একজনকে রজ্জুকে সর্পবোধ করাইয়া আনন্দ উপভোগ করিয়াছিল। শরৎ একবার বরযাত্রায় বিদেশ গিয়াছিল। তথায় ক্লান্ত হইয়া একস্থলে শুইয়া পড়িয়াছিল। মধ্য রাত্রিতে একটা লোক তাহাকে ধাক্কা দিয়া তুলিয়া বলিল—"তোর এত বড় স্পর্দ্ধা তুই আমার দাদার পায়ের কাছে নিদ্রা যাস্?"

শরৎ কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া বলিল—অপরাধ হ'য়েছে।

লোকটা বলিল—জানিস আমার দাদা কে? রামগতি চাটুয্যে।

শরৎ বলিল—ওঃ! রামগতি চাটুয্যে মশায়? বড় সৌভাগ্য তাঁর সাক্ষাৎ পেলাম।

রামগতির লক্ষ্মণ ভ্রাতা বলিল—জানিস্ বাঙ্গালা দেশে দাদার মত কেহ বেহালা বাজাতে পারে না?

শরৎ বলিল—বিলক্ষণ জানি। তবে যদি দয়া করে একটু শুনান।

সন্তুষ্ট হইয়া তখন ছোট ভাই একখানা জীর্ণ বেহালা বাহির করিল। রাম-গতি নীলকমলের মত ম্যাঁও ম্যাও করিতে লাগিল। ভ্রাতা একটা ডুগী লইয়া তাল দিতে আরম্ভ করিল—বিষম বাদ্য। শরৎ বলিল—"একটা গান হ'লে হয় না?"

কনিষ্ঠ ভ্রাতা তখন রাসভ-স্বরে গান ধরিল—

যমুনা পুলিনে ব'সে কাঁদে রাধা বিনোদিনী
বিনে সেই রাকাশশী বাঁকাশ্যাম গুণমণি

গান "গুণো" পার হইয়া আর অগ্রসর হইল না। অশেষ প্রকার মুখভঙ্গি করিয়া

নানা সুরে রামগতির প্রাণের ভাই 'গুণো' 'ও গুণো' 'গুণো' বলিয়া কালোয়াতির টান মারিতে লাগিল। সুবিধা পাইয়া শরৎ নিদ্রাদেবীর আরাধনা করিল। প্রভাতে নিদ্রাভঙ্গ হইলে দেখিল যে গায়ক তখনও 'গুণো' 'ও গুণো' 'গুণো' বলিয়া চীৎকার করিতেছে।

বন্ধুর গল্পে সকলে প্রাণ ভরিয়া হাসিল। এবার আমার পালা আসিল। আমি বলিলাম—আমি সম্প্রতি যে একটা মজা ক'রে এসেছি ভগবান জানেন তার কি ফল হয়েছে।

সকলে আমার গল্প শুনিতে ব্যস্ত হইল। আমি কাঁচি মার্কা চুরুটে টান দিয়া আমার কাহিনী আরম্ভ করিলাম।

(২)

"ছুটি লইবার ঠিক অব্যবহিত পূর্ব্বে আমি নয়াদুমকার পোষ্ট মাষ্টার ছিলাম। নয়াদুমকা ঠিক এই প্রকার পাণ্ডববর্জ্জিত দেশ—ভাল সঙ্গী পাইবার উপায় নাই। ঠিক এই রকম চারিদিকে পাহাড়, মাঝে মাঝে সাঁওতালদের বাস, গরুর গলায় কাঠের ঘণ্টা, রাখাল বালকদের হাতে তীর ধনুক। বন্ধুর মধ্যে একটি সহকারী কেরাণী।

"অজিতবাবু নয়াদুমকার সিনিয়ার ডেপুটি। বড় কড়া হাকিম। একদিন অজিতবাবুর চাপরাসী রামপদারত আসিয়া আমার সহকারী গোবিন্দের হস্তে একখানি বেশ মোটা পত্র দিয়া বলিল—"মাষ্টার বাবুহো একরামে কেত্তেকা টিকিট লাগাতই ?"

গোবিন্দ বলিল—"চার পয়সা।"

'চারগো পয়সা! বহুৎ লিখ্‌লেই।'

"রামপদারত চলিয়া গেলে আমাদের কেমন কৌতূহল হইল। চায়ের জন্য জল গরম হইতেছিল। তাহার বাষ্পে ধরিয়া চিঠিখানা খুলিলাম।"

শ্রোতাদিগের উপর গল্পের কি রকম ফল হইল তাহা জানিবার জন্য একবার চতুর্দ্দিকে চাহিলাম। দেখিলাম গুণোর গল্পের অপেক্ষা আমার গল্প জমিয়াছে, কারণ স্বয়ং মনোহর নিবিষ্টচিত্তে আমার গল্প শুনিতেছিল।

আমি বলিলাম—মনোমোহন বাবু, এবার—

মনোহর বাবু এক গাছা শাল গাছের গড়ানে ভর দিয়া একটু উঠিয়া বসিয়াছিলেন। আমার কথায় বাধা দিয়া তিনি বলিলেন—আমার নাম মনোহর।

সকলে হাসিল। আমি বলিলাম—ক্ষমা করবেন। মনোহর বাবু এবার আপনার পালা।

তিনি কিছু বলিলেন না। আশু শীর্ণ বলিল—রসভঙ্গ করিস্ কেন? চিঠি খুলে কি দেখ্‌লি?

আমি বলিলাম—"অজিত ডেপুটির পত্র খুলিয়া বড় মজার সংবাদ পাইলাম। তাঁহার পুত্র কলিকাতায় থাকিত। এম্-এ পাশ করিয়া ডেপুটি হইবার চেষ্টা করিতেছিল। বুঝিলাম পিতার অনুরোধ সত্ত্বেও তাঁহার পুত্র বিবাহে অসম্মত হইয়াছিল। অজিতবাবু সংবাদ পাইয়াছিলেন যে, পুত্র একটি আত্মীয়ার শিক্ষিতা কন্যাকে বিবাহ করিবার জন্য উন্মত্ত হইয়াছে। তিনি পত্রে যাহা লিখিয়াছিলেন আমার স্মরণ আছে। তিনি লিখিয়াছিলেন—"বিষ্ণুবাবুর পত্রে জানিলাম তুমি মণীন্দ্রবাবুর কন্যার পাণিগ্রহণ করিবার জন্য উন্মত্ত হইয়াছ। পাশ্চাত্য দেশে শিক্ষিত লোকে আপনার পছন্দমত জীবনসঙ্গিনী বাছিয়া লয়। তাহার পর তাহারা কিন্তু পিতার গলগ্রহ হইয়া থাকে না। স্বামী স্ত্রী নূতন সংসার পাতিয়া নূতন গৃহে বাস করে।"

আমি মুখভঙ্গি করিয়া অজিতবাবুর পত্রের আবৃত্তি করিতেছিলাম। দেবেন্দ্র দাস বলিল—"তুই পোষ্ট মাষ্টার না হ'য়ে থিয়েটারে ঢুকিস্‌নি কেন?"

বন্ধুরা হাসিল। আমি আবার গল্প বলিতে আরম্ভ করিলাম।

"তাহার পর অজিতবাবু ইংরাজি সমাজের কতকটা চিত্র দিয়া লিখিয়াছিলেন—'আমাদের সমাজ ইংরাজ সমাজ নহে। ইংরাজ আপনার স্বত্ব আদায়ের জন্য উন্মত্ত, আমরা সারাজীবন কর্ত্তব্য-সাধনে প্রবৃত্ত। আমাদের প্রথম কর্ত্তব্য পিতামাতার আজ্ঞাপালন। কতবার আমরা তোমায় বিবাহ করিতে বলিয়াছি। তুমি সে আজ্ঞা পালন কর নাই। তুমি বলিয়াছ, কাজকর্ম্ম জুটিলে বিবাহ করিবে। কিন্তু তুমি যে পিতার সহিত ছলনা করিতেছ, পিতার সহিত প্রবঞ্চনা করিতেছ, তাহা বুঝিতে পারি নাই। তুমি স্বয়ং বিবাহের চেষ্টা করিতেছ, মণীন্দ্রের ষোড়শী কন্যাকে দেখিতেছ, তাহাকে বিবাহ করিবার বন্দোবস্ত করিতেছ। যদি এ কথা সত্য হয় তাহা হইলে বিশেষ লজ্জার কথা। বুঝিব এম্-এ পাশ করিয়াও তুমি মূর্খ হইয়াছ।" এইরূপ ভর্ৎসনা করিয়া হিন্দু সমাজের আদর্শ বর্ণনা করিয়া, পিতৃভক্তি-সম্বন্ধে শাস্ত্রে কি বলিয়াছে তাহা বুঝাইয়া তিনি পুত্রকে লিখিয়াছিলেন—"যদি একথা সত্য হয় তাহা হইলে হিন্দু-পরিবারে তোমার স্থান নাই। আজ হইতে তোমার নিজের ব্যয় নিজে বহন করিবে।"

মনোহর বেশ মনোযোগ দিয়া আমার গল্প শুনিতেছিল। আমি পত্রখানি

আবার বন্ধ করিয়া কলিকাতায় পাঠাইয়া দিয়াছিলাম, বন্ধুদিগকে বলিলাম। তাহারা পত্রের উত্তর শুনিবার জন্য ব্যস্ত হইয়া উঠিল। আমি পত্রের উত্তরটিও বাষ্প-সাহায্যে খুলিয়াছিলাম। মনোহর সে শালবৃক্ষের রলাট লইয়া আমার পার্শ্বে আসিয়া বসিল।

(৩)

আমি বলিলাম—"পত্রের উত্তর বড় সংক্ষিপ্ত। উত্তরে অজিতবাবুর পুত্র লিখিয়াছিল—"হিন্দুসন্তানের কর্ত্তব্য-সম্বন্ধে আপনার সহিত আমার মতানৈক্য নাই। তবে বিবাহ-সম্বন্ধে পূর্ব্বে যাহা বলিয়াছি এখনও তাহা বলিতেছি। কাজকর্ম্ম না করিয়া বিবাহ করিলে আপনার ব্যয়বৃদ্ধি হইবে। মণীন্দ্রবাবুর কন্যা-সম্বন্ধে যাহা লিখিয়াছেন তাহা সমস্তই ভুল। একদিন তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে গিয়াছিলাম। কন্যাটি পিতার নিকট আসিয়াছিল। পরে বিষ্ণুবাবু জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, মেয়েটি কেমন। বাস্তবিক মণীন্দ্রবাবুর কন্যা সুন্দরী। আমি তাই বলিয়াছিলাম—মেয়েটি বেশ সুন্দরী। এ কথা লইয়া কেহ যদি আপনাকে একটা মিথ্যা গল্প লিখিয়া থাকে, জানিবেন আমি সম্পূর্ণ নির্দ্দোষ। আমি বিবাহের কোন চেষ্টাই করি নাই, তবে সুন্দরীকে সুন্দরী বলিয়াছি মাত্র। এ বিষয়ে হিন্দুশাস্ত্র আমার পক্ষে।"

পত্রের উত্তর শুনিয়া বন্ধুরা হাসিল। সুরেশচন্দ্র বলিল—ছেলেটা তো খুব জ্যেঠা।

আমি বলিলাম—না, জ্যেঠা বল্‌তে পারিনি। দেখ্‌ছ না সুরটা অভিমানের।

ললিত বলিল—বুঝ্‌ছ না ব্যাপারটা কি? মণীন্দ্রবাবু কায়দা ক'রে মেয়েটাকে দেখিয়েছে! তারপর ছেলেটা তাকে সুন্দরী বলেছে সেই জোরে একটু রঙ্‌চঙ্‌ দিয়ে অজিতবাবুকে চিঠি লিখিয়েছে। ঐ বিষ্ণু বেটা দালাল।

সকলে হাসিলাম। প্রিয়দাস বলিল—ও আজকালকার একটা চাল। ভেবেছে বাপ চট্‌ করে রাজি হ'য়ে যাবে। কিন্তু এক্ষেত্রে বাপ যে হিরণ্যকশিপু তা বোঝেনি।

সকলে হাসিল। আশু শীল বলিল—এখন গবেষণা থাক্‌। তার পর কি হ'ল বল্‌। মজা কোথা?

আমি বলিলাম—এইবার মজা আস্‌ছে। আমাদের মধ্যেও গবেষণা আরম্ভ হ'ল। গোবিন্দ বল্‌লে যে ছেলেটার বিয়ে কর্‌তে মত আছে। আমিও দেখ্‌লাম, মেয়েটা সুন্দরী, অন্ততঃ ছেলেটা নিজের মুখে সে কথা স্বীকার করেছে।

মণীন্দ্রবাবুও ওদের নিশ্চয় পুরাণো কুটুম্ব। আর ছেলেটা ওখানে বিয়ে করতে যেন একটু ঝুঁকেছে।

বন্ধুরা হাসিয়া উঠিল। মনোহর শালের লাঠি লইয়া ঝরণার জলে ছোট ছোট পাথর ফেলিতেছিল।

আমি বলিলাম—যখন ওরকম সিদ্ধান্ত হ'ল তখন একটু পরোপকার কর্‌বার বাসনা হ'ল। গোবিন্দের সঙ্গে পরামর্শ ক'রে একখানা জবাব খসরা ক'রে ফেলা গেল।

গোঁ করিয়া একটা শব্দ হইল। শুনিয়াছিলাম হাতী-জোবড়ার ঝরণায় বাঘ জলপান করিতে আসে। সকলে চমকিত হইলাম। পরে দেখিলাম পালিত ভায়া নাক ডাকাইতেছেন। ভীষ্মদেব যেমন ইচ্ছা-মৃত্যুর বর পাইয়াছিলেন, পালিত ভায়া তেমনি বসিয়া বসিয়া ইচ্ছা-নিদ্রার কৌশল করায়ত্ত করিয়াছিলেন।

হাসির রোল থামিল, ব্যাঘ্র-ভীতি তিরোহিত হইল। আমি আবার গল্প আরম্ভ করিলাম—জবাবটা খসরা ক'রে ফেললাম। লিখ্‌লাম—"শ্রীচরণেষু—আপনার পত্র পাইয়া মর্ম্মাহত হইলাম। কোন্ সন্তান না অপরাধ করে? তবে আপনার আশীর্ব্বাদে যখন একটু শিক্ষালাভ করেছি তখন কর্ত্তব্যও পালন করিব। আপনি যখন অসম্মত তখন নিশ্চয়ই জীবনে বিবাহ করিব না। চির-কুমার থাকিব। জগতকে দেখাইব হিন্দুসন্তান ইংরাজী শিক্ষা পাইয়াও মনের সুকোমল বৃত্তি নষ্ট করিয়া, পিতৃভক্ত হইতে পারে। অপরাধ গ্রহণ করিবেন না, এ বিষয় লিখিতে লজ্জা করে বলিয়া অপরের হাতের লেখা পত্র দিলাম।"

সকলে খসরার অনুমোদন করিল। আমি বলিলাম—দাঁড়াও, আরও মজা আছে। "মনের সুকোমল বৃত্তি নষ্ট করিয়া" ঐ লাইনটা লিখে আবার কেটে দিয়েছি। অর্থাৎ বাপ বুঝবে যে ছেলে বিনয় দেখিয়েছে অথচ বিয়েটা না দিলে কষ্ট পাবে। এতেও যদি মণীন্দ্রবাবুর মেয়ের বিবাহ না হয় তো প্রজাপতির নির্ব্বন্ধ।

(৪)

বন্ধুরা বলিল—অজিতবাবু কি জবাব দিলেন?

আমি বলিলাম—জানি না। তার পরদিনই ছুটি নিয়ে চলে—

মুখের কথা মুখে রহিল। টাই! শালের রলা পৃষ্ঠে পড়িল। রুদ্রমূর্ত্তি মনোহর বলিল—পাজি, বদ্‌মায়েস, রাস্কেল।

টাই! আবার এক ঘা। বন্ধুরা 'কি কর!' 'কি কর' বলিয়া ধরিতে গেল।

আবার টাই ! তিন নম্বর,এবার হাতী-জোবড়ার লাঠি বেশ পায়ের গাঁটের উপর পড়িল। বন্ধুরা তাহাকে বাগাইয়া ধরিবার পূর্ব্বে লগুড়-রত্ন আর একবার পৃষ্ঠ চুম্বন করিল।

মনোহর ক্রোধে ফুলিতেছিল। সে বলিল—বদ্‌মায়েস, জান কি উত্তর পেয়েছি ?

সকলে বিস্ময়ে তাহার দিকে চাহিলাম। সে বলিল—অজিতবাবু আমার পিতা। তিনি জাল চিঠি পেয়ে উত্তরে লিখেছিলেন—"হতভাগ্য, অদ্যাবধি জানিব আমি নিঃসন্তান। তুমি আমার নিকট আর মুখ দেখাইও না।"

একে লগুড়াঘাত তাহার উপর এই সংবাদ। উঃ ! বাস্তবিকই হিরণ্যকশিপু।

মনোহর বলিল—কে জান্‌ত এর ভেতর এত কথা আছে। কি কষ্ট পেয়েছি জানেন ? বাড়ি ছেড়ে তিন সপ্তাহ ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্চি। কতবার আত্মহত্যা কর্‌তে গেছি। বাবা টের পেলে আপনাকে জেল খাটাতে পারেন।

সে বিষয়ে আমার কিছুমাত্র সন্দেহ ছিল না। সে পিতার নিকট আমার নাম গোপন করিয়া মিটাইয়া লইবে বলিল। আমি আশু শীলের কাঁধে ভর দিয়া বলিলাম—মশায় পায়ে ধ'রে ক্ষমা চাচ্চি। কিন্তু একটি প্রার্থনা আছে।

মনোহর বিস্ময়ে আমার মুখের দিকে চাহিল। আমি বলিলাম—লাঠি গাছটা দিন। ও আমার শিক্ষাগুরু। জীবনে এমন মজা আর কর্‌ব না।

শ্রীকেশবচন্দ্র গুপ্ত।

সাহিত্য-সমাচার।

শান্তি।—১ম বর্ষ, ৩য় সংখ্যা। ইহা একখানি 'কী-মতো-কোনো'—সম্প্রদায়ভুক্ত নব প্রকাশিত মাসিক। খাড়া, বড়ি, থোড়—যাহা প্রায় সকল মাসিকের প্রাণ, ইহাও তাহাতে অনুপ্রাণিত, কারণ ইহাতে কবিতা আছে, গল্প আছে, প্রবন্ধ আছে, সমালোচনা আছে। এই সংখ্যায় প্রথমেই 'গান' শীর্ষক কবিতা, ভাব অতি জীর্ণ ও পুরাতন। 'কবিত্ব ও দার্শনিকতা'—প্রবন্ধটী উপভোগ্য। 'স্মারক-লিপি'—পণপ্রথা ও বাল্যবিবাহের বিপক্ষে যাহা এতদিন নানা সংবাদপত্র ও মাসিকপত্রে আলোচনা হইতেছিল, সেই চর্ব্বিত-চর্ব্বণ-সমন্বিত উচ্ছ্বাস। 'বিবেচক' গল্পের 'বিরেচক' নামকরণ করিলে সুপ্রযুক্ত হইত। 'গাভীহারা'—(গাথা) লেখক সহজ সরল গ্রাম্য ভাষায় এই কবিতাটী রচনা করিয়াছেন। পাঠ করিলে মনে হয় না যে এই লেখকেরই অন্যান্য এমন অনেক কবিতা আছে যাহার ভাব গ্রহণ করিতে 'হেঁচ্‌কি' উঠে। 'অংশীদার' বিদেশী গল্প। ঘটনা অস্বাভাবিকতা-দোষ-দুষ্ট, বিশেষতঃ এদেশে ভাল জমে নাই। 'বিদায়'—কবিতা, 'তীরের' সহিত 'ধরে'র মিল ঠিক হয় না। 'ন্যাংটা বাবা'—'শ্রী'হীন যোগীন্দ্রনাথ কুণ্ডু-লিখিত। বেশ হইয়াছে। রসহীন ছ্যাবলামিপূর্ণ 'একখানি পত্র' সম্পাদকদ্বয় কি উদ্দেশ্যে প্রকাশ করিলেন ? 'বর্ষা-প্রভাতে'—কবিতা—ভাবে ও ভাষায় বেশ হইয়াছে। 'সে নয়'—কবিতা, মন্দ নয়। আমরা 'শান্তি'র উন্নতি কামনা করি।

সুদর্শন-চক্র।

গিরিশচন্দ্রের পৌরাণিক নাটক।

গিরিশচন্দ্রের সর্ব্বপ্রথম নাট্য-রচনা পৌরাণিক কাহিনী অবলম্বনেই সঙ্ঘটিত হইয়াছিল। বাল্যকাল হইতেই গিরিশচন্দ্রের প্রতিভা পৌরাণিক আখ্যানের অপরূপ সৌন্দর্য্য-গ্রহণের সুযোগ পাইয়াছিল। যখন তিনি নিতান্ত অল্পবয়স্ক, তখন নিত্য সন্ধ্যার সময় খুল্লপিতামহীর নিকট গিয়া বলিতেন "গল্প বল"। তাঁহার খুল্লপিতামহী পৌরাণিক আখ্যানসমূহ খুব ভালরূপে অবগত ছিলেন। লোকমুখে শ্রবণ ব্যতীত যাত্রা ও কথকতায় তাঁহার মনে পৌরাণিক চিত্রগুলি উজ্জ্বলরূপে অঙ্কিত হইয়া যায়। বালক গিরিশচন্দ্রের তৃপ্তির জন্য তিনি নিত্য রামায়ণ, মহাভারত বা পুরাণ-বর্ণিত আখ্যায়িকামালা বর্ণন করিতেন। বালক তন্ময়চিত্তে তাহা শ্রবণ করিয়া মুগ্ধ হইত। কেবল অন্যান্য বালকের ন্যায় শুনিত না, নিজের চিত্তে গল্পগুলির নায়ক-নায়িকাদের সহিত সহানুভূতির কম্পনও তীব্রভাবে অনুভূত হইত। একদিনকার কথা বলি। শ্রীকৃষ্ণের বাল্য-লীলা বর্ণনা হইতেছে। রাধিকা, গোপ, গোপিনী শ্রীকৃষ্ণকে কত ভালবাসিত। সেই ভালবাসার বাঁধন কাটাইয়া শ্রীকৃষ্ণ মথুরায় চলিয়া গেলেন। ব্রজধামে হাহাকার উঠিল। গিরিশের প্রাণও রাধিকা, গোপ, গোপিনী, যশোদা ও নন্দের দুঃখে ব্যাকুল হইয়া উঠিল। সাগ্রহে জিজ্ঞাসা করিলেন "শ্রীকৃষ্ণ আবার বৃন্দাবনে আসিলেন"? তাঁহার খুল্লপিতামহী বলিলেন, না। গিরিশচন্দ্র আবার বলিলেন "আসিলেন না"? উত্তর হইল 'না'। গিরিশচন্দ্র কাঁদিয়া পলাইয়া গেলেন। আর গল্প শুনিলেন না। নন্দ, যশোদা, রাধিকা, গোপ, গোপিনী স্নেহের বন্ধন কাটাইয়াছে বলিয়া কৃষ্ণের উপর যে অভিমান করিয়াছিল, বালক গিরিশের কোমল অন্তঃকরণও সে অভিমানে পূর্ণ হইয়া গিয়াছিল। তাই বলিতেছি এরূপ একদিন নহে, দিনের পর দিন পৌরাণিক উপাখ্যানগুলি গিরিশচন্দ্রের চিত্তে গাঁথিয়া যাইতে লাগিল। উপাখ্যানের সুখ দুঃখের সহিত বালকের হৃদয় সুখ দুঃখে পূর্ণ হইত। এই বালকচিত্তের উপর পৌরাণিক আখ্যায়িকার অসাধারণ প্রভাব শেষে নাটকে ফুটিয়া উঠিয়াছিল। বাল্যে গল্প শ্রবণই গিরিশচন্দ্রের পৌরাণিক নাট্যরচনার ভিত্তি। পূর্ব্বোক্ত কৃষ্ণবিরহের জীবন্ত চিত্র গিরিশচন্দ্র "প্রভাসযজ্ঞে" অঙ্কিত করিয়াছেন।

এইরূপে গল্প শুনিয়া গিরিশচন্দ্রের মনে যে পৌরাণিক কাহিনীর প্রতি অনুরাগ উৎপন্ন হইয়াছিল তাহার ফলে তিনি যেখানে কথকতা হইবে বলিয়া সংবাদ পাইতেন, সেখানে উপস্থিত হইতেন। ভিখারী-বৈষ্ণব গান গায়িতে আসিলে একাগ্রচিত্তে তাহার গান শ্রবণ করিতেন। পরে নিজে যখন পড়িয়া অর্থ বুঝিতে শিখিলেন, তখন কৃত্তিবাসের রামায়ণ ও কাশীরাম দাসের মহাভারত প্রবল আগ্রহে পাঠ করিতে লাগিলেন। একবার দুইবার নহে, কতবার যে এই দুইখানি গ্রন্থ পড়িয়াছিলেন তাহার ইয়ত্তা নাই। বৃদ্ধাবস্থায় কৃত্তিবাসের রামায়ণ ও কাশীদাসের মহাভারত তিনি অনর্গল আবৃত্তি করিয়া যাইতেন। সমগ্র রামায়ণ ও মহাভারত এইরূপে তাঁহার আয়ত্তে আসিয়াছিল।

এই সকল কারণে গিরিশচন্দ্রের মনে পৌরাণিক আখ্যান বিশেষভাবে আধিপত্য করিয়াছিল। তাই তিনি প্রথমে পৌরাণিক নাট্যই রচনা করিয়াছিলেন। আরও বিশেষ কারণ ছিল যে পৌরাণিক নাট্যে বাঙ্গালী দর্শক অধিকতররূপে আকৃষ্ট হইবে। এ সম্বন্ধে গিরিশচন্দ্রের নিজের মন্তব্য উদ্ধৃত করিতেছি :—

"জাতীয় বৃত্তি পরিচালনা ব্যতীত কবিতা বা নাটক জাতীয় হিতকর হয় না। ভারতবর্ষের জাতীয় মর্ম্মে—ধর্ম্ম। দেশহিতৈষিতা প্রভৃতি যত প্রকার কথা আছে, তাহাতে কেহ ভারতের মর্ম্মস্পর্শ করিতে পারিবেন না। ভারত ধার্ম্মিক। যাহারা লাঙ্গল ধরিয়া চৈত্রের রৌদ্রে হলসঞ্চালন করিতেছে, তাহারাও কৃষ্ণনাম জানে। তাহাদেরও মন কৃষ্ণনামে আকৃষ্ট। যদি নাটক সার্ব্বজনীন হওয়া প্রয়োজন হয়, কৃষ্ণনামেই হইবে। ইংরাজী ভাণে, বিদেশীয় ভাণে যাহারা ভাণ করেন, তাঁহারা ভারতের মর্ম্ম বোঝেন না। সেই ভাণে জাতীয় উন্নতি কখনও হইবে না। জাতীয় হৃদয়ের উপর উন্নতির ভিত্তি। সেই ভিত্তি কতদূর প্রগাঢ় তাহা ইতিহাস-পাঠে সম্পূর্ণ উপলব্ধি হইবে। হিন্দুধর্ম্মের উপর বহু বিরূপ প্রবাহ বহিয়াছে। কোন কোন মুসলমান রাজার সংকল্পই ছিল কাফের দূর করিবে। দিগ্বিদিকব্যাপী বৌদ্ধধর্ম্ম হিন্দুস্থানে বহিয়াছে তবু আজও আবাস-স্থানের নাম—হিন্দুস্থান। হিন্দুধর্ম্মমূল হিন্দু-হৃদয় হিন্দুধর্ম্ম এতই বিজড়িত করিয়া রাখিয়াছে। অবস্থাগত প্রভাবে রাজ্য চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়াছে তথাচ হিন্দু-হৃদয়ে হিন্দুধর্ম্মের সমান আরাধনা।............হিন্দুস্থানের মর্ম্মে মর্ম্মে ধর্ম্ম। মর্ম্মাশ্রয় করিয়া নাটক লিখিতে হইলে ধর্ম্মাশ্রয় করিতে হইবে। এই মর্ম্মাশ্রিত ধর্ম্ম বিদেশীয় ভীষণ তরবারিধারে উচ্ছেদ হয় নাই।" [রঙ্গালয়, ১ম বর্ষ ১৩০৮ 'পৌরাণিক নাটক' নামক প্রবন্ধ]

গিরিশচন্দ্রের নাটক বাঙ্গালীর এত প্রিয় হইয়াছে তাহার কারণ উপরি উদ্ধৃত গিরিশচন্দ্রের মন্তব্য হইতেই বুঝা যাইবে। 'চৈতন্যলীলা' 'নিমাই-সন্ন্যাস' প্রভৃতি নাটক বৈষ্ণবগণকে কতদূর আকৃষ্ট করিতে সমর্থ হইয়াছিল নিম্নলিখিত

ঘটনাই তাহার প্রমাণ। নবদ্বীপের বিখ্যাত পণ্ডিত ব্রজনাথ বিদ্যারত্ন মহাশয়ের পুত্র মথুরানাথ পদরত্ন 'চৈতন্যলীলা'র সুখ্যাতি শুনিয়া কলিকাতায় অভিনয় দেখিতে আসেন। অভিনয়-দর্শনে মুগ্ধ হইয়া তিনি গিরিশচন্দ্রের পদধূলি লইতে অগ্রসর হইয়াছিলেন। এক গিরিশচন্দ্রের নাটকই রঙ্গালয়ে হরিনামের বন্যা বহাইয়াছে।

আমাদের দেশে শিক্ষিতের সংখ্যা এখনও অতি অল্প। রমণীগণের ত কথাই নাই। এই সকল অশিক্ষিত পুরুষ বা রমণীগণের সম্মুখে ঐতিহাসিক নাটক অভিনয় হইলে তাহারা অতি অল্প স্থলেই রসগ্রহণে সমর্থ হয়। ইতিহাস-বিদ্ শ্রোতা আমাদের রঙ্গালয়ে কয়জন ? গিরিশচন্দ্র নিজেই লিখিয়াছেন—

"ঐতিহাসিক নাটক সমস্তই স্থানীয়। সেক্ষপীয়রের ঐতিহাসিক নাটক স্থানীয়। তাহার অপর জাতীয় অনুবাদ নাই। স্থানীয় প্রসঙ্গ স্থানেই চলিয়াছে। স্থানীয় সকলে সে কথা জানে বলিয়া চলিয়াছে। Wars of the Roses ইংলণ্ডের ঘরে ঘরে জানে, তাই সেই ঐতিহাসিক নাটক চলিয়াছে। কেবল ঐ সকল ঐতিহাসিক নাটক লিখিয়া সেক্ষপীয়র সেক্ষপীয়র হইতেন না। আমরা 'এক্‌জামিনে'র খাতিরে ইংলণ্ডের ইতিহাস পড়িয়াছি, সেইজন্য দুই একজনেরও রাজারাণীর বক্তৃতা ভাল লাগে, নচেৎ লাগিত না।" [রঙ্গালয়, ১ম বর্ষ—১৩০৮]

সুতরাং প্রধানতঃ সাধারণের সন্তোষের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া, সাধারণের মর্ম্মে আঘাত দিতে কৃতসংকল্প হইয়া, সাধারণকে উচ্চ আদর্শ দেখাইতে স্থির-প্রতিজ্ঞ হইয়া গিরিশচন্দ্র পৌরাণিক নাটক-রচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। তাঁহার সামাজিক নাটকগুলিও অপূর্ব্ব, কিন্তু সেগুলি তাঁহার শেষ জীবনের লেখা। তিনি নিজে নবীন নাট্যকারদের উপদেশ দিতেন—

"সামাজিক নাটক রচনা করা বড় দুরূহ। সংসারে অনেক দেখিয়া, অনেক দুঃখ-ক্লেশ সহিয়া, অনেক মানবচরিত্র নিপুণভাবে পর্য্যালোচনা করিয়া তবে ভাল সামাজিক নাটক লেখার ক্ষমতা জন্মে। আমি যৌবনে সামাজিক নাটক লিখি নাই।"

গিরিশচন্দ্রের পৌরাণিক নাটকগুলিকে প্রধানতঃ রামায়ণমূলক, মহাভারত-মূলক ও পুরাণমূলক এই তিন ভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে।

রামায়ণমূলক নাটকগুলি পর পর যদি অভিনীত হইয়া যায় তাহা হইলে দর্শকেরা মনে করিবেন, সমগ্র রামায়ণখানিই তাঁহার সম্মুখে নাট্যাকারে প্রদর্শিত হইতেছে। বিভিন্ন সময়ে রচিত হইলেও যদি এইরূপে নিম্নলিখিত নাটকগুলির পর পর অভিনয় হয়, তাহা হইলেই নাট্যাকারে রামায়ণের সৃষ্টি হইবে। প্রথমে "সীতার বিবাহ", পরে "রামের বনবাস", তাহার পর "সীতাহরণ", "অকাল-বোধন" ও "রাবণবধ" ও শেষে "সীতার বনবাস" ও "লক্ষ্মণ বর্জ্জন" অভিনীত

হইলেই সমগ্র রামায়ণ অভিনয় হইল। আমাদের এখানে যদি রামলীলা উৎসব থাকিত, তাহা হইলে আশা করিতে পারিতাম কিছুদিন ধরিয়া ধারাবাহিকরূপে এই অভিনয় চলিতে পারিত। পশ্চিমাঞ্চলে রামলীলার সময় সমগ্র রামায়ণ নাট্যাকারে প্রদর্শিত হইয়া থাকে।

রচনার তারিখ দেখিয়া সাজাইতে গেলে উল্লিখিত পুস্তকগুলি এইরূপ দাঁড়াইবে। (১) অকাল বোধন (২) রাবণ বধ (৩) সীতার বনবাস (৪) লক্ষ্মণ বর্জ্জন (৫) সীতার বিবাহ (৬) রামের বনবাস (৭) সীতাহরণ।

১২৮৪ হইতে ১২৮৯ বঙ্গাব্দের মধ্যে এই নাটকগুলি রচিত ও অভিনীত হয়। গিরিশচন্দ্র তখন গ্রেট ন্যাসনাল নামক অধুনা-লুপ্ত রঙ্গালয়ের অধ্যক্ষ ছিলেন। এই নাটকগুলি বাল্মীকির রামায়ণের অনুসরণ অপেক্ষা কৃত্তিবাসের রামায়ণেরই অধিকতর অনুসরণ করিয়াছে। পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, বাল্যকালের শ্রুত গল্প ও কৃত্তিবাসী রামায়ণ গিরিশচন্দ্রের উপর অসীম প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল। তাই বাল্মীকি-রামায়ণে যাহা নাই, এমন অনেক অদ্ভুত ঘটনা গিরিশচন্দ্রের নাটকে দেখিতে পাওয়া যায়। গিরিশচন্দ্র কৃত্তিবাসকে অনুসরণ করিতে গিয়াই এই সকল ঘটনার সৃষ্টি করিয়া ফেলিয়াছেন। দুই একটি উদাহরণ দিলেই ইহা পরিস্ফুট হইবে।

"সীতার বনবাস" নাটকে প্রথম অঙ্ক, দ্বিতীয় গর্ভাঙ্কে উর্ম্মিলা সীতাকে রাবণের চিত্র অঙ্কিত করিতে অনুরোধ করিলে সীতা তাহা অঙ্কিত করিয়া দেখাইলেন।

উর্ম্মিলা। বারেক দেখাও সখি, চিত্রিয়া আকার।

... ...

সীতা। হের সখি, চিত্রিয়াছি দুরন্ত রাক্ষসে।

তারপর উর্ম্মিলা চলিয়া গেল।

সীতা। অলসে অবশ কলেবর,
না পারি চলিতে বিষম নিদ্রার ভার।
[রাবণের চিত্রের উপর শয়ন]

[রামের প্রবেশ]

... ...

রাম। একি!
রাবণের চিত্র হেরি!
ফলিল তারার অভিশাপ
দুঃখানল মন্দোদরী নিভিল তোমার
কলঙ্কিনী জনক-নন্দিনী।

ইহা পাঠ করিয়া আমরা স্তম্ভিত হইয়া যাই। অগ্নিপরীক্ষায় সমুত্তীর্ণা সীতার প্রতি আবার সন্দেহ! রামচন্দ্রের মনে এরূপ সন্দেহ কখনও উদয় হয় নাই। লোকের জন্য তিনি অগ্নিপরীক্ষা করিয়াছিলেন, প্রজারঞ্জনের জন্য সীতাকে বনবাসে দিয়াছিলেন। রাবণের চিত্রের উপর সীতাকে শয়ন করিতে দেখিয়া সন্দিগ্ধহৃদয়ে সীতাকে বনবাসে দেন নাই। এই চিত্রের উপর শয়ন ও তজ্জনিত রামের সন্দেহ অঙ্কিত করিয়া গিরিশচন্দ্র বিশেষভাবে অপরাধী হইয়াছেন। বাল্মীকি-রামায়ণে ইহা নাই, রামায়ণের কথাবলম্বনে রচিত কাব্য রঘুবংশে ইহা নাই। রামায়ণমূলক নাটক উত্তরচরিতেও রাম সীতা-চরিত্র-সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ। এ চিত্র গিরিশচন্দ্রের সম্পূর্ণ অনুপযুক্ত।

আর একটি উদাহরণ, বিশ্বামিত্র তাড়কাবধের জন্য রাম লক্ষ্মণকে লইতে আসিলেন। গিরিশচন্দ্র দেখাইয়াছেন প্রথমে দশরথ রামলক্ষ্মণকে না দিয়া ভরত-শত্রুঘ্নকে বিশ্বামিত্রের সহিত পাঠাইলেন। পথে বিশ্বামিত্রের সহিত ভরতের এইরূপ কথোপকথন হইতেছে—

বিশ্বা। আছে দুই পথ যাইবারে তপোবনে
তিনদিনে উত্তরিব এ পথে যাইলে,
তৃতীয় প্রহর মাত্র এ পথ-গমনে;
কিন্তু পথ বড়ই দুর্গম,
ভীষণা তাড়কা বৈসে কানন-মাঝারে
নর-ঘাতী,
নরমাংস আশে ফিরে সদা বনে বনে,
কহ, কোন্ পথে করিবে পয়াণ।
ভরত। তিন দিনে যাব ভালে ভালে
কি কাজ জঞ্জালে মুনি
কিবা কার্য্য রাক্ষসী ঘাঁটায়ে।
বিশ্বা। হরে মুরারে,
এই কি সে ব্রহ্মসনাতন
রাক্ষস-নিধনহেতু জনম যাঁহার?
সত্য কহ কি নাম তোমার
নহে ভস্ম করিব এখনি।
ভরত। ভ—রাম মম নাম বলে দেছে পিতা।
বিশ্বা। আরে মাথা খেয়ে ভরতে আনিনু সাথে
প্রতারণা কৈল দশরথ
অধঃপাতে যাইবারে গঠিয়াছে সেতু।
ভরত। সত্য মুনি ভর—না রাম আমি।
বিশ্বা। ভ—রাম ভ—রাম করে জ্বালালে আমায়
চল ফিরে চল।
[সীতার বিবাহ, ১ম অঙ্ক, ২য় গর্ভাঙ্ক।]

এ সকল কি? ভরতকে এরূপ কাপুরুষরূপে চিত্রিত করা, দশরথকে প্রতারণাপরায়ণ করা অতীব নিন্দনীয় হইয়াছে। বাল্মীকির রামায়ণে এ সকল নাই। এই সমস্ত গুরুতর দোষ উপেক্ষণীয় নহে। "রাবণ-বধ" নাটকের প্রারম্ভে গিরিশচন্দ্র মাইকেল হইতে নিম্নলিখিত পংক্তিগুলি উদ্ধৃত করিয়াছিলেন—

"নমি আমি কবিগুরু তব পদাম্বুজে
বাল্মীকি, হে ভারতের শিরশ্চূড়ামণি!
... ...
কৃত্তিবাস কীর্ত্তিবাস কবি
বঙ্গভূমি-অলঙ্কার।"

কিন্তু বাল্মীকি-রামায়ণ অনুসরণ করিলে গিরিশচন্দ্রকে এরূপ নিন্দিত চিত্র অঙ্কিত করিতে হইত না। কৃত্তিবাসই গিরিশচন্দ্রকে এখানে যথার্থ পথ হইতে বিচলিত করিয়াছেন। উদ্ধৃত দুইটি স্থলের ঘটনা কৃত্তিবাসের রামায়ণে এইরূপে বর্ণিত হইয়াছে :—

"সীতারে চাহিয়া বলে যত নারীগণ।
দশ মুণ্ড কুড়ি হাত কেমন রাবণ॥...
রাবণ লিখিতে সীতা মনে কৈল সাধ।
বিধির নির্ব্বন্ধ হেথা পড়িল প্রমাদ॥
হাতে খড়ি ধরে সীতা দৈবের নির্ব্বন্ধ।
দশ মুণ্ড কুড়ি হস্ত লিখে দশস্কন্ধ॥...
সুখের সাগরে দুঃখ ঘটায় বিধাতা।
নেতের অঞ্চল পাতি শুইলেন সীতা॥
ভাবিতে ভাবিতে রাম যান অন্তঃপুরী।
রামে দেখি বাহির হইল যত নারী॥
সীতা পাশে দেখি রাম লিখন রাবণ।
সত্য অপযশ মম বলে সর্ব্বজন॥"

[উত্তরাকাণ্ড। হিতবাদী সংস্করণ ৪১২ পৃষ্ঠা]

"চিন্তিত হইয়া রাজা ভাবে মনে মনে।
ডাকিলেন ভরত শত্রুঘ্ন দুইজনে॥
দোঁহে দাঁড়াইল আসি মুনির সাক্ষাতে।
রাজা বলিলেন যাহ মুনির সঙ্গেতে॥
ভূপতির বঞ্চনায় ভ্রান্ত তপোধন।
মনে ভাবিলেন এই শ্রীরাম লক্ষ্মণ॥
আগে আগে মুনি যান পাছে দুইজন।
সরযূ নদীর তীরে দিল দরশন॥
মুনি বলিলেন শুন ভূপতি-কুমার।
হেথা গমনের পথ আছে দ্বিপ্রকার॥
এই পথে গেলে তিন দিনে যাই ঘর।
এই পথে গেলে লাগে তৃতীয় প্রহর॥
তৃতীয় প্রহর পথে আছে কিন্তু ভয়।
সেই পথে রাক্ষসী তাড়কা নামে রয়॥
তাড়িয়া ধরিয়া খায় যত মুনিগণ।
কোন্ পথে যাইতে তোমার লাগে মন॥
বলিলেন ভরত শুনহ তপোধন।
দুষ্ট খাঁটাইয়া পথে কোন্ প্রয়োজন॥
এ কথা শুনিয়া মুনি ভাবিলেন মনে।
ইনি কি হবেন যোগ্য রাক্ষস-বারণে॥
শুনি এক রাক্ষসের নাম এত ডর।
মারিবেন কিসে তিন কোটি নিশাচর॥
রাজার শঠতা মুনি ভাবেন অন্তরে।
শ্রীরামে না দিয়া রাজা দিল ভরতেরে॥

[আদিকাণ্ড। হিতবাদী সংস্করণ ৬০ পৃষ্ঠা]

কেবল পূর্ব্বোক্ত দুই স্থলে নহে, আরও বহু স্থলে বাল্মীকি-রামায়ণে অনুল্লিখিত ঘটনা কৃত্তিবাসের অনুকরণে গিরিশচন্দ্র নিজ নাটকে সংযোজিত করিয়াছেন। মহীরাবণ মায়া প্রকাশ করিয়া রামলক্ষ্মণকে পাতালে লইয়া

যাইয়া বন্দী করিল, গিরিশচন্দ্র কৃত্তিবাসের এই অদ্ভুত উপাখ্যানের উল্লেখ করিয়াছেন—

"জাগি মহীতলে মহীরাবণঘরে
পাশে শুয়ে ভাই মম।"

[লক্ষ্মণ বর্জ্জন, ৫ম দৃশ্য।

কৃত্তিবাসে আছে—

"শরীরে পুলক বীর পবন তনয়।...
চক্ষুর নিমেষে গেল রাজ-অন্তঃপুরে।
শ্রীরাম লক্ষ্মণ যথা বন্দী আছে ঘরে।
দোমারি লোহার গড় ভিতর বাহিরে।
চারিদিকে নিশাচর নানা অস্ত্র ধরে॥"

[লঙ্কাকাণ্ড, হিতবাদী সংস্করণ ৩১০-১১ পৃষ্ঠা।

"সীতার বনবাসে" গিরিশচন্দ্র যে লব কুশ কর্ত্তৃক রাম-লক্ষ্মণ ভরত-শত্রুঘ্ন নিধন ও হনুমানের বন্ধন প্রভৃতি ঘটনার অবতারণা করিয়াছেন তাহা কৃত্তিবাসের রামায়ণেই পাওয়া যায়। বাল্মীকি-রামায়ণে তাহার কিছুমাত্র উল্লেখ নাই।

যদি বুঝিতাম বাল্মীকি-রামায়ণের অনুসরণ না করাতে গিরিশচন্দ্রের নাটকীয় চরিত্র বা আদর্শ উন্নত হইয়াছে তাহা হইলে না হয় তাঁহার কৃত্তিবাসের অনুসরণ সমর্থনযোগ্য হইত। কিন্তু আমরা কি দেখিতেছি? সীতাগত প্রাণ রামচন্দ্র প্রজারঞ্জনের জন্য নিজ হৃৎপিণ্ড উৎপাটন করিয়া সীতানির্ব্বাসন করিতেছেন, এ চিত্রের পরিবর্ত্তে গিরিশচন্দ্রের নাটকে দেখিলাম রাম সীতা-চরিত্রে সন্দিগ্ধ। সত্যসন্ধ দশরথ যিনি সত্যরক্ষার জন্য প্রাণ অপেক্ষা প্রিয় পুত্রকে বনবাসে দিয়াছিলেন, গিরিশচন্দ্রের নাটকে দেখি তিনি বিশ্বামিত্রের নিকট মিথ্যা বলিয়া প্রতারণা করিতেছেন। গিরিশচন্দ্রের নাটকে দেখি ভরত কাপুরুষ। রাক্ষসীর ভয়ে অগ্রসর হইতে চাহে না। কৃত্তিবাস গিরিশচন্দ্রকে কিরূপ চিত্র অঙ্কিত করাইবার হেতুভূত হইয়াছিলেন তাহার আর অধিক দৃষ্টান্ত কি দিব?

মহাভারতমূলক নাটকগুলির মধ্যে "অভিমন্যু বধ", "পাণ্ডবের অজ্ঞাতবাস" ও "পাণ্ডব-গৌরব" মহাভারতের মূল ঘটনা অবলম্বনে রচিত। মহাভারতের বিভিন্ন উপাখ্যানগুলি লইয়াও গিরিশচন্দ্র অনেক নাটক রচনা করেন। "নল-দময়ন্তী", "শ্রীবৎস-চিন্তা" "জনা" এই শ্রেণীর নাটক।

অন্যান্য পুরাণমূলক নাট্যের মধ্যে শিব-দুর্গা বিষয়ক "আগমনী", "দক্ষযজ্ঞ", ও "হরগৌরী", কৃষ্ণবিষয়ক "দোল-লীলা" "ব্রজবিহার" "প্রভাস যজ্ঞ" "মণি-হরণ" ও "নন্দদুলাল" নাট্য গিরিশচন্দ্র রচনা করিয়াছিলেন। "বিল্বমঙ্গল" "নসীরাম" "করমেতিবাই" প্রভৃতি নাটকগুলিও কৃষ্ণভাবে অনুপ্রাণিত। কবি-কঙ্কণ চণ্ডীর আখ্যান লইয়া "কমলে কামিনী" নাটক; পৌরাণিক অন্যান্য উপাখ্যান-অবলম্বনে "ধ্রুব-চরিত্র", "বৃষকেতু" "প্রহ্লাদচরিত্র" ও "অভিশাপ" রচিত হইয়াছে।

সর্ব্বশুদ্ধ প্রায় পঁচিশখানি নাট্য গিরিশচন্দ্র পৌরাণিক আখ্যানরূপ ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। গিরিশচন্দ্র লিখিয়াছেন—

"যত জাতির যত উচ্চ গ্রন্থ আছে সকলই Mythological অর্থাৎ পৌরাণিক গ্রন্থ অবলম্বনে লিখিত। পৌরাণিক গ্রন্থ অবলম্বনে হোমার, পৌরাণিক গ্রন্থ অবলম্বনে ভার্জ্জিল; খৃষ্টীয় পুরাণ অবলম্বনে মিল্টন, পৌরাণিক গ্রন্থ অবলম্বনে বাঙ্গালার মাইকেল। কবিবর হেমচন্দ্রের "বৃত্রসংহার" পুরাণ অবলম্বনে।" [রঙ্গালয় ১ম বর্ষ, ১৩০৮।

গিরিশচন্দ্র পৌরাণিক নাট্য রচনা করিয়া যশ ও অর্থ উভয়ই লাভ করিয়া-ছিলেন। এখনও বাঙ্গালী দলে দলে পৌরাণিক নাটকের অভিনয় দেখিতে যায়, জন্মাষ্টমী, শিবরাত্রি প্রভৃতি ব্রত-উপলক্ষে পুরাঙ্গনাগণকে পৌরাণিক নাটকের অভিনয় দেখাইয়া থাকে। আর ঐতিহাসিক নাটক রচনা ত এক প্রকার বন্ধ। ইংরাজ-চরিত্র থাকিলেও ইংরাজগণের ভারতাধিকারের পরবর্ত্তী কোনও ঐতিহাসিক ঘটনা লইয়া নাটক রচিত হইলে প্রায়ই সেগুলির অভিনয় নিষিদ্ধ হয়।

কিন্তু এই মারা-কাটা লইয়া ঐতিহাসিক নাটকেও ধর্ম্মভাবাপন্ন হিন্দু তত মুগ্ধ হয় না। জনকয়েকের কথা বলিতেছি না; সাধারণ দর্শকগণের কথা বলিতেছি। ঐতিহাসিক নাটকে যে ঘটনা-বাহুল্য, হত্যা, পাপ প্রভৃতি দেখাইয়া মানবকে উচ্চ আদর্শে চালিত করিবার প্রয়াস পাওয়া যায়, পৌরাণিক নাটকেও তাহা সহজেই হইতে পারে। এ বিষয়ে গিরিশচন্দ্রের উক্তি উদ্ধৃত করিয়া প্রবন্ধ শেষ করিব।

"মারা কাটা লইয়া এমন কি নাটক লিখিবেন, যাহা ব্যাস-রচিত ভারতে নাই। এখন পাঁচ সাতটা সেক্সপীয়রকে আসিয়া শিখিতে হইবে ব্যাসরচিত ভারতে কি কি ভাব আছে। ম্যাকবেথ, হ্যামলেট, ওথেলো, লীয়র প্রভৃতি সেক্সপীয়র-রচিত উচ্চশ্রেণীর নাটক। এ সকল কঠোর নাটকেও পিত্রাদেশে মাতার মস্তকচ্ছেদ নাই, গর্ভস্থ শিশুবধ নাই এবং কোন জাতীয় কোন নাটক বা কবিতায় সুপ্ত শিশুহন্তা অশ্বত্থামারও মার্জ্জনা নাই। এই বিশাল ভাবাপন্ন কাব্যক্ষেত্র হইতে উদ্ধৃত নাটক যিনি ঘৃণা করেন, তাঁহার বিরুদ্ধে এইমাত্র বলা যায় যে তিনি কি বলিতেছেন, তাহা তিনি জানেন না।"

শ্রীশরচ্চন্দ্র ঘোষাল।

সংস্কৃত সাহিত্যে সমালোচন

সাহিত্যের উন্নতির পক্ষে সমালোচনা পদ্ধতির উপযোগিতা সর্ব্বাপেক্ষা সমধিক। নিপুণ সমালোচনায় সাহিত্যের প্রকৃত দোষ গুণ বুঝিতে পারা যায়, এবং তাহা বুঝিতে পারিলে কি ভাবে সাহিত্যের গতি প্রবর্ত্তিত করিলে সাহিত্য, স্থায়ী অভ্যুদয়ের পথে অগ্রসর হইতে পারিবে, তাহা হৃদয়ঙ্গম হয়। সূক্ষ্মদৃষ্টি সমালোচকের পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বিশ্লেষণ-প্রভাবে সাহিত্যের দোষ অথবা গুণ আত্মপ্রকাশ করে, সুতরাং ইহাতে সাহিত্যের সহিত সাধারণের ঘনিষ্ঠ পরিচয়, অন্তরায়শূন্য হয়। সাধারণে যে কাব্য একাধিকবার পাঠ করিয়াও তাহার সৌন্দর্য্য বুঝিতে পারেন না, সমালোচকের সুনিপুণ তুলিকার রেখাপাতে সে সৌন্দর্য্য-চিত্র পরিস্ফুটতা লাভ করিয়া হৃদয়ে প্রগাঢ় আনন্দ আনিয়া দেয়। এই জন্যই গ্রন্থকার অপেক্ষা সমালোচকের সহৃদয়তা ও ভূয়োদর্শিতা অধিক থাকা প্রয়োজন। তাই একজন বলিয়াছেন,—

"কবিতারসমাধুর্য্যং কবির্বেত্তি ন তৎকবিঃ।
ভবানীভ্রুকুটীভঙ্গীং ভবো বেত্তি ন ভূধরঃ॥"

যিনি কবিতার লেখক, তিনি সেই কবিতার যতটা রস-মাধুর্য্য বুঝিতে না পারেন, সহৃদয় সমালোচক তাহা অপেক্ষা অধিক মধুরতা অনুভব করেন এবং তাহা সাধারণকে বুঝাইবার সামর্থ্য রাখেন।

অনেকের বিশ্বাস, আমাদের প্রাচীন সংস্কৃত সাহিত্যে সমালোচনা-পদ্ধতি ছিল না, আমরা ভিন্ন ভাষার সাহিত্য হইতে আহরণ করিয়া আমাদের বঙ্গ-সাহিত্যে সমালোচনা-রীতির প্রবর্ত্তন করিয়াছি। কিন্তু আজকাল যেরূপ সমালোচনা-পদ্ধতি প্রচলিত, তাহা পাশ্চাত্যভাবের সমালোচনারও যথাযথ অনুকরণ নহে। বর্ত্তমান বঙ্গসাহিত্যে সমালোচনার অভাব নাই,—মাসিক, সাপ্তাহিক, গ্রন্থের ভূমিকা প্রভৃতি সর্ব্বত্রই সমালোচনা দেদীপ্যমান। এই সমালোচনা নামে আজকাল যাহা বাহির হইতেছে, তাহা হয়, স্তুতিবাদের বীণা-নিক্কণ, অথবা নিন্দাবাদের বজ্রনির্ঘোষ। গ্রন্থের কোন্ অংশ কি দোষে নিন্দনীয়, বা কি গুণে প্রশংসার্হ, আধুনিক সমালোচনার সহায়তায় প্রায়শঃই তাহা বুঝিতে পারা যায় না।

আমাদের প্রাচীন সংস্কৃত সাহিত্যের অন্তর্গত আলঙ্কারিক সমালোচনা-পদ্ধতি কিরূপ সুন্দর নৈপুণ্যপূর্ণ, এই ক্ষুদ্র নিবন্ধে তাহাই দেখাইবার চেষ্টা করিব। নানাবিধ সূক্ষ্ম বিচারের অবতারণা পূর্ব্বক পূর্ব্বতন আলঙ্কারিকগণ, কাব্য, নাটকের কিরূপ নিপুণভাবে সমালোচনা করিয়াছেন, তাহা তাঁহাদের আলঙ্কারিক বিচার-পদ্ধতি অবলোকন করিলেই স্পষ্ট হৃদয়ঙ্গম হয়। প্রকৃতপক্ষে অলঙ্কার শাস্ত্রই কাব্য-নাটকাদির সূক্ষ্ম সমালোচনাত্মক সন্দর্ভ।

যে সকল কবিতার অন্বয়-যোজন কষ্টসাধ্য, আলঙ্কারিকগণ সেই সকল কবিতাকে ক্লিষ্টতা-দোষে দুষ্ট বলিয়াছেন।

"ধম্মিল্লস্য ন কস্য প্রেক্ষ্য নিকামং কুরঙ্গশাবাক্ষ্যাঃ।
রজ্যত্যপূর্ব্ববন্ধব্যুৎপত্তের্মানসং শোভাম্॥"

[অর্থ—"মৃগাক্ষীর সুবিন্যস্ত সংযত কেশপাশের শোভা দেখিয়া কাহার চিত্ত তৎপ্রতি অতিমাত্র অনুরক্ত না হয়?"]

অলঙ্কার শাস্ত্রে এই শ্লোকের আলোচনায় লিখিত হইয়াছে যে "অত্র ধম্মিল্লস্য শোভাং প্রেক্ষ্য কস্য মানসং ন রজ্যতীতি সম্বন্ধঃ ক্লিষ্টঃ।" অর্থাৎ কবিতায় যে ভাবে পদবিন্যাস রহিয়াছে, তাহাতে 'ধম্মিল্লের শোভা দেখিয়া কাহার মন অনুরক্ত না হয়?'—এইরূপ সম্বন্ধ যোজন কষ্টসাধ্য।

সাড়ম্বরে যে সকল কবিতার আরম্ভ হইয়াছে, কিন্তু সে শব্দচ্ছটা শেষ পর্য্যন্ত রক্ষিত হয় নাই, আলঙ্কারিক সমালোচকগণ এই সকল কবিতাকে পতৎপ্রকর্ষতা-দোষে দূষিত বলিয়াছেন।

"প্রোজ্জ্বলজ্জ্বলনজ্বালাবিকটোরুসটাচ্ছটঃ।
শ্বাসক্ষিপ্তকুলক্ষ্মাভৃৎ পাতু বো নরকেশরী॥"

[অর্থ—"যাঁহার বিশাল জটাসমূহ জ্বলদগ্নিশিখাবৎ উগ্র, যাঁহার নিশ্বাস-বায়ুর আঘাতে কুলাচলশ্রেণী দূরে অপসৃত হইয়া থাকে, সেই নৃসিংহ তোমাদিগকে রক্ষা করুন।"]

এই কবিতার ক্রমশঃই অনুপ্রাস-প্রকর্ষ হ্রাস পাইয়াছে। তাই "সাহিত্য-দর্পণ"কার লিখিয়াছেন, "অত্র ক্রমেণানুপ্রাসপ্রকর্ষঃ পতিতঃ।"

"ইন্দুর্বিভাতি কর্পূরগৌরৈর্ধবলয়ন্ করৈঃ।
জগন্মা কুরু তন্বঙ্গি মানং পাদানতে প্রিয়ে॥"

[অর্থ—"হে কৃশাঙ্গি, কর্পূর-শুভ্র কিরণরাশির দ্বারা ভুবনতল ধবলিত করিয়া চন্দ্র বিরাজ করিতেছে, এ সময়ে পদানত প্রিয়ের প্রতি অভিমান করিও না।"]

আলঙ্কারিকেরা বলিয়াছেন, এই কবিতায় 'জগৎ' শব্দ প্রথমার্দ্ধে থাকা উচিত ছিল।

বাঙ্গালা কবিতাতেও ইহা দোষ বলিয়া গণ্য। কবিবর হেমচন্দ্র, "মেঘনাদ-বধ" কাব্যের ভূমিকায় মধুসূদনের কবিতায় এইরূপ ভূরি দোষের উল্লেখ করিয়া লিখিয়াছেন,—

"চতুর্থতঃ—বিরাম-যতি-সংস্থাপনের দোষে স্থানে স্থানে শ্রুতিদুষ্ট হইয়াছে ; যথা—

"কাঁদেন রাঘব-বাঞ্ছা আঁধার কুটীরে
নীরবে—
"নাচিছে নর্ত্তকীবৃন্দ, গাইছে সুতানে
গায়ক ;—
* * * *

প্রক্রমভঙ্গদোষের উদাহরণ রূপে অলঙ্কার শাস্ত্রে ভারবির নিম্নলিখিত পদ্য উদ্ধৃত হইয়াছে।—

"যশোঽধিগন্তুং সুখলিপ্সয়া বা
মনুষ্যসংখ্যামতিবর্ত্তিতুং বা।
নিরুৎসুকানামভিযোগভাজাং
সমুৎসুকেবাঙ্কমুপৈতি লক্ষ্মীঃ॥"

এ কবিতায় 'যশোঽধিগন্তুং' ও 'মনুষ্যসংখ্যামতিবর্ত্তিতুং' এই উভয় স্থলেই 'তুমুন্' প্রত্যয় রহিয়াছে, কাজেই মধ্যবর্ত্তী 'সুখলিপ্সয়া' এই বাক্যের পরিবর্ত্তে 'সুখমীহিতুং' এইরূপ 'তুমুন্' প্রত্যয়ান্ত বাক্য রচনাই উচিত ছিল। আলঙ্কারিকগণ এইরূপ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ত্রুটির উল্লেখ করিয়াও কাব্যের সমালোচনা করিয়াছেন। এমন সূক্ষ্মভাবের আলোচনা অন্য ভাষায় বিরল নহে কি ?

একজন কবি লিখিয়াছেন,—"ঘোরো বারিমুচাং রবঃ।" আলঙ্কারিক সমালোচক বলিলেন যে, মেঘের গর্জ্জন লোকপ্রসিদ্ধ, সুতরাং 'মেঘের রব' লেখায় প্রসিদ্ধিপরিত্যাগ নিবন্ধন দোষ হইয়াছে।

যে শব্দ প্রকৃত বিষয়ের কোনও উপযোগী নহে, এরূপ অনাবশ্যক শব্দপ্রয়োগ করা দোষাবহ। তাই—

"বিলোক্য বিততে ব্যোম্নি বিধুং মুঞ্চ রুষং প্রিয়ে।"

[অর্থ—"প্রিয়ে, এই দেখ বিশাল গগনাঙ্গনে কেমন চন্দ্র উদিত হইয়াছে, এ সময়ে ক্রোধ পরিত্যাগ কর।"]

এই শ্লোকের আলোচনায় "সাহিত্যদর্পণ"কার লিখিয়াছেন, "অত্র বিতত-শব্দো মানত্যাগং প্রতি ন কিঞ্চিদুপকুরুতে।" অর্থাৎ গগন মণ্ডলকে 'বিতত' শব্দে বিশেষিত করায় মানত্যাগের কোনও হেতুই দর্শিত হয় না।

"জাতা লজ্জাবতী মুগ্ধা প্রিয়স্য পরিচুম্বনে।"

[অর্থ—"প্রিয়তমের চুম্বনে মুগ্ধা লজ্জাবতী হইয়াছিল।"]

আলঙ্কারিকগণ এই শ্লোকাংশের সমালোচনা করিয়া বলিয়াছেন যে, এস্থলে স্পষ্ট 'লজ্জাবতী' না লিখিয়া লজ্জার কার্য্য নেত্রনিমীলনের উল্লেখ করাই উচিত ছিল। সুতরাং প্রথম চরণের পরিবর্ত্তে "আসীন্মুকুলিতাক্ষী সা"—এইরূপ লিখিলে নির্দ্দোষ হইত।

যে রসের যাহা বিরোধী, তাহার বর্ণন করা সঙ্গত নহে। সুতরাং অলঙ্কার-শাস্ত্র মতে—

"মানং মা কুরু তম্বঙ্গি জ্ঞাত্বা যৌবনমস্থিরম্।"

[অর্থ—"হে তম্বঙ্গি, আর অভিমান করিও না, জান ত যৌবন অস্থির।"]

এই শ্লোকাংশে যৌবনের অস্থিরতা কীর্ত্তন যুক্তিযুক্ত হয় নাই। কারণ, ধনজনযৌবনাদির অস্থিরত্ব কথন শৃঙ্গার রসের পরিপন্থী শান্তরসের অঙ্গ, কাজেই শৃঙ্গার রসের শ্লোকে বিবেকের উদ্দীপক ভাব সন্নিবেশ অসঙ্গত হইয়াছে।

আলঙ্কারিক সমালোচকগণ বলিয়াছেন যে, "বেণী সংহার" নাটকের দ্বিতীয় অঙ্কে স্বপক্ষাশ্রিত বীরশ্রেষ্ঠদিগের বিনাশ সময়ে পত্নী ভানুমতীর সহিত দুর্য্যোধনের শৃঙ্গার রসালাপ শোভন হয় নাই। "কুমারসম্ভব" কাব্যে পার্ব্বতী পরমেশ্বরের সম্ভোগ শৃঙ্গার বর্ণনও আলঙ্কারিক সমালোচকের চক্ষে সুসঙ্গত নহে। তাই তাঁহারা বলিয়াছেন, "ইদং পিত্রোঃ সম্ভোগবর্ণনমিবাত্যন্তমনুচিতম্।" অর্থাৎ মাতাপিতার সম্ভোগ বর্ণনের ন্যায় ইহা অত্যন্ত অনুচিত।

সূক্ষ্মধীসম্পন্ন আলঙ্কারিকগণ এইরূপ নিপুণ ভাবে নানা কাব্য, নাটকের সমালোচনা করিয়াছেন। সেই সমস্ত দীর্ঘ আলঙ্কারিক বিচারের অবতারণা করিলে তাহা পাঠক পাঠিকার তাদৃশ তৃপ্তিপ্রদ হইবে না, সুতরাং সংক্ষেপে আলঙ্কারিকদিগের সমালোচনা-পদ্ধতির ক্রম দর্শিত হইল।

অনেক প্রাচীন টীকাতেও কবিতার সমালোচনাত্মক সরস বিশ্লেষণ দৃষ্ট হয়। এই টীকাকারেরা ব্যাখ্যাবসরে কবিতার প্রত্যেক পদের সার্থকতা দেখাইয়াছেন এবং কোথায় কিরূপ ব্যঙ্গার্থ ফুটিয়া উঠিয়াছে, তাহার আলোচনা করিয়াছেন।

"রসমঞ্জরী", মৈথিল কবি ভানুভট্ট প্রণীত একখানি অত্যুৎকৃষ্ট আলঙ্কারিক সন্দর্ভ। এই গ্রন্থে শৃঙ্গার রসের আলম্বন নায়ক নায়িকাদির ভেদ ও লক্ষণ প্রভৃতি বিশদভাবে অভিহিত হইয়াছে। উদাহরণের শ্লোকগুলি গ্রন্থকারের স্বরচিত। বিখ্যাত বৈয়াকরণ নাগেশভট্ট 'প্রকাশ' নামে ও অনন্ত পণ্ডিত

'ব্যঙ্গার্থ কৌমুদী' নামে এই গ্রন্থের টীকা লিখিয়াছেন। টীকাকার অনন্ত পণ্ডিত, অদ্ভুত নিপুণতার সহিত সমুদয় শ্লোকের সুবিস্তৃত ব্যাখ্যা করিয়াছেন। তিনি শ্লোকস্থ প্রত্যেক পদের সার্থকতা দেখাইয়া স্বীয় অসাধারণ চিন্তাশীলতা ও সহৃদয়তা অভিব্যক্ত করিয়াছেন। নিম্নে তাঁহার ব্যাখ্যা-রীতির কিঞ্চিৎ পরিচয় প্রদত্ত হইল।—

"অয়ং রেবাকুঞ্জঃ কুসুমশরসেবাসমুচিতঃ
সমীরোঽয়ং বেলাদরবিদলদেলাপরিমলঃ।
ইয়ং প্রাবৃড্ ধন্যা নবজলদবিন্যাসচতুরা
পরাধীনং চেতঃ সখি কিমপি কর্ত্তুং মৃগয়তে॥"

[অর্থ—"বর্ষাকাল; সম্মুখে এই বিহার-যোগ্য রেবাকুঞ্জ। তাহার উপর শ্রমাপনোদনকারী সুরভি পবন প্রবাহিত হইতেছে। সখি, এ সময়ে আমার পরাধীন চিত্ত কি-যেন-কি-এক আকাঙ্ক্ষায় উদ্বেলিত হইয়া উঠিয়াছে।"]

টীকাকারের বিস্তৃত ব্যাখ্যার সংক্ষিপ্ত মর্ম্ম এই :—কুঞ্জ দূরস্থ হইলে গমনাগমনজনিত ক্লেশ হইতে পারে, তাই শ্লোকে 'অয়ং' শব্দ প্রযুক্ত হইয়াছে। 'অয়ং' শব্দের অর্থ সম্মুখবর্ত্তী। সখা সম্বোধনে রহস্য কথন যোগত্ব ধ্বনিত হইতেছে। দৈনন্দিন স্নানের উদ্দেশে রেবাতটে নরনারীর সমাগম বিচিত্র নহে, তাই এস্থলে আগমন-নিবন্ধন লোকে অন্যরূপ আশঙ্কা করিতে পারিবে না—এইজন্য রেবাকুঞ্জ অর্থাৎ রেবাতীরবর্ত্তী কুঞ্জ বলা হইয়াছে। অন্য লোকের দেখিবার ভয় নাই, সুতরাং এ স্থান নিঃশঙ্ক ভাবে কেলির যোগ্য, 'কুঞ্জ' পদের দ্বারা ইহাই ব্যক্ত হইতেছে। এখানে সহজেই সুরতশ্রমের অপনোদন হইবে, তাই পরিমলগন্ধবাহী সমীরণের কথা বলা হইয়াছে। প্রাবৃট্‌কাল বলিলেই হইত, আবার নূতন মেঘ সঞ্চারের উল্লেখ কেন?—এখনই অবিশ্রান্ত বৃষ্টিপাত হইবে, এ পথে লোকজন চলিবে না, সুতরাং জনশূন্য স্থানে নায়কের সহিত বহুক্ষণ অবস্থান করিতে পারিব,—বর্ষোন্মুখ মেঘাবির্ভাবের উল্লেখ করায় নায়িকার এইরূপ মনোভাব ব্যক্ত হইতেছে।

বাহুল্য ভয়ে একখানি গ্রন্থের একটী মাত্র শ্লোকেরই সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা-পদ্ধতির পরিচয় প্রদর্শিত হইল। এইরূপ সমালোচনাত্মক ব্যাখ্যা, সংস্কৃত সাহিত্যের অনেক গ্রন্থেই দেখিতে পাওয়া যায়।

শ্রীহরিহর ভট্টাচার্য্য।

প্রতিমা।

বর্ত্তমান সময়ে আমরা জলের কলে কুকুরের অথবা বাঘের মুখ হইতে জল পড়িতেছে দেখিয়া পাশ্চাত্য শিল্পের নৈপুণ্য অনুভব করি। কিন্তু বহু শতাব্দী পূর্ব্বে আমাদের দেশের সুপ্রসিদ্ধ কবি বাণভট্ট কাদম্বরীর ভবন যে ভাবে সাজাইয়া গিয়াছেন, তাহার প্রতি লক্ষ্য করিলে আধুনিক পাশ্চাত্য শিল্পের তুলনায় প্রাচীন প্রাচ্যশিল্পের ন্যূনতা অনুভূত হয় না। রাজপুত্র চন্দ্রাপীড় কাদম্বরীর ভবনে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন,—কোথাও স্ফটিক নির্ম্মিত বলাকা-শ্রেণীর মুখ হইতে ঝর ঝর করিয়া জল পড়িতেছে, কোথাও কলের সাহায্যে কৃত্রিম মেঘমালা ঘুরিয়া বেড়াইতেছে, তাহাতে আবার ইন্দ্রধনু (রামধনু) শোভাবিস্তার করিতেছে। স্থানে স্থানে কলের ছোট ছোট গাছ বড় বড় জল বিন্দু বর্ষণ করিতেছে, কোথাও বা উড়ন্ত কলের পাখী পাখ নাড়িয়া জলকণা মিশ্রিত ঠাণ্ডা হাওয়া যোগাইতেছে *। সুতরাং কলের পুতুল চালাইয়া বাহাবা পাওয়ার প্রবৃত্তি এবং সফলতা পূর্ব্বকালে কম ছিল বলিয়া বোধ হয় না।

এখন যেমন চিত্রে প্রিয়ব্যক্তির প্রতিকৃতি অঙ্কিত করিয়া রাখা হয়, পূর্ব্বকালেও এই রীতির বহুল প্রচলনের পরিচয় পাওয়া যায়। বর্ত্তমান সময়ে অন্যের দ্বারাই প্রায় চিত্র অঙ্কিত হইয়া থাকে, কিন্তু পূর্ব্বকালে রাজা রাণী প্রভৃতি নায়ক নায়িকাগণ নিজেই এই শ্রেণীর চিত্রাঙ্কনে সমর্থ হইতেন। তাঁহারা ইচ্ছামত প্রিয়তমের বা প্রিয়তমার প্রতিকৃতি অঙ্কিত করিয়া তদ্দর্শনে বিরহের দুঃখ প্রশমিত করিতেন।

রাজা দুষ্মন্ত নিজের হাতেই শকুন্তলার মনোহর-মূর্ত্তি অঙ্কিত করিয়া তাহাতে নয়নযুগলকে পরিতৃপ্ত করিয়াছিলেন।

সাগরিকা বৎস রাজের চিত্র স্বহস্তেই অঙ্কিত করিয়াছিলেন। (রত্নাবলী ২য় অঙ্ক) কারুর দ্বারাও ফরমাইশ মত চিত্র প্রস্তুত করান হইত। শ্রীহর্ষের বর্ণনায় জানা যায় যে, নলরাজের রূপগুণ শ্রবণে তাঁহার প্রতি অনুরক্তা দময়ন্তী

---

* কচিৎস্ফটিক-বলাকাবলী বধ্যমানবারিধারা মিলিতেন্দ্রায়ুধাঃ সঞ্চার্য্যমানা মায়ামেঘমালাঃ... অনবরত স্থূলজলবিন্দুদুর্দ্দিন মুৎসৃজতঃ যন্ত্রবৃক্ষকান্। কচিদ্বিধূতপক্ষ-নিঃক্ষিপ্ত শীকরানীত নীহারা ভ্রমন্তী যন্ত্রময়ীঃ পত্র শকুনি শ্রেণীঃ। (কাদম্বরী)

লীলাগৃহের ভিত্তিতে কারুতরের দ্বারা নলের এবং নিজের চিত্র আঁকাইয়া উভয়ের সখ্য-দর্শন করিয়াছিলেন * ।

ভবভূতির লেখনী-প্রসূত রাম-বনবাসের বিস্তৃত চিত্রে অতীব নৈপুণ্যের পরিচয় পাওয়া যায়। সেই বৈচিত্র্য-পূর্ণ চিত্র-দর্শনে দ্রষ্টা রামচন্দ্র অতীত ঘটনাবলীকে উপস্থিত মনে করিয়া মোহিত হইয়াছিলেন। (উত্তরচরিত ১ম অঙ্ক)

সে কালে চিত্রাঙ্কন অবশ্য শিক্ষনীয় বিষয়ের অন্যতম বলিয়া বিবেচিত হইয়াছিল। দর্শনশাস্ত্রেও দৃষ্টান্ত স্থলে চিত্রের বর্ণনা দেখা যায়। সুতরাং কূট-তর্কপ্রিয় দার্শনিকগণও যে শিল্পশাস্ত্রের খবর রাখিতেন, তাহা সুস্পষ্ট বুঝা যায়। পঞ্চদশীর ষষ্ঠ পরিচ্ছেদের নাম চিত্রদীপ, এই পরিচ্ছেদে পরমাত্মাতে অধ্যস্ত সংসারকে চিত্ররূপে কল্পনা করা হইয়াছে, এই প্রসঙ্গে সেকালের চিত্র নির্ম্মাণ পদ্ধতির অনেকটা পরিচয় পাওয়া যায়। যথা—চিত্রপটে যেরূপ চারিটি অবস্থা দেখা যায়, সেইরূপ পরমাত্মাতেও চারিটি অবস্থা বুঝিতে হইবে।

চিত্রের চারিটি অবস্থা যথাক্রমে ধৌত, ঘট্টিত, লাঞ্ছিত ও রঞ্জিত এই চারি নামে অভিহিত হইয়াছে, তন্মধ্যে স্বভাবতঃ অর্থাৎ কেবল বস্ত্ররূপে অবস্থিত শুভ্রবস্ত্র "ধৌত", অন্নের দ্বারা বিশেষরূপে লিপ্ত "ঘট্টিত", মসীর দ্বারা (কালীর দ্বারা) আকার রূপে অঙ্কিত "লাঞ্ছিত" এবং সেই দাগের অনুসারে বিবিধ বর্ণের (রঙ্গের) পূরণ অর্থাৎ সন্নিবেশ হইলে "রঞ্জিত" নামে অভিহিত হয়। †

এই উক্তিতে বুঝা যায়, কাপড়ের উপর ভাতের মাড় লাগাইয়া তাহাতে প্রথমতঃ পেন্‌সিলের মত পদার্থের দ্বারা দাগিয়া তাহাতে নানা রঙ্গের সন্নিবেশ করা হইত।

---

* প্রিয়ং প্রিয়াঞ্চ ত্রিজগজ্জয়িশ্রিয়ৌ,
লিখাধিলীলাগৃহ-ভিত্তিকাবপি।
ইতি স্ম সা কারুবরেণ লেখিতম্,
নলস্যচ স্বস্যচ সখ্য মীক্ষতে। (নৈষধচরিত ১।৩৮)

† যথা চিত্রপটে দৃষ্ট মবস্থানাং চতুষ্টয়ম্।
পরমাত্মনি বিজ্ঞেয়ং তথাবস্থা-চতুষ্টয়ম্।
যথা ধৌতো ঘট্টিতশ্চ লাঞ্ছিতো রঞ্জিতঃ পটঃ।
... ...
স্বতঃ শুভ্রোঽত্র ধৌতঃস্যাৎ ঘট্টিতোঽন্ন বিলেপনাৎ।
স্যাকারৈ র্লাঞ্ছিতঃ স্যাদ্ রঞ্জিতো বর্ণ-পূরণাৎ॥

আমাদের শিল্পশাস্ত্রে চিত্রবিদ্যা চতুঃষষ্টি কলার অন্যতম বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। বাৎস্যায়নের কামসূত্রে চতুঃষষ্টি কলার যে নাম নির্দ্দেশ দেখা যায়, তাহাতে আলেখ্য (চিত্র) চতুর্থ স্থান অধিকার করিয়াছে *। কামসূত্রের টীকাকার যশোধর চিত্রকে "ষড়ঙ্গ" বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন, অর্থাৎ চিত্রনির্ম্মাতাকে ছয়টি বিষয়ে দৃষ্টি রাখিয়া কার্য্য সম্পাদন করিতে হইবে। সেই ছয়টি অঙ্গ যথাক্রমে রূপভেদ, প্রমাণ, ভাবযোজন, লাবণ্যযোজন, সাদৃশ্য এবং বর্ণিকাভঙ্গ †। যশোধর অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন যে, গীত হইতে চিত্র পর্য্যন্ত যে কয়টি কলা উক্ত হইয়াছে, তাহাদের প্রয়োজন অন্যের অনুরাগ জন্মান এবং নিজের চিত্ত বিনোদন ‡।

আমরা কিন্তু চিত্রকলার আরও অনেক প্রয়োজন অনুভব করি। চিত্র না হইলে শিল্পের স্বরূপ জ্ঞাপন করা অসম্ভব বলিয়াই মনে হয়। ছাত্রকে বুঝাইবার সময়ে চিত্রের সাহায্যে যতটা ভাব প্রকাশ করা যায়, কেবল ভাষার দ্বারা তাহা হইয়া উঠে না। টীকাকারগণ "পুষ্পবিশেষঃ" "জন্তুবিশেষঃ" এইরূপ উক্তির দ্বারা মূলের তাৎপর্য্য প্রকাশ করিয়া থাকেন, আমরাও সেইরূপ বৈজাত্য-নির্দ্দেশ-পূর্ব্বকই শিষ্য বুদ্ধির বৈশদ্য সম্পাদন করিয়া থাকি। কিন্তু প্রাচীন যুগের রীতি এইরূপ ছিল বলিয়া মনে হয় না। কারণ শিবধর্ম্মের একটি বচন পাঠে আমরা জানিতে পারি যে, যিনি সংস্কৃত, প্রাকৃত প্রভৃতি বাক্যের দ্বারা এবং দেশভাষা প্রভৃতি উপায়ের দ্বারা শিষ্যকে উপযুক্তরূপে বুঝাইতে পারেন, তিনিই গুরুনামে অভিহিত হন ¶। উক্ত বচনস্থ আদি পদের দ্বারা চিত্র প্রভৃতির গ্রহণ হইয়াছে বলিয়া মনে হয়। রঘুনন্দন ভট্টাচার্য্য মহাশয় আদিশব্দের অর্থ "গ্রন্থ করণাদি" বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। তাঁহার ব্যাখ্যাতেও "আদি" শব্দ দেখা যায়; সুতরাং তাঁহার সহিত একমত হইয়াও আমরা তৎপ্রযুক্ত আদি শব্দের বলে চিত্র প্রভৃতি উপায়কে ধরিতে পারি।

কারণ আমাদের মত শাস্ত্রব্যবসায়িগণও সেকালে কলাজ্ঞানে নৈপুণ্যলাভ

---

* গীতং বাদ্যং নৃত্যং আলেখ্যং বিশেষক চ্ছেদ্যম্ ইত্যাদি (৩ অধ্যায়)

† রূপভেদাঃ প্রমাণানি ভাবলাবণ্য-যোজনা।
সাদৃশ্যং বর্ণিকাভেদ ইতি চিত্রং ষড়ঙ্গকম্।

‡ এতানি পরানুরাগ-জননাত্মাত্মবিনোদার্থানিচ।

¶ সংস্কৃতৈঃ প্রাকৃতৈর্ব্বাক্যৈর্যঃ শিষ্য মনুরূপতঃ।
দেশভাষাদ্যুপায়ৈশ্চ বোধয়েৎ স গুরুঃ স্মৃতঃ। (আহ্নিকতত্ত্ব)

করিতেন। আমরা ভারতী মাতার নিকট যে সকল বিষয়ে জ্ঞানলাভের জন্য প্রার্থনা করি, তাহাতে নৃত্য গীতাদি কলারও নাম দেখিতে পাওয়া যায়। যথা—

"বেদাঃ শাস্ত্রানি সর্ব্বাণি নৃত্যগীতাদিকঞ্চ যৎ।
ন বিহীনং ত্বয়া দেবি! তথা মে সন্তু সিদ্ধয়ঃ॥"

সর্ব্বতন্ত্র-স্বতন্ত্র রাঘবভট্ট আত্মপরিচয় দানাবসরে নিজকে কলা-কুশল বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন; সুতরাং চিত্রবিদ্যা প্রভৃতি কলা যে পূর্ব্বাচার্য্য-দিগের বিশেষ আদরণীয় ছিল, এবং বিবিধ প্রয়োজন সম্পাদন করিত, তাহা বুঝা যাইতেছে।

মূর্ত্তিশিল্প আমাদের ধর্ম্মকর্ম্মের একটি প্রধান অঙ্গ। এই যে জগদম্বা সংবৎসরান্তে দশভুজাকারে ভক্তের মণ্ডপ শোভিত করিতে আসিতেছেন, তাঁহার মহাপূজায় যে সকল সামগ্রীর প্রয়োজন, তন্মধ্যে অভিরূপ প্রতিমাও একটি প্রধান অঙ্গ বলিয়া বিবেচিত হইয়াছে। শাস্ত্র বলিয়াছেন—পূজকের তপোবল, পূজোপকরণের আতিশয্য, এবং প্রতিমার আভিরূপ্য অর্থাৎ সৌন্দর্য্য, এই কয়টি কারণে দেবতার সান্নিধ্য হইয়া থাকে।*

ধ্যানকার্য্যে প্রতিমার বিশেষ প্রয়োজন। শুক্রনীতিসারে কথিত হইয়াছে যে, প্রতিমাকারক মানব যেরূপ ধ্যানরত হইতে পারে, অন্য কোনও উপায়ে সেরূপ হইতে পারে না। †

ধ্যানোপযোগিনী প্রতিমা শিল্পশাস্ত্রানুযায়ী অবয়ব-সন্নিবেশানুসারে নির্ম্মিত হইলে, মনোহারিণী সেই প্রতিমা পুণ্য প্রদান করেন, অবয়ব-সন্নিবেশের ব্যতিক্রম ঘটিলে সাধকের আয়ুধন বিনাশ করেন, এবং দুঃখ বৃদ্ধি করেন। ‡

প্রতিমার পরিমাণ সম্বন্ধে শাস্ত্রে বিশেষ নিয়ম দেখা যায়। দেবতাভেদে প্রতিমার পৃথক্ পৃথক্ পরিমাণ বিহিত হইয়াছে। তন্মধ্যে কয়টি মাত্র দেবতার পরিমাণ এই স্থানে প্রদর্শিত হইল, যথা—চণ্ডী, ভৈরব, বেতাল, নরসিংহ ও বরাহ, এই সকল ক্রূর দেবতার মূর্ত্তি দ্বাদশ তাল পরিমিত হইবে। §

---

* অর্চ্চকস্য তপোযোগাদর্চ্চনস্যাতি শায়নাৎ।
আভিরূপ্যাচ্চ বিম্বানাং দেবঃ সান্নিধ্য মৃচ্ছতি॥ (তিথিতত্ত্বে হয়শীর্ষ পঞ্চরাত্র)

† প্রতিমাকারকোমর্ত্ত্যো যথাধ্যান-রতোভবেৎ।
তথা নান্যেন মার্গেণ প্রত্যক্ষেণাপি বা খলু॥ (৪র্থ অ ৪ প্রকরণ)

‡ যথোক্তাবয়বৈঃ পূর্ণা পুণ্যদা সুমনোহরা।
অন্যথায়ুর্ধন-হরা নিত্যং দুঃখ বিবর্দ্ধিনী॥ (৪।৪।৭৩ শুক্র.)

§ চণ্ডী ভৈরব বেতাল নরসিংহ-বরাহকাঃ।
ক্রূরা দ্বাদশতালাঃ স্যু র্হয়শীর্ষাদয়স্তথা॥ (৪।৪।৮৬ শুক্র)

শাস্ত্রান্তরে দেবতা-প্রতিমা-দর্শন মাত্রই প্রণামের উপদেশ আছে। এই বিধি লঙ্ঘন করিলে প্রায়শ্চিত্ত করিতে হয়। যথা—

"দেবতা-প্রতিমাং দৃষ্ট্বা যতিং দৃষ্ট্বাপ্যদণ্ডিনম্।
নমস্কারং নকুর্য্যাদ্‌যঃ প্রায়শ্চিত্তীয়তে ত্বসৌ ॥"

দেবতা-প্রতিমা-ভঙ্গকারীর গুরুতর দণ্ডের বিধান দেখা যায়।

"দেবতা-প্রতিমা-ভেদক শ্চোত্তম সাহসং দণ্ডনীয়ঃ" (বিষ্ণুসং।৫।৬৭)

এই সকল প্রমাণানুসারে বুঝা যায় যে, আর্য্য জাতির সহিত প্রতিমার পরিচয় নূতন বা আগন্তুক নহে, আর্য্যধর্ম্মের সঙ্গে সঙ্গেই ধরণীমণ্ডলে প্রতিমা প্রতিষ্ঠাপিত হইয়াছে।

দেশভেদে এবং যুগভেদে প্রতিমা-পরিমাণের পার্থক্যের পরিচয় পাওয়া যায়। দেশভেদে মূর্ত্তির সপ্ততাল প্রভৃতি উচ্চতা হইয়া থাকে। * সত্যযুগে দশতাল, ত্রেতাযুগে নবতাল, দ্বাপরে অষ্টতাল এবং কলিযুগে সপ্ততাল পরিমাণ নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। † সুতরাং আমাদের মূর্ত্তির পরিমাণ-প্রভৃতির সহিত দেশান্তরের শিল্পশাস্ত্রের কোনও সম্বন্ধ নাই; মৎস্যপুরাণ হয়শীর্ষ পঞ্চরাত্র প্রভৃতি গ্রন্থে মূর্ত্তি শিল্পের বিস্তৃত বিবরণ দেখা যায়, এই সকল গ্রন্থের মৌলিকতায় পরবর্ত্তী অনেক গ্রন্থ প্রণীত হইয়াছে। দু' চারিটি প্রবন্ধের দ্বারা মূর্ত্তি শিল্পের বা চিত্রকলার সমগ্র বিবরণ প্রকাশ অসম্ভব, সুতরাং এই প্রবন্ধে অধিক প্রমাণ উদ্ধৃত হইল না।

শ্রীগিরীশচন্দ্র বেদান্ততীর্থ।

প্রাকৃত কামধেনু।

সম্প্রতি রাবণকৃত "প্রাকৃত কামধেনু" নামক একখানা প্রাকৃত ভাষার ব্যাকরণ আমাদের হস্তগত হইয়াছে। ইহাতে বঙ্গভাষার কয়েকটি শব্দের মূলভিত্তি দেখিতে পাওয়া যায়। গ্রন্থ অতি ক্ষুদ্রকলেবর; ৫ পত্রে ৩৪টি সূত্র।

---

* সপ্ততালাদ্যুচ্চতা বা মূর্ত্তীনাং দেশভেদতঃ। ৪।৪।৮৪। শু।

† দশতালা কৃতযুগে ত্রেতায়াং নবতালিকা।
অষ্টতালা দ্বাপরেতু সপ্ততালা কলৌযুগে। ৪।৪।৮৫।

সূত্রের পর বৃত্তি এবং উদাহরণও আছে; বৃত্তিকারের নাম নাই। প্রাপ্ত গ্রন্থ অতি জীর্ণ, কিঞ্চিৎ গলিত, লিপিকালের উল্লেখ নাই। গ্রন্থারম্ভে—

ব্রহ্মাণমাদৌ শিরসা প্রণম্য
..................বিদ্যাম্।
শ্রীরাবণেনানববুদ্ধিশালিনা
বিধীয়তে প্রাকৃত কামধেনুঃ॥
বিস্তরাদ্ গদিতং পূর্ব্বং সংক্ষেপাদধুনোচ্যতে।
বালবোধকরং সূত্রং দধ্নো যাদৃঙ্ নবোদ্ধৃতম্॥
দেবরুচ্যা প্রতীতানাং তদ্ভাবানাং নিগদ্যতে।
লক্ষণেনেহ যৎসিদ্ধং তৎসমং দেশজন্তু তৎ॥

গ্রন্থশেষে—"ইত্যাদ্যাভক্ত রাবণকৃত প্রাকৃত কা............।" এইরূপ পরিচয় পাওয়া যায়।

ডগমগি, থরথরি, দড়্‌বড়ি এই তিনটি শব্দ বাঙ্গালাতেও প্রযুক্ত হয়। "সোরট্ট মহরট্টাদীনি যথোপদিষ্টম্" এই সূত্রে উক্ত তিনটি শব্দ উদাহৃত হইয়াছে। আবার "ঐক্যং বহূনাং ত্বরিতোচ্চারিতানাম্" এই সূত্রের বৃত্তিতে "নৌখেলায়াং ডগ্‌মগীত্যেকো বর্ণঃ, দড়্‌বড়ি থরহরি ইত্যেকো বর্ণঃ ন বহবঃ।" এইরূপ উক্ত হইয়াছে। প্রাকৃত ও বাঙ্গালায় "ডগ্‌মগি" শব্দের অর্থভেদ হইলেও মূলশব্দ এক আছে। সংস্কৃত ভাষায় মাতৃবাচক সম্বোধনে "মাতঃ" প্রয়োগই অধিক। "মা" শব্দ থাকিলেও সম্বোধনে তাহার প্রয়োগ বড় দেখা যায় না। সংস্কৃত যখন কথিত ভাষা ছিল তখন সম্বোধনে "মা" প্রয়োগ ছিল কি না জানিবার উপায় নাই। বঙ্গভাষায় সম্বোধনে "মা" প্রয়োগই দেখা যায়; সংস্কৃত বহুল বিশুদ্ধ বাঙ্গালায় "মাতঃ" প্রয়োগ থাকিলেও কথিত ভাষায় তাহার প্রয়োগ একেবারেই নাই। "ওত্বং বিসর্জ্জনীয়ে সম্বোধনে চ" এই সূত্রে "মাতঃ =মত্তে, মাএ" উদাহৃত হইয়াছে। সম্ভবতঃ "মাএ"র "এ" পরিত্যাগ করিয়া বাঙ্গালাতে "মা", এবং একার স্থানে ইকার হইয়া হিন্দীতে "মাই" সম্বোধন স্থান পাইয়াছে। বাঙ্গালায় "থান" শব্দের ভূরি প্রয়োগ যথা—এখানে, সেখানে ইত্যাদি। "লোপ আদৌ সকারস্ত" এই সূত্রে "কাষ্ঠং=কাঠং। স্থানং= ঠানং, থানং" এই উদাহরণ দেখা যায়। বাঙ্গালা পদ্যে ব্যাখ্যান অর্থে "বাখান" শব্দের প্রয়োগ দেখা যায়। "যবয়োর্লোপঃ দ্বিত্বঞ্চানাদৌ" এই সূত্রে "ব্যাখ্যানং =বাখানং" এই উদাহরণ আছে। "পঞ্চম্যা ই" এই সূত্রদ্বারা পঞ্চমী বিভক্তি

স্থানে "ই" হয়, যেমন "বৃক্ষাৎ=বৃক্ষই"। এই "ই" হইতেই কি বাঙ্গালায় "হইতে" হইয়াছে? বাঙ্গালা পদ্যে দর্শনার্থে "হের" শব্দের যথেষ্ট প্রয়োগ দেখা যায়। "দর্শনার্থে প্রেক্ষিঃ" এই সূত্রের বৃত্তিতে—

"দর্শনার্থে সদা প্রেক্ষি র্ব্বদতো ভণিতি স্তথা।
প্রযুজ্যতে প্রাকৃতে হি হেরধাতুশ্চ দর্শনে॥
ইতি বাল্মীকি গ্রন্থে।"

এইরূপ উক্তি দেখা যায়। এই উক্তিতে বাল্মীকি প্রণীত প্রাকৃত ব্যাকরণেরও আভাস পাওয়া যাইতেছে।

"সোরট্ট মহরট্টাদীনি যথোপদিষ্টম্" এই সূত্রে "থরথরি" ও "ঐক্যং বহূনাং ত্বরিতোচ্চারিতানাম্" এই সূত্রে "থরহরি" এইরূপ প্রয়োগ দেখা যায়। লিপি-বিভ্রাটে এইরূপ হইয়াছে, কি শব্দই দুইটি তাহা জানিবার উপায় নাই।

শ্রীসতীশচন্দ্র সিদ্ধান্তভূষণ।

অভিব্যক্তি ও জন্মান্তরবাদ।

প্রাচীন আর্য্যগরিমা, সর্ব্বগুণাধার আর্য্যঋষি—তাঁহাদের নাম-স্মরণে প্রাণ নাচিয়া উঠে, তাঁহাদের পুণ্যস্মৃতিতে দেহ মন উৎফুল্ল হয়। কোন শাস্ত্র তাঁহাদের অবিদিত ছিল না, কোন বিদ্যা তাঁহাদের অনায়ত্ত ছিল না। আমাদের অধঃপতনের মাত্রা যত বর্দ্ধিত হইতেছে, আমাদের প্রাচীন কীর্ত্তির মোহ-মদিরা ততই আমাদিগকে মাতাইয়া তুলিতেছে। আধুনিক সাহিত্য, আধুনিক বিজ্ঞান কোন নূতন কথা বলিলে আমরা নিজেদের প্রাচীন পুঁজি-পাটা নাড়িয়া চাড়িয়া দেখি—আমাদের ভাণ্ডারের স্তূপের মধ্যে তাহার অনুরূপ কিছু আছে কি না তাহার অনুসন্ধান করি। সামান্য একটু মিল হইলে আর রক্ষা নাই, আমরা আধুনিক বিদ্যার গুরুত্ব উপেক্ষা করি, আধুনিক শিক্ষার ধৃষ্টতা দেখিয়া অট্টহাস্য করি, ঘাড় নাড়িয়া ভ্রূকুটি করিয়া বলি—এ সব পুরাতন কথা, আমাদের পূর্ব্বপুরুষগণ এ সকল রহস্য বহু শতাব্দী পূর্ব্বে করায়ত্ত করিয়াছিলেন। আধুনিক জগতের নভোযুদ্ধের আয়োজন দেখিয়াও আমাদের মধ্যে অনেকে বিস্মিত হয় নাই। ইন্দ্রজিৎ মেঘান্তরাল হইতে যুদ্ধ করিতেন, এরোপ্লেন-আবিষ্কর্ত্তা তাঁহার লুপ্ত বিদ্যাটা পুনরুদ্ধার করিয়াছেন মাত্র।

আর্য্যঋষিদিগের পুণ্য-স্মৃতিতে উৎফুল্ল হওয়া আমাদের পক্ষে স্বাভাবিক। তাঁহাদের সাধনার তুলনায় আধুনিক পাশ্চাত্য পণ্ডিতদিগের জ্ঞানচর্চ্চা তুচ্ছ, তাহা আমি অস্বীকার করি না। তাঁহাদের নীতি ধর্ম্মমূলক ছিল, তাঁহাদের প্রত্যেক অনুষ্ঠানের মূলে ধর্ম্ম ছিল। যোগবলে তাঁহারা দিব্যচক্ষু লাভ করিয়াছিলেন, অনেকে ভূত, ভবিষ্যৎ, বর্ত্তমান ত্রিকালের রহস্য দেখিতে পাইতেন। প্রাচীন আর্য্যগণ দর্শন ও বিজ্ঞানে এত নূতন বিধি আবিষ্কার করিয়াছিলেন, পাশ্চাত্য জগৎ বহুদিন প্রাণপাত পরিশ্রম করিয়াও সে সকল বিধি আবিষ্কার করিতে পারিবেন কি না সন্দেহ। কিন্তু ঠিক যে আকারে আধুনিক জগৎ বিজ্ঞান ও দর্শনের বিধি বুঝিয়া থাকে, প্রাচীন জগৎ ঠিক সেইরূপে বুঝিত—একথা বলিতে গেলে অজ্ঞতা প্রকাশ করা হয়। তখনকার সভ্যতা এক পথে অগ্রসর হইয়াছিল, আধুনিক সভ্যতা ভিন্নপথগামী। সুতরাং প্রাচীন ভারতে ঠিক এই রকমের রেল গাড়ি ছিল, এই প্রকার তাড়িতালোকে প্রাচীন অযোধ্যা বা কাঞ্চীনগর সুশোভিত ছিল, আধুনিক আগ্নেয়াস্ত্রের মত আকার-প্রকারের আগ্নেয়াস্ত্র লইয়া প্রাচীন ক্ষত্রিয়গণ সমরযাত্রা করিতেন—একথা বলিতে যাওয়া বাতুলতা।

আধুনিক পাশ্চাত্য জগতে অভিব্যক্তিবাদ বড় বেশী আদর পাইয়াছে। ইহার মূলে সত্য নিহিত আছে বলিয়া প্রায় সাধারণ পাশ্চাত্য পণ্ডিতের বিশ্বাস। দুই একজন অভিব্যক্তিবাদে আস্থা স্থাপন করিতে না পারিলেও অভিব্যক্তিবাদ আপামর সাধারণ অভ্রান্ত বলিয়া গ্রহণ করিয়াছে। জীবের অভিব্যক্তি হইতে ক্রমশঃ এই বিধি সকল বিষয়ে কার্য্য করিতে দেখা গিয়াছে; সমাজ, ব্যবসায়, বাণিজ্য সকল বিষয়ে এখন ক্রমোন্নতির নিয়ম দৃষ্ট হইতেছে। পারিপার্শ্বিক অবস্থার সহিত নিজের অবস্থার সামঞ্জস্য করিতে না পারিলে যেমন জীবশ্রেণীর উচ্ছেদ হয়, অর্থনীতিশাস্ত্রবিদ্ মার্শাল সাহেব বলিয়াছেন, পারিপার্শ্বিক অবস্থার সহিত নিজের অবস্থার সামঞ্জস্য করিতে না পারিলে কোন বিশেষ বাণিজ্যেরও ধ্বংস অবশ্যম্ভাবী।

পাশ্চাত্য জ্ঞান যখন এদেশে প্রবেশ লাভ করিল, তখন আমরা প্রত্যেক বিদ্যাটা লইয়া আমাদের প্রাচীন বিদ্যার সহিত মিলাইয়া দেখিতে আরম্ভ করিলাম। যুগপ্রবর্ত্তক অভিব্যক্তিবাদ লইয়াও আমাদের মধ্যে মহা গণ্ডগোল পড়িয়া গেল—অন্নবিদ্যা ভয়ঙ্করীর মুখে উপেক্ষার ক্ষীণ হাসি দেখা দিল, ভ্রূকুটির ভঙ্গিমা দেখা দিল, পাশ্চাত্য সাধনাকে অন্নবিদ্যা তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য

করিল। মোটামুটি শুনিয়া, অর্দ্ধেক বুঝিয়া অনেকে বলিয়া উঠিল ডারবিন, হার্বার্ট স্পেন্সার নূতন কোন কথা আবিষ্কার করেন নাই। তাঁহাদের বর্ণিত অভিব্যক্তিবাদ হিন্দুসমাজে বহু শতাব্দী পূর্ব্বে জ্ঞাত ছিল। আনি বেসান্তের মত প্রতিভাশালিনী বিদুষী বলিলেন—দশাবতারের তালিকা অভিব্যক্তির ক্রম মাত্র। ধন্য আর্য্যঋষিগণ, ধন্য পুণ্যভূমি ভারতবর্ষ! আধুনিক বিজ্ঞান প্রাণপাত পরিশ্রম করিয়া যে সত্য এতদিনে আবিষ্কার করিল, সে বিদ্যা যুগ-যুগান্তর ধরিয়া পবিত্র ভারতের মূর্খ জ্ঞানী আচণ্ডালের সাধারণ জ্ঞানরূপে বিরাজ করিতেছে।

প্রাচীন ভারতের পুণ্যস্মৃতিতে গৌরববোধ করা আমাদের পক্ষে বাস্তবিক সুখকর। এ দুর্দ্দিনে তাহাতে আমরা প্রভূত পরিমাণে শান্তিলাভ করি। কিন্তু সকল বিদ্যা আর্য্যঋষিদিগের করায়ত্ত হইয়াছিল তাহা বলিলে সত্যের অপলাপ করা হয়। আধুনিক পাশ্চাত্য জগতের অভিব্যক্তিবাদ যে একেবারে অভ্রান্ত তাহাও স্পর্দ্ধা করিয়া কেহ বলিতে পারে না। ইহা এখনও 'থিওরী' মাত্র, একটি অভিমত—অনেক চাক্ষুষ উদাহরণ দ্বারা অভিব্যক্তিবাদের সত্য সপ্রমাণ করিবার চেষ্টা হইতেছে মাত্র। এ মতে এখনও অনেক প্রমাণাভাব আছে, অনেক কথা মানিয়া লইতে হয়, বিশেষ প্রমাণের কোনও উপায় নাই। এখনও পর্য্যন্ত এমত অথণ্ড আছে, ইহার বিরুদ্ধে যত কথা বলা যায় তাহা অপেক্ষা অধিক কথা ইহার সপক্ষে বলিতে পারা যায়। জগতের অনেক গূঢ় রহস্য অভিব্যক্তিবাদ মীমাংসা করিয়াছে। কিন্তু তবু ইহা 'থিওরী'—ইহা একেবারে অভ্রান্ত বলিয়া সপ্রমাণ হয় নাই। এখনও ইহার বিরুদ্ধবাদিগণ বলিয়া থাকেন, জড় হইতে জীবের স্বতঃ-উৎপত্তি সম্ভবপর, জীবকোষেব অবস্থান্তর (transmutation), এক শ্রেণীর জীবকোষ হইতে অপর শ্রেণীর জীবকোষের উদ্ভব, সম্ভবপর। কিন্তু এ সকল মতামত এখনও অভিব্যক্তিবাদের গৌরব ম্লান করিতে পারে নাই।

অভিব্যক্তিবাদ সাধারণ গ্রাহ্য বলিয়াই আর্য্যশাস্ত্রে ইহার অস্তিত্ব সপ্রমাণ করিবার জন্য আমরা এত ব্যস্ত হইয়া উঠি। কিন্তু স্থির হইয়া দেখিলে বুঝিতে পারা যায়, দারবিন, হার্বার্ট স্পেনসার বা হাক্‌স্‌লে ঠিক যেভাবে অভিব্যক্তিবাদ বুঝাইয়াছেন সে অভিব্যক্তিবাদ কস্মিন্‌কালে কোন যুগে কোন আর্য্যঋষি কোন সংস্কৃত গ্রন্থে শিক্ষা দেন নাই। আমাদের জন্মান্তরবাদের সহিত অভিব্যক্তিবাদের মূল সত্যের মিল আছে বটে, কিন্তু তাহার সহিত অভিব্যক্তিবাদের সবিশেষ পার্থক্য আছে। দারবিনের অভিব্যক্তিবাদ ভারতের কেহ জানিত না, ইহার

জন্মস্থল ভারতবর্ষে নহে, একথা বেশ স্পষ্ট করিয়া বলা যাইতে পারে। অভিব্যক্তিবাদ সত্যমূলক হইলে তাহারই যশ পাশ্চাত্যের, তাহা ভ্রান্ত হইলে অপযশও পাশ্চাত্যের। ইহার দোষ-গুণের জন্ত আমাদের পূর্ব্বপুরুষগণ মোটেই দায়ী নহেন।

অভিব্যক্তিবাদের অনেক শাখা-প্রশাখা আছে। আমি মোটামুটি এস্থলে অভিব্যক্তিবাদের বর্ণনা করিব। তাহার পর জন্মান্তরবাদের সামান্ত পরিচয় দিয়া দেখাইব, এ দুই মতের মধ্যে কত পার্থক্য বিগুমান।

এক হইতে বহুর উদ্ভব, সরল দেহ হইতে জটিল কলেবরের ক্রমোন্নতি, সামান্ত আকার হইতে জটিল আকারের সৃষ্টি, সামান্ত প্রটোজোয়া বা আদি প্রাণী হইতে ক্রমোন্নতির ফলে একদিকে গোলাপ, দালিয়া অপর দিকে মনুষ্য দেহের বিকাশ, মোটামুটি অভিব্যক্তিবাদের ইহা প্রতিপাদ্য বিষয়। জীব ও উদ্ভিদের যেমন অভিব্যক্তি হইয়াছে, তেমনি এই পৃথিবীরও অভিব্যক্তি হইয়াছে। চন্দ্র-সূর্য্যও সামান্ত দেহ হইতে অমন তেজঃপুঞ্জ রুদ্রমূর্ত্তি লাভ করিয়াছে, শশী অমল শুভ্র শীতল বরবপু প্রাপ্ত হইয়াছে, অভিব্যক্তিবাদীর ইহা অভিমত। আমরা এস্থলে চন্দ্র সূর্য্য গ্রহ তারা নীহারিকা ধূমকেতুর অভিব্যক্তি ছাড়িয়া দিয়া জীবের অভিব্যক্তির কথা বর্ণনা করিব। বুঝিতে চেষ্টা করিব কিরূপে এই ধরণী শ্যাম বপু লাভ করিল, কিরূপে তাঁহার ক্রোড়ে দেবকান্তি জ্ঞান-বুদ্ধির আধার মনুষ্য-জাতি জন্মলাভ করিল।

অসীম বিমান-পথে কোটী কোটী চন্দ্র সূর্য্য গ্রহ তারা ঘুরিয়া বেড়াইতেছে, প্রত্যেকে নিজ নিজ কক্ষে ঘুরিতেছে ফিরিতেছে। বিমান-পথে মেঘের মত কতকগুলা পদার্থ ঘুরিয়া বেড়ায়। ইহাদের কতকটা পরস্পরের সহিত মিলিত হইয়া একসঙ্গে থাকিয়া ঘুরিতে আরম্ভ করে। ক্রমে ইহারা দানায় দানায়, এটমে এটমে সংমিশ্রিত হইয়া ঘনীভূত হয়, ইহারা ঘুরিতে ঘুরিতে ঘর্ষণে দীপ্ত হইয়া উঠে, জ্বলিয়া উঠে, সূর্য্যের মত প্রভাময় দেহ লাভ করে। ক্রমে ঘুরিতে ঘুরিতে ইহাদের তেজের হ্রাস হয়, উপরের অগ্নির প্রশমন হয়, জমাট বাঁধিয়া 'নেবুলা' বা নীহারিকার উপরে সর পড়িতে থাকে। তখন তাহা জীবজন্তুর বাসোপজীবী হয়। ধীরে ধীরে তাহার উপর প্রাণের বিকাশ হয়—প্রথমে বড় সরল প্রাণীর আবির্ভাব হয়—সরল সামান্ত দেহবিশিষ্ট আদি প্রাণী—ক্রমে তাহার দেহের জটিলতা জন্মিতে থাকে, ক্রমে ক্রমে সকল জটিল দেহবিশিষ্ট প্রাণী, জীব ও উদ্ভিদ, ধরিত্রীর অঙ্গ ছাইয়া ফেলে।

পৃথিবীর অভিব্যক্তি নেবুলা হইতে—কায়াহীন আকারবিহীন নীহারিকা হইতে এই ভূমণ্ডলের সৃষ্টি হইয়াছে। আধুনিক রসায়নশাস্ত্র কতকগুলি পদার্থকে উপাদান বা element বলিয়া শ্রেণীবদ্ধ করিয়াছে। পরীক্ষা দ্বারা সপ্রমাণ করিয়াছে যে, তাহাদের আর অপর পদার্থে বিভক্ত করিতে পারা যায় না, তাহাদের দুই কিম্বা বহুর সংমিশ্রণে পৃথিবীর যাবতীয় পদার্থের শরীর গঠিত হইয়াছে। অম্লজান, জলজান, স্বর্ণ, রৌপ্য, প্লাটিনম্ প্রভৃতি এই শ্রেণীর পদার্থ। এই সকল পদার্থ বাষ্পাকারে নেবুলার মধ্যে বিদ্যমান ছিল। ক্রমশঃ নেবুলা জমাট বাঁধিল, এই সকল উপাদান পরস্পরের সহিত মিশিয়া নূতন জীবন আরম্ভ করিল, সেই সকল পদার্থ জমাট বাঁধিয়া ভূপৃষ্ঠ সৃষ্টি করিল, পর্ব্বত ও সমুদ্রের বিকাশ হইল, জড় জগতের অভিব্যক্তি হইল।

এইরূপে জড় জগতের অভিব্যক্তি হইয়াছে, ঠিক ঐ রকম উপায়ে ভূমণ্ডলের আধুনিক আকারের সৃষ্টি হইয়াছে, এ শিক্ষা কোন হিন্দুশাস্ত্রে পাওয়া যায় না। আমি বলিতেছি ঠিক এইরূপ ক্রমবিকাশের মত, ঠিক এই রকম যুক্তিতর্ক পাশ্চাত্য পণ্ডিতদিগের নিজস্ব। ইহা সত্যমূলক কিম্বা এ যুক্তি-তর্কের মধ্যে ভ্রম আছে তাহা বলা সুকঠিন। কিন্তু এই মত তাঁহাদিগের নিজস্ব সে কথা জোর করিয়া বলা যাইতে পারে। মধুকৈটভের মেদ হইতে মেদিনীর যে জন্মকথা শাস্ত্রে বর্ণিত হইয়াছে, 'ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণে'র পৃথিবী খণ্ডে সপ্তম অধ্যায়ে পৃথিবীর যে উপাখ্যান আছে,সে কাহিনী ইহা হইতে বিভিন্ন তাহা বলা বাহুল্য। বেদান্তদর্শনের দ্বিতীয় অধ্যায়ের তৃতীয় পাদে সৃষ্টি-প্রক্রিয়া বর্ণিত হইয়াছে। তথায় প্রথম সূত্রের ব্যাখ্যার মধ্যে ভামতী টীকায় দেখিতে পাওয়া যায়—

"নথব্বাকাশমুৎপদ্যতে। কস্মাৎ। অশ্রুতেঃ।

অর্থাৎ "আকাশ উৎপন্ন হয় নাই। কেন? শ্রুতিতে তাহার উল্লেখ নাই।" ইহা ব্রহ্মে আশ্রিত। বায়ু ও তেজের অস্তিত্ব বুঝাইয়া শ্রীভগবান শঙ্করাচার্য্য বলিয়াছেন—"তেজোঽতস্তথাহ্যাহ॥" ভামতী টীকায় দেখিতে পাওয়া যায় "আপোঽতস্তেজসো জায়ন্তে।" অগ্নি হইতে জল জন্মিয়াছে। তাহার পর—"পৃথিব্যধিকাররূপ শব্দান্তরেভ্যঃ।" সূত্রের ব্যাখ্যায় মহাপণ্ডিত ভামতী বলিয়াছেন—"তা আপ ঐক্ষন্ত বহ্ব্যঃ স্যামঃ প্রজায়েমহীতি তা অন্নমসৃজন্ত।" অর্থাৎ "সেই জলেরা ভাবিল, আলোচনা করিল আমরা বহু হইব ও জন্মিব। অনন্তর তাহারা অন্ন বা পৃথিবীর সৃজন করিল।" তাহার পর টীকাকার বলিতেছেন—

"শ্রুত্যান্তরমপি সমানাধিকারমন্ত্বাঃ পৃথিবীতি ভবতি, তদ্‌যদপাং শর আসীৎ তৎ সমহন্যত সা পৃথিব্যভবদিতি চ।" অর্থাৎ শ্রুত্যন্তরেও পৃথিবীর জলযোনিত্ব কথিত আছে। উক্ত হইয়াছে সৃষ্টিকালে যে জলের শর হইয়াছিল, সেই শর সংহত অর্থাৎ কঠিন হইলে তাহা পৃথিবী হইল।"

বলা বাহুল্য এমতের সহিত পাশ্চাত্য মতের সামঞ্জস্য হয় না। কেবল এক প্রকার পদার্থ হইতে অপর প্রকার পদার্থের বিকাশ হইয়াছে—এই সূক্ষ্ম সত্য টুকু উভয় মতে দৃষ্ট হয়। তাহা ব্যতীত অপর সাদৃশ্য আছে বলিয়া মনে হয় না। আর্য্য ও পাশ্চাত্য মতের প্রধান পার্থক্য এই যে আর্য্য মত সকল পদার্থের কারণ ব্রহ্মে স্থাপন করিয়াছে, পাশ্চাত্য মত জড়ে আদৌ আত্মার অস্তিত্ব দেখিতে পায় নাই।

যাহা হউক, আবার পাশ্চাত্য মতের আলোচনা করিব। অভিব্যক্তিবাদী দার্শনিকদিগের মতে এইরূপে পৃথিবীর জন্ম হইল, ভূপৃষ্ঠ একটু শীতল হইল। "পৃথিবী ভূভাগ ও বারিধি মালায় বিভক্ত হইল। উত্তর মেরুতে প্রাণ ধারণের উপযুক্ত শৈত্য উপলব্ধি হইল। প্রাণহীন বাষ্প ও গ্যাস হইতে প্রাণহীন জলস্থল হইল, প্রাণহীন প্রস্তর জন্মিল, প্রাণহীন বায়ুও সৃষ্ট হইল।" *

প্রাণহীন পৃথিবীর সৃষ্টি হইল। শেষে প্রাণহীন অঙ্গারজান, অম্লজান প্রভৃতি কোন প্রকারে মিশিয়া আদিপ্রাণ সৃষ্টি করিল। ঠিক কিরূপ উপায়ে প্রাণহীন অম্লজান প্রভৃতি মিশিয়া প্রাণের সৃষ্টি করিল সে বিষয়ে পাশ্চাত্য জগতে নানা মুনির নানা মত দেখিতে পাওয়া যায়। বসুমতীর প্রথম জীবনে একবার অপ্রাণী জড় পরস্পরের সহিত মিলিয়া প্রাণের সৃষ্টি করিয়াছিল এ বিষয়ে সকলে একমত। তবে ঠিক কিরূপ বিশিষ্ট উপায়ে ঐরূপ কার্য্য সংঘটিত হইয়াছিল, সে বিষয়ে প্রত্যক্ষবাদী পাশ্চাত্য পণ্ডিতের দল কল্পনা সাহায্যে মৌলিক গবেষণায় প্রবৃত্ত হইয়াছেন। † অবশ্য সে সকল গবেষণার মধ্যে কোন্ পণ্ডিতের যুক্তি তর্ক অভ্রান্ত এ প্রবন্ধে তাহা বিচার করিবার আবশ্যক নাই। তাঁহারা সর্ব্ববাদীসম্মতি ক্রমে স্বীকার করিয়াছেন যে পৃথিবীতে প্রথমে একবার জড় হইতে চৈতন্যের আবির্ভাব হইয়াছিল। সেরূপ কার্য্য এখন হইতে পারে না। এখন কেবল প্রাণ হইতে প্রাণের বিকাশ হয়, এক শ্রেণীর উদ্ভিদ হইতে অপর শ্রেণীর উদ্ভিদের জন্ম হয়, এক শ্রেণীর জীব হইতে অপর শ্রেণীর জীবের অভি-

* অর্চ্চনা ১০ম বর্ষ ৪৩৫ পৃষ্ঠা।

† অর্চ্চনা ১০ম বর্ষ ৪৪১ পৃষ্ঠা।

ব্যক্তি হয়। সৃষ্টির প্রাক্কালে একবার 'জীব হইতে উদ্ভিদ কিম্বা উদ্ভিদ হইতে জীবের বিকাশ হইয়াছিল। আদিপ্রাণ উদ্ভিদদেহ অবলম্বন করিয়াছিল কি জীবদেহ অবলম্বন করিয়াছিল তাহাও তাঁহারা অভ্রান্তরূপে বলিতে পারেন না। কিন্তু সৃষ্টির প্রাক্কালে যাহা হইবার হইয়াছিল। এখন কিন্তু "জীব হইতে জীবের উদ্ভব। অপ্রাণী হইতে প্রাণী সৃষ্ট হয় না।" *

জীবসৃষ্টি বিশাল, বৈচিত্রময়। জীব ও উদ্ভিদ জগত যে কত ভাগে বিভক্ত কে তাহার ইয়ত্তা করিবে। "পৃথিবীর বিভিন্ন জাতীয় জীবের কথা ছাড়িয়া দিয়া কেবল এক একটা জীবশ্রেণীর প্রতি দৃষ্টি করিলে দেখিতে পাই এক একটা শ্রেণীও বহুশাখা প্রশাখায় বিভক্ত। এমন কি একই প্রকারের জীবের মধ্যে পার্থক্য দেখিতে পাই।" † বস্তুতঃ এই সকল পার্থক্য যে আবহমানকাল একই ভাবে চলিয়া আসিতেছে তাহা বলিতে পারা যায় না। আমাদের সম্মুখে আমাদেরই কার্য্যের দ্বারা জীব ও উদ্ভিদ জগতে কত নূতন শ্রেণীর জীব ও উদ্ভিদ উৎপন্ন হইতেছে তাহা আমরা নিত্য দেখিতে পাই। গৃহপালিত জীবের মধ্যে নানা শ্রেণীর নূতন জীব উৎপন্ন হইতেছে, মানবের সহিত সখ্য স্থাপন করিয়া গবাদি পশুজাতি অনেক নূতন শ্রেণীতে বিভক্ত হইতেছে। "মানুষ সকল সময় যে ইচ্ছা করিয়া গৃহপালিত জীবদিগের মধ্যে পার্থক্যের সৃষ্টি করিয়াছে, তাহাদিগকে বিভিন্ন শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়াছে, তাহা নহে। জ্ঞানে বা অজ্ঞানে সে যে গৃহপালিত জীবের শ্রেণীবৃদ্ধি করিয়াছে সে বিষয়ে সন্দেহ নাই।" "অনেক জন্তুর কপালে 'মনুষ্যালয়ে নির্ম্মিত' মোহর মারিয়া দিলে মোটেই সত্যের অপলাপ করা হয় না"। ‡

যেমন মনুষ্য আলয়ে থাকিয়া জীবের শ্রেণীবৃদ্ধি হয় তেমনি প্রকৃতির কোলে স্বাভাবিক ভাবে বাস করিবার সময় জীব নানা শ্রেণীতে বিভক্ত হয়। বস্তুতঃ নরগৃহের জীবশ্রেণীর বিষয় আলোচনা করিতে করিতে দারবিন সাহেব এ সত্য আবিষ্কার করিয়াছিলেন। তাহাতেই এদিকে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ হয়। শেষে পণ্ডিতেরা সিদ্ধান্ত করেন যে সামান্য এক-কোষ বিশিষ্ট আদিপ্রাণ হইতে বহুকোষ বিশিষ্ট জটিল প্রাণী সকলের অভিব্যক্তি হইয়াছে। এমন কি "এক শ্রেণীর আদি প্রাণী হইতে জীব ও উদ্ভিদ উভয় জাতির উন্মেষণ হইয়াছে।...

---

* অর্চ্চনা ১০ম বর্ষ ৫০ পৃষ্ঠা।

† অর্চ্চনা ১০ম বর্ষ ৯৮ পৃষ্ঠা।

‡ অর্চ্চনা ১০ম বর্ষ ১২১—১২৬ পৃষ্ঠা।

কেহ কেহ বলেন যে, আমাদিগের প্রথম পূর্ব্বপুরুষ বৃক্ষজাতীয় ছিলেন, কেহ কেহ বলেন তিনি জীব জাতীয় ছিলেন।" *

পাশ্চাত্য অভিব্যক্তিবাদীদিগের এই সিদ্ধান্তগুলি ঠিক এইরূপে কোনও স্থলে হিন্দুশাস্ত্রে নাই বলিয়াই আমার বিশ্বাস। শূন্যে বাষ্পমালা ঘুরিতে ঘুরিতে তাল পাকাইল, তাহার পর সূর্য্যদেবের মত আগুনের ভাটার মত সর্ব্বশরীরে বিষম উত্তাপ লইয়া ঘুরিতে ঘুরিতে ক্রমশঃ শীতল হইয়া বাহিরে শর পড়িল, মৃত্তিকার সৃষ্টি হইল। পৃথিবীর সৃষ্টি হইল কিন্তু তাহাতে কোনও জীবজন্তু নাই, শেষে এক শ্রেণীর প্রাণী সৃষ্টি হইল—তাহারা জীব কি উদ্ভিদ বলিতে পারা যায় না—দেহ বড় সরল, কুটিলতার চিহ্নমাত্র নাই, জ্ঞানের কোন লক্ষণ নাই, বহু শ্রেণীর বিকাশ নাই। কিন্তু অন্তরে এক বিষম তেজ আছে, প্রাণে একটা অব্যক্ত স্পৃহা আছে—বাড়িবে;বিকশিত হইবে , জটিল হইবে, অভিব্যক্ত হইবে। একটু পার্থক্য ঘটিল, আদি প্রাণী জটিল হইল, জটিলতর হইল। সন্তান সন্ততির মধ্যে পার্থক্যের গণ্ডী গভীর হইল—সন্তান সন্ততি বিভিন্ন শ্রেণীতে বিভক্ত হইল। এক শ্রেণীর সহিত অপর শ্রেণীর সম্বন্ধ আছে তাহা সহজে বুঝিয়া উঠা কঠিন। পার্থক্য বাড়িতে লাগিল কিন্তু প্রত্যেক জাতির প্রাণে সেই আকাঙ্ক্ষা সেই অব্যক্ত বাসনা—আরও বিকসিত হইব, অপরের অপেক্ষা কর্ম্মনিপুণ হইব, জীবন সংগ্রামে জয়ী হইব। এক শ্রেণী উদ্ভিদ হইল—জড়বৎ উদ্ভিদ—কিন্তু তাহারও প্রাণে আকাঙ্ক্ষা আছে—অপর শ্রেণী জীবে পরিণত হইল। ক্রমে জীব শ্রেণী মনুষ্যত্ব লাভ করিল—মনের বিকাশ হইল, বুদ্ধি শক্তির বিকাশ হইল। আরও কি হইবে তাহা ভবিষ্যতের তিমিরগর্ভে নিহত।

ঠিক এই প্রকারে মনুষ্যজাতির অভিব্যক্তি হইয়াছে হিন্দুশাস্ত্র তাহা বলে না। মনুষ্যজাতির এইরূপে অভিব্যক্তি হইবার কতকগুলা কারণও পাশ্চাত্য পণ্ডিতেরা নির্দ্দেশ করিয়াছেন, সেগুলিও তাঁহাদের নিজস্ব।

(ক্রমশঃ)

শ্রীকেশবচন্দ্র গুপ্ত।

---

* অর্চ্চনা ১০ম বর্ষ ৩৩৩ পৃষ্ঠা।

পাদ্রী কেরী।

এদেশে আসিয়া প্রথম সাত বৎসর কাল কেরীসাহেব যে ভাবে জীবন যাপন করেন, সে ভাবের জীবনকে দুঃখ-দারিদ্র্যের—অকৃতকার্য্যতার জীবন বলা যায়। ১৭৯৩ খৃষ্টাব্দে তিনি এদেশে আসেন, তখন হইতে সাত বৎসর কাল পর্য্যন্ত তিনি কোনদিকে কিছুই সুবিধা করিয়া উঠিতে পারেন নাই। এই কয়বৎসর কাল ক্রমাগত অর্থকষ্ট তাঁহাকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিয়াছিল। এই কয় বৎসরের মধ্যে একটি হিন্দুকেও তিনি 'অন্ধকার হইতে আলোকে' আনিতে সমর্থ হন নাই। এই শেষোক্ত ঘটনাটিই তাঁহার সর্ব্বাপেক্ষা মর্ম্মপীড়ার কারণ হইয়াছিল।

তবে "চক্রবৎ পরিবর্ত্তন্তে দুঃখানি চ সুখানি চ।" কেরী সাহেবেরও অদৃষ্ট-চক্রের গতি ফিরিতে আরম্ভ হইল। সাত বৎসর কাল উপর্য্যোপরি ব্যর্থ-প্রয়াসের পর তিনি জীবন-যুদ্ধে জয়ী হইতে আরম্ভ করিলেন। ১৮০০ খৃষ্টাব্দে জানুয়ারী মাসের ১০ই তারিখে, যেদিন তিনি শ্রীরামপুরে বসিয়া পাদ্রীদিগের জন্য সেখানে এক কুঠী নির্ম্মাণ করেন, সেইদিন হইতে তাঁহার দুঃখ-নিশি অবসান হইবার সূচনা দেখা দিল। ঐ দিন বাঙ্গালার ইতিহাসের পক্ষেও একটা বিশেষ স্মরণীয় দিন। কারণ, শ্রীরামপুরে পাদ্রীদিগের ঐ আস্তানা প্রতিষ্ঠার পর হইতেই বঙ্গদেশে ধর্ম্মবিপ্লবের সূত্রপাত হয়—হিন্দু খ্রীষ্টান হইতে আরম্ভ করে।

খ্রীষ্টীয় ধর্ম্ম প্রচারের পক্ষে শ্রীরামপুর তখন বিশেষ সুবিধার স্থানই ছিল। কারণ, শ্রীরামপুর তখন দিনেমারদিগের অধীনে। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর আইন সে সময়ে শ্রীরামপুরে চলিত না। শ্রীরামপুরের তখন সরকারী নাম ছিল—'ফ্রেডারিকস্ নগর'। ১৭৫৫ খৃষ্টাব্দে দিনেমারেরা মুর্শিদাবাদের নবাবের নিকট হইতে 'ফারমান' আনাইয়া শ্রীরামপুরে কুঠী নির্ম্মাণ করে। ১৮০১ খৃষ্টাব্দে ইংরাজ ও দিনেমারে যুদ্ধ বাধে। সেই যুদ্ধে দিনেমারদিগকে শ্রীরাম-পুর দেশটি হাতছাড়া করিতে হয়।

শ্রীরামপুরে কেরী সাহেবের আস্তানা প্রতিষ্ঠিত হইলে, বিলাতের মিশনরী-কর্ত্তৃপক্ষ তাঁহার জনকয়েক সহকারী নিযুক্ত করিয়া দেন। এই সহকারিগণের

নাম,—ডাক্তার যশুয়া মার্শমান, মার্শমানের পত্নী হেনা মার্শমান, ব্রাণ্ডসেন, গ্রাণ্ট ও উইলিয়াম ওয়ার্ড। হেনা মার্শমান—এদেশের প্রথম স্ত্রী-পাদ্রী।

পাদ্রী কেরী গোঁড়া খৃষ্টান ছিলেন। হিন্দুর আচার-ব্যবহার তিনি দুই চক্ষে দেখিতে পারিতেন না। ১৮০০ খৃষ্টাব্দের শেষ রবিবারে তিনি শ্রীরামপুরে বসিয়া কৃষ্ণচন্দ্র পাল নামক একজন বাঙ্গালীকে খৃষ্টান-ধর্ম্মে দীক্ষিত করেন। যতদূর জানা যায়,তাহাতে মনে হয় এই কৃষ্ণচন্দ্রই প্রথম বাঙ্গালী-খ্রীষ্টান; জাতিতে সে সূত্রধর। চন্দননগরে তাহার বাটী ছিল, কিন্তু কৃষ্ণচন্দ্র বাস করিত শ্রীরাম-পুরের নিকটেই। যখন সে খ্রীষ্টান হয়, তখন তাহার বয়স ৩৬ বৎসর। শুনা যায়, কৃষ্ণচন্দ্র অর্থের ও উন্নতির লোভেই খ্রীষ্টান-ধর্ম্মে দীক্ষিত হয়। যাহা হউক, খ্রীষ্টান হইয়া সে কেরী সাহেবের কার্য্যে বিশেষ সহায়তা করিয়াছিল। নিজের ঘরের সকলকেই একে একে সে খৃষ্টান করে। প্রথমে নিজের স্ত্রীকে, তারপর স্ত্রীর এক ভগ্নী, নিজের চারিটি কন্যা, ও এক বিধবাকে কৃষ্ণচন্দ্র 'অন্ধকার হইতে আলোকে' লইয়া যায়। তাহার পত্নীর নাম রাসমণি, আর উক্ত বিধবাটির নাম অন্নপূর্ণা। কৃষ্ণচন্দ্রের শালী জয়মণি—প্রথম বাঙ্গালী খ্রীষ্টান-রমণী। ইহাদের খৃষ্টান হইবার অল্পদিন পরেই গোকুলমণি নাম্নী আরও একটি বাঙ্গালীর মেয়ে খ্রীষ্টান হইয়াছিল। কৃষ্ণচন্দ্র শ্রীরামপুরে একটি গির্জ্জা স্থাপন করে; ইহাই প্রথম দেশীয় খৃষ্টান-ভজনালয়।

কৃষ্ণচন্দ্রের পূর্ব্বে একজন বাঙ্গালী খ্রীষ্টান হইয়াছিল বলিয়া একটা কথা শুনা যায় বটে; কিন্তু তাহার স্বপক্ষে তেমন কোনও প্রমাণ পাওয়া যায় না। শুনা যায় যে, লর্ড ক্লাইভের আনীত সুইডেন দেশীয় পাদ্রী কির্ণাণ্ডার ইতিপূর্ব্বে ঘনশ্যাম দাস নামক এক বাঙ্গালী যুবককে নাকি খ্রীষ্টান-ধর্ম্মে দীক্ষিত করেন। ঘনশ্যাম জাতিতে কায়স্থ ছিল। সে অল্পবয়সেই লর্ড ক্লাইভের সেনাদলে যোগদান করে, এবং পরে বিলাত যায়। বাঙ্গালীর বিলাত-যাত্রা বোধ করি, এই প্রথম। বিলাত হইতে ফিরিয়া আসিয়া ঘনশ্যাম ১৭৭৪ খৃষ্টাব্দে কলিকাতার সুপ্রীম কোর্টে দোভাষীর ও অনুবাদকের কার্য্যে নিযুক্ত হয়। ঘনশ্যামের এইটুকু ইতিহাসই জানিতে পারা যায়; কির্ণাণ্ডার ঘনশ্যামকে সত্য সত্যই খ্রীষ্টান-ধর্ম্মে দীক্ষিত করেন কিনা, সে সম্বন্ধে বিশেষ কোনও প্রমাণ অদ্যাবধি পাওয়া যায় নাই। কিন্তু কেরী সাহেবের প্ররোচনায় কৃষ্ণচন্দ্র পাল যে স্বধর্ম্ম ত্যাগ করে, একথা প্রমাণসিদ্ধ।

কৃষ্ণচন্দ্র জাতিতে সূত্রধর বলিয়া, তাহাকে খৃষ্টান করিয়া কেরী সাহেবের

তেমন বিশেষ তৃপ্তি হয় নাই। তাঁহার সাধ ছিল যে, উচ্চশ্রেণীর হিন্দুকে খৃষ্টান করিবেন। কিছুদিন পরে তাঁহার সে সাধও পূর্ণ হইয়াছিল। শ্রীরামপুরে পীতাম্বর সিংহ নামে চল্লিশ বৎসর বয়সের এক কায়স্থকে তিনি খৃষ্টান-ধর্ম্মে দীক্ষিত করেন। পীতাম্বর কৃষ্ণচন্দ্রের মত নিরক্ষর ছিল না। শ্রীরামপুরের মিশনারী ফ্রীস্কুলে কেরী তাহাকে শিক্ষকের পদে নিযুক্ত করিয়া দেন। তারপর কৃষ্ণপ্রসাদ নামে ১৯ বৎসর বয়সের এক ব্রাহ্মণ বালককে কেরী সাহেব কলিকাতায় আনিয়া খৃষ্টান করেন। এই ব্রাহ্মণ বালককে খৃষ্টান করিয়া কেরী সাহেবের মহা আনন্দ হইয়াছিল। পরে শ্যামদাস নামে আর একটি কায়স্থের ছেলেও কেরীর উদ্যোগে খৃষ্টান হয়। পীরুমিঞা নামে এক মুসলমান শ্যামদাসের প্রতিবেশী ছিল। কেরী এই মুসলমানকেও খৃষ্টান করেন। পীরুমিঞা এদেশের প্রথম মুসলমান খৃষ্টান।

খৃষ্টান ধর্ম্মের আরও অধিক প্রচার জন্য কেরী সাহেব এই সময়ে আর এক পন্থা অবলম্বন করেন। যাহাতে খৃষ্টানী শিক্ষা পাইয়া এদেশের ছেলেরা খৃষ্টান-ধর্ম্মে অনুরক্ত হয়, তাহার জন্য কেরী মিশনারী সম্প্রদায়ের অর্থ সাহায্যে নানা স্থানে 'ফ্রীস্কুল' প্রতিষ্ঠা করিতে লাগিলেন। এই হিড়িকে ১৮১০ খৃষ্টাব্দে ছেলেদের জন্য কলিকাতাতেও একটি 'ফ্রী স্কুল' স্থাপিত হয়। ১৮১৮ খৃষ্টাব্দের মধ্যে কেরী সাহেবের চেষ্টায় ও উদ্যোগে বাঙ্গালা দেশে প্রায় ১২৬টি বিদ্যালয় স্থাপিত হইয়াছিল। ১৮১৭ খৃষ্টাব্দে কলিকাতার হিন্দু অধিবাসীরা কলিকাতা সহরে 'হিন্দু স্কুলের' প্রতিষ্ঠা করেন। ১৮২১ খৃষ্টাব্দে 'শ্রীরামপুর কলেজ' স্থাপিত হয়,—স্থাপনকালে কলেজের ছাত্রসংখ্যা মোটে ৩৭টি ছিল। ইহার পর, ১৮২৭ খৃষ্টাব্দে কলিকাতায় 'ডফ কলেজ' প্রতিষ্ঠিত হয়।

এদেশের প্রচলিত ভাষায় বাইবেলের কথা প্রচারিত না হইলে, দেশের লোক খৃষ্টানী ভাবে অনুপ্রাণিত হইবে না ভাবিয়া কেরী এদেশের প্রায় সকল ভাষাতেই বাইবেল গ্রন্থ প্রচার করেন। এইজন্য তাঁহাকে কঠোর পরিশ্রম ও অসীম অধ্যবসায়ের সহিত সংস্কৃত, বাঙ্গালা, হিন্দী ও উড়িয়া প্রভৃতি ভাষা শিখিতে হইয়াছিল। এদেশে যত রকম ভাষা প্রচলিত আছে, তাহার মধ্যে বাঙ্গালা ভাষাকেই তিনি সকল ভাষার চেয়ে পছন্দ করিতেন, ভালবাসিতেন। বাঙ্গালা ভাষার প্রসার ও ঐ ভাষা শিক্ষার উপযোগিতা সম্বন্ধে তিনি তাঁহার ব্যাকরণ-খানির * ভূমিকায় যে সকল কথা বলিয়া গিয়াছেন, তাহা বাঙ্গালী পাঠকের

* আন্তরিক কৃতজ্ঞতার সহিত জানাইতেছি যে, এই গ্রন্থখানি আমি অগ্রজপ্রতিম পূজনীয় শ্রীযুক্ত কেশবচন্দ্র গুপ্ত মহাশয়ের নিকট হইতে প্রাপ্ত হইয়াছি।—লেখক।

প্রণিধানযোগ্য। আমরা এস্থলে সেই 'ভূমিকা'র স্থলবিশেষ উদ্ধৃত করিয়া দিলাম :—

"Bengal, as the seat of the British Government in India, and the centre of a great part of the commerce of the East, must be viewed as a country of great importance. Its soil is fertile, its population great, and the necessary intercourse subsisting between its inhabitants and those of other countries who visit its ports, is rapidly increasing. A knowledge of the language of this country must therefore be a very desirable object.

A language which is spoken from the Bay of Bengal in the south, to the mountains of Bootan in the north, and from the borders of Rangpur to Arakan.

In Bengal all bonds, leases, and other agreements, or instruments, are generally written in the current language; and the greater part of those persons with whom a European is concerned, especially in the collection of revenue, and in commercial undertakings, speak no other; to this may be added, that, with a few exceptions, those who have a smattering of Hindoosthanee, speak it too imperfectly to express their sentiments with precision."

"The Bengalee may be considered as more nearly allied to the Sungskrita than any of the other languages of India; for though it contains many words of Persian and Arabic origin, yet four-fifths of the words in the language are pure Sungskrita. Words may be compounded with such facility, and to so great an extent in Bengalee, as to convey ideas with the utmost precision, a circumstance which adds much to its copiousness. On these, and many other accounts, it may be esteemed one of the most expressive and elegant languages of the East."

কেরী অসাধারণ মেধাবী পুরুষ ছিলেন। তখনকার কালে এক কোলব্রুক সাহেব ছাড়া আর কোনও ইংরাজ তাঁহার মত ভাষাবিদ্ ছিলেন না। নানা ভাষায় তাঁহার অভিজ্ঞতা দেখিয়া গবর্ণমেণ্ট তাঁহাকে কলিকাতার 'ফোর্ট

উইলিয়াম কলেজে' ভারতীয় ভাষার অধ্যাপক-পদে নিযুক্ত করেন। মিশনারী-দিগকে গবর্ণমেণ্ট সে সময়ে তেমন সুনজরে দেখিতেন না বটে, কিন্তু উপায়ান্তর না দেখিয়া বাধ্য হইয়াই পাদ্রী কেরীর উপর তাঁহারা এই কার্য্যের ভার অর্পণ করিয়াছিলেন।

ইংরাজেরা কেরীকে এদেশের 'উইক্লিফ্' নামে অভিহিত করেন। এইরূপ আখ্যা দিবার কারণও আছে। জন উইক্লিফ্ যেমন বাইবেলকে বিলাতের সর্ব্বজনপাঠ্য করিবার জন্য লাটিন্ বাইবেলকে সর্ব্বপ্রথম ইংরাজী ভাষায় অনূদিত করেন, কেরীও তেমনি এদেশে খৃষ্টান-ধর্ম্ম প্রচারের পথ সুগম হইবে মনে করিয়া বাইবেল-গ্রন্থকে এদেশীয় নানা ভাষায় ভাষান্তরিত করিয়া গিয়াছেন। উইক্লিফের সময় বিলাতে যেমন ধর্ম্মে ও সাহিত্যে যুগান্তর আসিয়াছিল, বঙ্গদেশেও কেরীর আবির্ভাবে অনেকটা সেইরূপ ঘটিয়াছিল। ১৮২৯ খৃষ্টাব্দে বঙ্গভাষা বাঙ্গালা দেশের আইন-আদালতের ভাষা বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হয়। এ সময়ে কেরীর উদ্যোগে এদেশের বহু উদ্ভ্রান্ত উচ্ছৃঙ্খল যুবক স্বধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া খৃষ্টধর্ম্মে দীক্ষিত হয়।

সতীদাহ প্রথার মূলোচ্ছেদন ব্যাপারেও কেরী সাহেব সর্ব্বপ্রধান উদ্যোগী ছিলেন। তিনি ইহার বিরুদ্ধে লর্ড ওয়েলেস্‌লির নিকট অতি তীব্র ভাষায় তিনখানি আবেদন পত্র পেশ করেন; তৃতীয় পত্রে ফল হইয়াছিল। ১৮০৫ খৃষ্টাব্দের ৫ই ফেব্রুয়ারী তারিখে লর্ড ওয়েলেস্‌লি সতীদাহ প্রথার বিরুদ্ধে সর্ব্বপ্রথম আইন তৈয়ারী করেন। তাহার পর ১৮৩৯ খৃষ্টাব্দে লর্ড বেণ্টিকের শাসন সময়ে,ইংরাজ পাদ্রী কেরী ও উড়িয়া পণ্ডিত মৃত্যুঞ্জয়ের উদ্যোগে, এবং ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রবর্ত্তক রাজা রামমোহন রায়ের চেষ্টায় সতীদাহ-প্রথা দেশ হইতে একেবারে উঠিয়া যায়।

[আগামীবারে সমাপ্য।]

শ্রীঅমরেন্দ্রনাথ রায়।

মন্ত্র-শক্তি।

(১)

আমি প্রেমিক নহি—যেহেতু ঠিক কুড়ি বৎসর বয়ঃক্রমের সময় আমার শুভবিবাহ হইয়াছিল। আমি বিদ্বান বা বুদ্ধিমান নহি—যেহেতু উদরান্নের জন্য আমাকে সওদাগরি আফিসে দালালি করিতে হয়। আমি পরচর্চ্চা করিয়া বিমল নির্দ্দোষ আমোদ উপভোগ করিবার অবসর পাই না—যেহেতু সর্ব্বদাই বগলে কাপড়ের নমুনা লইয়া আমাকে চিনাবাজার, বড়বাজার, চাঁদনী, বহুবাজার প্রভৃতি স্থলে পোষাক বিক্রেতাদের দোকানে দোকানে ঘুরিয়া বেড়াইতে হয়। কিন্তু তাহা বলিয়া ছোট সাহেবের সহিত মাসাবধি প্রত্যহ আঁটসাঁট বেশ ভূষিত হিমাংশু-জ্যোতিঃ যুবতী মেমকে বৈকালে ঘুরিয়া বেড়াইতে দেখিয়া নিঃসঙ্কোচে সিদ্ধান্ত করিয়াছিলাম যে সাহেব বাহাদুর কন্দর্প ঠাকুরের কুসুমশরের আঘাতে জর্জ্জরিত হইয়াছেন, সেই গোলাপ-গণ্ড নীলাক্ষি সুন্দরীর পদতলে আত্মবিক্রয় করিয়াছেন। ময়দানের দিকে গেলেই দেখিতাম বেশ পরিপাটিরূপে বেশভূষা করিয়া কিঙ্ সাহেব সেই যুবতীটির সহিত মোটরে গল্প করিতে করিতে ছুটিতেছেন, কখনও বা কেল্লার দক্ষিণে কুলিবাজারের মাঠের উপর মেম সাহেবের বাহুতে বাহু বাঁধিয়া ঘুরিতেছেন, কখনও বা ইডেন উদ্যানের ব্যাণ্ড ষ্ট্যাণ্ডের নিম্নে বেতের চেয়ারে বসিয়া সঙ্গীত উপভোগ করিতেছেন। একদিন দেখিলাম সাহেব মেম বায়োস্কোপে প্রবেশ করিলেন, একদিন প্রণয়ী-যুগলকে ফুটবল ম্যাচের ভিড়ের মধ্যেও দেখিতে পাইলাম। মনে মনে বড় আনন্দ হইল। কিঙ্ সাহেব বড় অমায়িক লোক, তাঁহার ভাবী সহধর্ম্মিণীর সৌন্দর্য্যে আমি মোহিত হইলাম।

একদিন এক মস্ত অর্ডার লইয়া সাহেবের গৃহে কথোপকথন করিতেছিলাম, সেদিন ফুটবল ম্যাচের শিল্ড্ প্রতিদ্বন্দ্বিতার শেষ দিন। সাহেব বলিলেন—অমরবাবু! বলুন তো আজ কে জিতবে? আরগাইল্ না কিঙ্স্ওন্?

আমি বলিলাম—সাহেব আমার অত সখ্ নেই। ও গোরার দলের যে কেহ জিততে পারে তাতে আমার এসে যায় না।

সাহেব হাসিয়া বলিলেন—তবুও তো লোকে একটা ধারণা করে।

আমি বলিলাম—সাহেব, নিজের সংসার নিয়ে ব্যস্ত, পরিবারের সুখের জন্যে—

সাহেব হাসিলেন, বলিলেন—নিজে কিছু উপভোগ করবে না ?

আমি বলিলাম—সাহেব এইবার দেখ্‌ব। যখন তখন বাবুদের পরিহাস করেন, এইবার আপনাকেও বুঝতে পারা যাবে। মেম সাহেবের হুকুম—

কিন্তু সাহেব বালকের মত হাসিয়া উঠিলেন, আমাকে বলিলেন—কি বল্‌ছ বাবু ?

আমি বলিলাম—সাহেব যখন বিকেলে রাস্তায় বেড়াই তখন চোক বুজে বেড়াই না। সাহেব, বিয়ের সময় আমাদের খাওয়াতে হ'বে। আমি আফিসের বাবুদের ব'লে দিচ্ছি।

সাহেব হাসিয়া বলিলেন—বাবু, তুমি দেখেছ ? বলতো আমার পছন্দ কেমন ?

আমি আন্তরিক আনন্দ প্রকাশ করিয়া বলিলাম—সাহেব, আপনি বেশ সুন্দরী মেম বিবাহ কর্‌ছেন। ভগবান আপনাদের বাঁচিয়ে রাখুন। আমাদের মধ্যে লক্ষ্মীশ্রী ব'লে একটা কথা আছে। আপনার মেমের সেটা ষোল আনা আছে !

সাহেব ধন্যবাদ করিয়া আমার করমর্দ্দন করিলেন। তিনি বলিলেন—বাবু, আমি খুব ভাল বংশের ছেলে, মিশ্‌ ডারকুমানও খুব ভাল বংশের কুমারী।

আমি বলিলাম—মিশ্‌ ডারকুমান ? জার্ম্মান আফিসের বড় সাহেব ডারকুমানের কন্যা ?

সাহেব সম্মতিসূচক ঘাড় নাড়িলেন। বাস্তবিক জার্ম্মাণ হইলেও ইংরাজ সওদাগর সমাজে ডারকুমান সাহেবের বেশ প্রতিপত্তি ছিল। কাজ সারিয়া যখন চলিয়া আসি তখন সাহেব বলিলেন—অমরবাবু, বাবুদের এখন এ কথা বল্‌বেন না। আমি বিবাহের সময় নিশ্চয় তাঁ'দের ভোজ দিব—বাগানে বলেন, কালীঘাটে বলেন, যেখানে ইচ্ছে। তবে এখন কথাটা গোপন রাখবেন।

আমি প্রতিশ্রুত হইলাম। প্রতি বৎসর জানুয়ারীর প্রথম দিনে আমাদের অফিস হইতে বাবুদের কালীঘাটে পূজার জন্য একশত টাকা দেওয়া হইত। তাই সাহেবের অভিপ্রায় বিবাহের উৎসবে তিনি ঐরূপ একটা ভোজ দিয়া বাবুদের তুষ্ট করিবেন। তিনি বাস্তবিক ভদ্রলোক, সম্ভ্রান্তবংশীয় ইংরাজ। নেহাৎ পেটের দায়ে পয়সা লুটিবার জন্য ভারতবর্ষে আসেন নাই।

(২)

সেদিন সমস্ত দিন বৃষ্টি হইয়াছিল। আমায় কিন্তু অভ্যাসমত অফিসের গাড়ি চড়িয়া নমুনার খাতা বগলে করিয়া দোকানে দোকানে ঘুরিতে হইয়াছিল —মহাপূজার জন্য অর্ডার সংগ্রহ করিতেছিলাম। সেদিন দোকানদারদের ঘরে তেমন ভিড় ছিল না, সুতরাং আমি প্রত্যেক দোকানে বসিয়া দুই দণ্ড বাক্যালাপ করিবার অবসর পাইয়াছিলাম। অনেক কাজও সংগ্রহ করিয়াছিলাম।

বেলা ছয়টার সময় এক রকম কাজ শেষ করিলাম। তখন বৃষ্টি থামিয়াছিল। ভাবিলাম একটু মাঠের মধ্যে ঘুরিয়া আসি। রেড্ রোডে ধীরে ধীরে গাড়ি যাইতেছিল, আমি অর্দ্ধশায়িত অবস্থায় ভেকের কোলাহল শুনিতেছিলাম। স্নিগ্ধ সমীরণ উপভোগ করিতেছিলাম। ময়দানে অমন দুর্দ্দিনেও নানাজাতীয় যুবকের দল ফুটবল খেলিতে, ফুটবলের ম্যাচ্ দেখিতে আসিয়াছিল। আমার ফুটবল ভাল লাগিত না সুতরাং লোকগুলা সম্বন্ধে তেমন প্রশংসার ভাব মনোমধ্যে আদৌ স্থান পাইল না। হঠাৎ দেখিলাম একখানি ভাড়াটিয়া ফিটনে চড়িয়া কিড্ সাহেব একাকী চলিয়া গেলেন। আমি একটু বিস্মিত হইলাম। মাণিকজোড়ের অপরটি কোথা?

ইডন উদ্যানে গিয়া কিন্তু দেখিলাম মেম সাহেব তাঁহার সহিত পদচারণা করিতেছেন। আমি বাঙ্গালীদের দিকে বেড়াইতেছিলাম। হটাৎ কে পিছন হইতে আমার স্কন্ধ স্পর্শ করিল। আমি ফিরিয়া দেখি প্রণয়ীযুগল।

আমি শশব্যস্তে তাঁহাকে অভিবাদন করিলাম। সাহেব বলিলেন—ইনি আমাদের অফিসের ক্যান্‌ভাসার অমরবাবু—ইনি মিস্ ডারক্‌মান।

আমি মেমকে সেলাম করিলাম। তিনি আমাকে দুই একটা কথা জিজ্ঞাসা করিলেন। তাঁহার ইংরাজি তেমন স্পষ্ট নয়, একটু আধ আধ কথা।

আমি বলিলাম,—মেম সাহেব, আপনি বোধ হয় ভারতবর্ষে এই প্রথম এসেছেন?

তিনি একটু হাসিয়া বলিলেন,—বাবু, আমি এদেশে জন্মেছিলাম। তারপর বাড়ি গিয়েছিলাম। আবার এসেছি। এবার আমার ইংরাজি দোরস্ত হ'বে।

আমি অপ্রস্তুত হইয়া বলিলাম,—ক্ষমা করিবেন, আমি তা' বলিনি।

প্রণয়ীযুগল একটু হাসিলেন। তাহার পর তাঁহারা বাগানের বাহিরে চলিয়া গেলেন। জার্ম্মাণদের সম্বন্ধে আমার দু'টি ধারণা ছিল—তাহারা সস্তায়

মাল সরবরাহ করিতে পারে, আর তাহাদের মধ্যে অনেকে সংস্কৃত জানে। ভবিষ্যতে এ দুইটার রহস্য সেই সুন্দরীর নিকট জানিয়া লইবার বাসনা হইল। মিসেস্ কিঙ্‌ হইয়া তিনি আরও অমায়িক হইবেন, সে বিষয়ে আমার কিছুমাত্র সন্দেহ রহিল না।

(৩)

অগষ্ট মাস পড়িল। কলিকাতায় হুলস্থূল পড়িয়া গেল। জার্ম্মান সম্রাট অকস্মাৎ নেপোলিয়ানের মত বিশ্ববিজয়ী বীর হইবার জন্য সশস্ত্র হইলেন। জার্ম্মাণ জাতিও তর্জ্জনী হেলাইয়া সমগ্র বিশ্বকে উপেক্ষা করিয়া অসিধারণ করিল। ইংরাজ অশেষ প্রকারে শান্তির চেষ্টা করিলেন, কৃতকার্য্য হইলেন না। ইংলণ্ডের পররাষ্ট্রসচীব অনেক বিচক্ষণতা দেখাইলেন, জার্ম্মাণী শুনিল না। ৪ঠা আগষ্ট সম্রাট পঞ্চম জর্জ্জ যুদ্ধের জন্য ভেরী বাজাইলেন। পৃথিবীর চারিদিক হইতে সাজ সাজ রব উঠিল। বিশাল সাম্রাজ্যের সকল জাতি, সকল সম্প্রদায়, সকল ব্যক্তি সম্রাটের মর্য্যাদা রক্ষার জন্য প্রাণ দিতে চাহিল। সাম্রাজ্যময় হুলস্থূল পড়িয়া গেল। জার্ম্মাণীর দন্তে ইংরাজ-প্রজা জ্বলিতে লাগিল, বেলজিয়মের নিগ্রহে সকলে মর্ম্মপীড়া ভোগ করিতে লাগিল। সকলে একবাক্যে, একমনে জার্ম্মাণীর দর্প খর্ব্ব করিতে চাহিল।

জার্ম্মাণীর সহিত আমাদেরও কারবার ছিল। ইয়ুরোপ হইতে একেবারে জাহাজ আসা বন্ধ হইল, কাজকর্ম্ম বিশৃঙ্খল হইল। জাতীয় সম্ভ্রমের ভয়ে, ব্যবসায় বাণিজ্যের গোলমালে সাহেবদের মুখে আর প্রফুল্লতার চিহ্ন রহিল না। আতঙ্কে বাবুরা শিহরিয়া উঠিল। নানাপ্রকার গুজবে কলিকাতার সকল শ্রেণীর লোক বিচলিত হইল। গঙ্গার ঘাটে স্নান করিতে করিতে বৃদ্ধারা বলিতে লাগিল—"পোড়া জার্ম্মাণীর তেজ দেখ। শেষে কিনা এদেশে লড়্‌তে আসে।" বাবুর দল ক্ষেপিয়া উঠিল। এবার তাহারা যুদ্ধ করিবে, স্বদেশের জন্য, সাম্রাজ্যের জন্য, সম্রাটের জন্য প্রাণ দিবে।

একদিন ধীরে ধীরে ছোট সাহেবের ঘরে ঢুকিলাম। তিনি মানচিত্র দেখিতেছিলেন। আমাকে দেখিয়া বলিলেন,—কাজকর্ম্মের খবর কি বাবু?

আমি বলিলাম,—সাহেব খবর মোটেই ভাল নয়।

সাহেব বলিলেন,—তা'তে ক্ষতি নাই। বাবু, কাগজে দেখ্‌ছিলাম বাবুরা ভলাণ্টিয়ার হ'চ্ছে।

আমি বলিলাম,—হ্যাঁ সাহেব। মানের জন্যে সবাই যশ অর্জ্জন করবে, আমরাই বা কেন চেষ্টা করব না?

সাহেব বলিলেন,—ঠিক্ কথা। তবে শুনছি নাকি আপাততঃ দুই হাজার বাঙ্গালী সেবা করবার জন্য 'অ্যাম্বুলেন্সে' যাচ্চে। সে কাজ আরও মাস্তের।

আমি বলিলাম,—হ্যাঁ সাহেব, তা' বুঝেছি। তবে যে রকম গতিক দেখ্‌ছি শেষে লটারি কর্‌তে হ'বে।

সাহেবের মুখে এক অনির্ব্বচনীয় সুখের ভাব দেখিলাম। কিন্তু সাহেব ভারী সুপুরুষ। তিনি বলিলেন,—কেন?

আমি বলিলাম,—সাহেব অন্ততঃ হাজার দশেক লোক যেতে চাহিবে।

সাহেব বড় আনন্দিত হইলেন। তিনি বলিলেন,—আমাদেরও অবস্থা সেই প্রকার। কিচনার সাহেব মোটে এক লক্ষ লোক চেয়েছেন, দেখবেন এক মাসের মধ্যে অন্ততঃ চার লক্ষ লোক জুট্‌বে। বাবু, আপনি যাবেন?

আমি দুইবার ঢোঁক গিলিলাম, একটু মাথা চুলকাইলাম। ইতস্ততঃ করিয়া বলিলাম,—সাহেব, আমার দরকার হ'বে না।

সাহেব বলিলেন—দরকার অদরকার বুঝি না, অপরে কর্ত্তব্য করবে আমি করতে পারব না, সেটা আমার বরদাস্ত হয় না। আমি নিজে যাচ্চি।

আমি বলিলাম,—সাহেব, আমার স্ত্রী আছে, দুইটি শিশু আছে—

সাহেব বাধা দিয়া বলিলেন,—তারা ত' চিরকাল আছে। যুদ্ধ একবার হ'য়েছে, যদি হেরে যাই—

আমি শিহরিয়া উঠিলাম। বলিলাম,—সাহেব, ওকথা মুখে আনবেন না। বিজয়লক্ষ্মী আপনাদের উপর চিরকাল দয়া করেন।

সাহেব হাসিয়া বলিলেন,—আমি আপনাকে যেতে বলছি না। আমার কিন্তু তৃপ্তি হয় না। আমি শীঘ্র যাচ্চি। কিচ্‌নারের পল্টনে নাম লেখাব।

আমি বলিলাম,—সাহেব, আপনার বিবাহের সব তো ঠিক—

সাহেব বলিলেন—ফুঃ! এখন সে কথা নয়।

মুখে সে কথা বলিলেন বটে, কিন্তু তিনি যথেষ্ট বেদনা অনুভব করিতেছিলেন তাহাতে সন্দেহ ছিল না। তাঁহার প্রাণের মধ্যে জার্ম্মাণ-প্রণয়িনীর শ্রীমূর্ত্তির সহিত ব্রিটানীয়ার মাতৃমূর্ত্তি ভীষণ সমরে প্রবৃত্ত হইতেছিল, তাহা বেশ বুঝিতে পারিলাম। আমি বলিলাম,—সাহেব যুদ্ধ শীঘ্রই শেষ হ'বে। ওরা বানের জলের মতন দল বেঁধে একবার ফ্রান্সের দিকে ঠেলে যাবে, তারপর আবার বানের জলের মত ফিরে যাবে। মাঝে থেকে কতকগুলা প্রাণ যাবে, গর্ব্ব খর্ব্ব হ'বে।

বাঙ্গালীর যুক্তি-বিচারে সাহেবের তৃপ্তি হইল না। তিনি ঘাড় নাড়িলেন, বলিলেন,—উঁহু বাবু। ওসব কথা বিশ্বাস করি বটে, কিন্তু বাবু তৃপ্তি হয় না। আপনিও চলুন।

আমি একটু সমস্যায় পড়িলাম।

(৪)

মাত্র তিন দিন সময় আছে। কয়েকদিন মনের মধ্যে অনেক আন্দোলন করিলাম। দেশসেবা, সাম্রাজ্যসেবা, রাজসেবা। বাঙ্গালীর অনেক দিনের অপযশ দূর করিবার একটা অবসর আসিয়াছিল, বৃহৎ সাম্রাজ্যের সকল শ্রেণীর লোকের সহিত এক উদ্দেশ্যে, এক স্বার্থে শত্রুনাশ করিতে যাইব, দাম্ভিক জার্ম্মাণের অস্ত্রাহত নিজেদের বীর সৈনিকদের শুশ্রূষা করিব, তাহাদের রণ-ক্লান্ত মুখে জল দিব, ক্ষতস্থান ধৌত করিব, স্বচক্ষে সাম্রাজ্যের শত্রুর অধঃপতন দেখিব—কি আনন্দ, কি সুখ! পরক্ষণেই স্ত্রীর কোমল মুখখানি স্মরণ করিতে-ছিলাম, শিশু দুইটির সহাস্য অধর, সুললিত বাহু, আধ আধ পিতৃসম্বোধনের সহিত অস্ত্রের ঝনঝনা, আর্ত্তের আর্ত্তনাদ, মুমূর্ষুর চীৎকার, রক্তের স্রোত, নিহতের রক্তাক্ত দেহ—কল্পনাপটে ভাসিয়া আসিতেছিল। আমার হৃদয়ে তেমন বল ছিল না, আমার দ্বারা এ কার্য্য সাধিত হইবে না। আমি প্রার্থনা করিব, ইংরাজের জয়কামনা করিব, চিন্তার বলে সম্রাটের কার্য্য সাধন করিব—রণস্থলে প্রাণ দিতে পারিব না।

আমাদের অফিসের অনেকগুলি যুবক আম্বুলেন্স সেবা সমিতিতে নাম লিখাইয়াছিল। তাহাদের উৎসাহ, তাহাদের উদ্দীপনা দেখিয়া এক একবার সাহসে বুক বাঁধিতাম। কিন্তু সাহেবের মুখ দেখিয়া এক একবার মনে হইত, আমার জীবনের মূল্য অপেক্ষা কি ইহার জীবনের মূল্য অধিক নয়? আমাদের পাড়ায় সতীশচন্দ্র এম, এ, বি,এল পাশ করিয়া ওকালতি করিতেছিল। তাহারও গৃহে যুবতী স্ত্রী আছে, বৃদ্ধা জননী আছেন। সতীশচন্দ্র যেন বিবাহের বরযাত্র যাইবার জন্য আয়োজন করিতেছিল। আমাকে ইতস্ততঃ করিতে দেখিয়া সতীশ বলিল,—"আরে পাগল নাকি? চল না। একবার বই তো আর দু'বার মরবে না? আর আমাদের মরবার কোন ভয় নেই। লাল ক্রশ্-চিহ্ন দেখ্‌লে শত্রুরাও মারবে না।"

আমি এক প্রকার স্বীকৃত হইলাম। কিন্তু গৃহে গিয়া স্ত্রীর মুখ দেখিয়া আবার ভাবিলাম,—যেমন দেশের প্রতি কর্ত্তব্য আছে, তেমনি এঁর প্রতিও তো একটা কর্ত্তব্য আছে। সাত পাঁচ ভাবিয়া স্ত্রীকে বলিলাম,—শুনেছ?

স্ত্রী বলিল,—কি? আফিসে কাজ কর্ম্ম নেই সেই কথা?

আমি বলিলাম,—না তা' ছাড়া আরও অন্য কথা। এই বলছিলাম কি—ওর নাম কি—যুদ্ধে যাচ্চি।

স্ত্রী কিছু বলিল না। কেবল আমার দিকে চাহিল। কি দৃষ্টি! আমার প্রাণের যত উৎসাহ, যত উদ্দীপনা, যত বাসনা, যত বীরপণা নিমেষে দূর হইল। সেগুলাকে প্রাণের মধ্যে পুনঃ প্রতিষ্ঠা করিবার জন্য সাহসে ভর করিয়া বলিলাম,—না সত্য সত্য যাব।

স্ত্রী উপেক্ষার হাসি হাসিয়া বলিল,—বেশ ত।

(৫)

আর একদিন মাত্র অবশিষ্ট আছে। তখনও প্রাণের মধ্যে সংগ্রাম চলিতেছিল। তখনও স্থির করিয়া উঠিতে পারি নাই। গৃহে স্ত্রীর বিদ্রূপ, বাহিরে বন্ধু বান্ধবের পরিহাস। অফিসে কাজ কর্ম্ম মোটেই ছিল না। কিন্তু সাহেব বিলাত যাইতেছিলেন, বড় সাহেব কলিকাতার নবগঠিত সখের পল্টনে যোগদান করিয়াছিলেন। ঘরে বাহিরে কেবল যুদ্ধের কথা, ভদ্র ইতর, মূর্খ জ্ঞানী সকলেই জার্ম্মাণীর অধঃপতন কামনা করিতেছিল, বেলজিয়মের বীরপণার প্রশংসা করিতেছিল, কিরূপে রাজভক্তি দেখাইবে তাহার আয়োজন করিতেছিল। সন্ধ্যার সময় অনন্যগতি হইয়া ধীরে ধীরে ময়দানে উপস্থিত হইলাম।

অপর সময় ঘাটের ধারে বিলাতী জাহাজের বাহুল্য বশতঃ পতিতোদ্ধারিণী ভাগীরথীর পুণ্য সলিলের বড় একটা দর্শনলাভ করিতে পারা যায় না। এখন গঙ্গার ঘাট ফাঁকা, সামান্য দুই একখানা মাত্র বিলাতী জাহাজ দৃষ্টিপথে পড়ে। ইডেন উদ্যানেরও ভিড় একটু কমিয়াছিল। ঝাড়বাড়ীর ভিড় অধিক। কাজ কর্ম্মের অভাবে ইহারা বাগানে এক একটি বাঙ্গালী বাবুকে ধরিয়া যুদ্ধের গল্প শুনিতেছিল। অচিরেই যে আমাদের জয় হইবে, সে আশা অধিকাংশ লোকের প্রাণে বর্ত্তমান। কেবল দুই একজন অতি বিজ্ঞ, সন্দেহে ঘাড় নাড়িয়া বলিতেছিল,—"ওরাও প্রস্তুত হ'য়েছে; জার্ম্মাণী রক্তবীজের ঝাড়, একটু দেরী হ'তে পারে। তা হ'লে কাজ কর্ম্মের বড় ক্ষতি হ'বে।"

আমি সে ভিড়ের মধ্যে না বসিয়া বাগানের ভিতরের রাইডের দিকে গেলাম। একটা নিভৃত স্থলে একখানা বেঞ্চি পাতা ছিল, তাহার উপর বসিলাম। বেশ অন্ধকার হইয়াছিল, মৃদুমন্দ সমীরণ সেবা করিতে লাগিল। পূর্ব্ব ও পশ্চিম আকাশে দুইটি উজ্জ্বল তারকা জ্বলিতেছিল। প্রাণে বেশ শান্তি আসিতেছিল।

মনে মনে বলিলাম—"উৎসন্ন যাক বেটা জার্ম্মান। একটু বিশ্রাম করি।" পায়ের জুতা খুলিয়া আসন পিঁড়ি হইয়া বসিয়া অনেক সুখ-দুঃখের কথা ভাবিতে লাগিলাম—যুদ্ধের চিন্তা প্রাণ হইতে একেবারে তাড়াইয়া দিলাম।

আমি যে ঝোঁপে বসিয়াছিলাম তাহার অপর পার্শ্বে বোধ হয় একখানা বেঞ্চি ছিল। মনে হইল দুইজন লোক আসিয়া সেই বেঞ্চে বসিল। বৃক্ষান্তরাল হইতে বিলাতী এসেন্সের সুবাস আসিল। আগন্তুকের কণ্ঠস্বর শুনিয়া বিস্মিত হইলাম। কিঙ্ সাহেব কথা বলিতেছিলেন।

সাহেব বলিলেন,—নিশ্চিত।

মেম বলিলেন,—আমি জার্ম্মাণ বলিয়া তুমি আমায় ঘৃণা কর?

আবেগভরে সাহেব বলিলেন,—তাহার পূর্ব্বে যেন আমার মৃত্যু হয়। তবে আপাততঃ জার্ম্মাণদের উপর আমাদের কি রকম মনোভাব—

মেম বলিলেন—তা' বুঝি, জার্ম্মাণদেরও তোমাদের উপর বড়—

মেম ইতস্ততঃ করিতেছিলেন; সাহেব বলিলেন,—ঘৃণা। আমরাও তাদের ঘৃণা করি।

মেম নীরব হইলেন। একটু আর্দ্রস্বরে বলিলেন,—চার্লি—

সাহেব বলিলেন,—ডারলিং!

মেম বলিলেন,—চার্লি! আমি আমার জাতীয়তা ছাড়িতে পারি। আমি এদেশে—তোমাদের ভারতবর্ষে জন্মিয়াছি। আমার পিতা ডমিসাইলের আবেদন—

নিষ্ঠুর কিঙ্ সাহেব বলিলেন,—আমি পারিতাম না, মেরী, কখনও পারিতাম না। আমি জার্ম্মাণীতে থাকিলে ব্রিটেনের নাম লইয়া কারাগারে যাইতাম, প্রাণের ভয়ে জাতীয়তা বর্জ্জন করিতাম না।

মেম বলিলেন,—সে কথার জবাব পিতা দিতে পারেন।

সাহেব ক্ষমা ভিক্ষা করিলেন। মেরী ডারকমান বলিলেন,—চার্লি, আমি জাতীয়তা বর্জ্জন করিতেছি ইংরাজের ভয়ে নয়, একজন ইংরাজের প্রেমের দায়ে।

আমার চক্ষে জল আসিল। সাহেবের মুখ দেখিতে পাইলাম না। চুম্বনের শব্দ পাইলাম। প্রেমের নিকট স্বদেশপ্রীতি হারি মানিল। আমার মনের একটা বোঝা নামিয়া গেল। আর ভাবিবার আবশ্যক নাই—নজির খুঁজিয়া পাইয়াছি।

সাহেব কিছুক্ষণ চুপ করিয়া বলিলেন,—মেরী, তোমার প্রেম বড় পবিত্র।

আমি মোটে তোমার যোগ্য নই। তুমি কেন আমার জন্যে এত ত্যাগ স্বীকার করছ?

মেম বলিলেন,—স্বর্গসুখের জন্য, চার্লি!

চার্লি স্ত্রীলোক, প্রেমের জন্য সর্ব্বস্ব ত্যাগ করিতে পারে।

আবার চুম্বনের শব্দ পাইলাম। মেম বলিলেন,—বল, যুদ্ধে যাবে না?

সাহেব বলিলেন,—তুমি প্রতিজ্ঞা কর, আজ হ'ক, এক বৎসর পরে হ'ক্, যখন আমি তোমায় হৃদয়ে ধরিতে চাহিব, তুমি আমারই হইবে?

মেম প্রতিশ্রুত হইলেন। কি স্বর্গীয় প্রাণ! সাহেব বলিলেন,—মেরী, আর কুহক বিস্তার করিও না। তোমার নাম স্মরণ করিয়া, তোমার জন্যই যশ আনিতে দাও—ছয়মাসের জন্য বিদায় দাও।

মেমের উত্তর শুনিতে পাইলাম না। সাহেব বলিলেন,—মেরী, প্রিয়তমে, আর বাধা দিও না। যদি আসিয়া তোমায় না পাই আত্মহত্যা করিব। দেশসেবা করিতে দাও। এখন তুমিও ইংরাজ—

কি মনের বল—কি স্বদেশপ্রীতি—মাতৃভূমির জন্য কি স্বার্থত্যাগ! আমি মন্ত্রমুগ্ধের মত শুনিতেছিলাম—বাহুতে বল আসিতেছিল, প্রাণ সাহসে ভরিয়া উঠিতেছিল, একটা তাড়িত-প্রবাহ ধমনীর মধ্যে ছুটাছুটি করিতেছিল।

ব্যাণ্ডের শেষ গৎ বাজিয়া উঠিল। ব্যাণ্ড-ষ্ট্যাণ্ডে সাহেবেরা মাথার টুপি খুলিল। কিড্ সাহেব লাফাইয়া উঠিল—দৃঢ়স্বরে বাদ্যের সুরের সহিত গাহিলেন,—

"God save our gracious King."

আমি যেন মন্ত্রমুগ্ধ হইয়াছিলাম—সাহেবের কণ্ঠস্বর আবার কর্ণে প্রবেশ করিল—

Send him victorious,
Happy and glorious

আত্মহারা হইলাম। কর্ত্তব্যপথ বাছিয়া লইলাম। মেঘমন্দ্রে সাহেব শেষ করিলেন—

"God save the King."

আমি উঠিয়া দাঁড়াইলাম। সাহেব বলিলেন,—প্রিয়তমে ক্ষমা কর। প্রতিজ্ঞা স্মরণ রেখো। শীঘ্র আসব। আর তোমার মুখ দেখব না। মনের বল কমে আসে—

উন্মত্তের মত যুবক ছুটিল। আমিও রোরুদ্যমানা মেরী ডারকুমানকে ফেলিয়া নাম লিখাইতে চলিলাম।

*   *   *   *

সাহেব চলিয়া গেলেন। আমাদের যাওয়া হইল না। অত শীঘ্র আমাদের শিখাইতে পারিবে না বলিয়া গবর্ণমেণ্ট আমাদের সমরে পাঠাইল না। কিন্তু আমি কর্ত্তব্যচ্যুত হই নাই। যেদিন হুকুম পাইব, সম্রাটের জন্য প্রাণ দিতে কুণ্ঠিত হইব না। ইংরাজ ও অষ্ট্রেলিয়াবাসী, ক্যানাডাবাসী ও বুয়ারের সহিত সমান উৎসাহে গাহিব—

"God save the King."

শ্রীকেশবচন্দ্র গুপ্ত।

নাদির সাহের পত্র।*

আফগানরাজের পরাজয়ের পর আসরফ্ আলি মর্দ্দন খাঁকে হিন্দুস্থানের দূত নিযুক্ত করিয়া ভারত সম্রাটের নিকট প্রস্তাব করি যে কান্দাহার ও তাহার নিকটস্থ প্রদেশগুলি আমাদের পরস্পর রাজ্যের শত্রু, সেইজন্ত হিন্দুস্থান হইতে একটী সৈন্তদল গঠন করিয়া পার্ব্বত্য পথগুলি রোধ করিয়া লুণ্ঠনকারীদের পলায়নে বাধা দেওয়া আবশুক মনে করি। সম্রাট মহম্মদ সাহ একথায় একেবারে মত দিয়াছিলেন এবং এই সর্ত্তে সন্ধিসূত্রে আবদ্ধ হইয়াছিলেন। আমাদের দূত প্রত্যাবর্ত্তন করিলে আমরা মহম্মদ আলি খাঁকে পুনরায় সম্রাটের নিকট পাঠাই—তাহাতেও তিনি পূর্ব্ব সন্ধিসূত্র অটুট রাখিতে অঙ্গীকার করিয়াছিলেন।

আমরা বিজয়-গৌরবের সহিত কান্দাহারে প্রত্যাবর্ত্তন করিলে কালাট ও গিজনীর আফগান-দমনে নিযুক্ত আমাদের বিজয়ী সেনাধ্যক্ষদের মুখে শুনি যে মহম্মদ সাহ স্বীয় অঙ্গীকার রক্ষা করেন নাই এবং সৈন্ত গঠনের কোনও উদ্যোগ করেন নাই। এই সমাচারে আমরা বাধ্য হইয়া মহম্মদ খাঁ টার্কোম্যান্‌কে

---

* [২৯ জিলকড্, ১১১৫ হিজিরা সাহাজাহানাবাদ হইতে নাদির সাহ দিল্লির অভিযান সম্বন্ধে তাঁহার পুত্র ইরান দেশের অস্থায়ী শাসনকর্ত্তা রেজা কুলি মির্জ্জাকে এই পত্র প্রেরণ করেন।] Asiatick Researches Vol. X. p p 539-547.

দিল্লি-সম্রাটের নিকট তাঁহার অঙ্গীকার স্মরণ করাইবার জন্য দিল্লিতে পাঠাই। কিন্তু উক্ত সম্রাট ও তাঁহার মন্ত্রিবর্গ সন্ধিভঙ্গ করেন, দূতমুখে প্রেরিত প্রসঙ্গটি অবজ্ঞা করেন, আমাদের পত্রের উত্তর দেন নাই এবং আমাদের দূতকে অবরুদ্ধ করেন। এই অবস্থায় আমরা বাধ্য হইয়া গিজ্‌নি ও কাবুল অভিমুখে অভিযান করিয়া এবং দুর্দ্ধর্ষ পর্ব্বতবাসীদের পরাজয় করিবার পরই মহম্মদ সাহের বিরুদ্ধে আমরা সাহজাহানাবাদ অভিমুখে অভিযান আরম্ভ করিলাম, কারণ আমাদের প্রতি তাঁহার ঘৃণা ও অশ্রদ্ধার ভাব আমাদিগকে ধৈর্য্যচ্যুত করিতেছিল।

পেশোয়ার-দমন ও লাহোর-গ্রহণের সমাচার আমাদের প্রিয়পুত্রকে পূর্ব্বেই দিয়াছে। আমরা শাভলের শেষ দিন উক্ত নগর হইতে যাত্রা করি এবং জেলকাদের দশ তারিখে শুক্রবারে আম্বালায় পৌঁছি। এখানে আমরা শুনিলাম যে মহম্মদ সাহ অসংখ্য সৈন্যসংগ্রহ করিয়াছেন। দেশের প্রধান ব্যক্তি-বর্গ, তিন লক্ষ সৈন্য, তিন শত কামান, ৩।৪ শত হস্তী এবং উপযুক্ত রণসম্ভারের সহিত বিপুলবাহিনী পরিচালন করিয়া তিনি দিল্লি হইতে পাণিপতে পৌঁছিয়া-ছেন। আমরা তৎক্ষণাৎ আমাদের বিজয়ী সৈন্যবর্গকে তাহাদের যাবতীয় দ্রব্যসম্ভার অম্বালায় রাখিতে আদেশ দিয়া শত্রুর সম্মুখীন হইতে অগ্রসর হইলাম। মহম্মদ সাহাও পাণিপথ হইতে কার্ণালে যাত্রা করিলেন।

যুদ্ধযাত্রা করিবার পরে আমরা আমাদের সৈন্যশ্রেণী হইতে ৫।৬ হাজার সৈন্যকে বিচ্যুত করিয়া একটী স্বতন্ত্র দল মহম্মদ সাহের সৈন্যসমূহের সংখ্যা ও গতিবিধি পর্য্যবেক্ষণ করিতে অগ্রে প্রেরণ করি। তাহারা কার্নালের নিকট-বর্ত্তী হইবামাত্র দশ সহস্র হিন্দুস্থানী সৈন্যের সম্মুখে পড়ে। আমাদের সৈন্যদল তাহাদিগকে আক্রমণ করে, বিধ্বস্ত করে এবং তাহাদের সেনাধ্যক্ষ ও অনেক লোককে বন্দী করিয়া আনয়ন করে।

এই বিষম পরাজয়বার্ত্তায় মহম্মদ সাহ আর অগ্রসর না হইয়া কার্নেলেই অপেক্ষা করিতে লাগিলেন এবং স্বীয় সৈন্যশ্রেণীকে বেষ্টন করিয়া একটী খাল কাটাইলেন এবং বাঁধ প্রভৃতি দ্বারা একটী দৃঢ় গড় নির্ম্মাণ করিয়া তদুপরি কামান সজ্জিত করিলেন।

আমরা মহম্মদ সাহের তাঁবুর পূর্ব্বদিকে—দিল্লি যাইবার পথে—একদল সৈন্য পাঠাইলাম। মঙ্গলবার ১৫ই তারিখে ইহারা সংবাদ পাইল যে, সয়াদৎ খাঁ—(বারহান্ উল্ মল্ক) ত্রিশ সহস্র সৈন্য, যথোপযুক্ত রসদ, যুদ্ধাস্ত্র, হস্তী প্রভৃতি লইয়া মহম্মদ সাহের সহিত যোগ দিবার জন্য মালবাতে (Malabat) আসিয়া পৌঁছিয়াছে।

সুতরাং তাহাকে বাধা দিবার জন্য আমরা দুই ঘণ্টা রাত্রি থাকিতে অগ্রসর হইলাম এবং পাণিপথের পথ অবরোধ করিলাম। আমরা আশা করিতেছিলাম অতঃপর মহম্মদ সাহ স্থান পরিত্যাগ করিয়া আমাদিগকে আক্রমণ করিতে আসিবে। প্রাতে ১॥০ ঘণ্টা পরে, আমরা কারনেল অতিক্রম করিয়া হিন্দুস্থানী শিবিরের পূর্ব্বদিকে গমন করিলাম। পথে আমরা সয়াদৎ খাঁর সৈন্যবাহিনী হইতে পথভ্রষ্ট কয়েকজন সৈন্যকে বন্দী করিলাম এবং তাহাদের মুখে শুনিলাম সয়াদৎ খাঁ সম্রাটের সহিত পূর্ব্বরাত্রি ১০টার সময় যোগদান করিয়াছে।

এই সংবাদে আমরা সেই স্থানেই শিবির ও সৈন্যস্থাপন করিলাম। এই স্থান হইতে মহম্মদ সাহের শিবির প্রায় এক ফারসক্ অন্তরে।

সয়াদৎ খাঁর জন্যই মহম্মদ সাহ অপেক্ষা করিতেছিলেন। এক্ষণে তিনি নিজে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হইয়া ⅓ ভাগ কামান শিবির রক্ষার জন্য রাখিয়া অধিকাংশ সৈন্য লইয়া বেলা ১২টার সময় আমাদের বিরুদ্ধে যাত্রা করিলেন। তিনি সম্মুখে ও পশ্চাতে সৈন্য রাখিয়া মধ্যভাগে স্বীয় আসন গ্রহণ করিলেন। তাহাদের সৈন্য অসংখ্য, খুব ঘনভাবে শ্রেণীবদ্ধ। সৈন্যশ্রেণীর আগমনে পার্শ্বস্থ ভূমি যেন অন্ধকার হইয়া পড়িতেছিল। এবং মনে হয় ইহারা আবদল গরদোগলীর সৈন্যের ১০।১২ গুণেরও অধিক।

আমরা আমাদের শিবিরের জন্য কয়েকজন প্রহরী রাখিয়া দয়ালু পরমেশ্বরের সাহায্য প্রার্থনা করিয়া রণক্ষেত্রে ধাবমান হইলাম।

দুই ঘণ্টাকাল সজোরে যুদ্ধ এবং মুহুর্মুহু কামান গর্জ্জিতে লাগিল। পরে জগদীশ্বরের কৃপায় আমাদের সিংহ-বিক্রমশালী বীর যোদ্ধৃবর্গ যুদ্ধক্ষেত্র হইতে শত্রুদের হটাইয়া দিল এবং বিধ্বস্ত করিয়া ফেলিল।

রাজহস্তীপৃষ্ঠে আরূঢ় সয়াদৎ খাঁ, তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র নিশা মহম্মদ খাঁ আমাদের হস্তে বন্দী হইল। সম্রাটের প্রধান মন্ত্রী সামসাম্ আলি খাঁ দৌরন আমির উল্ ওমরা বাহাদুর আহত হইলেন। তাহার এক পুত্র হত এবং আর একপুত্র মির্ অসার আহত হইয়া বন্দী হইল এবং পরদিন তাহার মৃত্যু হইল। সম্রাটের শরীররক্ষকদলের অধ্যক্ষ ওয়াশিলি খাঁ—সাদাব খাঁ, আমির কুলি খাঁ, আলি মহম্মদ খাঁ, মির হুসেন খাঁ, খাজা আসরফ্ খাঁ, আলি-ইয়ার খাঁ, অকিল বেগ খাঁ, সাদদ্ খাঁ আফগন্, ওমেদ্ আলি খাঁ, রেজিন রা খাঁ (যুদ্ধাস্ত্রের অধ্যক্ষ) এবং সিরখালু এবং তিন শত প্রধান ব্যক্তি ও জননায়ক হত হইয়াছেন। তাহাদের মধ্যে ১৫ জন, ৭, ৪ ও ৩ সহস্র সৈন্যের অধ্যক্ষ ছিল।

মহম্মদ সাহ এবং নিজাম উল মল্ক, কমর উল দিন খাঁ প্রধান মন্ত্রী এবং কতকগুলি প্রসিদ্ধ ও অপ্রসিদ্ধ ব্যক্তি নিজ সৈন্যবেষ্টনীর মধ্যে স্বীয় শিবিরে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া আমাদের 'বিজয়-তরবারি'র আঘাত হইতে নিষ্কৃতিলাভ করেন।

যুদ্ধ দুই ঘণ্টা চলিয়াছিল এবং ২॥০ ঘণ্টা কাল আমাদের বিজয়ী সৈন্যবৃন্দ শত্রুর পশ্চাদ্ধাবনে নিযুক্ত ছিল। সন্ধ্যার এক ঘণ্টা পূর্ব্বে রণক্ষেত্র শত্রুশূন্য হইল। শত্রুদের শিবির বিশেষরূপে সুরক্ষিত দেখিয়া আমরা উহা আমাদের সৈন্যদিগকে আক্রমণ করিতে অনুমতি প্রদান করি নাই।

প্রভূত ধনসম্পত্তি, কতকগুলি হস্তী, সম্রাটের যুদ্ধাস্ত্রগুলি এবং আরও নানাবিধ সামগ্রী আমরা যুদ্ধজয়ের পুরস্কারস্বরূপ প্রাপ্ত হইয়াছিলাম। বিশ সহস্রের অধিক সংখ্যক শত্রু রণক্ষেত্রে হত হইয়াছে এবং তাহারও অধিক সংখ্যা বন্দী হইয়াছে।

অনতিবিলম্বে আমরা সম্রাটের শিবির বেষ্টন করিলাম—নিকটবর্ত্তী দেশ হইতে উহাদের বার্ত্তার আদানপ্রদান বন্ধ করিবার ব্যবস্থা করিলাম এবং শিবির ও গড় ভূমিসাৎ করিবার জন্য কামান সজ্জিত করিলাম।

সম্রাট-শিবিরে বিশেষ বিশৃঙ্খলা ও গোলযোগ চলিতে থাকায়, তিনি বাধ্য হইয়া ১৭ই তারিখে নিজাম উল মল্ককে আমাদের রাজ-শিবিরে প্রেরণ করিলেন এবং পরদিন সম্রাট স্বয়ং স্বীয় সানুচর সহ বিমর্ষচিত্তে আমাদের স্বর্গীয় জ্যোতিঃদীপ্ত রাজ-সম্মুখে আগমন করিলেন।

আমরা তুর্কীবংশোদ্ভূত এবং সম্রাট মহম্মদ সাহও তুর্কীবংশোদ্ভূত। সেইজন্য তাঁহার আগমনবার্ত্তা পাইয়া আমার প্রিয় পুত্র নশির আলি খাঁকে শিবিরের বাহির হইতে তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিয়া আনিবার জন্য পাঠাইলাম। তিনি শিবিরে প্রবেশ করিলে আমরা তাঁহাকে আমাদের নামাঙ্কিত 'পাঞ্জা' প্রদান করিলাম। তিনি সেই দিন আমাদের আতিথ্য গ্রহণ করিলেন। বংশ-হিসাবে আমাদের যে সম্বন্ধ আছে তাহা স্মরণ করিয়া এবং রাজার রাজা সম্রাটের কিরূপ সম্ভ্রম হওয়া উচিত তাহা বিবেচনা করিয়া আমরা তাঁহার পরিবার ও পারিষদবর্গের মুক্তিবিধান করিলাম এবং উপযুক্ত উচ্চ সম্মানের সহিত তাঁহাদিগকে আশ্রয় দিলাম।

ইহার পর সপরিবার সম্রাট ও হিন্দুস্থানের রাজন্যবর্গ দিল্লিতে পৌঁছিলেন। এবং জিলকাদের ২৯শে তারিখে আমরা বিজয়-গরিমার সহিত রাজধানী অভিমুখে অগ্রসর হইতে লাগিলাম।

বিখ্যাত তুর্কী গৌরগণীয় বংশে জন্ম বলিয়া মহম্মদ সাহের সহিত আমাদের নিকট সম্বন্ধ—সেইহেতু আমাদের রাজ-অভিলাষ তাঁহাকে আমরা সিংহাসনে স্থাপন করি এবং তাঁহার শিরে রাজমুকুট সন্নিবেশ করি।

ধন্য জগদীশ্বর! ধন্য সেই মহান্ শক্তি যিনি আমাদের এই কার্য্য-সম্পাদন করিবার শক্তি দিয়াছেন। করুণাময় জগদীশ্বরের নিকট আমরা যে এই মহাকৃপা পাইয়াছি তাহার জন্য আমরা ধন্য, কৃতজ্ঞ।

ঈশ্বর আমাদের জয়যুক্ত মনে রাজসিংহাসন সৃজন করিয়াছেন এবং তাহার তুলনায় পার্থিব জয়-গরিমা-সমুদ্র বুদ্‌বুদের ন্যায় তুচ্ছ। এবং তিনি যে অসীম দয়া প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহা সমগ্র মানবজাতি অনুভব করিতে পারিবেন।

যেহেতু আমরা অনেকগুলি কামান অধিকার করিয়াছি, আমরা আমাদের বিজয়ী সেনা হইতে ২০ সহস্র মোগল, কতকগুলি অস্ত্র ও হস্তী কাবুলে অগ্রসর হইবার আদেশ দিয়াছি। নিঃসন্দেহে আমাদের স্নেহের পুত্র উক্ত প্রদেশের সংবাদ আমাদিগকে জ্ঞাপন করিবে।

তোমার পত্র-প্রাপ্তির পর আমাদের প্রেরিত সৈন্যদলকে বল্ক বা হিরাটে অগ্রসর হইতে আদেশ দিব।

আমরা মহাসম্ভ্রান্ত অশর খাঁকে বল্কে পাঠাইবার জন্য নিযুক্ত করিয়াছি, নৌ রোজার (২২শে মার্চ্চ) পর তিনি নিশ্চয় যাইবেন।

আমাদের বিজয়-গরিমা ঈশ্বরপ্রদত্ত এবং আমাদের সুঅদৃষ্ট বশতঃ—একথা সর্ব্বদা স্মরণ রাখিও। আমাদের এই রাজকীয় সমাচারের কতকগুলি নকল করিয়া সাধারণের গোচরের জন্য সাম্রাজ্যের ভিতর বিতরণ-ব্যবস্থা করিও। তাহাতে আমাদের শুভাকাঙ্ক্ষী ব্যক্তিবর্গ সুখী ও উল্লসিত হইবেন এবং গুপ্তশত্রু ভগ্নোদ্যম ও বিচলিত হইবে। সর্ব্বদা রাজ্যের সম্পদবৃদ্ধির ব্যবস্থা করিবে এবং সুপরিচালিত করিতে চেষ্টা করিবে। সর্ব্বশ্রেষ্ঠ যিনি তাঁহার নিকট আত্মসমর্পণ করিবে। তাঁহার কৃপায় সকলে—নিকটে বা দূরে—যাহারা আমাদের শাসনকার্য্যের সহিত মিলিয়া চলে না এবং অহিত আকাঙ্ক্ষা করে তাহারা নিজের জালে আবদ্ধ হইবে। এবং যাহারা আমাদের প্রকৃত বন্ধু ও আশ্রিত, তাহাদের ইচ্ছা পূর্ণ হইবে এবং আমাদের সহৃদয় ও উদার শাসনে তাহাদের যথেষ্ট শ্রীবৃদ্ধি হইবে।

শ্রীকৃষ্ণদাস চন্দ্র।

দাও-দাও।

১

একদিন চেয়েছিলে,—কি দৃষ্টি সজল!
জগৎ দেখিয়াছিনু নবীন উজ্জ্বল।
একদিন হেসেছিলে,—কি হাসি সরল!
হৃদয়ে জাগিয়াছিল কবিত্ব নির্ম্মল।
একদিন ক'য়েছিলে,—কি কথা কোমল!
জীবনে জন্মিয়াছিল বিশ্বাস অটল।

২

সে মোহ কোথায় আজ! কি তীব্র চেতনা—
জীবন আস্বাদ-হীন, মরণ কামনা!
নাই সুখ দুখ স্বপ্ন, নাহিক কল্পনা,
আশা-তৃষা-হীন দিন,—কি দীর্ঘ যন্ত্রণা!
দাও—দাও সত্য মিথ্যা,—যা' ইচ্ছা, ললনা!
প্রেম নয়—দাও তবে প্রেম-প্রবঞ্চনা।

শ্রীঅক্ষয়কুমার বড়াল।

স্ত্রী-জাতি বন্দনা।

হে দেবি! এ বঙ্গভূমে তুমিই একা জাগ্রত, অতএব তোমাকে প্রণাম করি।

তুমি সর্ব্বব্যাপিনী! কেন না সকল ঘরে আছ। তুমি অন্নপূর্ণা! কেন না তুমি আপনার উদর অন্নে পূর্ণ করিয়া থাক; তুমি অভয়া, কেন না তুমি পতির বাবাকেও ভয় কর না।

তুমি দিগম্বরী! যে অবধি শান্তিপুরে ধুতি উঠিয়াছে।

তুমি রক্ষাকালী! কেন না পতির পরমায়ুঃ তুমি বামকরে রক্ষা করিতেছ।

তুমি মহামায়া! কেন না জ্ঞানী কি অজ্ঞান তুমি সকলকে ভুলাইয়াছ।

তুমিই পুরুষের চক্ষু, তুমিই কর্ণ, তুমিই জ্ঞান; তাহারা আপন চক্ষে যাহা দেখে তাহা মিথ্যা; আপন কর্ণে যাহা শুনে তাহা বৃথা।

এ সংসারে তুমিই কর্ণধার! কেন না তুমি সকলের কর্ণ ধরিয়া চালাইতেছ।

তোমার নিমিত্ত সকলে মোট বহিতেছে; তোমারই নিমিত্ত স্বয়ং মহাদেব ভিক্ষার ঝুলি বহিয়াছেন।

হে দেবি! তুমি স্পষ্ট করিয়া বল, তোমার বীজমন্ত্র ওঁকার, না অলঙ্কার?

হে সুরুচি! তুমি স্বরূপ বল, মৎস্যের "ন্যাজা" ভালবাস, কি প্রতিবাসীর "মুড়া" ভালবাস?

হে দেবি! তুমি মনে করিলে সকলের মুণ্ডু ঘুরাইতে পার—কথায়; পৃথিবী ভাসাইয়া দিতে পার—রোদনে! পৃথিবীকে রসাতলে পাঠাইতে পার—কলহে।

(ভ্রমর।)



পাদ্রী কেরী।

(৩)

কোন কোন লেখকের ধারণা যে, কেরী সাহেব এদেশে আসিবার পূর্ব্বে এদেশে ছাপাখানা জিনিষটার নাম-গন্ধ মাত্র ছিল না ;—তিনি আসিয়াই এদেশে উহা সংস্থাপন করিয়াছিলেন। কিন্তু ধারণাটা ঠিক নহে। যদিও তাঁহারই উদ্যোগে, তাঁহারই চেষ্টায় বঙ্গদেশে মুদ্রাযন্ত্রের উন্নতি ঘটিয়াছিল, শ্রী ফিরিয়াছিল সত্য ; কিন্তু তা' বলিয়া তাঁহাকে এদেশে মুদ্রাযন্ত্রের আদি-প্রতিষ্ঠাতা বলিলে বিষম ভুল বলা হয়।

বাঙ্গালাদেশে মুদ্রাযন্ত্র জিনিষটা যে কে সর্ব্বপ্রথম স্থাপন করিয়াছিলেন, তাহা ঠিক জানি না। তবে এটুকু জোর করিয়া বলিতে পারি যে, কেরী সাহেব এদেশে আসিবার কিছুকাল পূর্ব্বেই এদেশের ছাপাখানা হইতে বাঙ্গালা বহি ছাপাইয়া বাহির হইয়াছিল। সে বহি—হ্যালহেড সাহেবের ব্যাকরণ। যতদূর জানা গিয়াছে, তাহাতে মনে হয় যে, এই ব্যাকরণখানিই বাঙ্গালার প্রথম মুদ্রিত পুস্তক। এখনও এ গ্রন্থের অস্তিত্ব পাওয়া যায়। হুগলী কলেজের লাইব্রেরীতে 'গ্লাস্ কেসে'র মধ্যে পরম আদরের সহিত এই ব্যাকরণ খানিকে সাজাইয়া রাখা হইয়াছে। ১৭৭৮ খৃষ্টাব্দে হুগ্‌লী সহরের এক অতি জীর্ণ ছাপাখানা হইতে এই গ্রন্থ প্রকাশিত হইয়াছিল। শুনা যায়, চার্লস্ উইলকিন্স্ সাহেব তাঁহার বন্ধু হ্যালহেডের এই ব্যাকরণখানি ছাপাইবার জন্য স্বহস্তে একসেট বাঙ্গালা অক্ষর খোদাই ও ঢালাই করিয়া দেন। এই অক্ষর গুলিই আদি বাঙ্গালা 'টাইপ্'।

স্যর্ চার্লস্ উইলকিন্স একজন অসামান্য কাজের লোক ছিলেন। বিলাতের যেমন কাক্সটন, বাঙ্গালার তেমনই স্যর চার্লস্ উইলকিন্স্। তাঁহার হস্ত-প্রেরণা না পাইলে বাঙ্গালা বহি ছাপাইবার উপায় অত শীঘ্র করিয়া হইত কি না সন্দেহ। উইলকিন্স্ সাহেব পঞ্চানন নামে এক বাঙ্গালী কর্ম্মকারকে হাতে ধরিয়া এই হরপ্ প্রস্তুতের প্রণালী সকল শিখাইয়াছিলেন। পরে কেরী সাহেব

শ্রীরামপুরে এক 'টাইপ্-ফাউণ্ডারী' প্রতিষ্ঠা করিয়া সেইখানে পঞ্চাননকে 'টাইপ' প্রস্তুতের কার্য্যে নিযুক্ত করেন। এই কারখানায় বাঙ্গালা ও দেব-নাগরী অক্ষরই বেশীর ভাগ তৈয়ারী হইত। শ্রীরামপুরের অনেকেই তখন এই কারখানায় আসিয়া পঞ্চাননের কাছে ঐ কাজ শিখিত। পঞ্চাননের এই সাকৃরেদদের মধ্যে মনোহর নামে একজন কারিগরই খুব ভাল কাজ শিখিয়াছিল। তাহার মত সুন্দর হরপ্ বানাইতে তখন কেহই পারিত না। শুধু তাহাই নহে। মনোহর ভারতবর্ষের প্রায় সমস্ত প্রাদেশিক ভাষারই অক্ষর তৈয়ারী করিতে পারিত। শ্রীরামপুর মিশন এই মনোহরের সাহায্যেই ভারতবর্ষের নানা স্থানে 'টাইপ্' সরবরাহ করিত। এদিকে কেরী সাহেবের ছাপাখানা ও 'টাইপ্ ফাউণ্ডারী,' এই দুইটির অবস্থাও ক্রমশঃ ভাল হইতে লাগিল। এই মুদ্রাযন্ত্রটি তিনি ইতিপূর্ব্বে কলিকাতায় ক্রয় করিয়াছিলেন। দিনাজপুরে যাইবার সময় এটিকে তিনি সঙ্গে করিয়া লইয়া যান। পরে শ্রীরামপুরে আসিয়া যখন বাস করিতে আরম্ভ করেন, তখন ঐ কলটিকেও সঙ্গে করিয়া সেখানে লইয়া আসেন। ১৮০১ খৃষ্টাব্দে, এই মুদ্রাযন্ত্র হইতে কেরী সাহেবের বাঙ্গালা 'নিউটেষ্টামেণ্ট্' মুদ্রিত হইয়াছিল।

কেবল যে 'টাইপ্ ফাউণ্ডারী' ও ছাপাখানা প্রতিষ্ঠা করিয়াই কেরী সাহেব এ দেশে পুস্তক প্রচারের পথ প্রশস্ত করিয়াছিলেন, তাহা নহে। কাগজের অভাবও তিনি অনেকটা পূরণ করিয়াছিলেন। প্রথম-প্রথম তিনি পাটনার মোটা কাগজ ব্যবহার করিতেন; পরে বিলাত হইতেও কাগজের আমদানী করেন। কিন্তু সময়ে সময়ে কাগজ না পাওয়ায় যথাসময়ে পুস্তক-প্রকাশের পক্ষে ব্যাঘাত ঘটিতে লাগিল। এই দেখিয়া সে সময়ে উইলিয়ম জোন্স্ নামে এক সাহেব, পাদ্রী কেরীকে একটি "ষ্টীম এঞ্জিন" আনাইতে পরামর্শ দেন। পরামর্শ যুক্তিযুক্ত বুঝিয়া কেরী সাহেব একটি "ষ্টীম্ এঞ্জিন" ক্রয় করেন। ১৮২০ খৃষ্টাব্দের ২৭শে মার্চ্চ তারিখে এই কলটি এদেশে আসে। ইহার পূর্ব্বে ভারত-বর্ষে 'ষ্টীম্এঞ্জিন' কখনও আসে নাই,—ইহাই এদেশের আদি 'ষ্টীম্এঞ্জিন'। যেদিন কলটি শ্রীরামপুরে আসিয়া পৌঁছায়, সেদিন কি সাহেব, কি বাঙ্গালী—দেশশুদ্ধ লোক "আগুনের কল দেখিব" বলিয়া উহা দেখিতে দলে দলে ছুটিয়াছিল। এই কল হইতে পর্য্যাপ্ত পরিমাণে কাগজ প্রস্তুত হইতে লাগিল। ১৮২০ হইতে ১৮৬৫ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত শ্রীরামপুর ভারতের নানাস্থানে কাগজ সরবরাহ করিয়াছিল। সিপাহীবিদ্রোহের সময় যে টোটা বিদ্রোহের প্রধান

কারণ বলিয়া পরিগণিত হইয়াছিল, তাহাও নাকি শুনিতে পাওয়া যায় যে, এই কারখানায় প্রস্তুত হইয়াছিল।

বাঙ্গালা টাইপ ও দেশী কাগজ প্রস্তুত করিয়া, মুদ্রাযন্ত্রের প্রতিষ্ঠা করিয়া, এবং বাঙ্গালা ভাষায় নানা পুস্তক মুদ্রাঙ্কন করিয়া কেরী সাহেব বাঙ্গালা ভাষার যে কি উপকার করিয়া গিয়াছেন, তাহা বোধ করি আর বুঝাইয়া বলিবার দরকার করে না। ইতিপূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, ১৮০১ খৃষ্টাব্দে কেরী সাহেবের রচিত বাঙ্গালা 'নিউ টেষ্টামেণ্ট' ও ব্যাকরণ মুদ্রিত হয়। পরে ১৮১৫ খৃষ্টাব্দে তাঁহার অমর কীর্ত্তি "বাঙ্গালা অভিধান" প্রকাশিত হইতে আরম্ভ হয়। এই অভিধান খানিতে অন্যূন অশীতি সহস্র অর্থ-সমন্বিত বাক্য সংগৃহীত হইয়াছে।

প্রথম-প্রথম ছাপিবার জন্য বাঙ্গালা বহি পাওয়া যাইত না; সেইজন্য ইংরাজী পুস্তক বাঙ্গালায় অনুবাদ করিয়া তখন বহি ছাপান হইত। শুনিতে পাওয়া যায়, ভার্জ্জিলের 'ইলিয়ড্' কাব্য এবং সেক্সপীয়রের 'টেম্পেষ্ট' নাটক পুস্তক সে সময়ে অনূদিত হইয়া মুদ্রিত হইয়াছিল। ইহার কিছুদিন পরে স্কুলবুক-সোসাইটিও বাঙ্গালা পুস্তকাদি ছাপাইতে আরম্ভ করে। সোসাইটি সেই সময়ে কেশবচন্দ্রের পিতা রামকমল সেনকে সোসাইটির কর্ম্মচারীরূপে নিযুক্ত করিয়া তাঁহার দ্বারা একখানা বাঙ্গালা অভিধান লিখাইয়া লন। ক্রমে ক্রমে বাঙ্গালা পুস্তকের প্রচার বাড়িতে লাগিল। শুনা যায়, এই সময়ে দশ বৎসরের মধ্যে ন্যূনাধিক পঞ্চদশ সহস্র পুস্তক বিক্রয় হইয়া যায়।

বাঙ্গালা সংবাদপত্রের সৃষ্টিও কেরীর হাতে হইয়াছিল। তিনি বাঙ্গালায় আসিবার পূর্ব্বে এদেশে সংবাদপত্রের অস্তিত্বই ছিল না। ১৮১৮ খৃষ্টাব্দে ডাক্তার মার্শমান্ একখানি বাঙ্গালা সংবাদপত্র প্রকাশ করিবার প্রস্তাব করেন। কেরী সর্ত্ত করেন যে, সংবাদপত্র যদি মাসে মাসে বাহির হয়, আর সেই কাগজে যদি রাজনীতির কোনও গন্ধ না থাকে, তাহা হইলে তিনি সে কাগজ চালাইতে প্রস্তুত আছেন। সঙ্কল্প কার্য্যে পরিণত হইল। ঐ বৎসরেই খুব ধুমধাম করিয়া শ্রীরামপুরে "দিগ্‌দর্শন" নামে একখানি মাসিকপত্র প্রকাশিত হয়। ইহাই ভারতবর্ষের আদি মাসিকপত্র। "দিগ্‌দর্শন" তিন বৎসরকাল জীবিত ছিল। শিক্ষিত সম্প্রদায়ের নিকট কাগজখানির খুবই আদর হইয়াছিল। তারপর, ১৮১৮ খৃষ্টাব্দের ৩১শে মে তারিখে শ্রীরামপুর হইতে কেরী সাহেব "সমাচার দর্পণ" নামে একখানি সাপ্তাহিক পত্র বাহির করেন। এই "সমাচার দর্পণ" বাঙ্গালার আদি সাপ্তাহিক পত্র। ভারতের তদানীন্তন গবর্ণর জেনারেল লর্ড হেষ্টিংস্

এই কাগজখানির ডাকমাশুলের হার তখনকার সাধারণ ডাকমাশুলের চতুর্থাংশ নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিয়াছিলেন। এই খৃষ্টানী কাগজে হিন্দুধর্ম্মের, হিন্দুর আচার-ব্যবহারের বিরুদ্ধে প্রবন্ধাদি প্রকাশিত হইত। হিন্দুরাও ঐ সকল কথার পাল্টা জবাব দিবার জন্য "তমোনাশন" নামে আর একখানি সাপ্তাহিক পত্র বাহির করেন। এইরূপে এদেশে সংবাদপত্রের সৃষ্টি হইল। সঙ্গে সঙ্গে বঙ্গ-ভাষারও প্রসার বৃদ্ধি হইতে লাগিল।

লর্ড হেষ্টিংসের আমলেই এদেশে ইংরাজী সংবাদপত্রের সৃষ্টি হয়। সে কাগজের নাম রাখা হইয়াছিল—"ফ্রেণ্ড অব্ ইণ্ডিয়া"। এখন আমরা "ষ্টেটস্‌ম্যান" নামে যে কাগজখানি দেখিতে পাই, উহাই হেষ্টিংসের আমলে "ফ্রেণ্ড্ অব্ ইণ্ডিয়া" নামে প্রকাশিত হইয়াছিল। ডাক্তার মার্শমান্ ও তাঁহার পুত্র এই পত্রের সম্পাদকতা ও কার্য্যাধ্যক্ষতার কার্য্য করিতেন। তারপর বিখ্যাত জর্ণালিষ্ট মেরিডিথ্ টাউনসেণ্ড সাহেব এই কাগজের কর্ত্তৃত্বভার স্বহস্তে গ্রহণ করেন। এদেশে ইংরাজী সংবাদপত্রের মূলেও মার্শমানের ন্যায় কেরীও ছিলেন। কেরী সাহেবকেই আমরা এদেশে সাপ্তাহিক ও মাসিকপত্রের প্রতিষ্ঠাতা ও প্রবর্ত্তক বলিয়া নির্দ্দেশ করিতে পারি। বাঙ্গালা ভাষার উন্নতির জন্য এমন কাজ ত দেখিতে পাই না, যাহার মূলে কেরী নাই। হিন্দু হউন, আর খ্রীষ্টানই হউন, যিনি শিক্ষাবিস্তারের জন্য এতটা যত্ন, এতটা ত্যাগস্বীকার করিয়া গিয়াছেন, তিনি আমাদের পরম কৃতজ্ঞতার পাত্র। পরিষৎ কেরী সাহেবের নাম-গন্ধ না করিলেও বঙ্গসাহিত্যের ইতিহাস হইতে কেরী সাহেবের নাম কেহ মুছিতে পারিবেন না। লোক-বল থাকিলে, জোগাড় থাকিলে, পয়সার জোর থাকিলে, এদেশে পঞ্চাশ বৎসরের বুড়া পড়িতে পায় না;—ঘর হইতে তাঁহাকে টানিয়া আনিয়া সম্বর্দ্ধনা করা হয়! অথচ যাঁহারা দেশের ও দশের কাজ করিয়া গিয়াছেন, শিক্ষা-বিস্তারের জন্য প্রাণপাত করিয়াছেন, আমাদের মনুষ্যত্বের উন্মেষ ঘটাইবার চেষ্টা করিয়া গিয়াছেন, তাঁহাদের নাম আমরা মুখে আনি না। কিন্তু আমরা কালি-কলমে নিত্যই জাহির করিয়া থাকি, আমাদের কর্ত্তব্য-জ্ঞানটা এখন খুব বেশী হইয়াছে।

শ্রীঅমরেন্দ্রনাথ রায়।

অজ্ঞাতবাস।*

(১)

আধুনিক বাবুদের পূজার অবকাশে বেড়াইতে যাওয়ার মত সংক্রামক ব্যাধি আমাকে স্পর্শ করিতে না পারিলেও গত পূজার অবকাশে আমাকে বাধ্য হইয়া কাশীধামে যাইতে হইয়াছিল। কারণ আমাদের সরল সুধী সুহৃদ দেবীদা' শরীরা-সুস্থতা-নিবন্ধন দিন কতকের জন্য বায়ুপরিবর্ত্তন করিতে সেখানে গমন করিয়া-ছিলেন। তাঁহাকে দেখিলে আনন্দ হয়, তাঁহার মুখের দুটো কথা প্রাণে অমৃতসিঞ্চন করে। তাঁহার স্পষ্টভাষিতা যতই অপ্রিয় হউক না কেন আনন্দ-প্রদ, তাঁহার মুখের বাণী যত তিক্ত হউক না কেন বসন্তকালে কচি নিম্বপত্রের ন্যায় রোচক। কি একটা তাঁহার মহা-আকর্ষণী শক্তিতে তাঁহাকে আমরা এত ভালবাসি যে তাঁহার পাদমূলে কণ্টক বিদ্ধ হইলে মনে হয় দাঁত দিয়া তুলিয়া দিই। এ হেন প্রিয়বর দেবীদা' যখন তাঁহার প্রিয় পাচক ফকিরকে লইয়া কাশী-ধামে অবস্থান করিতেছেন, তখন দিন কতকের জন্য সেখানে গিয়া তাঁহার সহিত একত্র অবস্থান, আহার-বিহার যে কিরূপ লোভপ্রদ তাহা বর্ণনীয় নহে। প্রিয়-বন্ধু অমূল্যকে লইয়া আমি কাশীধামে দশাশ্বমেধঘাটে একটী ক্ষুদ্র অট্টালিকায় উপনীত হইলাম। আমাদিগকে পাইয়া নির্ব্বাসিতপ্রায় দেবীদা'র মুখমণ্ডল অনাবিল আনন্দের পবিত্র প্লাবনে উচ্ছ্বসিত হইল।

অঘটন ঘটিল! সাগরাভিমুখে নদী যেরূপ প্রবাহিত হয়, চুম্বকের আকর্ষণে লৌহখণ্ড আত্মবিস্মৃত হইয়া যেরূপ ছুটিয়া যায়, সেইরূপ হইল! আমাদের বাল্যবন্ধু 'বুটে' দিল্লি হইতে এবং প্রিয়দর্শন দাশুও কলিকাতা হইতে দেবীদা'-সান্নিধ্যে উপনীত হইল। আমরা এই অপ্রত্যাশিত মিলনে আত্মবিস্মৃত হইয়া পড়িলাম। সুর তাল সংযোজনা করিয়া বন্ধু অমূল্য গাহিল—

এস গো দেবীদা' এস গো।
বাঞ্ছিত তুমি, শ্রীচরণে নমি, পরাণের প্রিয় বঁধুগো—
উদার মহান্ হৃদয় তোমার, করুণার ধারা বহে শতধার—
তুমি যে মোদের প্রীতি-পারাবার, নয়ন-অঞ্জন বঁধুগো—
যেথা যাবে তুমি যাব সাথে সাথে, তামাকু সাজিব, খা'ব তব 'পাতে'—
দোসর হইব মরণের পথে, সহমরণে যা'ব গো।

---

* Truths are stranger than fictions এই গল্পটী তার একটী দৃষ্টান্ত। স্থান কাল পাত্র সমস্তই কল্পিত।—লেখক।

আমাদের তান্‌সেন দাশু এই গানে তান সংযোগ করিল, 'গিটকীরী' মারিল। গান জমিল।

* * * * *

বিজয়ার পর আমরা বন্ধু কতিপয় কোলাকুলি করিয়া প্রীতি-বন্ধনে পরস্পরে 'মজগুল্' হইয়া রহিলাম। বাস্তবিক আমাদের এই অপ্রত্যাশিত মিলনে যেন স্বর্গের সুখ-শান্তি আনয়ন করিয়াছিল। কারণ প্রকৃতপক্ষে আমরা 'বুটে' ও 'দাশু'কে বহুদিন হারাইয়াছি। 'বুটে' চাকুরীর খাতিরে দিল্লিতে বদলী হইয়াছে। আর দাশু পূর্ব্বে আমাদেরই ছিল, একটু অন্তরে থাকিলেও নিয়ত আসিত। এখন আমাদের দূরদৃষ্টবশতঃ 'মাঝে মাঝে তার দেখা পাই, নিতি নিতি সে যে আসে না!' এতে দাশুর দোষ দেওয়া চলে না। কারণ আমাদের চেয়েও তাহাকে ভালবাসিতে পারে এমন তাহার কতকগুলি বন্ধু তাহার পথ আগুলিয়া বসিয়া থাকে! আমাদের তান্‌সেন্ দাশু তাহাদের প্রীতি-স্বর্ণ-শৃঙ্খলে আবদ্ধ! দাশুকে ও বুটেকে স্নেহ-শৃঙ্খলে বাঁধিতে প্রয়াস পাইলাম। এইরূপে অতি সুখেই দিন অতিবাহিত হইতে লাগিল।

(২)

নিরবচ্ছিন্ন সুখ মানবের ভাগ্যে ধাতা লিখেন নাই। তাহা হইলে স্বর্গে ও মর্ত্ত্যে কোনও পার্থক্য থাকিত না। সুতরাং আমাদের প্রত্যাগমনের দিন উপস্থিত হইল। দেবীদা'র স্নেহময় বাহুপাশ ছিন্ন করিয়া আমরা চারিজনেই বিদায় লইলাম। কোনরূপে নয়নজল অবরুদ্ধ রাখিয়াছিলাম। আমাদের স্থির হইল সারনাথ দেখিয়া বেনারস-ক্যাণ্টনমেণ্ট ষ্টেসন হইতে অমূল্য ও আমি কলিকাতায় ফিরিব, দাশু ও বুটে অযোধ্যা-রোহিলখণ্ড-রেলে দ্বারবঙ্গ হইয়া আসিবে। পথে এমন কোনও বিশেষ উল্লেখযোগ্য ঘটনা ঘটে নাই, তবে বন্ধুবর অমূল্য নানারূপ রসিকতা ও রহস্যে আমাদের সজীব রাখিতে চেষ্টা করিয়াছিল; তন্মধ্যে তাহার শালিক পক্ষীর ভাষায় কথোপকথন ও তাহার ভাষাটী উপভোগ্য। রসভঙ্গ হইবে না বিবেচনায় নিম্নে তাহা উদ্ধৃত করিলাম।

জনৈক শালিক—খুন্নি কুরকুচি কঁহা ঘিন্না ছোঁ (হে বন্ধুপত্নী, বন্ধু কোথায় গেছে ?)

শালিক-পত্নী—চি কট্ কট্ কোঁ ক্যাঁ (এই ছিল, কোথায় গেছে)

শা—ক্যাঁকোর্ বিচি কোকিও কোকিও কোকিও (আমি যে এসেছিনু— একথা—তাকে বোলো বোলো বোলো)

শালিক-পত্নী—ট্রক্ ছোঁ ট্রক্ ছোঁ, টক্ টক্ ছোঁ (বোল্‌বো বোল্‌বো অবশ্য বোল্‌বো)

শা—কিশিং কিশিং কিশিং—(আসি আসি আসি)

ফর্‌রাং (উড়িয়া যাইবার শব্দ)

আমরা এইরূপ আনন্দ করিতে করিতে ক্যান্টনমেণ্ট-ষ্টেশনে আসিয়া দাশু ও বুটেকে ট্রেণে চড়াইয়া বিদায় দিলাম। এবং শুনিলাম ট্রেণের সময় পরিবর্ত্তন হওয়ায় কলিকাতা যাইবার শেষ ট্রেণ ছাড়িয়া গিয়াছে। আমরা চক্ষুতে অন্ধকার দেখিলাম। সাহেব ষ্টেশন মাষ্টারকে বিশ্রামাগারটী রাত্রের মত ব্যবহার করিতে দিতে অনুরোধ করিলাম। তিনি মধ্যম শ্রেণীর যাত্রীকে ১ম ও ২য় শ্রেণীর বিশ্রামাগারে স্থান দিতে অস্বীকৃত হইলেন এবং আমাদিগকে মোসাফেরখানায় বিশ্রাম করিতে 'বিনামূল্যে' পরামর্শ দিলেন। বলা বাহুল্য, আমরা বাধিত হইয়া বলিলাম—"যদি ২য় শ্রেণীর টিকিট না হইলে বিশ্রামাগারে প্রবেশের নিয়ম না থাকে তাহা হইলে না হয় আমরা মোগলসরাই অবধি দুইখানি ২য় শ্রেণীর টিকিট ক্রয় করি।"

সাহেব ভদ্রতা করিয়া বলিলেন—বিশ্রামাগারে ২।১ ঘণ্টা থাকা চলিতে পারে, উহা সমস্ত রাত্রি অবস্থানের জন্য নহে।

আমরা প্রমাদ গণিলাম। রাত্রি দশটার সময় আবার দেবীদা'কে বিরক্ত করিতে কাশীধামে প্রত্যাবর্ত্তন করিব এ ইচ্ছা আমার বা অমূল্য কাহারও ছিল না, অমূল্য তাই আমাকে কহিল—"ছকু, আমি জানি এই ষ্টেশনের নিকট আমাদের একজন নামজাদা বাঙ্গালী বেপোয়ারীবাবু থাকেন। ইনি এখানকার একজন বড় ইঞ্জিনিয়র। চল তাঁর বাড়ীতে যাই, খুব আদরের সহিত তিনি আমাদের আশ্রয় দিবেন এ বিশ্বাস আমার আছে। বিদেশে বাঙ্গালী বাঙ্গালীকে খুব খাতির যত্ন করে।"

আমি তাহার কথায় দ্বিরুক্তি করিলাম না; একখানি একাগাড়ীতে দুই বন্ধুতে বেপোয়ারী বাবুর বাসা-অভিমুখে প্রধাবিত হইলাম।

(৩)

আমরা বেপোয়ারী বাবুর সুবৃহৎ ও সুসজ্জিত অট্টালিকার ফটকে পৌছিলে, দারোয়ান সম্ভ্রমের সহিত আমাদের আগমনের উদ্দেশ্য জিজ্ঞাসা করিল। অমূল্য আমার দিকে ফিরিয়া ইংরাজীতে বলিল—'What's the good of telling our object to this fellow?' আমিও ঘাড় নাড়িয়া বন্ধুবরের কথায়

সম্মতি দিলাম। বন্ধুবর তাঁহার স্বভাবসিদ্ধ হিন্দিভাষার প্রস্রবণ ছুটাইলেন—বলিলেন—"দেখো, হাম কল্‌কেত্তা রহেনাওলা হ্যায়—বেণোয়ারী বাবুকে দোস্তি হ্যা, বাবুকে এক্‌দফে সমাচার দেনা"—মেঘের কোলে সৌদামিনীর রেখার মত, দারোয়ানজীর গুম্ফ নিম্নে একটা মৃদু হাসিরেখা ছুটিয়া গেল! বন্ধুবরের হিন্দীভাষার অভিজ্ঞতার জন্য এই হাস্য অথবা ইহার আর কোনও গূঢ় কারণ ছিল তাহা তখন বুঝি নাই, পরে বুঝিয়াছিলাম। দারোয়ানজী বাটীর ভিতর প্রবেশ করিল এবং ৫ মিনিট পরে ফিরিয়া আসিয়া আমার হস্তে একখানি ইংরাজীতে ছাপা কাগজ দিল—তাহাতে লেখা ছিল—

Name, Address, Business (অর্থাৎ নাম, ধাম, কার্য্য)।

সুতরাং বুঝিতে বাধ্য হইলাম যে বেণোয়ারীবাবু সাহেব-প্রকৃতির লোক। অমূল্য দ্বিরুক্তি না করিয়া তাহার নাম ধাম এবং উদ্দেশ্য 'সাক্ষাতে বক্তব্য' মুদ্রিত ফরম এইরূপ পূর্ণ করিয়া বেণোয়ারী-সাহেবের নিকট পাঠাইল। পাঁচ মিনিট পরে ভিতর হইতে সংবাদ আসিল—"সাহেব আপ্‌কো সেলাম্‌ দিয়া।"

আমরা উভয়ে ভিতরে প্রবেশ করিতেছি এমন সময় অমূল্য আমার কাণে কাণে বলিল—আমরা বোধ হয় এখানে থাকবার জায়গা পাব না, কিন্তু আমার বিশেষ ইচ্ছা আজ এইখানেই থাকি। দেখি না কি রহস্য হয়। অমূল্য চিরদিন রহস্যপ্রিয়—আমারও কেমন তীব্র ইচ্ছা হইল যেমন করিয়াই হউক আজ এই বাঙ্গালী-সাহেবের আতিথ্য-গ্রহণ করিতেই হইবে। আলবিল্লা-পরিহিত বেণোয়ারী সাহেব তখন চেয়ারে বসিয়া আছেন, সম্মুখে একখানি নক্সা ও কতকগুলি কাগজপত্র রক্ষিত। আমরা সম্মুখীন্ হইতেই গম্ভীর স্বরে সাহেব বলিলেন—"What do you want please ?" (আপনারা কি চান্ মহাশয়)। বাঙ্গালীর সাহেবীয়ানা চাল দেখিলে অমূল্য ভারি চটিত। সে নিজে উচ্চশিক্ষিত ও দেশের একজন সম্ভ্রান্ত ও নামজাদা ব্যক্তি হইলেও কখনও সে 'আত্মবিস্মৃত' হয় নাই। সেও গম্ভীর ভাবে বলিল—"আজ্ঞে আমরা আজ ষ্টেশনে ট্রেণ ফেল হয়ে বড়ই কষ্টে পড়েছি, যদি আপনি এই রাত্রিটার মত দয়া করে একটু আশ্রয় দেন।"

বেণোয়ারী-সাহেব নাক সিটকাইয়া বলিল—"Oh 'am awfully sorry, I hav'nt got enough accommodation" (আমি অত্যন্ত দুঃখিত, আমার বাটীতে স্থান সংক্ষেপ)। ইংরাজী কথা বুঝিয়া তাহার উত্তরে বাঙ্গালা জবাব দেওয়াটা বোধ হয় সভ্যতা-বিরুদ্ধ। তাই বেণোয়ারী-সাহেবের মুখখানিতে বিরক্তিভাব

প্রস্ফুট। অমূল্য নাছোড়বন্দা। সে যদি নিজের পরিচয় দিত তাহা হইলে সাহেব তাহাকে অন্দরের মধ্যে একটী দুগ্ধফেননিভ শয্যাদান করিতেও বোধ হয় কুণ্ঠিত হইতেন না। কিন্তু আত্ম-সম্মানজ্ঞানে অমূল্য অপরাজেয়। পরিচয় না দিয়া এই স্থানেই আমাদের আশ্রয় লইতে হইবে এই তাহার পণ। সে সপ্রতিভভাবে বলিল —দেখুন, আপনিও বাঙ্গালী, আমরাও বাঙ্গালী। বিদেশে বাঙ্গালী বাঙ্গালীকে খুব যত্ন করেন, তবে আপনি বড় চাকরী করেন, বাঙ্গালী থেকে সাহেবীতে উন্নীত হয়েছেন এই যা কথা!

বেণোয়ারী-সাহেব চুরুটের ছাই ফেলিতে ফেলিতে একটু রাগত ভাবে বলিলেন—"I shall be obliged if you don't disturb me!" (আপনি আমাকে বিরক্ত না করিলে বাধিত হইব)—আমি বুঝিলাম এর পরের ঘটনা 'অর্দ্ধচন্দ্র' সেইজন্ত ব্যাপারটা আর অগ্রসর হয় এটা আমার ইচ্ছা ছিল না, তাই অমূল্যকে চোক্ টিপিলাম। উভয়ে নীরবে সাহেবের কক্ষ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলাম—সাহেবের নিকট সাহেবীয়ানা হিসাবে কোনও 'বিদায়' লওয়া আবশ্যক বোধ করিলাম না।

(৪)

আমাদের বেণোয়ারী-সাহেবের চেয়ে দারোয়ানকে হৃদয়বান্ বলিয়া বোধ হইল। সে আমাদিগকে কহিল 'আপ্‌লোক এৎনা রাৎমে কাঁহা ঠাহারিয়েগা?' হিন্দীভাষায় আমার খুব একটা দখল আছে, অন্ততঃ আমার পরিচিত বন্ধুবান্ধবেরা আমায় এইরূপ 'সার্টিফিকেট' দিয়াছেন! আমি বলিলাম— "রাস্তাপর গাছতলামে শুয়া রহেগা, ব্যস্। ফজির হনেসে কল্‌কেত্তায় দৌড় দিয়াযায়েগা।" দারোয়ান ঈষদ্ধাস্ত করিয়া কহিল—'বাবু হিঁয়াপর ক্যাণ্টমেণ্টকে কানুন্ হ্যায়—এৎনা রাৎমে ক্যা জানে আপ্‌লোক পাকাড় যা শক্তেহেঁ।"

আমি—ক্যা করেগা, বায়সিন্ অদৃষ্টমে হ্যা ঐ সিন্‌তো হোনা চাহিয়ে।

দারোয়ান—আপ্ মেহেরবাণী করকে মেরা ছোটি কাম্‌রেমে তশরিফ লিজিয়েগা তো বহুৎ আচ্ছি হ্যায়।

আমি—উস্‌মে ক্যা হায়, আলবৎ রহেগে।

বলা বাহুল্য, বেণোয়ারী-সাহেবের দারোয়ানের ব্যবহারে আমরা মুগ্ধ হইয়াছিলাম। উচ্চশিক্ষিত স্বদেশবাসী কেবলমাত্র রাত্রিবাসের স্থানদান করিতে কুণ্ঠাবোধ করিলেন, কিন্তু সামান্য দশ টাকা বেতনের অশিক্ষিত দারোয়ানের হৃদয় আমাদের জন্য কাঁদিয়া উঠিল। আমরা বিপদে পড়িবার যেরূপ ভাব

দেখাইতেছিলাম আমাদের দশা সেরূপ না হইলেও, বেণোয়ারী-সাহেবের নিকট আমরা সদ্ব্যবহার আশা করিয়াছিলাম। যাহা হউক আমরা হৃদয়বান দারোয়ানের ক্ষুদ্র কুটীরে রাত্রিবাস করিয়া পরদিবস বেণোয়ারী-সাহেবকে ২।১টী বাক্যবাণ বিদ্ধ করিয়া বাটী ফিরিব এই 'উত্তপ্ত' আশায় ক্ষুদ্র 'চার পায়ে'র উপর সুদীর্ঘ তনুদ্বয় বিস্তার করিয়া দুই বন্ধুতে শয়ন করিলাম। বলা বাহুল্য, আমরা দারোয়ান প্রদত্ত 'চাপেটী' ও 'মহরকী ডাল' খুব তৃপ্তির সহিত আহার করিয়াছিলাম।

(৫)

রাত্রি তিনটা বাজিয়া গিয়াছে। আমরা ছারপোকা-দংশনে বিব্রত হইয়া দুই বন্ধুতে মিলিয়া অনবরত সিগারেট ধ্বংস করিতেছি এবং মাঝে মাঝে পায়চারি করিয়া দংশন-জ্বালার শান্তিলাভ করিতে প্রয়াস পাইতেছি, অদূরে দারোয়ান গাঢ় নিদ্রাভিভূত। ছারপোকা কেন, বোধ হয় 'বোল্‌তা' কামড়াইলেও তাহাকে তুলিতে পারিত না। এমন সময়ে আমাদের কক্ষে "ক্রীং ক্রীং ক্রীং" করিয়া ঘণ্টা বাজিতে লাগিল। আমরা কি করি, বাধ্য হইয়া দারোয়ানের ঘুম ভাঙ্গাইয়া ঘণ্টার দিকে তাহার নিদ্রিত নয়ন ও মন আকর্ষণ করিয়া দিলাম। সে বলিল—"বহুৎ মুস্কিল হো গিয়া, সাহেব হামেরা জরিমানা করেঙ্গে।"

আমরা সাহস দিয়া কহিলাম—"তোম্ ভিতরমে যাও, তোমরা ত কুছ কসুর নাহি হুয়া। জরিমানা হো যায় ত হাম্‌লোক তোমরা ক্ষতিপূরণ করেগা।"

দারোয়ান আমাদের কথা শুনিতে শুনিতে অন্দরমহলে প্রবেশ করিল এবং দুই মিনিটের মধ্যে একখানি চিঠি হস্তে ফিরিয়া আসিল এবং আমাদিগকে বসিয়া থাকিতে অনুরোধ করিয়া ত্রস্তে বাহিরে চলিয়া গেল। ব্যাপার কি? চিঠি কিসের? কিছুই বুঝিতে পারিলাম না। ভয় হইল, যদি ইঞ্জিনিয়র সাহেব আমাদের অবস্থিতি জানিতে পারিয়া আমাদিগকে পুলিসে দিবার জন্য দারোয়ানকে পুলিশে পাঠাইয়া থাকেন। আমরা দুই বন্ধুতে সভয়ে এই বিষয়ে আলোচনা করিতে লাগিলাম। রহস্তের ফল শেষে কি শ্রীঘরবাসে পর্য্যবসিত হইবে! অমূল্য দারোয়ানের উদ্দেশ্যে বলিল—'দোহাই বাবা দারোয়ান! আমাদের কি এমনি জামাই-আদরে যত্ন করে শেষে শ্রী-ঘরে পাঠাবে।' প্রায় ঘণ্টা খানেক পরে একজন 'হ্যাটকোট'ধারী বাঙ্গালী "থপ্ থপ্ টুং টুং" শব্দকারী একখানি শকটারোহণে বাটীর মধ্যে প্রবেশ করিলেন। তখন দুই বন্ধুতে আমরা নবাগত ভদ্রলোকটী সম্বন্ধে আলোচনায় প্রবৃত্ত হইলাম। ইনি কে? পুলিশের ইনস্পেক্টর? না তা'ত নয়, তাহা হইলে ইনি অন্দরের মধ্যে

প্রবেশ করিবেন কেন? এই যুক্তিতে আমাদের হৃদয়ের গুরুভার কতকটা লাঘব হইল। ইনি ডাক্তার নিশ্চয়ই! পরক্ষণেই আমাদের কথার যাথার্থ্য প্রমাণীকৃত হইল। বেণোয়ারী-সাহেব ডাক্তার-সাহেবের সহিত ফটকের দিকে আসিতেছেন, পশ্চাতে গাড়ীখানি আস্তে আস্তে চলিয়াছে। আমরা কামরার দরজাটী একটু বন্ধ করিয়া দিলাম, ডাক্তার সাহেব বলিলেন—"It is a real Asiatic type Cholera, we should do what can be best done!" সজলনেত্রে বেণোয়ারী-সাহেব ডাক্তার-সাহেবের সহিত করমর্দ্দন করিয়া অন্দরে প্রবেশ করিলেন। দারোয়ানের মুখে শুনিলাম সাহেবের একমাত্র পুত্রের কলেরা হইয়াছে।

(৬)

ব্যাপার গুরুতর হইয়া উঠিয়াছে। একঘণ্টা পরে ডাক্তার-সাহেব আসিলেন, এবং Injection করিয়া ঔষধপ্রয়োগ করিয়া গেলেন এবং প্রত্যুষে ছয়টার সময় পুনরায় আসিয়া Case hopeless মন্তব্য প্রকাশ করিয়া রুমাল দিয়া মুখ মুছিতে মুছিতে প্রস্থান করিলেন। বেণোয়ারী-সাহেব এই বাঙ্গালী ডাক্তারকে প্রথমবার আনিবার পরই স্থানীয় সাহেব ডাক্তারকে আনিবার জন্য প্রতি অর্দ্ধ ঘণ্টা ব্যবধানে লোক পাঠাইতেছেন। লোক ফিরিয়া আসিয়া প্রতিবারই সংবাদ দিতেছে—"ডাক্তার-সাহেব মোগলসরাই গিয়াছেন, বেলা নয়টার সময় তাঁহার আসিবার কথা।" তবু বেণোয়ারী-সাহেবের মন বুঝিতেছে না। যদি কোনও প্রকারে ডাক্তার-সাহেব মোটরে ব্যোমযানে বা অন্য কোনও দ্রুতগামী যানে বিধাতা প্রেরিত হইয়া প্রত্যাবর্ত্তন করেন! বিপদের সময় অঘটন সংঘটনের সম্ভাবনা মানব মাত্রেরই হৃদয়ে স্বতঃই উপস্থিত হয়। তাই তাঁহার কঠোর আদেশ—"ডাক্তার সাহেব আসুন আর নাই আসুন, অনবরত তাঁর বাটীতে লোক যাওয়া চাই-ই।" তখন বেলা ৬৷৹টা, বাড়ীর ভিতর হইতে বামাকণ্ঠনিঃসৃত করুণ ক্রন্দন ধ্বনি উত্থিত হইয়া আমাদের মর্ম্মস্পর্শ করিল। আমরা নিতান্ত কঠোর হৃদয় হইলেও বড়ই বিচলিত হইয়া উঠিলাম। অভিশাপের কথা আমাদের মধ্যে প্রচলিত আছে বটে কিন্তু আমরা ত কোনও অভিসম্পাত করি নাই, অথবা অভিসম্পাত করিলে যে তাহার ফল অবশ্যম্ভাবী হাতে হাতে ফলিবে এমত বিশ্বাস ত আমাদের নাই।

অমূল্য বলিল—'উঠ' তখন রহস্য নামক পদার্থটা তাহার হৃদয় হইতে কোথায় অন্তর্হিত হইয়াছে। সে গম্ভীর। যে বাটীর 'বাহিরের ঘরে' আমরা

পূর্ব্বরাত্রে 'টিকিট' না দিয়া প্রবেশ করিতে পাই নাই সেই বাটীর অন্তঃপুরে বিনা আহ্বানে আমরা উভয় বন্ধু প্রবেশ করিলাম এবং ক্রন্দনরোল লক্ষ্য করিয়া আমরা রোগীর গৃহে উপস্থিত হইলাম।

রোগীর চক্ষু কোটরগ্রস্ত। কেবল তৃষ্ণায় জল জল করিতেছে এবং অসহ্য যন্ত্রণায় ছটফট্ করিতেছে। তাহার মাতা একটী চাম্‌চে করিয়া মাঝে মাঝে তাঁহার মুখে জল দিতেছেন। বেণোয়ারী-সাহেব দূরে রুমালে মুখ ঢাকিয়া বসিয়া আছেন। দ্বারপার্শ্বে পরিচারিকা পাচিকা প্রভৃতি ৪।৫ জন হুকুম তামিল করিবার জন্য আদেশের অপেক্ষা করিতেছে। আমাদের দেখিয়া রোগীর মাতা অবগুণ্ঠন ঈষৎ টানিয়া দিলেন। আমাদের পদশব্দে বেণোয়ারী-সাহেব মুখ হইতে রুমাল অপসারিত করিয়া আমাদের মুখপানে উদাস দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিলেন। আমরা কাহাকেও কোনও কথা বলিলাম না। অমূল্য শয্যার উপর বসিয়া রোগীর নাড়ী-পরীক্ষা করিয়া মুখ বিকৃত করিল। নাড়ী তখন বাহুমূল ছাড়িয়া ঊর্দ্ধে উঠিতেছে। রোগীর হাত পা ঠাণ্ডা। পাঁচ মিনিট অন্তর হোমিওপ্যাথিক ঔষধ চলিতেছে। আমি পরিচারিকাদের একজনকে সম্বোধন করিয়া কহিলাম, "একটু জল গরম কর"। একজনকে বলিলাম—"খানিকটা লবণ নিয়ে এস।" তাহারা মন্ত্রমুগ্ধবৎ আমাদের হুকুম তামিল করিল। অমূল্য তাড়াতাড়ি তাহার গ্লাডষ্টোন্ ব্যাগটী খুলিয়া একখানি 'ল্যান্‌সেট' বাহির করিয়া রোগীর বগলের উপরে কাটিয়া দিল এবং তাহাতে রবারের নল সংযোগ করিয়া লবণ সংযুক্ত ঈষদুষ্ণ জল ভিতরে (Injection) প্রবেশ করাইতে লাগিল। বেণোয়ারী-সাহেব বিস্মিত নয়নে আমাদের কাণ্ড দেখিতে লাগিলেন। কোনও বাঙ্‌নিষ্পত্তি করিবার তাঁহার ক্ষমতা ছিল না। আমাদের কার্য্য-অন্তে, 'অর্দ্ধ ঘণ্টা পরে আসিব' বলিয়া বাহিরে আসিলাম।

(৭)

অর্দ্ধ ঘণ্টা পরে পুনরায় আসিয়া দেখিলাম নাড়ী-সঞ্চালন আরম্ভ হইয়াছে। রোগীও অপেক্ষাকৃত সুস্থ। অমূল্যকে দেখিয়া বালক-রোগী বলিল, 'আপনার যখন এমন কাঁচা খেকো দেবতা রয়েছে তখন কাল রাত থেকে কেন আমায় এত কষ্ট দিলেন?' বালক-রোগী বোধ হয় বুঝিতে পারে নাই প্রথম ডাক্তার এবং অমূল্য স্বতন্ত্র ব্যক্তি। এইবার বেণোয়ারী-সাহেব বলিলেন—"মশায় কি ডাক্তার?" অমূল্য বলিল—"আজ্ঞে না মশাই, আমরা আপনার গত রাত্রির অতিথি।" তিনি মুখ নত করিলেন, কোনও কথা কহিলেন না।

রোগীর মাতা বোধ হয় আমাদের কথাবার্ত্তা বুঝিতে পারেন নাই, অথবা যদিও বুঝিয়া থাকেন তাহা হইলেও আমাদের প্রতি তাঁহার স্বামীর সদ্ব্যবহারের কথা বোধ হয় তিনি অবগত ছিলেন না। অবগুণ্ঠনের মধ্য হইতে করুণ ও কাতরকণ্ঠে তিনি বলিলেন—'আপনি আমার ছেলেকে অনেকটা রোগ-যন্ত্রণামুক্ত করেছেন—আপনি যেই হন, ডাক্তার হন আর নাই হন আমার ছেলেকে ভাল করে তবে এখান হইতে যাবেন আমার এই অনুরোধ।'

অমূল্য বলিল—"আপনারা এখানকার প্রধান ব্যক্তি, আপনাদের অনুরোধ-লঙ্ঘন করিবার শক্তি আমার নাই—আপনি কোনও ভয় করিবেন না। বিচক্ষণ সাহেব-ডাক্তার আসিতেছেন, তিনি রোগীর চিকিৎসা ভালই করিবেন। আমায় আজ কলিকাতায় যাইতেই হইবে না গেলে বিশেষ ক্ষতি, তবে ডাক্তার-সাহেব আসিলে আমি আর একবার আসিব।" বেণোয়ারী-সাহেব কি বলিতে যাইতে-ছিলেন কিন্তু তৎপূর্ব্বেই আমরা সে স্থান পরিত্যাগ করিয়া আমাদের আশ্রয়দাতা দারোয়ানজীর ক্ষুদ্র কুটীরে উপস্থিত হইলাম।

(৮)

ঠিক বেলা নয়টার সময় মোটর গাড়ীতে সাহেব-ডাক্তার আসিয়া উপস্থিত হইলেন। বেণোয়ারী-সাহেব তাঁহাকে উপরে লইয়া যাইতে যাইতে রোগের বিবরণ বুঝাইতে লাগিলেন। বলিলেন, "প্রথমে হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা হয় তাহাতে কোনও ফল হয় নাই, রোগীর নাড়ী ছাড়িয়া যায়। আমরা হতাশ হইয়া পড়িলাম! আপনার নিকট প্রতি অর্দ্ধ ঘণ্টা অন্তর লোক পাঠাই। এস্থানে আর কোনও চিকিৎসক নাই যিনি 'রজার্স' সাহেবের নূতন বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে কলেরা-চিকিৎসা করিতে পারেন। এমন সময় দুইটী অজ্ঞাত ভদ্র-লোক আসিয়া সেই প্রণালীতে চিকিৎসা করিলেন, এখন বোধ হয় রোগীর অবস্থা অপেক্ষাকৃত ভাল।" কথাবার্ত্তায় বুঝিলাম সাহেব-ডাক্তারের সহিত তাঁহার বিশেষ ঘনিষ্টতা। আমরা রোগীর পার্শ্বে উপস্থিত হইলাম। সাহেব ডাক্তার জিজ্ঞাসা করিলেন—"সে ভদ্রলোক কোথায়?" অমূল্য সপ্রতিভ-ভাবে ডাক্তার মরিশনের সম্মুখীন হইয়া অভিবাদন করিলেন। তিনি আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া বলিলেন—Hallo Amulya Babu! How are you? Whence have you come? Aren't you now in the Cholera Ward? (অমূল্য বাবু! কেমন আছ? কোথা থেকে আসছ? তুমি ত এখনও কলেরা ওয়ার্ডে আছ?) ডাক্তার মরিশন অমূল্যের শিক্ষক ছিলেন। অমূল্য

সহাস্যে তাঁহাকে অভিবাদন করিয়া কহিল—"Thank you sir! I am still in the Cholera Ward—I happened to be a guest of this gentleman on my way home." (ধন্যবাদ! এখনও আমি কলেরা ওয়ার্ডে আছি। বাটী যাইবার পথে আমি এই ভদ্রলোকটীর অতিথি হইয়াছি)।

সাহেব তখন বেণোয়ারী বাবুকে বুঝাইয়া বলিলেন যে অমূল্য তাহার প্রিয় ছাত্র ছিল। চিকিৎসা খুব সুন্দর হইয়াছে, এমন কি তিনি নিজে এরূপ করিতে পারিতেন কি না সন্দেহ! কারণ এই নব প্রণালীতে তিনি অধিক রোগী চিকিৎসা করেন নাই এবং সেইজন্য ইহাতে তিনি বিশেষ অভ্যস্তও নন। অমূল্য যে Godsend একথা বুঝাইতেও তিনি বিস্মৃত হইলেন না। তিনি অমূল্যকেই শেষ অবধি চিকিৎসা করিতে অনুরোধ করিলেন। এই স্পষ্ট-ভাষী সাহেব-ডাক্তারের কথায় আমরা বিশেষ প্রীত হইলাম। অমূল্য সাহেবকে ধন্যবাদ দিলেন। ডাক্তার-সাহেব আমাদের সকলের সহিত করমর্দ্দন করিয়া বিদায়গ্রহণ করিলেন। বেণোয়ারী-সাহেবের মুখখানি যেন বিবর্ণ হইয়া গেল। তিনি কিছু পরে প্রকৃতিস্থ হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—"ডাক্তার বাবু আপনার নাম?"

অমূল্য বলিল—'কেন কাল রাত্রিতে ত আপনার ফর্ম্মে লিখিয়া দিয়াছি।' মানুষ যতই নীচ বা অভদ্র হউক না কেন বিপদের সময় তাহাকে লইয়া রহস্য বা বিদ্রূপ করা অভদ্রতা ও নিষ্ঠুরতা। তবে আমি অমূল্যের কথায় প্রতিবাদও করিলাম না কারণ সে হয়ত নিশ্চয় বুঝিয়াছে রোগী বাঁচিবে সুতরাং রোগীর পিতা নিজেকে যেরূপ বিপদগ্রস্ত মনে করিতেছেন, সে সেরূপ করিতেছে না।

বেণোয়ারী বাবু বলিলেন—"মহাশয় আমার অপরাধ ক্ষমা করুন। কাল রাত্রিতে আপনারা কোথায় ছিলেন?" *

আমি বলিলাম—"কেন আপনার হৃদয়বান দারোয়ানের কামরায়!"

"উঃ আমি কি অভদ্র, নিষ্ঠুর! আপনাদের কতনা কষ্ট হয়েছে! আমি গলবস্ত্র হয়ে আপনাদের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছি—আপনারা আজ আমার আতিথ্যগ্রহণ করুন!" কাতরকণ্ঠে বেণোয়ারী বাবু এই কথা বলিয়া অমূল্যের মুখের দিকে চাহিলেন!

বেণোয়ারী বাবুর সহধর্ম্মিণী অবাক হইয়া তাঁহার স্বামীর ব্যবহারের কথা শুনিতে লাগিলেন।

* ক্ষমা প্রার্থনা করায় বেণোয়ারী 'সাহেব' হইতে 'বাবু'তে অবনমিত হইলেন।—লেখক।

অমূল্য গম্ভীরভাবে কহিল—"যখন ডাক্তার মরিশন সাহেব আমার হাতে রোগীর ভার দিয়া গিয়াছেন তখন আজ রাত্রে আমি কলিকাতায় যাইব না। আমি কেল্‌নারের হোটেলে থাকিবার ব্যবস্থা করিব!" গৃহিণী আসিয়া কহিল—"আপনাদের উপর আমরা যে নিষ্ঠুর ব্যবহার করিয়াছি তাহার জন্য আমাকে ক্ষমা করুন। আপনারা এখানে আতিথ্যগ্রহণ না করিলে আমরা বুঝিব, আমাদের পাপের প্রায়শ্চিত্ত নাই।"

এরূপ 'কাকুতি-মিনতি' কোনও ভদ্রলোক বা পাষণ্ড কেহই বোধ হয় উপেক্ষা করিতে পারে না—তবে অমূল্য অভিনয়টা মন্দ চালায় নাই! অগত্যা আমরা তাঁহাদের প্রস্তাবে সম্মত হইলাম।

(৯)

আমরা তিন দিন রহিলাম। রোগীর আর কোনও ভয় নাই! আমরা কলিকাতা যাইবার উদ্যোগ করিতেছি, এমন সময় একখানি তারবার্ত্তা হস্তে বেণোয়ারী বাবু ও তাঁহার পত্নী আমাদের সম্মুখীন হইলেন। বেণোয়ারী বাবু অমূল্যের হাত ধরিয়া বসিয়া পড়িলেন—তাঁহার পত্নী কোনও কথা কহিতে না পারিয়া কাঁদিতে লাগিলেন। ব্যাপার কি কিছু বুঝিতে পারিলাম না—অভদ্রতা হইলেও বেণোয়ারী বাবুর নিকট হইতে তারবার্ত্তাটী চাহিয়া লইলাম। দেখিলাম, তারের সংবাদটী অমূল্যের কনিষ্ঠ সহোদর বটকৃষ্ণ তাহার শ্বশুর বেণোয়ারী বাবুকে পাঠাইয়াছেন। সে রোগীর অবস্থা জিজ্ঞাসা করিয়াছে এবং আমাকে ও অমূল্যকে নমস্কার জ্ঞাপন করিয়াছে!

আমাদের সমস্ত পরিচয় বেণোয়ারী বাবুর গোচরীভূত হইয়াছে! তিনি লজ্জায় ও মরমে মরিয়া গিয়াছেন। অতঃপর একটু সংযত হইয়া তিনি বলিলেন —"বাবা অমূল্য আমি চিরদিন বিদেশে থাকি কখনও তোমায় দেখি নাই, তাই চিনিতে পারি নাই! আমি তোমার পিতৃস্থানীয় আমার অপরাধ লইও না।" অমূল্য বেশ সপ্রতিভভাবে বলিল—"কেন আপনি এত উতলা হচ্ছেন? মানুষের ভ্রম হয় না ত কা'র হয়?"

গৃহিণী বলিলেন—"বাবা অমূল্য, কিছু মনে কোরো না। মানুষের মেজাজ সব সময় ঠিক থাকে না। তুমি দিন কত এখানে থেকে যাও।"

অমূল্য বলিল—"না মা, আর আমার থাকবার যো নাই! আমার কালেজ কামাই হচ্ছে। অন্য সময় সবান্ধবে এসে আপনাদের বাটীতে থেকে যাব।"

অতঃপর আমরা দুই বন্ধুতে বেণোয়ারী বাবু ও তাঁহার সহধর্ম্মিণীকে প্রণাম করিয়া আগামী বৎসরের জন্য একটা নিমন্ত্রণ জুটাইয়া লইয়া বাটী ফিরিলাম। বলা বাহুল্য, ফিরিবার পূর্ব্বে দারোয়ানকে যথাসাধ্য বক্‌শিস দিতে বিস্মৃত হই নাই।

শ্রীকৃষ্ণদাস চন্দ্র।

আবাহন।

১

এইত উঠেছে ফুটি' সেই আকুলতা
পঙ্কজ-নয়নে,
সেই আশা ভাষা যেন রয়েছে ঘুমায়ে,
নন্দন স্বপনে।

২

আলো ছায়া, প্রতিবর্ণে, রেখায় রেখায়,
প্রিয়ার প্রতিমা—
তেমনি মদির হাসি, সম্ভ্রম সঙ্কোচ,
তেমনি ভঙ্গিমা!

৩

তেমনি অধর ওষ্ঠ বাঁকা ভ্রূযুগল—
তবু—তবু—যেন,
হয় নাই তার মত মধুর উজ্জ্বল—
কি অভাব—কেন?

৪

কোন্ বর্ণে, কোন্ ছন্দে, কোন্ অলঙ্কারে,
আঁকিলে তাহায়,
এ চিত্র ফলকে মোর পাইব দেখিতে
মোহিনী প্রিয়ায়!

৫

রহিয়াছি আত্মহারা মগ্ন তার ধ্যানে,
কত বর্ষ ধরি,
আঁকিতেছি এই পটে মূর্ত্তি প্রেয়সীর
জগৎ বিস্মরি'।

৬

হ'বে কি সাধনা ব্যর্থ—আমরণ শ্রম?
এই তুলিকায়
আঁকিতে কি পারিব না একটী রমণী
রূপ-পূর্ণতায়?

৭

একবার ফিরিত সে, চিত্র পাশে যদি
দাঁড়াইত আসি,
স্মৃতি হ'তে মুছে দিত গাঢ় কুহেলিকা
একবার হাসি!

৮

দেখিতাম কতরূপ ছিল তার দেহে,
কত রূপ প্রাণে,
কি ফুটিল চিত্রে মোর, কিবা ফুটিল না
যুগব্যাপী ধ্যানে!

৯

কোথা তুমি, কোন্ গ্রহে, আছ পুণ্যলোকে
রূপসী আমার?
ক্ষণতরে স্বর্গ ছাড়ি এস প্রেমময়ি
শুধু একবার!

১০

এস দেবি, এস ত্বরা, এ জীর্ণ কুটীরে
আছি প্রতীক্ষায়,
দিনান্তে ডুবিছে রবি—এ সাধনা মম
বুঝি ব্যর্থ যায়।

শ্রীসতীশচন্দ্র বর্ম্মণ।

মহাত্মা কার্ণেজি।

আণ্ড্রু কার্ণেজির অভূতপূর্ব্ব দানের জন্যই আজকাল আমেরিকার পাঠাগার সমূহের এত উন্নতি সাধন হইয়াছে। 'কার্ণেজি' নামটী এখন "পাঠাগারের উন্নতি"র পরিভাষারূপে পরিগৃহীত হইতেছে! পাঠাগারসমূহের ইতিহাসবিদ্ পাঠকবৃন্দ মহানুভব কার্ণেজিকে বিশেষ ভক্তি ও শ্রদ্ধার সহিত দেখিয়া থাকেন কি উপায়ে কার্ণেজি বিপুল সম্পত্তির অধিকারী হইলেন এবং দেশের কার্য্যের জন্য তাহা ব্যয় করিলেন—তাহা চিত্তাকর্ষক ও উচ্চ আদর্শ।

উনআশী বৎসর পূর্ব্বে আণ্ড্রু কার্ণেজি (Andrew Carnegie) স্কটল্যাণ্ডে ডম্‌ফার্‌লিন্ (Dumferline) নামক এক সহরে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতা উইলিয়াম কার্ণেজি তন্তুবায় ছিলেন। কার্ণেজি তাঁহার মাতা এবং খুল্ল-তাতের নিকটে প্রাথমিক শিক্ষা লাভ করেন। তাঁহার মাতাই তাঁহার চরিত্র গঠনের একমাত্র উপদেষ্টা ; এবং সুদীর্ঘ ৫০ বৎসর কাল কার্ণেজি মাতৃ-প্রতিভা-মণ্ডিত ছিলেন। তাঁহার সাধারণ-তন্ত্র-নীতিজ্ঞ খুল্লতাতের নিকট তিনি রাজনীতি এবং ইতিহাস শিক্ষা করেন—এবং এই শিক্ষাগুণে কার্ণেজি দশ বৎসর বয়ঃক্রম কালে সাধারণতন্ত্র-প্রণালীর অনুরক্ত হন।

বস্ত্র-বয়নের জন্য বৈজ্ঞানিক যন্ত্রের আবিষ্কার হইলে কার্ণেজির পিতা নিজ ক্ষতির সম্ভাবনা দেখিয়া সপরিবারে স্বদেশ পরিত্যাগপূর্ব্বক আমেরিকার পিট্‌সবর্গ নামক স্থানে আসিয়া বাস করিলেন। কার্ণেজির বয়স তখন এগার বৎসর। বার বৎসর বয়সে কার্ণেজিকে একটি তুলার কারখানায় 'কাটুমে' সুতা জড়াইবার জন্য নিযুক্ত হইতে হইল। এই কার্য্যের জন্য তিনি সপ্তাহে এক ডলার * এবং কুড়ি সেণ্ট (অর্থাৎ প্রায় ৩।৶০) মাত্র পাইতেন। ইহার পর কত লক্ষ লক্ষ ডলার তাঁহার হাত হইতে খরচ হইয়াছে—কিন্তু তিনি এখনও সেই সপ্তাহকালব্যাপী পরিশ্রমলব্ধ মুদ্রার বিষয় গল্প করিয়া থাকেন।

এক বৎসর পরে তাঁহাকে অন্য একটি কারখানায় বয়লারে আগুণ দিবার কার্য্যে নিযুক্ত করা হয়। এই কারখানায় তাঁহাকে দিনব্যাপী কঠিন পরিশ্রম করিতে হইত, কিন্তু আণ্ড্রু কখনও অসুখী ছিলেন না। তিনি সর্ব্বদাই উৎফুল্ল এবং ভবিষ্যৎ সুদিনের জন্য আশান্বিত। দারিদ্র্যের করালমূর্ত্তি তাঁহার

* এক ডলারের মূল্য প্রায় ৩, তিন টাকা।

নিকট কখনও ভয়াবহ ছিল না। তাঁহার জীবনের এই সময়ের কথা-প্রসঙ্গে তিনি বলেন,—"প্রকৃত সুখ শান্তি ও আদর্শ জীবন সাধারণতঃ ধনীর প্রাসাদ অপেক্ষা দীন দরিদ্রের কুটির হইতে পাওয়া যায়।" ইহা দারিদ্র্য-অনভিজ্ঞ বিলাসী দার্শনিক প্রবরের বাক্য নহে—প্রকৃত ভুক্তভোগীর কথা—যিনি ভীষণ দারিদ্র্য এবং মাহান্ ঐশ্বর্য্য উভয়ই ভোগ করিয়াছেন। বয়লারে এক বৎসর কাজ করিয়া তিনি ওহিও (Ohio) টেলিগ্রাফ অফিসের পিয়নের কার্য্যে নিযুক্ত হইলেন। অবসর সময়ে তিনি টেলিগ্রাফের কার্য্য শিক্ষা করিতে লাগিলেন এবং অনতিবিলম্বে পেন্সিল্‌ভ্যানিয়া (Pennsylvania) রেলপথের টেলিগ্রাফ মাষ্টারের পদ প্রাপ্ত হন।

এই সময়ে ব্যবসায়ে তিনি প্রথম হস্তক্ষেপ করেন; পৈতৃক বাড়ী বন্ধক দিয়া আডাম্‌স্ এক্সপ্রেস্ কোংর (Adams Express Co) দশখানি অংশ ক্রয় করেন।

শীঘ্রই তাঁহার কর্ম্মকুশলতা কর্ত্তৃপক্ষের গোচর হইল এবং উক্ত রেলওয়ের পিট্‌সবর্গ বিভাগের তিনি অধ্যক্ষ হইলেন। এই কার্য্য তিনি বিশেষ দক্ষতার সহিত সম্পাদন করেন এবং যখন আমেরিকায় যুদ্ধ উপস্থিত—তাঁহাকে ওয়াশিংটনে (Washington) আসিতে হইল এবং সৈন্য গমনাগমনের জন্য রেলপথের এবং গবর্ণমেণ্টের টেলিগ্রাফের ভার তাঁহার উপর প্রদত্ত হইল। যুদ্ধের প্রতি তাঁহার চিরপুষ্ট আন্তরিক ঘৃণা এই ভীষণ সংগ্রামের সময়ে প্রকট হইল। ওয়াশিংটন্ হইতে ফিরিয়া আসিলে 'নিদ্রা যাইবার গাড়ী'র আবিষ্কারকর্ত্তা মিঃ উড্রুফের সহিত তাঁহার আলাপ হয়। মিঃ উড্রুফ তাঁহাকে এই কার্য্যে সহায়তা করিতে বলেন। কার্ণেজি তৎক্ষণাৎ এই প্রস্তাবে স্বীকৃত হইলেন এবং কিছু টাকা কর্জ্জ লইয়া উড্রুফ স্লিপিং কার কোংর (Woodruff Sleeping Car Co) একজন অংশীদার হইলেন। এই ব্যবসায়ের অংশে তিনি পূর্ব্ব ক্রীত অংশগুলি অপেক্ষা অধিক লাভবান্ হইয়াছিলেন।

১৮৬১ খৃঃ অঃ পেন্সিলভ্যানিয়ায় তৈলের খনি আবিষ্কৃত হওয়ায় কার্ণেজি তাঁহার সঞ্চিত মুদ্রা চল্লিশ সহস্র ডলার অর্থাৎ প্রায় ১ লক্ষ ২০ হাজার টাকা ব্যয় করিয়া একটি তৈলের খনি ক্রয় করিলেন। এই সময় হইতে তাঁহার সৌভাগ্যরবি উদয় হইল।

কার্ণেজি আয়রণ ফোর্জ কোং (Iron Forge Co) এবং কিষ্টোন্ ব্রিজ কোংর (Keystone Bridge Co) সহিত মিলিত হইলেন এবং বিসমারের

(Bessmer) ইস্পাত প্রস্তুত করিবার প্রণালী দেখিবার জন্য বিলাতে গমন করিলেন এবং আমেরিকায় প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া ইস্পাতের রেল প্রভৃতি প্রস্তুত করিবার জন্য ইউনিয়ন মিল (Union Mills) স্থাপন করেন। তৎপরে কার্ণেজি এডগার টম্‌সন্ ষ্টিল্ ওয়ার্কস্ (Edgar Thomson Steel Works) স্থাপন করিলেন। ১৮৮৩ খৃঃ অঃ কার্ণেজি হোম্‌ষ্টেড্ ষ্টিল্ ওয়ার্কস্ (Homestead Steel Works) কিনিয়া লইলেন এবং তাঁহার অন্যান্য কারখানা ইহার সহিত একত্র করিয়া নাম হইল কার্ণেজি ষ্টিল্ কোং (Carnegie Steel Co. Ld.)। ইহার মূলধন ২৫০০০০০০ ডলার। ১৮৯২ খৃঃ অঃ কার্ণেজি একটি কোক কোম্পানি খরিদ করিলেন। ১৯০০ সালে তাঁহার ব্যবসার মূলধন ১৪০০০০০০০ ডলার। বাষট্টি বৎসর বয়সে তিনি কর্ম্ম-জগত হইতে অবসর গ্রহণ করিলেন। এই সময় তাঁহার আয় প্রায় ২৫০০০০০০০০ ডলার।

কর্ম্মচারিবৃন্দ যাহাতে তাহাদের নির্দ্দিষ্ট কার্য্য নিজের ভাবিয়া করিতে পারে তিনি তাহার ব্যবস্থা করিতেন। তাঁহার সফলতার আর একটি কারণ, তিনি সমব্যবসায়ে লিপ্ত কোন কর্ম্মকুশল উদ্যমশীল ব্যক্তিকে সাদরে আহ্বান করিয়া নিজ ব্যবসায়ের অংশীদার করিতেন। ইহাতে সেই ব্যক্তিরও উন্নতি হইত এবং কার্ণেজিরও বিশেষ সাহায্য হইত।

কার্ণেজিও কখন পরিশ্রমকাতর ছিলেন না। অসুস্থতা-নিবন্ধন তিনি অবসর লন নাই। পরোপকারার্থ নিজ জীবন এবং তাঁহার অতুল ধনরাশি বিতরণ করিবেন বলিয়া তিনি অবসর লইয়াছিলেন।

তাঁহার মতে ধন-উপার্জ্জন অপেক্ষা ব্যয় করা অধিক কষ্টকর। তাঁহার প্রিয় প্রবচন "বিপুল সম্পত্তি রাখিয়া মৃত্যু ধীকারজনক।" কার্ণেজি আধুনিক দানপ্রথার অনুবর্ত্তী নহেন।

নর্থ আমেরিকান্ রিভিউ (North American Review) নামক পত্রিকাতে কার্ণেজি লিখিয়াছিলেন "বিশ্ববিদ্যালয়, সাধারণ পাঠাগার, হাঁসপাতাল, লেবরেটরি প্রভৃতি স্থাপন বা প্রসারণ করাই দেশহিতৈষণার প্রকৃত পন্থা।"

সাধারণ পাঠাগারে দানের জন্যই কার্ণেজি দেশ বিখ্যাত। বাল্যকালে তিনি পিটস্‌বর্গে একটি ক্ষুদ্র পাঠাগারে পুস্তক পাঠ করিতেন। সেই সময় হইতেই এই স্পৃহা তাঁহার হৃদয়ে বলবতী হইয়াছিল। সেই পাঠাগারে ৪০০ পুস্তক ছিল, সপ্তাহে একদিন মাত্র খোলা হইত এবং অনেক নরনারী সেই পুস্তক

পাঠের নিমিত্ত ব্যগ্র এবং ব্যস্ত হইয়া পড়িতেন। ভবিষ্যতে অর্থবান্ হইলে পাঠাগার ও পুস্তকের অভাব পূরণ করিবেন বলিয়া তিনি প্রতিজ্ঞা করেন। তিনি দরিদ্র ছিলেন বলিয়াই এরূপ অনুভব করিয়াছিলেন এবং তাহার নিরাকরণের জন্য তাঁহার প্রাণ ব্যাকুল হইয়াছিল। ক্রোরপতি হইয়া এখনও তিনি বলেন "সাধারণ পাঠাগার সাধারণের জন্য জগতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ দান—কিন্তু এই কার্য্যে সকলের উৎসাহ চাই এবং প্রদত্ত অর্থ সুপ্রযুক্ত হইয়া যেন লোকশিক্ষার জন্য ব্যবহৃত হয়।" কার্ণেজি লিখিয়াছেন "সাধারণ পাঠাগার দেশের সর্ব্বসাধারণের উন্নতিসাধন করে বলিয়াই এই কার্য্যে আমার এত অনুরাগ। চেষ্টান্বিত ব্যক্তি মাত্রেই ইহা হইতে লাভবান্ হন্ অর্থাৎ অনেক উচ্চ আশা, ভাব এবং সৎপ্রবৃত্তি —যাহা জগতের শ্রেষ্ঠ রত্ন, তাহা গ্রন্থমধ্যে নিবদ্ধ থাকে—লাভ করেন। আমার ধারণা উত্তম গল্প পুস্তকও দরিদ্রের একঘেয়ে জীবনে নূতন প্রাণ আনয়ন করে। পাঠস্পৃহা অন্যান্য জঘন্য প্রবৃত্তি দূর করে। এই সকল এবং অন্যান্য কারণে সাধারণের উন্নতিবিধায়ক বলিয়া পাঠাগারের প্রতি আমার এত আসক্তি।"

১৮৯১ খৃঃ অঃ পিটারহেড্ লাইব্রেরীর প্রথম অধিবেশনে তিনি এই বিষয়ে তাঁহার মত ব্যক্ত করেন। বক্তৃতার সময় তিনি বলেন "প্রত্যেক পল্লীগ্রামে একটি পাঠাগার হওয়া বিশেষ আবশ্যক—ইহাতে গ্রামস্থ ব্যক্তিবর্গের অশেষ উপকার হয়। বিশেষতঃ গ্রামের অল্প বয়ঃপ্রাপ্ত বালকবালিকারা এই পাঠাগার হইতে প্রভূত জ্ঞানার্জ্জন করিতে পারে। একটি পাঠাগার নির্ম্মাণ করিবার খরচ অনেক, কিন্তু বৎসরে পঁচিশ পাউণ্ড খরচ করিয়া একটি ক্ষুদ্র পাঠাগার স্থাপিত হইতে পারে। এইরূপে যদি একটি জেলায় তিনটি পাঠাগার স্থাপিত হয় এবং পরস্পরে পুস্তক-বিনিময় করেন—তাহা হইলে সেই জেলার একটি প্রধান অভাব পূর্ণ হইতে পারে এবং তত্রস্থ ব্যক্তিমাত্রেরই হৃদয়ে জ্ঞানার্জ্জনের স্পৃহা বলবতী হয়। যদি একটি জেলার তিনটি স্কুল এইরূপ প্রতিজ্ঞায় আবদ্ধ হয়েন, তাহা হইলে ইউরোপের Triple alliance অপেক্ষা ইহা দেশের এবং দশের প্রভূত উপকার সাধন করিতে পারে। স্কুলের শিক্ষকেরা বলিয়া থাকেন "বালক বালিকারা পুস্তকগুলিকে গিলিয়া ফেলিবার চেষ্টা করে।" ইহা সত্য—একটুও অতিরঞ্জিত নহে। বালকবালিকাদের পুস্তক পাঠ করিবার আগ্রহ এত বেশী যে তাহারা পুস্তক পাইলে আর তাহা ছাড়িতে চাহে না। দেশের এই সকল অভাব ধনী ব্যক্তিরা অনায়াসে মিটাইতে পারেন। অগাধ ধন সম্পত্তির লভ্যাংশ হইতে কিছু দান করিলে তাঁহাদের কোনই ক্ষতি হয় না কিন্তু সাধারণের যথেষ্ট

উপকার হইয়া থাকে। আমার মতে ধনী ব্যক্তি মাত্রেরই এই বিষয়ে দৃষ্টিপাত করা উচিত। যিনি আপনার ধনরাশি পরোপকারার্থ বিতরণ করেন এবং আত্মজীবন পর্য্যন্তও উৎসর্গ করেন তিনিই প্রকৃত দেশহিতৈষী ব্যক্তি। দেশ-হিতৈষী ব্যক্তিরা দান ত করিবেনই বরং সকলের সহিত অনুপ্রাণিত হইয়া দেশের কার্য্যে নিযুক্ত থাকিবেন।" উপরি-লিখিত প্রত্যেক কথাই সারগর্ভ এবং এ বিষয় লইয়া অনেকেরই চিন্তা করা আবশ্যক।

পরোপকারার্থ কার্ণেজি নিম্নলিখিত ফণ্ডগুলি স্থাপন করিয়াছেন :—

Carnegie Institution of Washington :—

ইহা ১৯০২ খৃঃ অঃ স্থাপিত হয় এবং ইহাতে ২২০০০০০০ ডলার ব্যয়িত হইয়াছে। বিস্তৃত গবেষণার বহুল প্রচারের জন্য এবং মানব হিতার্থ জ্ঞানের প্রসার করিবার জন্য এই টাকা ন্যস্ত হইয়াছে।

Carnegie Foundation for the advancement of Teaching :—

ইহা ১৯০৫ খৃঃ অঃ স্থাপিত হয় এবং ইহার জন্য ১৫০০০১০০ ডলার প্রদত্ত হইয়াছে। অবসরপ্রাপ্ত কর্ম্মচারী, শিক্ষক এবং আমেরিকাবাসী ও কর্ম্মচারিগণের বিধবাদের সাহায্যার্থ এই অনুষ্ঠান।

Carnegie Hero Fund :—(৫০০০০০০ ডলার)

অপরকে আসন্ন মৃত্যু হইতে যে বীর আপন জীবন বিপন্ন করিয়া রক্ষা করে তাঁহাদের পুরস্কারের জন্য—যাঁহারা এই সকল ব্যাপারে সাহায্য করিতে আঘাতপ্রাপ্ত হন তাঁহাদের শুশ্রূষা করিবার জন্য এবং এই সকল হতাহত বীরের পোষ্যবর্গের সাহায্যার্থ এই ফণ্ডের সৃষ্টি।

Carnegie Hero Fund (Great Britain)

—(১৯০৩)—১২৫০০০০ ডলার

" " " (France)—(১৯০৯)—১০,০০০০০ "

" " " (Germany)—(১৯১০)—১২৫০০০০০ "

Carnegie Peace Fund—(শান্তির জন্য) ১৯১০ খৃঃ অঃ স্থাপিত। ইউরোপের রাজন্যবর্গের মধ্যে শান্তি সংস্থাপনার্থ ১০০০০০০০ ডলার ব্যয়িত হইয়াছে।

Carnegie Corporation—(১৯১১)—২৫০০০০০০ ডলার আমেরিকার অধিবাসীবর্গের সুবিধার জন্য স্কুল, লেবরেটারী ইত্যাদি স্থাপনার্থ উপরি-লিখিত মুদ্রা প্রদত্ত আছে।

Carnegie Library Corporation (United Kingdom) 1913—১০০০০০০০ ডলার। লাইব্রেরীর জন্য এবং গির্জ্জার বাজনার জন্য উক্ত মুদ্রা দেওয়া হয়।

এইরূপ দান কার্য্যের সর্ব্বশুদ্ধ ব্যয় ১০১৭৫০০০০ ডলার কিম্বা ৩০৫২৫০০০০৲ টাকা।

আমাদের দেশে কার্ণেজির প্রবচন প্রচলিত হওয়া আবশ্যক। ভারতবর্ষের অনেক ধনী ব্যক্তি মনে করেন "অপুত্রক অবস্থায় মৃত্যুর অপেক্ষা নিন্দনীয় বিষয় আর কিছুই নাই।" তাঁহাদের সর্ব্বদাই আশঙ্কা পাছে পিতৃপুরুষের পিণ্ডলোপ হয় এবং তাহাদের প্রভূত সম্পদ পুত্র ব্যতীত অন্যের করতলগত হয়। কার্ণেজির মত বা উপদেশ প্রথমে সেই শ্রেণী ব্যক্তির বর্ত্তমানে কোনও উপকারে না আসিলেও ভবিষ্যতে তাঁহাদের বংশধরেরা ইহাতে গৌরবান্বিত হইয়া থাকে এবং ইহাই আদর্শ জ্ঞান করিয়া তাঁহারাও দেশের কার্য্যে জীবন উৎসর্গ করিতে পারে।

শ্রীকালীপদ মুখোপাধ্যায়।

নিধু বাবু।

নিধু গুপ্তের নাম বাঙ্গালা দেশের কে না জানে? 'নিধুর-টপ্পা' কে না শুনিয়াছে? অথচ এত জানিয়া-শুনিয়াও আমরা বড় একটা কেহ তাঁহার নাম করি না। শুনিতে পাই, শিক্ষিতেরা বলেন,—নিধু অশ্লীল—vulgar। হবেও বা! বলিতে পারি না! কিন্তু আমরাও দেখিতে পাই যে, এই vulgar কবির প্রভাব এমন কি শিক্ষিত সম্প্রদায়ের কবি রবীন্দ্রনাথ, অক্ষয়কুমার প্রভৃতিও এড়াইতে পারেন নাই। গিরিশ ও রবীন্দ্রের গানে, অক্ষয়কুমারের কবিতায় এমন লাইন অনেক আছে, যাহা নিধু গুপ্তের।

নিধুর প্রণয়-সঙ্গীতের তুল্য প্রণয়-সঙ্গীতত আজ পর্য্যন্ত শুনিতে পাইলাম না। গিরিশচন্দ্রই হউন, আর রবীন্দ্রনাথই হউন, প্রেমের গান-রচনায় বঙ্গদেশে নিধু গুপ্তেরত প্রতিদ্বন্দ্বী দেখিতে পাই না। কথাটা হয়ত বাবুদের নিকট অত্যুক্তি ঠেকিবে। কিন্তু আমরা পূর্ব্বাপর আলোচনা করিয়া যাহা বুঝিয়াছি, তাহাই বলিতেছি। ভাবের এমন প্রগাঢ়তা এখনকার প্রণয়-সঙ্গীতে বড়

একটা দেখিতে পাই না। যাঁহারা আমাদের কথা শুনিয়া মুখ মুচ্‌কি উপেক্ষার হাসি হাসিতেছেন, তাঁহারা যদি একটু মনোযোগের সহিত নিধুর টপ্পার আলোচনা করেন, তাহ'লে, তাঁহাদিগের মুখ হইতেও ঐ 'অত্যুক্তি' বাহির হইবে। তাঁহারাও বলিবেন, নিধুর এক-একটি গান যেন এক একটা পাঁজরভাঙ্গা দীর্ঘ নিশ্বাস!—সে গানের তুলনা নাই।

এমন অদ্বিতীয় গীত-রচয়িতার জীবন-কথা আমাদের দেশে আলোচিত হয় না। তাঁহার গান বহু বৈঠকে গীত হয় বটে, কিন্তু কখনও কোনও সাহিত্যিককে সে গানের বিস্তৃত বিশ্লেষণ করিতে দেখি নাই। প্রায় ২৬২১ বৎসর পূর্ব্বে কবিবর অক্ষয়কুমার বড়াল মহাশয় 'কল্পনা' নাম্নী মাসিক পত্রিকায় একবার অতি সংক্ষেপে নিধুবাবুর জীবন-সম্বন্ধে দুই চারিটী কথা বলিয়াছিলেন। তারপর, বিশেষ কিছু কাহাকেও বলিতে শুনি নাই। তাই ৬০ বৎসর পূর্ব্বে ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত মহোদয় রামনিধির (নিধুবাবুর) জীবন-কথা যাহা বিবৃত করিয়াছিলেন, আজ আমরা তাহা 'অর্চ্চনা'র পাঠকবর্গকে উপহার দিলাম। কবির লিখিত কবির জীবনী সকলের পাঠ করিয়া রাখা উচিত। পরে আমরা নিধুবাবুর সঙ্গীতের সৌন্দর্য্য বিশ্লেষণ করিবার চেষ্টা পাইব।

রামনিধি গুপ্তের জীবন চরিত। *

"বৈদ্যকুলোদ্ভব ৺বাবু রামনিধি গুপ্ত মহাশয়, যিনি নিধুবাবু নামে বিখ্যাত ছিলেন। তিনি বাঙ্গালা ১১৪৮ অব্দে ত্রিবেণীর নিকটস্থ চাঁপ্তা নামক গ্রামে স্বীয় জনকের মাতুল ৺রামজয় কবিরাজের গৃহে জন্মগ্রহণ করেন। ইতিপূর্ব্বে বর্গির হেঙ্গামা ও নবাবী দৌরাত্ম্যপ্রযুক্ত রামনিধি বাবুর পিতা ৺হরিনারায়ণ কবিরাজ এবং পিতৃব্য ৺লক্ষ্মীনারায়ণ কবিরাজ এই দুই সহোদর কলিকাতার কুমারটুলির বাটী পরিত্যাগ পূর্ব্বক উক্ত "চাঁপ্তা" গ্রামে পলায়ন করেন, তাঁহারা কিছুকাল তথায় অবস্থান করত বাঙ্গালা ১১৫৪ সালে কলিকাতায় পুনরাগমন পূর্ব্বক কুমারটুলির ভবনে পুনরায় অবস্থিতি করিলেন, এই স্থলেই রামনিধি বাবু বিদ্যাভ্যাসে নিযুক্ত হইয়া কৃতবিদ্য হইলেন, এবং তাঁহার দৈবশক্তির বিলক্ষ সুলক্ষণ সাধারণ সমাজে দৃষ্ট হইতে লাগিল,—অনেকের নিকটেই তিনি সমাদৃত

* বর্ণাশুদ্ধি প্রভৃতি প্রবন্ধে যেমন পাইয়াছি, অবিকল তাহা উদ্ধৃত করিয়াছি। উদ্ধৃতাংশে 'কেরামতি' করায় আমরা বিশেষ পরিপন্থি।—লেখক।

ও প্রেমাস্পদ হইলেন। নিধুবাবুর দুই কনিষ্ঠা সহোদরা ছিলেন, তাঁহার পিতা প্রথমা কন্যাকে পাতুরিয়াঘাটা নিবাসি ৺শিবচন্দ্র কবিরাজ এবং দ্বিতীয়া কন্যাকে কাঁচরাপাড়া নিবাসি ৺দাতারাম কবিরাজকে সম্প্রদান করত লোকান্তর গমন করেন। রামনিধি বাবু ১১৬৮ সালে "সুখচর" নামক গ্রামে প্রথম বিবাহ করেন। ১১৭৫ বর্ষে সেই প্রথমা স্ত্রীর গর্ভে এক সন্তান প্রসূত হয়, নব কুমারের মুখাবলোকনপূর্ব্বক বাবু বিস্তর উৎসাহ প্রকাশ করেন।

অনন্তর যে সময়ে এই বঙ্গদেশে ইংরাজদিগের স্থির প্রভূত্ব হয় এবং যখন সাহেবেরা এই রাজের ভিন্ন ভিন্ন অংশের রাজা ও ভূম্যধিকারিদিগের সময়ে নিধুবাবু নিজ পল্লীস্থ ৺দেওয়ান রামতনু পালিত মহাশয়ের সহিত চিরণছাপরায় কর্ম্ম করিতে গমন করিলেন, তৎকালে জনাঞি গ্রাম-বাসি সুবিখ্যাত ৺জগন্মোহন মুখোপাধ্যায় মহাশয় ছাপরার কালেক্টর এবং মোণ্টগুমরি সাহেবের কেরাণির পদে অভিষিক্ত ছিলেন। রামতনু পালিত তথায় কিছুদিন দেওয়ানী কর্ম্ম করত বায়ুরোগে আক্রান্ত হইয়া একেকালেই অকর্ম্মণ্য হইলেন, তখন পালিতবাবুর সহিত রামনিধিবাবু ব্যতায় দ্বিতীয় ব্যক্তি এমত আর কেহই ছিলেন না, যিনি ঐ দেওয়ানী পদের যথার্থ উপযুক্ত পাত্র হয়েন। এই উপস্থিত ঘটনায় জগন্মোহন মুখোপাধ্যায় উক্ত দেওয়ানী কর্ম্মের নিমিত্ত অত্যন্ত লোলুপ হইলেন, কিন্তু মনে মনে এমত বিবেচনা করিলেন যে নিধুবাবু এখানে বর্ত্তমান থাকাতে এ কর্ম্মটী তিনি কোন মতেই প্রাপ্ত হইতে পারেন না, একারণ শঠতা ও ছলনা পূর্ব্বক এক দিবস বাবুকে কহিলেন "আপনি কি ব্রহ্মহত্যা করিতে এখানে আসিয়াছেন?" ইহাতে বাবু বিস্ময়াপন্ন হইয়া উত্তর করিলেন "সে কি মহাশয়! আমি ব্রহ্মহত্যা করিতে আসিয়াছি, এ কেমন কথা হইল? আমি গো, ব্রাহ্মণের সেবক ও রক্ষক, অতএব আপনি বিজ্ঞ হইয়া আমার প্রতি এমত অন্যায় উক্তি কেন করেন?" তচ্ছ্রবণে মুখোপাধ্যায় কহিলেন "দেওয়ানী কর্ম্ম সাহেব আমাকে দিতে চাহেন, কিন্তু তোমার বিদ্যা, বুদ্ধি ও কর্ম্মদক্ষতা দেখিলে এ কর্ম্ম তোমাকেই দিবেন, আমাকে কখনই দিবেন না।" ব্রাহ্মণের প্রতি গুপ্ত বাবুর স্বভাবতঃ অত্যন্ত ভক্তি ও শ্রদ্ধা ছিল, এজন্য কোনরূপ আপত্তি না করিয়া ঐ পদে মুখোপাধ্যায় মহাশয়কে অভিষিক্ত করণার্থ বিবিধ প্রকার যত্ন ও পোষকতাই করিলেন, এবং তিনি পদস্থ হইয়া যাহাতে কৃতকার্য্য হয়েন তদ্বিষয়ে সদুপদেশ ও সৎপরামর্শ দিয়া বিশেষ সহায়তা করত তাঁহার কেরাণি-গিরি কর্ম্মে স্বয়ং নিযুক্ত হইয়া কিছুকাল তৎকর্ম্ম নির্ব্বাহ করিলেন।

ছাপরার কালেক্টরী কেরাণির কর্ম্মগ্রহণ করিয়া নিধুবাবু তৎকালে তথায় সঙ্গীত বিদ্যায় সুপণ্ডিত অনেক যবন গায়ককে বেতন দিয়া নিযুক্ত করত স্বাবকাশ সময়ে তাহার নিকট সঙ্গীত-শাস্ত্র শিক্ষা করিতে লাগিলেন। গীতবিদ্যা-তৎপর যবনেরা প্রায় অত্যন্ত ক্রুর, সহজে কাহাকেই যথার্থরূপ উপদেশ প্রদান করে না। যখন ঐ বিদ্যায় বাবুর কিঞ্চিৎ সংস্কার জন্মিল তখন শিক্ষা দান বিষয়ে শিক্ষকের কার্পণ্য জানিতে পারিয়া মিয়া সাহেবকে সেলাম করিয়া কহিলেন "আমি তোমারদিগের জাতীয় যাবনিক গীত আর গান করিব না, আপনিই বঙ্গভাষায় হিন্দি গীতের অনুবাদ পূর্ব্বক রাগ রাগিণী সংযুক্ত করিয়া গান করিব।" ফলে তাহার অব্যবহিত পরে তাহাই করিলেন, অর্থাৎ উক্ত মুসলমান গায়ককে বিদায় দিয়া আপনিই রাগ রাগিণী, তাল মান, অনুসারে বাঙ্গালা গীত রচনা করণে প্রবৃত্ত হইলেন।

ইহার কিছুদিন পরেই নিধুবাবু ছাপরা জিলার মধ্যস্থিত "রতনপুরা" নামক গ্রামে গিয়া "ভিখ্নরাম" স্বামিজীউর নিকট মন্ত্রগ্রহণ করিলেন, ঐ মহাশয় অত্যন্ত জ্ঞানী ও সাধু ছিলেন, "জ্ঞানানন্দ" গোস্বামীর ন্যায় উক্ত মহাপুরুষের অনেক অলৌকিক ক্রিয়া মানব মণ্ডলে ব্যক্ত আছে। "জ্ঞানানন্দ" বামাচারী ছিলেন, "ভিখন্‌রাম" দক্ষিণাচারী, তাঁহাকে সকলেই সিদ্ধপুরুষ কহিত। তিনি নিধুবাবুকে শান্ত, শ্রদ্ধাবান, বিনয়ী, ভক্ত, সচ্চরিত্র ও দয়ালু দৃষ্টে এই বর প্রদান করিলেন, যে "তুমি সুখী ও খ্যাতাপন্ন হও" কিয়দ্দিন পরেই ঐ মহাপুরুষের এই মহা আশীর্ব্বাদ সত্য ও সফল হইল। হিন্দুস্থানে "সরিমিয়া" নামক ব্যক্তি যেমন অতিশয় বিখ্যাত সুকবি ও সুগায়ক ছিলেন, ইনি অত্যল্প দিবসের মধ্যেই বঙ্গদেশে অবিকল তদনুরূপ হইলেন।

এক দিবস জগন্মোহন মুখোপাধ্যায় মহাশয় আপনার আমলাদিগের প্রতি এতদ্রূপ আদেশ করিলেন যে "তোমরা চাকরী করিতে আসিয়াছ, অতএব উপার্জ্জনের পথ দৃষ্টি কর, এ সময়ে যে জমীদার তোমার দিগ্যে যাহা দিবে তাহাই লইয়া আপনাপন বাটীতে প্রেরণ কর। ইহাতে যদি তোমারদিগের উপর কোনরূপ আপদ বিপদ উপস্থিত হয় তবে আমি তাহা হইতে রক্ষা করিব। ভয় কি, নির্ভয়ে উপার্জ্জন কর ইত্যাদি" এবম্ভূত অপরিমিত অনুমতি শুনিয়া রামনিধি বাবু তৎক্ষণাৎ তৎকর্ম্ম পরিত্যাগ করিলেন। * ইহাতে দেওয়ানজী অত্যন্ত

* এই স্থলে এমত এক কিম্বদন্তী আছে, যে নিধুবাবু হিসাবের পুস্তকে স্বরচিত গান লিখিয়াছিলেন, সাহেব তদ্দৃষ্টে বিরক্ত হওয়াতে তিনিও রোষ-পরবশ হইয়া কর্ম্মত্যাগ করিলেন।

ক্রুদ্ধ হইয়া কহিলেন "বাবুজী আপনি যদি নিতান্তই কর্ম্ম না করেন, তবে আপনার প্রাপ্য ১০,০০০ দশ সহস্র মুদ্রা গ্রহণ করত গৃহে গমন করুন" বাবু তাহাতেই সম্মত হইয়া তখনি তদনুরূপ কার্য্য করিলেন। পরন্তু তাঁহার ছাপরা হইতে কলিকাতা আগমন কালে দেওয়ানজী এই অনুরোধ করিলেন, যে, "আপনি উত্তম কবি, অতি সুগায়ক, এবং রসসাগর বিশেষ, অতএব অনুগ্রহ পূর্ব্বক যদি প্রতি বৎসর ৺সরস্বতী পূজার দিবসে মৎপ্রণীত বাগ্‌দেবীর বন্দনাটী গান করেন তবে আমি অপরিমিত প্রীতি প্রাপ্ত হই"। গুপ্ত মহোদয় তদ্বাক্যে অঙ্গীকৃত হইয়া তদবধি প্রতি-বর্ষেই শ্রীপঞ্চমীর দিবসে সরস্বতীর নিকট অঞ্জলি দিয়া দেওয়ানের কৃত এই গান করিতেন। যথা—"জয় জয় বাগ্‌বাণী" ইত্যাদি। এই গীতের সম্পূর্ণাংশ আমরা প্রাপ্ত হই নাই।

নিধুবাবু সহজেই সন্তোষচিত্ত ছিলেন, প্রায় কেহই তাঁহাকে বিষণ্ণ বা বিমর্ষ অথবা উৎকণ্ঠিত দেখিতে পান নাই, সর্ব্বদাই হাস্য পূর্ব্বক আমোদ প্রমোদে কালক্ষয় করিতেন। এমত কালে তাঁহার প্রথম পক্ষের পুত্রটী কৃতান্ত কুটীরে নীত হইল, এবং ইহার কিছুদিন পরে তাঁহার সেই স্ত্রীও কালের গ্রাসে পতিতা হইলেন। এই স্ত্রী ও পুত্র বিয়োগে তিনি অত্যন্ত শোকাকুল হইয়াছিলেন, ইহাতে বিপুল বিলাপবিশিষ্ট হইয়া অন্তঃকরণের আক্ষেপ নিবারণার্থ এই গীত রচনা করিয়াছিলেন,—

"মনোপুর হোতে আমার হারায়েছে মন।
কাহারে কহিব, কার দোষ দিব, নিলে কোন জন।
না বোলে কেমনে রব, বোল্লে বল কি করিব,
তোমা বিনে আর, সেখানে কাহার, গমনাগমন।
অন্যের অগমনীয়, জান সে স্থান নিশ্চয়
ইথে অনুমান, এই হয় প্রাণ, তুমি সে কারণ।
যদি তাহে থাকে ফল, লোয়েছ কোরেছ ভাল,
নাহি চাহি আমি, যদি প্রাণ তুমি, করহ যতন।" *

তদনন্তর ১১৯৭ সালে যোড়াসাঁকো পল্লীতে দ্বিতীয়বার বিবাহ করিলেন, সে সংসারো অতি শীঘ্রই গত হইল, ইহাতে পুনঃ পুনঃ বিবাহ করণে নিতান্তই অনিচ্ছুক হইয়াছিলেন, কিন্তু কি করেন, দৈব নির্ব্বন্ধ, খণ্ডন হইবার নহে। নানা প্রকার অনুরোধ বশতঃ ১২০১ কিম্বা ২ হায়নে "রবিজহাটি, চণ্ডীতলা"

---

* রাগিণী কেদারা—তাল, জলদ তেতালা।

গ্রামের হরিনারায়ণ সেন মহাশয়ের তৃতীয় কন্যাকে তৃতীয় পক্ষে উদ্বাহ করিলেন, এই সংসারে তাঁহার তিনটী পুত্র ও কয়েকটী কন্যা জন্মে, তন্মধ্যে প্রথম পুত্র লোকান্তরিত হইয়াছেন, দ্বিতীয় পুত্র বাবু জয়চন্দ্র গুপ্ত এবং তৃতীয় পুত্র বাবু সুখময় গুপ্ত, অধুনা নিধুবাবুর এই দুই বংশধর, বংশরক্ষা করিতেছেন। ইহাঁদিগের উভয়ের অনেকগুলীন পুত্রকন্যা জন্মিয়াছে।

গুরুচরণ কবিরাজ ও গুরুদাস কবিরাজ, নিধুবাবুর এই দুইজন ভাগিনেয় অতিশয় কৃতবিদ্য হইয়াছিলেন, বাবু তাহারদিগ্যে প্রাণাধিক জ্ঞানে যথোচিত স্নেহ করিতেন, ইহাঁরা উভয়েই তাঁহার সংসারে প্রতিপালিত হইয়া যৌবনাবস্থায় মায়িক দেহ পরিহার করাতে তিনি অত্যন্ত কাতর হইলেন এবং তদবধি সাংসারিক সুখ সম্বন্ধে এককালেই আসক্তি-হীন হইলেন, কি ঐশ্বর্য্য, কি পরিজন, কাহারো প্রতি আর কিঞ্চিন্মাত্র যত্ন করিতেন না, গৃহে থাকিয়া উদাসীনের ন্যায়-ব্যবহার করিতে লাগিলেন।

ইনি উপকার ধর্ম্মকেই পরম ধর্ম্ম জ্ঞান করিয়া সাধ্যানুসারে পরোপকারে ক্রুটী করিতেন না, দায়গ্রস্ত ব্যক্তি নিকটস্থ হইলেই যথাসম্ভব দান দ্বারা তাহাকে তুষ্ট করিতেন। আপনি সম্পূর্ণরূপে সাহার্য্য করণে অক্ষম হইলে অন্যকে অনুরোধ করিতেন। এইরূপ স্বতঃ পরতঃ যে প্রকারে হউক লোকের উপকার করিতে পারিলেই সুখী হইতেন, একারণ তাঁহার প্রশংসাপুষ্পের সুবাস সর্ব্বত্রই বিস্তৃত হইয়াছিল।

শোভাবাজারস্থ বটতলা নিবাসী ৺বাবু রামচন্দ্র মিত্র, যিনি এমিরিকান কাপ্তেনের মুচ্ছুদ্দি ছিলেন এবং যাঁহার পুত্র সুবিখ্যাত বাবু জয়চন্দ্র মিত্র, অদ্যাপি বিরাজ করিতেছেন, তাঁহার বাটীর উত্তরাংশে বড় একখানা প্রসিদ্ধ আটচালা ছিল, নিধুবাবু প্রতি দিবস রজনীতে তথায় গিয়া সঙ্গীত বিষয়ের আমোদ করিতেন। ঐ স্থলে এই নগরস্থ প্রায় সমস্ত সৌখিন্ ধনি ও গুণি লোকেরা উপস্থিত হইয়া বাবুর সুধাময় কণ্ঠ বিনির্গত সুমধুর সঙ্গীত স্বরে মুগ্ধ হইতেন।

বাবু নারায়ণ মিশ্র মহাশয় পক্ষির দল করিয়া উক্ত প্রসিদ্ধ আটচালায় সর্ব্বদাই উল্লাস করিতেন। পক্ষির দলের পক্ষি সকলেই ভদ্র সন্তান, ও বাবু এবং সৌখিন্ নামধারি সুখি ছিলেন। পাখির দলেরা নিধুবাবুকে কর্ত্তা বলিয়া অত্যন্ত মান্য করিত। পক্ষিগণ গাঞ্জার গুণানুসারে নাম পাইতেন। তাবতেই বাসা বাঁধিতেন, কুটা বহিতেন, ডিম পাড়িতেন, আধার খাইতেন ও বুলি ঝাড়িতেন।

যথা পক্ষির বুলি—

"ভিঁ ঝিঁণ, কিটি কিটি, কিস্ কিসিন্"।
"চুকু মুকু চুকু, চুক্ চুকুণ্"।
"কিচি মিঁচি কিচি, কিচিন্ কিন্"।
"কুকু রামসালিকে, কুঁ, কু, গঙ্গা বিসং"।
"ছোট বিলের পাখি মোরা বড় বিলের কে।
উড়িতে না পেরে পাখি, পোষ মেনেছে"।
"কুকু, গাংসালিকে, কু, গঙ্গা বিসং"। ইত্যাদি

এই সমস্ত দ্বিপদ পক্ষির আকাশ-ভেদি বুলি সকল দ্বিপদ পক্ষিরাই বুঝিতে পারিতেন, অন্যের বুঝিবার সাধ্য কি? এমত জনরব যে এক ব্যক্তি পক্ষিদলে ভুক্ত হওনের অভিপ্রায়ে আসিয়া একাসনে বসিয়া একেবারে উপরি উপরি ১০০ এক শত ছিলিম্ গাঁজা খাইলেন, কিন্তু এই মাত্র অপরাধ ও বীরত্বের হানি হইল যে শেষ ছিলিম্‌টী টানিবার সময়ে একবার একটুখানি খুক্ খুক্ করিয়া কাসিয়াছিল, এই লঘু দোষে পক্ষিরাজ তাঁহার গুরুদণ্ড করিলেন, অর্থাৎ তাঁহার নাম "ছাতারে পাখী" রাখিলেন। ইহাতে সে ব্যক্তি অত্যন্ত দুঃখিত হইয়া রোদন-বদনে বিস্তর বিনয় করিয়া কহিল "ধর্ম্মাবতার! এই যৎকিঞ্চিৎ ক্ষুদ্র দোষেই কি আমাকে এত অপমান করা কর্ত্তব্য হয়?" এতদ্বাক্যে খগেশ্বর কিঞ্চিৎ প্রসন্ন হইয়া উত্তর করিলেন "ওরে মূর্খ! জানিস্ তো, এখন আমি আর কি করিতে পারি? হাকিম্ ফেরেতো হুকুম ফেরে না। ভাল তোর স্তবে আমি তুষ্ট হইলাম, কিন্তু 'ছাতারে' নাম একেবারে রহিত করিতে পারিব না, অতএব তোর নাম 'স্বর্ণ ছাতারে' রাখিলাম।"

পাখিরদলের আর আর বিস্তর রহস্যজনক ইতিহাস আছে, তাহা এস্থলে উল্লেখ করণের প্রয়োজন করে না।

পরন্তু নিধুবাবুর সঙ্গীত বিদ্যায় অনুরাগ ও নাম সম্ভ্রম সুন্দররূপে প্রকাশ হইলে বঙ্গদেশের নানা স্থান হইতে প্রধান প্রধান লোকের কলিকাতায় আগমন করত তাহার গান শুনিয়া সমূহ সন্তোষলাভ করিতেন। ইঁহারা ভাবতেই বাবুর নিকট আসিতেন, কিন্তু বাবু প্রায় কখনই কাহারো নিকট গমন করিতেন না, কারণ তিনি স্বাধীনতা সম্মানের উপর নিয়তই দৃষ্টি রাখিতেন, তোষামোদাদি উপাসনাকে অত্যন্ত হেয় জ্ঞান করিতেন। কোন কোন প্রাচীন ব্যক্তি কহেন "বর্দ্ধমানাধিপতি মৃত মহাত্মা ৺তেজশ্চন্দ্র রায় বাহাদুর এতন্নগরে শুভাগমনানন্তর কোনরূপ কৌশলক্রমে তাঁহার গান শুনিয়াছিলেন।"

মুরশিদাবাদস্থ মৃত মহারাজ মহানন্দ রায় বাহাদুর এখানে আসিয়া বহুদিন অবস্থান পূর্ব্বক প্রতিদিবস এক নিয়মে বাবুর সহিত একত্র হইয়া মনের আনন্দে আমোদ প্রমোদ করিতেন। উক্ত মহারাজের শ্রীমতী নাম্নী এক রূপবতী গুণবতী বুদ্ধিশালিনী বারাঙ্গণা ছিল, ঐ বারবিলাসিনী রামনিধি বাবুকে অন্তঃ-করণের সহিত ভালবাসিত ও অতিশয় স্নেহ করিত এবং বাবুও তাহার বিস্তর গৌরব ও সম্মান করিতেন। ইহাতে কেহ কেহ অনুমান করিতেন এই শ্রীমতী নিধুবাবুর প্রণয়িনী প্রিয়তমা বেশ্যা। কিন্তু অনেকে একথা অগ্রাহ্য করিয়া কহিতেন "তিনি লম্পট ছিলেন না, কেবল স্তুতি, বিনয়, স্নেহ এবং নির্ম্মল প্রণয়ের বশ্য ছিলেন। এই প্রযুক্ত তাহাকে অতিশয় স্নেহ করিয়া প্রায় প্রতি রজনীতেই তাহার গৃহে গমন করিতেন, এবং কিয়ৎক্ষণ হাস্য পরিহাস, কাব্য আলাপ ও গীত বাদ্য করিয়া আসিতেন, আর সেখানে বসিয়া মনের মধ্যে যখন যেরূপ ভাবের উদয় হইত তৎক্ষণাৎ রাগ সুর বদ্ধ করিয়া তাহারি এক এক টপ্পা রচনা করিতেন।

১২১০ সালের পূর্ব্বে মৃত মহামতি মহারাজা নবকৃষ্ণ বাহাদুরের সময়ে বাঙ্গালি মহাশয়দিগের মধ্যে আখড়াই গাহনায় অত্যন্ত আমোদ ছিল। তখন উক্ত মহারাজার নিকট কুলুইচন্দ্র সেন নামক একজন বৈদ্য আখড়াই বিষয়ে অতিশয় প্রতিপন্ন ছিলেন। ঐ মহাশয় সঙ্গীত শাস্ত্রে অদ্বিতীয় পারদর্শী ছিলেন, তাঁহাকে আখড়াই গাহনার একজন জন্মদাতা বলাই কর্ত্তব্য হয়। যদিও তাঁহার পূর্ব্বে ও তৎসমকালে উক্ত বিদ্যায় বিশেষ নিপুণ আর কয়েক ব্যক্তি এতন্নগরে ও চুঁচুড়া প্রভৃতি স্থানে সজীব ছিলেন, তথাচ এই মহাশয়কে তাঁহাদিগের সকলের অপেক্ষা প্রধান কহিতে হইবেক, যেহেতু ইনি আপন ক্ষমতা ও শক্তি দ্বারা পুরাতন বিষয়ের কোন কোন অংশ পরিবর্ত্তন করত অনেক নূতন সৃষ্টি করেন। সুর ও গীতকে নানা প্রকার রাগ রাগিনীতে যুক্ত করত নূতন নূতন বাদ্যের সূচনা করিয়াছিলেন। ঐ কুলুইচন্দ্র সেন ৺রামনিধি গুপ্তের অতি নিকট সম্বন্ধীয় মাতুল ছিলেন। আখড়াই গীতের তিনি যে সকল নূতন প্রণালী করেন সেই প্রণালীই অদ্যাবধি প্রচলিত রহিয়াছে।

১২১০ সালে যখন মহামান্য মহারাজা রাজকৃষ্ণ বাহাদুর আখড়ায়ী আমোদে আমোদী হইলেন, তখন শ্রীদাম দাস, রাম ঠাকুর, ও নসিরাম সেকৃরা প্রভৃতি কয়েকজন সর্ব্বদাই আখড়াই সঙ্গীতের সংগ্রাম করিত, ইহারা ভাবতেই এ বিষয়ে বিশেষ পণ্ডিত ছিল, কিন্তু সৌখিন্ ছিল না, পেসাদারি করিয়া টাকা লইত।

১২১১ অব্দে নিধুবাবুর উদ্যোগে এতন্নগরে দুইটী সংশোধিত সখের আখড়াইদলের সৃষ্টি হইল। তাহার এক পক্ষে বাগবাজার ও শোভাবাজারস্থ সমুদয় ভদ্রসন্তান এবং আর এক পক্ষে মনসাতলা অথবা পাতুরেঘাটা নিবাসি ৺নীলমণি মল্লিক মহাশয় ও তাঁহার বন্ধুবর্গ ব্রতি হইলেন। আখড়াই যুদ্ধের স্থিরতার নাম "বদী" ও পক্ষ প্রতিপক্ষের নাম "বাদী" এই উভয় দলে "বদী" হইলে নিধুবাবু বাগবাজারের পক্ষ হইয়া গীত ও সুর প্রদান করিলেন, এবং মল্লিক বাবুর পক্ষে শ্রীদাম দাস প্রভৃতি কয়েকজনে গীত ও সুর প্রস্তুত করণার্থ প্রবৃত্ত হইলেন। ঐ সঙ্গীত সংগ্রাম শ্রবণ দর্শন করত নগরস্থ সমস্ত বিশিষ্ট লোক অপর্য্যাপ্ত আনন্দ সাগরে অভিষিক্ত হইয়াছিলেন। এইরূপে সখের আখড়াই স্থাপিত হইলে ব্যবসায়িদিগের আখড়ায়ের দল একেবারে উঠিয়া গেল।

সখের আখড়ায়ের এতদ্রূপ সূত্র সঞ্চার হইলে কিছুদিন পরে অনেকেই তদ্বিষয়ে অনুরাগি হইলেন। পাতুরেঘাটাস্থ মহামান্য ঠাকুরবাবুরা, যোড়াসাঁকো পল্লীস্থ সুবিখ্যাত সিংহ বাবুরা, গরাণহাটা নিবাসি সম্ভ্রান্ত ৺বাবু কৃষ্ণমোহন বসাখ, শোভাবাজারস্থ খ্যাত্যাপন্ন ৺কালীশঙ্কর ঘোষ মহাশয়ের পুত্রগণ এবং শ্যামপুকুর পল্লীবাসী ৺দিগম্বর মিত্র ও হলধর ঘোষ প্রভৃতি কতিপয় বন্ধু, ইহাঁরা প্রত্যেকেই আপনাপন পল্লীতে ভিন্ন ভিন্ন রূপে এক একটা দল করিয়াছিলেন, এবং তাঁহারদিগের সকলেরি সহিত বাগবাজারের দলের দুই একবার করিয়া যুদ্ধ হইয়াছিল। এমত শুনিতে পাই, সেই সমস্ত সময়ে বাগবাজারের পক্ষেই অধিক সংখ্যায় জয়লাভ হইয়াছে, কারণ এ পক্ষে সুর ও গীত বিষয়ে ৺রামনিধি গুপ্ত এবং গাহনা পক্ষে অদ্বিতীয় স্বরসিদ্ধ সুরজ্ঞ কোকিলকণ্ঠ বাবু মোহনচাঁদ বসু প্রভৃতি গায়ক, সুতরাং দুই দিক উত্তম হওয়াতেই বাগবাজারের জয়ের সম্ভাবনাই অধিক ছিল। কিন্তু ইহাঁরা নিতান্ত পরাজয় হয়েন নাই, এমত নহে, গাহনা বাজনায় জয় পরাজয় "হাওয়ার" উপরেই নির্ভর করে। গীত, সুর ও গায়ক, এই তিন সর্ব্বোৎকৃষ্ট হইলেও এক একদিন "হাওয়ার" দোষে জমাট হয় না, ফাকে ফাকে উড়িয়া যায়। যাঁহারা সকল বিষয়েই অপকৃষ্ট, দৈববশতঃ "হাওয়ার" গুণে তাঁহারা এমত "লগ্ন" করেন যে তচ্ছ্রবণে শ্রোতৃমাত্রেই সীমা-শূন্য সন্তোষ-সাগরে মগ্ন হইয়া থাকেন, বিশেষতঃ রাগ রাগিনীর খেলা, ছেলে খেলা নহে, অতিশয় কঠিন। যে সময়ের যে রাগ, সেই সময়টী না হইলে সে রাগের রাগ থাকে না, ইহাতে সময়ের বৈলক্ষণ্য জন্য রাগের অনুরাগ না হইয়া সহজেই বিরাগ হইতে পারে। যাহা হউক, সকল পক্ষই পরস্পর জয়ি ও যশস্বি

হইবার জন্য যথাযোগ্য যত্নের ত্রুটি করেন নাই, সাধ্যমত সাধন করিয়াছেন, ইহাতে কোন কোন-বার বাগবাজারের দল পরাভব হইয়াছেন। কিন্তু তাঁহারা কোনবারে সর্ব্বতোভাবেই পরাভব হয়েন নাই।

বাগবাজারবাসী সর্ব্বত্র বিখ্যাত শ্রীমান্ বাবু মোহনচাঁদ বসু প্রথমেই আখড়াই গাহনার প্রধান গায়কের পদে ব্রতী হয়েন নাই, যখন তিনি বালক ছিলেন, তখন জীল দিতেন। তাহার কতিপয় বৎসর পরেই তিনি প্রধানের পদ প্রাপ্ত হইলেন। বাঙ্গালির মধ্যে এই বঙ্গদেশে তাঁহার ন্যায় বাঙ্গালা গাহনা বিষয়ে ইদানীং সর্ব্বশ্রেষ্ঠ যোগ্য ব্যক্তি দ্বিতীয় আর কেহই জন্মগ্রহণ করেন নাই, নিধুবাবু ইঁহাকে প্রাণাপেক্ষা স্নেহ করিতেন, যেহেতু তাঁহার কৃত কি "আখড়াই" কি "টপ্পা" ইনি যখন যাহা গাহিতেন, তখন তাহাতেই মধুবৃষ্টি করিতেন। মোহনচাঁদের স্বর শ্রবণে আহা, আহা শব্দে অশ্রুপাত না করিয়াছেন এমত ব্যক্তি কেহই নাই। এই মহাশয় স্বয়ং হাফ্ আখড়ায়ের সৃষ্টি করত বঙ্গদেশস্থ সমস্ত লোককে মুগ্ধ করিয়াছেন এবং দাঁড়া কবির যে সকল সুর ও রথ, দোল এবং সংকীর্ত্তন প্রভৃতির যে যে সুর করিয়াছেন, তাহাই পীযম পরিপূর্ণ। যদি বীণা-যন্ত্রের বাদ্য শ্রবণে লোকের অরুচি হয়—যদি কোকিল কুলের সুমধুর কুহুধ্বনি শ্রবণে বিরক্তি জন্মে—যদি মধুকরের মধুমিশ্রিত ঝঙ্কার রব বিষ বোধ হয়, তথাচ মোহনচাঁদ বাবুর সুর ও স্বর শুনিতে মুহূর্ত্তকালের জন্য কাহারো মনে বিরক্তি জন্মে নাই, বরং ক্রমে লালসার বৃদ্ধিই হইয়াছে। কি কলিকাতা, কি তন্নিকটস্থ সমস্ত গ্রাম, কি দিল্লী, কি লাহোর ইত্যাদি উত্তর পশ্চিম প্রদেশের যে যে স্থানে বাঙ্গালি বাবুরা বিরাজ করিতেছেন, সেই সেই স্থানেই বসুবাবুর গুণ ব্যখ্যা হইতেছে ও নাম জাগরূক রহিয়াছে, যেহেতু তাঁহারা তাঁহার প্রণীত সুর গাহিয়া সর্ব্বদাই আমোদ করিতেছেন। এই মহাশয় কন্দর্পের ন্যায় অতি সুপুরুষ ছিলেন, ইহা লেখা বাহুল্য মাত্র, কারণ পাঠকগণের মধ্যে অনেকেই পূর্ব্বে তাঁহাকে দেখিয়াছেন এবং এইক্ষণেও দেখিতেছেন। হায় কি দৈব বিড়ম্বনা! রসের দোষে অধুনা তাঁহার সে দেহ নাই, সে রূপ নাই, সে শ্রী নাই, সে ভাবভঙ্গি কিছুই নাই, যেন সে তিনি আর তিনিই নহেন। চারি পাঁচ বৎসর হইল জগদীশ্বর তাহার প্রতি প্রতিকূল হইয়া কখনো শয্যাগত, কখনো কিঞ্চিৎ সুস্থ করিতেছেন। এই মৃতবৎ অবস্থাতেও যিনি তাঁহার মুখে গান শুনিবেন তিনিই চমৎকৃত হইয়া সাধুবাদ প্রদান করিবেন। অত্যন্ত কাতর হইয়া প্রার্থনা করি, করুণাময় পরমেশ্বর তাঁহার প্রতি প্রসন্ন হইয়া শীঘ্রই পূর্ব্ববৎ আরোগ্য করুন।

যদিও দৈবশক্তি দেবীর অনুগ্রহেই মোহনচাঁদ বাবুর এতদ্রূপ নাম সম্ভ্রম ও প্রতিপত্তি হইয়াছে, তথাচ ৺রামনিধি গুপ্ত মহাশয়কেই তাঁহার সকল বিষয়েরি মূলাধার কহিতে হইবেক, কেননা তাঁহারি দ্বারা শিক্ষা ও তাঁহারি দ্বারা সংস্কার। লোকে অদ্যাবধি মোহনচাঁদ বাবুকে নিধুবাবুর "খাস ভাণ্ডার" কহিয়া থাকে।

এই স্থলে কেহ এমত আপত্তি তুলিতে পারেন যে মোহনচাঁদ বাবুর পূর্ব্বে যোড়াসাঁকোস্থ বাবু রামচাঁদ মুখোপাধ্যায় এবং পাতুরেঘাটার বাবু রামলোচন বসাখ প্রভৃতি কয়েকবার "হাফ্ আখড়াই" করিয়াছিলেন। কিন্তু একথা কথাই নহে, তাহাকে কখনই হাফ আখড়াই বলা যাইতে পারে না, কেন না তাঁহারা "পেসাদারি দাঁড়া কবির সুরে" গান করিয়া কেবল বসিয়া গাহিতেন। মোহনচাঁদ আখড়াই ভাঙ্গিয়া হাফ্ আখ্ড়ায়ের নূতন ধরণের সুর করিয়া যৎকালে বড়বাজারস্থ শ্রীযুক্ত বাবু রামসেবক মল্লিক মহাশয়ের ভবনে শীতকালে এক শনিবারের রাত্রিতে গাহনা করিলেন, বোধ হয় তৎকালে প্রশংসার শব্দে বাটীর থাম পর্য্যন্ত কাঁপিয়াছিল, সেবারে যোড়াসাঁকো ও পাতুরেঘাটার সংযোজিত মহাশয়েরা সংপূর্ণরূপে পরাজয় হইয়া পরে সেই দৃষ্টান্তানুসারে সুর প্রস্তুত করণে শিক্ষিত হইলেন, তথাচ তাঁহারা অদ্যাবধি তদ্বৎ উৎকৃষ্টরূপে কৃত-কার্য্য হইতে পারেন নাই।

আখড়াই গীতের উত্তর প্রত্যুত্তর নাই। যাঁহারদিগের সুর ও গাহনা ভাল হইত, তাঁহারাই জয়-পতাকা প্রাপ্ত হইয়া ঢোল বাজিয়া আনন্দ পূর্ব্বক গমন করিতেন। উভয় পক্ষেই তিনটি করিয়া গীত গাহিতেন, প্রথমে এক একটী "ভবানী বিষয়" পরে এক একটী "খেউর" সর্ব্বশেষে এক একটী "প্রভাতী"। সর্ব্বদাই দুই দলে যুদ্ধ হইত, কোন কোন বার তিন দলেও সংগ্রাম চলিয়াছে। "ভবানী" বিষয়ের মহড়ার ২৬টী অক্ষরে একটী ত্রিপদী, চিতেনে ঐরূপ একটী ত্রিপদী এবং পাড়ঙ্গে দুইটী ত্রিপদী। ইহাতেই কেবল সুর ও রাগ রাগিনীর পাণ্ডিত্য এবং বাদ্যের পারিপাট্য। সঙ্গতের বাদ্য "পিড়েবন্দি" "দোলন" দৌড়, সব দৌড়, এবং গান সমাপন সময়ে যে বাদ্য, তাহার নাম "মোড়" কি মহড়া, কি চিতেন ও কি পাড়ঙ্গ সকল গাহনার বাদ্য প্রায় একরূপ, কিঞ্চিৎ প্রভেদ মাত্র, ত্রিপদীর একটী পদ যথা।—"নিশ্চিত ত্বং নিরাকারা।"—

এই কএকটী কথা গাহিতে গাহিতে যেমন রাগ রাগিনীর পরিবর্ত্তন অমনি তৎসঙ্গে সঙ্গেই, বাদ্যের পরিবর্ত্তন হইয়া থাকে। সঙ্গত, যথা প্রথমে পিড়েবন্দি, পরে দোলন, তৎপরে দৌড় সর্ব্বশেষে সব-দৌড়। প্রথমে মহড়া গাহিয়া

গায়কেরা একবার বিশ্রাম করেন, ঐ সময়ে সাজ বাজিয়া থাকে, সেই সাজ সাঙ্গ হইলে আবার চিতেন ধরেন, চিতেন সাঙ্গ হইলে আবার সাজ বাজে, তৎপরে পাড়ঙ্গ গাহিয়া গান সমাপন করেন।

ঠাকুরাণী বিষয় গাহনার নিয়ম ও সঙ্গতের নিয়ম যেরূপ, খেউড় ও প্রভাতির নিয়ম অবিকল সেইরূপ। এই সঙ্গীত প্রকৃতই সঙ্গত, ইহাতে অসঙ্গত হওনের বিষয় কি? এই গীত ও বাদ্যের মিছিল অর্থাৎ প্রণালী অতি আশ্চর্য্য, একরূপ অদ্ভুত নূতন সৃষ্টি বলিলেই হয়, ইহাতে এরূপ সুকৌশল আছে যে, উত্তর পশ্চিম প্রদেশীয় অদ্বিতীয় সঙ্গীত তৎপর গায়ক ও বাদ্যকর মহাশয়েরা কোন ক্রমেই সহজে তাহার মর্ম্মগ্রহণ করিতে পারিবেন না, এবং নিয়ত এক বৎসর শিক্ষা না করিলে কখনই সঙ্গত করিতে সমর্থ হইবেন না। অপিচ কোন্ কোন্ তালের সহযোগে আখড়াই তালের রচনা হইয়াছে তাহাও আশু অনুধাবন করিতে পারিবেন না, শ্রবণ মাত্রেই নূতন প্রকার চমৎকার বোধ হইবে।

আখড়াই খেউড় ও প্রভাতী গীতে কি মহড়া, কি চিতেন, কি পাড়ঙ্গ অর্থাৎ অন্তরা ইহার প্রত্যেকেতেই চতুর্দ্দশটী অক্ষর, অর্থাৎ একটী করিয়া "পয়ার"

যথা, খেউড় (মহড়া)—

"অনেক যতনে প্রেম তোমার সহিতে" দেওয়া ইত্যাদি

—যথা, প্রভাতী (মহড়া)—

"না হোতে সুখের শেষ প্রভাত হইল।" দেওয়া ইত্যাদি

—যথা, ভবানী বিষয় (মহড়া)—

"নিশ্চিত ত্বং নিরাকারা, অজ্ঞান বোধে,

সাকারা, তত্বজ্ঞানে চৈতন্যরূপিনী। করুণাময়ী" ইত্যাদি।

আখড়াই তিন গানের ভিন্ন ভিন্ন তিনখানি সাজ, সে সাজের ভিতর যে কত সাজ, তাহার কি ব্যাখ্যা করিব? যখন বাজে তখন বাজে লোকের বুঝিবার সাধ্য কি? ফলে যৎকালে এক পক্ষের সাজ উত্তমরূপে বাজে, তৎকালে বিপক্ষদিগের হৃদয়ে বাজে ইহাতে সন্দেহ কি?

আখ্ড়াই বাজনার প্রধান যন্ত্র, তানপুরা, বেহালা, মন্দিরে, ঢোল, মোচঙ্গ, খরতাল, সিটি ইত্যাদি, ইহার সঙ্গে, সপ্তসারা, জলতরঙ্গ, বীণা, বেণু, সেতার প্রভৃতি যত যোগ কর, ততই উত্তম, কিন্তু না করিলে কিছুমাত্র হানি হয় না। আখ্ড়াই ঢোল বাজানা যে প্রকার নূতন তাহার বেহালার গৎ সকলি সেই প্রকার নূতন, কোন কোন আখড়াই সম্প্রদায় ২০।২১ খান পর্য্যন্ত যন্ত্র একত্র বাজাইয়াছেন।

আখ্‌ড়াই গাহনা সর্ব্বশেষে স্বর্গগত সুবিখ্যাত বহুগুণজ্ঞ ৺রাজা গোপী-মোহন বাহাদুরের ভবনে যতবার হইয়াছে, এত অধিক আর কোন খানেই হয় নাই। আমরা কোন প্রামাণ্য প্রাচীন পুরুষের প্রমুখাৎ পরিজ্ঞাত হইয়াছি, সংগীত বিদ্যায় অত্যন্ত নিপুণ কোন ইংরাজ উক্ত রাজনিকেতনে একবার সমস্ত রাত্রি জাগরণ পূর্ব্বক আখ্‌ড়াই শুনিয়া কি গাহনা কি বাজনা উভয় বিষয়েই অত্যন্ত মোহিত হইয়াছিলেন এবং গমনকালীন তিনি বিস্তর প্রশংসা করিয়া বিদায় হইলেন।

আখড়াই গাহনা যে প্রকার বাহুল্য ব্যাপার তাহাতে কোনমতেই গীতের উত্তর প্রত্যুত্তর হইতে পারে না, কারণ ১০।১২ জন গায়ক একত্র হইয়া ক্রমশঃ এক বৎসরকাল সুর ও তাহার মিছিল সমুদয় অভ্যাস করত গলার মিল করিয়া যখন দুই তিন গোপনীয় সভা করিয়া দেখেন যে সকল দিক সমান হইয়াছে, আর কোনরূপ অনৈক্য বা দোষ নাই, তখন পরস্পর সম্মত হইয়া প্রকাশ্য যুদ্ধের দিন স্থির করেন।

আখ্‌ড়াই সাজের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠই ঢোল, তাহার নীচেই বেহালা, পূর্ব্বে যত ব্যক্তি ঢোল বাজাইয়াছেন, তন্মধ্যে বাগবাজার নিবাসি ৺রসিকচাঁদ গোস্বামি মহাশয়ের অপেক্ষা প্রধান আর কেহ হয়েন নাই, এবং উক্ত পল্লীস্থ ৺বাবু রাধানাথ সরকারের অপেক্ষা বেহালা বিদ্যায় কেহই নিপুণ ছিলেন না। গোস্বামির ঢোল ও সরকার বাবুর বেহালা যিনি না শুনিয়াছেন, তাঁহার কর্ণই বৃথা।

গরাণহাটাস্থ বাবু কৃষ্ণমোহন বসাক অনেকবার দল করিয়াছিলেন, তাঁহার দলে 'গোবিন্দ' নামক একজন মালা সুর ক"িত, সে ব্যক্তি এ বিষয়ে অত্যন্ত নিপুণ ছিল, এবং রাজা রামমোহন রায়ের সময়ে ব্রহ্মসভায় ব্রহ্মসংগীত গান করিত। ঐ গোবিন্দ এইক্ষণে জীবিত নাই।

শোভাবাজারে একবার মাত্র দল হইয়াছিল, সেবারে ৺কালীশঙ্কর ঘোষ মহাশয়ের বাটীতেই বাগবাজারের দলের সহিত সংগ্রাম হয়, তাহাতে সেতার বিদ্যায় অদ্বিতীয় পারদর্শী ৺মাধবচন্দ্র ঘোষ মহাশয় গোবিন্দমালার সহিত একত্র হইয়া শোভাবাজারের পক্ষে সুর প্রস্তুত করেন।

শ্যামপুকুরের মহাশয়েরা কেবল একটীবার দল করেন, তাহাতে তৎপক্ষে কাঁচরাপাড়া নিবাসী বৈদ্যবংশ্য শ্রীযুক্ত বাবু রামচাঁদ রায় মহাশয় সুর ও গীত প্রস্তুত করিয়া দেন, ইনি এ বিষয়ে ও সংগীত বিদ্যায় অতিশয় যোগ্য, কিন্তু

ইঁহার আখ্‌ড়াই সুরের পদ্ধতি শিক্ষা বাগবাজার হইতেই হইয়াছে। আখ্‌ড়াই সম্পর্কীয় প্রায় তাবতেই গত হইয়াছেন, কেবল ঈশ্বরানুগ্রহে অধুনা এই মহাশয় এবং বাবু মোহনচাঁদ বসু মাত্র জীবিত আছেন।

৩০ বৎসর হইল আখ্‌ড়াই গাহনা রহিত হইয়াছে, ইহার মধ্যে অনেকে অনেকবার উদ্যোগ করিয়া কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই। ১২৬০ সালের চরমকালে শ্যামপুকুরের নব্য বাবুরা কয়েক মাস চাগিয়া উঠিয়াছিলেন, শেষ ৬১ সালের পদার্পণেই শ্রীবিষ্ণু স্মরণ করিলেন। অনেকের মনে এমত আশা জন্মিয়াছিল যে বহুকালের পর আখড়াই শুনিব। তাহা না হওয়াতে "অজা যুদ্ধে ঋষি শ্রাদ্ধে" ইত্যাদি শ্লোক পাঠ করিতে হইল।

বাঙ্গালার মধ্যে আখড়াই গাহনায় অনেক সভ্যতা ও পাণ্ডিত্য আছে, কিন্তু আক্ষেপের বিষয়, এই যে, অতি অল্পকালের মধ্যেই এই ব্যাপার একেবারে লোপ হইয়া গেল, আর তাহার পুনরুত্থানের সম্ভাবনাই দেখিতে পাই না। কাল সহকারে মানুষের মনের অবস্থা যত পরিবর্ত্তন হইতেছে, ততই তাহার সঙ্গে সঙ্গেই পুরাতন আমোদ প্রমোদের উচ্ছেদ হইতেছে।

আখড়ায়ের সৃষ্টিকর্ত্তা কোন ব্যক্তি আমরা স্থিররূপে ইহার নিশ্চয় করিতে পারিলাম না। কিন্তু অনেকেই শেষে ৺কুলুইচন্দ্র সেন মহাশয়কে ইহার জন্মদাতারূপে নির্ণয় করিয়াছেন। এ বিষয়ে অপর এক প্রমাণ এই, বহুদিন হইল "কবিওয়ালা ৺ভোলা ময়রা এক লহর গায়" সেই লহরের এক স্থানে এরূপ বর্ণনা ছিল "আখড়ায়ের সৃষ্টি কোল্লে কুলুইচন্দ্র সেন"—বঙ্গদেশে অপর স্থানের কথা দূরে থাকুক্ এই কলিকাতার অতি নিকটস্থ অনেকের কর্ণকুহরেই আখড়ায়ের গীত বাদ্য ধ্বনিত হয় নাই।

৺রামনিধি গুপ্ত মহাশয় এই আখ্‌ড়ায়ের বিস্তর শ্রীবৃদ্ধি করেন তাহাতে কোন সন্দেহ নাই, এবং সর্ব্বশেষে তাঁহার প্রণীত সংশোধিত পদ্ধতিই প্রচলিত হইয়াছিল।

কয়েক বৎসর হইল নিধুবাবু কৃষ্ণমোহন বসাক বাবুর সহিত মাহেশের স্নানযাত্রার মেলা দেখিতে গিয়া অষ্টাহ নৌকার উপরেই বাস করেন, তাহার মধ্যে এক দিবসও সংগীতের আমোদ হয় নাই। কেবল বাবুর বাক্ কৌশল ও রসিকতাতেই সকলে সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন। ইনি অতিশয় রসিক হইয়াও অত্যন্ত গম্ভীর ছিলেন, তাঁহার মুখের পানে মুখ করিয়া "বাবু একটী গান কর" এমত কথা কহিতে কাহারো সাহস হইত না। ইনি দীর্ঘজীবী হইয়া সুখে কালযাপন করিয়াছেন।

এই মহাশয়ের মৃত্যুর ২০ কিম্বা ২৫ বৎসর পূর্ব্বে অনেকেই কহিত "তিনি জীবিত নাই" এই সূত্রে পরস্পর কত বাজী রাখারাখি হইয়াছিল। এবং এই উপলক্ষে কেহ কেহ তাঁহারি নিকট আসিয়া জিজ্ঞাসা করিয়াছিল "মহাশয় কি অদ্যাপি সজীব আছেন?"

বটতলায় আমোদের স্থান ভঙ্গ হইলে বাগবাজার নিবাসী ৺দেওয়ান শিবচন্দ্র মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের যত্নে ও সাহায্যে ঐ বাগবাজারস্থ ৺রসিকচাঁদ গোস্বামির ভবনে কিছুদিন বাবুর বৈঠক হয়, সেই স্থানে আহ্লাদের ব্যাপার অতি বাহুল্য রূপেই হইয়াছিল, তথায় বসিয়া সময়ে সময়ে যে সকল টপ্পা ও অন্য গীত রচনা করিতেন তাহার ভাব ও রাগ স্বর অতি মনোহর হইত। ৺রাজা রাজবল্লভের কালোয়াৎ 'আবুবরস্ খাঁ' তচ্ছ্রবণে কহিয়াছিল, "একাধারে এক ব্যক্তি হইতে এরূপ হওয়া অত্যন্ত অসম্ভব, অতএব দৈবশক্তি ব্যতীত কখনই এমত সম্ভবে না।"

বাবু শারীরিক নিদান এমন বুঝিতেন, যে সময়ে স্নান, সময়ে ভোজন সময়ে শয়ন করাতে একাল পর্য্যন্ত কখনো কোনরূপ রোগ ভোগ করেন নাই, তিনি এত যে প্রাচীন হইয়াছিলেন তথাচ চক্ষুঃ কর্ণ প্রভৃতি ইন্দ্রিয়ের কিছুমাত্র বৈলক্ষণ্য হয় নাই। এবং বুদ্ধিরও ভ্রম হয় নাই। মৃত্যুর পূর্ব্বে কেবল এক বৎসর কাল দুর্ব্বলতা জন্য গতিশক্তির ব্যাঘাত হইয়াছিল, এ কারণ বাটীর বাহির হইয়া কুত্রাপি গমন করিতে পারেন নাই। এই এক বৎসর যে যে মহাশয় দেখা করিতে আসিতেন, তাঁহারদিগের সহিত হাস্যবদনে আলাপাদি করিয়া পরিশিষ্ট সময় "হস্তামল" কুবের ও তুলসীদাস কৃত গ্রন্থ অথবা ইংরাজী ও বাঙ্গালা পুস্তক পাঠ করিতেন। রামনিধি বাবু ৯৭ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত এবম্ভূত সুখ সম্ভোগ করণান্তর ১২৪৫ সালের ২১ চৈত্র দিবসে পুত্র, কন্যা, পৌত্র দৌহিত্রাদি রাখিয়া জাহ্নবী তীরে নীরে জ্ঞান পূর্ব্বক জগদীশ্বরের নাম উচ্চারণ করিতে করিতে এতন্মায়াময় সংসার পরিত্যাগ করত যোগাধামে যাত্রা করিলেন।

ঐ মৃত মহাত্মা মৃত্যুর কিছুদিন পূর্ব্বে স্বরচিত সংগীত সকল মুদ্রিত করত একখানি পুস্তক প্রকাশ করেন, তাহাতে যে ভূমিকা ও রাগ রাগিনীর বিষয় বিস্তার করিয়া লেখেন আমরা তদবিকল নিম্নভাগে উদ্ধৃত করিলাম, এতৎপাঠে সকলেই সন্তুষ্ট হইবেন। *

* স্থানাভাববশতঃ আমরা কেবল ভূমিকাটী উদ্ধৃত করিলাম।

কি সধন কি অধন সর্ব্বসাধারণ ব্যক্তিই নিধুবাবুকে "বাবু" শব্দে সম্বোধন করিতেন। বাবুর বাটী, বাবুর সুর, বাবুর গীত, বাবু এলেন, বাবু গেলেন ইত্যাদি। বাঙ্গালা গীতে রাগ সুরের ব্যাপারে ইনি যদ্রূপ ক্ষমতা প্রকাশ করেন, তাহাতে "সরিমিয়ার" অপেক্ষা ইহাঁকে কোন অংশেই ন্যূন বলা যাইতে পারে না। ইহাঁর প্রণীত টপ্পাই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। যেমন হিন্দুস্থানে "সরির টপ্পা" তেমনি বঙ্গদেশে "নিধুর টপ্পা"। অনেকেই "নিধু" "নিধু" কহেন, কিন্তু নিধু, শব্দটি কি, অর্থাৎ এই নিধু, কি গীতের নাম, কি সুরের নাম, কি রাগের নাম, কি মানুষের নাম, কি, কি ? তাহা জ্ঞাত নহেন। যাহা হউক, আর বাহুল্য করণের প্রয়োজন করে না। নিধুবাবু যে প্রকার রাগ, সুর এবং ভাবের প্রতি দৃষ্টি করিতেন, মিলের প্রতি সে প্রকার দৃষ্টি করিতেন না। একারণ তাঁহার কোন কোন গান সুর করিয়া গাহিলে মানুষের মনকে যে প্রকার আর্দ্র করে, মুখে পাঠ করিলে সে প্রকার চিত্তসুখকর হয় না। যথা মান, দিন, মন, প্রাণ, ছিল, গেল ইত্যাদি ফলে কেবল ৺ভারতচন্দ্র রায় গুণাকর ও কবিরঞ্জন ৺রামপ্রসাদ সেন ব্যতীত পুরাতন প্রায় সমস্ত কবিদিগের প্রণীত কবিতায় এই প্রকার মিলের দোষ আছে, নিধুবাবুর এক এক খান সুর "খেয়ালের" অপেক্ষাও কৌশল কলাপ পরিপূরিত ও অতি মধুর। ভাবের উদয় মাত্রেই মুখ হইতে স্বভাবতঃ যে সকল কথা নির্গত হইত ইনি তাহাই সুর ও রাগভুক্ত করিয়া গান করিতেন, সেই সময়ে যদিস্যাৎ মিলের প্রতি কিঞ্চিন্মাত্র মনোযোগ করিতেন তবে সোণার উপর সোহাগার অপেক্ষাও কতদূর পর্য্যন্ত উত্তম ও আশ্চর্য্য হইত তাহা কথনীয় নহে। এই বিষয় উল্লেখের আর আবশ্যক করে না, যিনি জগদীশ্বর, এই বিচিত্র বিনোদ বিশ্ব বিরচনা করিয়াছেন, যখন তাঁহার রচনাই সংপূর্ণরূপে দোষ-শূন্য হয় নাই, তখন মানুষের রচনার সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর হইবে, ইহা কোন মতেই সম্ভব হইতে পারে না। যথা—

"গন্ধঃ সুবর্ণে, ফলমিক্ষুদণ্ডে, না কারি পুষ্পং খলু চন্দনেষু।
বিদ্বান্ ধনাঢ্যো নচ দীর্ঘজীবী, ধাতুঃ পুরেস্মিন্ নচ বুদ্ধিদাতা।"

আহা! জগদীশ্বর এমত সুবর্ণ সুবর্ণ সৃষ্টি করিয়া তাহাতে গন্ধ প্রদান করেন নাই। ইক্ষু, যাহার দণ্ড অতি সুমধুর করিয়াছেন, সেই মধুলতাকে ফলপ্রদান করেন নাই।—চন্দনবৃক্ষ যাহার কাষ্ঠকে অতিশয় সুরভি করিয়াছেন, তাহাকে ফুল প্রদান করেন নাই।—আর বিদ্বান্ ব্যক্তিকে ধনাঢ্য ও দীর্ঘজীবী করেন

নাই, অতএব ইহাতে বিধাতার দোষ কি? কারণ তিনি যখন সৃষ্টি করেন তখন বুদ্ধি ও পরামর্শ প্রদান করে এমত ব্যক্তি কেহই তাঁহার নিকট ছিল না।

৺রামনিধি গুপ্ত মহাশয় স্বরচিত সংগীত সকল মুদ্রিত করিয়া যে পুস্তক প্রকটন করেন, তাহার ভূমিকা অবিকল উদ্ধৃত করিলাম।

"ভূমিকা।

এই পশ্চাতের লিখিত গীত সকল বহু দিবসাবধি সুন্দর রূপ ব্যক্ত থাকাতে কোন মত প্রকারে মুদ্রাঙ্কিত করিয়া প্রকাশ করিতে আমার বাসনা ছিল না, এক্ষণে সময়ক্রমে এই কারণ বশতঃ সর্ব্বসাধারণ গুণগ্রাহিগণের অবগতির জন্য মুদ্রাঙ্কিত করিতে হইল। এই গীত সকলের অল্প অল্প অংশ অশুদ্ধ করিয়া আমার অজ্ঞাতে প্রচার করিতে লাগিল, কিঞ্চিৎ কাল পরে তাহা হইতেও অধিকাংশ ভূরি ভূরি বর্ণাশুদ্ধি এবং অশুদ্ধ পদে পূর্ণিত করিয়া প্রচার করিল, এই নিমিত্ত বিবেচনা করিলাম, মৎকৃত সঙ্গীত সকল এক্ষণেও যদ্যপি বাস্তবিক এবং শুদ্ধরূপ প্রকাশিত না হয় তবে হানি আছে। এই আশঙ্কা প্রযুক্ত প্রকাশ করিলাম। এই পুস্তকান্তর্গত গীত সকল আত্মীয় বন্ধুগণের এবং গানে আমোদিত ব্যক্তিদিগের তুষ্টির কারণ রচনা করিয়াছিলাম, এক্ষণে প্রচার করণের সেই আর এক মানসও রহিল। বঙ্গভাষায় এতাদৃশ গানের পুস্তক যদ্যপি সম্পূর্ণরূপে অভিনব নহে, তথাপি এ ভাষায় এমত গ্রন্থ অন্তের পুস্তকের দৃষ্টান্ত মত কহা যাইতে পারে না, এবং এই গীত সকলে আলাপচারি-দ্বারা যে সকল তান্ বসিয়াছে, তাহা কোন হিন্দুস্থানি খ্যাল ও টপ্পার সুরে গীত রচনা করিয়া দেওয়া এমত নহে; অথচ গান করণ মাত্রেই রাগ রাগিনীর রূপ অবিকল বুঝাইতেছে। সঙ্গীত বিদ্যার সমুদয় রাগ ও রাগিনী অতি বিস্তর। কালে কালে তাহার অনেক লোপ হইয়া আসিয়াছে, এক্ষণে যাহা আছে তাহাও অনেকে জ্ঞাত নহে, যাহাই হউক, এই পুস্তকে সঙ্গীতশাস্ত্র সম্মত এবং সঙ্গীতে পণ্ডিতগণের কল্পিত নানা প্রকার রাগ রাগিনীতে গান সকল প্রকাশিত হইল, এতদ্ভিন্ন রাগদ্বয়ে এবং রাগিনীদ্বয়ে মিলাইয়া কতক গীত প্রকাশ করিলাম, আর নির্ঘণ্ট পত্রিকাতে ঐ রাগ এবং রাগিনীর সময় নিরূপণ করিয়া অকারাদি রীতি ক্রমে শ্রেণীবদ্ধ করিলাম, অনুমান করি যে ইহাতে পাঠকবর্গের কিঞ্চিৎ উপকার দর্শিতে পারিবেক।"

অভিব্যক্তি ও জন্মান্তরবাদ।

হিন্দুশাস্ত্র-বর্ণিত সৃষ্টিপ্রকরণ আলোচনা করিলে বুঝিতে পারা যায় তাহা উপরিউক্ত প্রকরণ অপেক্ষা কত বিভিন্ন। ফলতঃ অভিব্যক্তিবাদের সহিত আর্য্যশাস্ত্রের সৃষ্টিবাদের কোনও সম্পর্ক নাই। এমন কি হিন্দুশাস্ত্র-বর্ণিত সৃষ্টিরহস্য একেবারে অভিব্যক্তিবাদের বিরোধী, একথা বলিলে সত্যের অপলাপ করা হয় না। মনুসংহিতার প্রথম অধ্যায়ে সৃষ্টিপ্রকরণ বর্ণিত হইয়াছে। স্বয়ম্ভু

ভগবান প্রথমে অব্যক্ত ছিলেন। তাহার পর তিনি প্রবৃত্ত-বীর্য্য হইয়া এই বিশ্বসংসারকে ক্রমে ক্রমে প্রকটিত করিয়া প্রকাশিত হন।

যোঽসাবতীন্দ্রিয়গ্রাহ্যঃ সূক্ষ্মোঽব্যক্তঃ সনাতনঃ
সর্ব্বভূতময়োঽচিন্ত্যঃ স এব স্বয়মুদ্ভভৌ।

যাঁহাকে কেবল মনের দ্বারা বুঝিতে পারা যায়, যিনি সূক্ষ্ম, অব্যক্ত, সনাতন সেই সর্ব্বভূতময় অচিন্ত্য পুরুষ স্বয়ংই প্রথমে শরীরাকারে উদ্ভব হইয়াছিলেন। তিনি নিজ শরীর হইতে বিবিধ প্রজা সৃষ্টি করিবার উদ্দেশ্যে চিন্তা করিবামাত্র জলের সৃষ্টি করিলেন এবং তাহাতে আপন শক্তি-বীজ অর্পণ করিলেন। সেই বীজ সহস্রাংশুপ্রভ হইয়া একটি অণ্ডে পরিণত হইল। এবং সেই অণ্ডে তিনি স্বয়ং সর্ব্বলোক পিতামহ ব্রহ্মারূপে জন্মপরিগ্রহ করিলেন। ভগবান ব্রহ্মা সেই ব্রহ্মাণ্ডে ব্রাহ্ম্যমানের সম্বৎসর কাল বাস করিয়া পরিশেষে আত্মগত ধ্যান বলে উহাকে দ্বিধা করিলেন। তিনি সেই দ্বিধা-বিভক্ত অণ্ডের ঊর্দ্ধখণ্ডে স্বর্গাদিলোক এবং অধোখণ্ডে পৃথিব্যাদি নির্ম্মাণ করিলেন এবং মধ্যে ব্যোম, অষ্টদিক এবং সলিল-স্থান বা সমুদ্র সৃষ্টি করিলেন।

তাহার পর ভগবান্ ব্রহ্মা পরমাত্ম-স্বরূপ সদসৎ জ্ঞানের আধার মনের সৃষ্টি করিলেন। অবশ্য মনস্ফুরণের পূর্ব্বে অহম্-অভিমানী সর্ব্বকর্ম্মপ্রবর্ত্তক অহঙ্কারতত্ত্ব প্রস্ফুরিত করিয়াছিলেন। আবার অহঙ্কারতত্ত্বের পূর্ব্বে মহত্তত্ত্বের স্ফুরণ হইয়াছিল।

এই অভিব্যক্তির ক্রমই হিন্দুশাস্ত্রের বিশেষত্ব। পাশ্চাত্য বিজ্ঞান যেমন দেহের অভিব্যক্তি লইয়া আলোচনা করিয়াছে—কিরূপে প্রটোজোয়া হইতে ক্রমে ক্রমে সূক্ষ্ম হইতে জটিল দেহবিশিষ্ট জীবের আবির্ভাব হইয়াছে তাহার আলোচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছে, হিন্দুশাস্ত্র সেরূপ শারীরিক যন্ত্রের অভিব্যক্তি প্রসঙ্গ লইয়া অভিব্যক্তির ক্রম অনুসন্ধান করে নাই। চিন্ময় জগতই হিন্দুর জগত। চিৎশক্তির বিকাশ, চিৎশক্তির অভিব্যক্তি, চিৎশক্তির ক্রমোন্নতি—ইহাই হিন্দুশাস্ত্রের প্রতিপাদ্য বিষয়। তাই আর্য্য-স্মৃতিকার ভগবান্ মনু অভিব্যক্তির ক্রম বর্ণনার প্রথমে অহম্‌তত্ত্বের স্ফুরণ হইতে অভিব্যক্তির বর্ণনা করিয়াছেন। বিলাতী দার্শনিক Calderwood সাহেব Darwin ও Wallaceএর অভিব্যক্তিবাদ সমালোচনায় বলিয়াছিলেন যে তাঁহারা কেবল শরীর লইয়াই অভিব্যক্তিবাদের আলোচনা করিয়াছেন। মনের কথা কিছু বলেন নাই।

ভগবান্ মনুর সৃষ্টিতত্ত্বের আরও একটু আলোচনা করিব, তাহা হইলেই বুঝিতে পারা যাইবে যে পাশ্চাত্য অভিব্যক্তিবাদের সহিত প্রাচ্যদর্শনের কোনও

সংশ্রব নাই। যাঁহারা গলাবাজী করিয়া বলেন যে হিন্দুশাস্ত্রে পাশ্চাত্য অভিব্যক্তিবাদের জন্ম, তাঁহারা পাশ্চাত্য অভিব্যক্তিবাদ বা হিন্দুশাস্ত্র ও আর্য্যদর্শন কিছুই বুঝেন না। ভগবান্ মনু বলিয়াছেন যে পিতামহ ব্রহ্মা ক্রমে ক্রমে বিষয়-গ্রহণক্ষম ইন্দ্রিয়াদিদিগকে সৃষ্টি করিলেন। তাহার পর

তেষাস্ত্বয়বান্ সূক্ষ্মান্ ষণ্ণামপ্যমিতৌজসাম্।
সন্নিবেশ্যাত্মমাত্রসু সর্ব্বভূতানি নির্ম্মমে॥

অর্থাৎ তাহাদিগের মধ্যে অনন্ত কার্য্যক্ষম অহঙ্কার ও পঞ্চতন্মাত্র এই ছয়টির সূক্ষ্মতম আত্মাকে তদীয় বিকার ইন্দ্রিয় এবং পঞ্চভূতের সহিত যোজনা করিয়া তিনি দেব মনুষ্য তির্য্যক্ স্থাবরাদি সর্ব্বভূতের সৃষ্টি করিয়াছেন। পৃথিব্যাদি লোক সকলের হিতকামনায় সেই পরমেশ্বর ব্রহ্মা আপনার মুখ, বাহু, উরু ও পদ হইতে যথাক্রমে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র এই চারিবর্ণ সৃষ্টি করিলেন এবং তিনি আপনার শরীরকে দ্বিভাগ করিয়া অর্দ্ধেক পুরুষ ও অপর অংশে নারীর সৃষ্টি করেন। সেই নারীর গর্ভে বিরাট পুরুষ উৎপন্ন হন; সেই বিরাট পুরুষ দুস্তর তপস্যা করিয়া ভগবান মনুর সৃষ্টি করেন। মনু, মরীচি, অঙ্গিরা প্রভৃতি দশজন প্রজাপতির সৃষ্টি করিয়াছেন; সেই দশজন প্রজাপতি আবার সপ্তমনুর সৃষ্টি করেন।

এতে মনূংস্তু সপ্তান্যানসৃজন ভূরিতেজসঃ।
দেবান্ দেবনিকায়াংশ্চ মহর্ষীংশ্চামিতৌজসঃ॥
যক্ষরক্ষঃ পিশাচাংশ্চ গন্ধর্ব্বাপ্সরসোঽসুরান্।
নাগান্সর্পান্সুপর্ণাংশ্চ পিতৄণাঞ্চ পৃথগ্‌গণান্.
বিদ্যুতোঽশনিমেঘাঞ্চ রোহিতেন্দ্রধনূংষি চ।
উল্কানির্ঘাতকেতূঞ্চ জ্যোতিংষ্যুচ্চাবচানি চ॥
কিন্নরান্বানরান্মৎস্যান্ বিবিধাঞ্চ বিহঙ্গমান্।
পশূন্মৃগান্মনুষ্যাংশ্চ ব্যালাংশ্চোভয়তোদতঃ॥
কৃমি-কীট-পতঙ্গাঞ্চ যূকা-মক্ষিক-মৎকুণং।
সর্ব্বঞ্চ দংশমশকং স্থাবরঞ্চ পৃথগ্বিধম্॥

এই দশ প্রজাপতি আবার, মহাতেজস্বী অপর সপ্ত মনুর সৃষ্টি করিলেন এবং যে দেবসমূহকে ব্রহ্মা সৃষ্টি করেন নাই, এমন দেবগণ ও তাহাদের বাসস্থান, অসীম ক্ষমতা সম্পন্ন বহু মহর্ষি, যক্ষ, রাক্ষস, পিশাচ, গন্ধর্ব্ব, অপ্সর, অসুর, নাগ, সর্প, গরুড়াদি পক্ষী এবং পৃথক্ পৃথক্ পিতৃগণ, বিদ্যুৎ, বজ্র, মেঘ, নানাবর্ণ জ্যোতির্দ্দণ্ড, ইন্দ্রধনু, উল্কা, নির্ঘাত অর্থাৎ ভূমি ও অন্তরীক্ষগত উৎপাতধ্বনি, ধূমকেতু, ধ্রুব ও অগস্ত্যাদি নানা প্রকার জ্যোতিঃ পদার্থ, কিন্নর, বানর, মৎস্য, নানা প্রকার পক্ষী, পশু, মৃগ, মনুষ্য ও দুই পংক্তি দন্তবিশিষ্ট জন্তু অর্থাৎ অশ্বাদি,

সিংহাদি হিংস্র জন্তু, কৃমি, কীট, পতঙ্গ, যূক, মক্ষিকা, মৎকুণ, সর্ব্বপ্রকার দংশ মশক এবং বৃক্ষ লতাদি পৃথক্ পৃথক্ স্থাবর—এ সকলই ইহারা সৃষ্টি করিলেন।

আমরা এতদুভয় বর্ণনার মধ্যে কোনটির শ্রেষ্ঠত্ব সপ্রমাণে যত্নবান নহি। আর্য্য দর্শনে প্রজাপতি ও ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টির মধ্যে অনেকে অলীক কল্পনার পরিচয় পাইতে পারেন, পাশ্চাত্য মতের প্রটোপ্লাজম হইতে মনুষ্যের অভিব্যক্তির মধ্যে কেহ কেহ আরব্য উপন্যাসের আজগুবি কাহিনীর আভাস পাইতে পারেন। এ প্রবন্ধে আমাদের বক্তব্য এই যে প্রাচ্য ও আধুনিক পাশ্চাত্য মতে সৃষ্টি-প্রকরণ একেবারে বিভিন্ন। পাশ্চাত্য মতে সামান্য সরল দেহ বিশিষ্ট জীব-শ্রেণী হইতে ক্রমে ক্রমে আধুনিক অসংখ্য জীব পরিপূর্ণ পৃথিবীর সৃষ্টি হইয়াছে। আর্য্য মতে ভগবান প্রথমে ব্রহ্মাকে সৃষ্টি করেন। তিনি নানারূপ গুণ ও ইন্দ্রিয় সৃষ্টি করিয়া একেবারে সকল প্রকারের জীব নির্ম্মাণ করিয়া পৃথিবী জীবপূর্ণ করিয়াছিলেন। পাশ্চাত্য মতে পৃথিবীর জীবের অভিব্যক্তির প্রধান কারণ জীবন-সংগ্রাম। প্রত্যেক জীবের জন্মের দুইটি নিয়ম আছে। প্রথমতঃ প্রত্যেক জীবের পিতামাতার মত আকার প্রকার, জনক জননীর মত রূপ গুণ পাইবার একটা প্রবৃত্তি আছে, দ্বিতীয়তঃ প্রত্যেক জীবের পিতামাতা হইতে বিভিন্ন রূপ গুণ পাইবারও একটা প্রবৃত্তি আছে। সন্তান জনকের মত হয় কিন্তু জনক জননী হইতে একটু পৃথক হয়। জীবন-সংগ্রাম এই পার্থক্য টুকু ফুটাইয়া তুলে, প্রতিদ্বন্দ্বিতায় জীব নূতন গুণটুকুর সদ্ব্যবহার করে। যাহার সেই পার্থক্যে বিশেষত্ব থাকে পারিপার্শ্বিক অবস্থা তাহাকে সাহায্য করে। সেই জীব বাঁচিয়া যায়। এইরূপে পৃথিবীতে নূতন জীবের সৃষ্টি হয়। বলা বাহুল্য, এ নিয়ম আর্য্য দর্শনের কোথাও বর্ণিত হয় নাই। ইহা পাশ্চাত্য জগতের বিজ্ঞান-বিদ্ পণ্ডিতদিগের বর্ণিত নিয়ম।

আজ কাল প্রাচীন আখ্যায়িকা গুলিকে রূপক প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা সর্ব্বত্র দেখিতে পাওয়া যায়। এবং সেই রূপকের ব্যাখ্যার দ্বারা লোকে সকল আধুনিক জ্ঞানের উৎপত্তি প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা করে। সেইরূপে কেহ ব্রহ্মাকে নেবুলা বা মনুকে প্রটোজোয়া বলিতে পারেন। সেরূপ বাতুল তার্কিক-দিগের কথার প্রতিবাদ করিতে যাওয়াও বাতুলতা।

পূর্ব্বে বলিয়াছিলাম এক বিষয়ে অভিব্যক্তিবাদের হিন্দুদিগের ক্রমোন্নতির জ্ঞানের সহিত সামঞ্জস্য হয়। আমাদিগের জন্মান্তরবাদের সহিত ইহার কিঞ্চিৎ সাদৃশ্য আছে। কিন্তু সাদৃশ্য অতি সামান্য, মূল পার্থক্যই অধিক।

হিন্দু পাঠকের সম্মুখে অবশ্য জন্মান্তরবাদের বিশদ বর্ণনা করিবার প্রয়োজন হইবে না। আত্মা প্রথমে মায়াচ্ছন্ন থাকেন, ক্রমশঃ কর্ম্মফলের অনুরূপ দেহ লাভ করিয়া নানারূপ দেহ পরিগ্রহ করেন। মনুষ্য জন্ম লাভ করিবার পূর্ব্বে আমাদের আত্মা নানা যোনি ভ্রমণ করিয়াছেন, কখনও উন্নতিমার্গে অগ্রসর হইয়াছেন কখনও পিছাইয়াছেন। কিন্তু লক্ষ্য একদিকে ক্রমশঃ জ্ঞান অর্জ্জন করিয়া মোক্ষলাভ করিবে।

বলা বাহুল্য, এ মতের সহিত অভিব্যক্তিবাদের বিশেষ পার্থক্য আছে। জন্মান্তরবাদ একটি মাত্র আত্মা লইয়া তাহাকে নানা যোনি ঘুরাইতেছে; অশ্ব হইতে কৃমি করিতেছে, কৃমি হইতে মানব করিতেছে, আবার মানবের আত্মা কর্ম্মফলে বৃক্ষত্ব প্রাপ্ত হইতেছে। ইহাতে জীবশ্রেণীর অভিব্যক্তির কোনও কথা নাই। পিতার অভিব্যক্তির ফল পুত্র সে কথার আভাস নাই। এক একটা আত্মা যুঝিতেছে, নিজের পূর্ণতা পাইবার জন্য ভীষণ জীবিকা-রণে হারিতেছে জিতিতেছে। কেবল যে যোগ্যতমের উদ্বর্ত্তন হইতেছে তাহা নহে। আত্মা কখনও শ্রেষ্ঠতা লাভ করিয়া কর্ম্মফলে অধঃপতিত হইতেছে কখনও আবার নিম্নশ্রেণী হইতে ঊর্দ্ধে উঠিতেছে। ইহাতে জীবন-সংগ্রামে জীবশ্রেণীর উচ্ছেদ বা জীবশ্রেণীর অভিব্যক্তির কোনও সার্থকতা নাই। জন্মান্তরবাদে জীবের ব্যক্তিগত উন্নতি অবনতির নিয়ম বর্ণিত হইয়াছে,ইহাতে জীবশ্রেণীর অভিব্যক্তির কোনও নিয়ম নাই।

শ্রীকেশবচন্দ্র গুপ্ত।

বঙ্কিমচন্দ্রের বাল্যরচনা ও ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের মন্তব্য।

"বঙ্কিমচন্দ্রের বিরচিত কবিতার সুবঙ্কিম ভাব কৌশল সকল অতিশয় সন্তোষজনক, ইনি রূপক বর্ণনা স্থলে নায়কনায়িকার কথোপকথনছলে যে সমস্ত প্রগাঢ় ভাব ব্যক্ত করেন তদ্দৃষ্টে সুপণ্ডিত ভাবুক মাত্রেই প্রীত হইয়া থাকেন। ইনি অতি তরুণ বয়সে অতি প্রবীণ সুরসিক জনের ন্যায় মন হইতে অতি আশ্চর্য্য নূতন নূতন ভাব সকল উদ্ভূত করিতেছেন। এ অংশে ইহার

প্রশংসা বর্ণনে বর্ণাবলী বলহীনা, ফলে এই স্থলে একটী অনুরোধ এই, যে, বঙ্কিম পদ্য রচনায় আর সমুদয় বঙ্কিম করুন, তাহা যশের জন্যই হইবে, কিন্তু ভাবগুলীন প্রকাশার্থ যেন বঙ্কিম ভাষা ব্যবহার না করেন, যত ললিত শব্দে পদ বিন্যাস করিতে পারিবেন ততই উত্তম হইবেক। এবং "এবে, কয়ে, চেনু, গেনু" ইত্যাদি প্রাচীন কবিগণের প্রিয় শব্দগুলীন পরিহার করিতে পারিলে আরো ভাল হয়। অপিচ প্রতিনিয়তই আদিরসের সেবা না করিয়া এক একবার অন্য রসের উপাসনা করা কর্ত্তব্য হইতেছে, তাঁহার পদ্য অস্মদাদির অন্তঃকরণকে প্রেমাভিষিক্ত করিয়া থাকে এজন্য অবিলম্বে আদ্য ছাড়িয়া অপর কোন রসের এক প্রবন্ধ প্রেরণ করিবেন।

শিশির বর্ণনাছলে স্ত্রী পতির কথোপকথন।

লঘু ললিত।

স্ত্রী।

হইয়াছে জল, বড়ই শীতল,
ছুঁইলে বিকল, হইতে হয়।
আগে যে জীবন, জুড়াত জীবন,
সে বন এখন, নাহিক সয়॥
সুখদ মলয়, হইলেক লয়,
এলো হিমালয়, শীতল অতি।
পদার্থ সকল, সমীরণ জল,
কি কাল শীতল, হলো সম্প্রতি॥
সকল শীতল, করয় বিকল,
কিন্তু অপরূপ, নিরখি তায়?
সমস্ত শীতল, প্রতপ্ত কেবল,
বোধ হয় প্রাণ, তোমার গায়॥

পতি।

মোরে নিরন্তর, তব নেত্রকর,
পাবক প্রখর, দাহন করে।
মম দেহোপর, বহ্নি খর তর,
তাই উষ্ণভাব, এ দেহ ধরে॥

স্ত্রী।

কেন বিভাবরী, দীর্ঘ দেহ ধরি
ধরায় বিহরি, রহে এখন।
ত্যজিতে ধরণী, নাচায় রজনী,
বল গুণমণি, শুনি কারণ॥

পতি।

নয়ন মুদিয়ে, থাক ঘুমাইয়ে,
তখনি হেরিয়ে, তোমার মুখ।
সতী বিভাবরী, শশি জ্ঞান করি,
হেরি প্রাণপতি, পায় কি সুখ॥
আছে যতক্ষণ, শশী প্রাণধন,
পাইয়ে রতন, না ত্যজে তায়।
তাই বিভাবরী, পতি বোধ করি,
বহুক্ষণ ধরি, রয় ধরায়॥
কিন্তু লো যেক্ষণে, নিদ্রার ভঞ্জনে,
চাহিয়া নয়নে, উঠ প্রভাতে।
হেরি ও নয়নে, নিশা ভাবি মনে,
কুমুদী সতিনী, পালায় তাতে॥

স্ত্রী।

অতিশয় ঘন, বল কি কারণ,
নিরখি প্রভাতে, এ কুজ্ঝটিকা।
কেন সব হয়, ধূমাকার ময়,
কি ধূম হইল, ধরা ব্যাপিকা॥

পতি।

এবে আর দর্প, না করে কন্দর্প,
তাহার কারণ, শুন ইহায়।
তব নিকেতন, আসিল মদন,
আপন যাতন, দিতে তোমায়॥
কি তব স্থান, হরের সমান,
যে বহ্নি নয়নে, সে ভস্ম হয়।
তাই ধনি তার, শক্তি সে প্রকার,
অবনীতে আর, নাহিক রয়॥
ভস্ম হৈল শর, তার কলেবর,
প্রবল দহনে, দাহন হয়।
দাহনের ধুম, ব্যাপে নভোভুম,
ভ্রমেতে কুআশা, লোকে কয়॥

স্ত্রী।

কি কারণ প্রাণ, শঙ্কর সমান,
মোরে কর জ্ঞান, উন্মত্ত প্রায়।
কোথায় কি মম, হের হর সম,
তোমারে বুঝাতে হইল দায়॥

পতি।

বিবেচনা করি, তোরে প্রাণেশ্বরি,
বলি ত্রিপুরারি, প্রলাপ নয়।
হরের ভূষণ, সব বিলক্ষণ,
তোমার অঙ্গেতে, তুলনা হয়॥
হরের ইন্দুর, সমান সিন্দুর,
শিরেলো তোমার, কি শোভা পায়।
সদা, শিরোপরি, আছ সিঁথিপরি,
তিন ধারা ধরি, গঙ্গা খেলায়॥
স্কন্ধ শিরোপরে, হরের বিহরে,
সদা ফণিবরে, ভীষণ অতি।
বেণী ফণিবর, তব নিরন্তর,
স্কন্ধ শিরোপর, রয় তেমতি॥
যেই মত হরে, কণ্ঠে বিষ ধরে,
তেমতি গরল, তুমিও ধর।
কিন্তু কণ্ঠে নয়, কিছু অধো রয়,
বিশেষিয়া বলি, ও পয়োধর॥
যে গরল হরে, কণ্ঠদেশে ধরে,
কাছে না এনে সে নাশিতে নারে।
কিন্তু পয়োধরে, যে গরল ধরে,
দূর হইতেই, মানবে মারে॥
যদি বল প্রিয়ে, কণ্ঠে না রহিয়ে,
অধোভাগে কেন, গরল রয়।
কণ্ঠে রৈলে তবে, মুখ কাছে রবে,
মুখামৃতে বিষ, নিস্তেজ হয়॥

স্ত্রী।

কি মূঢ় মানব, কোলে নিজ সব,
দুরন্ত পাবক, লয়েছে টানি।
বিশ্বাসঘাতক, সেই সে পাবক,
করিবে দহন, তাহা না জানি॥

পতি।

দোষ দাও পরে, নিজ দোষোপরে,
দৃষ্টি নাহি কর, কি অপরূপ।
আপনি কেমনে, আপন নয়নে,
রেখেছো অনল, কহ স্বরূপ॥

স্ত্রী।

তব প্রেমাধার, রাখিব না আর,
নয়নে আমার, কাল অনল।
দেখ প্রাণধন, মুদিয়া নয়ন,
তাড়াই আগুন, শয্যায় চল॥

পতি।

যদ্যি তুমি প্রাণ, নাহি দিলে স্থান,
কোথায় অনল, যাইবে আর।
পৃথিবীতে আর, স্থান নাহি তার,
তাহে বলী শীত, বিপক্ষ তার॥
যাইবে যথায়, যাইবে তথায়,
দুরন্ত শাত্রব, শীত ধাইয়ে।
এমতে ধরায়, নাহি স্থান পায়,
শেষে জলে যায়, রয় ডুবিয়ে॥
তাই দেখ কাল, নিশা শেষকাল,
উঠে জল হোতে, ধূমের রাশি।
তাই বলি প্রিয়ে, স্থান না পাইয়ে,
হয়েছে অনল, সলিলবাসি॥

শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়,
হুগলি কলেজের ছাত্র।"

'কেরী'-প্রসঙ্গ।

বাঙ্গালা ভাষার সহিত পাদ্রী কেরীর সম্বন্ধ ও তাঁহার পরিচয় স্নেহাস্পদ শ্রীমান্ অমরেন্দ্রনাথ রায় গত তিন সংখ্যা 'অর্চ্চনা'য় পাঠকবর্গকে দিয়া সকলের ধন্যবাদভাজন হইয়াছেন। কেরী সাহেবের নিকট ভারতবর্ষীয় প্রায় সমস্ত দেশ-প্রদেশ উপকৃত, তন্মধ্যে বঙ্গদেশের ন্যায় মহারাষ্ট্র দেশও সমানভাবে ঋণী।

শ্রীরামপুরে কতকগুলি পাদ্রী আসিয়া অবস্থান করেন, কেরী ইহাঁদের অন্যতম। ইংরাজ রাজপুরুষগণ ইহাঁদের নিকট এ দেশীয় নানা ভাষা শিক্ষা করিতেন। শ্রীরামপুরে অবস্থান করিয়া পাদ্রী কেরী ভারতবর্ষীয় চল্লিশটী বিভিন্ন ভাষায় বাইবেলের অনুবাদ ও মুদ্রণ করেন।

বোম্বাই প্রদেশের শিক্ষিত ব্যক্তিবর্গের ধারণা ১৮১২ খৃষ্টাব্দে মুদ্রিত বৈজনাথ পণ্ডিতের "সিংহাসন বত্তিসি" মহারাষ্ট্রীয় ভাষায় "প্রথম মুদ্রিত গ্রন্থ"। কলিকাতা ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল্ হলের বর্ত্তমান তত্ত্বাবধায়ক রায় বাহাদুর বি, এ, গুপ্ত মহোদয়ের বিশেষ অনুসন্ধান ফলে প্রকাশ "১৮০৫ খৃষ্টাব্দে মহারাষ্ট্রীয় ভাষায় ব্যাকরণ প্রকাশিত হয়। উহাই "প্রথম মুদ্রিত পুস্তক"। ১৮১১ খৃষ্টাব্দে মহারাষ্ট্রীয় ভাষায় এবং ১৮২০ খৃঃ অঃ গুজরাতি ভাষায় কেরী সাহেব কৃত বাইবেলের অনুবাদ প্রকাশিত হয়।

১৮০৩ খৃঃ অঃ ১৫ই ডিসেম্বর তারিখে কেরী সাহেব লেখেন—"আমি মহারাষ্ট্রীয় ভাষায় বাইবেলের অনুবাদ করিতেছি, যিনি আমাকে সাহায্য করিতেছেন তিনি একজন মহারাষ্ট্র দেশীয় ব্যক্তি। আমি ইতিমধ্যেই কতকগুলি অধ্যায় অনুবাদ করিয়াছি। সমস্ত রকমের অক্ষরগুলির 'টাইপ' আমরা এখানে ঢালাই করিয়া লইতে পারিব।"

১৮০৭ খৃঃ অঃ কেরী সাহেব লিখেন—"মহারাষ্ট্র প্রদেশের শিক্ষিত ব্যক্তিরা দেবনাগরী অক্ষরে বিশেষ ব্যুৎপন্ন থাকিলেও, ব্যবসায়ীদের মধ্যে একপ্রকার ছোট অক্ষরের প্রচলন আছে যাহার আকার নাগরী হইতে অনেক পৃথক। এই ছাঁচে আমরা অক্ষর ঢালাই করিয়াছি এবং 'মহারাষ্ট্র

নূতন সমাচার' (Mahratta New Testament) ও একখানি মহারাষ্ট্রীয় অভিধান মুদ্রিত করিতে আরম্ভ করিয়াছি। উড়িয়া ভাষার অক্ষরের সহিত ইহার ঢালাই ও নির্ম্মাণের ব্যয় প্রায় সমান।" কেরী সাহেব নিম্নলিখিত মহারাষ্ট্রীয় গ্রন্থগুলি প্রকাশ করেন—

1. মহারাষ্ট্রীয় ভাষার ব্যাকরণ (A Grammar of Mahratta Language by Dr. Cary published at Sirampore in 1805)

2. সেণ্ট মেথু (St. Mathew) ১৮০৫ খৃঃ অঃ।

3. বাইবেল (Holy Bible 5 Vols.) ... ১৮০৭—১৮২১।

4. নূতন সমাচার ২য় সংস্করণ (New Testament 2nd Edin) ১৮২৪

ইহা হইতেই দৃষ্ট হইবে মহারাষ্ট্রীয় ভাষার ব্যাকরণই "প্রথম মুদ্রিত পুস্তক"। নিম্নলিখিত সপ্তরথীর নিকট মহারাষ্ট্রীয় ব্যক্তিবর্গ চিরকৃতজ্ঞ— (১) লর্ড ওয়েলেশলী (২) উইলিয়ম কেরী (৩) স্যর সি, উইলকিন্স্ (৪) পণ্ডিত মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার (৫) কর্ম্মকার পঞ্চানন (৬) তস্য সহকারী মনোহর (৭) পণ্ডিত বৈজনাথ।

শ্রীরামপুর প্রেস—বাঙ্গালা-ব্যাকরণের অক্ষরগুলি স্যর সি, উইল্‌কিন্স্ (Sir C. Wilkins) বিশেষ যত্ন ও অধ্যবসায়ের সহিত প্রস্তুত করান। তিনি বঙ্গদেশের 'ক্যাক্স্‌টন্' (Caxton) উপাধি লাভের উপযুক্ত। তিনি পঞ্চানন নামক একজন বাঙ্গালী কর্ম্মকারকে 'টাইপ-কাটা' শিক্ষা দেন। মনোহর নামক পঞ্চাননের একজন শিক্ষানবীশ ভারতবর্ষীয় সমস্ত ভাষার অক্ষর নির্ম্মাণ করেন এবং তদ্দ্বারা সর্ব্বপ্রদেশের সাহিত্যের প্রভূত উপকার সাধন করেন। ১৮০১ খৃঃ অঃ রাজা প্রতাপাদিত্যের জীবন-চরিত প্রকাশিত হয়। ইহাই বাঙ্গালা গদ্যে মুদ্রিত আদি গ্রন্থ।

পাদ্রী কেরীর খৃষ্টধর্ম্ম-প্রচারে এদেশে ব্যক্তিদের ধর্ম্মে আঘাত লাগিবে বিবেচনা করিয়া মহামান্য ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী কর্ত্তৃক কেরী সাহেব নির্ব্বাসিত হন। তিনি কয়েক দিবস রামবাগানের বিখ্যাত 'দত্তের বাটী'তে লুকাইয়া থাকেন তৎপরে শ্রীরামপুরে ডচ্ গবর্ণমেণ্ট তাঁহাকে আশ্রয় দেন। যদি তিনি এই আশ্রয় না পাইতেন এবং ভারত ত্যাগ করিয়া যাইতেন, তাহা হইলে আমরা তাঁহার অমূল্য সহায়তা হইতে বঞ্চিত থাকিতাম!

শ্রীকৃষ্ণদাস চন্দ্র।

হরু ঠাকুর *

(ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত রচিত।)

৺হরেকৃষ্ণ ঠাকুর, যিনি হরুঠাকুর নামে সর্ব্বত্র বিখ্যাত ছিলেন। ইনি মহানগর কলিকাতার সিমুলিয়া নিবাসী ৺কল্যাণচন্দ্র দীর্ঘাড়ির পুত্র। যৎকালে ইহাঁর যজ্ঞোপবিত হয়, তৎকালেই ইনি দৈবশক্তি দেবীর কল্যাণে কবিতা রচনা করণে প্রবৃত্ত হয়েন। ক্রমে যত অভ্যাসের সঙ্গে সঙ্গে বয়সের আধিক্য হইতে লাগিল, ততই উত্তর উত্তর শক্তির উন্নতি হইল। হরু ঠাকুরের পিতা কল্যাণ-চন্দ্র দীর্ঘাড়ি প্রতিবাসিদিগের মধ্যে বিশেষ একজন গণ্য ও মান্য ছিলেন না। কিন্তু সৎকর্ম্ম করিয়া সদাচার দ্বারা সামান্যরূপে সংসার নির্ব্বাহ করিতেন। হরু ঠাকুর স্বীয় ক্ষমতা ও গুণের প্রভাবে স্বয়ং খ্যাতি ও প্রতিষ্ঠা লাভ করত সর্ব্বপ্রিয় ও মান্য হইয়াছিলেন। এ বিষয়ে তাঁহার সম্ভ্রম ও গৌরবের কথা অধিক কি উল্লেখ করিব, তিনি অতি অল্প দিবসের মধ্যেই আপনার সংগীতে গুরু, লঘু প্রভৃতি প্রাচীন কবিকদম্বের উচ্চ নাম প্রচ্ছন্ন করত আপামর সাধারণ সর্ব্ব সমাজে পূজ্য হইয়া ঠাকুর শব্দে বাচ্য হইলেন।

এই ঠাকুরটী ৭৫ বৎসরের অধিক কাল ইহ সংসারে বিচরণ করিতে পারেন নাই। এবং যে সময় তিনি মানবলীলা সম্বরণ করেন অদ্য দিবস হইতে সেই সময়ের গণনা করিলে বোধ করি ৪০ বৎসরের উর্দ্ধ না হইবে বরং কয়েক বৎসর ন্যূন হইতে পারে। ইনি সংস্কৃত অথবা ইংরাজী কিছুই অভ্যাস করেন নাই, অথচ বুদ্ধির কৌশলে এরূপ ভাব ভঙ্গি প্রকাশ করিতেন, যে, সেই বাহ্য ব্যাপার দৃষ্টে ভাবতেই তাঁহাকে উক্ত উভয় বিদ্যায় বিশেষ পারদর্শী বলিয়া জ্ঞান করিতেন। প্রধান প্রধান অধ্যাপক মহাশয়েরা তাঁহাকে অধ্যাপক শ্রেণী মধ্যে গ্রাহ্য করিতেন। এবং তিনি অনেকানেক স্থানে ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদিগের সহিত তুল্যরূপে গাড়ু, ঘড়া প্রভৃতি বিদায় লইয়াছেন।

হরু অতিশয় সুগায়ক ছিলেন। কবিতা সকল যেমন উত্তমরূপে রচনা করিতেন, সেইরূপ আবার তৎসমুদয় অতি সুমধুর সুরে ও যথাযোগ্য রাগ রাগিণীতে সংযুক্ত করত সংগীত দ্বারা লোকের চিত্ত হরণ করিতেন। তাঁহার কণ্ঠ বিগলিত সুধাস্বরে ভাবতেই মোহিত হইয়াছেন।

---

* ১লা পৌষ ১২৬১ সালের 'সংবাদ প্রভাকর' হইতে উদ্ধৃত।

ইহাঁর বয়ক্রম যখন ৮।১০ আট দশ বৎসর,তখন সখের দলে জিল দিতেন। এবং কবিতার দুই একটি পদ পূরণ করিতেন। পরে যৎকালে ১৫।১৬ পঞ্চদশ বা ষোড়শ বর্ষ বয়স হইল তৎকালে সখের দলের উপর স্বয়ং প্রাধান্য প্রকাশ পূর্ব্বক স্বরচিত সুর ও গান দ্বারা শ্রোতৃবর্গের মন আকর্ষণ করিতে লাগিলেন। এবং যে সময়ে যে কবিতা রচনা করিতেন তাহা রঘুনাথ দাসের দ্বারা সংশোধন করিয়া লইতেন। আর মধ্যে মধ্যে বিনা বেতনে রঘুর দলে গাহনা করিতেন। কিন্তু কবিতা কল্পে তাঁহাকে বড় অধিক কাল রঘুর সাহায্য গ্রহণ করিতে হয় নাই, কারণ পরমেশ্বরের পরিপূর্ণ অনুকম্পায় তিনি সংক্ষেপ সময়ের মধ্যেই গুরুর নিকট এমত গুরু হইলেন যে, গুরু হইয়াও রঘু তাঁহার নিকট লঘু হইল। কিন্তু হরু অত্যন্ত কৃতজ্ঞ ও সজ্জন ছিলেন, এজন্য গুরুর গুরুত্ব রক্ষা করিয়া নিজ লঘুত্ব প্রচারে ক্রটি করেন নাই। অর্থাৎ প্রথমাবধি শেষ পর্য্যন্ত যে যে গীত প্রস্তুত করিয়াছেন, তাহাতে আপন নাম গোপন রাখিয়া সর্ব্বশেষে রঘুর নামে ভণিতা দিয়াছেন। আমরা অদ্যাবসরীয় প্রভাকরে এই মহাশয়ের প্রণীত যে কয়েকটী গানের সংপূর্ণাংশ প্রকাশ করিলাম* যিনি তৎপ্রতি নয়নান্ত-পাত করিবেন, তিনি তাহাতে রঘুর নামের ভণিতা দেখিতে পাইবেন।

হরু ঠাকুর কখনই কোনরূপ বিষয় কর্ম্ম করেন নাই, বাল্যকালে কেবল আমোদ প্রমোদ, পরে সংগীত ব্যবসায় দ্বারা উপজীবিকা নির্ব্বাহ পূর্ব্বক সমস্ত সময় সম্বরণ করিয়াছেন। ইনি পূর্ব্বে "সৌখিন্" ছিলেন, কাহারো স্থানে কপর্দ্দক মাত্র গ্রহণ করেন নাই। শেষে নানা গতিকে অভাব বশতঃ ধনের নেশায় পেসায় প্রবৃত্ত হইলেন। মহামান্য মহারাজ নবকৃষ্ণ বাহাদুর কর্ত্তৃক ইহাঁর "সৌখীনত্ব" রূপ সতীত্ব সংহার হয়। অর্থাৎ মহারাজের অধিক অনুরোধ ও আশ্বাস বাক্য এবং দানের বশ হইয়া ইনি ধনাগম তৃষা কৃশা করিতে পারিলেন না।

কোন পর্ব্বাহ রজনীতে হরু ঠাকুর পেসাদারি দলে সখ করিয়া সংযুক্ত হইয়া উক্ত নৃপতির নিকেতনে গাহনা করত সর্ব্বতোভাবেই রাজার মন প্রফুল্ল করিয়াছিলেন, রাজা তচ্ছ্রবণে অতিশয় আনন্দ-পরবশ হইয়া ঠাকুরকে পারিতোষিক অর্থাৎ বকসিস্ স্বরূপ এক যোড়া সাল প্রদান করেন। হরু তাহাতে অপমান ও লজ্জা বোধ করত অভিমানে ম্লান ও ক্ষুব্ধ হইয়া তৎক্ষণাৎ সেই সাল ঢুলির মস্তকে অর্পণ করিলেন। মহারাজ তদ্দৃষ্টে চমৎকৃত হইয়া অথচ কিঞ্চিৎ রাগত

* স্থানাভাববশতঃ গানগুলি উদ্ধৃত করা হইল না।

হইয়া "ঐ গায়ককে এখানে নিয়ে আয়, নিয়ে আয়" পুনঃ পুনঃ এতদ্রূপ উল্লেখ করাতে ঠাকুর অতিশয় ভীত হইয়া পলায়ন করণের উদ্যোগ করিয়াছিলেন, কিন্তু পলাইতে পারেন নাই, অত্যন্ত ত্রাসিত ও কম্পিত কলেবর হইয়া রাজ সমীপে উপস্থিত হইলেন। রাজা তাঁহাকে ব্রাহ্মণ দেখিয়া ক্রোধ ভাব পরিহার পূর্ব্বক সবিশেষ পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলেন, হরু আত্ম বিবরণ জ্ঞাত করিলে মহামতি শোভাবাজারপতি অতি সন্তোষচিত্তে তাঁহার প্রতি প্রীতি পূর্ব্বক নিজ নামে দল করিতে উপরোধ করিলেন, হরু সেই অনুমতির অধীন ও লোভাধীন হইয়া কাযে কাযে সমাজের মাঝে লাজের মাথায় বাজের আঘাত করত রাজের অনুরোধ রক্ষা করিলেন। গোষ্ঠীপতি নৃপতি দলপতির আদেশে দল করিয়া দলপতি হইলে সেই ধ্বনি যে ধনির কর্ণকুহরে প্রবিষ্ট হইল তিনিই তাঁহাকে যত্ন পূর্ব্বক আহ্বান করত আপন বাটীতে গাহনার নিমিত্ত অর্থ দিয়া বাধিত করিতে লাগিলেন। এবম্প্রকারে ক্রমে ধনাঢ্যদিগের আগার মাত্রেই তাঁহার দলের বায়না হইতে লাগিল। কিন্তু তিনি বিশেষ বিশেষ পর্ব্বাহে রাজবাটী ভিন্ন অন্যত্র বায়না লইতে পারিতেন না।

মহারাজ নবকৃষ্ণ বাহাদুর হরু ঠাকুরকে অত্যন্ত স্নেহ করিতেন, তিনি ইঁহার গান ভিন্ন অন্যের গান প্রায় শুনিতেন না। প্রকৃত একজন গোঁড়া ছিলেন বলিলেই হয়। আপনার মনোগত ভাব সকল ব্যক্ত করিয়া সেই সেই ভাবে গান সকল রচনা করিতে অনুরোধ করিতেন, ঐ সমুদয় পুরুষোক্তি গান শ্লেষ ও ব্যঙ্গে পরিপূর্ণ হইত, তাহাতে মহিষীগণের উপর ইঙ্গিত থাকিত।

হরু ঠাকুরের এই একখানা প্রধান ক্ষমতা ও শক্তি ছিল, যে কোন ব্যক্তি যে কোন সময়ে যে কোন কথা প্রশ্ন স্বরূপ প্রদান করিতেন, তিনি তৎক্ষণাৎ সেই পদ বা সেই কথাটি উপলক্ষ করিয়া তাহাতে পাঁচ সাত অন্তরা গান প্রস্তুত করিতেন। যথা,—

প্রশ্ন

"পীরিতি নাহি গোপনে থাকে।

পূরণ

পীরিতি নাহি গোপনে থাকে।
শুনলো সজনি বলি তোমাকে।
শুনেছ কখনো, জ্বলন্ত আগুনো
বসনে বন্ধনো করিয়ে রাখে॥"

ইত্যাদি

তথা।

"তোমার আশাতে এ চারিজন!

পূরণ

তোমার আশাতে এ চারিজন।
মোরো মনো প্রাণো শ্রবণো নয়ন।
আছে অভিভূতো হয়ে সর্ব্বক্ষণ
দরশো, পরশো, শুনিতে সুভাষো,
করিতেছে আরাধন।" ইত্যাদি

প্রায় এই প্রকারেই অধিকাংশ গীত পূরণ করিতেন। সিমুলিয়ার ঠঠনে নিবাসী ৺রামশঙ্কর ঘোষ মহাশয় সর্ব্বদাই আপনার অভিপ্রায়ানুযায়ি প্রশ্ন প্রদান করিতেন। সেই সকল প্রশ্ন পূরিত গানের অধিকাংশই আমরা অদ্য প্রকটন করিলাম। হরু উক্ত ঘোষ মহোদয়ের অত্যন্ত প্রিয় ছিলেন। রাজভবনে এবং উক্ত ঘোষের গৃহে যত অধিক বার সংগীত সংগ্রাম করিয়াছিলেন, এত অধিক কাল আর কোন খানেই করেন নাই।

কি 'ভবানী' বিষয়, কি 'সখীসংবাদ', কি 'বিরহ', কি 'খেউড়' কি 'লহর' হরু সকল প্রকার গান রচনা করণেই নিপুণ ছিলেন। কিন্তু 'ভবানী' বিষয় তাদৃশ উত্তম হইত না, হরুর সখীসংবাদ ও বিরহের পরিচয় পশ্চাদ্ভাগেই প্রকাশ হইল. সুতরাং বাহুল্য করিয়া লিখিবার প্রয়োজন করে না। ইনি খেউড় এবং লহর গানের বিষয়ে সর্ব্বাপেক্ষাই বিখ্যাত ছিলেন, যখন যাহা রচনা করিতেন তখন তাহাই অতি আশ্চর্য্য হইত, তাহাতে কত বিদ্যা, কত গুণপণা এবং কত শব্দ ও ভাবের কৌশল প্রকাশ করিতেন তাহা লিখিয়া কি ব্যক্ত করিব? কিন্তু দুঃখের বিষয় এই, যে, অতি জঘন্য, অতি ঘৃণিত, অশ্রাব্য, অবাচ্য শব্দে পূরিত হইত, এ কারণ তাহা কোন প্রকারেই প্রকাশ করা বিধেয় নহে। যখন তাহার নাম করিতে হইলেই রাম বলিয়া ঘাম নির্গত করিতে হয়, ভূত প্রেত প্রভৃতি কর্ণে হস্ত দিয়া কোথায় প্রস্থান করে, তখন আমরা কি প্রকারে তাহা পত্রস্থ করিতে পারি। পূর্ব্বকার অতি প্রধান প্রধান মহিমান্বিত অর্থাৎ মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র রায় বাহাদুর, নবকৃষ্ণ বাহাদুর প্রভৃতি উচ্চ লোকেরা এবম্ভূত অদ্ভুত সকার বকারে অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইতেন, আমোদের পরিসীমা থাকিত না। জ্ঞাতি, কুটুম্ব, স্বজন, সজ্জন, পরিজনে পরিবেষ্টিত হইয়া গদগদ চিত্তে শ্রবণ করিতেন। ইহার বাহুল্য ব্যাখ্যা আর কি করিব? রাজা নবকৃষ্ণ বাহাদুরের হরু ঠাকুরের লহর এবং রাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায় বাহাদুরের শান্তিপুর নিবাসি লোচন খড়্কির কৃত "এতকাল্ কি কোরে মলেম্, আইবড়ো কপালে বিয়ে হোলোনা রে" ইত্যাদি কবিতা দ্বারা অনেকেই অবগত আছেন।

রাজা নবকৃষ্ণ বাহাদুর যৎকালে "নগর কীর্ত্তন" করেন, তৎকালে হরু ঠাকুর এই নাম প্রস্তুত করিয়াছিলেন; যথা।

"হরি বোল্ বলিয়ে প্রাণো যাবে।
আমার এমন দিন কি হবে॥
অন্তিম সময়ে বন্ধুগণে, আমার
শ্রবণে হরিনাম শুনাবে।
পুরাণে শুনেছি করুণাময়ো,
হরি আমায় কি করুণা করিবে॥"

ইত্যাদি

তথা।
হরি নাম লইতে অলসো কোরো না,
রসনা যা হবার তাই হবে।
ভবেরো তরঙ্গ বেড়েছে বোলে কি,
ঢেউ দেখে না ডুবাবে ॥”
ইত্যাদি

এই দুইটী নাম কি মনোহর! কি মোহহর! কি মোহকর! শ্রবণ অথবা কীর্ত্তন করণমাত্রেই অশ্রুপতন ও লোমাঞ্চ হইতে থাকে। অতি মূঢ় পাষণ্ড ব্যক্তিরো হৃদয় আর্দ্র হয়। আবাল বৃদ্ধ বণিতা মাত্রেই মুগ্ধ হইতে থাকেন। সকলেরি অন্তঃকরণে প্রেমের উদয় হয়। সকলেই চমকিত হইয়া মরণ স্মরণ করত মনের সমুদয় মোহ বিকার হরণ পূর্ব্বক ভাব ভক্তি ও জ্ঞানের প্রভাবে মরণ হরণ চরণ স্মরণ করিতে থাকেন। যেখানে যে বাঙ্গালি মহাশয় বিরাজ করিতেছেন, তিনি সেইখানেই বিশেষ বিবেকের অবস্থায় এই নাম সংকীর্ত্তন কীর্ত্তন করিয়া থাকেন। এই নাম কত ভিক্ষুকের উপজীব্য হইয়াছে তাহার সংখ্যা হয় না। কি ইতর কি ভদ্র, তাবতেই এতৎ গানে প্রেমিক হইয়া থাকেন, ইহার মধ্যে কি এক নিগূঢ় মধুরত্ব আছে, তাহা আমি বচনে ব্যক্ত করণে অশক্ত হইলাম।

ভবানে বেনে ও নীলু ঠাকুর, ভোলা ময়রা প্রভৃতি প্রথমে হরু ঠাকুরের দলে জিল দিত। পরে দোহার অর্থাৎ গায়কের পদে নিযুক্ত হয়। এইরূপে কিছু দিন গত করিয়া সকলে ভিন্ন ভিন্ন রূপে স্ব স্ব নামে দল স্থাপন করিলেন। তৎকালে হরু সকলকেই গীত ও সুর প্রদান করিতেন। অতি অল্প দিবস পরেই ভবানে বেনে রামজির অনুগত হইয়া তাহারি নিকট গীত লইতে আরম্ভ করিল, সর্ব্বশেষে রাম বসুর আশ্রিত হইয়া সমূহ সুখ্যাতি সংগ্রহ করিল।

হরু ভোলা ময়রাকে মনের সহিত ভাল বাসিতেন, এজন্য নীলুর পক্ষে পক্ষপাত করিয়া! তাহাকেই ভাল ভাল গান ও ভাল ভাল সুর গুলীন প্রদান করিতেন। এবং ভোলা জয়ী হইলেই অত্যন্ত তুষ্ট হইতেন, একারণ নীলু তাঁহার আশ্রয় পরিত্যাগ পূর্ব্বক কৃষ্ণমোহন ভট্টাচার্য্য, রাম বসু, গৌর কবিরাজ ও রামসুন্দর রায়ের শরণ লইলেন এবং তাঁহারদিগের প্রদত্ত অস্ত্রের বলে হরু গুরুর সহিত যুদ্ধ দিতে আরম্ভ করিলেন, সেই সমস্ত গীত যুদ্ধে অনেক রহস্য হইয়াছিল। আমরা সময়ক্রমে তদ্বিস্তারিত উল্লেখ করিতে কখনই ত্রুটি করিব না।

এক রাত্রি রাজা নবকৃষ্ণ বাহাদুরের বাটীতে নীলু ও ভবানে প্রভৃতির দল হরু ঠাকুরের উপর কয়েকটি শ্লেষোক্তি ছেড়ের খেস্‌সা গান গাহিয়া আসর

অত্যন্ত সরগরম করিয়া তুলিল, তৎশ্রবণে সকলের মুখ হইতে খল খল শব্দে হাস্য নির্গত হইতে লাগিল, এবং সকলেই ভাবিলেন হরু ঠাকুর ইহার উত্তর করিতে পারিলেন না। পরে হরু উঠিয়া যখন তাহার সদুত্তর প্রদান করিলেন, তখন সেই সমস্ত ব্যক্তি তদপেক্ষা শত গুণে সন্তুষ্ট হইয়া সাধুবাদ প্রদান করিতে আরম্ভ করিলেন। ৯০ বৎসর বয়স্ক কোন প্রাচীন ব্যক্তির প্রমুখাৎ সেই উত্তর গীতের কেবলমাত্র গহড়াটি শ্রবণ করিয়া নিম্নভাগে প্রকাশ করিলাম।

যথা।

"মহারাজ এখন যে যা ইচ্ছে করুন্।
সব এই মুগুড়ের গড়া।
এখন যে যা ইচ্ছে করুন্।
কেউ মারুন্ বা দশ কোষি পাল্লা,
দরিয়া টোপ্‌কে পড়ুন।"

ঐ গানের সমুদয় শুনিতে পাইলে পাঠকগণ বিশিষ্ট রূপেই তুষ্ট হইতেন।

রাজা নবকৃষ্ণ যত দিবস জীবিত ছিলেন, তত দিবস হরু ঠাকুর আপন দল রক্ষা করিয়া আপনিই গান গাহিতেন। পরে যে দিবস উক্ত মহাত্মা ইহলোক হইতে অপসৃত হইলেন, সেই দিবসেই তিনি এককালীন শপথ পূর্ব্বক দল ও গাহনা পরিত্যাগ করিলেন। দল স্থাপিত রাখিয়া তাঁহাকে গাহাইবার নিমিত্ত কত ভাগ্যধর ব্যক্তি কত প্রকার লোভ দেখাইয়াছিলেন তিনি কিছুতেই সেই লোভের বশীভূত হয়েন নাই। মহারাজ রাজকৃষ্ণ বাহাদুর বিস্তর অনুরোধ করেন, তাহাতে সম্মত না হইয়া এই উত্তর করিলেন যে "মহাশয়ের পিতার নিকট আমি লজ্জাশূন্য হইয়া যে প্রকার ব্যবহার করিয়াছি, আপনার নিকট কদাচ সে প্রকার করিতে পারিব না।" এই বাক্যে তাঁহাকে নিরুত্তর করিয়া ক্ষান্ত হইলেন।

হরু ঠাকুর এক বিবাহ করেন, সেই বিবাহিতা স্ত্রীর গর্ভে এক পুত্র ও দুই কন্যা জন্মগ্রহণ করেন। বহু দিবস হইল সেই পুত্রটি লোকান্তরিত হইয়াছেন। তাঁহার এক বিধবা স্ত্রী এ পর্য্যন্ত জীবিতা আছেন, হরুর দুই কন্যা কয়েকটী সন্তান সন্ততি প্রসব করেন। অধুনা তাঁহারদিগের মধ্যে কেহ কেহ জীবিত আছেন। কিন্তু কিরূপ অবস্থায় দিনপাত করিতেছেন আমরা তদ্বিশেষ বলিতে পারিলাম না। দৌহিত্র সন্তানেরা তাঁহার বাটী ও বিষয়াদি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, কিন্তু সে বাটীতে তাঁহারদিগের কাহাকেই দেখিতে পাই না। ইহাতে বোধ হয় বিক্রয় করিয়া স্থানান্তরে গমন করিয়াছেন।

হরু ঠাকুরের গানের নিমিত্ত আমরা কত যত্ন, কত চেষ্টা ও কত পরিশ্রম করিয়াছি এবং কত স্থানে ভ্রমণ করিয়া কত লোকের উপাসনা করিয়াছি ও এ পর্য্যন্ত করিতেছি তাহা লিখিয়া কি ব্যক্ত করিব? দশ সহস্র মুদ্রা ব্যয় করিলে যে উপকারের কার্য্য না হয়, আমারদিগের কেবল কায়িক ক্লেশ ও মানসিক অনুরাগের দ্বারা সে কার্য্য সুসিদ্ধ হইয়াছে ও হইতেছে। যে যে মহাশয় অপার অনুগ্রহ বিস্তার পূর্ব্বক এ বিষয়ে যথোচিত আনুকূল্য করিতেছেন তাঁহারা অস্ম-দাদিকে জন্মের মত ক্রয় করিয়া রাখিতেছেন, আমরা এ উপকারের প্রত্যুপকার করিয়া তাঁহারদিগের তুষ্টি জন্মাইতে পারি এমত কোন সম্ভাবনাই দেখিতে পাই না।

এই সমস্ত গানে মিলের ও শব্দের যে কিঞ্চিৎ গোলযোগ আছে তাহা কেহ ধর্ত্তব্য করিবেন না, কেবল ভাব অর্থ ও মর্ম্ম গ্রহণ করিবেন। ১০০ এক শত বৎসরের অধিক কাল পূর্ব্বে এরূপ যাহা হইয়াছে তাহাই যথেষ্ট বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে। বিশেষতঃ শুদ্ধ দৈব শক্তি বলে অশিক্ষিত জনের দ্বারা এমত উত্তম রচনা হওয়াতে কে না শ্লাঘার ব্যাপার বলিয়া গ্রাহ্য করিবেন। অদ্য এই অবধি শেষ করিয়া নিম্নভাগে গান গুলীন প্রকাশ করিলাম *।

(মহড়া) আর রাধার অভিমান কে সবে, বিনে কেশবে।
হরি পরিহরি একি অঙ্গে সম্ভবে॥
আমি যে সই গরবিনী, তারি গৌরবে।

(চিতেন) যে বংশীর রব শুনি সদা সর্ব্বক্ষণ।
যেন মৃতদেহে সখি আমার, আসিত জীবন॥
এখনো এ পাপ প্রাণ, রবে কি রবে॥

(অন্তরা) শ্যামের গুণের কথা, শুন প্রাণ সই।
ছল ক্রমে এক দিনো অভিমানী হই॥
(চিতেন) সে মান ভঞ্জনে হরি পেয়ে কত ক্লেশ।
আসি মানো ভিক্ষা করি নিলো, ধরি যোগির বেশ।
সে সবো স্বপনো হোলো তারো অভাবে।"

[এই গীতের বয়স ৭০ বৎসরের † ন্যূন নহে, বরং অধিক হইবে। সেই সময়ের এই রচনাকে অতি উৎকৃষ্টই কহিতে হইবে। আহা! "এখনো এ পাপ প্রাণ রবে কি রবে" এই পদের পারিপাট্য, শব্দ কৌশল ও মধুরতার বিষয় কি ব্যাখ্যা করিব! পরিতাপ এই, ইহার অপরাংশ ও দ্বিতীয় প্রাপ্ত হইলাম না।]—লেখক।

---

* স্থানাভাব বশতঃ গানগুলি এখন উদ্ধৃত করা হইল না। ভবিষ্যতে করিবার ইচ্ছা রহিল।

† অর্থাৎ বর্ত্তমান সময় হইতে ১৩০ বৎসর পূর্ব্বে।

সাময়িক সাহিত্য

সম্রাটবৃন্দের পাঠস্পৃহা *

আমাদের ভূতপূর্ব্ব সম্রাট সপ্তম এডোয়ার্ড সংবাদাদির সংক্ষিপ্ত সারাংশ পাঠ করিতেন। আমাদের বর্ত্তমান মহামান্য সম্রাট কর্ম্মবীর পঞ্চম জর্জ্জ সকল কার্য্য নিজে সম্পন্ন করিতে ইচ্ছুক এবং তিনি প্রধান প্রধান সংবাদপত্রগুলি স্বয়ং পাঠ করেন। তাঁহার বহুমূল্য সময় ও পরিশ্রমের লাঘবের নিমিত্ত অন্যান্য সংবাদপত্রের বিশেষ ও আবশ্যক পাঠ্য-অংশগুলি তাঁহার প্রাইভেট সেক্রেটারী পাঠের পূর্ব্বাহ্নে চিহ্নিত করিয়া রাখেন। তিনি পাঠকালীন কোনও কোনও অংশের মর্ম্মাংশ তুলিয়া রাখেন।

* *
*

জার্ম্মাণ-সম্রাট কইশরের পাঠপিপাসা অতি প্রবল। অত্যল্প সময়ে খুব দ্রুতগতিতে তিনি সংবাদপত্রাদি পাঠ করিয়া থাকেন। জাহাজনির্ম্মাণ, কামাননির্ম্মাণ প্রভৃতি শিল্প এবং যুদ্ধবিষয়ক প্রবন্ধগুলি পাঠ করিতে তাঁহার অসীম অনুরাগ। তিনি রসজ্ঞও বটেন এবং অনেক সময়ে হাস্যরসাশ্রিত সাময়িক পত্রগুলিও পাঠ করেন।

* *
*

অষ্ট্রিয়ার সম্রাট কচিৎ স্বয়ং পাঠ করেন। অন্যে তাঁহাকে পাঠ করিয়া শুনায়। রাজনীতি-আলোচনায় বৃদ্ধ নৃপতির এখনও বিশেষ অনুরাগ দৃষ্ট হয়। তিনি সমর-প্রসঙ্গেও অভিজ্ঞ। শিল্প বা সাহিত্য-বিষয়ে তাঁহার তাদৃশ অনুরাগ নাই।

* *
*

রুষ-সম্রাট জারের একখানি নিজের দৈনিক সংবাদপত্র আছে। কেবলমাত্র তাঁহারই জন্য উহা প্রত্যহ প্রাতে মুদ্রিত হয়। এই পত্রের বিশেষত্ব এই যে পৃথিবীর অন্য কোনও ব্যক্তি ইহা পাঠ করিতে পায় না। দুইখানি মাত্র ইহা ছাপা হয়—একখানি তাঁহার জন্য, অন্যখানি তাঁহার প্রাইভেট সেক্রেটারীর জন্য।

* *
*

ইতালির রাজা সাময়িক পত্রের প্রবন্ধ পাঠ করিতে ভালবাসেন।

* *
*

---

* The San Fransisco Call নামক পত্রে প্রকাশিত।

ডেনমার্কের নৃপতিও ইতালীর রাজার ন্যায় সাময়িক পত্রের প্রবন্ধাদি পাঠ করেন। তিনি বর্ত্তমান সময়ের সাহিত্য-প্রসঙ্গে বিশেষ অভিজ্ঞ ও তাহার আলোচনায় বিশেষ পারদর্শী।

* *
*

স্পেনের নৃপতির ইংরাজীপাঠলিপ্সা প্রবল। ইংরাজী সংবাদ ও সাময়িক [illegible] পাঠাগারে বিশেষভাবে সজ্জিত ও রক্ষিত হয়। 'পাঠ করা' অপেক্ষা 'কার্য্য' করার তিনি বিশেষ পক্ষপাতী এবং রাজ্ঞীই তাঁহাকে আবশ্যক সমাচারাদি জ্ঞাপন করেন।

দিল্লীর সংক্ষিপ্ত ইতিহাস।

"দিল্লী" নামে কত অতীত স্মৃতি হৃদয়-পটে জাগরিত হয়। কত হর্ষ বিষাদ, সুখ দুঃখ, হাসি কান্না, ঐশ্বর্য্য দারিদ্র্য, করুণা নিষ্ঠুরতা, বীরত্ব ও ভীরুতার চিহ্ন দিল্লীর বক্ষে স্তরে স্তরে প্রকটিত রহিয়াছে তাহার ইয়ত্তা নাই। রোমিও লাস্ ও রিমাস্ জন্মগ্রহণ করিবার বহু পূর্ব্বে—রোম নগরের নির্ম্মাণ হইবার শত শত বর্ষ পূর্ব্বে দিল্লী নগরী নির্ম্মিত হয়। কত শত রাজন্যবৃন্দ দিল্লী নগরীতে অপ্রতিহত প্রভাবে শাসনদণ্ড পরিচালনা করিয়াছেন, তাহার বিস্তৃত আলোচনার স্থানাভাব। নিম্নে সংক্ষেপে দিল্লীর কয়েকটি উল্লেখযোগ্য ইতিহাস-সংসৃষ্ট বিষয় মাত্র বর্ণনা করিতেছি।

হিন্দু শাসনাধীন দিল্লী।

পাণ্ডুপুত্র যুধিষ্ঠিরই দিল্লীর সর্ব্বপ্রথম হিন্দু রাজা। খ্রীঃ পূঃ পঞ্চদশ শতাব্দীতে তিনি ইন্দ্রপ্রস্থে একটি সুন্দর ও সুরক্ষিত নগর নির্ম্মাণ করেন। ইন্দ্রপ্রস্থ আধুনিক "পুরাণ কিল্লা" নামক স্থানে প্রতিষ্ঠিত ছিল। এই কিল্লা বর্ত্তমান দিল্লীর এক ক্রোশ দক্ষিণে অবস্থিত। বিভিন্ন সময়ে ভিন্ন ভিন্ন রাজা এই ইন্দ্রপ্রস্থ বা ইন্দ্রপথের নাম-পরিবর্ত্তনের চেষ্টা করিয়া কৃতকার্য্য হন নাই।

যুধিষ্ঠির ধর্ম্মভাবে অনুপ্রাণিত হইয়া দিল্লীর সিংহাসন সমলঙ্কৃত করিয়াছিলেন। তাঁহার মহাপ্রস্থানের পর তদ্‌বংশীয় ত্রিশ জন রাজা দিল্লীর সিংহাসনে উপবেশন করেন। অবশেষে কশুকের মন্ত্রী নিষ্ঠুর, বিশ্বাসঘাতক, অকৃতজ্ঞ কিশর্ভ প্রভুকে হত্যা করিয়া রাজসিংহাসন অধিকার করেন। কিশর্ভের বংশধরগণ ৫০০ শত বর্ষ ব্যাপী দিল্লীতে শাসনকার্য্য সম্পাদন করেন। অবশেষে

এই বংশের লোপ হয়। তদনন্তর গৌতম বংশ ও মৌর্য্য বংশ, দিল্লীতে খ্রীঃ পূঃ পঞ্চদশ শতাব্দী হইতে খ্রীঃ পূঃ ৫৭ শতাব্দী পর্য্যন্ত রাজত্ব করেন। মৌর্য্যবংশের শেষ নরপতি মিলুর অভিপ্রায়ানুসারে দিল্লীর নাম "মিলুপুর" হয়।

৫০ খ্রীঃ পূর্ব্বাব্দে বিক্রমাদিত্য দিল্লীর সিংহাসনে আরোহণ করেন। এই রাজপুত বংশীয়, অসীম প্রতাপশালী নৃপতি শকদিগের দুর্দ্দমনীয় তেজ ও অত্যাচার দমন করেন। তিনি অত্যন্ত বিদ্যোৎসাহী এবং পণ্ডিতের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। দাক্ষিণাত্য হইতে কাবুল পর্য্যন্ত তাঁহার সাম্রাজ্য বিস্তৃত হইয়াছিল, কিন্তু তাঁহার পরলোকপ্রাপ্তির সঙ্গে সঙ্গেই তদীয় রাজ্য খণ্ড বিখণ্ড হয়।

খ্রীঃ পূঃ প্রথম শতাব্দীতে শকেরা ভারতে বিশেষ আধিপত্য বিস্তার করে। শক সেনাপতি কনিষ্ক "শকাব্দা"র প্রচলনকর্ত্তা। এই সমস্ত শকেরা পঞ্জাবে অবস্থিতি করিয়া দিল্লী অধিকারে চেষ্টা করে, এই কারণে সমস্ত এশিয়াবাসীর নিকট এই "শ্বেত হুন" (White Huns) জাতি বিশেষ ভীতিপ্রদ ছিল।

খ্রীষ্টীয় অষ্টম শতাব্দীতে অনঙ্গপাল দিল্লী নগরী পুনর্নির্ম্মাণ করেন। অনঙ্গপালের রাজত্বকালেই প্রকৃতপক্ষে রাজপুতজাতির অভ্যুত্থান হয়। কিন্তু তাঁহার তিরোধানের সঙ্গে সঙ্গেই দিল্লী আবার জনশূন্য হয়। তদনন্তর দ্বিতীয় অনঙ্গপাল দিল্লী নগরীকে পুনর্ব্বার জনমানব-সঙ্কুলিত রাজধানীতে পরিণত করেন।

তুয়ার বংশের শেষ নৃপতি, তৃতীয় অনঙ্গপালের রাজত্বকালে অর্থাৎ ১১৫৪ খ্রীষ্টাব্দে রাজপুত রাজ বিশলদেব দিল্লী অধিকার করেন। কিন্তু প্রজাপতির নির্ব্বন্ধে বিজেতা ও বিজিত এতদুভয় বংশ পরিণয় সূত্রে আবদ্ধ হওয়ায় দিল্লী অনঙ্গপালেরই অধীন থাকে।

১১৯১ খ্রীষ্টাব্দে বিশালদেব ও অনঙ্গপালের পৌত্র পৃথ্বীরাজ দিল্লী শাসন করেন। ইঁহার রাজত্বের পর বীর জাতি রাজপুতদিগের অধঃপতন আরম্ভ হয়। ইতঃপূর্ব্বে প্রায় ৪০০ শত বৎসর ধরিয়া মুসলমানেরা পঞ্জাবে গমনাগমন করিতেছিল। দিল্লী বিজয়ই তাঁহাদের ইচ্ছা ছিল; কিন্তু রাজপুত জাতির বীরত্বে, রণনৈপুণ্যে এতাবৎকাল তাঁহারা দিল্লী-আক্রমণে কৃতকার্য্য হন নাই।

১১৯১ খ্রীষ্টাব্দে সাহাবুদ্দীন দিল্লী আক্রমণ করেন। ইতিহাসে তিনি মহম্মদ ঘোরী নামে পরিচিত। তিনি একজন যোদ্ধা ছিলেন বটে, কিন্তু নিষ্ঠুরতা তাঁহার জীবনকে কলঙ্কিত করিয়াছিল। তাঁহার দিল্লী-আক্রমণ ব্যর্থ হয় এবং তিনি পরাজিত হন।

মহম্মদ ঘোরী পরাজিত হইলেন বটে, কিন্তু দিল্লী-বিজয় সঙ্কল্প তাঁহার

মন হইতে সমূলে উৎপাটিত হইল না। কিছুদিন পরে আর একদল বিশাল সৈন্য সংগ্রহ করিয়া তিনি দিল্লী আক্রমণ করিলেন। এই সময়ে রাজপুত জাতি আত্মকলহে নিমগ্ন ও পূর্ব্ব বিজয়গৌরবে স্ফীত। দিল্লী-সংরক্ষণে তখন তাহারা বিশেষ অমনোযোগী হওয়ায় ধূর্ত্ত মহম্মদ অনায়াসেই দিল্লী অধিকার করিয়া বীরবর পৃথ্বীরাজকে হত্যা করিলেন।

মুসলমান শাসিত দিল্লী।

মহম্মদ ঘোরী সর্ব্বপ্রথম দিল্লী-বিজয় করিলেও আপনাকে দিল্লীর সম্রাট্ বলিয়া ঘোষণা না করিয়া কুতবুদ্দিনকে রাজপ্রতিনিধি নিযুক্ত করিলেন। ১২০৬ খ্রীষ্টাব্দে মহম্মদ ঘোরী নিহত হন এবং তন্মুহূর্ত্তে কুতবুদ্দিন আপনাকে সর্ব্বপ্রথম ভারতের মুসলমান সম্রাট্ বলিয়া ঘোষণা করেন। কুতব শৈশবাবস্থায় তুর্কীস্থান হইতে ক্রীতদাসরূপে আনীত হইয়াছিলেন বলিয়া ইতিহাসে তাহার বংশধরেরা "ক্রীতদাস বংশ" বলিয়া খ্যাত।

কুতবুদ্দিন চারি বৎসর মাত্র দিল্লীর সিংহাসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন, এবং এই অল্প সময়ের মধ্যেই তিনি একজন সুদক্ষ শাসনকর্ত্তা বলিয়া দেশমধ্যে বিশেষ প্রশংসালাভ করিয়াছিলেন। কুতবুদ্দিনের পর তদীয় পুত্র আরাম পিতৃ সিংহাসনে আরোহণ করেন, কিন্তু এক বৎসর রাজত্ব ভোগ করিতে না করিতেই তদীয় ভগিনীপতি আল্‌তামাস্ দিল্লীর শাসনদণ্ড স্বহস্তে গ্রহণ করেন। আল্‌তামাস্ বিশেষ বুদ্ধিমান ও সুদক্ষ শাসক ছিলেন। তিনি ক্রীতদাসরূপে কুতবুদ্দীনের অধীনতায় চাকুরী আরম্ভ করেন, কিন্তু স্বীয় কর্ত্তব্যনিষ্ঠা ও প্রভুভক্তিতে কুতবকে এতদূর মোহিত করেন যে কুতব সানন্দে তাহার করে আপন দুহিতাকে অর্পণ করেন।

মুসলমান শাসকগণের মধ্যে আল্‌তামাসই সর্ব্বপ্রথমে বঙ্গদেশ জয় করেন। তদবধি বঙ্গদেশ দিল্লীর অধীন হয়। ১২২৯ খ্রীষ্টাব্দে বাগদাদের খালিফ আল্‌তামাসকে স্বাধীন নৃপতি বলিয়া স্বীকার করেন। পঞ্চবিংশ বৎসর রাজত্ব করিয়া আপন কন্যা রিজিয়ার হস্তে দিল্লীর ভার অর্পণ করিয়া ১২৩৫ খ্রীষ্টাব্দে আল্‌তামাস ইহলীলা সম্বরণ করেন। আল্‌তামাসের অবশ্য কয়েকটি পুত্র ছিল, কিন্তু তিনি তাহাদের শাসন-দণ্ড-পরিচালনার দক্ষতা বিষয়ে সন্দিহান ছিলেন। পক্ষান্তরে রিজিয়া রাজকার্য্যে তাঁহাকে অনেক প্রকারে সহায়তা করায় তাহার যোগ্যতা সম্বন্ধে বিন্দুমাত্র সন্দেহ না থাকায় তিনি রিজিয়াকেই দিল্লীর সিংহাসনের উত্তরাধিকারিণী বলিয়া নির্দ্দেশ করেন।

রিজিয়ার রাজত্বকালের শেষে বিদ্রোহ উপস্থিত হয়। তিনি স্বয়ং যুদ্ধক্ষেত্রে অবতীর্ণা হন, কিন্তু বাতিন্দার শাসনকর্ত্তা কর্ত্তৃক বন্দী হন। তাঁহাকে তিনি বিবাহ করেন। তদনন্তর রাজ্যোদ্ধারের জন্য ১২৪০ খৃঃ অঃ রিজিয়া পুনর্ব্বার যুদ্ধ করেন কিন্তু পরাজিত ও নিহত হন। রিজিয়ার মৃত্যুর পর ছয় বৎসর যাবত বহরম ও মসৌদের পৌত্র দিল্লীর শাসনকার্য্য সমাধা করেন। তদনন্তর আল্‌তামাসের তৃতীয় পুত্র নাসিরুদ্দীন মহম্মদ সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হন। তিনি অত্যন্ত শান্ত প্রকৃতির ছিলেন; কাজেই তাঁহার রাজত্বের বিংশতি বৎসর তদীয় ভগিনীপতি বল্‌বন্ রাজকার্য্য সম্পাদন করেন। বল্‌বন্ একজন সুদক্ষ শাসক ছিলেন এবং সমস্ত শত্রুগণকে বশীভূতও করিয়াছিলেন, কিন্তু হিন্দুদিগের প্রতি বিদ্বেষ ও অত্যাচারে তাঁহার চরিত্র কলঙ্কিত হইয়াছে।

বল্‌বনের মৃত্যুর পর তদীয় মূর্খ পুত্র কাই খস্‌রু দিল্লীর সিংহাসনে আরোহণ করেন, কিন্তু শীঘ্রই নিহত হন। তদনন্তর কাই কোবাদ সিংহাসনে উপবিষ্ট হন, কিন্তু অল্পদিনের মধ্যে তিনিও নিহত হন।

ইহার পর খিলিজী বংশীয় জালালুদ্দীন রাজমুকুট ধারণ করেন। তিনি বল্‌বনের অধীনে কার্য্য করিতেন। যখন তাঁহার বয়স সপ্ততি বৎসর তখন তাঁহাকে অনিচ্ছাসত্ত্বে সিংহাসনে উপবেশন করিতে হয়। তিনি করুণাপরায়ণ নৃপতি বলিয়া প্রসিদ্ধ ও প্রাতঃস্মরণীয়। জালালুদ্দীন অতি যত্নে তাঁহার ভাগিনেয় আলাউদ্দীনকে শৈশবাবস্থা হইতে লালনপালন করিয়াছিলেন। আলা-উদ্দীন কিন্তু বৃদ্ধ জালালকে নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করিয়া সিংহাসন অধিকার পূর্ব্বক কৃতজ্ঞতার পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করেন। বিংশতি বৎসর দোর্দ্দণ্ড প্রতাপে রাজত্ব করিবার পর ১৩১৬ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহার অনুগত ভৃত্য মালিক তাঁহাকে বিষপ্রয়োগে হত্যা করে। নৃশংস মালিক ইহাতেও প্রীত না হইয়া আলাউদ্দীনের দুইটী পুত্রের চক্ষুরুৎপাটন করে, এবং যদি রাজকর্ম্মচারীবৃন্দ এইরূপ নিষ্ঠুর কার্য্যের প্রতিরোধ না করিত তাহা হইলে বোধ হয় সে আলাউদ্দীনের কনিষ্ঠ দুই পুত্রেরও ঐরূপ দশা করিতে নিরস্ত হইত না।

ইহার পর আলাউদ্দীনের তৃতীয় পুত্র, মবারক শাহ দিল্লীর সিংহাসনে অধি-রোহণ করেন। কিন্তু ইনিও নিষ্ঠুরতা-প্রদর্শনে মালিক অপেক্ষা কোন অংশে ন্যূন ছিলেন না। তিনি তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতার নেত্র-উৎপাটন করেন। ইহাতে খস্‌রু খাঁ কুপিত হইয়া তাহাকে হত্যা করে এবং স্বয়ং অল্পদিনের জন্য দিল্লীর সিংহাসনে উপবেশন করেন। কিন্তু লাহোরের শাসনকর্ত্তা গিয়াসুদ্দীন তোগলক

আসিয়া তাঁহার শিরশ্ছেদ করে। গিয়াস তোগলক-বংশের প্রতিষ্ঠাতা। তিনি একজন তুর্কী দেশীয় ক্রীতদাসের পুত্র। তিনি আধুনিক দিল্লীর নয় মাইল দূরে অবস্থিত তোগলাবাদের দুর্গ নির্ম্মাণ করেন। বস্তুতঃ গিয়াসুদ্দীন যুদ্ধবিগ্রহ অপেক্ষা বিখ্যাত দুর্গাদির নির্ম্মাণ ও সংস্কারে অধিকতর যত্নবান ছিলেন। কিন্তু তাঁহাকেও বহুদিন রাজত্বভোগ করিতে হয় নাই। ১৩২৫ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহার যোগ্য পিতৃভক্ত পুত্র জুনা খাঁ বা মহম্মদ তোগলক তাঁহাকে হত্যা করিয়া সিংহাসনে উপবেশন করে। মহম্মদ তোগলকের বিশেষ চাপল্য ছিল। তিনি চীনদেশ জয়করণ অভিপ্রায়ে তথায় অভিযান প্রেরণ করিয়া ব্যর্থমনোরথ হন। তিনি এতদূর সমরাভিলাষী ছিলেন যে লোকে তাঁহাকে "খুনী শাহ" বা রক্তপিপাসু রাজা বলিত।

১৩৫১ খ্রীষ্টাব্দে মহম্মদ পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হন। তদনন্তর তাঁহার ভাগিনেয় ফিরোজ শাহ দিল্লীর রাজসিংহাসন সুশোভিত করেন। তিনি সদাশয় ও প্রজাবৎসল ছিলেন বলিয়া বোধ হয় ভগবান তাঁহাকে নির্ব্বিবাদে সুদীর্ঘ সাঁইত্রিশ বৎসর রাজ্য সুখভোগ করিবার অবসর দেন। ফেরোজাবাদে তিনি রাজধানী নির্ম্মাণ করেন। এই ফেরোজাবাদের ভগ্নাবশেষ এখনও দিল্লীতে দৃষ্ট হয়। এতদ্ব্যতীত তিনি তৃষ্ণার্ত্ত প্রজার জলকষ্ট নিবারণের জন্য একটি পয়ঃপ্রণালী খনন করেন, বলা বাহুল্য সেই পয়ঃপ্রণালীর সুস্বাদু বারি আজিও লক্ষ লক্ষ প্রজার জলকষ্ট দূর করিতেছে। ৯০ বৎসর বয়ঃক্রমকালে পলিত কেশ ফেরোজ শাহ পৌত্র গিয়াসুদ্দীন তোগলকের হস্তে রাজদণ্ড অর্পণ করিয়া ১৩৮৮ খৃষ্টাব্দে পরলোকগত হন।

গিয়াসুদ্দীনের রাজত্বকালে রাজ্য মধ্যে বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হয়। ফলে অবসর বুঝিয়া তাতার বংশীয় তৈমুরলঙ্গ দিল্লীতে উপস্থিত হইয়া এই মহানগরী বিধ্বস্ত করিয়া ফেলে। বস্তুতঃ তৈমুরের ন্যায় লুণ্ঠনপ্রিয় ও অত্যাচারী আক্রমণকারী পৃথিবীর ইতিহাসে কোথাও দৃষ্ট হয় না। দিল্লী সহর ধ্বংস বিধ্বংস করিয়া এবং তথাকার যাবতীয় মূল্যবান দ্রব্যাদি লইয়া তৈমুরলঙ্গ চলিয়া গেলে সম্রাট্ নাসিরুদ্দীন নস্‌রীত শাহ গুপ্ত স্থান হইতে নির্গত হন। কিন্তু অল্পদিনের মধ্যে তিনি এবং তাঁহার উত্তরাধিকারী মহম্মদ উভয়েই নিহত হন। এইরূপে তৈমুরলঙ্গের আক্রমণে তোগলক বংশের দীপ চিরদিনের জন্য নির্ব্বাপিত হয়।

দিল্লী ইহার পর মহা শ্মশান ভূমিতে পরিণত হয়। এই জনমানবহীন নগরীতে ইহার পর খস্‌রু খাঁ, মবারক, মহম্মদ এবং আলাউদ্দীন প্রভৃতি ক্রমান্বয়ে

রাজত্ব করেন। এই শেষোক্ত রাজার সময়ে বিলোল লোদী নামক জনৈক আফগানবাসী দিল্লী অধিকার করতঃ লোদী বংশের প্রতিষ্ঠা করেন। এবং দিল্লীর সাম্রাজ্য হইতে বহির্ভূত প্রদেশসমূহ পুনরায় জয় করিয়া দিল্লীর নষ্ট গৌরব পুনরায় উদ্ধার করেন। তিনি ধার্ম্মিক, ন্যায়বান এবং বিদ্যোৎসাহী ছিলেন। ৩৮ বৎসর রাজত্ব করিবার পর ১৪৮৮ খৃষ্টাব্দে তাঁহার মৃত্যু হয়।

তাহার পর তাঁহার যোগ্য পুত্র সেকেন্দর লোদী দিল্লীর সিংহাসনে আরোহণ করেন। সেকেন্দর দিল্লীর নষ্ট-শ্রী পুনরুদ্ধার করেন। সেকেন্দর আপন ধর্ম্মে অত্যন্ত বিশ্বাসী ও পক্ষপাতী এবং অত্যন্ত হিন্দু-বিদ্বেষী ছিলেন। ১৫১৮ খৃষ্টাব্দে সেকেন্দার ইহলীলা সংবরণ করেন এবং তদীয় পুত্র ইব্রাহিম লোদী সিংহাসনে উপবেশন করেন। ইব্রাহিম্ই লোদীবংশের শেষ রাজা। তাঁহার বিশ্বাসঘাতকতার জন্য রাজ্যে বিদ্রোহ হয়।

এই সময়ে ১৫২৫ খৃষ্টাব্দে জহরুদ্দীন মহম্মদ বাবর কাবুলের রাজা ছিলেন। তিনি দিল্লী নগরী অধিকার করিবার জন্য তত্রত্য রাজদ্বেষী প্রজাবৃন্দ কর্ত্তৃক আহূত হইলেন। তিনি মাত্র দ্বাদশ সহস্র সৈন্য লইয়া ভারত-আক্রমণ করিলেন। দিল্লীর নিকটে পাণিপথ নামক স্থানে উভয় দলে ভীষণ যুদ্ধ হইল, ফলে বিজয়-লক্ষ্মী বাবরের অঙ্কশায়িনী হইলেন। এই সময়ে রাজপুত জাতিও বাবরকে পরাজিত ও বিতাড়িত করিতে চেষ্টার ত্রুটী করেন নাই, কিন্তু তাঁহারাও অবশেষে পরাজিত হইলেন। বাবরের আত্মজীবনী বিশেষ হৃদয়গ্রাহী। তিনিই ভারতে মোগল-সাম্রাজ্যের ভিত্তি স্থাপয়িতা।

১৫৩০ খৃষ্টাব্দের ২৬শে অক্টোবর তারিখে বাবরের মৃত্যু হয়। তাঁহার পর হুমায়ুন দিল্লীর সিংহাসনে উপবেশন করেন। কিন্তু দুর্দ্ধর্ষ আফগান সের খাঁয়ের অত্যাচারে ছয় বৎসর কাল পলাতক অবস্থায়—এক দেশ হইতে অন্য দেশে ভ্রমণ করিবার পর ১৫৫৫ খৃষ্টাব্দের ২৩শে জুলাই তারিখে স্বরাজ্য পুনরধিকার করেন এবং ১৫৫৬ খৃষ্টাব্দে দিল্লী প্রাসাদের সোপান হইতে পড়িয়া গিয়া এই প্রথিতনামা সম্রাট্ মানবলীলা সংবরণ করিলেন। দিল্লীর বাহিরে তাঁহার সমাধি-মন্দির আছে। এই সমাধি মন্দির নির্ম্মাণ করিতে ষোল বৎসর সময় লাগিয়াছিল। এটি পৃথিবীর মধ্যে অন্যতম শ্রেষ্ঠ "মৌসলিয়েম" বলিয়া পরিগণিত। তৎপরে তদীয় মহিষী হামিদার গর্ভজাত আকবর পিতৃসিংহাসনে আরোহণ করেন। তিনি যখন সিংহাসনে উপবেশন করেন, তখন তিনি বালক মাত্র। কিন্তু তাঁহার বুদ্ধিমত্তা, প্রতিভা, সর্ব্বধর্ম্মে সমদর্শিতা, ঔদার্য্য-

প্রভৃতির গুণে শীঘ্রই রাজ্য মধ্যে সুশৃঙ্খলা স্থাপিত ও মোগল-প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হইল।

১৬০৫ খৃষ্টাব্দে আকবরের মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্র সেলিম দ্বাবিংশতি বৎসর যাবত দিল্লীর সিংহাসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন। সেলিম, জাহাঙ্গীর নামেই বিশেষ পরিচিত। তাঁহার বেগম নূরজাহান অদ্বিতীয় রূপবতী এবং অসীম শক্তিশালিনী মহিলা ছিলেন। তিনিই প্রকৃতপক্ষে রাজকার্য্য পরিচালন করিতেন। জাহাঙ্গীরের রাজত্বকালে দুইটি ঘটনা অনুষ্ঠিত হয়। (১) ১৬১৩ খৃষ্টাব্দে সুরাটে ব্রিটিশ কারখানা নির্ম্মাণ করিবার আদেশ-পত্র দেওয়া হয়। (২) ১৬১৫ খৃষ্টাব্দে স্যর্ টমাস্ রো জাহাঙ্গীরের দরবারে ব্রিটিশ রাজদূত স্বরূপ উপস্থিত হন।

১৬২৮ খৃষ্টাব্দে পিতার মৃত্যুর পর সাজাহান আপনাকে রাজা বলিয়া ঘোষণা করেন। তিনি "সাজাহানাবাদ" নগর নির্ম্মাণ করেন। এই সাজাহানাবাদই বর্ত্তমান দিল্লী। অশীতি বৎসর যাবত মোগলদিগের রাজধানী আগ্রাতেই অবস্থিত ছিল। সাজাহান সেখানে আপনার প্রিয় মহিষী মমতাজ মহলের স্মৃতি অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য "তাজমহল" নির্ম্মাণ করেন। সাজাহান নিজে একজন বড় যোদ্ধা ছিলেন না, তিনি তাঁহার পুত্রদিগকে ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের শাসনকর্ত্তৃপদ প্রদান করিয়াছিলেন। তাঁহার রাজত্বকালে আফগানিস্থান ভারত সাম্রাজ্য হইতে বিচ্ছিন্ন হয়। ১৬৫৮ খৃষ্টাব্দে তাঁহার পুত্র আওরেঙ্গজেব আগ্রা দুর্গে তাঁহাকে বন্দী করিয়া দিল্লীতে প্রবেশ করেন ও স্বয়ং সম্রাট্ হন। ১৬৬৬ খৃষ্টাব্দে সাজাহান বন্দী অবস্থায় প্রাণত্যাগ করেন। আওরেঙ্গজেবের পর বাহাদুর শাহ, ফরক শাহ, মহম্মদ শাহ প্রভৃতি রাজত্ব করেন,কিন্তু অবশেষে নাদির শাহের আক্রমণে, লুণ্ঠনে ও অত্যাচারে দিল্লী নগরী ধ্বংস বিধ্বংস ও শোণিতপ্লাবিত হয়। বলা বাহুল্য, তদবধি মোগল-সাম্রাজ্য-রবি অস্তমিত হয়।

১৭৬০ খৃষ্টাব্দে মহারাষ্ট্রীয়েরা রাজপুত ও জাটদিগের সহায়তায় বলীয়ান্ হইয়া মুসলমানদিগকে ভারত হইতে বিতাড়িত করিতে বদ্ধপরিকর হয়। পাণিপথে উভয় দলে ভীষণ যুদ্ধ হয়, ফলে মহারাষ্ট্রীয় জাতি পরাজিত হয় ও তাহাদের শক্তি ক্ষীণ হইয়া পড়ে।

ব্রিটিশ শক্তির অভ্যুত্থান।

যখন মহারাষ্ট্রী ও মোগল এতদুভয় জাতি রণসমুদ্রে নিমজ্জিত ছিল তখন ব্রিটিশ জাতি ভারতে লব্ধপ্রতিষ্ট হইতেছিল। ১৭৬১ খৃষ্টাব্দে

ভারতবর্ষে মোগল, মহারাষ্ট্র ও ফরাসী এই তিনটি জাতির শক্তিদীপ নির্ব্বাপিত হয়।

এই সময়ে নিহত সম্রাট্ আলমগীরের পুত্র বঙ্গদেশে ইংরেজের বৃত্তিভোগী অবস্থায় অবস্থান করিতেছিলেন। তিনি "শাহআলম" এই উপাধি গ্রহণ করেন এবং ১৭৭১ খৃষ্টাব্দে তিনি দিল্লী প্রত্যাবর্ত্তন করেন। তিনি দ্বাত্রিংশতি বৎসর যাবত মহারাষ্ট্রীয়দের হস্তে কাষ্ঠ-পুত্তলিকার ন্যায় অবস্থান করেন।

১৮০৩ খৃষ্টাব্দে জেনারেল লেক্ ফরাসী সৈন্য ও মহারাষ্ট্রীয়দিগকে পরাজিত করিয়া দিল্লীতে প্রবেশ করিয়া বৃদ্ধ সম্রাট্‌কে নিজের করায়ত্ত করেন।

১৮০৬ খৃষ্টাব্দে সাহ আলম্ মৃত্যুমুখে পতিত হন এবং তৎপুত্র দ্বিতীয় আকবর দিল্লীর সিংহাসনে উপবেশন করেন। তাঁহার পর ১৮৩৭ খৃষ্টাব্দে বাহাদুর শাহ দিল্লীর সিংহাসনে উপবেশন করেন। ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে তিনি সিপাহী-বিদ্রোহের সময় বিদ্রোহীদিগের সহায়তা করার অপরাধে রাজনৈতিক অপরাধী বলিয়া নির্ব্বাসিত হন।

তৎপরে মোগলবংশ-রবি ক্রমে ক্রমে অস্তমিত হয়।

১৮৭৭ খৃষ্টাব্দে মহারাণী ভিক্টোরিয়া দিল্লীতে ভারত-সাম্রাজ্ঞী বলিয়া বিঘোষিতা হন।

১৯০৩ খৃষ্টাব্দে সপ্তম এডওয়ার্ড দিল্লীতে ভারতেশ্বর বলিয়া ঘোষিত হন।

১৯১১ সালে আমাদের বর্ত্তমান মহামান্য সম্রাট্ পঞ্চম জর্জ্জ দিল্লীতে স্বয়ং রাজমুকুট গ্রহণ করেন। তদবধি দিল্লী ভারতবর্ষের রাজধানী।

শ্রীশ্যামলাল গোস্বামী।

লুব্ধ।

(১)

খোড় বড়ি, খাড়া! খাড়া, বাড়, খোড়! সেই একঘেয়ে জীবন। সেই প্রভাতী আশার মধুর স্বর, সারা দিবসের প্রতীক্ষা, আবার সেই সন্ধ্যার নিরাশা। এক দিন নহে, দুই দিন নহে, এক সপ্তাহ নহে, দুই সপ্তাহ নহে, কয়েক বৎসর ধরিয়া জীবনে এইরূপ একটানা ভাটার স্রোত বহিতেছিল। কি কঠোর আকাশ-বৃত্তি! কত প্রতীক্ষা করিলাম, কত চেষ্টা করিলাম, কালীঘাটে কত

পূজা দিলাম, একে একে কত দেবতাকে ডাকিলাম, মা দুর্গার চালচিত্রে যত দেবদেবী আছেন সকলের অর্চ্চনা করিলাম, কিন্তু পোড়া অদৃষ্ট ! কোন ফল ফলিল না। কালীতলায় শিবলিঙ্গের নিকট প্রার্থনা করিবার সময় এক একবার বাসনা হইত মন্দিরের ভিতরে ঢুকিয়া শিবের কঠিন দেহে একবার প্রশস্ত ললাটটা ঠুকিয়া লই।

যদি জীবনের নদীটুকু মজিয়া যাইত তাহা হইলেও একটা নূতন কিছু হইত। এই বারোমেসে একঘেয়ে ভাটার টানের হাত থেকে রক্ষা পাইতাম। তাহা কিন্তু হইত না। ঠিক মাসিক খরচটুকু কায়ক্লেশে উপার্জ্জন করিতে পারিতাম। ভদ্রলোক মক্কেল আসিলেই আশা দিত, বলিত—"এইবার দাঁড়ান্ না, আমার এই মামলা টুকু জিতিয়ে দিন্ না, দেখবেন কি হয়। বাজারে এ অধীনের কি খাতির আছে দেখবেন।" এরূপ আশ্বাসবাণীও একঘেয়ে। বঞ্চনা করিয়া অল্প পারিশ্রমিক দিবার সময় ভদ্রবেশধারী সকল মক্কেলই ঐরূপ কথা বলিত। অনেকে নগদ ফি দিবার সময় আসিলেই বলিত—"এই যে বাবু, দাদা টাকা নিয়ে আসছেন।" দাদা টাকা নিয়ে আসছেন ! অথচ ভ্রাতায় ভ্রাতায় তুমুল সংগ্রাম, পরস্পরের মুখ দেখাদেখি নাই। প্রথম প্রথম তর্ক করিতাম—মক্কেল অপ্রস্তুত হইয়া বলিত—"আজ্ঞে মাসতুতো ভাই।" সকল চোরের মধ্যে পরস্পরের ঐ সম্পর্ক। এখন আর ও কথার প্রতিবাদ করি না—একঘেয়ে কথার একঘেয়ে প্রতিবাদ করিয়া কে শক্তির অপচয় করে ? দালালগুলা বলিত—"বাবু আপনার নাম বাজারময় ছড়িয়ে পড়েছে। একটা গাড়ি ঘোড়া করুন।" হাসিতাম, ভাবিতাম বাজারের লোক আমার অমল যশ সৌরভেই মুগ্ধ হক্। ঘরের অবস্থাও ঐরূপ। শাস্ত্রে আছে বটে—"ইষ্টা ভার্য্যা সুমিত্রং চ অপূর্ব্বাণি দিনে দিনে।" কিন্তু শাস্ত্র মাথায় থাকুন—যাক্ ভদ্রলোকের মেয়ে—তার কথায় কাজ নাই।

(২)

উকীল-সভার আদি ও অকৃত্রিম রীতি-অনুসারে নব্য জুনিয়ার উকীলের দল "রাজা উজীর" মারিতেছিলেন, হাকিমেরা যে প্রত্যেকে মূর্খ এবং নির্ব্বোধ তাহা প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা করিতেছিলেন, প্রত্যেকেই নিজের ঢাকের উপর সবেগে লগুড় পিটিতেছিলেন। আমি একটু আইনের নজির দেখিতেছিলাম। সে দিনটা প্রাণে একটু আনন্দ ছিল, একসঙ্গে বাইশ টাকা উপার্জ্জন করিয়াছিলাম। আহা ! প্রত্যহ যদি এইরূপ হইত !

সবেগে সতিশচন্দ্র গৃহে প্রবেশ করিয়া তারস্বরে বেয়ারাকে ডাকিতে লাগিল। বলা বাহুল্য, দুই চারিজন তাহাকে পরিহাস করিয়া উঠিল। সে বলিল—"ওহে ঠাট্টা না। আজ সেণ্ট লেজারের টাকা পাঠাবার শেষ দিন।"

রমেশ বলিল—এই কষ্টের পয়সা ঐ রকম ক'রে নষ্ট কর্‌তে মায়া হয় না ?

সতিশ বলিল—মায়া কি! এ অবস্থায় দশ টাকা কম আর দশ টাকা বেশীতে কিছু আসে যায় না। না হয় দশ টাকা যাবে। কিন্তু বাবা! একবার মেরে দিতে পারলে যে দু'লাক আড়াই লাক টাকা—নিদেন দু' দশ হাজারও তো হ'বে।

আমি ভাবিলাম—বাস্তবিক দশ টাকা কম বেশী হইলে জীবনের গতি পরিবর্ত্তিত হইবে না। পৃথিবীর সকল স্থান হইতে লোকে এই লটারীর টিকিট ক্রয় করে। সকল টিকিট বিক্রয় হইলে টার্ফ ক্লবের সাহেবেরা লটারী করে। বিলাতের ডার্ব্বী ঘোড়দৌড়ে যতগুলি ঘোড়া থাকে এক দিকে তাহাদের নাম থাকে আর এক দিকে ক্রেতাদের নাম থাকে। ঘোড়ার নামের সঙ্গে অনেক শূন্য টিকিট থাকে। ভাগ্যবান লোকদিগের নামের সহিত ঘোড়ার নামের টিকিট উঠে। তাহার পর বিলাতে ঘোড়দৌড় হয়। তাহাদের মধ্যে আবার যে ঘোড়া প্রথম স্থান অধিকার করে যাহার নামে সেই ঘোড়ার টিকিট উঠিয়াছিল সে প্রায় দুই লক্ষ আড়াই লক্ষ টাকা উপহার পায়। যাহার নামে ঘোড়া উঠে সেই লটারীর উপহার পায়। অবশ্য যাহার ঘোড়ার যত দ্রুত বেগ তাহার লাভের মাত্রা তত অধিক। কে বলিতে পারে একখানা টিকিট কিনিলে আমার নামে একটা বেগবান অশ্ব উঠিবে না—আমিও আড়াই লক্ষ টাকা পাইব না। আনন্দে প্রাণটা নাচিয়া উঠিল। ধীরে ধীরে উঠিয়া সতিশের পার্শ্বে গিয়া দাঁড়াইলাম।

সতিশ মনি অর্ডারের ফরমে লিখিতেছিল। আমি বলিলাম—ওহে আমারও নামে দশটা টাকা পাঠালে হয় না ?

সতিশ জুয়াড়ি। যত রকম লটারী আছে প্রত্যেকটিতেই কষ্টলব্ধ টাকার অসদ্ব্যবহার করে। সঙ্গী পাইয়া তাহার বড় আনন্দ হইল। সে বলিল—নিশ্চয় হয়। দাও না। একখানা কেন, দু চারখানা টিকিট কেনো।

আমি বলিলাম—হ্যাঁ দু' চারখানা! একখানা হয় না আবার দু' চার খানা।

সতিশ বলিল—না না বুঝছ না ? যত বেশী সংখ্যায় টিকিট কিন্‌বে ঘোড়া ওঠ্‌বার আশা তত বেশী থাকবে। এক একটা সাহেব বিশ পঁচিশ খানা ক'রে টিকিট কেনে।

লাইব্রেরীর অপর সভ্যেরা উঠিয়া আসিল। সকলে আমাকে বিদ্রূপ করিতে লাগিল। কেহ কেহ সতিশকে তিরস্কার করিল। একজন মুরুব্বি উকীল বলিলেন—সতিশ তুমি তো বড় বদ্ ছেলে হে! কেন আবার গোবর্দ্ধন বেচারাকে ও কাজে নাচাচ্চো?

সতিশ বলিল—মশায় কে কাকে নাচায়। কার অদৃষ্টে কি আছে কে জানে? হয় তো পাতা-চাপা বরাত। একটু হাওয়া পেয়ে যদি পাতাটা সরে যায়, বাস্—তখন আর গোবর্দ্ধনকে পায় কে? কি বল মাষ্টার গোবর?

একজন "স্বদেশী" উকীল বলিল—মরণ আর কি! ঘরের পয়সাগুলা বিলেতের সাহেব বেটাদের না দিলে নয়? এতে কি আর দেশের ভাল হ'বে?

ভট্টাচার্য্য মহাশয় চুপ করিয়া বসিয়াছিলেন। তিনি বৃদ্ধ—"দন্তবিহীনম্ জাতম তুণ্ডম"—অতি বৃদ্ধ না হইলেও বৃদ্ধ। তাহার উপর তিনি পরম হিন্দু। আমরা সকলে তাঁহাকে অত্যন্ত সম্মান করিতাম। তিনি বলিলেন—ওহে ভায়ারা দ্যূতক্রীড়া বড় গর্হিত। মহারাজা নলের কি হ'য়েছিল মনে নাই? মৃচ্ছকটিকে—আচ্ছা থাক, দেখ একবার অদৃষ্ট পরীক্ষা ক'রে। তবে ভবিষ্যতে সাবধান।

আমি একটু গদ্গদকণ্ঠে বলিলাম—কি জানেন ভট্টাচায্যি মশায়! রাত্রি যখন খুব অন্ধকার হয় তার পরই আলো আসে। অবস্থাটা একটু সঙ্গীন হ'য়ে দাঁড়িয়েছে।

একজন বিদ্রূপ করিয়া বলিল—তা হ'য়েছে বটে, তা না হলে আর ঘরের দশ টাকা ছুঁড়ে ফেলে দিচ্চ।

সতিশ চুপি চুপি বলিল—ওসব কারও কথা শুনো না। তুমি টিকিট কিনে ফেল। ওদের সব হিংসা হয়েছে। বাবা! কেউ কারও ভাল দেখতে পারে না। কলিকাল রে ভাই, কলিকাল! ঘোর কলিকাল!

আমি পকেট হইতে কুড়ি টাকা বাহির করিয়া সতিশের হস্তে দিলাম।

(৩)

জীবনে একটু নূতনত্ব আসিল। প্রতীক্ষা! প্রতীক্ষা তো বহুদিন হইতে করিতেছিলাম। কিন্তু, এ প্রতীক্ষা একটু অধিক উন্মাদক। সামান্য দুই একটা মক্কেলের প্রতীক্ষা নহে—দুই দশ টাকার প্রতীক্ষা নহে—আড়াই লক্ষ মুদ্রার প্রতীক্ষা! হাঃ হাঃ হাঃ! মনে হইলে হৃদয় উৎফুল্ল হইত। আড়াই লক্ষ! কে বলিতে পারে পাইব না? কে বলিতে পারে অদৃষ্টে কি আছে?

আড়াই লক্ষ টাকা! একবার মারিতে পারি—কি ক্ষুদ্র গৃহ,কি সরঞ্জাম, হীন নগ্ন প্রাচীর—কি ভীষণ আম কাঠের তক্তপোষ, জীর্ণ তোষক, ময়লা চাদর। একবার টাকাটা পাইলে হয়—চৌরঙ্গীতে বাসা লইব, সজ্জিত গৃহে থাকিব, স্ত্রীকে মাজিয়া ঘসিয়া, মলিন বাসের পরিবর্ত্তে মূল্যবান পোষাক পরাইব। তখন তাহার স্বাভাবিক সৌন্দর্য্যটা বহুগুণ বর্দ্ধিত হইবে। আবার এক একবার সুখ স্বপ্ন ভাঙ্গিয়া যাইত। ভাবিতাম—ছিঃ ছিঃ বিদ্যাশিক্ষা করিয়া লোকে এত মূর্খ হইতে পারে! "গাছে কাঁটাল গোঁপে তেল"—তাহার মধ্যেও এতটা প্রগাঢ় মূর্খতা নাই। কি নির্ব্বোধের মত সুখস্বপ্ন দেখিতেছি! দিনের শেষে দশ টাকা উপার্জ্জন করিবার যাহার শক্তি নাই তাহার পক্ষে কি বাতুলতা। জুয়াড়ী সতিশের উপর ক্রোধ হইত। তাহার মত পাগলের কথায় কেন কষ্টলব্ধ কুড়ি টাকা জলে ফেলিলাম এক একবার তাহা ভাবিতাম।

একদিন প্রভাতে মক্কেলের প্রতীক্ষায় বসিয়া ঐরূপ সুখস্বপ্ন দেখিতেছিলাম, আবার চমক ভাঙ্গিতেছিল, আবার সুখস্বপ্নের মোহ ঘোরটা আসিয়া উৎফুল্ল করিতে যাইতেছিল। এমন সময় বাড়িওয়ালার দ্বারবান আসিল। স্বয়ং কৃতান্ত আসিলে অত বিরক্ত হইতাম না। সামান্য পঁচিশ টাকার জন্য লোকটা তিনবার আসিয়াছিল। কি নীচ! কি স্বার্থপর!

স্মরণ করিলাম বাক্সে মাত্র সতের টাকা সওয়া সাত আনা মজুত আছে। লোকটার উপর বড় ঘৃণা হইল। ভাবিলাম ডার্ব্বির টাকাগুলা পাইলে কখনও ভাড়াটিয়া বাটি খরিদ করিয়া ভদ্রলোকের নিগ্রহ করিব না। মুদীর দোকানের উপরও আমার ঐরূপ একটা জাতক্রোধ ছিল—আর নীচ হীন নরাধম, পামর পাষণ্ড ভাবিতাম, দর্জ্জির দলকে।

বাড়িওয়ালার দ্বারবান ধীরে ধীরে আমার সম্মুখে বিলখানি রাখিল। আমি মনোভাব গোপন করিয়া একটু মোলায়েম ভাবে হাসিয়া বলিলাম—আজ না —এতোবার।

দ্বারবান বলিল—বাবু তিন দফা আয়া।

আমি বলিলাম—আচ্ছা চৌঠা দফে আনেসে হোগা। হাতমে রূপেয়া নেহি হায় ভাই।

লোকটা একটু হাসিল। একটু ঘাড় বাঁকাইয়া বিলখানি তুলিয়া লইল। আমার হৃদয় শেলবিদ্ধ হইতেছিল! উঃ কি ভীষণ অত্যাচার! দারিদ্র্যের ভ্রূকুটি কি মারাত্মক! একটা মূর্খ হীন দ্বারবানের শ্লেষ—দাঁড়াও মূর্খ একবার ডার্ব্বি

লাভ করি, তাহার পর তোমাদের চাকর রাখিব, সামান্য ত্রুটিতে কষাঘাত করিব।

(৪)

সতিশ বলিল—মাষ্টার গোবর আর চারদিন আছে।

আমি একটু হাসিলাম। সে বলিল—কি বাবা! ডার্ব্বীটা পেলে একটু ভাগ দিও। সব টাকাটা নিজে নিজে হজম ক'র না।

আমি বলিলাম—কেন, তুমিও তো একখানা টিকিট কিনেছ।

সে বলিল—আমি ডার্ব্বি মারলে কি আর রক্ষে রাখব। আগে তো এই পাপিষ্ঠগুলার মুখ বন্ধ করব। তার পর বুঝেছ, মাষ্টার গোবর, একটা গোলাপ ফুলের মত ইহুদি—

বাকী টুকু সে আমার কাণের কাছে মুখ রাখিয়া বলিল। আমি হাসিয়া বলিলাম—তোমার মরণ নেই! আমি নিজের অবস্থাটা সুধরে নব। বাড়ি-ওয়ালা, মুদী, দর্জ্জি এই সব বেয়াদবগুলার অত্যাচারের হাত থেকে রক্ষা পাব।

সতিশ হাসিয়া বলিল—তোমার স্ত্রী কি বলে?

আমি বলিলাম—এই সব ধুরন্ধরেরা যা বলে। বলে—আমি লোভী, আমি মূর্খ, আমার বন্ধু—অর্থাৎ তুমি—মানে হ'চ্চে—

সতিশ বলিল—বোকা, বদ্‌মায়েস্, জুয়াড়ি, জুয়োচ্চোর।

আমি বলিলাম—হ্যাঁ অনেকটা সেই রকম কথা বলে বটে।

সতিশ বলিল—আচ্ছা বাবা। একবার ঘোড়াটা উঠুক তখন নিজে গিয়ে সেলাম ক'রে আসব আর নিজের হাতে রাঁধিয়ে এক পেট খেয়ে আস্‌ব।

আমরা দুইজন একত্র হইলেই অপরাপর উকীলেরা হাসিত। আমি চসমা খুলিয়া গল্প করিতেছিলাম। একটি রসিক বন্ধু আসিয়া বলিল—কি মাষ্টার গোবর! চসমা খুলে রেখেছ কেন?

আমি বলিলাম—তাতে দাঁত বার কর্‌বার কি আছে? গল্প করবার সময় তো চিরকালই চস্‌মা খুলে রাখি।

রসিক বন্ধু বলিলেন—ওঃ গল্প করছ! আমি ভাবছিলাম বুঝি লাক্ টাকার স্বপ্ন দেখছিলে। তা হ'লে তো চসমা চাই।

সতিশ তাহাকে তাড়া করিল। সে রণে ভঙ্গ দিয়া পলাইল। সতিশ বলিল—আমাদের মধ্যে একজন যদি মারতে পারি তো এই হতভাগা গুলার হিংসাটা আরও শতগুণ বেড়ে যায়।

আমি বলিলাম—সে কথা যাক্। এখন নামে ঘোড়া উঠ্‌লো কি না উঠলো, কি ক'রে টের পাব?

সতিশ বুঝাইল তাহার জন্ত অপেক্ষা করিতে হয় না। একদল সাহেব আছে তাহাদের জুয়াখেলা ব্যবসা। রাত্রে যেমনি লটারী হইয়া যায় তাহারা জানিতে পারে কাহার নামে কোন্ ঘোড়া উঠে। তাহারা তখন রাত্রে লোকের বাড়ি বাড়ি ছুটাছুটি করে। দশ হাজার বিশ হাজার পঞ্চাশ হাজার লাক্ টাকায় তাহারা ঐ সকল টিকিট খরিদ করিয়া লয়। কে জানে কাহার নামের ঘোড়া ঘোড়দৌড়ের সময় কি রকম ছুটিবে। তাই তাহারা নগদ মূল্যে টিকিট বিক্রয় করে। যে সাহেব খরিদ করে সে তাহা হইতে দশ হাজার হারাইতেও পারে আবার আ'ড়াই লক্ষ টাকাও পাইতে পারে।

এ ক্রীড়ার নূতনত্ব ছিল। এতদিন কেন টিকিট ক্রয় করি নাই তাই ভাবিতেছিলাম।

সতিশ বলিল—এই দেখ না আরও চারটে দিন মাত্র বাকী আছে। লটারীর দিন রাত্রে একটু সজাগ থেকো। দেখবে মোটর গাড়ি প্যাঁক্ প্যাঁক্ করতে করতে তোমাদের গলিতে ঢুকছে, বড় বড় সাহেব তোমাদের বাড়ির দরজা ঠেলছে।

বৈশাখী চপলার মত ক্ষীণ হাসির রেখা আমার ওষ্ঠ প্রান্তে মিলাইয়া গেল। কি সুখ-রজনী আসিতেছে কে বলিতে পারে? "পুরুষস্থ ভাগ্যম্"—পণ্ডিতেরা ঠিকই বলিয়াছিলেন।

(৫)

রাত্রিতে লটারী। শত শত লোকের ভাগ্য পরীক্ষা হইবে। মধ্যে এক জ্যোতিষীর দ্বারা কোষ্ঠী পরীক্ষা করিয়া লইয়াছিলাম। কোষ্ঠীর ফল শুভ— "শত্রুনাশ, মহোল্লাস, ধনাগম, সুহৃদ লাভ।" কিন্তু আর সন্দিগ্ধ মনে বাস করা দুরূহ হইয়া উঠিতেছিল। যাহা হউক, একটা সংবাদ পাইলে মনে শান্তি আসিত, আবার পুরাতন কর্ম্মস্রোতে গা ভাসাইয়া দিতে পারিতাম। আজই এ দুর্ভাবনার একটা নিবৃত্তি হইবে।

চিন্তিত মনে গৃহে ফিরিলাম। স্ত্রী বলিল—তোমার ওপর দিন দিন আমার শ্রদ্ধা কমছে। তুমি কি সত্যি সত্যি ভাব যে টাকা পাবে?

আমি বড় বিরক্ত হইলাম। সেও বিরক্ত হইল। আমি তাহাকে তিরস্কার করিলাম। সে কাঁদিল—নারীর ব্রহ্মাস্ত্র! আমি আরও বিরক্ত হইলাম।

স্ত্রী বলিল—আমার মরণ হ'লে তোমার ভাল হয়।

সেই পুরাতন কথা। আমি বলিলাম—মরণ সোজা কথা নয়।

সে বলিল—সোজা আজকাল খুব। দু পয়সার কেরোসিন তেল হ'লেই হয়। আচ্ছা তুমি লটারির টাকা নিয়ে সুখে থেক। আমি নিজের পন্থা দেখব।

আমি কিছু বলিলাম না। কি বলিব? একটু সুখের লেশমাত্র ছিল না। পৃথিবীতে কাহারও এক কপর্দ্দক সহানুভূতি পাই নাই। কেহ একবার বুঝিল না প্রাণের ভিতর কি উত্তেজনা পুষিয়া রাখিয়াছিলাম!

সে রাত্রে আহার নিদ্রা হইল না। ভৃত্য দুই একবার ডাকিতে আসিল। আমি কিন্তু উপরে উঠিলাম না। বাহিরের ঘরেই শয্যা রচনা করিয়া শুইয়া রহিলাম। কণ্টক শয্যা। স্ত্রীর কঠোর ব্যবহার, উচ্চাশার মধুর বীণাঝঙ্কার, নিরাশার ভ্রূকুটি, জঠর জ্বালা,—এক সঙ্গে দল বাঁধিয়া আমায় সুচিকাবিদ্ধ করিতেছিল। ভাবিলাম এ কাল-রজনী কোন রূপে পোহাইলে হয়। টাকা পাইবার আশা, ধনী হইবার প্রতীক্ষা এত ভীষণ, না জানি অর্থাগম কি বিষম ব্যাপার! সন্দেহ হইতেছিল—তবে কি অর্থে সুখ নাই? আবার বাড়িওয়ালার দ্বারবান, মুদী, দর্জ্জি সব মাথা তুলিতেছিল। আর সন্দেহ রহিল না যে অর্থেই সুখ, ধন লাভেই শান্তি!

(৬)

প্রায় মধ্য রাত্রি। সারা রাত এক রকম নিদ্রা হয় নাই। গলির মোড়ে সামান্য শব্দ হইলেই আশায় প্রাণ নাচিয়া উঠিতেছিল—বুঝিবা সুসংবাদ লইয়া মোটর গাড়ি ছুটিয়া আসিতেছে। সমস্ত ঘটনাগুলা যেন আমার স্বপক্ষে দল বাঁধিয়াছিল। হঠাৎ সতিশের হস্তে টিকিট ক্রয়, কোষ্ঠীর ফল, এমন কি স্ত্রীর সহিত দ্বন্দ্বও আমার পক্ষে শুভ। তাহা না হইলে তো আর বাহিরে শয়ন করিতে পারিতাম না।

মধ্যে একটু তন্দ্রা আসিয়াছিল। হঠাৎ একটা শব্দে ঘুম ভাঙ্গিল। একাধিক লোকের কণ্ঠস্বর। বাটীর বাহিরে ভীষণ জনতা। সকলে একবাক্যে ডাকিতেছিল—উকিল বাবু, উকীল বাবু, দোর খুলুন। শীঘ্র।

কি অপার আনন্দ! পয়সা হইলে বন্ধুর অভাব হয় না। হাঃ হাঃ হাঃ! এতদিন পাড়ার লোক আমায় গ্রাহ্য করিত না। আজ ডার্ব্বি মারিয়াছি বলিয়া কি আগ্রহ। "মশায় শীঘ্র! দরজা খুলুন।" হাঃ হাঃ হাঃ! প্রাণ ভরিয়া হাসিয়া

লইলাম! শীঘ্র! সস্তায় টিকিট কিনিয়া লাভ করিবে সাহেব? দাঁড়াও। আবার দ্বারে শব্দ "মশায় শীঘ্র! সর্ব্বনাশ হ'বে! শীঘ্র।"

এবার ভাবিলাম দরজা না খুলিলে অভদ্রতা হয়। অশিক্ষিত ধনী লোক অভদ্রতার প্রশ্রয় দেয়। আমি শিক্ষিত ধনী! হাঃ হাঃ হাঃ! ধনী! খুব খানিকটা হাসিয়া লইলাম। জয় দুর্গা বলিয়া বাটীর দ্বার খুলিলাম।

প্রতিবেশীগণ মহা আগ্রহে বলিল—শীঘ্র যান্ মশায়, শীঘ্র, আগুন, আগুন।

আগুন! তবে কি সাহেবের মোটর গাড়ি জ্বলিয়া গিয়াছে? আমি বলিলাম—আগুন! মোটর গাড়িতে?

একজন বলিল—মশায় কি পাগল হ'য়েছেন নাকি? আগুন আপনার ছাদে। শীঘ্র যান—কেরোসিনের গন্ধ পাচ্চেন না?

সর্ব্বনাশ! হৃদয়ের স্পন্দন বন্ধ হইল। হা মূর্খ লুব্ধ! কি সুখ স্বপ্ন দেখিতেছিলে? সহধর্ম্মিণীর প্রেমের মূর্ত্তি মানসপটে ভাসিতে লাগিল। আহা! তবে তো অভাগিনী মিথ্যা ভয় দেখায় নাই। স্ত্রী-হত্যার পাপে সন্তপ্ত প্রাণ কি মনঃকষ্ট পায় তাহা নিমেষের মধ্যে পূর্ণমাত্রায় উপলব্ধি করিলাম। হাত পা টলিতেছিল—মাথা ঘুরিতেছিল। পাগলের মত টলিতে টলিতে উপরে উঠিলাম। প্রতিবেশীগণ ছুটিল। আমি বলিলাম—আপনাদের পায়ে পড়ি, বাঁচান বাঁচান! শীঘ্র বাঁচান!

উপরে উঠিলাম—কেরোসিনের গন্ধে শ্বাসরোধ হইতেছিল। ধূমশিখা পাক দিয়া বিমান পথে আমার মূর্খতা, আমার লোভান্ধ নীচতার সাক্ষ্য দিবার জন্য ছুটিতেছিল। হায়! হায়! এত দিনে প্রকৃতপক্ষে লক্ষ্মী হারাইলাম। দ্যূতক্রীড়া করিয়া সাধ্বী স্ত্রী-রত্ন হইতে বঞ্চিত হইলাম। হাঃ ভগবান্!

আমি ছাদে উঠিয়াই শিরে করাঘাত করিয়া বসিয়া পড়িলাম। পাড়ার লোকেরা অগ্নি নির্ব্বাপিত করিতে লাগিল। একজন হাসিয়া বলিল—আঃ মোলো! একি ব্যাপার!

আমি বলিলাম—আপনারা আমায় যা' ইচ্ছা করুন।

সকলে হাসিতে লাগিল। আমি বলিলাম—আপনারা আমার চেয়েও নিষ্ঠুর।

তাহারা আবার হাসিল। একজন বলিল—এ রসিকতা কে করলে, বাঁশে কাপড় জড়িয়ে আগুন—

আমি বলিলাম—আপনারা বড় নির্দ্দয়, আমার স্ত্রী রোগা ব'লে এমন পরিহাস—

লোকগুলা হাসিল। একজন বলিল—লোকটা পাগল—চল যাই।

তাহারা চলিয়া গেল। আমি কিছু বুঝিতে পারিলাম না। অনুতপ্ত, সন্তপ্ত প্রাণে টলিতে টলিতে অগ্নির দিকে অগ্রসর হইলাম।

পশ্চাত হইতে কে কাঁধ ধরিল। স্ত্রী! জীবিতা স্ত্রী! আমি বিস্মিত হইয়া তাহাকে আলিঙ্গন করিলাম। পুনঃ পুনঃ তাহার মুখ দেখিলাম—সত্যই স্ত্রী!

সে হাসিয়া বলিল—কেমন মতলব করেছি। বাতিক সেরেছে?

আমি গদ্গদ কণ্ঠে বলিলাম—চমক ভেঙ্গেছে। হাঃ ভগবান! তোমাকে ফিরিয়ে পেয়ে বাস্তবিক শত ডার্ব্বি লাভের আনন্দ পেলাম।

শ্রীকেশবচন্দ্র গুপ্ত।

জৈন গ্রন্থাবলী।

প্রাচীন ভারতের ইতিহাস-সঙ্কলনের জন্য যে যে উপাদান আবশ্যক বলিয়া বিবেচিত হইয়াছে, জৈন-সাহিত্য তাহাদের মধ্যে অন্যতম। ভিন্‌সেণ্ট স্মিথ্ লিখিয়াছেন "জৈনদের শ্রুতিসমূহ বহু প্রয়োজনীয় ঐতিহাসিক তথ্য পূর্ণ।" * কিন্তু অতি অল্প জৈন গ্রন্থই এ পর্য্যন্ত প্রকাশিত হইয়াছে। জৈনমন্দির সমূহের ভূগর্ভ নির্ম্মিত অন্ধকারময় কক্ষসমূহে সহস্র সহস্র পুঁথি ধ্বংস হইয়া যাইতেছে, এই বিংশ শতাব্দীতেও মন্দিরাধ্যক্ষগণ এগুলি কাহাকেও প্রদর্শন করিতে সহজে সম্মত হন না। গভর্ণমেণ্টের পৃষ্ঠপোষিত জনৈক কর্ম্মচারীকে এইরূপ এক মন্দিরে অনেক আপত্তির পর প্রবেশ করিতে দেওয়া হইয়াছিল। তিনি লিখিয়াছেন "মাথার উপর চামচিকা ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। কক্ষতল চামচিকার পুরীষ-সমাচ্ছন্ন। ধূলা, উইপোকা প্রভৃতিতে মূল্যবান্ পুঁথিগুলি চিরকালের মত বিলুপ্ত হইতে বসিয়াছে।" প্রাচীনকালে ধর্ম্মরহস্য গুপ্তির জন্যই হউক বা বিধর্ম্মীর অত্যাচার হইতে রক্ষা করিবার জন্যই হউক, এরূপ ভাবে গ্রন্থরক্ষার হয়ত প্রয়োজন হইয়াছিল। কিন্তু আজিকার দিনে এরূপ সন্তর্পণে গ্রন্থ গোপন করিবার কোনও সঙ্গত হেতু নাই। এখনকার মন্দিরাধ্যক্ষগণ এই বদ্ধমূল কুসংস্কার পরিত্যাগ করিলে জগতে জৈনধর্ম্মের মূলতত্ত্বগুলি প্রচারিত হইবে,

* The Early History of India. Page 8.

প্রাচীন ভারতের ইতিহাস সঙ্কলনের নব উপাদান প্রাপ্ত হওয়া যাইবে ও সঙ্গে সঙ্গে জৈন গ্রন্থাবলীর প্রচার বশতঃ জৈনদেরও প্রতিষ্ঠালাভ হইবে।

সুখের বিষয় জৈন গ্রন্থ-প্রচারে আজকাল কিছু কিছু চেষ্টার পরিচয় পাওয়া যাইতেছে। কয়েক বর্ষ পূর্ব্বে কলিকাতায় "শতাবধানী" জনৈক পণ্ডিতের সমাগম হইয়াছিল। ইনি একই সময়ে এক শত বিষয়ে মনোযোগ দিতে পারিতেন বলিয়া উক্ত আখ্যা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। কেহ কেহ তাঁহাকে মুখে মুখে বিভিন্ন ছন্দে বিভিন্ন ভাবের কবিতা রচনা করিতে বলিতেছেন। কেহ এই সময়ে যদৃচ্ছাক্রমে কয়েকবার ঘণ্টা বাজাইতেছেন। কেহ বিবিধ চিত্র প্রদর্শন করিতেছেন। কেহ নানাপ্রকার ভাষার বিবিধ শব্দ উচ্চারণ করিতেছেন। এইরূপে কিছুক্ষণ অতীত হইলে "শতাবধানী" কিয়ংক্ষণ সময় লইলেন। পরে যাঁহার যাঁহার শ্লোক-রচনার ফরমাস ছিল তাঁহাদিগকে মুখে মুখে শ্লোক রচনা করিয়া দিলেন। ঘণ্টা কয়বার বাজিয়াছিল, মাঝে থামিয়া আবার কতবার বাজিয়াছিল, কি কি চিত্র প্রদর্শিত হইয়াছিল প্রভৃতি সমস্ত ঘটনা ধারাবাহিক ক্রমে স্মৃতিশক্তি সাহায্যে বর্ণনা করিলেন। এই শতাবধানী পণ্ডিত রায়চন্দ্র রাবজী ভাই একজন প্রসিদ্ধ জৈন-সংস্কারক ছিলেন। ১৮৬৭ খৃষ্টাব্দে কাথিয়াওয়াড় প্রদেশে ইঁহার জন্ম হয়। বাল্যকাল হইতেই ইঁহার অসাধারণ স্মৃতিশক্তির কথা প্রচারিত হইয়া পড়ে। নবম বর্ষ বয়সে পদ্যে ক্ষুদ্র রামায়ণ ও মহাভারত ও দ্বাদশ বর্ষ বয়সে তিন দিনে ঘড়ি সম্বন্ধে তিন শত শ্লোক রচনা করাতে সকলেই তাঁহার ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে অতিশয় আশান্বিত হন। পঞ্চদশ বর্ষ বয়ঃক্রম কালে তিনি 'অষ্টাবধান' অর্থাৎ আট বিষয়ে মনোযোগ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। ক্রমশঃ আট হইতে সংখ্যা বৃদ্ধি করিয়া অভ্যাস করিতে করিতে তিনি 'শতাবধান' হইয়া পড়িলেন। তখন তাঁহার বয়স উনবিংশ বর্ষ মাত্র। বোম্বাই হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি বহু সম্ভ্রান্ত ইংরাজ প্রভৃতির সম্মুখে তিনি এই আশ্চর্য্য ক্ষমতা প্রকাশিত করিলে প্রধান বিচারপতি সার্ চার্লস সার্জ্জেণ্ট (Sir Charles Sargeant) তাঁহাকে ইয়োরোপ-যাত্রা করিতে অনুরোধ করেন। কিন্তু রায়চন্দ্র জৈন—'অহিংসা পরম ধর্ম্ম' তাঁহার মূলমন্ত্র। জীবহিংসা ব্যতীত যে স্থলে আহার নির্ব্বাহ হয় না, সেই ইয়োরোপে তিনি কিরূপে গমন করিবেন ? কাজেই সে অনুরোধ রক্ষা না করিয়া ভারতেরই বিভিন্ন স্থলে তিনি এই 'শতাবধান' শক্তি প্রদর্শন করিয়াছিলেন।

একবিংশ বর্ষ বয়ঃক্রমকালে রায়চন্দ্র জহুরীর ব্যবসায়ে প্রবৃত্ত হন ও অল্প-

কাল মধ্যেই প্রভূত ধন উপার্জ্জন করেন। বহুদিন হইতেই তাঁহার মনে ধর্ম্ম-বীজ অঙ্কুরিত হইয়াছিল। সংস্কৃত ও প্রাকৃত ভাষায় রচিত জৈন ধর্ম্মসম্বন্ধীয় গ্রন্থাবলী তিনি আগ্রহ সহকারে পাঠ করিয়াছিলেন। তাঁহার অসাধারণ স্মৃতি-শক্তি এ বিষয়ে তাঁহার পরম সহায়ক হইয়াছিল। তিনি প্রাচীন জৈন ধর্ম্ম গ্রন্থাবলী প্রচারকল্পে সবিশেষ উদ্যোগী ছিলেন। ভারতবর্ষের বিভিন্ন শ্রেণীর জৈনগণের একতাবিধান তাঁহার মূলমন্ত্র ছিল। বহু সভা সমিতি ও বক্তৃতা দ্বারা এ কার্য্য অনেকটা অগ্রসর হইতেছিল কিন্তু ৩৩ বৎসর মাত্র বয়সে ১৯০১ খৃষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে কাথিয়াওয়াড়ের রাজকোট নামক স্থলে তিনি সহসা মৃত্যুমুখে পতিত হইলেন। মৃত্যুর পূর্ব্বে তিনি "মোক্ষমালা", "আত্মসিদ্ধ্যুপায়" ও "পঞ্চাস্তিকায়" নামক গ্রন্থ ও 'আত্ম' সম্বন্ধে কতকগুলি প্রবন্ধ রচনা করিয়া গিয়াছিলেন।

রায়চন্দ্রের মৃত্যু হইল বটে কিন্তু তিনি যে কার্য্যের সূত্রপাত করিয়াছিলেন তাহা একেবারে বন্ধ হইল না। অল্প দিনের মধ্যেই তাঁহার স্মৃতিরক্ষার্থ এগার হাজার টাকা সংগৃহীত হইল। এ অর্থ মর্ম্মরমূর্ত্তি বা প্রস্তরফলকে ব্যয়িত হইল না—লুপ্ত জৈনগ্রন্থ প্রচারেই ইহা নিয়োজিত হইল। রায়চন্দ্র জীবদ্দশায় "পরম-শ্রুত প্রভাবক মণ্ডলী" নামক এক সমিতি স্থাপনা করিয়াছিলেন। জৈন ধর্ম্ম-গ্রন্থ প্রচারই এ সমিতির কর্ত্তব্য নির্দ্ধারিত ছিল। তাঁহার জীবদ্দশায় কার্য্য আরম্ভ হয় নাই বটে কিন্তু তাঁহার মৃত্যুর পর এই সমিতি স্মৃতিরক্ষার্থ সংগৃহীত অর্থসাহায্যে "রায়চন্দ্র জৈন শাস্ত্রমালা" নামক গ্রন্থ সমূহ প্রকাশে প্রবৃত্ত হইলেন। দুই মাস অন্তর এক একখানি গ্রন্থ প্রকাশিত হইতে লাগিল। নেমিচন্দ্র সিদ্ধান্ত চক্রবর্ত্তী-রচিত "দ্রব্য-সংগ্রহ", কুন্দকুন্দাচার্য্য রচিত "পঞ্চাস্তিকায় সময়সার", ভোজসাগর রচিত "দ্রব্যানুযোগতর্কণা", বিমল-দাসকৃত "সপ্তভঙ্গী-তরঙ্গিণী" প্রভৃতি প্রয়োজনীয় জৈন গ্রন্থ সকলের মূল, হিন্দী অনুবাদ সহিত "রায়চন্দ্র জৈনশাস্ত্রমালা"য় প্রকাশিত হইয়াছে। নিম্নলিখিত গ্রন্থগুলিও উক্ত গ্রন্থমালার অন্তর্ভুক্ত—স্যাদ্বাদমঞ্জরী, জ্ঞানার্ণব, ষোড়শকপ্রকরণ, প্রবচন-সার, নাটকসময়সার, সর্ব্বার্থসিদ্ধি (পূজ্যপাদ স্বামী), দ্বাত্রিংশতিকা (হরিভদ্রসূরি) পরমাত্মপ্রকাশ (যোগীন্দ্রদেব) সুভাষিতরত্নসন্দোহ (অমিতগতি) ধর্ম্মসংগ্রহণী (হরিভদ্রসূরি) উপমিতিভবপ্রপঞ্চা কথা (সিদ্ধর্ষি) গুণস্থানক্রমারোহণ (রত্ন-শেখরসূরি) যোগবিন্দু ও ধর্ম্মবিন্দু (হরিভদ্রসূরি)।

কাশী হইতে আর দুইখানি গ্রন্থমালা প্রকাশিত হইতেছে। প্রথম গ্রন্থ-

মালার নাম "যশোবিজয়-জৈন-গ্রন্থমালা"। কাশীতে "যশোবিজয়-জৈন-পাঠশালা" নামক এক জৈন বিদ্যামন্দির বর্ত্তমান আছে। ইহার সংস্থাপক, মুনিবর বিজয় ধর্ম্ম স্থরি। ইনি শ্বেতাম্বর সম্প্রদায়ের একজন সর্ব্বজনপূজ্য সাধু। ১৯২৪ সম্বতে কাথিয়াওয়াড় প্রদেশে মহোবা নগরে ইহার জন্ম হয়। তখন ইহার নাম ছিল—মূলচন্দ। বিংশ বর্ষ বয়ঃক্রমকালে ইনি সংসার পরিত্যাগ করিয়া সন্ন্যাস-ধর্ম্ম অবলম্বন করেন। এই সময় হইতেই ইনি "বিজয়ধর্ম্ম" নামে প্রসিদ্ধি লাভ করেন। জৈনধর্ম্ম প্রচারে ইহার অসীম অনুরাগ ও উৎসাহ। কিছুদিন ইনি "জৈনশাসন" নামক পাক্ষিক পত্র প্রকাশিত করিয়াছিলেন। বহু হিন্দী ও গুজরাতী জৈনধর্ম্মগ্রন্থ ইঁহার রচনা। ইঁহার প্রকাশিত "যশোবিজয় জৈনগ্রন্থমালা" নামক গ্রন্থাবলী জৈন মাত্রেরই আদরণীয়। প্রমাণনয়তত্ত্বালোকালঙ্কার (বাদিদেবস্থরি) মল্লিনাথ মহাকাব্য (বিজয়চন্দ্রস্থরি) পার্শ্বনাথ-চরিত্র (ভাবদেব সূরি) ষড়্দর্শন-সমুচ্চয় (রাজশেখরস্থরি) রত্নাকরাবতারিকা (রত্নপ্রভাচার্য্য) প্রভৃতি অমূল্য গ্রন্থরাজি এই গ্রন্থমালায় প্রকাশিত হইয়াছে।

কাশী হইতে দ্বিতীয় যে গ্রন্থমালা প্রকাশিত হইতেছে, তাহার নাম "সনাতন জৈন-গ্রন্থমালা"। ইহাতে দিগম্বর জৈনসম্প্রদায়ের গ্রন্থগুলিই মুদ্রিত হইতেছে। মূলগ্রন্থ (সংস্কৃত বা প্রাকৃত) ও মূল সংস্কৃত টীকামাত্র ইহাতে প্রকাশিত হইতেছে। কাশীর "জৈনধর্ম্মপ্রচারিণী সভা"ই এ কার্য্যের উদ্যোগী। বিভিন্ন ব্যক্তির সাহায্য হইতে এক একখানি গ্রন্থের মুদ্রণব্যয় সঙ্কুলন হইয়া থাকে। কুন্দকুন্দাচার্য্যচরিত "সময়প্রাভৃত", অকলঙ্ক-দেবরচিত "তত্ত্বার্থরাজবার্ত্তিক" প্রভৃতি গ্রন্থ এই গ্রন্থমালায় স্থান পাইয়াছে।

কলিকাতা এসিয়াটিক সোসাইটি হইতেও কতকগুলি জৈনগ্রন্থ মুদ্রিত হইয়াছে। এগুলি Bibliotheca Indica নামক সুপ্রসিদ্ধ গ্রন্থমালার অন্তর্ভুক্ত। ইহার মধ্যে তত্ত্বার্থাধিগমস্থত্র (উমাস্বামী-কৃত) সমরাইচ্চ কহা (সমরাদিত্য কথা) উবাসগদসাও (উপাসকদশাঙ্গ) শান্তিনাথচরিত্র, প্রবন্ধ-চিন্তামণি, পরীক্ষামুখ, ন্যায়সার ও উপমিতিপ্রপঞ্চাকথা বহুলরূপে পঠিত হইয়া থাকে।

প্রসিদ্ধ Sacred Books of the East নামক গ্রন্থাবলীর দুই খণ্ডে জৈন ধর্ম্মগ্রন্থ স্থানলাভ করিয়াছে। এই দুইখণ্ডে আচারাঙ্গ সূত্র, কল্পসূত্র, উত্তরাধ্যায়ন সূত্র ও সূত্রকৃতাঙ্গ নামক প্রাচীনতম জৈন শ্রুতিগুলির ইংরাজী অনুবাদ প্রকাশিত হইয়াছে। পূর্ব্বে যে সমস্ত গ্রন্থের কথা উল্লিখিত হইল, সেগুলির

কেবল মূল ও সংস্কৃত টীকা মাত্র মুদ্রিত হইয়াছে। দুই চারিখানি গ্রন্থের হিন্দী টীকাও হইয়াছে। গুজরাট প্রদেশে বহু জৈনের বাস, সেইজন্য বহু জৈনগ্রন্থের গুজরাটি ভাষায় অনুবাদ হইয়াছে। মারাঠি ভাষায়ও কতকগুলি গ্রন্থের অনুবাদ আছে। কিন্তু বর্ত্তমান সময়ে সমগ্র ভারতে এমন কি ইয়োরোপ ও আমেরিকা পর্য্যন্ত প্রচার করিতে হইলে জৈন গ্রন্থগুলির ইংরাজী অনুবাদ হওয়া প্রয়োজন। প্রাচীনতম জৈন গ্রন্থগুলি প্রাকৃত ভাষায় রচিত। ভারতে বা অন্যত্র এ ভাষার অধুনা চর্চ্চা অতীব বিরল। সংস্কৃত চর্চ্চাও সীমাবদ্ধ হইয়া পড়িয়াছে। সর্ব্ব-সাধারণের সহজবোধ্য করিবার জন্য মূল গ্রন্থের সহিত ইংরাজী অনুবাদ প্রকাশও আবশ্যক। কেবলমাত্র Sacred Books of the East নামক গ্রন্থমালায় চারখানি জৈন গ্রন্থের ইংরাজী অনুবাদ এ পর্য্যন্ত প্রকাশিত হইয়াছে। দুই একখানি জৈন মাসিকপত্রে "পুরুষার্থ সিদ্ধ্যুপায়" প্রভৃতি দুই একখানি গ্রন্থের ধারাবাহিক অনুবাদ প্রকাশিত হইতেছিল কিন্তু এখনও পুস্তকাকারে সেগুলি প্রকাশিত হইবার বিলম্ব আছে। লণ্ডনে Jain Literature Society নামক এক সমিতি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। ইহার সভাপতি জর্ম্মণীর অধ্যাপক ডাক্তার হার্‌মান জেকবি, এম্, এ, পি, এচ্ ডি। ইঁহাদের উদ্দেশ্য জৈন গ্রন্থাবলীর ইংরাজী অনুবাদ প্রকাশ করা। তিনখানি গ্রন্থ ইঁহারা প্রথমে প্রকাশার্থ নির্ব্বাচিত করিয়াছেন। সে তিনখানি গ্রন্থের নাম প্রবচনসার, স্যাদ্বাদমঞ্জরী ও ষড়্‌দর্শন সমুচ্চয়। এগুলির অনুবাদ অদ্যাপি সমাপ্ত হয় নাই। সমিতি এ যাবৎ আশানুরূপ অর্থ সাহায্য প্রাপ্ত হন নাই। সেইজন্য তাঁহাদের সংকল্প কার্য্যে পরিণত হইবার কত বিলম্ব ঘটিতে পারে তাহা স্থির নাই।

সম্প্রতি ভারতবর্ষ হইতে ধারাবাহিক জৈন গ্রন্থাবলী প্রকাশের একটা উদ্যোগ হইতেছে। কাশীর "ভারত জৈন মহামণ্ডল" এই অনুষ্ঠানের কর্ত্তা। ইহাঁরা মূল গ্রন্থ (সংস্কৃত বা প্রাকৃত) ইংরাজী ভূমিকা, ইংরাজী অনুবাদ, ইংরাজী টীকা সহ প্রকাশ করিতে উদ্যত হইয়াছেন। ধারাবাহিক ইংরাজীতে জৈনধর্ম্ম গ্রন্থমালা প্রকাশ এই প্রথম। প্রথম খণ্ড যন্ত্রস্থ। এ গ্রন্থখানির নাম দ্রব্য-সংগ্রহ। রচয়িতা—নেমিচন্দ্র সিদ্ধান্ত চক্রবর্ত্তী। মূল গ্রন্থখানি প্রাকৃত গাথায় রচিত। এই গ্রন্থে জৈনধর্ম্মের মূলতত্ত্বগুলি বিবৃত হইয়াছে। অতি শীঘ্রই গ্রন্থখানি প্রকাশিত হইবে।

এই শেষোক্ত গ্রন্থমালা Bibliotheca Jamica নামক সাধারণ নামে অভিহিত হইবে ও ইহার বিশেষ বিশেষ বিভাগ থাকিবে। গ্রন্থমালা সম্পূ

হইলে সমগ্র জগতের পুরাতত্ত্ব বিভাগে বিশেষ আন্দোলন উপস্থিত হইবে। কারণ জৈনধর্ম্ম গ্রন্থাবলী হইতে ভারতবর্ষের এক প্রাচীন ধর্ম্মের স্বরূপ প্রকটিত হইবে। ভারতের প্রাচীন যুগের জৈনধর্ম্মাবলম্বী নৃপতিগণ, জৈন তীর্থঙ্কর ও সাধুগণ, জৈন মন্দিরসমূহ, প্রাচীন জৈন তাম্রশাসন ও মুদ্রা, জৈন রীতিনীতি, আচার ব্যবহার প্রভৃতির প্রকৃত পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যাইবে। ইংরাজী অনুবাদ হইতে সভ্য জগতের সর্ব্বত্রই বিভিন্ন বিষয়ে গবেষণারত পণ্ডিতগণ নিজ নিজ প্রয়োজনীয় উপাদান সংগ্রহ করিতে পারিবেন। সমগ্র ভারতের জৈনগণ এই মহদনুষ্ঠানে সহায়তা করিয়া নিজ ধর্ম্মের মহিমা প্রচারের সঙ্গে সঙ্গে জগতের জ্ঞানবৃদ্ধির সহায়তা করুন এই আমাদের বিনীত প্রার্থনা।

শ্রীশরচ্চন্দ্র ঘোষাল।

পারের স্মৃতি।

এবার বুঝি আমার কথা মনে পড়েছে !
তাই সাঁজের আকাশ, সাঁজের বাতাস
গানে ভরেছে !
তাই ফুটে উঠে ফুলের হাসি,
বেজে উঠে বনের বাঁশী,
সকল শোভা সৃষ্টিখানি
জড়িয়ে ধরেছে !
এবার বুঝি আমার কথা মনে পড়েছে !

কত দেশের কতই তরী ঘাটে লেগেছে।
তাই হারিয়ে যাওয়া সকল চাওয়া
প্রাণে জেগেছে।
তাই চুকে গেছে সকল দেনা,
ফুরিয়ে গেছে বেচা কেনা,
হৃদয় মাঝে তোমার বাঁশী
পাগল করেছে।
এবার বুঝি আমার কথা মনে পড়েছে !

শ্রীনরেন্দ্রনাথ সেন।

অবতার ও অভিব্যক্তি।

"যদা যদাহি ধর্ম্মস্যগ্লানির্ভবতি ভারত।
অভ্যুত্থানমধর্ম্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহং॥
পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্
ধর্ম্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে।"

পূর্ণব্রহ্ম মেদুরমন্দ্রে নিজকণ্ঠে এ কথা বলিয়াছিলেন।' পুণ্যক্ষেত্র কুরুক্ষেত্রের সে ধ্বনি যুগ যুগান্তর ধরিয়া আর্য্যাবর্ত্তের গগনে পবনে ধ্বনিত হইতেছে—যুগ যুগান্তর ধরিয়া আমাদের জীবন্মৃত জাতিকে অনুপ্রাণিত করিতেছে। জাতীয় জীবনের গভীর নিরাশার অমানিশার মাঝে আশার উষালোকের কনক রেখা প্রতিভাত হয়, মনে হয় আবার তিনি আসিবেন, আবার তিনি নরদেহ ধারণ করিয়া অধর্ম্মের গতিরোধ করিবেন, সাধুদিগের পরিত্রাণ করিবেন, পাপের বিনাশ করিবেন, ধর্ম্ম সংস্থাপন করিবেন। আসুরী শক্তি বিশ্ববিজয়ী হইবে না, অবতার রূপে তিনি স্বয়ং নামিয়া আসিলে জগৎ নূতন স্রোতে প্লাবিত হইবে। পূর্ব্বে যাহা হইয়াছে ভবিষ্যতেও তাহাই হইবে।

পাশ্চাত্য বিজ্ঞান ও প্রাচ্য শাস্ত্রের সমন্বয় করিতে গিয়া অনেকে মুরুব্বিয়ানা করিয়া বলিয়া থাকেন, পাশ্চাত্য বিজ্ঞান প্রাণপাত পরিশ্রম করিয়া প্রকৃতির যে নিয়মগুলার সন্ধান পাইয়াছে, প্রাচীন আর্য্যজাতি সেগুলা ঠিক ঐরূপ ভাবে আবিষ্কার করিয়াছিল। পূর্ব্ব প্রবন্ধে বলিয়াছি, আধুনিক অভিব্যক্তিবাদের সহিত হিন্দু শাস্ত্রের কোনও সম্পর্ক নাই। জন্মান্তরবাদের সহিত ইহার কতকটা সাদৃশ্য থাকিলেও মূলে ইহাদের মধ্যে বিশেষ পার্থক্য বিদ্যমান। অনেকে বলিয়া থাকেন, হিন্দুর দশাবতারের ক্রম মানুষের অভিব্যক্তির ক্রম মাত্র, সুতরাং ডারবিন, হার্ব্বাট স্পেন্সার, হাক্স্‌লে প্রভৃতি জন্মিবার যুগ যুগান্তর পূর্ব্বে পুণ্য-ভূমি আর্য্যাবর্ত্তের ধূলিকণার গাত্রে তাহাদের আবিষ্কৃত সত্য লিখিত ছিল —এদেশের ছেলে বুড়া অভিব্যক্তিবাদ বিদিত ছিল। কুরুক্ষেত্রের আশ্বাসবাণী ঐরূপ টীকাকারের হস্তে পড়িয়া আসল অর্থ হারাইয়াছে, ভগবানের অবতার গুলিকে প্রটোজোয়া জীবাণু হইতে মনুষ্যের অভিব্যক্তির ক্রম বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। বিলাতী বিজ্ঞানে সৃষ্ট জীবের মধ্যে মনুষ্যই শ্রেষ্ঠ বলিয়া পরিগণিত হয়, যেহেতু মনুষ্যলোক ছাড়াইয়া প্রত্যক্ষবাদীদিগের স্থূল দৃষ্টি দেবলোক পর্য্যন্ত

পঁহুছিতে পারে না। হিন্দু শাস্ত্র দেবলোককে বিশ্বাস করে, সূক্ষ্ম শরীর পরিপূর্ণ নানা জগতের কথা কহিয়া থাকে, সুতরাং অভিব্যক্তির উচ্চ শিখরে মানব দণ্ডায়মান, একথা হিন্দু শাস্ত্র বিশ্বাস করে না। হিন্দুর জগত অসীম অনন্ত—আত্মার ভ্রমণ-পথ সুদীর্ঘ—অনন্ত বলিলে অত্যুক্তি হয় না। এই জগতের পাপ পুণ্যের উপর আত্মার অনন্তকালের স্বর্গনরকে বিশ্বাস হিন্দুর শাস্ত্র প্রশ্রয় দেয় না। ইহাই আর্য্য ধর্ম্মের বিশেষত্ব, এই বিশ্বাসের জন্যই সনাতন ধর্ম্ম আবহমান কাল আপনার শ্রেষ্ঠত্ব অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছে।

শ্রদ্ধেয়া মিসেস বেসান্তই প্রথমে অবতারের তালিকার মধ্যে মানবের অভিব্যক্তির স্তরের নিদর্শন পাইয়াছিলেন। হিন্দু সমাজ তাঁহার নিকট অশেষ প্রকারে ঋণী, হিন্দু শাস্ত্রবিষয়ে তাঁহার জ্ঞান প্রগাঢ়। তাঁহার দিব্যচক্ষু আছে, তিনি দিব্যচক্ষে অনেক সনাতন সত্য উপলব্ধি করিয়া থাকেন। তিনি একথা যে ভাবে বলিয়াছিলেন তাঁহার অন্ধ অনুকারক বিজ্ঞের দল কথাটা ঠিক সে ভাবে না বুঝিয়া অবতারের তালিকায় হুবহু অভিব্যক্তির ক্রম দেখিয়া থাকেন। আমরা এ বিষয়ে মিসেস বেসান্তের ভক্তদিগের সহিত এক মত হইতে পারি না। কেন পারি না, তাহার কারণ ব্যক্ত করিতেছি।

প্রথমতঃ আমরা অবতারদিগের আখ্যায়িকার সামান্য আলোচনা করিব। কেবল ভগবানের অবতারের নাম গ্রহণ করিয়া নামের তালিকায় অভিব্যক্তির ক্রম দেখিলে সে যুক্তি ন্যায়ানুমোদিত হইবে না। আমাদিগকে অবতারদিগের আখ্যায়িকার আনুসঙ্গিক বিবরণ গ্রহণ করিতে হইবে। তাহা হইলেই এ মতের ভ্রম প্রতিপন্ন হইবে।

প্রথমে মৎস্য অবতার। গায়ক জয়দেব মধুরকণ্ঠে গাহিয়াছিলেন—

"প্রলয়পয়োধিজলে ধৃতবানসি বেদম
বিহিতবহিত্রচরিত্রমখেদম্।
কেশব ধৃত মীন'শরীর,
জয় জগদীশ হরে।"

বৈবস্বত মনু প্রথমে ভগবানের এই রূপ দর্শন করেন। তখন তিনি ক্ষুদ্র এক মৎস্য আকারে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। মনু মৎস্যটিকে ধরিয়া পাত্রে রাখিলেন। মৎস্য তখনই বাড়িল, আরও বৃহৎ পাত্রে তিনি মৎস্যটিকে সযত্নে তুলিয়া রাখিলেন। মীনদেহ আবার বাড়িল। ক্রমে মৎস্য জলাশয়ে রক্ষিত হইল। ক্ষুদ্র জলাশয় ভগবানের সে মীনদেহ ধরিয়া রাখিতে পারিল না। তখন তাঁহাকে

সাগরে ছাড়িয়া দিতে হইল। সামান্য পৃথিবীর পয়োধি—স্বর্গ মর্ত্ত রসাতলের বিশ্ব বিধাতাকে বাঁধিয়া রাখে এ ক্ষমতা অম্বুনিধির কোথা? মীন আরও বাড়িতে লাগিল। শেষে প্রলয় উপস্থিত হইল। ঋষিগণ বেদ লইয়া তরণী আরোহণ করিলেন, বিবস্বত মনু বড় বিপদে পড়িলেন। প্রলয়ের পর যে নূতন পৃথিবী রচিত হইবে, বেদ বিহীন হইয়া সে পৃথিবী নরক বলিয়া পরিগণিত হইবে। তিনি কি করিবেন, মহা প্রলয়ে কিরূপে বেদের রক্ষা করিবেন? তখন মীনদেহ দেখিয়া তাঁহার হৃদয়ে আশার উদ্রেক হইল, তিনি মীনদেহে তরণী সংবদ্ধ করিলেন। বেদের রক্ষা হইল। ভগবান মীনরূপে বেদ ধারণ করিলেন। সাধুদিগের পরিত্রাণ করিলেন। জয় জগদীশ হরে।

ভূতত্ত্ববিদেরা বলিয়া থাকেন, পৃথিবীর ভূখণ্ডের একটা আদিম স্তর আছে, যেখানে কেবল মৎস্য জাতির অস্থি কঙ্কাল পাওয়া যায়। পৃথিবীতে পলি পড়িবার পূর্ব্বে জগতে কেবল মৎস্য বা জলচর জীবেরই বসবাস ছিল। সে যুগকে ভূতত্ত্ববিদেরা Silurian Age বলিয়া থাকেন। তখন শ্বাপদ-সঙ্কুল কাননের সৃষ্টি হয় নাই, ধরণীপৃষ্ঠে নরনারী-পরিপূর্ণ নগর বা গ্রামের চিহ্নও ছিল না। তখন কেবল জগতে জলচর জীব বাস করিত। তাহা হইতে অভিব্যক্তিবাদীগণ স্থির করিয়াছেন যে, সেই জলচর জীবদিগের অভিব্যক্তির দ্বারা শ্বাপদ বিহঙ্গম নর বানরের সৃষ্টি হইয়াছে। অর্থাৎ সেই জলচর জীবদিগের সন্তান সন্ততি ক্রমশঃ রূপান্তরিত হইয়া দ্বিপদ মানবে পরিণত হইয়াছে।

ভূতত্ত্ববিদ্‌দিগের গবেষণা সত্যমূলক হইতে পারে, অভিব্যক্তিবাদী পণ্ডিতদিগের ধারণা নির্ভুল হইতে পারে; কিন্তু আমাদিগের মীনাবতারের বর্ণনার দ্বারা উহাদের কথার যাথার্থ্য প্রমাণ করিতে যাওয়া বা উহাদের গবেষণা অভ্রান্ত মনে করিয়া আমাদের অবতারের কাহিনী সত্যমূলক প্রতিপন্ন করিতে যাওয়া বাতুলতা মাত্র। ভূতত্ত্ববিদ্‌দিগের Silurian বা মৎস্য যুগে পৃথিবী জলমগ্ন ছিল, তখন দেব দানব যক্ষ রক্ষ কাহারও সৃষ্টি হয় নাই। সেই জলজ জীবদিগের আমলে বুদ্ধিশক্তির আদৌ অভিব্যক্তি হয় নাই বলিলে অত্যুক্তি করা হয় না। সেটা নেবুলা বা নীহারিকা হইতে সৃষ্ট জগতের আদিম অবস্থা। তখন এই ভূমণ্ডলে প্রাণের বিকাশ হইয়াছে মাত্র—সে প্রাণ বড় সরল।

আমাদের মৎস্য অবতার রূপে সচ্চিদানন্দ শ্রীহরি জীবদেহ ধারণ করিয়াছিলেন একটি মন্বন্তরের শেষে। তাঁহার দেহ ধারণের পূর্ব্বে একটা জগত ছিল। সে জগতে মানুষ ছিল—মনুর সন্তানগণ সৃষ্ট হইয়াছিল। সে জগতে সনাতন

সত্যের আধার বেদ পরিজ্ঞাত ছিল। সে জগতের অধিবাসীবৃন্দ এত মানসিক উন্নতি করিয়াছিলেন যে, তাঁহাদের মধ্যে ঋষিগণ জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহারা প্রলয় কালেও বিচলিত হয়েন নাই। বেদের উদ্ধার সাধন না করিতে পারিলে ভবিষ্যতে জগত অন্ধকার হইবে, এ ধারণায় তাঁহাদের প্রশান্ত হৃদয় উদ্বেলিত হইয়াছিল। হয় ত তাঁহাদেরই কাতর প্রার্থনায় অনাদি অনন্ত শ্রীহরি সামান্য মীনদেহ ধারণ করিয়াছিলেন। তিনি বিশ্বপাতা। তাঁহার নিকট মীন ও মানবের পার্থক্য নাই। প্রলয়-পয়োধি-জলের উপযুক্ত দেহ—মীনদেহ।

মীনদেহ এক মন্বন্তরের শেষে জন্মিয়াছিলেন। সেই জগতের বীজ লইয়া নূতন পৃথিবীর মানবকে অনুপ্রাণিত করিয়াছিলেন। Silurian যুগের তিনি Protozoa অবতার, একথা হাসির কথা মাত্র—জ্ঞানের কথা নহে। বিষ্ণু-পুরাণ স্পষ্ট করিয়া বলিয়াছেন যে, ভগবানের মীন অবতার ও কূর্ম্ম অবতার বিগত মন্বন্তরের—এ মন্বন্তরের প্রথম অবতার বরাহ।

তাহার পর

ক্ষিতিরতিবিপুলতরে তিষ্ঠতি তব পৃষ্ঠে
ধরণিধরণকিণচক্রগরিষ্ঠে
কেশব ধৃত কূর্ম্ম শরীর,
জয় জগদীশ হরে।

অভিব্যক্তিবাদী বলিয়া থাকেন যে, যখন পৃথিবী ভূভাগ ও জলভাগে বিভক্ত হইল, তখন জলচর ও ভূচর উভচর জীবের অভিব্যক্তিই সম্ভবপর। দশাবতারের দ্বিতীয় অবতার কূর্ম্ম। কূর্ম্ম উভচর, জলচর ও ভূচর। আবার নামের তালিকা দেখিয়া গবেষণা হইল। আনুসঙ্গিক বর্ণনা বাদ দিয়া কেবল নাম ও আকৃতি দেখিয়া হিন্দুশাস্ত্র ও পাশ্চাত্য বিজ্ঞান সমন্বয়-প্রয়াসী পণ্ডিতগণ বলিয়া উঠিলেন —দ্বিতীয় অবতারে অভিব্যক্তির দ্বিতীয় ক্রম বর্ণিত হইয়াছে মাত্র। কূর্ম্ম অবতার amphibious জীব amœbaর উন্নত অভিব্যক্ত সন্তান মাত্র। শাস্ত্রকার রূপকের ছলে আধুনিক অভিব্যক্তির ক্রম বর্ণনা করিয়াছেন মাত্র। শ্রীমদ্ভাগবতে উক্ত আছে—

বিলোক্য বিঘ্নেশবিধিং তদেশ্বরো
দুরন্তবীর্য্যোঽবিতথোঽভি সন্ধিঃ।
কৃত্বা বপুঃ কাচ্ছপমদ্ভুতং মহৎ।
প্রবিশ্য তোয়ং গিরিমুজ্জহার।

সমুদ্র মন্থনের সময় মন্দার পর্ব্বত পৃষ্ঠে ধারণ করিবার জন্যই কেশব কূর্ম্মরূপ

ধারণ করিয়াছিলেন। তাঁহার পৃষ্ঠে মন্দার পর্ব্বত চাপাইয়া সর্পের দুই দিক ধরিয়া সুরাসুর টানিয়াছিলেন, তাহার ফলে সমুদ্র হইতে অমৃত উঠিয়াছিল, লক্ষ্মী উঠিয়াছিলেন, নানা পদার্থ উঠিয়াছিল। অভিব্যক্তির রূপক কাহিনী হইলে ভগবান কূর্ম্ম অবতারের কাহিনীর আনুসঙ্গিক বর্ণনার অর্থ কি? সুর বা অসুরের অভিব্যক্তি হইল কবে? তাহারা কোন্ দিনে কোন্ জন্তুর অভিব্যক্তির ফলে জন্মগ্রহণ করিয়াছিল? মিসেস বেসান্ত কূর্ম্ম অবতারের গল্পের বড় মনোরম ব্যাখ্যা করিয়াছেন। সে ব্যাখ্যা সত্যই হউক মিথ্যাই হউক, সে ব্যাখ্যা লইলে আর মনে হয় না কূর্ম্ম অবতার অভিব্যক্তির ক্রম মাত্র। হাতী ঘোড়া সকলই সমুদ্র মন্থন হইতে উঠিয়াছিল। তাহারা মন্থনের ফলে উঠিয়াছিল, ইংরাজী বিজ্ঞান বর্ণিত অভিব্যক্তির ফলে সৃষ্ট হইয়াছিল, কূর্ম্ম অবতারের বর্ণনা পড়িলে তাহা মনে হয় না।

বসতি দশন শিখরে তব লগ্না
শশিনি কলঙ্ককলেব নিমগ্না।
কেশব ধৃত শূকর রূপ
জয় জগদীশ হরে।

পাশ্চাত্য ভূতত্ত্ববিদ্‌দিগের মতে Lemurian Age নামক পৃথিবীর একটা যুগ ছিল। Lemurian যুগেই প্রথমে ভূখণ্ডের আবির্ভাব হয়। শ্রদ্ধেয়া মিসেস বেসান্ত বলেন, বরাহ অবতার Lemurian যুগের অবতার। তিনি দশন শিখরে পয়োধি-তল হইতে ধরণীর উদ্ধার করিয়াছিলেন। বিলাতী বিজ্ঞানের মতে এই যুগেই স্তন্যপায়ী জীবের প্রথম আবির্ভাব হয়। বরাহ স্তন্যপায়ী জীব। সুতরাং বরাহ অবতার ভূখণ্ড আবিষ্কার করিয়াছিলেন—একথা বলিয়া সহস্র সহস্র বৎসর পূর্ব্বে আর্য্য ঋষিগণ অধুনা-আবিষ্কৃত সার সত্যের আভাস দিয়াছিলেন।

আবার জিজ্ঞাসা করি, এ কথায় অবতার প্রভুর গল্পের আনুসঙ্গিক বর্ণনা পরিত্যক্ত হইল কেন? কূর্ম্ম অবতার উভচর, তাঁহার আবির্ভাবের তাৎপর্য্য যে তিনি জলে ও স্থলে অবলীলাক্রমে বাস করিতে পারেন। তাহা হইলে তাঁহার আবির্ভাব কালে ধরণী জাগিয়া উঠিয়াছিল। আবার বরাহ অবতার আসিয়া দশন সাহায্যে মৃত্তিকা তুলিয়া Lemurian যুগের প্রবর্ত্তন করিলেন কেন? আমাদের সূক্ষ্ম দৃষ্টি নাই। স্থূল জ্ঞানে শ্রদ্ধেয়া শ্রীমতী বেসান্তের যুক্তির সারবত্তা উপলব্ধি করিতে পারি না। বরাহ অবতার হিরণ্যাক্ষ নামক দৈত্যকে সংহার

করিয়াছিলেন। বিলাতী মতের সহিত সমন্বয় করিতে গেলে এ মহাবলী দৈত্য হিরণ্যাক্ষের তাৎপর্য্য কি? এ সকল প্রশ্নের মীমাংসা হওয়া সুকঠিন। তাই আমরা মিসেস বেসান্তের মত অভ্রান্ত বলিয়া গ্রহণ করিতে পারি না।

নরসিংহরূপ সম্বন্ধেও ঐরূপ যুক্তি করা যায়; তখন দেব ও দৈত্যের নিশ্চয়ই পূর্ণ অভিব্যক্তি হইয়াছে। প্রহ্লাদের মত ভক্ত-প্রাণের অভিব্যক্তি হইয়াছে। প্রহ্লাদকে হলাহল ভক্ষণ করাইবার চেষ্টা হইল, শ্রীহরি স্বয়ং কারাগারে বসিয়া ভক্তের কালকুট ভক্ষণ করিলেন তাহা অমৃতে পরিণত হইল। শরীর রোমাঞ্চিত হইয়া উঠে—পাষণ্ডেরও প্রাণ গলিয়া যায়। হস্তী পদতলে শিশু ভক্তকে দৈত্যরাজ নিক্ষেপ করিলেন। শিশুকে আদরে বনের পশু পৃষ্ঠে তুলিয়া লইল। ভক্তের প্রতি ভগবানের কি মমতা! শেষে দৈত্য বিরক্ত হইয়া বলিল—"বাচাল ছেলে বল্ তোর কৃষ্ণ কোথায়?" মিসেস বেসান্তের মতে তখন অভিব্যক্তির নিম্নস্তরে জগত অবস্থিত। তখন কিন্তু শিশু প্রহ্লাদের মুখে সেই সার সত্য ধ্বনিত হইল। কুরুক্ষেত্রে যে সত্য ধ্বনিত হইয়াছিল, সেই কথা ভগবদ্ভক্ত প্রহ্লাদ বলিলেন—"আমার শ্রীহরি সর্ব্বত্র বিদ্যমান।" প্রাণ শিহরিয়া উঠে—স্বপ্ন বলিয়া মনে হয়। দৈত্য বলিল—"স্ফটিকস্তম্ভে আছেন?" "নিশ্চয়"! যিনি "সূত্রে মনিগণারিব" সারা বিশ্ব চরাচর জুড়িয়া বিদ্যমান, তিনি আবার স্ফটিকস্তম্ভে নাই.? প্রহ্লাদ জ্ঞানদীপ্ত, প্রধান ভক্ত। প্রহ্লাদ শিশু, তবু প্রহ্লাদ পিতাকে বলিল—"নিশ্চয়"। মহাদর্পে দানব স্ফটিকস্তম্ভ ভাঙ্গিলেন, অমনি নরসিংহ মূর্ত্তি বাহির হইল—ইন্দ্রের বর বিফল করিবেন না বলিয়া তিনি এ রকম বীভৎসরূপ ধারণ করিলেন। ধর্ম্ম সংস্থাপনের জন্য তিনি আবার অবতীর্ণ হইলেন। শরীর শিহরিয়া উঠে। প্রাণের ভিতর হইতে জয়দেবের সহিত স্বর মিলাইয়া বলিতে বাসনা হয়—

তবকরকমলবরে নখমদ্ভুতশৃঙ্গম,
দলিতহিরণ্যকশিপুতনুভৃঙ্গম্
কেশব ধৃত নরহরিরূপ,
জয় জগদীশ হরে।

কিরূপে শ্রদ্ধেয়া মিসেস বেসান্ত মহোদয়া এ গল্পে অভিব্যক্তির ক্রম দেখিলেন তাহা বলা কঠিন। অভিব্যক্তিবাদ সত্য হইলে অবশ্য মানুষ সৃষ্টি হইবার পূর্ব্বে মনুষ্য ও পশুর সম্মিলিত আকারের জীব সৃষ্টি অনিবার্য্য। কিন্তু এ গল্পের আনুসঙ্গিক বর্ণনা হইতে যতদূর বুঝিতে পারা যায়, তাহাতে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য মতের সামঞ্জস্য করিবার উপাদান বিরল বলিয়াই আমার মনে হয়।

তাহার পর—"বলিরে ছলিতে দেব হ'লেন বামন।" মিসেস বেসান্ত বলেন, ইহা দ্বারা নর-বুদ্ধির অভিব্যক্তি সূচিত হইয়াছে। ভাল কথা। কিন্তু তাহাতে ইংরাজী দৈহিক অভিব্যক্তির ক্রম বর্ণিত হইল কেমন করিয়া। বলিরাজ বড় ধর্ম্মপ্রাণ, বড় দানশীল। ব্রাহ্মণ পৃথিবীর কিছু আকাঙ্ক্ষা করে না—দগ্ধোদরের জন্য মুষ্টি ভিক্ষা করে মাত্র। ভগবান ব্রাহ্মণ বামনের রূপে বলিরাজার যজ্ঞসভায় সমাসীন হইলেন। ক্ষুদ্রকায় বামন—মাত্র ত্রিপাদ ভূমি যাচিঞা করিলেন। মাত্র ত্রিপাদ ভূমি। দুই পাদে তিনি স্বর্গ মর্ত্ত্য অধিকার করিয়া বসিলেন। বলিরাজের দান করিবার আর কিছু নাই। নশ্বর দেহমাত্র নিজস্ব ছিল। বামনদেবের ক্ষুদ্র পদপ্রান্তে দানশীল বলিরাজা লুটিয়া পড়িলেন। প্রভু তাঁহার শরীরে চরণ রাখিলেন। ধন্য বলিরাজা। জয়দেব স্তবে বলিয়াছিলেন—

ছলয়সি বিক্রমণে বলিমদ্ভুত বামন
পদনখনীরজনিতজনপাবন
কেশব ধৃত বামন রূপ
জয় জগদীশ হরে।

তাহার পর

ক্ষত্রিয়রুধিরময়ে জগদপগতপাপম
স্নপয়সি পয়সি শমিত ভবতাপম
কেশব ধৃত ভৃগুপতিরূপ
জয় জগদীশ হরে।

পরশুরাম অবতারের সহিত অবশ্য অভিব্যক্তির ক্রমের কোনও সম্পর্ক নাই। শ্রীরামচন্দ্র, শ্রীকৃষ্ণ, বুদ্ধদেব ও কল্কি অবতারের সহিতও বিলাতী অভিব্যক্তিবাদের পরোক্ষ বা প্রত্যক্ষ ভাবে কোন সম্পর্ক নাই। প্রত্যেক অবতারের জীবন নূতন ভাবে উদ্ভাসিত—প্রত্যেক বার জগদীশ্বরের অবতীর্ণ হইবার কারণ বিভিন্ন। যখন যে ভাবে তিনি ধর্ম্ম সংস্থাপন করিতে মনস্থ করিয়াছেন, যখন যেরূপের আবশ্যক হইয়াছে তখন তিনি সেই রূপ গ্রহণ করিয়াছেন।

দশাবতারের তালিকা হইতে এই শিক্ষা পাওয়া যায় যে, ভগবানের চক্ষে সকল জীবের দেহই বোধ হয় সমান। তিনি মীন বা কূর্ম্ম, বরাহ বা নরসিংহ কোনও রূপকে বীভৎস বলিয়া মনে করেন নাই। তাঁহার চক্ষে উচ্চ নীচের পার্থক্য নাই, মানব ও পশুর ভেদ জ্ঞান নাই।

আরও এক কথা। হিন্দু শাস্ত্র কেবল যে এই দশটিকেই অবতার বলিয়া থাকে তাহা নহে। অনেক বার ভগবান অবতীর্ণ হইয়াছেন, কখনও বা মানুষে

ভাবাবেশ হইয়া নর অবতারের মত ব্যবহার করিয়াছে। এই দশটি প্রধান অবতার ব্যতীত হিন্দুগণ আরও অবতার বিশ্বাস করেন। বুদ্ধদেবের পরই ভগবান শ্রীশঙ্করাচার্য্যরূপে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। অনেকে শ্রীশঙ্করাচার্য্যের নাম অবতারের নামের তালিকায় বসাইয়া থাকেন। অস্মদ্দেশীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায় শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুকে জগদীশ্বরের অবতার বলিয়া বিশ্বাস করেন। এক সম্প্রদায় শ্রীমদ্ রামকৃষ্ণ পরমহংসকে অবতার বলিয়া ঘোষণা করেন। কবীরপন্থী কবীর সাহেবকে, শিখেরা গুরু নানককে অবতার বলিয়া থাকেন। মৎস্য, কূর্ম্ম ক্রমে নামের তালিকা পুরাণে দৃষ্ট হয়। কেবল তাঁহাদিগকে বাছিয়া কোন্ মহাত্মা কবে দশ অবতারের তালিকা সম্পূর্ণ করিয়াছেন, সে তথ্য পাইবার কোনও উপায় নাই। কিন্তু সে ক্রম যে ডারবিন-প্রমুখাৎ বিলাতী পণ্ডিত-দিগের অভিব্যক্তির ক্রম হইয়া দাঁড়াইবে, নিশ্চয়ই এ সন্দেহ সে মহাত্মার হৃদয়ে স্থান পায় নাই।

শ্রীকেশবচন্দ্র গুপ্ত।

ডোমা।

(১)

ডোমা সাঁওতাল—বলিষ্ঠ, সরল, শ্রমশীল। মধ্যাহ্ন রৌদ্রে ডোমা গোলাপ বাগানের মাটি কাটিত, "হিজু আঁয়" বলিয়া ডাকিলে ডোমা হাসিতে হাসিতে ঘর্ম্মাক্ত কলেবরে আমাদের বাঙ্গালার বারান্দায় আসিয়া জিজ্ঞাসা করিত—"কি ববু?" আমরা ডোমার সহিত নানাপ্রকার বাক্যালাপ করিতাম, রসালাপ করিতাম, তাহার নিকট সাঁওতালি ভাষা শিক্ষা করিতাম। ডোমা বিরক্তিবোধ করিত না, সরল নির্ভীক ভাবে ডোমা আমাদের সহিত সুখ দুঃখের কথা কহিত। আমাদের বন্ধুত্বই ডোমার কাল হইবে সে কথা আমরা ঘুণাক্ষরে বুঝিতে পারি নাই।

ঠিক আমাদের সহিত বন্ধুত্ব করিয়া ডোমা জীবনে হলাহলের আস্বাদন পাইয়াছিল অথবা অনেক জ্ঞানী মানী ধনী লোকের মত প্রেমের দায়ে ডোমার অধঃপতন হইয়াছিল সে কথার মীমাংসা করা কঠিন। আমি প্রেমের উঃ আঃ দীর্ঘশ্বাসের কথা বলিতেছি না। সেগুলা উচ্চ নীচ সকল প্রেমিক প্রেমিকাকেই

সহ্য করিতে হয়। উঃ! আঃ! দীর্ঘশ্বাস, প্রাণের একটা দুরু-দুরু ভাব ব্যতীত এই স্বর্গীয় বৃত্তির অপর একটা উপসর্গ আছে। সেটা অর্থাভাব। কোন কবি এরূপ কুকথার উল্লেখ করেন নাই বটে, কিন্তু উত্তমরূপে—উত্তমরূপে কেন একটু নির্দ্দয়রূপে—প্রেমিক হৃদয় ব্যবচ্ছেদ করিলে তথায় ধনলালসার স্পষ্ট চিহ্ন দেদীপ্যমান থাকিতে দেখা যায়। হৃষ্ট পুষ্ট কৃষ্ণকায় ডোমার ভবিষ্যতে যে অধঃপতন হইয়াছিল, তাহার জন্য তাহার হৃদয়ের এই স্বর্গীয় মধুর বৃত্তি যে আংশিকভাবে দায়ী, তাহা সুনিশ্চিত।

আমাদের সাঁওতাল বন্ধু যে মুন্নী মেইজিনের প্রণয়াভিলাষী হইয়াছিল সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ ছিল না। মুন্নী বেশ গোলগাল নধর দেহ সাঁওতাল যুবতী —যেন কালো পাথরের গ্রীক প্রতিমূর্ত্তি। রমেশ বলিত—"বেটী যেন পাষাণ প্রতিমা।" ডোমা যখন আপন মনে গোলাপ বাগানে 'কোদাল পাড়িত' তখন সেই পাষাণ প্রতিমা শিরে কলসী লইয়া, সাঁওতালী সাড়ির 'রাঙ্গা' আঁচলটি বক্ষের উপর বিন্যস্ত করিয়া আমাদের কূপে জল তুলিতে আসিত। ডোমা তাহার দিকে চাহিয়া থাকিত, অধর কোণে হাসিয়া মুন্নীর দিকে চাহিত, আবার চারিচক্ষের মিলন হইলে উভয়ে মুখ ফিরাইত, চারিদিকে তাকাইয়া দেখিত কেহ তাহাদিগের লক্ষ্য করিতেছে কি না। অবশ্য তাহাদের প্রেমের অভিনয়ে ওসমান ছিল না। তবু সরমের খাতিরে যুবতী পাষাণ প্রতিমা চারিদিকে চাহিত। আমরা ঘরে বসিয়া গবাক্ষ-রন্ধ্র দিয়া তাহাদের কাণ্ড কারখানা দেখিয়া হাসিতাম, বলিতাম—"বেশ বাবা কন্দর্প ঠাকুর! পাত্র পাত্রী জ্ঞান নাই, কালো সাদার জ্ঞান নাই। খুব রুচি!"

একদিন শৈলেন্দ্র ডোমাকে ডাকিল—হিজু আঁয়। হিজু আঁয়।

সস্মিত ডোমা দালানে আসিল। শৈলেন্দ্র বলিল—এই বেটা! ও আই-মাইটা কে?

ডোমারই শিক্ষিত বিদ্যা। আইমাই অর্থে স্ত্রীলোক—একটু বয়োধিকা স্ত্রীলোক।

ডোমা প্রতিবাদ করিয়া বলিল—এঃ ববু! আইমাই কি আছে? কুড়ি আছে।

আমরা হাসিলাম। কুড়ি অর্থে যুবতী। স্পষ্ট লক্ষণ। রমেশ বলিল—বেটা ডোমা ঐ কুড়িটাকে বুঝি সাদি করবি? বিহা করবি?

ডোমা বলিল—হ্যাঁ বাবু মতলব করছি। তো রূপেয়া কোথা পাব, কেমন ক'রে বিহা করব?

প্রেমের গুপ্ত শত্রু অর্থাভাব—ছায়ার মত প্রেমের অনুসরণ করে। ডোমাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, বিবাহ করিতে আবার অর্থের কি প্রয়োজন ?

ডোমা বুঝাইল। বলিল—এঃ ববু! রূপিয়া চাহিবে না। ওকুরাকে রাঙ্গা লুগা দিতে হোবে, মুরগি কাটতে হোবে, শূয়োর কাটতে হ'বে, তবে না সাদি হ'বে। গাঁয়ের লোক এমনি ছাড়বে ? সাদি হোবে তো খাবে না ?

সাঁওতালী ভাষায় মুর্গীকে বলে সিম, অণ্ডকে বলে বিল্লি। রমেশ তাহার উচ্চারণ অনুকরণ করিয়া বলিল—"তোর সাদি হোবে তো আমাদের সিম্ খিলাবি ? বিল্লি খিলাবি ?"

ডোমা বলিল—কাহে না ববু ?

(২)

কয়েক জন বন্ধু মিলিয়া পূজাবকাশে এস্থলে আসিয়াছিলাম। কোন কাজ কর্ম্ম ছিল না। তাই ডোমা ও তাহার প্রণয়িনীর প্রসঙ্গ লইয়া দিন কাটাইতাম। আর ষড়যন্ত্র করিতাম কিরূপে কৃপণ জিতেন্দ্রকে প্রতারণা করিয়া কিছু অর্থ সংগ্রহ করিব। সে দিন জিতেন্দ্র মধ্যাহ্নে গাঢ় নিদ্রায় অভিভূত ছিল। আমরা ভিন্ন কক্ষে বসিয়া তাহাকে প্রতারিত করিবার নানারূপ কৌশল উদ্ভাবন করিতেছিলাম। সে খুব ধূর্ত্ত। দেখিলাম তাহার বাক্স হইতে চুরি করিতে না পারিলে তাহার অর্থে আমাদের রসনার সুখ সম্পাদন করিবার আশা বিফল হইবে। আমরা বসিয়া সে বিষয় আলোচনা করিতেছি এমন সময় ডোমা-মন-মোহিনী মুন্নী শিরে "কাড়া" লইয়া আমাদের ফটকের ভিতর প্রবেশ করিল। শৈলেন্দ্র বলিল—আজ মুন্নীর সঙ্গে কথা কইতে হ'বে। ডোমা হিংসেতে জ্বলবে এখন।

আমরা তাহার মতের অনুমোদন করিলাম। ইত্যবসরে মুন্নী আমাদের দালানের নিকট আসিল। শৈলেন্দ্র বলিল—ওকারেম তাহেনা! (কোথা থাক ?)

যুবতী কিছু বলিল না। মৃত্তিকার দিকে চাহিয়া একটু দ্রুত চলিতে লাগিল। শৈলেন্দ্র আবার বলিল—"এ কুড়ি ওকারেম ওড়ে আমাং"। অর্থাৎ যুবতী তোমার গৃহ কোথা ?

ভীতা কুরঙ্গিনীর মত যুবতী আরও দ্রুত গতিতে কূপের দিকে চলিল। আমরা শৈলেন্দ্রকে লইয়া রঙ্গ করিতে লাগিলাম। ছিঃ ছিঃ সে সামান্য একটা কৃষ্ণকায় সাঁওতাল রমণীর নিকট এতটা উপেক্ষিত হইল! তাহার প্রতিদ্বন্দ্বী

ডোমা! যুবতী মুন্নীর চক্ষে ডোমার কৃষ্ণবর্ণ, অসুর দেহের যে মূল্য আছে, শৈলেন্দ্রের কোমল দেহের কোঁকড়া চুলের সে টুকু আদর নাই! কি মনস্তাপ!

শৈলেন্দ্র সহজে ক্রুদ্ধ হইবার লোক নহে। সে বলিল—এ ডোমা বেটার কারসাজি। বেটা নিশ্চয় ভুল সাঁওতালি শিখিয়ে দিয়েছে।

আমরা বলিলাম—কেন তার তো পরীক্ষা হ'য়েছে। প্রথম সে যে কথার যে তর্জ্জমা করেছিল দু ঘণ্টা বাদে সে সেই কথার ঠিক সেই তর্জ্জমা করেছিল। ও কি আর ভুলটা মনে করে রেখে আবার মিলিয়ে দিতে পারে?

শৈলেন্দ্র মনে মনে অবশ্য একটু অবমানিত হইয়াছিল। সে বলিল—না। ও বেটা নিশ্চয় চালাকি করেছে। এই ডোমা মাজি। হিজু আঁয়।

ডোমা কোদাল ছাড়িয়া বহুক্ষণ ধরিয়া আমাদের কার্য্যকলাপ পর্য্যবেক্ষণ করিতেছিল। তাহার লজ্জাবনতমুখী প্রণয়িনী শৈলেন্দ্রের প্রশ্নের উত্তর দেয় নাই, গোলাপ গাছের অন্তরাল হইতে ডোমা তাহাও লক্ষ্য করিয়াছিল। শৈলেন্দ্রের আহ্বানে হাসিতে হাসিতে ডোমা আমাদের দিকে আসিল।

কৃত্রিম কোপ প্রদর্শন করিয়া শৈলেন্দ্র বলিল—বেটা আজ তোকে মেরে ফেলব। মামুই তু ইমে। (তোকে মারব।)

ডোমা অভ্যাস মত দশনপংক্তি বিকসিত করিয়া বলিল—কেন কি হোলো ববু?

শৈলেন্দ্র—বেটা! কি হ'ল? ভুল সাঁওতালি শিখিয়ে দেওয়া। আজ বেটাকে মামুই তু ইমে করব। বেটাকে মেরে ধূড়ি (ধূলা) করে দব। সিত্তা, পুষি, শুকরি, হন (কুকুর, বিড়াল, শূকর, ইন্দুর)।

ডোমা হাসিতে লাগিল। বাহাদুরী মেজাজের। এত গালাগালিতে ডোমা ক্রুদ্ধ হইল না। সে পূর্ব্ববৎ হাসিতে হাসিতে বলিল—"কেন কি হোলো ববু?"

শৈলেন্দ্র বলিল—হ'ল তোর মাথা। বেটা তোর ঐ স্ত্রীলোকটার সঙ্গে সাঁওতালি বুলিতে কথা কইলাম ও জবাব দিলে না। নয় ও নিজের বুলি বোঝে না আর না হয় তো তুই ভুল্ সাঁওতালি শিখিয়েছিস্।

ডোমা বলিল—সরম লাগে ববু তাই বাৎ বোললে না। আচ্ছা আমি বলিয়ে দিচ্ছি।

রমণী মস্তকে জলপূর্ণ কলসী লইয়া ফিরিয়া আসিল। ডোমা তাহার সহিত সাঁওতালি বলিতে আরম্ভ করিল। সে ভাষার একটা বর্ণও বোধগম্য হইল না। রমণী বাস্তবিক লজ্জিতা হইয়াছিল।

শৈলেন্দ্র সুবিধা বুঝিয়া বলিল—ওকারেম ওড়ে আমাং? (তোমার ঘর কোথায়?)

যুবতী মৃদুস্বরে বলিল—"অণ্ডে" (ঐ স্থলে)। অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া মুন্নি তাহার গৃহ দেখাইয়া দিল। অবশ্য আমরা তাহার গৃহ চিনিতাম।

শৈলেন্দ্র বলিল—নোয়া চি আতো? (এটা কি গ্রাম?)

যুবতী গ্রামের নাম বলিয়া চলিয়া গেল। শৈলেন্দ্র বলিল—ডোমা বেটা, ও বেশ ভাল বহু হ'বে। ওকে বাপ্‌লা ইমে (বিবাহ) করছিস না কেন?

ডোমা বলিল—আগে বলছিলাম না ববু? পয়সা কোথা? সাদিতে হাঁড়িয়া খেতে হয়, কত পয়সার দরকার।

শৈলেন্দ্র বলিল—আচ্ছা বেটা আমার সঙ্গে আজ সাঁঝের বেলায় বেড়াতে যাস, কি ক'রে পয়সা রোজগার করতে হয় শিখিয়ে দেব।

আমরা সকলে শৈলেন্দ্রের শিষ্যত্ব গ্রহণ করিতে স্বীকৃত হইলাম। সে আমাদের সে অমূল্য বিদ্যা দান করিতে সম্মত হইল না। সন্ধ্যার পর ডোমাকে লইয়া বাস্তবিকই শৈলেন্দ্র ভ্রমণ করিতে বাহির হইল। তাহার ও ডোমার বন্ধুত্ব সম্বন্ধে বন্ধুদিগের মধ্যে নানারূপ আলোচনা হইতে লাগিল। জিতেন্দ্র বলিল—মাথামুণ্ডু অপর কিছুই হ'বে না। শৈল ওর কাছ থেকে আরও কতকগুলা সাঁওতালি বুলি শিখে আমাদের জ্বালাতন করবে।

আমি বলিলাম—মন্দ কি? বিজাতীয় ভাষার বুক্‌নি সময়ে সময়ে লাগে ভাল।

(৩)

আমরা কয়েকজন বন্ধু মিলিয়া যে স্থলে পূজার ছুটিতে অজ্ঞাতবাস করিতেছিলাম, সে স্থলটি মধুপুরের সন্নিকটে। সে স্থলটি হইতে কলিকাতার বাবুর দল অসুরবিক্রমে স্বভাবের সৌন্দর্য্য টুকু বিনষ্ট করিতে পারে নাই। সেখানে শাল, মহুয়া প্রভৃতির ঘন বন পাঁচ সাত খানি বাটীকে ঘিরিয়া স্থলটিকে বেশ মনোরম করিয়া রাখিয়াছে। দেশের নাম করিতেছি না প্রতিজ্ঞা ভঙ্গের ভয়ে। বন্ধুগণ পরস্পরের নিকট শপথ করিয়াছিলাম যে ১৯১৩ সালের পূজার ছুটি আমরা কোন্ দেশে অতিবাহিত করিয়াছিলাম তাহা কাহারও নিকট ব্যক্ত করিব না।

আমাদের বাটীর উত্তর দিকে মাত্র কয়েকখানি অট্টালিকা ছিল। সেগুলিও আমাদের বাড়ির দূরে অবস্থিত ছিল। পশ্চাতে ও দক্ষিণে শাল ও মহুয়ার বন অসমতল ভূমিকে আবৃত করিয়া রাখিয়াছে। আমাদের সম্মুখে পশ্চিম দিকে

একটা বিস্তৃত প্রাঙ্গণ, তাহার পর একটি স্বল্পতোয়া পার্ব্বত্য নদী। নদীর পর-পারে দুইটি পাহাড়। একটি পাহাড় বহুদূর বিস্তৃত, অপরটি ক্ষুদ্রকায়। আমাদের বাটীর বারান্দায় বসিলে দুইটি পাহাড়ের মধ্যবর্ত্তী উপত্যকাটি বড় সুন্দর বলিয়া মনে হইত। শষ্প-শ্যামল সুদীর্ঘ উপত্যকা—তাহার দিকে চাহিলে চক্ষু জুড়াইত, প্রাণ মন নাচিয়া উঠিত। আমাদের একজন বন্ধু স্থলটির নামকরণ করিয়াছিলেন,—"মনোরমা উপত্যকা"।

মনোরমা উপত্যকার এক পার্শ্বের বিস্তৃত পাহাড়ের গাছের ভিতর দিয়া ক্ষুদ্র একটা গৃহের মত পদার্থ দৃষ্টিগোচর হইত। আমরা দুই তিন দিন সে স্থলে পৌঁছিবার চেষ্টা করিয়াছিলাম। নদীর ওপারে ভাঙ্গন। একেবারে প্রায় বিশ হাত উচ্চ পরিখা। রাস্তা বলিয়া দিবার কেহ নাই। ডোমার নিকট হইতে গৃহে বসিয়া যে পথের সংবাদ পাইতাম, নদীকূলে গিয়া সে পথের সন্ধান পাইতাম না।

দ্বাদশীর দিন ডোমাকে বলিলাম—ডোমা, চল্ পাহাড়ের পথ দেখিয়ে দিবি চল।

ডোমা বলিল—যাওনা বাবু ঐতো পথ।

শৈলেন্দ্র বলিল—না বেটা তোকে যেতে হবে। হয় দেখিয়ে দিতে। তিনে ঝলা? (কত দূর?)

জিতেন্দ্র বলিল—আবার সাঁওতালি কথা! বাবা! না ক্ষেপিয়ে ছাড়বে না।

আমরা হাসিলাম। শৈলেন্দ্র সাঁওতালি বুকনি দিবে না বলিয়া প্রতিশ্রুত হইল।

নদীতে কেবল বালি। যেখানে খুব গভীর সেস্থলে এক হাত জল। খানিকটা বালির উপর দিয়া তো কোন প্রকারে একটা পথ পাইলাম। পথ আর কিছুই না, জমি ফাটিয়া ছোট গিরিস্রোত সেই পথে নদীতে আসিয়া পড়িয়াছে। সকলে বিশ্রাম করিবার জন্য বসিলাম।

আমি বলিলাম—হ্যাঁরে ডোমা! বাবু তোকে পয়সা রোজগার করবার কি উপায় শিখিয়ে দিলে?

ডোমা বলিল—কি আর শেখাবে ববু?

শৈলেন্দ্র বলিল—বড় দাতেতাজ খুড়ি তৃষ্ণা পেয়েছে। বলছি কি শিখিয়েছি।

শৈলেন্দ্র নদীর স্বচ্ছ জল পান করিল। আমরা আবার চলিতে লাগিলাম। চলিতে চলিতে শৈলেন্দ্র বলিল—আমি ভাই নানা রকম জেরা করে ডোমার

কাছ থেকে একটা সন্ধান পেয়েছি। সাঁওতালেরা ভারি সরল আর সাধু, তা না হ'লে এখনি ডোমা অনেক টাকা রোজগার করতে পারে।

সকলে বিষয়টা জানিবার জন্য ব্যগ্র হইলাম। শৈলেন্দ্র বলিল—এই গ্রামের আশে পাশে পাঁচ সাতটা সাঁওতালী পীঠস্থান আছে, গ্রাম থেকে ভূত তাড়াবার জন্যে ওদের দেশের রাজা—ভগবান জানেন বেটা কে—প্রতি বৎসর প্রত্যেক পীঠস্থানে এক একটা সোনার টুকরো পুঁতে রাখে। ডোমা বেটা সে স্থানের সন্ধান জানে। কিছুতে বেটা সে সোনা বার করবে না। বেশী না, একটা টুকরো বার করতে পারলে বেটার একটা ছেড়ে পাঁচ সাতটা বিয়ে হ'য়ে যায়।

গল্প করিতে করিতে আমরা মনোরমা উপত্যকায় আসিয়া পৌঁছিলাম। বাস্তবিক মনোরম স্থল। আমরা সে স্থলের সৌন্দর্য্য উপভোগ করিবার জন্য একবার বসিলাম। তাহার পর পাহাড়ের উপর উঠিতে আরম্ভ করিলাম।

পথে নীতিশাস্ত্রের আদ্যশ্রাদ্ধ চলিতে লাগিল। সাঁওতাল জাতির সাধুতা যে প্রকৃতপক্ষে নীতিজ্ঞান হইতে উদ্ভূত নহে, উহা যে ভয়প্রসূত সে বিষয়টা আমাদের মস্তিষ্কে প্রবেশ করাইবার জন্য জিতেন্দ্র বিধিমতে চেষ্টা করিতে লাগিল। এবিষয়ে শৈলেন্দ্র তাহার পক্ষ অবলম্বন করিল।

(৪)

আমরা পাহাড়ের উপর যে স্থলটি দেখিতে গিয়াছিলাম ভক্তের ভাষায় তাহাকে মন্দির বলে। বাস্তবিক সেটি দুই হাত আড়াই হাত উচ্চ সামান্য একটি কুলঙ্গীর মত। ভিতরে প্রতিমা বিগ্রহ কিছুই নাই। একদিকের প্রাচীরে কতকটা সিঁদুরের দাগ আছে।

ডোমা খুব ভক্তিভরে স্থানটিকে প্রণাম করিল। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম—ডোমা, এ কিসের মন্দির রে?

ডোমা বলিল—ধরিত্রীর মন্দির।

হরি! হরি! পাহাড়ের উপর ধরিত্রীর মন্দির। ডোমার দেবীর উপর অবশ্য আমাদের ভক্তি হইল না।

শৈলেন্দ্র ও জিতেন্দ্র একদিকে বসিয়া কথা কহিতেছিল। কৃপণ হইলেই লোকে লোভী হয়—বিশেষ যাহারা ব্যবসা বাণিজ্য করে। জিতেন্দ্র ডোমার আরাধ্যা ধরিত্রীদেবীর প্রোথিত সুবর্ণের সন্ধান লইবার জন্য শৈলেন্দ্রের সহিত পরামর্শ করিতেছিল।

শৈলেন্দ্র বলিল—ডোমা! বাপ্ ডমু! অনেক অনেক কুড়ি (যুবতী) দেখেছি বাবা কিন্তু তোর মুন্নি ঠিক গোলাপ বাহার (ফুলের) মত।

ডোমা বলিল —আ ববু! সাঁওতাল সব কালো।

শৈলেন্দ্র বলিল—দূর বেটা। কালো রঙ্ পাকা রঙ্। তোর মুন্নির বেশ চোখ। পুঁটি আহার (মাছ) দেখেছিস্—তার মত।

আমরা হাসিতে লাগিলাম। ডোমাও হাসিল।

শৈলেন্দ্র বলিল—তুই কবে বাপলা ইমে (বিবাহ) করবি? তোর রুয়ো কানা (দুঃখ) হয় না?

বেশ শীতল মলয় বহিতেছিল। দূরে আমাদের বাসস্থান দেখা যাইতেছিল। নদীটি সাপের মত বক্র গতিতে বহিতেছিল। পাহাড়ের উপর হইতে বড় সুন্দর দেখাইতেছিল। এরূপ স্থলে শৈলেন্দ্রের পাগলামী এক রকম লাগিতেছিল ভাল।

শৈল বলিল—বাপ্ ডমু! তোর মত আমার অবস্থা হ'লে "বোহো"তে (মাথায়) বিং (সাপ) কামড়েচে মনে হ'ত। কেন বেটা সাদি করছিস্ না?

ডোমা বলিল--বলেছি তো ববু! পয়সা কোথা?

শৈলেন্দ্র বলিল—বিশ্ টাকা হ'লে সাদি হয়? বারিয়া গেল (দু' দশ) টাকা হ'লে হয়?

ডোমা বলিল—হয়।

শৈলেন্দ্র বলিল—জিতেন দাওতো বিশ টাকা।

জিতেন পকেট হইতে দুই কেতা নোট বাহির করিল। ডোমা নোট চিনিত। প্রত্যেক খানার দাম যে দশ টাকা তাহা ব্যক্ত করিল। লোভ-লোলুপ দৃষ্টিতে সে সেই টাকার দিকে চাহিয়া রহিল।

শৈলেন্দ্র বলিল—দেখ্ বাবা ডোমা! বাপ্ ডমু, ডম্ ডমু! যদি সেই সোনা খুঁড়ে বার করতে পারিস—

ডোমা বলিল—না ববু না ববু। ধরিত্রী রাগ করবেন। ববু বড় বড় ভূত দানা আসিয়ে আমায় খাইয়ে ফেলবে। না ববু। না ববু।

শৈলেন্দ্র বলিল—শোন্‌না বেটা—

আমি বিরক্ত হইলাম। অপরাপর বন্ধুরা বিরক্ত হইল। ছিঃ! ছিঃ! কেন সরল সাধু অসভ্য ডোমাকে অর্থের প্রলোভন দেখাইয়া, কামিনীর লোভ দেখাইয়া তাহারা অধর্ম্ম অর্জ্জন করিতেছে তাহা বুঝিতে পারিলাম না। তাহার

সরল প্রাণে অধর্ম্মের বীজ বপন করিলে ভবিষ্যতে তাহা বিষবৃক্ষে পরিণত হইবে, চিরজীবনের জন্য দরিদ্র ডোমা প্রকৃত শান্তি হারাইয়া বিষাদগ্রস্ত হইবে সে কথা তাহাদিগকে বুঝাইয়া বলিলাম। তাহারা ভদ্রলোক শিক্ষিত লোক হইয়া কেন এরূপ গর্হিত কার্য্য করিতে উদ্যত হইয়াছে তাহা বুঝিতে পারিলাম না। লোভান্ধ জিতেন্দ্রই যত অনিষ্টের মূল।

তাহারা আমাদের কথায় ভ্রূক্ষেপ করিল না। তর্ক করিল। নরকে যাইতে হয় তাহারা যাইবে,আমাদের তাহারা টানিয়া নরকে লইয়া যাইবে না। ডোমাকে সভ্য করিতে যদি কোনও পাপ থাকে সে পাপের ভাগী হইবে তাহারা। সুবর্ণ উপভোগের জন্য—অজ্ঞ ব্যক্তিদিগের কুসংস্কার বশে উহা মৃত্তিকা তলে প্রোথিত করিয়া রাখিবার জন্য নহে। ভূমি হইতে সোনার টুকরা তুলিয়া লইলে কাহার কি অনিষ্ট হইবে? কিন্তু তাহার দ্বারা ইষ্ট হইবে অনেকের। প্রথমতঃ ডোমা বেচারা বিবাহ করিয়া প্রাণের জ্বালা নিভাইবে—নিরাশ প্রণয়ের কঠোরতার যন্ত্রণা হইতে রক্ষা পাইবে। আমাদের বন্ধু জিতেন্দ্রনাথ কিছু লাভ করিবে। এরূপ কার্য্যে ন্যায়ত ধর্ম্মত লোকত কি আপত্তি থাকিতে পারে?

যাহার জিহ্বাগ্রে দুষ্ট সরস্বতী আশ্রয় গ্রহণ করেন তাহার বাগ্মীতায় পরাজিত হওয়া অসম্ভব নহে। আমরা সেই অধর্ম্মের অভিনয়ের নীরব দ্রষ্টা হইলাম। ডোমা—সরল সাধু-প্রকৃতি শ্রমজীবী ডোমা বিবেকের সহিত একটা রফা-রফিয়ত করিয়া লইল। ধরিত্রীদেবীর অর্থ অপহরণ করিলে দোষ, হস্তদ্বারা স্পর্শ করিলে দোষ। গুপ্তস্থান দেখাইয়া দিলে দোষ নাই। পঁচিশ টাকা পাইয়া সে একটি স্থান দেখাইয়া দিল। জিতেন্দ্র মাটি খুঁড়িয়া প্রায় তিন শত টাকা মূল্যের সোনার টুকরা বাহির করিল। অপর সাঁওতালেরা সংবাদ পাইলে অনিষ্ট ঘটিবে বুঝিয়া সে তাড়াতাড়ি সেই সুবর্ণখণ্ড বস্ত্রের মধ্যে লুক্কায়িত করিল। হায় অর্থলিপ্সা!

(৫)

কলিকাতায় প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছিলাম। ভবিষ্যতে অন্ততঃ আর জিতেন্দ্রের সহিত ঘনিষ্ঠতা রাখিব না আমি সে বিষয়ে এক প্রকার স্থির সিদ্ধান্ত করিয়াছিলাম। শৈলেন্দ্র আমাদিগকে প্রীতি-ভোজনে নিমন্ত্রণ করিয়াছিল। আমাদের যে পাঁচজন বন্ধু প্রবাস-বাস করিতে গিয়াছিলেন তাঁহারা ব্যতীত অপর দুইজন নিমন্ত্রিত হইয়াছিল।

স্বভাবতঃ আমরা প্রবাসের গল্প করিতেছিলাম, সাঁওতালজাতির সমালোচনা হইতেছিল, তাহাদের মধ্যে বিশ্বাসঘাতকতা জুয়াচুরি প্রভৃতি অপরাধ অপরিজ্ঞাত ছিল, তাহাদের শ্রমশীলতা বড়ই প্রশংসাযোগ্য। কৃষিকার্য্যে তাহারা আমাদের বাঙ্গালী কৃষক অপেক্ষা দক্ষ তবু তাহারা এত দরিদ্র যে সামান্য ভুট্টা সিদ্ধ করিয়া আহার করিয়া থাকে। কেহ বলিল তাহারা বড় সত্যনিষ্ঠ, কেহ বলিল—কিন্তু মহুয়া ও হাঁড়িয়া পান করিয়া তাহারা বড় মাতাল হইয়া উঠে।

এইরূপ সমালোচনা অবশ্য আহারান্তে হইতেছিল। শৈলেন্দ্র বলিল—হ্যাঁ জুয়াচুরি জানে না বটে তবে শেখালে শেখে।

আমি বলিলাম—হ্যাঁ! শেখালে শেখে! আমার বোধ হয়—ওরা যে রকম সরল—জুয়াচুরি ওদের মাথায় আসে না। তোমার বন্ধু ডোমা বেটাকেই মনে কর না।

শৈলেন্দ্র হাসিয়া বলিল—আচ্ছা বলছি। ডোমা বেটা কেমন জুয়াচুরি শিখেছিল বল্‌ছি। বল দেখি আজ কা'র পয়সায় খেলে?

আমরা বিস্মিত হইয়া তাহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিলাম। সকলে এক-বাক্যে বলিলাম—কেন তোমার।

শৈলেন্দ্র বলিল—ভুল বিশ্বাস। আজকের খাওয়ার জন্যে তোমরা জিতেন্দ্রকে ধন্যবাদ দাও। খাওয়াটা তার টাকা থেকে হ'য়েছে বরং এক টাকা পৌণে পাঁচ আনা বাকী আছে।

জিতেন্দ্র বলিল—কি রকম?

শৈলেন্দ্র বলিল—সেখানে দেখলাম জিতেন্দ্র কোন প্রকারে পয়সা খরচ ক'রে আমাদের খাওয়াবে না অথচ লোকটার যথেষ্ট পয়সা আছে। তখন ডোমাকে শিখিয়ে একটা অভিনয় করলাম। তোমরা কি সত্য বিশ্বাস করলে যে আমি ধরিত্রী দেবীর সোনা চুরি করলাম। আর সাঁওতাল রাজা ছেড়ে বাদসাহেরও ক্ষমতা নেই যে অত বড় সোণার তাল মাটির তলায় পুঁতে রাখে।

আমরা একাগ্রচিত্তে শুনিতেছিলাম। আমার হৃদয়ের একটা ভার কাটিতেছিল। শৈলেন্দ্রের উপর যে অশ্রদ্ধা জন্মিয়াছিল তাহা লোপ পাইতেছিল। সে বলিল—না ভাই তা করিনি। আমার কাছে একটা পিতলের তাল ছিল। ডোমার সাহায্যে সেটাকে পুঁতিয়ে রাখি, প্রেমিক ডোমা বেটাকে পাখি পড়াবার মত সোনার তালের গল্প শেখাই, অভিনয় করতে শেখাই তার ফলে পেতল দিয়ে জিতেন্দ্র ভায়ার কাছ থেকে পঁচিশটি টাকা আদায় হয়।

আমরা আনন্দে করতালি দিলাম। জিতেন্দ্রের মুখ রক্তবর্ণ ধারণ করিল। শৈলেন্দ্র বলিল—আমি তা থেকে পাঁচ টাকা ডোমাকে দিই আর কুড়ি টাকা তোমাদের খাওয়াবার জন্যে রেখেছিলাম। অবশ্য সোনাটা জিতেন্দ্র পরিবারের অলঙ্কার নির্ম্মাণ করবার জন্যে রেখেছে।

জিতেন্দ্রের সর্ব্বশরীর কাঁপিতেছিল। আমি বলিলাম—তা' হ'লে সাঁওতালদেরও শেখালে শেখে।

(৬)

বাস্তবিক শিখাইলে শিখে। অন্ততঃ, ডোমা শিখিয়াছিল। সরল-হৃদয় ডোমা সেই শিক্ষার ফলে মুন্নির পাণিগ্রহণ করিয়াছিল। কিন্তু জীবনে একটা বিষম শাস্তি পাইয়া সে নূতন শিক্ষা লাভ করিয়াছিল। নরম মাটিতে দাগ—পুড়াইলে আরও গাঢ় হয়।

এই আখ্যায়িকা বর্ণিত ঘটনার প্রায় পাঁচ মাস পরে গিরিডি ম্যাজিষ্ট্রেটের কোর্টে এক মোকদ্দমা করিতে গিয়াছিলাম। আসামীর কাটগড়ায় এক সাঁওতাল আসামী। মোকদ্দমা প্রতারণার। আসামী একজন বাঙ্গালীকে দেব মন্দিরের নিকট মাটীর ভিতর হইতে সোনা বাহির করিয়া পঞ্চাশ টাকা গ্রহণ করিয়াছে। বাবু পরে বুঝিয়াছেন পদার্থটা সোনা নহে পিতল।

আমি বিস্মিত হইয়া আসামীর দিকে চাহিলাম। সর্ব্বনাশ! আসামী ডোমা। শিখাইলে শিখিতে পারে! আমার শরীর কাঁপিতেছিল। কুশিক্ষার ফলে বেচারার কি দুর্দ্দশা!

হাকিমও বিস্মিত হইয়া মোকদ্দমা শুনিলেন তিনি বলিলেন—এ বুদ্ধি আসামী কোথা হ'তে পেলে?

ডোমা কাঁদিতেছিল। সে বলিল—হুজুর এক বাঙ্গালী শিখিয়েছিল। আমার বংশে কেহ কখনও জেল খাটেনি, আমার গ্রামে কখনও পুলিস কারেও ধরেনি হুজুর। এ কাজ আর কখনও কর্‌ব না।

হাকিম বলিলেন—টাকা নিয়ে কি করেছিস?

রোরুদ্যমান ডোমা বলিল—সাদি করেছি হুজুর, টাকা দিয়ে সাদি করেছি। মুন্নির সাথে সাদি—

আর বলিতে পারিল না। ডোমা পরিশ্রম করিতে ভয় করে না, জেলের অন্ন তাহার গৃহের অন্নের অপেক্ষা উৎকৃষ্ট। কিন্তু ডোমা কাঁদিতেছিল তাহার বংশের জন্য, গ্রামের জন্য, নব-পরিণীতা স্ত্রীর জন্য, নিজের ইজ্জতের জন্য। শৈলেন্দ্রের শিক্ষিত বিদ্যার জন্য ডোমাকে হাকিম শাস্তি দিলেন—তিন মাস সশ্রম কারাবাস!

ডোমা বালকের মত কাঁদিতে লাগিল। ফুঁফাইয়া বলিল—হুজুর যদি ইজ্জত নিলেন তো ফাঁসি দিন। এ জানে আর কাজ কি?

আমি চক্ষু মুছিতে মুছিতে বিচারগৃহ হইতে বাহিরে আসিলাম।

শ্রী কেশবচন্দ্র গুপ্ত।

গান।*

বিহারীলাল যে এখনকার কালের একজন উৎকৃষ্ট সঙ্গীত-রচয়িতা, সে কথা বোধ করি, নূতন করিয়া বলিতে হইবে না। কি ধর্ম্ম-সভা, কি সাহিত্য-সভা,

* গান (প্রথম উচ্ছ্বাস) শ্রীবিহারীলাল সরকার প্রণীত। মূল্য।০ আনা। গুরুদাস-লাইব্রেরীতে প্রাপ্তব্য।

কি স্মৃতি-সভা, প্রায় সকল রকমের সকল সভাতেই বিহারীলালের গান গীত হইয়া থাকে। অতএব, তাঁহার রচিত একটা-না-একটা গান শোনেন নাই, শিক্ষিতের মধ্যে এমন লোক বোধ করি খুব কমই আছেন।

তবে তাঁহার গানের আলোচনা কেন? আলোচনা—তাঁহার আধুনিক গানের নহে। প্রায় ১১।১২ বৎসর পূর্ব্বে "গান" নাম দিয়া তিনি যে একখানি গানের বহি লিখিয়াছিলেন, তাহারই সম্বন্ধে আজ কিছু বলিব। সে সঙ্গীতের সহিত আধুনিক অধিকাংশ পাঠকই তেমন পরিচিত নহেন। সেইজন্য, তাহার সম্বন্ধে কিছু বলা কর্ত্তব্য বোধ করি। নহিলে, পরিচিতের নূতন করিয়া পরিচয় দিবার ইচ্ছায় এটুকু লিখিতে বসি নাই। বিহারীবাবুর রচিত আধুনিক গীত-গুলির প্রায় অধিকাংশই পাঠক-সমাজে সুপরিচিত।

দান্তে বলেন,—"Song can scarce be of any worth unless the song proceed from the heart, nor can song proceed from the heart unless pure and sincere love be there." বাস্তবিক, অন্তরের কথা না হইলে গান হয় না। আবার বিশুদ্ধ—অকপট প্রেম যে হৃদয়ে নাই, সে হৃদয় হইতেও সঙ্গীত-উৎপত্তির সম্ভাবনা নাই। গান—প্রেমিক হৃদয়ের একটা উচ্ছ্বাস প্রকাশের চেষ্টা করে। বিহারীবাবুর গানগুলি এই কথার প্রকৃষ্ট প্রমাণ। গানগুলি পড়িবার সময়, বেশ বুঝা যায় যে, ইহা প্রেমপূর্ণ হৃদয়ের সরল, স্বাভাবিক উচ্ছ্বাস। কবির আন্তরিক কথা তাহাতে আছে। বলিতে কি, ভগবানে তাঁহার অকৃত্রিম গভীর প্রেম দেখিয়া অনেক সময় চক্ষের জল রাখা যায় না। সন্তান-শোকে ব্যথিতচিত্তে তিনি গাহিয়াছেন,—

"ব্যথাহারী ব'লে হরি!
ভালবাস কি হে ব্যথা দিতে?
ব্যথা দিয়ে তাই কি হে,
চাহ ব্যথা ঘুচাইতে?"
* * * * *
কেন,—তোমার হাসা চাঁদ
আঁধারে মিশায়?
কেন,—তোমার ফোটা কমল
নিশীথে শুকায়?
কেন,—সন্ধ্যাচ্ছায়া পড়ে
গোধূলি গগন-গায়?
লীলাময়! তোমার এ সব লীলা
না পারি বুঝিতে?

অগ্নির উত্তাপে যেমন স্বর্ণের মলা-মলিনতা দূর হইয়া বিশুদ্ধ কান্তি ফুটিয়া উঠে, শোকাগ্নির দ্বারা কবিরও সেইরূপ হইয়াছে, শুদ্ধ বুদ্ধ ভাব তাঁহার ফুটিয়া উঠিয়াছে। পরক্ষণেই তিনি বলিয়াছেন,—

"আমার এ সব কিছু, বুঝে কাজ নাই;
আমি বুঝিতে না চাই। (কাজ নাই)
যদি ব্যথা না পে'লে
তোমার নাহি পাই;
যদি ব্যথা না পে'লে
তোমার ভুলে যাই;
তবে ব্যথা দিও, ব্যথা দিও,
দিও না, তোমার নাম ভুলিতে।"

এ অকৃত্রিম ঈশ্বর-ভক্তি, ভগবানে এমন অপরিসীম বিশ্বাস, আজকালকার সচরাচর সঙ্গীতে বড় একটা দেখিতে পাওয়া যায় না। কবিবর ওয়ার্ডসওয়ার্থ বলিয়াছিলেন,—"A deep sorrow hath humanised my soul." কবি বিহারীলাল বলিতেছেন,—

"হরি! আমি দুখ ভালবাসি,—সুখ-সাধ নাই হে।
আমি জনমে জনমে যেন দুঃখ পাই হে।
* * * * *
দুখেই আমার ঘুম ভেঙ্গে গেছে,
দুখেই আমার পরাণ জেগেছে,
দুখেই আমার চেতনা হোয়েছে
দুখেই তোমার চরণে লুটাই হে।
যত তাপে ফুটে বেদনা আমার;
তত তাপে উঠে স্মরণ তোমার;
স্মরণে পেয়েছি করুণা অপার,
সাধে কি সাধিয়ে ডেকে দুখ চাই হে।"

বিহারীলাল যে শুধু ভাল ভাল বৈষ্ণব-সঙ্গীত রচনা করিয়াছেন, তাহা নহে। যেমন কীর্ত্তন রচনা করিয়াছেন, তেমনি আবার আগমনী, বিজয়া, শ্যামাসঙ্গীত প্রভৃতিও রচনা করিয়াছেন। মায়ের মৃণ্ময়ী মূর্ত্তি দেখিয়া বিহারীলাল গাহিতেছেন,—

"ওগো কথা কি কহিবে!
ওগো কথা কি শুনিবে!
ওগো ফিরে কি চাহিবে।
মা কোথায়?
প্রাণহীন প্রতিমা কেবল।
যার প্রাণ-প্রতিষ্ঠার,—করিবারে অধিকার,—
আছে প্রাণ হেথা কার?
প্রাণ নাই,—সে প্রতিষ্ঠা করিবে কে বল?"

পরে আবার 'বিজয়া'র সময় ভক্ত কবি বলিয়াছেন,—

"কেন কাঁদিব, কেন না হাসিব?
কেন না হরষে তাঁহারে বিদায় দিব?
মৃণ্ময়ী মূরতি যার, হ'ল দূরে অপসার,
চিন্ময়ী এ চিতে আবার, ধ্যানে মায়ে ধেয়াইব।
শূন্য এ পর্ণ-কুটীর, পূর্ণ হৃদয়-মন্দির,
রবে মা জাগ্রত চির, প্রাণে সদা নিরখিব।
বিশ্বময়ী মা আমার, বিশ্ব তিনি বিশ্ব তাঁর,
মা ছাড়া আছে কি আর, গাবে কত বুঝাইব!"

সুর নহিলে সঙ্গীত সার্থক হয় না, এ কথা ঠিক। সঙ্গীত হইতে সুর খুলিয়া লইলে গানের কথা অনেক সময় নীরস হইয়া পড়ে বটে। কিন্তু তবু স্বীকার করিতে হইবে যে, গানে কবিত্বও কতকটা থাকা চাই। নহিলে, সঙ্গীত সম্পূর্ণতা লাভ—সার্থকতা লাভ করিতে পারে না। বিহারীলালের সঙ্গীত যেমন এক-দিকে সুরতালে ঠিক আছে, তেমনই আবার কাব্যাংশেও চমৎকার; কোনটিকে তিনি বঞ্চিত করেন নাই। তাঁহার শ্যামা-সঙ্গীতগুলিও কাব্য-হিসাবে অনেকটা সম্পূর্ণ;—তাহা পাঠমাত্রেই হৃদয়ে ভাবের উদ্রেক ও সৌন্দর্য্যের সঞ্চার করে। উদাহরণ স্বরূপ একটি শ্যামা-সঙ্গীত এস্থলে উদ্ধৃত করিলাম।—

"আমি দিবানিশি আকাশ-পানে চেয়ে রে।
আমার মনে হয়,
মেঘের মাঝে, আমার মা বুঝি ঐ।
মা আমার অনন্ত রূপিণী, মা আমার নীরদ বরণী,
আশা নীলিম, অনন্ত অসীম,
তাই ভাবি না তায়, আমার মা বৈ।"

এই গানটি পড়িবার সময় মনে পড়ে সেই অপূর্ব্ব সঙ্গীত,—"নিবিড় আঁধারে মা তোর চমকে অরূপ রাশি!" এমন গম্ভীর সৌন্দর্য্য খুব অল্প গানেই দেখা যায়।

শুধু যে ভগবৎ-প্রেমের গানেই গ্রন্থখানি পরিপূর্ণ, তাহা নহে। যে প্রেম রমণীর প্রতি প্রযোজ্য, সে প্রেমের সঙ্গীতও ইহাতে আছে। সংখ্যায় কম হইলেও গুণে সেগুলি কম নহে। কবি বলিতেছেন,—"ওগো, যেও নাক চ'লে। মরমের ব্যথা বুঝাতে পারি না বলে। * * * পাবে ব্যথা আমি ম'লে।"—ইহা গভীর প্রেমের কথা। এ লাইনটি নিধুবাবুকে স্মরণ করাইয়া দেয়।

সংক্ষেপে বিহারীলালের গানের পরিচয় দিলাম। যাঁহারা সমজদার পাঠক, আশা করি, তাঁহারা ইহা হইতেই তাঁহার সঙ্গীত-রচনার শক্তি বুঝিতে পারিবেন।

শ্রীঅমরেন্দ্রনাথ রায়।

ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত।

জানি না কেন, কি ভাবিয়া কি বুঝিয়া স্বর্গীয় লেখক প্রফুল্লচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় বলিয়াছিলেন যে,—"ঈশ্বর গুপ্ত সাময়িক জল-বুদ্বুদমাত্র, সময়ের সঙ্গে সঙ্গে সুতরাং বিলয় প্রাপ্ত।" আমরা কিন্তু ঠিক ইহার উল্টা বুঝি। আমাদের মনে হয়,—"যাঁহার প্রভায় প্রভা পায় প্রভাকর,"—তাঁহার নাম বিলুপ্ত হইবার নহে। বাঙ্গালা দেশে আজ সাহিত্য-চর্চ্চার যে মহাপ্লাবন আসিয়াছে, তাহা 'প্রভাকরে'রই প্রসাদাৎ। গুপ্ত-কবির 'প্রভাকর' প্রকাশিত না হইলে, আমাদের বিশ্বাস, বঙ্গভাষার আজ এতটা উন্নতি, এতটা প্রসার লাভ ঘটিত না।

ভারতবর্ষের দেশীয় সংবাদ পত্রের মধ্যে এই প্রভাকরই প্রথম প্রাত্যহিক। সুলভ মূল্যের এই প্রথম প্রাত্যহিকখানি প্রকাণ্ড জাল নিক্ষেপ করিয়া বঙ্কিম, দীনবন্ধু, রঙ্গলাল ও মনোমোহন প্রভৃতি অপূর্ব্ব ও অমূল্য রত্নগুলিকে সংগ্রহ করিয়া আনিয়াছিল, এবং সেই সঙ্গে উহা পাঠক সাধারণের মনোরঞ্জন করিয়া সাহিত্য-পণ্যকেও উন্নতির স্তরে আনিবার চেষ্টা করিয়াছিল।—এ কথা আমাদের মন-গড়া কথা নহে। স্বয়ং বঙ্কিমচন্দ্রও উহা স্বীকার করিতেন। তিনিও বলিয়া গিয়াছেন,—"বাঙ্গালা সাহিত্য এই প্রভাকরের নিকট বিশেষ ঋণী। মহাজন মরিয়া গেলে খাদক আর বড় তার নাম করে না। ঈশ্বর গুপ্ত গিয়াছেন; আমরা আর সে ঋণের কথা বড় একটা মুখে আনি না। কিন্তু একদিন প্রভাকর বাঙ্গালা সাহিত্যের হর্ত্তা কর্ত্তা বিধাতা ছিলেন। প্রভাকর বাঙ্গালা রচনার রীতিও অনেক পরিবর্ত্তন করিয়া যান। ভারতচন্দ্রী ধরণটা তাঁহার অনেক ছিল বটে—অনেক স্থলে তিনি ভারতচন্দ্রের অনুগামী মাত্র; কিন্তু আর একটা ধরণ ছিল, যা কখনও বাঙ্গালা ভাষায় ছিল না, যাহা পাইয়া আজ বাঙ্গালার ভাষা তেজস্বিনী হইয়াছে। নিত্য নৈমিত্তিকের ব্যাপার, রাজকীয় ঘটনা, সামাজিক ঘটনা, এ সকল যে রসময়ী রচনার বিষয় হইতে পারে, ইহা প্রভাকরই প্রথম দেখায়। আজ শিখের যুদ্ধ, কাল পৌষ পার্ব্বণ, আজ মিশনরী, কাল উমেদারী, এসকল যে সাহিত্যের অধীন

সাহিত্যের সামগ্রী, তাহা প্রভাকরই দেখাইয়াছিলেন। আর ঈশ্বর গুপ্তের নিজের কীর্ত্তি ছাড়া প্রভাকরের শিক্ষানবীশদিগের একটা কীর্ত্তি আছে। ইহার জন্যও বাঙ্গালার সাহিত্য প্রভাকরের নিকটে বিশেষ ঋণী।"

যে সময়ে "বাঙ্গালা বুঝিতে পারি" একথা স্বীকার করিতে অনেক বাঙ্গালীরই লজ্জা হইত, সেই সময়ে, একমাত্র ঈশ্বর গুপ্তই বাঙ্গালীকে 'মাতৃসম মাতৃভাষা'র সেবার জন্য আহ্বান করিয়াছিলেন। এতটা বুকের পাটা, এমন সাহস, তখন ঈশ্বর গুপ্ত ছাড়া আর কোনও বাঙ্গালী লেখকের ছিল না। ইংরেজীনবীশের ঘৃণা-তাচ্ছিল্য উপেক্ষা করিয়া তিনিই বাঙ্গালাকে সর্ব্বপ্রথম বুঝাইয়াছিলেন যে,—"সম্প্রতি স্বদেশীয় ভাষার উন্নতিকল্পে সর্ব্বতোভাবে সম্পূর্ণ যত্ন করা কর্ত্তব্য হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত দেশের উচ্চগৌরব কোনমতেই রক্ষা হইতে পারে না। আমরা অন্য কোন বিষয়ের অধিক আন্দোলন না করিয়া দেশীয় মহাশয়দিগে কেবল দেশের ভাষার প্রতি কিঞ্চিৎ দৃষ্টি রাখিতে অধিক অনুরোধ করিতেছি, কারণ ভাষাই সকল বিষয়ের মূলাধার, ভাষা ভিন্ন কিছুই হয় না, আমরা শুদ্ধ ভাষার পরিচয়েই পরস্পর পরিচিত হইতেছি, সাংসারিক তাবৎ কর্ম্ম নির্ব্বাহ করিতে শিক্ষিত হইয়াছি, পরমেশ্বরকে জানিতে পারিয়াছি, সুতরাং এমত মহোপকারিণী যে জাতীয় ভাষা তাহার প্রতি অশ্রদ্ধা করাতে কিরূপ অকৃতজ্ঞতা প্রকাশ হইতেছে তাহা কি কেহই বিবেচনা করেন না?"—

এইরূপ এক-আধ বার নহে; বহুবার বহু রকমে তিনি বাঙ্গালীকে বাঙ্গালা ভাষার চর্চ্চা করিতে উপদেশ দিয়া গিয়াছেন। বাঙ্গালা ভাষার দুর্দ্দশা দেখিয়া রোষে-ক্ষোভে কখনও বাঙ্গালীর উপর চাবুক চালাইয়াছেন, কখনও বা দুঃখে-অভিমানে চোখের জল ফেলিয়াছেন। সে চোখের জলের চিহ্ন তাঁহার লেখার মধ্যে যথেষ্ট দেখিতে পাওয়া যায়। তিনি দুঃখ করিয়া পদ্যে লিখিয়াছেন,—

"হায় হায় পরিতাপে পরিপূর্ণ দেশ। দেশের ভাষার প্রতি সকলের দ্বেষ॥
অগাধ দুঃখের জলে সদা ভাসে ভাষা। কোন মতে নাহি তার জীবনের আশা॥
নিশাযোগে নলিনী যেরূপ হয় ক্ষীণা। বঙ্গভাষা সেইরূপ দিন দিন দীনা॥
অপমান অনাদর প্রতি ঘরে ঘরে। কোনরূপে কেহ নাহি সমাদর করে।" ইত্যাদি

মাতৃভাষার গুণ-গান করিয়া এখন অনেকেই অনেক কবিতা রচনা করিতেছেন। কিন্তু ঈশ্বর গুপ্তের সময়ে বা তাঁহার পূর্ব্বে কবিতায় এমন কথা সাহস করিয়া কে বলে? তারপর আবার বলিয়াছেন,—

"যে ভাষায় হয়ে প্রীত, পরমেশ-গুণ গীত,
বৃদ্ধকালে গান কর মুখে।
মাতৃসম মাতৃভাষা, পুরাবে তোমার আশা,
তুমি তার সেবা কর সুখে।"

তবে ঈশ্বর গুপ্তের পূর্ব্বে মাতৃভাষার স্তব-স্তুতি করিয়া কখনও কেহ কিছু যে বলেন নাই, এমন বলি না। তাঁহার পূর্ব্বে আর এক কবির মুখ হইতেও বাহির হইয়াছিল,—

"নানান্ দেশে নানান্ ভাষা,
বিনা স্বদেশী ভাষা মিটে কি আশা।"

ইনিও বৈদ্য-কবি। ইঁহার নাম—রামনিধি গুপ্ত। ঈশ্বর গুপ্তের পূর্ব্বে একমাত্র নিধুবাবু ছাড়া আর কেহ স্বদেশী ভাষার গুণ গান করিয়া কিছু লেখেন নাই। কিন্তু ঐটুকু ছাড়া নিধুবাবুও মাতৃভাষার সম্বন্ধে আর কখনও কিছু বলিয়াছিলেন বলিয়া মনে হয় না।

তাই বলিতেছিলাম, ঈশ্বর গুপ্ত যে শুধু বঙ্কিম-দীনবন্ধু প্রভৃতির গুরু ছিলেন, তাহা নহে; তাঁহাকে বর্ত্তমান বঙ্গ সাহিত্যের গুরু বলিয়া আমরা নির্দ্দেশ করিতে পারি। কারণ, 'ইংরাজী লিখিয়া যশস্বী হইবার অস্বাভাবিক দুরাকাঙ্খার বন্ধন হইতে বাঙ্গালীকে মুক্ত করিতে যাঁহারা যত্নশীল হইয়াছিলেন, ঈশ্বর গুপ্ত তাঁহাদিগের প্রথম। শুধু তাহাই নহে। বঙ্গদেশের "স্থানে স্থানে যে সকল ভিন্ন ভিন্ন ভাষা প্রচলিত আছে, তত্তাবৎ উচ্ছেদ করিয়া ইংরাজী ভাষা প্রচলিত করণাভিপ্রায়ে" যখন জনকয়েক ইংরাজ উঠিয়া-পড়িয়া লাগিয়াছিলেন, তখন একমাত্র ঈশ্বর গুপ্তই তাহার বিরুদ্ধে তীব্র লেখনী সঞ্চালন করিয়াছিলেন। তিনি জন-সাধারণকে তখন বুঝাইবার চেষ্টা পাইয়াছিলেন যে, মাতৃভাষা ছাড়া জাতীয় হৃদয়ে প্রবেশ করিবার আর দ্বিতীয় পথ নাই। ঈশ্বর গুপ্ত রচিত যে প্রবন্ধটি আমরা এইখানে উদ্ধৃত করিয়া দিলাম, তাহাতেও পাঠকবর্গ দেখিবেন যে তাহার প্রতি ছত্রে ঈশ্বর গুপ্তের স্বজাতিপ্রীতি, স্বদেশপ্রীতি মাখানো রহিয়াছে। মাতৃভাষা তাঁহার প্রাণ ছিল। মাতৃভাষার সেবা ছাড়া তিনি অন্য কিছু জানিতেন না। কিন্তু এ সমস্ত সংবাদ এখন কে রাখে? কে এখন তাঁহার নাম করে? বঙ্কিম যথার্থই বলিয়াছেন,—"মহাজন মরিয়া গেলে খাদক আর বড় তার নাম করে না।"

"সংবাদপত্র ও দেশীয় ভাষা এবং রচনা"।*

যখন যে জাতির ব্যবহারের বর্ত্মে সভ্যতার সমাগম হয় তখন তাহার সঙ্গে সঙ্গে সেই দেশে সংবাদ পত্রের সৃষ্টি হইয়া বিদ্যার পথ মুক্ত হইতে থাকে, এই উৎকৃষ্ট নিয়মের পশ্চাদ্বর্ত্তি হইয়া আমরা বঙ্গদেশের মৃতপ্রায় ভাষার পুনরুদ্দীপনে যথোচিত যত্ন করণে উৎসুক হইয়াছি, কিন্তু কি প্রকারে পাঠকগণকে তুষ্ট করিব অহরহঃ কেবল সেই চিন্তা সংশয়ে পরিপূর্ণ রহিয়াছে, আমরা অনেক প্রকার তর্ক বিতর্ক দ্বারা সৃষ্টির কারণ সকল জ্ঞাত হইতে পারি, তথাচ পাঠকবর্গের তুষ্টির কারণ কিছুতেই অনুভূত হইতে পারে না, আমারদিগের এই উদ্যোগের অধিককাল পূর্ব্বে এতদ্দেশে এমত কোন কল্পনার সৃষ্টি হয় নাই, যাহার দৃষ্টান্তানুসারে আমরা মনোগত বিষয় সকল সুসম্পন্ন করিয়া সুখি হইতে পারি, সুতরাং এতদ্রূপ সন্দেহযুক্ত ক্লেশকর পথে অগ্রসর হইয়া দেশস্থ সকলকে আমারদিগের পশ্চাতে ধাবিত হইতে অনুরোধ করনে ভীত হইতেছি।

যখন লেখকদিগের অন্তঃকরণে কোন প্রকাশ্য পত্র অথবা গ্রন্থ রচনার অভিলাষ সুখ্যাতির আশার সহিত মিলিত হয় এবং যৎকালীন লেখকেরা অত্যন্ত ব্যগ্র হইয়া চিন্তার সহিত লেখনীকে হস্তে ধারণ করেন, তাঁহারদিগের তৎসময়ের মনের অবস্থা অতি চমৎকার হয় অর্থাৎ যদ্রূপ মনোগত ভাব ব্যক্ত করণের সময়ে চিত্ত আনন্দ সলিলে ভাসমান হইতে থাকে, সেইরূপ আবার ভাবি নিন্দার আশঙ্কায় ঐ মনকে ক্ষণে ক্ষণে অত্যন্ত ক্ষুব্ধ করে, এবং পূর্ব্বোক্ত রচনা সকল সাধারণ সমাজে অর্পণ করিতে কতই সংশয় জন্মে, পরন্তু কোন বিষয় লিপিবদ্ধ হইবার পূর্ব্বে যখন তাহা বিবেচনার গৃহে গোপন থাকে তখন তদ্বিষয়ে রচকের মনের মধ্যে কেবল একপ্রকার ভয় মিশ্রিত নূতন যশের অভিলাষ উদিত হয়। অপিচ ঐ মানসিক কল্পনা যৎকালীন লেখকের ক্রোড় হইতে পাঠকমণ্ডলীর নয়নের নিকটস্থ হয় তৎসময়ে আর নিজ কল্পিত অভিপ্রায়ের সহিত লেখকের কোন সম্পর্ক থাকে না, কেবল তাঁহারদিগের কথার উপরেই নির্ভর করে।

লেখক অত্যন্ত সাবধান অথবা শক্তিবিশিষ্ট হউন, কিন্তু তিনি দুই প্রকার পাঠক শ্রেণীর অধীনতার অতীত কখনই হইতে পারিবেন না, ইহার 'প্রথম শ্রেণী' যাঁহারা কেবল গুণগ্রাহি 'দ্বিতীয় শ্রেণী' যাঁহারা শুদ্ধ নিয়তই দোষকে অন্বেষণ করেন। এই দল দ্বয়ের পরস্পর বাগ বিতণ্ডা দ্বারা লেখকেরা এক-

* (১২৬০ ১লা চৈত্রের সংবাদ প্রভাকর হইতে উদ্ধৃত)

কালীন উৎসাহ এবং অনুৎসাহের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতেছেন, ফলতঃ প্রবঞ্চক-দিগের এই এক মহৎস্বভাব যে তাঁহারা অতি প্রবলতর অধিক সংখ্যক শত্রুর কর্তৃক বেষ্টিত হইলেও আপনাপন দেশ হিতজনক উৎসাহ ব্যাপারে প্রায় অনুৎসক হয়েন না, বরং শত্রুগণকে পরাভব করত নিজ নিজ মানসিক কল্পনাকে প্রবল করণে অতিশয় যত্ন করেন, অর্থাৎ ক্ষান্তিকে অবলম্বন না করিয়া বিপক্ষ বর্গের সন্তোষের পথ নির্ম্মাণ করিতেই যত্ন করেন।

সর্ব্ব সাধারণ লোকের অনুৎসাহই সকল বিষয়ের মূলোৎপাটনের হেতু হইয়াছে। যখন যে বিষয়ে সকলেই ঘৃণা করেন তখন সে বিষয়ের স্থায়িত্বের প্রতি কেহই সাহস করিতে পারেন না, দিন দিন তাহার পতনের পথ পরিষ্কৃত হইতেই থাকে, এবং হঠাৎ কোন এক সামান্য উপলক্ষেই বিনাশ হয়। যদিও আমরা একাল পর্য্যন্ত অনেকের অনুগ্রহে এবং আপনারদিগের বিশেষ যত্নে এই প্রভাকর পত্রের কার্য্য সম্মান পূর্ব্বক নিষ্পাদন করিতেছি তথাচ অধিকাংশ লোকের অনুৎসাহ দৃষ্টে সময়ে সময়ে সমুদয় অভিপ্রায় এককালীন অবসন্ন হইতে থাকে। ফলতঃ এতদ্বিষয়ে আমারদিগের অধিক খেদ করণের কোনও তাৎপর্য্য নাই, কারণ যতদূর পর্য্যন্ত সাধ্য, দেশের কুশলার্থে আমরা তাহার অন্যথা করি না, আমরা প্রতি-ক্ষণেই পরমেশ্বরকে স্মরণ করিয়া কার্য্য সম্পাদন করিতেছি, ইহাতে ভাবনার অতীত অমঙ্গল ঘটিলে সুতরাং তাঁহাকেই আবার প্রণিপাত করিয়া নিরস্ত হইব।

'লেখা' এই শব্দটী শুনিতে অতি সহজ বটে কিন্তু ইহা কিরূপ কঠিন ব্যাপার তাহা তিনিই জানেন যিনি নিয়ত বিশেষ পরিশ্রম পূর্ব্বক অতি সূক্ষ্ম দৃষ্টে মনোগত ভাবের সূত্রে শব্দ পুষ্পের হার গাঁথিয়া থাকেন। বিষয় বিশেষে অভিপ্রায়ের সহিত শব্দের সংযোগ করিতে হয়, এবং তাহার প্রত্যেক্ বিষয় পাঠকালীন্ যদিস্যাৎ পাঠকের অন্তঃকরণ আর্দ্র না হইল তবে সেই লেখা লেখাই নহে। যত প্রকার প্রকাশ্য পত্র আছে তন্মধ্যে সংবাদ পত্রের কার্য্য নিষ্পাদন করাই সর্ব্বা-পেক্ষা অতিশয় কঠিন ব্যাপার। অপরাপর পত্রের লেখকদিগ্যে যে দুই এক বিষয় সম্পন্ন করিতে হয়, তাহার ভাব সকল তাঁহারদিগের দৃঢ়তর সংস্কারের অধীন হইয়া সততই মনের মধ্যে ক্রীড়া করিতেছে। সংবাদপত্রের সম্পাদকদিগ্যে নিয়ত নানা বিষয়ে দৃষ্টি রাখিয়া অভিপ্রায় ব্যক্ত করিতে হয়, এবং তাহাতে এমত সুযুক্তি প্রকাশ করিতে হইবে যদ্দ্বারা দুই শত বৎসরের পরে লোকেরা উপকার প্রাপ্ত হইয়া সমাদর করিবেন।

সংবাদপত্র সম্পাদকের মধ্যে কোন কোন মহাশয় উচিত কর্ম্মে কিঞ্চিন্মাত্র পরিশ্রম না করিয়া কেবল উপার্জ্জনের প্রতি দৃষ্টি করাতে দেশের অনিষ্ট ও সকল সম্পাদকের নামে কলঙ্ক হইতেছে। তাঁহারদিগের পথ দৃষ্টে হঠাৎ অনেকেই সমুদয় পত্রের প্রতি বিরাগ প্রকাশ করিয়া থাকেন, এই বিষয় যদি কেবল উপার্জ্জনের নিমিত্ত হইত তবে আমরা এতদিনে বিবিধ প্রকারে সৌভাগ্য সঞ্চয় করিতে পারিতাম। ফলে অর্থ ভিন্ন একার্য্য নিষ্পন্ন হইতে পারে না, সুতরাং কিঞ্চিৎ টাকার প্রয়োজন করে, কিন্তু উপকারের প্রতি কটাক্ষ না করিয়া কেবল কোঁছড় পুরিয়া পয়াসা কুড়াইলে দেশের কি মঙ্গল হইতে পারে? যাহা হউক, আমরা বিনয় পূর্ব্বক প্রার্থনা করি, উক্ত মহাশয়েরা এই সময়ে এতৎ কর্ম্মে যথা বিহিত পরিশ্রম করিয়া সম্পাদক নামের কলঙ্ক মোচন করুন। যদি নানা কারণে আপনারা অক্ষম হয়েন তবে উপযুক্ত লোক নিযুক্ত করুন, নচেৎ এ বিষয়ে বিরত হইয়া অন্য প্রকারে অর্থ সংগ্রহের পন্থা দেখুন। বরং চুরি ভাল, ডাকাইতি ভাল, ভিক্ষা ভাল, তথাচ দেশোপকারের নাম করিয়া একটা ফাঁদ পাতিয়া মিথ্যারূপে অর্থ লওয়া অতি মন্দ। যাহাতে দেশের মঙ্গল হয়, তুমি তাহার কিছু করিবে না, অথচ অন্যের অনিষ্ট করত জগৎকে অন্ধ করিয়া কেবল অর্থ লইবে। ইহা স্বীকার্য্য বটে, যে, এক ব্যবসায়ীদিগের মধ্যে পরস্পর সকলে অন্যাপেক্ষা আপন উন্নতির প্রতি যত্ন করেন, কিন্তু তাহাতে তদনুরূপ পরিশ্রম ও কার্য্যের আবশ্যক করে, কর্ম্মের ফল দ্বারা সকল সহযোগিকে পরাজয় করিতে হইবেক, তাহা না করিয়া শুদ্ধ অহিতাচার করিলে কি হইবেক? ঢাল নাই, তলয়ার নাই, 'রামভদ্র' সরদার হইলেন। হে পাঠকগণ! আমরা শুদ্ধ দুই বিষয়ের নিমিত্ত এতদ্রূপ দুঃখের অবস্থায় পতিত হইতেছি। প্রথমতঃ অধিকাংশ দেশীয় লোক আমারদিগের কার্য্য দৃষ্টে যথা কর্ত্তব্য আনুকূল্য করেন না। দ্বিতীয়তঃ রাজপুরুষেরা এ দেশের মনুষ্য নহেন, তাঁহারা বাঙ্গালা ভাষা না জানাতে আমরা তাঁহারদিগের সমাদরের পাত্র হই না; ইংরাজের মধ্যে অনেকেই কোন্ পত্র ভাল ও কোন্ পত্র মন্দ ইহা অজ্ঞাত থাকাতে অর্থলোভি প্রতারকদিগের প্রচুর প্রভুত্ব হইয়াছে; তাহারা কিঞ্চিৎ উৎকোচ পাইয়া রাত্রিকে দিন ও দিনকে রাত্রি করিতেছে, সেই সেই প্রতারকের সহায়তায় কোন কোন সম্পাদক বিলক্ষণ সৌভাগ্য লাভ করিতেছেন।

আমরা সম্পাদকীয় ব্রতে ব্রতি হইয়া সুখ সম্পত্তির প্রার্থনা করি না; পাঠকবর্গের অনুরাগই আমারদিগের সম্পত্তি এবং সুখ্যাতিই আমারদিগের সুখ,

তাহার নিকট অর্থসুখ সুখ নহে; তবে কার্য্য সম্পাদনার্থে যে যৎকিঞ্চিৎ প্রয়োজনীয় তাহা হইলেই পরম সৌভাগ্য স্বীকার করি। যাঁহারা গ্রাহক শ্রেণীতে ভুক্ত আছেন তাঁহারা আপনাপন নিয়মিত দানের প্রতি দৃষ্টি করিলেই আমারদিগের অবস্থা জানিতে পারিবেন। এই মহানগরে ও বিদেশে যে সকল গ্রাহক আছেন তাঁহারা আমারদিগের পরিশ্রম বিবেচনা করিয়া যদ্যপি ভিক্ষা স্বরূপ নিয়মিতরূপে অর্থ প্রদান করেন তবে আমারদিগের কি দুঃখ? পরের এইক্ষণে যদ্রূপ অবস্থা আছে তদপেক্ষা দ্বিগুণ উন্নতি করি। কি করিব, তাঁহারদিগের উপর কোন ক্ষমতা নাই; কেবল অনুগ্রহের উপর নির্ভর করিয়া থাকি। আমরা যে পরিমাণে গ্রাহকের নিকট মূল্য প্রাপ্ত হই তদনুসারে কেবল বায়ু ভক্ষণ করত লেখনীকে আদা জল খাওয়াইয়া কার্য্য নির্ব্বাহ করা হইতেছে। পূর্ব্ব গত বৎসরে গত বৎসরের প্রতি যেরূপ প্রতীক্ষা করিয়াছিলাম এ বৎসর আবার এ বৎসরের প্রতি সেইরূপ প্রত্যাশা করিতেছি, কিন্তু দেশের অবস্থা দেখিয়া মঙ্গলের প্রতি লক্ষ্য করা মিথ্যা হইতেছে। বিধবার একাদশীর ন্যায় অন্নদাদির এই ব্রতপালন করা হইয়াছে, লোকের পিতৃশ্রাদ্ধের দিন পরিবর্ত্তন হয়, কিন্তু সংবাদপত্র প্রকাশের দিন পরিবর্ত্তন হইবার নহে; কৃতান্ত কেশ ধরিয়া টানিতেছে অথচ ছাপা যন্ত্রের ঘড়্ ঘড়্ শব্দের বিশ্রাম হয় না। সময়ে আহার ও নিদ্রা হইবার বিষয় কি? চক্ষের সহিত সুষুপ্তির প্রায় বিচ্ছেদ হইয়াছে, যদি কখন নিদ্রার আবির্ভাব হয় তৎক্ষণাৎ স্বপ্ন আসিয়া শাত্রবতা করিতে থাকে। আমরা দুঃখের কথা কি কহিব, এই ব্যবসায়ের ধর্ম্মে আহার ব্যবহার, লোক লৌকিকতা, আলাপ পরিচয় প্রায় রহিত হইয়াছে, সময় বিশেষে অতি প্রিয়তম বন্ধুর সহিত কথা কহিতে বিরক্তি জন্মে, কোন মতে তাঁহাকে বিদায় করিতে পারিলেই সন্তুষ্ট হই। উত্তমরূপে সকল দিগ্ রক্ষা করিয়া একখানী সংবাদপত্র প্রকাশ করিতে হইলেই এইরূপ করিতে হয়, নতুবা যেমন তেমন করিয়া কর্ম্মোদ্ধার করিলে পরিশ্রমের প্রয়োজন কি?

আমরা যে পর্য্যন্ত দৈনিকরূপে এই পত্র প্রকটন করিতেছি, সেই পর্য্যন্ত শ্রমের শরীর বৃদ্ধি হইতেছে, প্রতিদিন অবাধে নিষ্পন্ন করিয়া পাঠকগণের মনোরঞ্জন করিতে হয়, প্রভাকর পত্রের কলেবর ক্ষুদ্র হইলে কি হয়, কর্ম্মের ক্রটী না হইলেই হয়, যাঁহারা সপ্তাহে একখানা বৃহৎ পত্র প্রকাশ করেন তাঁহারদিগের পত্রের সহিত আমারদিগের প্রতিদিনের পত্র ঐক্য করিয়া দেখিলেই কৃতার্থ হইব। আমারদিগের নিত্য নিত্য নূতন নূতন চিন্তা করিয়া নূতন নূতন

বিষয়ে নূতন নূতন অভিপ্রায় ব্যক্ত করিতে হয়, এজন্য আমারদিগের পরিশ্রম অবশ্য অধিক হইবেক সকল ব্যক্তির মনের আস্বাদন একপ্রকার নহে, সুতরাং এমত সাহস করিয়া বলিতে পারি না যে অস্মদ্বিরচিত সর্ব্ব বিষয় সর্ব্ব লোকের সন্তোষ-বর্দ্ধক হয়, তবে এরূপ কহিতে পারি যে. প্রত্যেক্ প্রত্যেক্ ব্যাপারে পাঠকের তুষ্টি জন্মাইবার নিমিত্ত কোনমতেই সাধ্যাধীন কার্য্য সাধনে ক্রটী করি না। এবং প্রতি মাসের প্রথম দিবসের প্রভাকর রচনা বিষয়ে অধুনা যদ্রূপ পরিশ্রম করিতেছি তাহা তাবতেই প্রত্যক্ষ দর্শন করিতেছেন ও অনেকেই ইহাতে সন্তুষ্ট হইয়া অনুরাগ ব্যক্ত করিতেছেন।

যাহাতে বঙ্গভাষায় লিপি-বিদ্যায় পুরাতন রীতি পরিবর্ত্তন হইয়া উত্তমরূপে ভাব প্রকাশ হয় আমরা তদর্থে যত্ন করি। নীতি, ইতিহাস, বিজ্ঞান, কৃষি, বাণিজ্য, শিল্প, চিকিৎসা, পদার্থ-নির্ণায়ক ও ধর্ম্ম এবং রাজকীয় প্রভৃতি বহুবিধ বিষয়ের আলোচনা করিয়া থাকি, দেশের কুরীতি সংশোধন জন্য বিস্তর অনুরাগ প্রকাশ করিতেছি. তদ্ভিন্ন রূপকাদি লেখনের এক এক প্রকার নূতন নিয়ম আমারদিগের দ্বারা সৃষ্ট হইতেছে।

যে সকল যুবকেরা বঙ্গভাষা রচনায় প্রবৃত্ত হয়েন আমরা যথোচিত রূপে তাঁহারদিগ্যে উৎসাহ দিয়া থাকি। অস্মদাদির সৌভাগ্যবৃক্ষের এই এক সুফল দৃষ্ট হইতেছে, যাঁহারা এই প্রভাকরের বন্ধু ও সহকারি লেখকরূপে পরিগণিত ছিলেন তাঁহারা অতি প্রশংসিত লেখকরূপে সর্ব্বত্র বিখ্যাত হইয়া প্রকাশ্য পত্রের ও গ্রন্থ রচনার কার্য্য সম্পন্ন করিয়াছেন ও এইক্ষণেও করিতেছেন। অপিচ সংপ্রতি যাঁহারা এ পথের পথিক হইয়াছেন তাঁহারাও অনেকে কৃতকার্য্য ও বিখ্যাত হইয়া অনেকের প্রিয় হইবেন।

পরন্তু যে সকল ছাত্র কেবল পদ্য রচনা করেন, আমরা তাঁহারদিগ্যে গদ্য লিখিতে সর্ব্বদাই অনুরোধ করি, ফলতঃ তাঁহারা কবিতা রচনায় এককালীন ক্ষান্ত হয়েন আমারদিগের এরূপ অভিপ্রায় নহে; কিন্তু তাহাতে কোনরূপ দোষ স্পর্শিত না হইলেই উত্তম হয়। কবিতা রচনা অতি কঠিন, ইহা বল দ্বারা হয় না, ও মনুষ্য-কৃত নিয়মের অধীন নহে, এ জগন্মোহিনী-বিদ্যার অসাধারণ মহিমা বাখ্যা করা যায় না, পরমেশ্বরের প্রদত্ত এক অনির্ব্বচনীয় ক্ষমতা দ্বারা কবি মহাশয়েরা সেই মনোহর রস ব্যক্ত করিয়া থাকেন! এই জিহ্বা সকলেরি আছে, কিন্তু সকল রসনায় অমৃত মিশ্রিত হয় না, কেবল কবির রসনাই সুধার আধার হইয়াছে, এই কবিতা দ্বারা জগতের বিবিধরূপ বিচিত্র শোভা ও মনের

নানা প্রকার অব্যক্ত ভাব্ এবং অপ্রত্যক্ষ পদার্থপুঞ্জ প্রতিক্ষণেই প্রত্যক্ষের ন্যায় প্রকাশ পাইয়া থাকে। কবির বর্ণনায় এই সমস্ত বিষয় হস্ত-পদবিশিষ্ট প্রাণীর ন্যায় বিরাজমান হয়, সুকবি কর্ত্তৃক কবিতা রচিত হইলে প্রতি বর্ণে পাঠকের কর্ণে সুধা প্রবেশ করিতে থাকে এবং তৎসময়ে অশ্রুপতন, হৃৎকম্পন, লোমহর্ষণ প্রভৃতি সকল লক্ষণ দৃষ্টি করা যায়। কবিতার ন্যায় আশু হৃদয়-আর্দ্রকারী বিদ্যা আর কিছুই নাই। দুগ্ধপোষ্য শিশুসকল কবিতা শুনিতে ও অভ্যাস করিতে অত্যন্ত ব্যগ্র হয়। যেমন ভৃঙ্গের পক্ষে কমল, কোকিলের পক্ষে বসন্তকাল, শিশুর পক্ষে স্তন্যদুগ্ধ, দরিদ্রের পক্ষে ধন, রোগির পক্ষে আরোগ্য এবং অপুত্রকের পক্ষে পুত্র বিশেষ হর্ষজনক, সেইরূপ ভাবুক ব্যক্তির পক্ষে কবিতা অতিশয় সুখদায়িকা হয়। ফলে এমন মানুষও অনেক যাঁহারা কবিতার প্রতি অত্যন্ত বিরক্ত, তাঁহারদিগের এই বিরক্তির কারণ বোধ হয় জগদীশ্বরের বিড়ম্বনা। যদ্রূপ অন্ধের নিকট সৌন্দর্য্য, বধিরের নিকট সদ্বক্তৃতা ও ক্লীবের নিকট সুন্দরী স্ত্রী আদর প্রাপ্ত হয় না, তদ্রূপ অভাবক জনের নিকট কবিতা আদরণীয়া হয়েন না, কবি-ব্যক্তি রচনা দ্বারা আপনি সুখী হইয়া অন্যের শোক দুঃখ নিবারণ করেন। কোন কোন পণ্ডিত কহিয়াছেন, কবির অন্তঃকরণ পূর্ণিমার রাত্রির ন্যায় এবং কবিতা-রসে যাহার মনে সুখোদয় না হয় তাহার মন কণ্টকময় অথবা তিমিরাবৃত অমাবস্যার রাত্রি। অপর কোন রসিক ব্যক্তি উল্লেখ করেন, যাহারা সঙ্গীত ও কাব্যরসে বঞ্চিত ও বিরত,তাহারা শৃঙ্গ পুচ্ছহীন পশু, তবে যে তৃণ পত্র আহার করে না, সে শুদ্ধ পশু জাতির পরম সৌভাগ্য বলিয়াই স্বীকার করিতে হইবেক। ফলে যাঁহার কবিতায় চিত্তকে আনন্দ পথে আকর্ষণ করে এমত কবি অতি সুদুর্ল্লভ। ভাব, অর্থ, অলঙ্কার, শব্দ, ছন্দ ও অভিপ্রায় প্রভৃতি সমুদয় অঙ্গ সুন্দর না হইলে কবিতা হয় না; হে বন্ধুগণ! আপনারা সেইরূপ কবি হইয়া কবিতাদ্বেষিদিগের নিন্দা হইতে উত্তীর্ণ হও, নচেৎ কবির ইকার যুক্ত বকারের বিনিময়ে পকার প্রয়োগ করিতে হয়।

কেহ কেহ কবির সহিত চিত্রকরের তুলনা করিয়া থাকেন, কিন্তু তাহা কোন মতেই সম্ভব্য নহে, কারণ চিত্রকর কেবল বাহ্য-বিষয় চিত্র করেন, কবি অন্তর বাহির দুই বিষয় চিত্র করিয়া থাকেন।

পদ্য *

চিত্রকরে, চিত্র করে করে তুলে তুলি। চিত্রকর দেখে যত, বাহ্য অবয়ব।
কবি সহ তাহার, তুলনা কিসে তুলি। তুলিতে তুলিয়া রঙ্গ, লেখে সেই সব।

* এই কবিতাটী বসুমতী অফিস হইতে প্রকাশিত ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের গ্রন্থাবলীতে সন্নিবিষ্ট হইলেও, বর্ত্তমানে প্রবন্ধের সম্পূর্ণতা রক্ষা করিবার জন্য প্রকাশিত হইল।

কলে সে বিচিত্র চিত্র, চিত্র অপরূপ।
কিন্তু তাহে নাহি দেখি, প্রকৃতির রূপ ॥
চারু বিশ্ব, করি দৃশ্য, চিত্রকর কবি।
স্বভাবের পটে লেখে, স্বভাবের ছবি ॥
কিবা দৃশ্য, কি অদৃশ্য, সকলি প্রকট।
অলিখিত কিছু নাই, কবির নিকট ॥
ভাব, চিন্তা, প্রেম, রস, আদি বহুতর।
সমুদয় চিত্র করে, কবি চিত্রকর ॥
পটুয়ার চিত্র ক্রমে রূপান্তর হয়।
কবি চিত্র, কিবা চিত্র, বিনাশের নয় ॥
পটুয়ার লেখে কত, হাত মুখ পদ।
কবি-চিত্রকর লেখে, শুধু মাত্র পদ ॥
পদে পদে, সেই পদে, কত হাত মুখ।
বিলোকনে বিয়োগির, দূর হয় দুখ ॥
কবির বর্ণনে দেখি, ঈশ্বরীয় লীলা।
ভাব-নীরে স্নান করি, দ্রব হয় শিলা ॥
ভুল্যরূপে দৃষ্ট হয়, ধন আর বন।
ভাবরসে মুগ্ধ করে, ভাবকের মন ॥
রসিক জনের আর, নাহি থাকে ক্ষুধা।
প্রতিপদে বর্ণে বর্ণে, কর্ণে যায় সুধা ॥
জগতের মনোহর, ধন্য ভাই কবি।
ইচ্ছা হয় হৃদিপটে, লিখি তোর ছবি ॥

অধুনা বঙ্গভাষায় গদ্য রচনার যদ্রূপ সুপদ্ধতি প্রচলিত হইয়া আসিতেছে, ইহার ৪০ বৎসর পূর্ব্বে এতদ্রূপ ছিল না, কেবল মৃত মহাত্মা রাজা রামমোহন রায় মহাশয় রচনার এক নূতন সূচনা করিয়া দেশের মুখ উজ্জ্বল করিয়াছেন, ইহার পূর্ব্বে সাধুভাষায় কিরূপে শব্দ সংযোগ করিতে হয় তাহা বড় বড় পণ্ডিতেরাও জানিতেন না; সচারচর পত্র লিখিতে হইলে "যাতায়াতের তথাকার মঙ্গলাদি সমাচার লিখিতে আজ্ঞা হইবেক। আমরা ভাল আছি তাহাতে ভাবিত নহিবেন" ইত্যাদি। বিষয়ি লোকেরা কতক হিন্দি, কতক বাঙ্গালা, কতক পার্শি মিশ্রিত করিয়া পত্র লিখিতেন, যথা "বাপা হে, তুমি একবার খবরটা লও না, আজ্ সাত রোজ হল প্রাণাধিক বাবাজির ব্যাম হয়েছে, কবিরাজ তিন ওক্ত তিকিচ্ছে কর্‌ছেন, এখানে দাওয়াই ভাল নাই, তুমি একটু বিষ্ণু তোল পাঠাবা" ইত্যাদি। গদ্য রচনায় এইরূপ শ্রী ছিল, নতুবা প্রায় হেয়ালী দ্বারা তাবৎ ব্যাপার সম্পন্ন হইত, যথা "সদানন্দ আনন্দ পাইয়া যায় দল"—"পর্ব্বত শিখর পরে গঙ্গার তরঙ্গ" তথা "আগা ঝুম্‌ঝুম্ গোড়া মোও" ইত্যাদি। দুঃখের কথা কি কহিব রাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায় যিনি অতি সুপণ্ডিত ও সূক্ষ্মদর্শী ছিলেন তিনি নানা শাস্ত্রাধ্যাপক বহুবিধ পণ্ডিত কর্ত্তৃক বেষ্টিত হইয়াও ভাষা লেখনের ব্যবহারে শুদ্ধ প্রহেলিকা দ্বারা আমোদ প্রকাশ করিতেন। ফলতঃ তৎকালীন সংস্কৃত ভাষার কিঞ্চিৎ সমাদার ছিল; রাজা রামমোহন রায় সমাচার পত্র প্রকাশ ও পুস্তক রচনা দ্বারা স্বাভিমত ব্যক্ত করণে প্রবৃত্ত হইলে মহানুভব বিদ্যাতৎপর ৺নন্দলাল ঠাকুর মহাশয় তদ্বিরুদ্ধে লেখনী-ধারণ করিলেন, তৎকালে উভয় দলে অনেক সাহায্যকারি পণ্ডিত নিযুক্ত ছিলেন, উভয় পক্ষের

বিবাদে ভাষার বিস্তর উন্নতি হয়। পাদ্রি সাহেবদিগের সহিত প্রথম পক্ষের অনেক যুদ্ধ হইয়াছিল, সুতরাং আমরা ঐ সময়কেই বঙ্গভাষা অনুশীলনের আদি সময় এবং মৃত রাজাকে তাহার একজন সূত্র সঞ্চারক বলিয়া উল্লেখ করিব। এই মহাত্মা প্রপঞ্চ শরীর পরিহার করিলে কিছুদিন আলোচনার পথ এককালীন অপরিস্কৃত হইয়াছিল, এইক্ষণে পুনর্ব্বার তদপেক্ষা সদবস্থা হইয়াছে; অনেকেই লেখা-দ্বারা ও বক্তৃতা দ্বারা তর্ক বিতর্ক করিতে ও মনের ভাব ব্যক্ত করিতে উৎসুক হইয়াছেন, বিদ্যার্থিগণ বাল্যক্রীড়া ত্যাগ করিয়া অনুশীলনের ক্রীড়ায় আমোদ করিতেছে, সংবাদপত্রে বিবিধ বিষয় লিখিয়া দেশের মঙ্গল করিতেছে। এইক্ষণে ঘুড়ির লক্, দাবার ছক্. পাশার পাট্টি, ইয়ারের কষ্টি, তবলার ধিড়িং, সেতারের পিড়িং, গেরাবুর ছক্কা, লোটন লক্কা, ইত্যাদি শুদ্ধ প্রাচীনদিগের আমোদের অলঙ্কার হইয়াছে। যুবকেরা বেকনের এসে, সেক্সপিয়রের প্লে, কালিদাসের কাব্য, গীতার শ্লোক, শ্রুতির অর্থ এবং বস্তুনির্ণয় প্রভৃতি সমুদয় সদ্বিষয়ের আলোচনা করিতেছে। এই সকল দৃষ্টে পুণ্যাত্মা রামমোহন রায়ের জীবিতাবস্থা স্মরণ হইবায় মন শোক-মিশ্রিত কৃতজ্ঞতা রসে আর্দ্র হইতেছে। আহা! যে ব্যক্তি এই বঙ্গভাষা লেখকের সুরীতি সঞ্চার করেন—যে ব্যক্তি স্বদেশীয় মানব মণ্ডলীর মানসক্ষেত্রে বিদ্যার বীজ বপণ করণে বহুব্যয় ও যত্ন করেন—যে ব্যক্তির উদ্যোগ দ্বারা সদ্ভাবের সহযোগে সভ্যতা কতিপয় লোকের স্বভাব-সিংহাসন অধিকার করিতেছে—যে ব্যক্তির কৃপায় বেদান্ত ধ্বান্ত কূপ হইতে মুক্ত হইয়া কলিকাতাস্থ শান্ত স্বভাব মনুষ্য সমূহের হৃদয়পদ্ম প্রফুল্ল করিতেছেন—এবং যে ব্যক্তি স্থিরতর যুক্তিযুক্ত বিচার বাণে ভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বি ধার্ম্মিকেরা পরাভব হওত পরধর্ম্ম বিনাশ বিষয়ে প্রায় পরাঙ্মুখ হইয়া ঘোষণা-ঘরে আলোক নির্ব্বাণ করিয়াছিলেন, অধুনা সেই দেশোজ্জ্বলকারি মহাপুরুষের বিরহে অন্তঃকরণে কি দারুণ যন্ত্রণার ভোগ হইতেছে। যাহা হউক, যদিও তিনি জীবিত নহেন, তথাচ আপনার মহৎ কার্য্য ও কীর্ত্তি দ্বারা আমারদিগের নয়নাগ্রে প্রত্যক্ষের ন্যায় বিরাজমান্ রহিয়াছেন।

রাজা রামমোহন রায় যৎকালে বঙ্গভাষার শ্রীবৃদ্ধি সাধনে অনুরাগী হয়েন তাহার অল্পদিন পূর্ব্বে সি-বিলদিগের অধ্যয়নের নিমিত্ত পণ্ডিতবর মৃত মৃত্যুঞ্জয় তর্কালঙ্কার বিরচিত "প্রবোধ চন্দ্রিকা" এবং সুপণ্ডিত ৺হরপ্রসাদ রায় প্রণীত "পুরুষ পরীক্ষা" এই দুইখানি পুস্তক প্রকটিত হইয়াছিল। ইহার প্রথমোক্ত গ্রন্থে যদিও অনেক পাণ্ডিত্য প্রকাশ আছে, কিন্তু তাহার ভাষার অধিকাংশই

কঠিন ও কর্কশ, তাহাতে রস ও মধুরত্ব নাই! শেষোক্ত পুস্তকের রচনা অতি সহজ, ভাষা অতি কোমল, দেওয়ানজীর * ভাষার সহিত অনেকাংশেই তাহার তুলনা হইতে পারে। যাহা হউক, বাঙ্গালা গদ্য গ্রন্থের উল্লেখ করিলে ইঁহারা উভয়েই আদি গ্রন্থকর্ত্তারূপে গণ্য হইবেন। মহাপ্রভু পাদ্রি কেরি প্রভৃতি শ্বেতাবতারেরা ঐ সময় বঙ্গভাষায় খ্রীষ্টধর্ম্ম বিষয়ক কয়েকখানা পুস্তক প্রকটন করেন, তাহাতে কেবল সাহেব সাহেব গন্ধই নির্গত হইত। দেওয়ানজী জলের ন্যায় সহজ ভাষা লিখিতেন, তাহাতে কোন বিচার ও বিবাদ ঘটিত বিষয় লেখায় মনের অভিপ্রায় ও ভাব সকল অতি সহজে স্পষ্টরূপে প্রকাশ পাইত, এজন্য পাঠকেরা অনায়াসেই হৃদয়ঙ্গম করিতেন, কিন্তু সে লেখার শব্দের বিশেষ পারিপাট্য ও তাদৃশ মিষ্টতা ছিল না। ৺বাবু উমানন্দ ঠাকুর, যিনি নন্দলাল ঠাকুর নামে বিখ্যাত ছিলেন, তিনি "পাষণ্ড পীড়ন" প্রভৃতি যে কয়েকখানা গ্রন্থ প্রকাশ করেন তাহা সর্ব্বাংশেই উত্তম অর্থাৎ শব্দের লালিত্য এবং মাধুর্য্য প্রাচুর্য্য সর্ব্বদিগেই উত্তম হইয়াছিল, তদ্দৃষ্টে অনেকেই সরস রচনায় শিক্ষিত হইয়াছেন।

ইদানীন্তন বঙ্গভাষা নবযৌবন প্রাপ্ত হইয়াছে, এই সময়ে যাঁহারা অনুশীলন কল্পে অনুরাগি হইতেছেন তাঁহারা অনায়াসেই অভিপ্রেত বিষয়ে কৃতকার্য্য হইতে পারিবেন, তাহাতে দেশের অশেষ প্রকার উপকার সম্ভাবনা। সংপ্রতি মধ্যে মধ্যে দুই একখানি অত্যুৎকৃষ্ট গদ্য পূরিত ভাষা-পুস্তক প্রকাশিত হইতেছে, আমরা তৎপাঠে আনন্দ লাভ করিয়া থাকি, যখন তরু মুকুলিত হইয়াছে তখন ফলবান ও বলবান হইবে তাহা সংশয় কি?"

শ্রীঅমরেন্দ্রনাথ রায়।

অনুতপ্ত।

(১)

"সে কি কথা?"

"কেন, আকাশ থেকে পড়লে নাকি?"

বাস্তবিক সাবিত্রী সেইরূপ বিস্মিত হইয়াছিল। এ প্রেমে বিচ্ছেদ থাকিতে পারে না সেই ধারণাই তাহাকে এ কয় মাস উৎফুল্ল করিয়া রাখিয়াছিল। চির-

* মৃত রাজা রামমোহন রায়।

দিন সে অমরনাথকে বক্ষে ধরিয়া রাখিতে পারিবে সেই আশায় সে কুলত্যাগিনী হইয়াছিল, আত্মীয় স্বজন ছাড়িয়া সহরে পলাইয়া আসিয়াছিল। তাহাকে একাকিনী রাখিয়া অমরনাথ বিদেশযাত্রা করিবে তাহার মুখে এ ভীষণ সংবাদ শুনিয়া যুবতী শিহরিয়া উঠিল। তাহাকে ত্যাগ করিয়া অমরনাথ অন্যত্র যাইতে পারে—এ কথা সে অদ্যাবধি উপলব্ধি করিতে পারে নাই। বিশেষ এ অবস্থায়!

অমরনাথ বলিল—ভয় ক'র না। আমি তোমার ভরণপোষণের জন্যে টাকা দিয়ে যাচ্চি। আর মাসে মাসে তোমায় টাকা পাঠাব। বুঝ্লে?

সাবিত্রী তাহার মাথামুণ্ড কিছুই বুঝিল না। অর্থের কথা তাহার কর্ণে প্রবেশ করিল না। অমরনাথের মুখে সে কঠোরতার রেখা লক্ষ্য করিতেছিল। সে আজ তাহার কণ্ঠস্বরে চির-পরিচিত মধুরতা টুকু খুঁজিয়া পাইল না, তাহার আঁখিকোণে সেই উন্মাদক কটাক্ষের চিহ্নটুকু দেখিতে পাইল না। তাহার আরাধ্যের সর্ব্বশরীর হইতে দেবভাব তিরোহিত হইয়া উহা যেন একটা পৈশাচিকভাবে উদ্ভাসিত হইয়াছিল।

অমরনাথ বলিতে লাগিল—"পাঁচ ছ' মাস পরে আবার কল্‌কাতায় ফিরে আসব। কি বল সাবিত্রী! ততদিনে তোমার ছেলেটিও তিন চার মাসের—"

সাবিত্রী শিহরিয়া উঠিল। তাহার অবস্থা স্মরণ করিয়া যুবতী কাঁপিতে লাগিল। অমরনাথের কথা শেষ হইতে না হইতে সে দুই হস্তে চক্ষু ঢাকিয়া কাঁদিতে লাগিল। কি সর্ব্বনাশ! কল্পনা তাহাকে ভীষণ জীবনব্যাপী নির্জ্জনতার বিভীষিকা দেখাইল। সে সকলের নিকট অপরিচিতা, ভ্রষ্টা, কুলত্যাগিনী। তাহাকে আশ্রয় দিবার কেহ নাই, দুইটা মিষ্ট কথা বলিবার কেহ নাই। তাহার শিশু ভূমিষ্ঠ হইলে তাহার দিকে চাহিয়া হাসিবে এত বড় পৃথিবীতে এমন লোক কেহ ছিল না। সে যে মহাপাতক করিয়াছিল, ধর্ম্মত্যাগ করিয়া অধর্ম্ম আশ্রয় করিয়াছিল, সে কথা সে আজ প্রথম উপলব্ধি করিল। এতদিন অমরনাথের প্রেমের নেশায় যুবতী বিভোর হইয়াছিল, উন্মত্তের মত সে হিতাহিত জ্ঞানশূন্য ছিল। মিলন-সুখ তাহাকে অন্ধ করিয়াছিল, সে কেবল নিজের প্রাণের ভিতর গভীর সুখের লহর গণিত; বাহিরে চাহিয়া পৃথিবীর মুখে, সমাজের মুখে, আত্মীয় স্বজনের মুখে ঘৃণার কুৎসিৎ ভাব দেখিবার অবসর তাহার ছিল না। প্রেম বিশ্ববিজয়ী—তাহাকে মাতাইয়া রাখিয়াছিল, পাপপুণ্য হিতাহিত ধর্ম্মাধর্ম্ম তাহার অন্তরের ত্রিসীমায় প্রবেশ করিতে পারে

নাই। প্রেমোন্মাদিনী রমণীর নিকট ভুবন জুড়িয়া কেবল এক চিত্তবৃত্তি বিরাজ করে—সে অগ্রপশ্চাৎ চাহিতে পারে না। আজ অকস্মাৎ ধাক্কা দিয়া অমরনাথ তাহার ঘুম ভাঙ্গাইল, তাহার মোহ-পাশ ছেদন করিল। কি ভীষণ নির্জ্জনতার ছবি! কি কঠোর বিভীষিকা!

সাবিত্রীর আঁখিজল! এতদিন তাহার একবিন্দু অশ্রুর পরিবর্ত্তে যুবক এক কলসী বুকের রক্ত বিনিময় করিতে পারিত! আজ তাহার নেশা কাটিয়া গিয়াছে, সমরে জয়লাভ করিয়া আজ তাহার বিজয়গর্ব্ব পরিতৃপ্ত হইয়াছে। তাহার জন্ম সুন্দরী সাবিত্রী জাতি কুল মান আত্মীয়স্বজনের স্নেহমমতা জলাঞ্জলি দিয়াছিল, বৈধব্যের কঠোরতা ভুলিয়াছিল ইহাই যথেষ্ট। সে ধর্ম্মতঃ তাহাকে প্রতিপালন করিতে বাধ্য—সে কর্ত্তব্য অবহেলা করিতে তাহার আদৌ প্রবৃত্তি ছিল না। কিন্তু তাহার জন্ম জীবনে যশমান ধনসম্পত্তি অর্জ্জন করিতে পারিবে না ঈশ্বর সাক্ষ্য করিয়া সে এমন কথা কোন দিন বলে নাই। সেও ঘর বাড়ী আত্মীয়স্বজন ছাড়িয়াছিল, জন্মভূমির নিকট হইতে চিরদিনের জন্ম বিদায় লইয়াছিল। সে ভারত ছাড়িয়া যশ অর্জ্জন করিতে যাইতেছিল, অর্থোপার্জ্জন করিতে ছুটিতেছিল কাহার জন্ম? সে তো চিরদিনের জন্য তাহাকে পরিত্যাগ করিতে চাহে নাই। বাস্তবিক বিদেশ হইতে আসিয়া পুত্রমুখ দেখিবার লোভ যথেষ্ট পরিমাণে তাহার হৃদয়ে বর্ত্তমান ছিল। প্রেমিক প্রেমিকার অভিনয় তো তাহারা সাঙ্গ করিয়াছিল, এবার তাহাদের সংসারীর অভিনয় করিবার পালা। ইহাতে সে কাঁদিবার কারণ কিছু পাইল না। সাবিত্রীর ক্রন্দনে সে বিরক্ত হইল। বলিল—ওকি হ'চ্চে? বিরক্ত কর কেন?

বাল-বিধবা সাবিত্রী স্বেচ্ছায় গোপনে তাহাকে স্বামীত্বে বরণ করিয়াছিল। তাহার হৃদয়ের উন্মত্ত বাসনারাশি অমরনাথকে পাইয়া তাণ্ডব নৃত্য বন্ধ করিয়াছিল। আজ তাহার মুখে নূতন কথা শুনিয়া অভাগিনীর মুগ্ধ নয়নের আবরণ খুলিয়া গেল। তাহার মাতার মুখ মনে পড়িল, তাহার মন্দ আচরণে গ্রামে তাহার আত্মীয় স্বজন কি নির্য্যাতন ভোগ করিতেছে তাহা সাবিত্রী আজ প্রথম উপলব্ধি করিল—আজ সে প্রথম বুঝিল যে সে পাপিয়সী, অপবিত্রা। যাহার জন্য সে এই কণ্টকময় পথে আসিয়া পড়িয়াছিল আজ সে তাহাকে পরিত্যাগ করিতে কৃতসংকল্প! অমরনাথের পলকহীন চক্ষু দেখিয়া, স্থির ওষ্ঠদ্বয় দেখিয়া, ললাটের রেখা দেখিয়া যুবতীর তাহা বুঝিতে বিলম্ব হইল না। কি অরুন্তুদ বেদনা! কি ভীষণ পরীক্ষা! কুসুম সুবাসসিক্ত পথে সে পূতিগন্ধের আস্বাদন পাইল। তাহার মাথা ঘুরিতেছিল, চিন্তাশক্তি লুপ্ত হইতেছিল।

গম্ভীর ভাবে যুবক বলিল—বুঝলে তা' হলে আমি আজই রাত্রে যাব।

এবার তাহার মুখে বাক্যস্ফূর্ত্তি হইল। সে যুবকের হাত ধরিয়া বলিল—অমর, ছিঃ! ছিঃ! ভাব দেখি আমার দশা কি হ'বে! জীবনে আমার আর কে আছে? আমি কার কাছে থাকব। তোমারই জন্যে এ পথে—

অমরনাথ আরও বিরক্ত হইল। সে বলিল—বাপ মা সখ করে 'সাবিত্রী' নাম রেখেছিল ব'লে তুমি নিজেকে সত্যিই 'সাবিত্রী' ভাবছ নাকি? আমি কি তোমার স্বামী যে চিরকাল—

রমণীকে সর্প-দংশন করিল। সে বলিল—একি কথা! আমি জীবনে অন্য স্বামী চিনি না, তুমিই আমার স্বামী।

যুবক উচ্চহাস্য করিয়া উঠিল। বলিল—আমায় অবলম্বন করে এসেছ মাত্র, আমি তো নম্বর এক্ আবার কত—

যুবতী তাহার হাত ছাড়িয়া দিল। তাহার শ্বাসরোধ হইয়া আসিল। সে যাহাকে দেবতা মনে করিয়া হৃদয়ে কনক-সিংহাসনে বসাইয়াছিল ছিঃ ছিঃ সে তাহাকে এই চক্ষে দেখিত! তাহার সকল আদর-আপ্যায়ন মিথ্যা! একেবারে শত বৃশ্চিক আসিয়া কুলটাকে দংশন করিল, দীপ্ত মশাল লইয়া দলে দলে যমদূত আসিয়া কুলত্যাগিনীকে দগ্ধ করিতে লাগিল। সে বুঝিল, এ জীবনেই তাহার পাপের শাস্তি আরম্ভ হইয়াছে। সাবিত্রী যাতনা সহ্য করিতে পারিল না। তাহার হস্তপদ শিথিল হইল, চক্ষের জ্যোতিঃ ম্লান হইল, হৃদয়ের সিংহাসনের তলায় ভীষণ ভূমিকম্প হইল—সোণার সিংহাসন মাতালের মত টলিতে লাগিল, তাহার দেবতা ভূমে পড়িয়া লুটিতে লাগিল, হাজার হাজার সর্প আসিয়া অভাগিনীকে দংশন করিতে লাগিল, তাহাদের গ্রামের আবালবৃদ্ধবনিতা তাহার যন্ত্রণায় হাসিতে লাগিল—আনন্দের রোল করিতে লাগিল। তাহার চক্ষের জ্যোতিঃ ম্লান হইল—সে আর কিছু বুঝিতে পারিল না।

মূর্চ্ছিতা রমণীর মস্তকের নিকট কিছু অর্থ রাখিয়া যুবক গৃহত্যাগ করিল। তাহার প্রাণের একটা স্বরের উত্তরে সে বলিল—বেশ তো দেশে ফিরে যদি দেখি ভাল আছে, আমার ওপর মন আছে, আবার যত্ন করব, সুখে রাখব। লোকে বিবাহিত স্ত্রী ফেলে বিদেশ যাত্রা করে। আর আমি—

গাড়িতে উঠিয়া অমরনাথ ষ্টেসন অভিমুখে চলিয়া গেল।

(২)

হাসপাতাল গৃহের তাড়িত আলোকে সাবিত্রী ঘন ঘন দৃষ্টিতে নবজাত শিশুর প্রতি চাহিতেছিল। সাদা ধপ্‌ধপে ছেলে মুষ্টিবদ্ধ করিয়া শূন্যে হাত

নাড়িতেছিল। কি অপার আনন্দ! কি সুখ! কি নবনীত নির্ম্মিত দেহ। সাবিত্রীর সকল দুঃখ যেন ভাসিয়া যাইতেছিল, বিধি যেন তাহার প্রতি মুখ তুলিয়া চাহিয়াছিলেন, শত ইন্দুর আলোকে যেন ভগবান তাহার প্রাণের মসী-ঘন আঁধারটাকে দুরীভূত করিবার চেষ্টা করিতেছিলেন। এ শুভ দিনে যদি সে থাকিত—সাবিত্রী ভাবিল না—তখনই পুত্রের মুখ দেখিয়া তাহার চিন্তা ভুলিল—নৃশংস নিষ্ঠুর অমরনাথ! কিন্তু এতটা সুখ একেলা উপভোগ করিতে তাহার আদৌ প্রবৃত্তি হইতেছিল না। তবে যদি তাহার জননী—আবার ব্যথা, আবার ঝঞ্ঝট —সে পথ রুদ্ধ, সমাজ মুষল মুদগর লইয়া তাহাকে ও তাহার নিরপরাধ শিশুকে প্রহার করিবার জন্য উদ্যত। রমণী আবার শিশু-মুখ দেখিল। কি মন্ত্রপূত ইন্দুবদন। সকল দুঃখ সকল জ্বালা জুড়াইবার কি সুন্দর উপায়! সাবিত্রী তাহার দিকে চাহিয়া সুখে বিভোর হইয়া রহিল।

ঠিক সেই সময় পুত্রের পিতা অমরনাথ সিঙ্গাপুর সহরে সার্কাস কোম্পানীর তাঁবুতে বড় মনসুখে কাল কাটাইতেছিল। সে অমিত-পরাক্রম, সবলদেহ। বাল্যাবধি দেশে 'ডানপিটে ছেলে' বলিয়া বিখ্যাত। সে সার্কাস করিত, বিদেশে ঘুরিত, কিছুদিনের জন্য দেশে ফিরিয়া সে বাল-বিধবা সাবিত্রীর সর্ব্বনাশ করিয়াছিল। তখন সে অতটা বুঝিতে পারে নাই, তখন সে উপলব্ধি করে নাই যে গভীর প্রেমানুরাগে অভাগিনী সাবিত্রী তাহার জন্য জাতি কুলমান জলাঞ্জলি দিতে প্রস্তুত হইয়াছে। সে অসৎসঙ্গে ঘুরিত, জানিত একটা অবলম্বন ধরিয়া ভ্রষ্টা স্ত্রীলোক কুলের বাহির হইয়া আসে পরে আপনার পন্থা খুঁজিয়া লয়। কিন্তু সাবিত্রীর প্রাণে যদি সেরূপ প্রবৃত্তি দেখিত তাহা হইলে বলিষ্ঠ অমরনাথ কখনও তাহাকে ছাড়িতে পারিত না। তাহার প্রাণে তাহার অজ্ঞাতে সাবিত্রীর প্রতি গভীর প্রণয়ের বীজ রোপিত হইয়াছিল। কিন্তু জলের অভাবে সে বীজ বৃহৎ ছায়াশীতল মহীরুহে পরিণত হইতে পারিল না। কেহ তাহার সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিল না, কেহ তাহার প্রণয়ে শত্রুতাচরণ করিল না, সাবিত্রী মোটেই সন্দেহের কাজ করিল না। কেবল একঘেয়ে ভালবাসা আজীবন 'ভবঘুরে' অমরনাথের মোটেই সহ্য হইল না। আবার হংকং সিঙ্গাপুর মন্দালয় তাহাকে ডাকিতে লাগিল। সে সাবিত্রীকে অসহায় ফেলিয়া পলাইল। তাহার ভরণপোষণের বন্দোবস্ত করিতে প্রতিশ্রুত হইল।

প্রথমে কলিকাতা ছাড়িয়া অমরনাথ সাবিত্রীকে একাধিক পত্র দিয়াছিল। সাবিত্রী কিন্তু সে গৃহ ছাড়িয়া অন্যত্র চলিয়া গিয়াছিল। শেষে তাহাকে হাস-

পাতালে যাইতে হইয়াছিল, অমরনাথের পত্র তাহার হস্তগত হয় নাই। এ ব্যাপারে কিন্তু অমরনাথ এক নূতন ভাবে অনুপ্রাণিত হইয়াছিল। সে যাহা খুঁজিতেছিল এক রকম তাহা ঘটিল, সে বাধা পাইল, উপেক্ষার যন্ত্রণা বুঝিল। দিন দিন যেন কোন যাদুবলে তাহার বাসনারাশি সেই অসহায়া সুন্দরীর দিকে তাহাকে টানিতে লাগিল। কিন্তু সে মনে মনে বুঝিল যে, সে যে রত্ন উপেক্ষা করিয়া আবর্জ্জনার মধ্যে নিক্ষেপ করিয়াছে তাহা আবার খুঁজিয়া বাহির করা মনুষ্যের সাধ্যাতীত।

যখন হাসপাতালে শুইয়া সাবিত্রী পুত্রমুখধ্যান করিয়া নির্ম্মল নন্দন-সুখ উপভোগ করিতেছিল, ঠিক সেই সময় সিঙ্গাপুরের তাঁবুতে অমরনাথ বড় মন সুখে কাল কাটাইতেছিল। তাহাদের উভয়ের ভাগ্যের একটা সম্বন্ধ ছিল তাই বিধি একই সময়ে উভয়কে উৎফুল্ল করিতেছিলেন। একটা বৃহৎ শার্দ্দূলের গলদেশ শৃঙ্খলাবদ্ধ করিয়া অমরনাথ আসরে নামিয়াছিল। ব্যাঘ্র জৃম্ভন করিতেছিল, বিড়ালের মত লাঙ্গুল দুলাইতেছিল। দর্শকমণ্ডলী নিশ্বাস চাপিয়া সেই লোমহর্ষক ক্রীড়া দেখিতেছিল, মাঝে মাঝে ঘন করতালির চট্ চট্ শব্দে বিরহী অমরনাথের প্রাণে সুখের লহর তুলিতেছিল। ব্যাঘ্রটা অমরনাথের ইঙ্গিতে উঠিয়া দাঁড়াইতেছিল, মানুষের মত বসিতেছিল, ঘণ্টা বাজাইতেছিল, সম্মুখের পদদ্বয়ে ভর দিয়া উঠিয়া দাঁড়াইতেছিল, নানারূপ ক্রীড়া কৌতুক দেখাইয়া হিন্দু, মুসলমান, ইউরোপীয় ও মলয় নরনারীর সুখ্যাতি অর্জ্জন করিতেছিল। শেষে সেই শ্বাপদ মুখব্যাদান করিল, অমরনাথ অনায়াসে তাহার মুখের ভিতর আপনার মুণ্ড প্রবেশ করাইয়া দিল। লোকে ত্রস্ত হইয়া সে ক্রীড়া দেখিল। যখন নিরাপদে যুবক আপনার মুণ্ড বাহির করিয়া লইল তখন চারিদিকে প্রশংসার রোল উঠিল। তাম্বুমধ্যে করতালির রোল প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল। বিজয়ী বীরের মত অমরনাথ সকলের দিকে চাহিল। কি অপার আনন্দ! কি সুখ!

(৩)

ছয় মাস পরে সার্কাস কোম্পানী কলিকাতায় আসিল। অমরনাথ জাহাজে বসিয়া কত কল্পনা করিল। শিশু দেখিলেই তাহার প্রাণ আনন্দে নাচিয়া উঠিত। এতদিনে তাহার শিশু—সর্ব্বনাশ! তাহার শিশু! কোথায় তাহার শিশু! সাবিত্রী জীবিতা কি মৃতা সে তাহাই জানিত না। সাবিত্রী এখন কাহার অঙ্কলক্ষ্মী সে তাহাও বলিতে পারে না। সাবিত্রী আর তাহার মুখদর্শন

করিবে না সে সন্দেহ তাহার প্রাণকে আলোড়িত করিত। তখন তাহার জীবনব্যাপী সাধনা তাহার সহায়তা করিত, তাহার মাংসপেশী দৃঢ় হইত, তাহার মস্তিষ্কে রক্তের স্রোত ছুটিত, সে মনে মনে প্রতিজ্ঞা করিত যদি একবার সে তাহার প্রণয়িনীর সাক্ষাৎ পায়, তাহার শিশুর সন্ধান পায়, তাহা হইলে দেব দৈত্য যক্ষ রক্ষ কেহ তাহাদের রাখিতে পারিবে না। বিশ্বাসঘাতিনীর সে পাপের দণ্ড দিবে, শিশুকে কোলে তুলিবে, চুম্বন করিবে, বাঘের পৃষ্ঠে বসাইয়া দিবে। তাহাদের বিচ্ছেদের জন্য দায়িত্বটা তাহার আপনার, একথা তাহার মস্তিষ্কে প্রবেশ করিত না। সাবিত্রীর বিশ্বাসঘাতিনী হইবার সাধ্য নাই, সে পাপ করিলে তাহাকে দণ্ডভোগ করিতে হইবে তাহা সে সিদ্ধান্ত করিয়াছিল।

কলিকাতায় ফিরিয়া অমরনাথ সাবিত্রীর কোন সন্ধান পাইল না। তাহার মেজাজ বড় রুক্ষ হইল। সার্কাসের অধ্যক্ষের সহিত সে তর্ক করিল, তাহার ভয়ে অধ্যক্ষ কিছু বলিতে পারিল না। বিনা দোষে সে ব্যাঘ্রটাকে একদিন খুব প্রহার করিল, তাহাতেও প্রাণের জ্বালা নিভিল না। কলিকাতার সকল বারাঙ্গনার গৃহে ঘুরিয়া সে সাবিত্রীর অনুসন্ধান করিল, কোথাও তাহাকে পাইল না। তাহাতে তাহার প্রাণের উদ্বেগ কমিল কিন্তু প্রাণে শান্তি আসিল না। একদিন দূর হইতে সে গ্রামখানি দেখিয়া আসিল, নিজের গৃহ দেখিল, সাবিত্রীর শোকাতুরা জননীর কুটীর দেখিল, কোন সন্ধান পাইল না। একদিন রাত্রিতে ঘুরিতে ঘুরিতে সে দুইজন মাতালকে গল্প করিতে শুনিল। একজন বলিল—চল ভাই সাবিত্রীর ওখানে একটু ইয়ারকি দিয়ে আসি।

বলিষ্ঠ অমরনাথ শিহরিয়া উঠিল। অপর মাতাল বলিল—দূর ওর ঘরে একটা ছেলে ট্যাঁ ট্যাঁ করে, ওখানে কোথা যাবি?

অমরনাথও তাহাদের পিছনে একটু টলিতেছিল। কোন প্রকারে ধৈর্য্য ধরিয়া সে তাহাদের কথা শুনিতেছিল। প্রথম মাতাল বলিল—তা হোক ভাই। ও লোক ভাল, ওর প্রাণটা সাদা।

দ্বিতীয় ব্যক্তি সম্মত হইল। সমস্ত পথ নানা প্রকার কুৎসিত কথা কহিতে কহিতে মাতালদ্বয় চলিল। উন্মত্ত অমরনাথ তাহাদিগের অনুসরণ করিল। তাহার হৃদয়ের অন্তস্তল সূচিকাবিদ্ধ হইতেছিল। তাহার পাপের মাত্রাটা যুবক উপলব্ধি করিতেছিল। তাহার মানসপটে সেই শান্ত মধুর চিত্র উদ্ভাসিত হইল। সাবিত্রীর মাতার পবিত্র কুটীর, সুন্দরী যুবতী ব্রহ্মচারিণী মাতার সহিত ফুল তুলিত, তুলসী চয়ন করিত। সে কাণকাট, কাল ভুজঙ্গ তাহাদের

তপোবনে প্রবেশ করিল। সরলা তাহার নিকট দেশ বিদেশের গল্প শুনিল, তাহার অদ্ভুত অশ্বচালনা দেখিল, তাহার রূপে মজিল, গুণে মুগ্ধ হইল। সে তাহাকে দংশন করিল। তখন কেন বিধাতা তাহাকে ধরিয়া নরকের অগ্নিকুণ্ডে ফেলিয়া দেন নাই—তাহা হইলে সে পুড়িত কিন্তু সরলা সাবিত্রী বাঁচিত। তাহার পর সে বর্ত্তমান চিত্র কল্পনা করিল. মাতাল দুইটার দুর্গন্ধ দেহ দেখিল —সাবিত্রী ইহাদের সহচরী। তপ্ত লৌহশলাকা তাহার মাংসপেশী গুলাকে দগ্ধ করিতে লাগিল, শতবজ্র আসিয়া তাহাকে প্রহার করিতে লাগিল। সে মাতালের মত টলিতে টলিতে মাতাল দুইটার অনুসরণ করিল।

তাহারা একটা জঘন্য পল্লীতে গিয়া দ্বারে করাঘাত করিল। একটা কুৎসিত স্ত্রীলোক আসিয়া দ্বার খুলিয়া দিল। একজন মাতাল বলিল—এই যে সাবিত্রী! বলিহারী সাবিত্রী! যেন গোলাপ ফুলের মত মুখ। চল বাবা ঘরে চল।

সাবিত্রী গালি দিল। তাহারা কথাগুলা উপভোগ করিল। চক্ষু মুছিয়া বারম্বার অমরনাথ অপরিচিতাকে দেখিল। তাহার মনের একটা ভারী বোঝা নামিয়া গেল। আনন্দে অধীর হইয়া সে মাতাল দুইটাকে পদাঘাত করিল, ঘুসি মারিল, চড় মারিল। তাহারা ভূমিতে লুণ্ঠিত হইয়া পড়িল।

(৪)

দুই বৎসরের শিশু দুলাল আপনাকে রেলগাড়ি কল্পনা করিয়া কুটীরের চারিদিকে ছুটিতেছিল। "কুঃ"—দুলাল ইঞ্জিনের বাঁশীর শব্দ অনুকরণ করিয়া বলিতেছিল—"কুঃ!" তাহার পর মুখে ভস্ ভস্ ভস্ ভস্ বলিতে বলিতে তালে তালে পা ফেলিয়া দুলাল ছুটিতেছিল। তাহার জননী ঘরের দাওয়ায় বসিয়া কাগজের থলি নির্ম্মাণ করিতেছিল আর দুলালকে দেখিতেছিল। সে স্বর্গ দেখে নাই। ইহজীবনের পাপের জন্য তাহাকে অনন্তকাল নরকে বাস করিতে হইবে সে তাহা সিদ্ধান্ত করিয়া রাখিয়াছিল। তবু নির্ধন একবার রাজ-প্রাসাদের সুখ ঐশ্বর্য্যের কল্পনা করিয়া লয়। সাবিত্রীও স্বর্গের কল্পনা করিয়া লইয়াছিল। সে বুঝিয়াছিল স্বর্গ তাহার দুলালের মত হৃষ্টপুষ্ট সোণার যাদুতে পূর্ণ। সে দুলালের মুখ দেখিয়া সকল জ্বালা জুড়াইত। এ দুই বৎসর সে কত কষ্ট সহ্য করিয়াছে, কত কুলোকে কত প্রলোভন দেখাইয়া তাহাকে জ্বালাতন করিয়াছে, তবু সে দুলালের মুখ দেখিয়া সকল যাতনার কঠোরতার হস্ত হইতে অব্যাহতি পাইয়াছে। নারিকেলডাঙ্গার একটি গৃহস্থের কুটীরে একখানি

ঘর ভাড়া লইয়া সে বাস করিত। কাগজের ঠুলি নির্ম্মাণ করিয়া, পটে রঙ দিয়া সে জীবিকা-আহরণ করিত। তাহার মধ্যে কত লোক কত সাজে আসিয়া তাহাকে কত প্রলোভন দেখাইয়াছে। সাবিত্রী হাসিত, ভাবিত কলিকাতার বাহিরে এমন, না জানি সহরের ভিতরটা কি ভীষণ! সে থাকিলে ইহাদের পাপের—আবার সে—সাবিত্রী আবার শিশুর মুখ দেখিত, তাহাকে ভুলিতে চেষ্টা করিত। কিন্তু হতভাগা শিশুর সব ভাল—মুখখানা পিতার মুখের অবিকল নকল, দেহখানা পিতার দেহের মত গোলগাল হৃষ্টপুষ্ট। যুবতী নারায়ণ স্মরণ করিয়া অমরনাথের নিষ্ঠুরতা ভুলিতে চেষ্টা করিত।

একদিন তাহাদের ক্ষুদ্র পল্লীতে বড় গোলমাল পড়িয়া গেল। নিকটস্থ একটা বাগান হইতে বাদ্যের রোল উঠিল—ইংরাজী বাজনা। দলে দলে বালক বালিকা রুদ্ধ বাগানের চারিদিকে ঘুরিতে লাগিল। দুলাল বিস্মিত হইয়া মাতার নিকট ছুটিয়া আসিয়া সাবিত্রীর গলা জড়াইয়া ধরিয়া বলিল—তি মা?

মাতা বলিল—বাজনা।

বালকের আনন্দ হইল। বাজনার তালে তালে সে নাচিল। সাবিত্রী হাসিল, গৃহস্থের বধূ হাসিল। অপ্রস্তুত হইয়া দুলাল মাতার কোলে মুখ লুকাইল।

সাবিত্রী বলিল—বৌ, সত্যি কিসের বাজনা ভাই?

গৃহস্থের বধূ বলিল—ও ভাই তা শুননি। রায়েদের বাগানে এক সার্কাসের দল ভাড়া এসেছে।

সাবিত্রীর প্রাণ চমকিয়া উঠিল। সে অন্য মনে বলিল—দল কি?

বধূ বলিল—হ্যাঁ ভাই। ওরা গড়ের মাঠে খেলা দেখাবে। এখানে খেলা শেখে। বাজনা বাজে আর ওরা নিজেদের মধ্যে খেলা করে। কত ঘোড়া এনেছে। বাঘ এনেছে।

দুলাল শুনিতেছিল। বাঘ কি পদার্থ তাহা অবশ্য সে জানিত না। নামটা নূতন রকম শুনিয়া সে বলিল—বাদ্ এ-নে-চে? মা বাদ ন-ব!

গৃহস্থের বধূ হাসিল। তাহার জননী শিহরিয়া উঠিল। মনে মনে বারম্বার নারায়ণের নাম স্মরণ করিল।

(৫)

বাজনা বাজিতেছিল। পল্লীর ছেলে মেয়েগুলা রুদ্ধ ফটকের গরাদের ভিতর দিয়া ক্রীড়া দেখিতেছিল। শূন্যে তারের উপর একজন লোক অবলীলা-

ক্রমে চলিয়া বেড়াইতেছিল। একজন শূন্যে ঘুরিতে ঘুরিতে এক "বার" হইতে অপর "বারে" গিয়া পড়িতেছিল। বাড়ীওয়ালার পুত্রের সহিত দুলাল বাজনা শুনিতে আসিয়াছিল। সেও অপর বালকদের সঙ্গে ক্রীড়া দেখিতেছিল।

একজন বলিল—ঐ দেখ্ বাঘ।

অমরনাথ পিঁজরা হইতে বাঘ বাহির করিল। এক হাতে বাঘের গলার শিকল ধরিয়া অপর হস্তে বেত্র লইয়া সে তাহাকে কুকুরের মত টানিয়া বাহির করিল। দুলালের বড় আনন্দ হইল। সে কাহারও বাধা মানিল না। ছোট ছোট হাত পা লইয়া ফটকের গরাদের ফাঁক দিয়া সে বাগানের ভিতর প্রবেশ করিল। অপর বালকেরা তাহার সাহস দেখিয়া আনন্দ করিতে লাগিল। দুলাল ছুটিয়া বাঘের দিকে চলিল। তাহাকে দেখিয়া একজন চীৎকার করিয়া উঠিল। একটা গোলমাল শুনিয়া অমরনাথ তাহার দিকে চাহিল। সর্ব্বনাশ! এ যে তাহারই মুখ—তবে কি? তাহার ঘন ঘন শ্বাস পড়িতে লাগিল। সে দুই বৎসর ধরিয়া যে দুর্লভ রত্ন খুঁজিতেছিল, একি সেই রত্ন? তাহার বাহ্য জ্ঞান লোপ পাইল। বুক দুরু দুরু কাঁপিতে লাগিল। অন্যমনস্ক হইয়া সে বাঘের শিকল ছাড়িয়া দিল। পুত্রের দিকে সতৃষ্ণ নয়নে চাহিল। তাহার বাম চক্ষু স্পন্দিত হইতেছিল, সুখরবি উঠিতেছিল কি অন্ধকার ঘনাইয়া আসিতেছিল সে ঠিক বুঝিয়া উঠিতে পারিল না।

ব্যাঘ্র জৃম্ভন করিল। এদিক ওদিক চাহিল। অমরনাথের দিকে চাহিল। দেখিল প্রভু অন্যমনস্ক। সে নধর শিকারটি সম্মুখে দেখিল। আর তাহার পশুবৃত্তি সংযত করে সাধ্য কার। এক লাফে শার্দ্দূল দুলালকে ধরিল। চারিদিকে হৈ চৈ পড়িল।

(৬)

জটায়ু পক্ষী রাবণের রথ গিলিয়াছে—সাবিত্রী সেই পট রঙ করিতেছিল। রোল উঠিল—"বাঘে ধরেছে, বাঘে ধরেছে, দুলালকে বাঘে ধরেছে।"

নিমেষের মধ্যে রমণী ছুটিল। কোমল দেহে অসুর বিক্রমে প্রাচীর উল্লম্ফন করিয়া সে বাগানের মধ্যে পড়িল। অমরনাথ আসিয়া বাঘটাকে ধরিয়াছিল। রক্তমুখ শার্দ্দূল—স্নেহকাতর পিতা—নর ও পশুতে মল্লযুদ্ধ হইতেছিল। ব্যাঘ্র আর বাধা মানিল না, অমরনাথকে চিনিল না। অমরনাথের দেহ ক্ষত বিক্ষত করিয়া দিল।

সাবিত্রী ছুটিয়া গিয়া শিশুকে তুলিল—মল্লযুদ্ধ দেখিল না। তাহার দক্ষিণ

হস্ত একেবারে ছিন্ন হইয়াছিল, রক্তের স্রোত বহিতেছিল। খুব মৃদুভাবে তাহার বক্ষ স্পন্দিত হইতেছিল। অমরনাথ বাঘটাকে একপ্রকার বশীভূত করিয়াছিল কিন্তু প্রতি মুহূর্ত্তে তাহার বলক্ষয় হইতেছিল। বন্দুকের শব্দ হইল। সার্কাসের অধ্যক্ষ শার্দ্দূলটাকে গুলি মারিল। হুঙ্কার করিয়া পশুটা ভূমে লুটিয়া পড়িল। পিতার রক্ত পুত্রের রক্ত নরঘাতক শার্দ্দূলের রক্ত একস্রোতে ধরাতল সিঞ্চিত করিতে লাগিল।

আঁখিজলে বিদায়—রক্তস্রোতে মিলন! কি প্রহেলিকা! কি বিধিলিপি! রক্তাক্তদেহ অমরনাথ মৃতপ্রায় শিশুকে ধরিয়া বারম্বার চুম্বন করিতে লাগিল। সাবিত্রী তাহাকে দেখিল সে সাবিত্রীর কাতর মুখ দেখিল। যেন দুলালকে চিরদিন তাহারা একত্র লালনপালন করিতেছিল। সাবিত্রী কাতরকণ্ঠে বলিল—বাঁচাও, অমর, বাঁচাও।

মান নাই, অভিমান নাই, স্মৃতি নাই, বিষ নাই, রক্ত-বাসরে পুনর্মিলন—কোন সামাজিকতা নাই। উভয়ের প্রাণে স্পন্দন, উভয়ের কোলে স্নেহের দুলাল, উভয়ের চক্ষে অশ্রুর স্রোত। উভয়ের প্রাণের সকল তার এক সুরে বাঁধা। তাই সাবিত্রী কাতরকণ্ঠে বলিল—বাঁচাও, অমর, বাঁচাও।

অমর কাঁদিল। প্রাণপণে ক্ষতস্থান টিপিয়া ধরিল। শিশুর হৃদয় আর একটু জোরে স্পন্দন করিল। সাবিত্রীর প্রাণে আশা আসিল, অমরের প্রাণে আশা উপজিল। সাবিত্রী বলিল—তোমার নিজের রক্ত-ওগো কেহ দেখ না গা?

সকলে বিস্মিত নেত্রে দেখিতেছিল। অমর বলিল—থাক্।

সে শিশুর মুখচুম্বন করিল। সাবিত্রী শিশুর মুখচুম্বন করিল। শিশুর হৃদয় স্পন্দিত হইল, তাহার পরেই স্তব্ধ হইল। দেবশিশু দেবপুরীতে পলাইল। মাতা শিরে করাঘাত করিয়া কাঁদিল। পিতা শিরে করাঘাত করিল। পিতা বলিল—"আর পালাবো না। বাবা একবার দেখ।" শিশু দেখিল না। সাবিত্রীর কাতর-ক্রন্দনে বাগান প্রতিধ্বনিত হইল। অমর উঠিল। দৃঢ় হস্তে মৃত শিশুকে দক্ষিণ স্কন্ধে ফেলিল—অর্দ্ধ মূর্চ্ছিতা প্রণয়িনীকে বামস্কন্ধে তুলিয়া লইল। রক্তাক্ত দেহে ধীর পাদবিক্ষেপে টলিতে টলিতে বাগানের গৃহের দিকে চলিল। তাহার চক্ষু হইতে দরদর বেগে অশ্রুপাত হইতেছিল। দীর্ঘ নিশ্বাসের মাঝে হৃদয়ভেদী হুঙ্কার করিয়া অনুতপ্ত বলিতেছিল—হাঃ ভগবন! হাঃ ভগবন!

শ্রীকেশবচন্দ্র গুপ্ত।

ষটপদ।

সংস্কৃত শব্দ ষট্পদ অর্থে মধুমক্ষিকা। কিন্তু উই, পিপীলিকা, ফড়িং, প্রজাপতি প্রভৃতি নানা জাতীয় কীটপতঙ্গের ছয়টি পদ থাকিলেও তাহাদিগকে ষটপদ শ্রেণীভুক্ত করা হয় না। ছয়পদ বিশিষ্ট কীট পতঙ্গগুলিকে ইংরাজীতে ইন্‌সেক্ট (Insect) বলা হয়। আমরা এ প্রবন্ধে ষটপদ শব্দের যোগরূঢ় অর্থ বর্জ্জন করিয়া সকল ছয়পদ বিশিষ্ট কীট পতঙ্গ সম্বন্ধে উহা প্রয়োগ করিব। Insect শব্দের ষটপদ ভিন্ন অপর কোনও সংস্কৃত শব্দ পাইলাম না বলিয়া ইন্‌সেক্ট জাতীয় জীবের অর্থে 'ষটপদ' শব্দ ব্যবহার করিতে বাধ্য হইলাম।

ষটপদ নানা শ্রেণীতে বিভক্ত। এত প্রকারের ছয় পদ বিশিষ্ট কীট পতঙ্গ দেখিতে পাওয়া যায় যে আমাদের সাধারণ ভাষায় প্রত্যেকের নামকরণ করা হয় নাই। মোটামুটি কতকগুলা নামজাদা কীট পতঙ্গের সহিত আকারের সাদৃশ্য দেখিয়া আমরা অনেক গুলাকে পোকা, ফড়িঙ্, প্রজাপতি, পিঁপড়ে, আরশুলা প্রভৃতি আখ্যা প্রদান করি এবং যথাসম্ভব সেগুলির নিকট হইতে দূরে থাকিতে চেষ্টা করি। পাশ্চাত্য বিজ্ঞান প্রত্যেক ষটপদের আকার প্রকার চাল চলন পর্য্যবেক্ষণ করিয়া তাহাদিগের নামকরণ করিয়াছে, তাহাদের শ্রেণী বিভাগ করিয়াছে। সাধারণ লোকে যেমন একটা নূতন রকমের কীট বা পতঙ্গ দেখিলে ভয়ে ও ঘৃণায় তাহার নিকট হইতে দূরে থাকিতে পারিলে আপনাকে সৌভাগ্যবান মনে করে, নূতন রকমের ষটপদ পাইলে ষট্‌পদ্ তত্ত্ববিদ্ বিলাতী পণ্ডিত তেমনি মনে করেন যে তাঁহার ভাগ্য সুপ্রসন্ন। এই শ্রেণীর পণ্ডিতদিগকে Entomologist বলা হইয়া থাকে। বিলাতে অনেক ষটপদ তত্ত্ববিদ্ আছেন। আবার এক একজন এই প্রাণী বিভাগের এক একটি শ্রেণীর ষটপদের চাল চলন বিশেষত্ব অধ্যয়ন করিয়া জীবন যাপন করিয়াছেন। মাছি, মৌমাছি, উই, পিপীলিকা, ভ্রমর, প্রজাপতি সকল শ্রেণীর ভিন্ন ভিন্ন উপাসক পাশ্চাত্যে অনেক দেখিতে পাওয়া যায়। আমাদের দেশের কবির দল দুই অলিকে লইয়া অনেক ঠাট্টা বিদ্রূপ করিয়াছেন বটে কিন্তু কেহ তাহাদের রীতি নীতি চাল চলন লক্ষ্য করিয়া কালাতিপাত করিয়াছেন বলিয়া মনে হয় না। সংস্কৃতে ষট্‌পদপ্রিয় অর্থে নাগকেশর নলিনী প্রভৃতি ভৃঙ্গপ্রিয় কুসুম বুঝায়, অধ্যয়নশীল পণ্ডিত বুঝায় না!

ষট্‌পদ বা insect জাতীয় কোন জীবকে ব্যবচ্ছেদ করিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে সাধারণতঃ তাহাদের দেহ—মুণ্ড, বক্ষ ও উদর এই তিন ভাগে বিভক্ত। বক্ষে তিন জোড়া পদ সংবদ্ধ। ছয়টি পদ কেবল বক্ষেই সংবদ্ধ, উদর অপেক্ষাকৃত লম্বা হইলেও তাহাতে কোনও পদ সন্নিবেশিত নাই। বক্ষে ছয়টি পা ব্যতীত এই জাতীয় জীবের অনেকের দুই জোড়া পক্ষ থাকে। উপরের পক্ষ সাধারণতঃ মোটা এবং কঠিন, নিম্নের ডানা জালের মত। একটা আরশুলা ধরিয়া পরীক্ষা করিলেই একথার যাথার্থ্য বুঝিতে পারা যায়।

আমরা এ প্রবন্ধে কোন্ শ্রেণীর জীবের কথা বলিতেছি, উপরোক্ত দেহের বর্ণনা হইতে তাহা বেশ বোধগম্য হইবে। যে জীবের বক্ষে ছয়টি পদ সংযুক্ত নহে, ষট্‌পদ বা insect জাতির মধ্যে আমরা তাহাদের শ্রেণীবদ্ধ করিব না। মাকড়সা অষ্টপদ। সুতরাং তাহার ক্রিয়া কলাপ বিশেষত্ব আমাদের প্রবন্ধের বিষয়ীভূত নহে। বৃশ্চিক কৃমিকীট প্রভৃতিও ষট্‌পদ শ্রেণীভুক্ত নহে।

যেমন মুণ্ড, বক্ষ ও উদর এই তিন ভাগে ষট্‌পদের দেহ বিভক্ত, তেমনি আবার উহার দেহের প্রত্যেক ভাগটি ছোট ছোট গোলাকার চক্রে বিভক্ত। মুণ্ড ও বক্ষের কিম্বা বক্ষ ও উদরের পার্থক্য যেমন সহজেই দেখিতে পাওয়া যায় প্রত্যেক অংশের চক্রাকার বিভাগ গুলা তত সহজে বুঝিতে পারা যায় না। একটু বড় পতঙ্গ ধরিয়া এমন কি বড় কাঠ পিঁপড়া লইয়া সামান্য মনোযোগের সহিত দেখিলেই এই সকল চক্রের অস্তিত্ব বুঝিতে পারা যায়। ষট্‌পদ দেহের সমস্ত চক্রের সমষ্টি বিংশতি সংখ্যা অতিক্রম করে না।

উহাদের মুণ্ডে চক্ষু থাকে, এক জোড়া শুণ্ড থাকে এবং ষটপদ ভেদে ওষ্ঠের গঠন বিভিন্ন হইয়া থাকে। এক প্রণালীতে গঠিত হইলেও বিভিন্ন ষটপদ শ্রেণীর মুখের আকার বিভিন্ন। যে শ্রেণী যেরূপ পদার্থ ভোজন করিয়া জীবন ধারণ করে সেই শ্রেণীর ষটপদের মুখের আকৃতি সেইরূপ পদার্থ আহরণের উপযোগী। মশক প্রভৃতি কতক শ্রেণীর ষটপদের মুখের আকার কেবল দংশনোপযোগী। কাহারও মুখের আকৃতি হইতে বুঝিতে পারা যায় যে, সে কেবল কুসুমের বক্ষে মুখ দিয়া মধু পানই করিতে পারে। প্রজাপতি এই শ্রেণীর জীব। তাহারা কেবল শুঁড় প্রবেশ করিয়া ফুলের মধুটুকু চুরি করিয়া লয়। কিন্তু ভৃঙ্গ আর একটু নির্দ্দয়। সে শুঁড় দিয়া ফুল কাটিতে পারে, কুসুম যেখানে মধু সঞ্চয় করিয়া রাখে দুষ্ট অলি সে ঘরে সিঁদ কাটিয়া মধু অপহরণ করে। তাই তাহার মুখ ছেদন ও অপহরণ উভয় কর্ম্মের উপযোগী। তবে

ইহারা কেবল ফুলের যথা সর্ব্বস্ব অপহরণ করিয়া লয় না। এক ফুলের পরাগ অপর ফুলের গর্ভে প্রবিষ্ট করিয়া উদ্ভিদ জাতির বংশ বৃদ্ধি বিষয়ে সহায়তা করে।

ষটপদের বক্ষ তিন ভাগে বিভক্ত। প্রত্যেক বিভাগে এক জোড়া করিয়া পদ সন্নিবেশিত। অধিকাংশ ষটপদ পক্ষযুক্ত। দ্বিতীয় ও তৃতীয় বিভাগে এক এক জোড়া করিয়া ডানা থাকে। দ্বিতীয় চক্রের পক্ষদ্বয় কঠিন ও চিত্রিত।

ইহাদিগের শোণিত বর্ণহীন ও গাঢ়। এক একটা মশক বা ছারপোকা মারিলে যে লাল রক্ত নির্গত হয় তাহা উহাদের নিজস্ব নহে, তাহা নরশোণিত। মানুষের রক্ত পান করিয়া পরিপাক করিবার পূর্ব্বে নিহত হইলে মশক প্রভৃতির দেহ হইতে লালরক্ত নির্গত হয়।

অনেক জীবের মত ষটপদের শ্বাস প্রশ্বাসের কার্য্য নাসিকার দ্বারা সাধিত হয় না। ইহাদের সমস্ত দেহে শাখা প্রশাখা যুক্ত ছোট ছোট নল আছে। ইহাদিগের ইংরাজী পরিভাষা Trachæ। এই সকল নলের দ্বারা ইহাদের শ্বাস প্রশ্বাসের কার্য্য সাধিত হইয়া থাকে। উদরের অংশ বিশেষের পরিচালনার দ্বারা ফুসফুসের কার্য্য সম্পাদিত হইয়া থাকে।

ষট্‌পদের জ্ঞানেন্দ্রিয়ের মধ্যে চক্ষু ও শুণ্ড দেখিতে পাওয়া যায়। চক্ষুর দ্বারা ইহারা দেখিতে পায় এবং শুণ্ডের দ্বারা স্পর্শ সুখ অনুভব করে। ইহাদের ওষ্ঠের নিম্নে ক্ষুদ্র জিহ্বা আছে তাহাতে স্বাদ গ্রহণ করিবার ক্ষমতা আছে। ইহারা শব্দ শুনিতে পায় তাহা সহজ পরীক্ষার দ্বারা বুঝিতে পারা যায়। তাহারা যে আঘ্রাণ করিতে পারে তাহাও নিঃসন্দেহ। কেবল চক্ষের দ্বারা ফুলের অবয়ব দেখিয়া তাহারা বহুদুর হইতে ফুলের মধু আহরণ করিতে আসে-তাহা নহে। কুসুম সুবাস ভৃঙ্গকে আকর্ষণ করে—বহুদূর হইতে ফুলের গন্ধ আঘ্রাণ করিয়া অলিকুল কুসুমের সন্ধান পায়।

নিম্নশ্রেণীর অনেক জীবের মধ্যে স্ত্রী ও পুরুষের বিভিন্নতা নাই। ষটপদদিগের মধ্যে স্ত্রী ও পুরুষের স্বাতন্ত্র্য সুস্পষ্টরূপে বিদ্যমান। স্ত্রী ও পুরুষের, আকারের এবং বর্ণেরও পার্থক্য দেখিতে পাওয়া যায়। কতকগুলি ষটপদের মধ্যে ক্লীবের অস্তিত্ব প্রত্যক্ষ করিতে পারা যায়। কিন্তু আধুনিক পর্য্যবেক্ষণের ফলে স্থিরীকৃত হইয়াছে যে মধুমক্ষিকা সমাজের ক্লীবেরা প্রকৃতপক্ষে অসম্পূর্ণ দেহবিশিষ্ট স্ত্রী-জাতীয় ষটপদ। এইরূপ ক্লীবদিগকে সামাজিক ষটপদের যৌথ বাসস্থানে দেখিতে পাওয়া যায়। ইহারা সমাজের হিতের জন্য প্রাণপাত পরিশ্রম করে—যৌথ বাসস্থান নির্ম্মাণ করে, সকলের জন্য খাদ্য সংগ্রহ করে,

সন্তান সন্ততির লালন পালন করে এবং শত্রুর আক্রমণ হইতে নিজ নিজ সমাজকে রক্ষা করে। মধুমক্ষিকা, উই, পিপীলিকা প্রভৃতি এই শ্রেণীর ষটপদ।

কতকগুলি ষটপদের মধ্যে একটা বড় বিশেষত্ব দেখিতে পাওয়া যায়। অবশ্য সকল শ্রেণীর জীবই যৌবনে উপনীত হইলে দেহের অবস্থান্তর ঘটে। মানুষের মুখে গুম্ফ, শ্মশ্রুর উদ্গম হয়, ময়ূরের পুচ্ছ জন্মে, গরু ছাগল হরিণ প্রভৃতির মস্তকে শৃঙ্গের উদ্গম হয়। কিন্তু তাহা হইলেও নরশিশুর ও পূর্ণাবয়ব নরের মধ্যে এমন কোনও বিশেষ পার্থক্য নাই যাহাতে নরশিশুকে নর ব্যতীত অপর জীব বলিয়া মনে হয়। সকল জীবই শৈশবে অপূর্ণাবয়ব থাকে, যৌবনে পূর্ণাবয়ব প্রাপ্ত হয়। কিন্তু কতক শ্রেণীর জীবের এমন বিশেষত্ব আছে যে, শৈশবে তাহাদিগকে একেবারে অপর শ্রেণীর জীব বলিয়া মনে হয়। ভেক শিশুকে প্রথমাবস্থায় মৎস্য বলিয়া ভ্রম জন্মে। কিন্তু ক্রমশঃ তাহার শরীরের কতক অংশ পরিবর্ত্তিত হইয়া ভেক শিশু পূর্ণাবয়ব মণ্ডুকে পরিণত হয়। ইহাদের পরিবর্ত্তনে নূতনত্ব আছে। গুম্ফ শ্মশ্রু বর্জ্জিত নরশিশুর গুম্ফশ্মশ্রুশোভিত নরে পরিণতির সহিত, বয়সাধিক্যে ভেকের অবস্থান্তরের তুলনা হয় না। এইরূপ পরিণতির সহিত একেবারে নূতন রকমের কলেবর লাভ অনেক ষটপদের ভাগ্যে ঘটিয়া থাকে। রেশম কীটের দেহ পরিবর্ত্তিত হইয়া যখন প্রজাপতির দেহে পরিবর্ত্তিত হয় তখন রেশম কীট ও প্রজাপতি যে এক শ্রেণীর জীব তাহা মোটেই সম্ভবপর বলিয়া মনে হয় না। অনেক ষটপদ কিন্তু এইরূপ পরিবর্ত্তনশীল। বর্ষাকালের ঘৃণিত কণ্টকাবৃতদেহ শুঁয়া পোকা এক রকম প্রজাপতিতে পরিণত হয়। আমড়া গাছে হরিদ্রা বর্ণের এক প্রকার পোকা জন্মিয়া থাকে। সেগুলার দেহ বড় নরম, বুকে ষটপদ ব্যতীত অনেক পদ, বুকে হাঁটিয়া আমড়ার পাতা ভক্ষণ করিয়া থাকে। কিছুদিন পরে তাহারা সুন্দর পতঙ্গে পরিণত হয়—বেশ মসৃণ দেহ, শক্ত ডানা—কেমন সুন্দর বর্ণ। তাহার আকার দেখিয়া, দেহের লাবণ্য দেখিয়া, বর্ণ বিন্যাস দেখিয়া মনে হয় না যে, এই উড্ডয়নক্ষম সুন্দর পতঙ্গ শৈশবে বুকে হাঁটিয়া বেড়াইত।

ষটপদদিগের এইরূপ পরিবর্ত্তনশীলতা পর্য্যবেক্ষণ করিয়া জীবতত্ত্ববিদ্ পণ্ডিতগণ ইহাদিগকে তিনটি প্রধান শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়াছেন। এক একটি শ্রেণী আবার নানা শাখা প্রশাখায় বিভক্ত। আমরা এই তিন শ্রেণীর সামান্য পরিচয় দিব।

প্রথম শ্রেণীর ষটপদদিগকে অপরিবর্ত্তনশীল বা Ametabolic বলা হইয়া থাকে। ইহাদের মধ্যে শিশু ও পূর্ণাবয়বের আকৃতির কোনও পার্থক্য নাই। অপরাপর ষটপদ বৃদ্ধ বয়সে যেমন পক্ষযুক্ত হয় ইহাদের আর তেমন পক্ষ জন্মে না। ডিম ফুটিলেই শাবক পিতার মত দেখিতে হয়—অবশ্য আকারে শিশু পিতার মত বড় হয় না। বয়সের সহিত তাহাদের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ পূর্ণতা প্রাপ্ত হয় মাত্র, কিন্তু তাহাদের দেহের কোনও পরিবর্ত্তন ঘটে না।

এই শ্রেণীর ষটপদদিগকে মুখের গঠন ভেদে নানা প্রকার শাখাতে ষটপদ তত্ত্ববিদগণ বিভক্ত করিয়া থাকেন। অবশ্য সাধারণ পঠিকের পক্ষে সে সকল শ্রেণী বিভাগ তেমন চিত্তাকর্ষক হইতে পারে না।

ষটপদদিগের দ্বিতীয় শ্রেণী "আংশিক পরিবর্ত্তনশীল" বা Hemimetabolic। ষটপদদিগের এই পরিবর্ত্তন বুঝিবার জন্য আমরা তাহাদের জীবনের বিভিন্ন অধ্যায়গুলা বুঝিতে চেষ্টা করিব। অবশ্য প্রথমতঃ ইহারা ডিম হইতে নির্গত হইয়া এক অবস্থা প্রাপ্ত হয়। সেই অবস্থার ষটপদদিগকে লার্ভা (Larva) বলে। আমি এ শব্দের বাঙ্গালা পরিভাষা দিয়া বিষয়টাকে জটিল করিতে চাহি না। এ প্রবন্ধের উদ্দেশ্য পাঠকদিগের মনে কৌতূহল উদ্দীপিত করিয়া তাহাদিগকে এ বিষয়ে অধ্যয়ন করিতে উৎসাহদান করা। এ বিষয় অধ্যয়ন করিতে গেলে ইংরাজি গ্রন্থের আশ্রয় গ্রহণ করিতে হইবে। সুতরাং আমি ইংরাজি পরিভাষার পরিবর্ত্তে একটা বাঙ্গালা পরিভাষার সৃষ্টি করিতে চাহি না। তাই এ প্রবন্ধে আংশিক ও সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তনশীল ষটপদের শৈশব কালকে লার্ভা বলিয়া বর্ণনা করিব। লার্ভার অবস্থা উত্তীর্ণ হইয়া ষটপদ কীট পতঙ্গ দ্বিতীয় অবস্থায় পরিণত হইলে তাহাদিগকে পিউপা (Pupa) বলা হইয়া থাকে। জীবনের এই দ্বিতীয় অধ্যায় পার হইয়া ইহারা পূর্ণাবয়ব প্রাপ্ত হয়। তখন ইহাদিগকে ইমাগো (Imago) বলা হয়। পিতার মূর্ত্তি প্রাপ্ত হয় বলিয়া ইহাদিগকে মূর্ত্তিমান বা Imago বলা হইয়া থাকে।

অপরিবর্ত্তনশীল ষটপদদিগের লার্ভা, পিউপা ও ইমাগোর চেহারা এক প্রকারের। আংশিক পরিবর্ত্তনশীল ষটপদদিগের মধ্যে লার্ভা, পিউপা ও ইমাগোর অবয়বের যথেষ্ট সাদৃশ্য আছে। তবে সাধারণতঃ ইমাগোর পক্ষ থাকে, লার্ভার থাকে না। লার্ভা খুব কার্য্যতৎপর, খুব ভোজন করিতে ভালবাসে। লার্ভা পিউপায় পরিণত হইলে একটু বড় হয় এবং পক্ষের স্থলে অর্থাৎ বক্ষের দ্বিতীয় ও তৃতীয় চক্রাকার অংশে পক্ষের সামান্য আভাস পাওয়া যায়।

জীবনের দ্বিতীয় অধ্যায়ে এই শ্রেণীর ষটপদ খুব ঘুরিয়া ফিরিয়া বেড়ায়, ভোজন করিয়া দেহ সবল করে। তাহার পর ইহারা পূর্ণাবয়ব প্রাপ্ত হয়। তখন, ইহাদের পক্ষ উদগত হয় এবং জননেন্দ্রিয় সম্পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়। এই অবস্থায় ইহারা ডিম্বোৎপাদন করে, লার্ভা বা পিউপার সন্তানোৎপাদিকা শক্তি নাই।

এই শ্রেণীর, এক প্রকার ষটপদ লার্ভা ও পিউপা অবস্থায় জলচর তাহার পর ইমাগো অবস্থা প্রাপ্ত হইলে তাহারা ভূচর ও খেচর অবস্থায় জীবন ধারণ করে। কিন্তু ইহাদিগের অবয়ব তিন অবস্থায় প্রায় একই আকারের। কেবল লার্ভা পক্ষবিহীন, ইমাগো পক্ষযুক্ত। দুই এক প্রকার মক্ষিকা এই শ্রেণীর জীব।

আংশিক পরিবর্ত্তনশীল জীবের মধ্যে উই, আরশুলা, প্রভৃতি নানা প্রকার জীব আমাদের নিত্য সহচর। মুখের আকার ভেদে আংশিক পরিবর্ত্তনশীল ষটপদদিগকেও জীবতত্ত্ববিদ পণ্ডিতেরা নানা ভাগে বিভক্ত করিয়া থাকেন।

তৃতীয় শ্রেণীর ষটপদ সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তনশীল বা Holometabolic। আমাদিগের পরিচিত প্রজাপতি, ঝিঁঝিপোকা, মৌমাছি, বোলতা, ভীমরুল প্রভৃতি এই শ্রেণীর ষটপদ। এই শ্রেণীর ইনসেক্টের জীবনের ইতিহাস বড় বৈচিত্র্যময়। ইহাদিগের ডিম হইতে শেষ পরিণতি অবধি জগদীশ্বরের বিচিত্র সৃষ্টিকৌশল ঘোষণা করে। ইহাদিগের লার্ভার অবয়বের সহিত ইমাগোর অবয়বের কোনও সাদৃশ্য নাই।

এই শ্রেণীর ষট্‌পদ লার্ভা অবস্থায় কৃমিকীটের মত বুকে হাঁটিয়া চলে এবং ষটপদের বিশেষত্ব ছয়টি পদ ব্যতীত এ অবস্থায় ইহাদের বুকে অনেকগুলি পদ থাকে। আবার এই শ্রেণীর কতক প্রকার ষটপদের আদৌ চরণ থাকে না। লার্ভার মুখের খুব জোর থাকে আর এ অবস্থায় তাহারা পেটুকের মত খুব বেশী আহার করে। যাঁহারা রেশম কীট বা পলু পোকার চাষ দেখিয়াছেন, তাঁহারা এ কথার যাথার্থ্য অনুভব করিবেন। ইহারা গোগ্রাসে মালবেরী বা তুঁতপাতা ভক্ষণ করে। এই অবস্থায় লার্ভা যেমন ভোজন করে তেমনি বৰ্দ্ধিত হয়। অনেকবার খোলস ছাড়িয়া দেহকে সবল ও যথাসম্ভব বৰ্দ্ধিত করিয়া লার্ভা পিউপায় পরিবর্ত্তিত হয়। তখন ইহা একেবারে নিষ্কর্ম্ম হইয়া পড়ে। কতক শ্রেণীর ষট্‌পদ এই অবস্থায় আপনাদের শরীরের চারিদিকে মুখের লালা দ্বারা কোয়া নির্ম্মাণ করিয়া তাহার ভিতর নিশ্চেষ্ট হইয়া বসিয়া থাকে। রেশম কীট, তসর কীট প্রভৃতি এই শ্রেণীর জীব। কতক শ্রেণীর পিউপা অপর পদার্থ আশ্রয় করিয়া নিস্তেজ হইয়া পড়িয়া থাকে। কিন্তু এই সময় ইহাদের অবস্থান্তর হইতে

থাকে। রেশম কীট প্রভৃতি রেশমের কোয়ার ভিতর থাকিয়া প্রজাপতিতে পরিণত হয়। এই অবস্থায় ইহাদের শরীরের নানা অংশের পরিবর্ত্তন ও পরিবর্জ্জনের দ্বারা ইহারা এক প্রকার নূতন জীবে পরিণত হয়। সেই নূতন জীবই পূর্ণাবয়ব ষটপদ ইমাগো।

ইমাগো বা পূর্ণাবয়ব ষটপদ সন্তানোৎপাদিকা শক্তি লাভ করে। ইহারা সন্তান উৎপাদন করিয়াই পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হয়। মনে হয় তাঁহার সৃষ্টি বজায় রাখিবার জন্যই জগদীশ্বর এত আয়োজন করিয়া ইহাদের দেহের পূর্ণতা সম্পাদন করেন। এইজন্য পিপীলিকার পক্ষ উদ্গত হয় এবং পক্ষোদ্গম পিপীলিকার মরণ সূচনা করে।

পরিবর্ত্তনশীল ষটপদদিগের মধ্যে সকলেরই পক্ষ বেশ স্পষ্টভাবে উদ্গত হয় না। পিশু (flea) দিগের পক্ষস্থলে পক্ষের অঙ্কুর মাত্র দেখিতে পাওয়া যায়। ইহারা প্রায় দ্বাদশ দিন ধরিয়া গুটিপোকার মত কোয়া বুনিয়া প্রায় দুই সপ্তাহ পরে ইমাগো অবস্থায় নির্গত হয়। কতক প্রকারের পরিবর্ত্তনশীল ষটপদের পিউপা নিস্তেজ অবস্থায় না থাকিয়া জলচর অবস্থায় থাকে এবং ঘুরিয়া বেড়ায়। মশক এই শ্রেণীর জীব।

আমরা চলিত কথায় যাহাদের প্রজাপতি বলি, ইংরাজিতে তাহাদের মধ্যে দুইটি বিভাগ আছে—moths এবং butterflies। অবশ্য সে পার্থক্য এস্থলে আলোচনা করিবার আবশ্যক নাই।

পরিবর্ত্তনশীল ষটপদের মধ্যে মৌমাছি, পিপীলিকা প্রভৃতি সমাজ গঠন করিয়া যৌথ ভাবে বসবাস করে। আমরা পূর্ব্ব প্রবন্ধে * ঐ সকল যৌথ সমিতির বর্ণনা দিয়াছি—মৌমাছি কি প্রকারে বাসা নির্ম্মাণ করে তাহাও চিত্র দ্বারা বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছি, সুতরাং এস্থলে সে কথার পুনরাবৃত্তি করিলাম না।

অনেক শ্রেণীর ষটপদের মধ্যে আবার পুরুষের পক্ষ থাকে, স্ত্রীলোকের পক্ষ থাকে না।

পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিকগণ ষটপদ জগতকে অবশ্য প্রধানতঃ তিন ভাগে বিভক্ত করিয়াছেন। কিন্তু এই তিন ভাগ আবার এত শ্রেণীতে বিভক্ত যে তাহার ইয়ত্তা করা কঠিন। ফলতঃ ষটপদ জাতি যত অধিক শ্রেণীতে বিভক্ত হইয়াছে এত অধিক শ্রেণীতে অপর কোনও জাতীয় জীব বিভক্ত হয় নাই। এক ঝিঁঝিঁ পোকা (beetles) জাতীয় ষটপদ ৮০,০০০ রকমের দেখিতে পাওয়া যায়।

* অর্চ্চনা ১১ বর্ষ ২১৭ পৃষ্ঠা।

পণ্ডিতেরা অদ্যাবধি দুই লক্ষ প্রকারের ষটপদ আবিষ্কার করিয়াছেন এবং তাঁহারা আশা করেন যে অধ্যবসায়ের ফলে অন্ততঃ দশ লক্ষ রকমের ষটপদ আবিষ্কৃত হইবার সম্ভাবনা আছে।

ষটপদদিগের মধ্যে বোধ হয় পিপীলিকা ও মধুমক্ষিকা সর্ব্বাপেক্ষা দীর্ঘজীবী। ইহাদিগের সমাজের কর্ত্রী বা রাণীদিগকে সাত বৎসর অবধি জীবন ধারণ করিতে দেখা গিয়াছে। আবার অনেক রকম ষটপদ চব্বিশ ঘণ্টা মাত্র জীবন ধারণ করে। কোন কোন ষটপদ তিন বৎসরে পূর্ণাবয়ব প্রাপ্ত হয়, কিন্তু পূর্ণাবয়ব প্রাপ্ত হইয়া সামান্য কয়েক দিন মাত্র জীবন ধারণ করে। আমাদের গৃহের ড্যানভেনে মাছিগুলা গ্রীষ্মকালে শীঘ্র বাড়িয়া উঠে। শীতের প্রকোপে উহারা অত শীঘ্র বাড়িতে পারে না।

জগতে দুই লক্ষ রকমের ষটপদ থাকিলেও কেবল দুই চারি রকম ষটপদের দ্বারা আমাদের উপকার সাধন হয়। মৌমাছির অধ্যবসায় ও পরিশ্রমের ফলে আমরা মধুপান করিতে পারি, মোমের বাতী নির্ম্মাণ করিয়া দেবপূজা করিতে পারি। রেশম কীট, তসর কীটের অনুগ্রহে আমরা রেশম ব্যবহার করিতে পারি এবং কয়েক প্রকার কীটের দ্বারা লাক্ষা প্রস্তুত হয়। পূর্ব্বে এক প্রকার কীটের দেহ হইতে লিখিবার কালি নির্ম্মিত হইত, এখন কিন্তু আর জান্তব কালির দ্বারা লোকে বাণীর আরাধনা করে না।

সর্ব্বভুক নর দুই চারি প্রকারের ষটপদ ভোজন করিয়া থাকে। অনেক দেশের লোক পঙ্গপাল আহার করে। জনরব আছে যে চীনবাসীগণের নিকট আরশুলা বড় উপাদেয়, কিন্তু আমি অনেক চৈনিক বন্ধুকে এ বিষয় জিজ্ঞাসা করিয়া জানিয়াছি যে কথাটা অলীক। অষ্ট্রেলিয়া, আফ্রিকা প্রভৃতি দেশের অসভ্য অধিবাসিগণের মধ্যে কেহ কেহ পোকার ডিম খাইয়া থাকে।

অনেক ষটপদের মুখে বিষ থাকে, তাহাদের দংশনে শরীরে ব্যাধি জন্মে। অনেক ষটপদ আবার আমাদের কৃষিক্ষেত্রে ফসল নষ্ট করিতে প্রভূত অধ্যবসায় দেখাইয়া থাকে। তবে মোটের উপর ষটপদের নিকট উদ্ভিদ-জগৎ ঋণী। কারণ অনেকস্থলে তাহারা এক ফুলের পরাগ অপর ফুলে লইয়া না গেলে বীজ জন্মিত না।

জোনাকি পোকার দল ষটপদ শ্রেণীভুক্ত। ইহাদের আবার নানা প্রকার শ্রেণী আছে। বাঙ্গালার খদ্যোৎ উড়িয়া বেড়ায়। সিমলা পাহাড়ে এক প্রকার জোনাকী দেখিয়াছি তাহারা পক্ষহীন। একজন আমেরিকান পরিব্রাজক

বলেন, দক্ষিণ আমেরিকায় এক প্রকার জোনাকি পোকা আছে তাহাদের দেহের উভয় দিকে আলোক দৃষ্ট হয়। তাহারা চলিলে রেলের ইঞ্জিনের মত দেখিতে হয়।

বলা বাহুল্য, ষটপদ সকল দেশে সকল সময় পাওয়া যায়। তবে উষ্ণ দেশেই তাহাদের বাহুল্য। ইহাদের মধ্যে আবার কতকগুলি জলচর কতক জাতীয় ষটপদ পরজীবী এবং তাহারা জীবজন্তুর শরীরে অবস্থান করিয়া থাকে। রুচিভেদে ইহারা নানা প্রকার পদার্থ ভোজন করিয়া থাকে। তাই সংস্কৃতে কবি বলিয়াছেন—

"মক্ষিকাঃ ব্রণমিচ্ছন্তি মধুমিচ্ছন্তি ভ্রমরাঃ।"

শ্রীকেশবচন্দ্র গুপ্ত।

কেন?

ফুল যদি নাহি ফোটে, তবে কেন আর
কুঞ্জবনে গুঞ্জরে ভ্রমর।
লোকান্তর হ'তে যদি নাহি ফিরে মৃত
হাহাকার কেন নিরন্তর।
শরতের মেঘ শুধু ফুকারি ফুকারি
নীলাকাশে খুঁজে চপলায়।

সে রোদন—হাহাকার শূন্যে শূন্যে ঘুরি
অবশেষে বাতাসে মিশায়।
পিক কেন কেঁদে মরে—মরণ সুন্দর!
বসন্ত কি ফিরে বরষায়!
এত অশ্রু—এত শোক বেঁচে আছে প্রেমে
কে বলিবে—কোন ভরসায়!

শ্রীনরেন্দ্রনাথ সেন।

অন্ধ।

(১)

আমরা পাড়াগাঁয়ের ছেলে। মাঠ ছাড়িয়া শ্রান্ত গরুর পাল যখন গ্রামের দিকে ফিরিয়া আসিত আমরা সে সময় নদীর কূলে সূর্য্যাস্ত দেখিতে যাইতাম। আমাদের গ্রামের নদী দক্ষিণ বাহিনী। তাহার পরপারে খুব ঘন ঘন আম গাছের বাগান। বাগানের এক একটা গাছ আমার প্রপিতামহের নিজ-হস্তে

রোপিত, সেগুলাতে তত আম ফলে না বটে কিন্তু গাছগুলা খুব লম্বা চওড়া। রোজ সন্ধ্যার সময় আমরা দল বাঁধিয়া নদীর ধারে বসিয়া দেখিতাম সোণার থালার মত সূর্য্যদেব সেই গাছ গুলার পিছনে ডুব দিতেন। সেই সময় কাদা-খোঁচার দল ঝাঁক বাঁধিয়া উত্তর দিকে চলিয়া যাইত, বকগুলা আম গাছে উঠিত, চকাচকী বালির উপর দিয়া কোথায় চলিয়া যাইত। এক একটা খঞ্জনি তখনও পুচ্ছ নাড়িয়া বেড়াইত বটে তবু বেশ নির্জ্জনতা আসিয়া পৃথিবীর উপর দখল লইবার চেষ্টা করিত।

সে দিন আমি একেলা ভ্রমণ করিতে গিয়াছিলাম। আমাদের বাটীতে পৌষ পার্ব্বণে যাত্রা হইবে বলিয়া কাছারীর মাঠে আটচালা বাঁধা হইতেছিল, খেলার সাথীরা সেইখানে ছিল। রামদীন দারবানের উপর ভার ছিল সে সর্ব্বদা আমার সঙ্গে থাকিবে কিন্তু সন্ধ্যার সময় সে পেস্তা বাদাম বাটিয়া সিদ্ধি তৈয়ারী করিত বলিয়া আমি তাহাকে ছুটি দিতাম। আমি নদীর ধারে বসিয়া-ছিলাম। সন্ধ্যার অন্ধকারে দারুণ শীতে একটা ভোঁদড় জলে ডুবিয়া মাছ ধরিতে-ছিল, আমার দৃষ্টি সেই দিকে ছিল। বহুদূরে একখানা বজরা আসিতেছিল। পিছনের বাগানে শুষ্ক পাতার শব্দ হইতেছিল আমি প্রথমে সে দিকে চাহি নাই। ক্রমে পাতার শব্দ বাড়িতে লাগিল। একটা অপরিচিত স্বর বলিল—এই যে।

আমি বিস্মিত হইয়া পিছনে চাহিলাম। কি ভীষণ চেহারা! কি যমদূতের মত আকৃতি। দুইটি লোক—যেন যমজ ভাই!

প্রথম লোকটা বলিল—ছ্যালাম খোকা বাবু। তোমার বাপের মেহের-বাণিতে যে দেশে বাস করা দায় হ'ল।

আমি বলবান হইলেও তখন পঞ্চদশ বর্ষীয় বালক মাত্র। ঠিক সন্ধ্যার প্রাক্কালে নির্জ্জন নদীতটে এ রকম লোকের মুখে ঐরূপ মধুর সম্ভাষণ শুনিয়া ভীত হই নাই, একথা বলিলে আপনার বল বিক্রম সম্বন্ধে অত্যুক্তি করা হয়। আমি দেশের জমিদারের ছেলে, সকলে আমাকে অভিবাদন করিত, তোষামোদ করিত। এরূপ রূঢ়স্বরে আমার প্রতি এরূপ দুর্ব্বিনীত বাক্য প্রয়োগ করিতে জীবনে এই প্রথম শুনিলাম। বলা বাহুল্য, আতঙ্কের সহিত গভীর ক্রোধ আসিয়া আমাকে উত্তেজিত করিল। আমি বলিলাম—"কে রে বদমায়েস?"

লোক দুইটা হাসিয়া আমাকে গালি দিল, আমার পিতাকে গালি দিল—জঘন্য অশ্রাব্য ভাষায় গালি দিল। আমি ধৈর্য্যচ্যুত হইয়া হতভাগ্যদ্বয়ের একজনকে পদাঘাত করিলাম। মত্ত মহিষের মত উত্তেজিত হইয়া লোকটা

আমাকে প্রহার করিবার জন্য হাত তুলিয়াছিল এই অবধি স্মরণ আছে। তাহার পর আমার কি দশা হইল বলিতে পারি না।

(২)

যখন জ্ঞান হইল শুনিলাম আমি নৌকায়। শুনিলাম বটে, কিছু দেখিতে পাইলাম না। দাঁড়ের শব্দ পাইলাম, জলের শব্দ পাইলাম, মাঝিদের গান শুনিতে পাইলাম, মাছরাঙ্গার গগনভেদী চীৎকারে স্বগ্রামের জন্য প্রাণ নাচিয়া উঠিল—কিন্তু কিছু দেখিতে পাইলাম না। চোখ বাঁধা, মাথার উপর কাপড় বাঁধা, মাথায় অসহ্য যন্ত্রণা। আমি শঙ্কিত প্রাণে জিজ্ঞাসা করিলাম—আমি কোথায়?

একজন বলিল—আপনি নৌকায়। একটা নদীর ধারে আপনি মূর্চ্ছিত হ'য়ে পড়েছিলেন, আমরা আপনাকে তুলে এনেছি।

প্রাণ কাঁদিয়া উঠিল। ভয়ে শিহরিয়া উঠিলাম, লোকটি বোধ হয় বুঝিল। বলিল—ব্যস্ত হ'বেন না, কোন ভয় নাই। আজ চার দিন পরে আপনার জ্ঞান হ'য়েছে।

চারি দিন এই ভাবে কাটাইয়াছি? কি ভীষণ সংবাদ! গ্রাম হইতে অনেক দূরে আসিয়াছি বুঝিলাম। আমি বলিলাম—আমায় বাড়ী পৌঁছে দেন নি কেন?

ভদ্রলোক আমার বাড়ী জানিতেন না। কল্যাণপুর গ্রাম তিনি চিনিতেন না। যে গ্রামে আমায় পাইয়াছিলেন, তিনি সে গ্রামের নাম জানিতেন না।

আমি কাতরকণ্ঠে বলিলাম—আমাকে আপনারা সেই গ্রামে পৌঁছে দিন। আপনাদের পায়ে পড়ি সেই গ্রামে পৌঁছে দিন। আমার বাবা জমিদার, আমি তাঁর এক ছেলে। অনেক বখশিস, অনেক টাকা—

ভদ্রলোক বলিলেন—আমরা টাকার প্রত্যাশী নই। আপনাকে—

আমি লজ্জিত হইলাম। বলিলাম—আমায় ক্ষমা করুন। আপনারা আমার প্রাণরক্ষা করেছেন, আমায় ক্ষমা করুন। আমি পাগল হ'য়ে গেছি।

ভদ্রলোক বলিলেন—না না আপনি স্থির হোন, আপনার মাথা নাড়বেন না।

আমি বলিলাম—আমার চোখটা খুলে দিন না কেন? বড় কষ্ট হ'চ্ছে।

অতি কাতরকণ্ঠে তিনি বলিলেন—হ্যাঁ চোখ খুলে দিব। তবে চোখে বড় চোট লেগেছে।

আমি ভীত হইয়া বলিলাম—সারবে তো?

তিনি বলিলেন—হ্যাঁ, আমাদের সঙ্গে ডাক্তার আছেন। সারতে পারে। তবে—

কি সর্ব্বনাশ! তবে! আমি বালকের মত চীৎকার করিয়া কাঁদিয়া উঠিলাম। তাঁহাকে বলিলাম—এখনি আমার পিতাকে সংবাদ দিন। যত টাকা লাগে তিনি খরচ করবেন। অন্ধ হ'য়ে বাঁচতে পারবো না। আপনার পায়ে পড়ি বাবাকে সংবাদ দিন।

তিনি সান্ত্বনা দিলেন। প্রাণ কিন্তু বুঝিল না। কি কঠোর বিধিলিপি!

(৩)

"ডাক্তার বাবু!"

"আজ্ঞে?"

"ডাক্তার বাবু, আমি ভাল হ'ব? আবার মা বাপের মুখ দেখতে পাব?"

ডাক্তার বাবু করুণকণ্ঠে বলিলেন—"অত উতলা হ'বেন না। দেখি না এই অষুধটায় কি ফল হয়।"

নিত্যই ডাক্তার বাবুকে ঐ প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতাম। প্রত্যহ তিনি করুণকণ্ঠে ঐরূপ উত্তর দিতেন। প্রায় এক পক্ষ গৃহছাড়া হইয়াছিলাম। যে বাটীতে তাঁহারা আমাকে রাখিয়াছিলেন তাহা কুটীর কি প্রাসাদ তাহা বুঝিবার ক্ষমতা ছিল না। যাঁহারা আমার প্রাণরক্ষা করিয়াছিলেন, সর্ব্বদা আমার শুশ্রূষা করিতেছিলেন, তাঁহারা দেবতা কি পশু, তাহা জানিবার উপায় ছিল না। পৃথিবীর মুখ দেখিয়া আর আনন্দলাভ করিবার আশা ছিল না। এ সব কথা স্মরণ করিয়া কেবল কাঁদিতাম—অন্ধ নিষ্প্রভ নয়নে দেখিবার শক্তি ছিল না, কেবল কাঁদিবার শক্তি ছিল। হা বিধাত! পিশাচদের হস্তে আমার মৃত্যু হইল না কেন?

ডাক্তার বাবু চলিয়া গেলেন। যে ব্যক্তি আমার মাথার শিয়রে বসিয়াছিলেন তাঁহার শ্বাস প্রশ্বাসের শব্দ পাইতেছিলাম। তিনি বড় বেশী কথা কহিতেন না। আমার প্রাণের ভিতরটা ফাটিয়া যাইবার উপক্রম হইতেছিল। আমি তাঁহাকে বলিলাম—মশায়, কিছু খবর পেলেন?

তিনি বলিলেন—না। আমরা লোক পাঠিয়েছি কিন্তু কোন খবর আসেনি।

আমি বলিলাম—এত দিনে খবর এলনা কেন?

তিনি বলিলেন—উজিয়ে যেতে হ'বে। তার পর আপনাকে সন্ধ্যার পর খুঁজে পেয়েছিলাম। সে গ্রামটা ঠাওর করতে না পারলে একটু মুস্কিল হ'বে।

কিছু বলিতে পারিলাম না। এ দুর্দ্দিনে ইঁহাদের অনুগ্রহ ব্যতীত বাঁচিবার উপায় ছিল না। আমার কিন্তু মনে হইত ইঁহারা আমার পিতাকে সংবাদ প্রেরণ করিতে একটু শৈথিল্য প্রকাশ করিতেছেন।

তিনি বলিলেন—আপনি কি লিখতে পারবেন?

আমি বলিলাম—আন্দাজে লিখতে পারব, তবে প্রত্যেক লাইনের প্রথমে কলমটা ঠিক্ করে বসিয়ে দিতে হবে।

তিনি বলিলেন—তা' হ'লে একটু চেষ্টা ক'রে দেখুন। বোধ হয় আপনার হাতের লেখা পেলে আপনার পিতা একটু ব্যস্ত হ'তে পারেন। আমরা আর একজন লোক পাঠাতে পারি।

আমি লিখিলাম। কথাগুলা এক রকম তিনি বলিয়া দিলেন। আমি লিখিলাম—

"বাবা—

আমি দস্যুর আক্রমণে অন্ধ হইয়া নদীর ধারে পড়িয়াছিলাম। ভদ্রলোকের আশ্রয়ে আছি। আপনি অনুগ্রহ করিয়া পত্রবাহকের সহিত আসিবেন। অধিক কি লিখিব।

অভাগা সন্তান

শ্রীজ্যোতির্ম্ময় বসু।"

পত্র লিখিলাম বটে, কিরূপ অক্ষর লিখিলাম তাহা কিছু বুঝিতে পারিলাম না। পত্র সম্পূর্ণ হইলে তিনি তুলিয়া লইয়া পড়িলেন। তাহার পর আমাকে সহি করিবার জন্য পত্রখানি দিয়া কলম ঠিক করিয়া দিলেন। আমি পত্রখানি স্বাক্ষর করিলাম। তিনি বলিলেন—বাঃ বেশ লেখা হ'য়েছে।

আমার হৃদয়ের অন্তস্থল হইতে দীর্ঘ নিশ্বাস বাহির হইল। কি পাপে ভগবান আমার চক্ষু-রত্ন কাড়িয়া লইলেন তাহা ভাবিয়া ঠিক করিতে পারিলাম না।

(৪)

আরও এক সপ্তাহ কাটিয়া গিয়াছে। ডাক্তার বাবু আমার চক্ষের ব্যাণ্ডেজ খুলিয়া দিয়াছেন। কিন্তু দৃষ্টিশক্তি ফিরিয়া পাই নাই। উপর নীচে সম্মুখে পশ্চাতে যে দিকে তাকাই অন্ধকার—ঘন সূচিভেদ্য অন্ধকার, ভীষণ অমাবস্যার অন্ধকার। উদ্যানের বিহঙ্গম কাকলী শুনিয়া বুঝিতে পারি প্রভাত হইয়াছে, দূরে মাঠের উপর বাছুরের ক্রন্দন শুনিয়া বুঝিতে পারি বেলা বাড়িতেছে,

আবার সন্ধ্যার মিশ্র কলরব শুনিয়া মনে হয় পাখীরা বাসায় যাইতেছে, দিনমণি গগন ছাড়িয়া অস্ত যাইতেছেন। সকল শব্দেই প্রাণ হুঃ হুঃ করে, সকল শব্দের সহিত অসংখ্য মধুর স্মৃতি আসিয়া উপস্থিত জীবনটাকে আরও অসহ্য করিয়া তুলে। শিবার কলরব যে এত মধুর, তাহার সহিত যে এত স্নেহ মমতা সুখ ঐশ্বর্য্যের স্মৃতি মিশ্রিত থাকিতে পারে, সে ভাব পূর্ব্বে কখনও প্রাণে স্থান পায় নাই। এখন শৃগালের কর্কশ শব্দেও প্রাণ নাচিয়া উঠিত, দীর্ঘশ্বাস পড়িত, চোক্ষে জল আসিত, ভাবিতাম যদি এই গাঢ় অন্ধকারের মাঝে সেগুলারও একবার ছায়া দেখিতে পাই তবুও জীবন ধন্য হইবে। জীবনে ভাল মন্দ, শুভ অশুভ, সুন্দর কুৎসিত কোন ছবি দেখিতে পাইব না, একি সামান্য দুর্ভাগ্যের কথা! দুইটা হাত ভাঙ্গিয়া গেল না কেন, খোঁড়া হইলাম না কেন? কি মহা-পাপে ভগবান চক্ষু দুইটি কাড়িয়া লইলেন?

আমার চক্ষের ব্যাণ্ডেজ খুলিয়া লওয়া হইয়াছিল, চোখে হাত দিয়া দেখিতাম চোখের তারা আছে, চোখের পাতা আছে, পাতা খুলিতে পারিতাম বুজিতে পারিতাম, কিন্তু কিছু দেখিতে পাইতাম না। ডাক্তার উঠিতে বারণ করিত, তবু সুবিধা পাইলে শয্যার উপর উঠিয়া বসিতাম। আবার মাঝে মাঝে দেওয়াল ধরিয়া একটু বেড়াইতাম। কিন্তু সর্ব্বদা আমার গৃহে সেই অপরিচিত ভদ্র-লোকটি থাকিতেন। তিনি দেখিতে পাইলেই আমায় আবার শয্যা আশ্রয় করিতে হইত।

দিন গণিতাম। পাখীর ডাকে ভোর হইত। বামঘোষের চীৎকারে সন্ধ্যা আসিত। সেই হিসাবে দিন গণিয়া দেখিলাম বাইশ দিন গৃহ ছাড়া হইয়াছি। এতদিনে কেন পিতার সন্ধান পাইলাম না তাহা ভাবিয়া বড় কাতর হইলাম। ভদ্রলোক আমার পিতার নামে প্রায় চারি পাঁচ খানি পত্র লিখাইয়া লইয়া-ছিলেন। আমার মাতুলের নামেও দুইখানা পত্র লিখিয়া লইয়াছিলেন।

অঙ্গহানি হইলে বোধ হয় মানুষের মন নীচ ভাবে পূর্ণ হয়। ইঁহারা নিজ ব্যয়ে আমার চিকিৎসা করাইতেছিলেন, মৃত্যুর কবল হইতে আমাকে তুলিয়া আনিয়া আশ্রয় দান করিয়াছিলেন, তবু কেমন একটা সন্দেহ আসিয়া কয়েকদিন ধরিয়া আমার কুৎসিত প্রাণটাকে আরও কুৎসিত করিয়া তুলিতেছিল। পরিচয় দিতে ইঁহারা অনিচ্ছা প্রকাশ করিতেন তাহাতে বাস্তবিক তাঁহাদের মহত্ত্ব প্রকাশ পাইত। সাত্ত্বিক দানের উহাই লক্ষণ। তবু কিন্তু আমার কেমন একটা সন্দেহ হইত। পত্রগুলা লিখাইয়া সহি করাইবার পূর্ব্বে তিনি একবার পড়িয়া

লইতেন। তাহাতে কিন্তু আমার নীচ মনে একটা সন্দেহ হইত। সহি করিবার সময় তাঁহারা কি কাগজ পরিবর্ত্তন করিয়া দিতেন? আবার যখন স্থির হইয়া ভাবিতাম তখন নিজের নীচতা বুঝিতে পারিতাম। মনকে তিরস্কার করিতাম।

আজ তিনি বলিলেন—দেখুন জ্যোতির্ম্ময় বাবু আপনার পিতার কাছ থেকে দু'জন লোক ফিরে এসেছে।

আমি আনন্দে উৎফুল্ল হইলাম। এতদিনে অন্ততঃ বোঝার মত জীবনটা লইয়া পিতামাতার ক্রোড়ে আশ্রয় লইতে পারিব। জ্যোতিহীন শক্তিহীন চক্ষু দুইটা লইয়া মাতার সম্মুখে দাঁড়াইতে পারিব। আমি বলিলাম—বাবা কি বলেছেন? তিনি কি এসেছেন?

তিনি বলিলেন—আপনাকে অন্বেষণ করবার জন্য আপনার পিতা স্বয়ং দেশ বিদেশে ঘুরছেন। আপনাদের নায়েব লোকজন নিয়ে আসছেন। কালই এসে পৌছিবেন।

আমি বলিলাম—আপনাদের দেনা আমি শোধ করতে পারব না।

তিনি বলিলেন—ও কথা মনে করবেন না। আমি বলিলাম—সে কি কথা! আমার জন্যে আপনারা কত কষ্ট করলেন, কত খরচ করলেন।

তিনি বলিলেন—মানুষ যদি মানুষের সামান্য কাজে না লাগল ত জীবনের কোন উদ্দেশ্য নাই।

কি মহানুভবতা! নিজের উপর বিরক্ত হইলাম। বড় আত্মগ্লানি হইল। এমন লোকের উপর সন্দেহ করিয়াছিলাম। ছিঃ! ছিঃ!

(৫)

তিন বার শৃগাল ডাকিয়াছিল। নিশ্চয় রাত্রি দ্বিপ্রহর অতীত হইয়াছিল। তখনও তন্দ্রা আসে নাই। ভীষণ মানসিক উত্তেজনায় সময়ে সময়ে শয্যায় উঠিয়া বসিতেছিলাম। আমার অন্ধ মুখ দেখিলে মাতা কিরূপ আর্ত্তনাদ করিয়া কাঁদিয়া উঠিবেন তাহা কল্পনা করিতেছিলাম। মাতার সে মূর্ত্তি দেখিতে পাইব না বটে কিন্তু সে কাতর ক্রন্দন শিরায় শিরায়, মর্ম্মে মর্ম্মে পশিয়া আমাকে ব্যথিত করিবে। এই চিন্তাতে এক একবার কাঁদিতেছিলাম। আর সেই সব পুরাতন চিন্তা—মানুষের হাসি দেখিতে পাইব না, ফুলের উপর প্রজাপতি দেখিতে পাইব না, চন্দ্র মল্লিকার শুভ্র জ্যোতিঃ দেখিতে পাইব না, কাক, চিল, শৃগাল, কুক্কুর, শকুনি, গৃধিনী এ জীবনে কাহারও মুখদর্শন করিব না। আবার আশা হইত। ডাক্তার বলিয়াছিল, সুচিকিৎসায় কিছুদিন পরে দৃষ্টিশক্তি ফিরিয়া

আসিতে পারে। কে বলিতে পারে ডাক্তারের কথা সফল হইবে না। আরও কত কি ভাবিতেছিলাম। পিতার সহিত পরামর্শ করিয়া আমার মহানুভব আশ্রয়দাতার প্রত্যুপকার করিব।

তিনি নিদ্রা যাইতেছিলেন। ঠিক তালে তালে শ্বাস প্রশ্বাস পড়িতেছিল। শয্যা কণ্টক শরীরে বিঁধিতেছিল। ধীরে ধীরে উঠিলাম। সেই গৃহের সহিত আর রাত্রিতে শেষ সম্বন্ধ। প্রাচীর ধরিয়া একটু অগ্রসর হইলাম। পায়ে কি ঠেকিল। তুলিয়া লইলাম—দিয়াশলাই।

অন্ধের কিবা রাত্রি কিবা দিন। কিবা সূর্য্য কিবা দিয়াশলাই। তবু সাধ হয়, কুব্জের চিৎ হইয়া শুইতে ইচ্ছা হয়, পঙ্গুর গিরি-লঙ্ঘন করিতে সাধ হয়। অন্ধের একবার দিয়াশলাই জ্বালিতে ইচ্ছা হয়। জ্বালিলাম—দিয়াশলাই জ্বালিলাম—আলো হইল!

আলো জ্বলিল! গভীর অন্ধকারের ভিতর আলো জ্বলিল—অন্ধের চক্ষে আলোক পশিল! গৃহের চারিদিক উদ্ভাসিত হইল—শয্যা দেখিলাম—গৃহ দেখিলাম। রুদ্ধ গৃহদ্বার দেখিলাম, আর শয্যায় শায়িত আশ্রয়দাতাকে দেখিলাম। নারকীর মুখ—ভীষণ দেহ। সর্ব্বনাশ! আমাদের গ্রামের জালিয়াৎ সর্ব্বনেশে লোক। অনেকের সর্ব্বনাশ করিয়াছিল বলিয়া ইহার খ্যাতি আছে। তাহা হউক, আমি কিন্তু অন্ধ নহি ইহাই যথেষ্ট।

মাথা ঘুরিতে লাগিল। ভূমিতে বসিলাম। নিজের চুল ধরিয়া টানিলাম—বেদনা বোধ হইল। কাণ ধরিয়া টানিলাম—কষ্ট হইল। নিজের দেহে চিমটি কাটিলাম—আঘাত লাগিল। উহুঁ স্বপ্ন নয়। বাহিরে আবার শৃগাল ডাকিল। আশ্রয়দাতার নাসিকা-গর্জ্জনের শব্দ শুনিতে পাইলাম, স্বপ্ন নহে। তবে তো ইহারা আমাকে অন্ধকার গৃহে বন্দী করিয়া রাখিয়াছিল। কি একটা শঠতা করিবার উদ্দেশে এতটা অভিনয় করিতেছিল। ভগবান জানেন কাগজে কি স্বাক্ষর করিয়া লইয়াছিল। শত কাগজে স্বাক্ষর করিয়া লইলেও আজ আমি অন্ধ নহি! অন্ধ নহি! অন্ধ নহি!

ধীরে ধীরে দ্বারদেশে গেলাম। দ্বার খুলিলাম তবু অন্ধকার। একটা অন্ধকার ঘরের ভিতর দিয়া প্রাচীর ধরিয়া চলিলাম। আবার একটা দ্বার পাইলাম। দ্বার খুলিলাম। ছোট বারান্দা! জ্যোৎস্নার একটা ক্ষীণ রশ্মি আসিতেছিল। জ্যোৎস্নার রশ্মি! আলোকের রশ্মি! চির অন্ধকারের অবসান! গৃহের দ্বার রুদ্ধ করিলাম। তস্করকে ধরিবার জন্য নহে, নিজে নিরাপদ হইবার জন্য।

তাহার পর সোপান বহিয়া উপরে উঠিলাম, ক্রমশঃ আলোক আসিতেছিল, উপরে উঠিলাম। সর্ব্বনাশ ! আমাদের গ্রামের বাহিরে মুসলমান রাজকর্ম্মচারীদিগের পরিত্যক্ত ভগ্ন অট্টালিকায় বন্দী ছিলাম। সেটা সাপের বাসভূমি !

মাঠের উপর জ্যোৎস্নালোক পড়িয়াছিল, ভাঙ্গা অট্টালিকার উপর জ্যোৎস্নালোক খেলা করিতেছিল। অত উজ্জ্বল আলোকে অন্ধের চক্ষে ধাঁধাঁ লাগিতেছিল। আবার পৃথিবীর মুখ দেখিলাম। কি আনন্দ! কি সৌন্দর্য্য! ছুটিলাম ! ঊর্দ্ধশ্বাসে ছুটিলাম।

* * * * *

আলিয়াৎ মধু সেই কয়েকখানা চিঠির দ্বারা পিতার নিকট হইতে ছয় সহস্র মুদ্রা লইয়াছিল। পত্রগুলায় কেবল আমার স্বাক্ষর ছিল। প্রত্যেক খানা বদল করিয়া দিয়াছিল। প্রথম পত্রে লিখিত ছিল—"দস্যুহস্তে পড়িয়াছি—দুই হাজার টাকা আমগাছের তলায় রাখিলে ছাড়িয়া দিবে। ইহাদের ধরিবার চেষ্টা করিলে আমার গলায় ছুরি বসাইয়া দিবে।" দ্বিতীয় পত্রে ঐ প্রকারে আবার দুই হাজার টাকা লইয়াছিল। মামার নিকট হইতেও এক সহস্র টাকা লইয়াছিল। তৃতীয় পত্রে পিতা এক সহস্র টাকা দিয়াছিলেন। ভয়ে পুলিসে সংবাদ দিতে পারেন নাই। দুষ্ট লোক পাছে তাঁহার একমাত্র পুত্রকে নিহত করে।

দায়রার বিচারে মধুর সাত বৎসর সশ্রম কারাদণ্ড হইয়াছিল। দলের অপর লোক ধৃত হয় নাই।

শ্রীকেশবচন্দ্র গুপ্ত।

আশা।

ঝঞ্ঝা-ঝটিকার পাছে
মধু মন্দ বায়ু নাচে,
বিরহের পাশে আছে মধুর মিলন।
শীত-কুয়াসার কাছে
বসন্ত যে চেয়ে আছে ;
মরণের পাছে জাগে অনন্ত জীবন।

শ্রীনরেন্দ্রনাথ সেন।

সাহিত্য-সমাচার।

ইলিয়াডের গল্প।—শ্রীনবকৃষ্ণ ঘোষ বি, এ প্রণীত। মূল্য আট আনা।

মহাকবি হোমারের "ইলিয়াড" কাব্যের ইংরাজি অনুবাদ ও গল্পবিষয়ক বিবিধ গ্রন্থ-অবলম্বনে লেখক বঙ্গভাষায় এই গ্রন্থখানি অনুবাদ করিয়াছেন এবং গ্রন্থের ভূমিকায় তিনি 'কবি ও তাঁহার কাব্যের কথা'য় "ইলিয়াড ও অডিসি" নামক দুইখানি প্রাচীন মহাকাব্য ও তৎসহ মহাকবি হোমারের পরিচয় প্রদান করিয়াছেন।

সাধারণতঃ আমরা দেখিতে পাই যে, বিদেশীয় ভাষার গ্রন্থাদি অবলম্বনে লিখিলে ভাষা মনোরম হয় না—বলা বাহুল্য, লেখক সেই সনাতন রীতি ব্যতিক্রম করিয়া কৃতিত্বের পরিচয় দিয়াছেন। মৌলিক রচনার ন্যায় গ্রন্থের ভাষা প্রাঞ্জল ও হৃদয়গ্রাহী কিন্তু গ্রন্থান্তর্গত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কবিতা বা প্রবচনগুলির অনুবাদ ভাল হয় নাই। লেখক আর একটু যত্ন করিলে সে দোষগুলিও হয়ত থাকিত না। মোটের উপর গ্রন্থখানি উপাদেয় হইয়াছে। ইহা শিক্ষাপ্রদ এবং উপন্যাসের মত পাঠেচ্ছাবর্দ্ধক। উপরন্তু বিলাতী চারজন চিত্রকরের চিত্রিত চারখানি চিত্রের হাফ্‌টোন ছবি প্রকাশিত হওয়ায় গ্রন্থের সৌষ্ঠব অধিকতর বৃদ্ধি পাইয়াছে। ইহা "পুরস্কার-গ্রন্থ" রূপে নির্দ্দিষ্ট হইলে আমরা অত্যন্ত সুখী হইব। ইহার বহুল প্রচার বাঞ্ছনীয়।

তৃষা।—ইহা একখানি 'অপিন্যাসিকা' *। মূল্য।৹—শ্রীযুক্ত কুলদাচরণ সরকার প্রণীত। ইহাও আধুনিক গ্রন্থাদির 'ভূমিকা-ব্যাধি' হইতে অব্যাহতি লাভ করিতে পারে নাই। ভূমিকা-লেখক—শ্রীমান্ সুধাকৃষ্ণ বাগচি। যেমন টক্ ঘোল তেমনি ছেঁদা মালা। ভূমিকা-লেখক বলিতেছেন 'তৃষা যে পাপের প্রতি ঘৃণা জন্মাইয়া দেয় ও পাপের পরিণাম কি ভীষণ তাহা দেখাইয়া ও বুঝাইয়া দেয় সে কথা নিঃসঙ্কোচে বলা যাইতে পারে।' আমরাও নিঃসঙ্কোচে বলিতে পারি, ভূমিকা-লেখক পুস্তিকাখানি পাঠ করেন নাই অথবা পাঠ করিলেও বুঝিতে পারেন নাই। লেখক নবীন, তাঁহার লিখিবার ও গ্রন্থকার সাজিবার সাধ আছে। আমরা তাঁহার জন্য দুঃখিত। তাঁহার শক্তি সামান্য, সখ যথেষ্ট। অধ্যবসায় থাকিলে ও সাধনা করিলে তিনি ক্রমশঃ উন্নতিলাভ করিতে পারিবেন না একথা বলিলে সত্যের অপলাপ করা হয়।

নিত্যজ্যোতিঃ।—(কবিতা পুস্তক)—শ্রীদেবেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়-প্রণীত। এই গ্রন্থে সন্নিবিষ্ট কবিতাগুলি সাধারণ শ্রেণীর মত অর্থাৎ কেবলমাত্র শ্রুতিমধুর, অর্থহীন ও ন্যাকামিপূর্ণ নহে। পরন্তু জ্ঞান ও শিক্ষালাভ করিতে এই গ্রন্থখানি হিন্দু পাঠককে সহায়তা করিবে বলিয়া আমাদের বিশ্বাস। কবি কেবল ভাবুক নহেন সাধক। আমরা এই গ্রন্থের বহুল প্রচারে আনন্দলাভ করিব।

---

* যেমন 'নাটক' হইতে 'নাটিকা' তেমনি 'উপন্যাস' হইতে 'অপিন্যাসিকা'।

ছোট গল্প।

(শেষাংশ)

'ছোট গল্প' বলিলে যাহা বুঝায়, ২৩।২৪ বৎসর পূর্ব্বে আমাদের সাহিত্যে তাহা ছিল না। 'গল্প' নামে তখন যাহা চলিত, তাহা 'গল্প' নামের যোগ্য হইতে পারে; কিন্তু সেগুলিকে কিছুতেই 'ছোট গল্প' বলা যায় না। আকারে যে সে গল্পগুলি ছোট হইত না, তাহা নহে। তখনকার ৺দামোদর মুখোপাধ্যায়, ৺তারকনাথ বিশ্বাস প্রভৃতি অনেক লেখকেই যে সকল গল্প লিখিতেন, তাহার অধিকাংশই আকারে ছোট;—কিন্তু প্রকারে সে গুলি 'ছোট গল্প' হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র হইত। তাঁহারা কেবল ঘটনা লিখিতেন। "তারপর এই হইল, তারপর এই হইল,"—এই তাঁহাদের বুলি ছিল। ঘটনা যেমনই হউক; হৃদয়ের সঙ্গে যে তাহা শতসূত্রে আবদ্ধ, সে সম্বন্ধটা তাঁহারা বাদ দিয়া কেবলমাত্র ঘটনা-বর্ণন করিয়া যাইতেন। কিন্তু 'ছোট গল্পে' হৃদয় জিনিষটাই সর্ব্বস্ব; মানব-মনোবৃত্তি লইয়াই তাহার কারবার। ঘটনা অতি তুচ্ছ হউক, তাহাতে কোনও ক্ষতি নাই; কিন্তু সেই তুচ্ছ ঘটনাকে আশ্রয় করিয়াই গল্পে একটি হউক, দুইটি হউক, যে কয়টি লোক থাকে, তাহাদের ফুটাইয়া তুলিতে হয়। নহিলে রস নষ্ট হইয়া যায়—'ছোট গল্প' সার্থকতা লাভ করে না। ইংরাজী ছোট গল্পই বল, আর ফরাসী ছোট গল্পই বল, উভয় প্রকার গল্পেই ঐ বিশেষত্বটুকু পরিস্ফুট। তবে এতদুভয়ে যে কোনও কিছু প্রভেদ নাই, এমন বলি না। ইংরাজি ছোট গল্প কিছু ঘটনা-প্রধান। ফরাসী ছোট গল্প কিছু চরিত্র-প্রধান। অর্থাৎ অল্প পরিসরের মধ্যে মানুষের চরিত্র-বিশেষকে ফুটাইয়া তুলাই উভয়ের লক্ষ্য হইলেও ইংরাজী গল্প পড়িবার সময় মনে হয় যে, ঘটনার ঘাত-প্রতিঘাতেই যেন চরিত্র ফুটিয়া উঠিয়াছে। আর ফরাসী গল্প পড়িবার সময় মনে হয় যে, হৃদয়ের ঘাত-প্রতিঘাতেই যেন ঘটনা ঘটিয়াছে,—ঘটনাটা সেখানে যেন কিছু-না। সেইজন্য ফরাসী সাহিত্যে দেখা যায় যে, কোনও বাজে বৃত্তান্ত, বা কোনও এক লোকের দৈনন্দিন জীবন-কাহিনী প্রভৃতি বিষয় লইয়াও ছোট গল্প রচিত হইয়া থাকে। যাঁহারা রসিক, যাঁহারা সাহিত্য-শিল্প

বুঝেন, তাঁহারা উহা পাঠ করিতে ভালবাসেন—চিত্রিত চরিত্রের বিশ্লেষণ দেখিয়া আনন্দ উপভোগ করেন। কিন্তু যাঁহারা কেবল উপন্যাসের ঘটনা পড়িবার জন্যই উপন্যাস গ্রন্থের পাতা উল্টাইয়া যান, তাঁহারা ছোট গল্পের সৌন্দর্য্য ধরিতে পারেন না—মাধুর্য্য বুঝিতে পারেন না। অসম্পূর্ণ-বোধে তাঁহারা গল্প-পাঠ হইতে বিরত থাকেন।

উপন্যাসের ন্যায় ছোট গল্পও বিদেশ হইতে বঙ্গদেশে আসিয়াছিল। ইহার আমদানী করিয়াছিল—সুরেশচন্দ্রের 'সাহিত্য'। 'সাহিত্য' পত্রই এদেশের ছোট গল্পের প্রথম পথ-প্রদর্শক। প্রায় ২৪ বৎসর পূর্ব্বে,দ্বিতীয় বর্ষের 'সাহিত্যে' শ্রীমতী প্রজ্ঞাসুন্দরী দেবীর "ভিখারিণী" নামে যে একটি গল্প প্রকাশিত হয়, সেইটিই মনে হইতেছে, বাঙ্গালা ছোট গল্পের আদি। সাহিত্য-শিল্প-হিসাবে যে ইহাতে ক্রটি নাই, এমন নহে। ক্রটি বিলক্ষণই আছে। তবে উহার নানা ক্রটি ও অভাবাদি সত্বেও উহাতে 'ছোট গল্পে'র বিশেষত্ব কিঞ্চিৎ আছে বলিয়াই উহাকে ছোট গল্পের আদি বলিতেছি। তার পরেই দুই একটি ফরাসী গল্পের অনুবাদও ঐ 'সাহিত্য' পত্রেই প্রকাশিত হইয়াছিল। এই গল্প কয়টিই আধুনিক সাহিত্য-শিল্প-সমন্বিত গল্প-সমূহের এক প্রকার অঙ্কুর বলিলেও চলে।

অনুবাদ-অনুকরণের পর মৌলিকতার যুগ। উপরি-উক্ত গল্প কয়টি প্রকাশের অতি অল্পকাল পরেই তিনজন শক্তিশালী লেখক মৌলিক গল্পের নমুনা লইয়া বাঙ্গালার সাহিত্যের হাটে উপস্থিত হইলেন। ইঁহাদের আগমনে বাঙ্গালার গল্প-সাহিত্যের 'নদীতে' উন্নতির কোটালে মহা-বিক্রমের সহিত বান ডাকিয়া উঠিল। রবীন্দ্রনাথের "কাবুলীওয়ালা", সুরেশচন্দ্রের "প্রাইভেট টিউটার' ও নগেন্দ্রনাথের 'ক্লাবের কাহিনী' প্রভৃতি অপূর্ব্ব গল্পগুলি বঙ্গসাহিত্য-ভাণ্ডারের একটা দিক দীপ্ত করিয়া তুলিল। এই তিনজনের পর হইতেই বাঙ্গালী পাঠকদের 'ছোটগল্প' পড়িবার ঝোঁক হইল, এবং বাঙ্গালী লেখকদের ছোটগল্প লিখিবার সখ হইল। ফলে অচিরেই আমরা ৺শৈলেশচন্দ্র, সুরেন্দ্রনাথ, প্রভাতকুমার, সুধীন্দ্রনাথ ও জলধর প্রভৃতি উৎকৃষ্ট গল্প-লেখকগণের সাক্ষাৎকার-সৌভাগ্য লাভ করিলাম।

এখানে রবীন্দ্রনাথ রাজা। বড় কিছু গড়িতে গেলেই তিনি মাটি করিয়া ফেলেন বটে, কিন্তু ছোট জিনিষে তাঁহার হাত যেমন খুলে, এমন আর কিছুতে নয়। উপন্যাস বা নাটক-রচনায় তিনি তেমন কৃতকার্য্যতা লাভ করিতে পারেন নাই। মহাকাব্যও কখনও তিনি লেখেন নাই; কিন্তু

তাঁহার ছোট গল্পের, তাঁহার ছোট কবিতার, তাঁহার গাথার, তুলনা নাই। সাহিত্য-শিল্পের বিচার হিসাবে উক্ত কয়জনের গল্পই চমৎকার বটে, কিন্তু রবীন্দ্রনাথের গল্পে মানব-চিত্তার যেরূপ পুঙ্খানুপুঙ্খ ব্যবচ্ছেদ থাকে, তেমন ব্যবচ্ছেদ-বিশ্লেষণ আর কাহারও লেখার দেখা যায় না। তারপর সুরেন্দ্রনাথ মজুমদার ও প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের গল্পও বঙ্গসাহিত্যের গৌরবের সামগ্রী। সুরেন্দ্রনাথের গল্পের পাঠক-সংখ্যা কিছু কম বটে; কিন্তু তা' বলিয়া যে তাঁহার গল্পের গুণ কম, তাহা নহে। বেশ সমজদার, বেশ রসজ্ঞ পাঠক না হইলে তাঁহার গল্পের রসাস্বাদ করিতে পারে না। তাঁহার 'রচনা ভঙ্গী অনন্যসাধারণ—অনুকরণের অতীত। তাঁহার গল্পে এই উদ্ধতে মধুরে, গাম্ভীর্য্যে ও তারল্যে, তথ্যে ও রঙ্গে, তত্ত্বে ও ব্যঙ্গে অপূর্ব্ব সম্মিলন, এই আধ হরি আধ হর ভাব,—এই সাহিত্য বিলাসী ও দার্শনিক সন্ন্যাসীর আকস্মিক ভূমিকা-বিনিময় বঙ্গসাহিত্যে অতুলনীয়।' আর প্রভাতকুমারের যশোভাগ্য তাঁহার চেয়ে ভাল। পাঠকসংখ্যার হিসাবে রবীন্দ্রনাথের পরেই বোধ হয় এক্ষেত্রে তাঁহারই আসন। তাঁহার প্রায় প্রত্যেক গল্পেই "পরিহাস-প্রিয়ের কেমন একটু তীব্র অথচ মিষ্ট হাস্য আছে, দেখিতে পাই।' এ জিনিষ যে আর কাহারও গল্পে নাই, এমন বলি না। শৈলেশচন্দ্রের গল্পেও উহা আছে, তবে মাত্রায় কিছু কম। শৈলেশের গল্পে যাহার উন্মেষ হইয়াছিল, প্রভাতের গল্পে তাহাই বিকাশ লাভ করিয়াছে। যাহা হউক, এই সকল গল্প-লেখকগণের গল্প একটু মন দিয়া পড়িলে ছোটগল্পের প্রায় সকলরূপ গতি, সকলরূপ পন্থা অনেকটা ধরা যায়। ছোট গল্পের art জিনিষটা কি, তাহাও অনেকটা হৃদয়ঙ্গম হয়।

ছোট গল্পে রচনা-কৌশলই সাহিত্য-শিল্পের (art এর) সর্ব্বপ্রধান অঙ্গ। অল্প পরিসরের মধ্যে চরিত্র-বিশেষকে ফুটাইয়া তুলাই ছোট গল্পের প্রাণ বটে, কিন্তু সেই প্রাণ জিনিষটার উৎপত্তি রচনা-কৌশলের উপরেই নির্ভর করে। রচনা-কৌশল মানে যে কথার বাহার, শব্দের ঝঙ্কার,—তাহা কেহ মনে করিবেন না। ছোটগল্প লেখায় এমন কতকগুলি কায়দা-কারচুপি আছে, যাহার সমাবেশকেই রচনা-কৌশল বলে। এই রচনা-কৌশলের প্রধান সূত্র এই যে, গল্পের রচনা-পদ্ধতি সংক্ষিপ্ত হইবে। সংক্ষেপে ভাব প্রকাশ করা সাহিত্য-শিল্পীর একটা বিশেষ গুণ। এ গুণ গল্প-লেখকের থাকা চাই-ই। নহিলে গল্প-রচনার চেষ্টা ব্যর্থ হইয়া যাইবে। রচনা-কৌশলের দ্বিতীয় কথা,—কথোপকথন-

ব্যবহার। ছোট গল্পে যেখানে কথোপকথন ব্যবহার করা হয়, সেখানে প্রত্যেক কথার উপযোগিতা আছে কিনা,দেখিতে হইবে। উপন্যাসে দুইটা বাজে কথা চলে, কিন্তু ছোটগল্পে তাহা সৌন্দর্য্য হানি করে। পাঠক-সাধারণের চোখে হয়ত সে ত্রুটি ধরা পড়িতে না পারে, কিন্তু সমজদারের চক্ষু হইতে তাহার পরিত্রাণ নাই। আসল কথা, ছোট গল্পে কথোপকথনের প্রত্যেক কথাটি ওজন করিয়া ব্যবহার করা কর্ত্তব্য। তৃতীয় কথা—স্বভাব-বর্ণনা। ছোটগল্পে বিস্তৃত স্বভাব বর্ণনা অত্যন্ত বিরক্তিকর। অন্তঃপ্রকৃতিকে ফুটাইবার জন্য যেটুকু বাহ্যপ্রকৃতির কথা বলা আবশ্যক, সেইটুকুই বলা উচিত, নহিলে গল্পের সৌন্দর্য্য নষ্ট হইয়া যায়। প্রকৃত শিল্পীর রচনা-কৌশলে যাঁহারা অনভিজ্ঞ, তাঁহাদের গল্পে প্রায়ই স্বভাব-বর্ণনার বাহুল্য দেখা যায়।

এইত গেল মোটামুটি রচনা-কৌশলের কথা। এইবারে ছোটগল্পের রচনা-প্রণালীর কথা বলা যাউক। ছোটগল্পে রচনা-প্রণালী নানা রকম আছে। প্রথম প্রণালী এই যে, লেখক বর্ণিত বিষয়াভিজ্ঞ তৃতীয় ব্যক্তির ন্যায় গল্প বিবৃত করিয়া যান; যেন একজন রিপোর্টার। এই প্রণালীতেই আজ কাল অধিকাংশ গল্পই লিখিত হইয়া থাকে। আর একপ্রকার রচনা প্রণালী আছে, তাহাতে লেখক নিজেই গল্পের একটি চরিত্র হইয়া গল্প বলিয়া যান। জলধর বাবুর অধিকাংশ গল্পই এই ভঙ্গীতে লেখা। ইহা ছাড়া, পত্রের দ্বারাও 'ছোট গল্প' লিখিত হইয়া থাকে। অর্থাৎ,'গল্পের বিষয়ীভূত চরিত্রসকলের লিখিত পত্রে গল্পাংশ বিবৃত হইয়া থাকে। সুরেশচন্দ্রের 'প্রাইভেট টিউটার' নামক গল্পই এইরূপ প্রণালীর সর্ব্বপ্রথম ও সর্ব্বপ্রধান গল্প। এ গল্পের কিছু দিন পূর্ব্বে ৺দামোদর মুখোপাধ্যায়ের "প্রবাহ" কাগজে "জয়চাঁদের চিঠি" নামে পত্রে রচিত একটি গল্প প্রকাশিত হইয়াছিল বটে, কিন্তু সেটি 'ছোট গল্প' নহে। ছোট গল্পের বিশেষত্ব তাহাতে কিছু ছিল না।

ইহা ছাড়া, ডায়েরী হইতে উদ্ধৃতাংশের আকারেও ছোট গল্প লিখিত হইয়া থাকে। সুধীন্দ্রনাথের রচনায় এ শ্রেণীর গল্প আছে। 'এ প্রণালীর গল্প লেখায় লেখকের যেমন একটু ক্ষমতা থাকা দরকার, পাঠকেরও তেমনি একটু ক্ষমতা থাকা আবশ্যক। যে পাঠক একবার মাত্র চোখ বুলাইয়া পাঠ শেষ হইল মনে করেন,—তাঁহার পক্ষে 'ডায়েরীর আকারে লিখিত ছোট গল্প প্রীতিপদ হইবে না।'*

* সাহিত্য ;—১৩০৫।

ইহা ছাড়া, নাটকের মত কথোপকথন-আকারেও ছোট গল্প রচিত হইতে পারে। এ প্রণালীর লেখা খুব কমই দেখা যায়। রবীন্দ্রনাথের 'বশীকরণকে' কতকটা এই শ্রেণীর গল্প বলা যায়।

এখন কথা হইতেছে 'ছোট গল্প' নাম দিয়া আমরা যে সকল জিনিষ মাসিকের মারফতে সচরাচর চালাইয়া থাকি, তাহার অধিকাংশ 'ছোট গল্প' নহে। সেগুলিতে প্রায়ই মৌলিকতার ও আন্তরিকতার অভাব দেখা যায়। সে সকল গল্প পড়িবার সময় সুরেশচন্দ্রের এই কথাই কেবল মনে হয় যে,—"এই বিপুল বিশ্বে নর-নারীর গহন চিত্ত-বনে কত ফুল ফুটিতেছে, ঝরিতেছে; কিন্তু শিক্ষানবীশ বাঙ্গালী কবি বন-প্রান্তে সঙ্কীর্ণ প্রেমের কাট গোলাপ দেখিয়াই মুগ্ধ হন, এবং আর অগ্রসর না হইয়া তাহাই চয়ন করেন। জীবনের প্রকৃত সুখ দুঃখ গভীর গহনে ফুটিয়া ঝরিয়া যায়; বাঙ্গালা দেশের সাহিত্য-মালঞ্চের মালীরা সে সব ফুলের কোনও সন্ধান রাখেন না। এইজন্য এখনকার সাধারণ গল্পে আন্তরিকতা ও সমবেদনার এত অভাব। কৃত্রিম মোমের ফুলে মানসী দেবতার পূজা হয় না। লালসাই মানব-চিত্তের একমাত্র বৃত্তি নহে। নর-নারীর যৌন সম্বন্ধই বিপুল বিশ্বের একমাত্র চিত্র নহে। কিন্তু বাঙ্গালা সাহিত্যে উপন্যাস ও গল্পের ক্ষুদ্র ক্ষেত্রে চাষা লেখকগণ কেবল স্থূল লালসারই চাষ করিতেছেন, এবং 'প্রেম' নাম দিয়া তাহাই ভাবের হাটে বিক্রয় করিতেছেন। সমাজের কোনও উচ্ছ্বাস তাঁহাদিগকে স্পর্শ করিতে পারে না। দুর্ভিক্ষ, দারিদ্র্য, স্বদেশী, বয়কট, প্রভৃতি সামাজিক বিষম বিপ্লব ও দেশব্যাপী উচ্ছ্বাসে তাঁহারা গল্পের বস্তু দেখিতে পান না! তথাকথিত প্রেমের প্রেত ও লালসার প্রেতিনীই বাঙ্গালা গল্পের নায়ক-নায়িকা। গল্পের,—সাহিত্যের পরিধি এত ক্ষুদ্র নহে; মানব-জীবনের প্রসার এত সঙ্কীর্ণ নহে। যাঁহারা সাহিত্যে মানব-জীবনের সুখ দুঃখ লইয়া কারবার করিতে চান, তাঁহারা ক্ষুদ্রতার চশমা খুলিয়া বিরাট মানব-জগতের বিপুল বিচিত্র সুখ দুঃখের সহিত পরিচিত হউন। ক্ষুদ্রতার চর্ব্বিত চর্ব্বণ বিশাল মানব-সাহিত্যের উপাদান নহে।" এ কথা কি এখনকার গল্প-লেখকগণের মর্ম্ম স্পর্শ করিবে? নবীন দলের মধ্যে দুই তিনজন ছাড়া প্রকৃত গল্প-লেখক ত আমরা দেখিতে পাই না।

শ্রীঅমরেন্দ্রনাথ রায়।

মহারাষ্ট্রদেশে বিধবা-বিবাহোৎসব।

মহারাষ্ট্র দেশে দুই প্রকার বিবাহ-পদ্ধতি চলিত আছে। প্রথম 'সাহজান্' অর্থাৎ 'রাজযোটক'—দ্বিতীয় 'চক্রজান' বা 'নাত্রা'। কুমারের সহিত কুমারীর মিলন ও বিপত্নীকের সহিত কুমারীর বিবাহকে "সাজান" বলে। আর বিধবা রমণীর সহিত অবিবাহিত বা বিপত্নীকের বিবাহকে "চক্রজান" বলে। বলা বাহুল্য, বিধবা-বিবাহ উহাদের মধ্যে শাস্ত্রানুমোদিত। তবে ব্রাহ্মণ ও বৈশ্যদের মধ্যে উহা প্রচলিত নাই—ক্ষত্রিয় প্রভৃতি অন্যান্য জাতি বিধবা বিবাহের কতকটা পক্ষপাতী। তাহার স্বীয় মতের পোষকতার জন্য মহাভারতের নাগরাজ কন্যা বিধবা উলুপীর সহিত অর্জ্জুনের বিবাহ—নল রাজাকে হারাইয়া ব্রাহ্মণগণের অনুমতিগ্রহণ ও দময়ন্তীর দ্বিতীয় বিবাহের প্রস্তাব এবং পদ্ম-পুরাণে, বহুবার বিধবা হইয়াও কাশীরাজকন্যার পুনঃ পুনঃ বিবাহ এই সকল পুরালোক প্রমাণ প্রদর্শন করে।

মহারাষ্ট্রীয় রমণী স্বামীর মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে হস্তের বলয় কঙ্কণ প্রভৃতি খুলিয়া ফেলে। আর গুর্জ্জর দেশীয় হিন্দুরমণী (ইহাদের মধ্যে বিধবা বিবাহ নাই) মৃতের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার পর দশম দিবসে মস্তক মুণ্ডিত করে। দাক্ষিণাত্যের হিন্দু স্ত্রী অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার সঙ্গে সঙ্গে মস্তক মুণ্ডিত করে। তবে ব্যবস্থান্তরও আছে—যদি বিধবা অল্পবয়স্কা, গর্ভবতী বা স্তন্যপায়ী শিশুর জননী হয় তাহা হইলে তাহারা ২০ এমন কি সময়ে সময়ে ৩০ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত হস্তের অলঙ্কার ধারণ করে। পরে কোন নিকটাত্মীয়ের মৃত্যু হইলে বা কোন তীর্থক্ষেত্রে গমনপূর্ব্বক অলঙ্কার ত্যাগ করে ও মস্তক মুণ্ডিত করে। স্বামীহীনা কখনও সীমন্তে সিন্দূর রাখিতে পায় না। সাধারণতঃ বিধবারা সাদাসিধা কৃষ্ণবর্ণ পরিচ্ছদ ব্যবহার করে ও লঘু-পাক আহার্য্যাদি গ্রহণ করে। কোন কোন জাতির বিধবারা লাল বা সাদা রংএর বস্ত্রাদি পরিধান করে। বিধবাদের পক্ষে সর্ব্বাপেক্ষা কঠিন কর্ত্তব্য এই যে তাহারা স্বামীর মৃত্যুর পর এক বৎসর কাল গৃহের বাহির হইতে পায় না, গৃহকোণে নির্জ্জনে বসিয়া মৃত পতির উদ্দেশে শোকপ্রকাশ করিতে হয়। এক বৎসর অতীত হইলে, ইচ্ছা করিলে বিধবা পিতৃগৃহে যাইয়া আবার পত্যন্তর গ্রহণ করিতে পারে। বিধবাদের ছায়া পর্য্যন্ত মহারাষ্ট্র দেশে দুর্ভাগ্যের সহচরী জ্ঞানে অবজ্ঞাত হয়, সুতরাং হতভাগিনীরা বঙ্গ বিধবার ন্যায় কোন মাঙ্গলিক কার্য্যে

যোগদান করিবার অধিকার হইতে বঞ্চিতা। তাহারা শ্বশুর-গৃহে দাসীবৃত্তি করে, 'কথা' প্রভৃতি ধর্ম্মোপদেশ শ্রবণ করে আর তীর্থদর্শনে অবশিষ্ট জীবনটুকু কাটায়।

মহারাষ্ট্রীয় দেশে কুমারী বিবাহের ন্যায় বিধবা-বিবাহে কোন বিশেষ আড়ম্বর হয় না। সচরাচর বিধবা-বিবাহ-রাত্রেই হয়, এইজন্য উহাকে 'নাত্রা' বলে। ব্রাহ্মণের দ্বারাই বিধবা-বিবাহ-ক্রিয়া সম্পন্ন হয় কিন্তু নীচ জাতির মধ্যে ('কুণী' অর্থাৎ চাষী প্রভৃতি) কোন ক্রিয়াকলাপ হয় না সুতরাং পুরোহিতের কোন আবশ্যক নাই। তাঁহাদের বিধবারা ভাবী স্বামীপ্রদত্ত বস্ত্রালঙ্কারে ভূষিতা হইয়া জলপূর্ণ কলস মস্তকে ধারণপূর্ব্বক স্বামী গৃহে প্রবেশ করে। আত্মীয়েরা নবদম্পতীর মস্তকে ধান্যনিক্ষেপপূর্ব্বক আশী-র্ব্বাদ করে—পরে একত্র বসিয়া মিষ্টান্নাদি আহার করে। কিন্তু সম্ভ্রান্ত বংশের নিয়ম, এই যে—আত্মীয় স্বজন সহ বর কন্যাগৃহে গমন পূর্ব্বক কন্যার পিতাকে পণস্বরূপ কিছু উপঢৌকন প্রদান করিলে কন্যাকর্ত্তা বিবাহের অনুমতি প্রদান করে। তৎপরে যথাবিধি মাঙ্গলিক কর্ম্মাদির অনুষ্ঠানের পর বধূসহ বর নিজ গৃহে প্রত্যাগমন করে। তাহাদের মধ্যেও ধান্য দ্বারা আশীর্ব্বাদ-প্রথা আছে। সমস্ত ক্রিয়াদি সম্পন্ন হইবার পর বিধবা-কন্যার পিতা স্বজাতিকে আহার করায়। বিধবা-বিবাহ রবি বা মঙ্গলবারেই প্রশস্ত। 'নায়ক' জাতির বিশ্বাস যে দিনমানে বিধবা-বিবাহ হইলে অগ্নিদেব বিমুখ হন ও সমস্ত গ্রাম ভস্ম করেন। সুতরাং রাত্রেই বিধবা-বিবাহ প্রচলিত। ভীলজাতি রাক্ষস মতে বিধবা-বিবাহ করে। ভীল যুবক প্রণয়িণী বিধবাকে হরণ করিয়া পলাইয়া যায়। পরে বিধবার আত্মীয়দের ও গ্রামের মোড়লকে কিছু অর্থ প্রদান করিলে সমস্ত মিটিয়া যায়। বিবাহের পর দিবস নবদম্পতী গ্রাম হইতে দুই তিন ক্রোশ দূরবর্ত্তী কোন নির্জ্জন স্থানে গমন করে ও সন্ধ্যার পর প্রত্যাবর্ত্তন করে।

মহারাষ্ট্রে বিবাহ-বন্ধন ছেদন।—উচ্চবংশীয় হিন্দুদের মধ্যে স্বামী-স্ত্রী ত্যাগ বিরল। যে সকল জাতি বিধবা-বিবাহ সমর্থন করে তাহাদের মধ্যেই বিবাহ-বন্ধন-ছেদন-প্রথা দৃষ্ট হয়। ভাটু, কাম্বী প্রভৃতি সম্ভ্রান্ত বংশের মধ্যে স্বামী স্ত্রীত্যাগ করে কিন্তু স্ত্রী ইচ্ছা করিলে স্বামীত্যাগ করিতে পারে না। কুণ্‌, মালী প্রভৃতি নীচবংশে উভয়ে উভয়কে ত্যাগ করিতে পারে বটে কিন্তু তাহাদের জাতীয় পঞ্চায়তের অনুমতির প্রয়োজন। 'কুণী' জাতীয় কোন ব্যক্তি স্ত্রীত্যাগ কালে তাহাদের আচারানুযায়ী সকলের সম্মুখে স্বীকার করে যে সে তাহার

[illegible]—নতুবা ত্যাগ অসিদ্ধ। কিন্তু [illegible]-রমণী যদি স্বামী-ত্যাগ করিতে [illegible] তাহা হইলে তাহাকে তাহার স্বামী বিবাহের সময় যে পাণা অর্থাৎ পণ দিয়াছিল তাহা প্রত্যর্পণ করিতে হয়। নায়কের (চাষী) ষোল টাকা পাইলেই [illegible] উপর সমস্ত স্বত্ব ত্যাগ করে। কিন্তু পুরুষ যদি পত্নীত্যাগ করিতে [illegible] হইলে কিছুই পায় না। স্বামীকে বিবাহের ব্যয় প্রত্যর্পণ করিতে পারিলেই ভীল রমণীরা যথা ইচ্ছা যাইতে পারে।

মহারাষ্ট্রে সচরাচর স্বামী-স্ত্রীর মনান্তর হইলে বা ব্যভিচার ঘটিলেই পরস্পর পরস্পরকে ত্যাগ করে। আর নীচজাতির মধ্যে অতি সামান্য কারণেই দাম্পত্যবিচ্ছেদ ঘটে। ঢেড় জাতি যখন ইচ্ছা পরস্পরকে ত্যাগ করে—আর চণ্ডাল, ডোম প্রভৃতিরা পথ করিয়া সঙ্গ পরিবর্ত্তন করে।

স্বামীত্যক্তা রমণী বিধবা বলিয়া গণ্য হয়। স্বামীর ঔরসজাত সন্তানের প্রতি তাহার কোনও অধিকার থাকে না, আর যখন ইচ্ছা সে পুনরায় বিবাহ করিতে পারে।

মুসলমানেরা কোরাণের নির্দেশ-অনুসারে যখন ইচ্ছা স্ত্রীত্যাগ করিতে পারে বটে কিন্তু ভারতবাসী মুসলমানগণ হিন্দুদের সহিত বাস করিয়া তাহাদের ন্যায় স্ত্রীত্যাগ করিতে চাহে না। ইহার আরও একটা কারণ আছে—একবার স্ত্রী-ত্যাগ করিলে কেহই শীঘ্র তাহাকে কন্যা দিতে চাহে না। সুতরাং সহজে তাহারা ভিন্ন হয় না। পতিত্যাগ করিবার পর তিন মাস স্ত্রী পুনরায় বিবাহ করিতে পারে না। সাধারণতঃ স্বামীত্যক্তা রমণী পুনর্ব্বার বিবাহে স্বীকৃত হয় না। তাহারা বলে, ইচ্ছা করিলেই শয্যা-পরিবর্ত্তন করা যায় বটে কিন্তু অদৃষ্টের লিখন তো আর বদলায় না তবে আবার বিবাহ কিজন্য করিবে—অদৃষ্টে যাহা আছে হইবে। হায়! এ পোড়া দেশের পাশ্চাত্য সভ্যতালোকপ্রাপ্তা উচ্চশিক্ষিতা বঙ্গরমণীর মনে কি একথা কখনও জাগিবে?

বহু বিবাহ।—যদিও শাস্ত্রানুসারে হিন্দু বহু-বিবাহ করিতে অধিকারী কিন্তু মহারাষ্ট্র দেশে ব্রাহ্মণ ও বৈশ্যেরা কদাচিৎ একাধিক বিবাহ করে। তবে ব্রাহ্মণমধ্যে [illegible], সন্ন্যাসী ও তপোধনেরা এবং বৈশ্যমধ্যে দেশবর্ণীরা বহু বিবাহ করে। অন্যান্য সমস্ত জাতির মধ্যে বহু-বিবাহ-প্রথা প্রচলিত আছে। তবে সাধারণতঃ [illegible], কেবলমাত্র কন্যা-প্রসবিনী বা দুরারোগ্য ব্যাধি গ্রস্ত [illegible] পুরুষ দ্বিতীয় স্ত্রী গ্রহণ করে। 'কন্' ও [illegible] কয়েকটী [illegible] একমাত্র পত্নী জীবিতাবস্থায় জাতীয় পঞ্চায়তের অনুমতি

ব্যতীত পুনরায় বিবাহ করিতে পারে না। কিন্তু অধিকাংশ জাতি অতি সামান্য কারণেই স্ত্রী বা শ্বশুরের প্রতি ক্রুদ্ধ হইয়া পঞ্চায়তের অনুমতি না লইয়া আবার বিবাহ করে। আবার এমনও দেখা যায় যে প্রথমা পত্নী বন্ধ্যা হইলে স্বামীকে সে আবার বিবাহ করিতে অনুরোধ করে। আর পুরুষেরাও বিবাহ করিতে চায়, কারণ তাহারা ভাবী শ্বশুরের নিকট কিছু পণ আশা করে। মোটের উপর কোনও পুরুষ অপুত্রক থাকিতে চাহে না—পুত্রের জন্যই পুনঃ পুনঃ বিবাহ করে।

দক্ষিণ ভারতের মুসলমানগণ বহু বিবাহের পক্ষপাতী নহে। তবে প্রয়োজন হইলে তাহারা চারিটি পর্য্যন্ত স্ত্রী-গ্রহণ করিতে পারে। কিন্তু গুর্জ্জরের মুসলমানেরা সচরাচর অত্যন্ত দরিদ্র এইজন্য ইচ্ছা থাকিলেও ব্যয়াধিক্য-বশতঃ কেহ একাধিক বিবাহ করিতে পারে না বা চাহে না।

শ্রীচৈতন্যচরণ বড়াল।

অবশেষে।

পূজার ছুটিতে মেঝদাদার সহিত পুরী গিয়াছিলাম। জীবনে এই আমার প্রথম সমুদ্র-দর্শন। সমুদ্র দেখিয়া মনে যে কি ভাবের উদয় হইল, তাহা বুঝিতে পারিলাম না। আমার একা বেড়াইতেই বড় ভাল লাগিত। কূলে দাঁড়াইয়া অবাক্ হইয়া একদৃষ্টে তরল নীলিমার অফুরন্ত শোভা দেখিতাম; আর যখন ঢেউগুলি ভাঙ্গিয়া চূরিয়া ছুটিয়া আসিয়া পদতল ধৌত করিয়া আবার গড়াইয়া যাইত, তখন একা হাসিয়া হাসিয়া কতই না আনন্দ পাইতাম! পুরীতে আমরা প্রায় দেড় মাস ছিলাম।

আমাদের সহিত আমার এক বন্ধু, তাঁহার মাতা এবং দু'টি ছোট ভাই গিয়াছিলেন। একদিন আমরা এই কয়জনে ভুবনেশ্বর হইয়া কটক যাত্রা করিলাম। কটকে সে রাত্রি অতিবাহিত করিয়া পরদিন আবার পুরী আসিবার জন্য ষ্টেশনে আসিলাম। আমার বন্ধুটি কটক হইতে ফিরিয়া আসিলেন।

আমি, আমার বন্ধুর মাতা ও তাঁর ভাইগুটি পুত্রীর গাড়ির জন্য অপেক্ষা করিতে লাগিলাম। গাড়ি আসিলে তাঁহাদিগকে একটি 'ইণ্টার' ক্লাশে তুলিয়া দিয়া আমি গাড়ির সাম্‌নে দাঁড়াইয়া রহিলাম। গাড়ি ছাড়িবার তখনও অনেক বিলম্ব। দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া এদিক-ওদিক চাহিতে চাহিতে হঠাৎ দেখিলাম, একটি ফুটফুটে পরীর মতন ইংরেজের মেয়ে 'প্লাট্‌ফরমে' পায়চারি করিতেছে। সঙ্গে একটি বালক। বালিকা প্রায় সমস্ত গাড়ি নিরীক্ষণ করিয়া আমাদের গাড়ির একখানি গাড়ির আগে একটি সেকেণ্ড ক্লাসের সাম্‌নে দাঁড়াইয়া রহিল। মাঝে মাঝে সে তা'র 'রিষ্ট্‌-ওয়াচে' সময় দেখিতেছিল। আমি ভাবিলাম, এমন অনিন্দ্যসুন্দর রূপ বোধ হয় আর কখনও দেখি নাই। অতৃপ্তনয়নে আমি তাহার সেই অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্য দেখিতে লাগিলাম, এবং মনে মনে সে রূপের প্রশংসা করিতে লাগিলাম। কিন্তু এ কি!—চক্ষু ফিরাইতে চেষ্টা করিলাম—পারিলাম না। হঠাৎ বালিকার দৃষ্টি আমার দিকে পতিত হইলে আমার চক্ষু আপনা আপনিই নামিয়া গেল। ট্রেণ ছাড়িবার পাঁচ মিনিট আগে ঘণ্টা পড়িল। বালিকা গাড়িতে উঠিল। আমিও গাড়িতে উঠিয়া জানালার ধারে বসিয়া তাহারই কথা ভাবিতে ভাবিতে Burnsএর একটি গান মনে পড়িল।—

"Ae look deprived me O' my heart,
And I became a lover."

মনে হইতে লাগিল, আর একবার সেই কোমল সরল মুখখানি দেখিয়া আসি, আর একবার সেই এলায়িত কেশের শোভা দেখিয়া লই!

দুই তিন মিনিট কাটিয়া গেল। জানালা দিয়া মুখ বাড়াইলাম। দেখিলাম, সেই বালিকাকে এবং ছোট ছেলেটিকে লইয়া একজন টিকিট্‌-কলেক্টর নামিল। তাহারা নামিবামাত্র গাড়ি ছাড়িয়া দিল। টিকিট্‌-কলেক্টর তাড়াতাড়ি ছেলেটিকে কোলে লইয়া ছুটিয়া আসিয়া আমাদের গাড়ির দরজা খুলিয়া ছেলেটিকে ভিতরে ফেলিয়া দিল। বালিকা একটু পশ্চাতে পড়িয়াছিল, সেও ছুটিয়া আমাদের গাড়ির সম্মুখে আসিলে টিকিট্‌-কলেক্টর তাহাকে ঠেলিয়া গাড়িতে তুলিয়া দিতে চেষ্টা করিল, কিন্তু পারিল না। বালিকা গাড়ির হাতল ধরিয়া রাখিতে পারিল না। আবার একটু দৌড়িয়া হাতল ধরিবার জন্য হাত বাড়াইল। তখন আমিও ভিতর হইতে দক্ষিণ হস্ত বাড়াইয়া দিয়া বাম হস্তে দরজার কাঠ খুব সাবধানে ধরিয়া বলিলাম, "অনুগ্রহ করে আমার হাত ধরুন।" সে হাত

ধরিল, উঠিতেও চেষ্টা করিল কিন্তু পা-দান হইতে পদস্খলন হইল। টিকিট্-কলেক্টর তখন পিছন হইতে একটু সাহায্য করিতেই আমি অনায়াসে তাহাকে গাড়ির মধ্যে তুলিয়া লইতে সমর্থ হইলাম।

গাড়িতে বসিয়া বালিকা হাঁপাইতে লাগিল। পরে একটু সুস্থ হইয়া বলিল, "আজ আপনি না ধর্‌লে বোধ হয় আমি কাটা পড়তুম!" এবং তাহাদের প্রথায় আমাকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিল।

অতি বিনীতভাবে আমি বলিলাম, "মানুষের যা কর্ত্তব্য আমি তার বেশী কিছু করি নাই, এর জন্য আর ধন্যবাদ কি?"

হাতের তালুতে আমি একটু বেদনা অনুভব করিলাম। দেখিলাম, এক স্থান হইতে সামান্য রক্ত বাহির হইতেছে! সূচ বিদ্ধ হইলে যেরূপ হয় সেই-রূপ। কোথা হইতে সূচ বিঁধিল ঠিক করিতে পারিলাম না। রক্ত মুছিলাম, আবার একটু রক্ত বাহির হইল। বালিকা তাহা দেখিতে পাইল। অতি কোমল ও কাতর কণ্ঠে সে বলিল, "ইঃ! রক্ত পড়্‌চে যে!—বোধ হয় আমাকে তুল্‌বার সময় আপনার হাতে এই কাঁটাটি বিঁধে গেছে—" বালিকা যেন বড়ই ক্ষুব্ধ ও অপ্রতিভ হইয়া পড়িল।

দেখিলাম সত্যই টুপী আট্‌কাইবার একটি বড় কাঁটা! বালিকার ক্ষুব্ধ ও অপ্রতিভ ভাব দূর করিবার জন্য আমি বলিলাম, "না,—দুঃখিত হ'বার কারণ নেই, সামান্যই লেগেছে!"

তখন সে তাহার ছোট ব্যাগ হইতে একটি ক্ষুদ্র শিশি বাহির করিয়া আমার সেই ক্ষত স্থানে একটু ঔষধ দিয়া বলিল, "এখুনি ব্যথা কমে যাবে।"

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "টিকিট্-কলেক্টর্ আপনাদের সেকেণ্ড ক্লাস্ হ'তে নামিয়ে এখানে তুলে দিল কেন?"

—"কারণ আমাদের কাছে ইণ্টার ক্লাসের টিকিট্ আছে।"

—"তবে আপনি ইণ্টার ক্লাসে ওঠেন নি কেন?"

—"কোনও গাড়িই খালি পেলুম না।"

আমি আর কিছু জিজ্ঞাসা করিলাম না। আমাদের গাড়ির ঠিক পিছনেই 'European Ladies compartment' ছিল। মুখ নীচু করিয়া আমি ভাবিতে লাগিলাম, টিকিট্-কলেক্টর তাড়াতাড়ি ঠিক করিতে না পারিয়া আমাদের গাড়িতে তুলিয়া দিয়াছে।

কিছুক্ষণ আমরা উভয়েই নীরব! বালিকা আমার সাম্‌নেই বসিয়াছিল;

একবার দেখিবার ইচ্ছা হইল,—মুখ তুলিলাম। এ কি! বালিকা আমার দিকে সতৃষ্ণনয়নে কি দেখিতেছিল! মুখ ফিরাইয়া লইলই বা কেন? তাহার গণ্ডে যেন গোলাপ ফুল ফুটিয়া উঠিল! আবার ভাবিতে লাগিলাম, "বিদেশিনী কি……?"

চিন্তায় ব্যাঘাত পড়িল। ধীরে ধীরে বালিকা বলিল, "আপনারা কোথা যাবেন, জিজ্ঞেস করতে পারি কি?"

—"স্বচ্ছন্দে!—পুরী যাব।"

—"আপনাদের বাড়ি কি সমুদ্রের তীরে?"

—"হাঁ—সমুদ্রের তীরে।"

—"আমার সমুদ্র দেখ্‌তে বড় ইচ্ছে করে।"

এতক্ষণ জিজ্ঞাসা করিতে সাহস করি নাই, এইবার জিজ্ঞাসা করিলাম, "আপনি কোথায় যাবেন?"

—"খুরদা রোড। সেখানে আমার এক কাকা আছেন। তাঁর কাছেই এসেছি। মোটে এক সপ্তাহ এসেছি। জন্মাবধি লক্ষৌতে ছিলুম; সেখানে আমার আর এক কাকা সৈনিক বিভাগে কর্ম্ম করেন—আমি তাঁরই কাছে থাকৃতুম। আবার পাঁচ সাত দিন পরে লক্ষৌ ফিরে যাব।"

বালিকা অনেক কথা একেবারে বলিয়া ফেলিল। খুরদা রোড ষ্টেশনের নিকট গাড়ি আসিলে বালিকা বলিল, "আমার বোধ হয় আপনি বাঙ্গালী; আমি বাঙ্গালী……" কি বলিতে যাইতেছিল, হঠাৎ থামিল। গাড়ি ষ্টেশনে আসিল। দূরে একখানি বাড়ি দেখাইয়া সে বলিল, "ঐ বাড়িটা আমার কাকার, আমি ঐখানে থাকি।" এই বলিয়া তাড়াতাড়ি নামিয়া বিদায় লইবার জন্য কর-প্রসারণ করিলে আমি আগ্রহের সহিত তাহার হস্তধারণ করিয়া বিদায় লইলাম।

পুরীতে ফিরিয়া আসিলাম। কিন্তু দু'দণ্ডের দেখায় হৃদয়ে যে যুগান্তের পরিবর্ত্তন!—তাহারি চিন্তায় বুক ভরিয়া উঠিয়াছে!—পথের মাঝে 'পলকে যে আপনাকে হারাইয়া' আসিলাম—এ—কি?—ভালবাসা? দুর্ব্বল মনকে ধিক্কার দিতে লাগিলাম; আবার ভাবিলাম, আমার কি দোষ! যাহা সুন্দর—পবিত্র, যাহা দেখিলে মনে আপনা হ'তেই হৃদয়ের ভালবাসা উথলিয়া উঠে, তাহাকে ভালবাসিলে কি দোষ?

আমি সমুদ্রের ধারে বেড়াইতাম বটে, কিন্তু সমুদ্রের সৌন্দর্য্য যেন কমিয়া

গিয়াছে! সমুদ্রের দিকে তাকাইতাম বটে, কিন্তু দেখিতাম—কেবল তরঙ্গে তরঙ্গে সেই মুখখানি যেন ভাসিয়া বেড়াইতেছে।

কয়েক দিন এমনি তাহারি স্বপ্নে কাটিয়া গেল। একদিন সন্ধ্যার পূর্ব্বে সমুদ্রের তীরে বেড়াইতে বেড়াইতে দেখিলাম, সমুদ্রকূলে ঠিক তাহারই মতন কে যেন বসিয়া! পার্শ্বে একটি বৃদ্ধ। স্পষ্ট বুঝিতে পারিলাম না। কাছে গিয়া দেখিবার ইচ্ছা হইল। তাহাদের সম্মুখ দিয়া চলিয়া গেলাম। দেখিলাম—সেই-ই! বুকটা আনন্দে কাঁপিয়া উঠিল! কিন্তু কি আশ্চর্য্য! সে তো আমাকে চিনিতে পারিল না! ভাবিলাম, আমি বোধ হয় ভুল করিয়াছি। আবার ফিরিলাম; না, এবার সে সন্দেহ দূর হইল। তাহাদের নিকটে আসিবামাত্র বালিকা উঠিয়া আসিয়া আমার হাত ধরিয়া বলিল, "ইনি আমার কাকা" বৃদ্ধের দিকে ফিরিয়া কহিল, "কাকা, ইনিই আমার প্রাণ রক্ষা করেছিলেন।" বৃদ্ধ আহ্লাদপ্রকাশ করিয়া আমার সহিত করমর্দ্দন করিলেন এবং বসিতে বলিলেন। তার পর তাঁহাদের সহিত সমুদ্র সম্বন্ধে ও নানা বিষয়ে অনেক কথাবার্ত্তা কহিয়া আমি বিদায় লইলাম।

প্রত্যহ সন্ধ্যার সময় তাহাদের সহিত সাক্ষাৎ হইত ও বেশ গল্প-গুজব চলিত। তিন চারি দিন পরে বিদেশিনী তাহাদের বাটীতে আমাকে চায়ের নিমন্ত্রণ করিল। যথাসময়ে আমি নিমন্ত্রণ রক্ষা করিতে গেলাম। খুব আদর করিয়া তাহারা আমার অভ্যর্থনা করিল। আসিবার সময় মেরী দরজা পর্য্যন্ত আসিয়া বলিল, "আশা করি শীঘ্র আমাদের ভুলে যাবেন না।" উত্তর দিলাম "জীবনেও না।"

উজানে তরীর ন্যায় মন্থরগতিতে বাড়ির দিকে চলিলাম। যাইতে যাইতে পিছন ফিরিয়া দেখি,—মেরী তখনও দাঁড়াইয়া! দৃষ্টি আমারি দিকে! বুক কাঁপিয়া উঠিল! তবে কি মেরীও—থাক্! না, ইহা যে একেবারে অসম্ভব! আমি বাঙ্গালী, মেরী ইংরেজ! কিন্তু আবার মনে হইল, প্রণয়-রাজ্যে কি জাতিভেদ-প্রথা আছে?

পরদিন সন্ধ্যার সময় বেড়াইতে গিয়া তাহাদিগকে সমুদ্রের ধারে দেখিতে পাইলাম না! তাহাদের বাড়ি গিয়া দেখি, বাড়ি নিস্তব্ধ! কাহাকেও দেখিতে না পাইয়া চলিয়া আসিব কি না ভাবিতেছি; এমন সময় দেখি, মেরী ঘর হইতে বাহির হইয়া ইঙ্গিত করিয়া আমাকে ডাকিল! মেরীর সেই স্নেহ-ঢল-ঢল মুখখানি শুকাইয়া এতটুকু হইয়া গিয়াছে! দেখিয়া

হৃদয়ে একটা আঘাত পাইলাম; ভয় হইল। কারণ বুঝিতে না পারিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম। সে ঘরের ভিতর যাইতে বলিল। গিয়া দেখি, বৃদ্ধ রোগশয্যায় শায়িত। মেরী বলিল, "কাকার কাল রাত্রি হ'তে খুব জর হয়েছে; আজ দিনের বেলায়ও কিছু কমে নি, বরং এখন আবার খুব বেড়েছে। ভুল বক্‌চেন, অজ্ঞান হ'য়ে পড়ে আছেন, আমি একলা কি যে করবো কিছুই বুঝতে পারচি নে।" আমি বলিলাম, "খুর্‌দা রোডে আপনাদের বাড়িতে কোনও খবর পাঠিয়েছেন কি?"

—"খবর পাঠিয়ে কি করব! সেখানে তো কেউ নেই। আমার দু'টি খুড়তুত ভাই সেখানে এসেছিল, কিন্তু কাল তা'রা লক্ষ্ণৌ চলে' গেছে। এই দেখুন তাদের চিঠি।"

আমি বলিলাম, "কিছু উদ্বিগ্ন হ'বার কারণ নেই; আমার যতদূর সাধ্য আপনাকে সাহায্য করবো।" দেখিলাম—কৃতজ্ঞতায় তাহার চক্ষু দুটি ভরিয়া উঠিল!

সেই রাত্রেই আমি ডাক্তার ডাকিয়া আনিলাম। ডাক্তার বলিয়া গেল, "ঘোরতর জর-বিকার! বিকারের পূর্ণ লক্ষণ প্রকাশ পেয়েছে।" ঔষধ চলিতে লাগিল। রাত্রিতে বাড়ি ফিরিতে পারিলাম না। তাহাদের চাকর পাঠাইয়া বাড়িতে খবর পাঠাইলাম। মেরীকে বিশ্রাম করিতে বলিয়া সমস্ত রাত্রি রোগীর কাছে বসিয়া কাটাইলাম। মাঝে মাঝে মেরী সংবাদ লইয়া যাইতে লাগিল।

পরদিন সকালে বাড়ি ফিরিলাম। মেজদাদাকে সমস্ত বলিয়া আবার তথায় গেলাম। পাঁচ দিন এইরূপ ভাবে কাটিল। আমাদের শুশ্রূষায় কোনও ফল হইল না। ষষ্ঠ দিনে সমস্ত যন্ত্রণা হইতে নিষ্কৃতি পাইয়া বৃদ্ধ ইহধাম পরিত্যাগ করিল। মেরী খুড়ার শোকে একান্ত অধীর হইয়া পড়িল। আমিও চোখের জল রোধ করিতে পারিলাম না। দুই এক দিন পরে বালিকা অনেকটা শান্ত হইলে আমি তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, "আপনি এখানে একলা কি করে' থাক্‌বেন? লক্ষ্ণৌ ফিরে যাওয়া ভালো!"

"হাঁ, তাই করবো; তবে কাকাকে পত্র লিখেছি, তাঁর উত্তরের অপেক্ষা করছি।" আমি চিন্তিত হইলাম, কি করিয়া বালিকা একাকিনী বাড়িতে থাকিবে!

এই ঘটনার পাঁচ দিন পরে আমাদেরও কলিকাতা ফিরিবার দিন স্থির

হইল। আমার মাথায় যেন বজ্রপাত হইল—হৃদয়ের আধখানা এই সমুদ্রকূলে কেমন করিয়া ফেলিয়া যাইব! মেরী—মেরী—কেন তুমি আমার চোখে অমন 'সুন্দর হৃদিরঞ্জন' হইয়া ফুটিয়া উঠিলে!—

কলিকাতায় আসিবার আগের দিন সন্ধ্যাবেলা মেরীর সহিত আমাদের বাড়ির সকলে দেখা করিতে গেলেন। আমার বন্ধুর মাতা তাহাকে দেখিয়া চিনিতে পারিলেন। আমি মেরীকে তাঁহার পরিচয় দিলাম। মেরী বলিল, "আমার ভারী আক্ষেপ হচ্চে, আমি আপনাদের ভাষায় এই মহিলার সহিত কথা বল্‌তে পারছি নে।"

যাইবার সময় মেরীর নিকট বিদায় চাহিতে গেলাম!—আমার বুকের ভিতর একটা অব্যক্ত বেদনা তখন ফুলিয়া ফুলিয়া উঠিতেছিল! মেরীরও বুঝি তাই!—সে সহসা আমার কণ্ঠ আলিঙ্গন করিয়া তারপর একি......! আমি স্তম্ভিত! কিন্তু এক অশান্ত সৌভাগ্য-গর্ব্বে হৃদয় পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল! বুঝিলাম দেবী এ দীনের প্রেমাঞ্জলি গ্রহণ করিতে স্বীকৃতা! মেজদাদাও সমস্ত বুঝিয়াছিলেন।

ট্রেনে চড়িয়া মনে হইল, সমস্তই ভুল করিয়া আসিয়াছি। মেরীকে আমার ঠিকানা দিয়া আসিতে ভুলিয়া গিয়াছি! কলিকাতায় পৌঁছিয়াই তাড়াতাড়ি তাহাকে একখানি চিঠি লিখিলাম। কোনও উত্তর পাইলাম না!

কয়েক মাস কাটিয়া গেল; তবুও কোনও জবাব পাইলাম না। তখন আমার আশার দেউল ভাঙ্গিয়া পড়িল! কিন্তু মেরীর সেই কমনীয় মূর্ত্তিখানি হৃদয়ে তেমনি উজ্জ্বল হইয়া রহিল।

অগ্রহায়ণ মাসে বাড়িতে সকলে আমার বিবাহের বন্দোবস্ত করিল। কিন্তু আমি বিবাহে নারাজ হইয়া সে সম্বন্ধ ভাঙ্গিয়া দিলাম! কিন্তু হায়, মেরী কোথায়! আর কি তাহার সহিত দেখা হইবে?

(২)

নূতন বৎসর আসিল। একদিন সাহেব-পাড়ায় উৎসব দেখিতে গেলাম। সন্ধ্যার সময় হগ্‌ সাহেবের বাজারে একটি দোকান চমৎকার সাজাইয়াছে, তাহাই দেখিতেছি;—পার্শ্ব হইতে কে ডাকিল, "খগেন বাবু!" ফিরিয়া দেখি মনমোহিনীবেশে মেরী! সে একটি ঠিকানা দিয়া বলিল, "কাল বিকালে অনুগ্রহ করে' একবার দেখা করতে পারেন?" উত্তরের অপেক্ষা না করিয়া মুহূর্ত্ত মধ্যে সে তথা হইতে চলিয়া গেল!

পরদিন নির্দ্দিষ্ট সময়ে আমি মেরীর সহিত দেখা করিলাম। খুব দুঃখ করিয়া সে বলিল, "আপনার কথা আমি কতই ভাবতুম্, কিন্তু বোধ হয় আমার কথা আপনি একবারও ভাবেন নাই !" আমি বলিলাম, "কলকাতায় এসেই আপনাকে পত্র লিখেছিলুম, কিন্তু এ পর্য্যন্ত তা'র কোনও জবাব পেলুম না।"

—"দুঃখের বিষয়,আপনারা চলে' আসার পরদিনই আমি পুরী হতে এখানে এসেছি। আপনার পত্র আমি পাই নি। খগেন বাবু, আপনি আমাকে বাঙ্গালা শেখাবেন ?"

"অতি আহ্লাদের সহিত। বাঙ্গালা শিখ্‌বেন কেন ?"

—"আপনাদের ভাষা শেখ্‌বার আমার বড় ইচ্ছা হয়েছে। আপনাদের সঙ্গে আমি বাঙ্গালায় কথা বল্‌বো।"

মন আনন্দে নাচিয়া উঠিল। মনে মনে বলিলাম, "মেরী, তবে কি যথার্থই তুমি আমার হবে !"

একখানি বাঙ্গালা বই কিনিয়া মেরীকে পড়াইতে আরম্ভ করিলাম। সে বেশ যত্নের সহিত শিখিতে লাগিল। একদিন সে আমাকে তাহার নিজের একখানি 'ফটো' দিয়া বলিল, "আপনার পরিশ্রমের পুরস্কার।" ছবিখানি লইয়া আমি একদৃষ্টে দেখিতে লাগিলাম। তাহা দেখিয়া সে আমাকে জিজ্ঞাসা করিল, "অতক্ষণ ধরে' কি দেখ্‌ছেন ?" আমি ভাল করিয়া কিছু বলিতে পারিলাম না। শুধু বলিলাম, "আপনি কি বুঝবেন !"

আমার যদি একদিন আসিতে বিলম্ব হইত, তাহা হইলে মেরী বাহিরে আসিয়া উৎসুক-চিত্তে অপেক্ষা করিত।

প্রায় ছয় সাত মাস এই ভাবে কাটিল। একদিন গিয়া দেখি, মেরী অত্যন্ত বিষণ্ণ হইয়া বসিয়া আছে ! কারণ জিজ্ঞাসা করিলে সে বলিল, "এমন কিছুই নয়। শরীরটা ভাল নেই। আচ্ছা, আপনাকে রোজ কষ্ট দিই, তার জন্য আপনি কি আমার উপর রাগ করেন ?"

—"রাগ কি জন্য কোরবো ! বরং আমি এ'তে খুব সুখী," বলিয়া মেরীর পানে একটা বুভুক্ষিত কটাক্ষপাত করিলাম !

—"আপনার কি বিবাহ হ'য়েছে ?"

মুখ নীচু করিয়া আমি উত্তর দিলাম,—"না।"

—"কাহাকেও ভালবাসেন নি ?"

—বেসেছি মেরী, প্রাণ ভরে' ভালবেসেছি ।

—"তবে তাকে বিবাহ করেন নি কেন ?"

কিয়ৎক্ষণ চুপ করিয়া ভাবিলাম, সমস্তই বলিয়া ফেলি, কিন্তু বলিতে পারিলাম না । মেরী কি আমাকে পরীক্ষা করিতেছে ! জিজ্ঞাসা করিলাম, "আপনি কাউকে ভালবাসেন নি ?"

মেরী কিছু না বলিয়া উঠিয়া গিয়া দেরাজ হইতে একখানি ছবি আনিয়া আমার হাতে দিয়া বলিল, "খগেন বাবু, ইনিই আমার প্রণয়ী । ইনি এখন লক্ষ্ণৌ আছেন । আমাদের বিবাহের সমস্তই ঠিক হয়ে গেছে । আগামী পরশ্বদিন আমি সেখানে যাব ।"

দেখিলাম, ছবিখানি একটি ইংরাজ যুবার । হায় অদৃষ্ট !

শ্রীবিপিনবিহারী চক্রবর্ত্তী ।

"ভুল-ভাঙ্গা" ।

বল সখি ! কতদিন—কতদিন আর—
রুধি রাখি প্রাণপণে এ মত্ত আবেগ ;
উদ্ধ্ শির—আকুলিয়া নাহি চাহিবার—
পুঞ্জীভূত [illegible] বন্ধ বুকদেশ ।

কে জানিত [illegible] দুটি নিরবেশ
[illegible] খুলিয়া দোরে [illegible] ধার ।

কে জানিত—মলয়ের মধু-কম্প-বেগ
ভেঙ্গে দেবে কল্পনার সুধাপাত্রাধার ।

হারায়ে গেছে সব গোল—সব একাকার,
এস দেবি ! জ্বাল দীপ—বড় অন্ধকার—
ভাবি নাই একবারও যৌবনের মাঝে
গোলাপ চলিয়া যাবে, বেঁধে যাবে হায়—
[illegible] যে [illegible] প্রিয়ে ! এ জীবন সাঁঝে
তুমি আছ—আমি আছি আর কেহ নাই ।

শ্রীনরেন্দ্রনাথ সেন ।

প্রকৃতির রণ-কৌশল ।

প্রকৃতির লীলাক্ষেত্রে প্রাণী জীবন-সংগ্রামে রক্ষা পাইবার [illegible] জীবজন্তুর যে সকল উপায় অবলম্বন করে তাহা বড়ই কৌতুকাবহ । [illegible] কথায়, অন্যের কথায় বলিতে গেলে মনে হয় যে প্রকৃতি [illegible] অনেক কৌশলে আপনার সন্তানসন্ততিগণকে শত্রুহস্ত হইতে রক্ষা

করেন। বৈজ্ঞানিকদিগের ভাষায় বলিতে হয়—যে নানারূপ কৌশল অবলম্বন করিয়া জীবন-সংগ্রামে জীবজন্তু অব্যাহতি লাভ করে।

জীবিকা-রণে জীবগণ নানা কৌশল অবলম্বন করে তাহা নিঃসন্দেহ। আমরা চারিদিকে চাহিয়া দেখিলে একথার যাথার্থ্য উপলব্ধি করিতে পারি। মানুষ যেমন দুর্ব্বল হইলে প্রবলের আশ্রয় গ্রহণ করে, প্রবলের বাহ্যিক সাজ সরঞ্জাম আয়ত্তাধীন করিয়া জীবন-সংগ্রামে জয়লাভ করে, পশুপক্ষীকীটপতঙ্গও তেমনি প্রবল জীবের বেশভূষা, চালচলন, কণ্ঠস্বর অনুকরণ করিয়া অনেক সময় আপনাদের অস্তিত্ব বজায় রাখে। পারিপার্শ্বিক অবস্থার সহিত আপনাদের শারীরিক অবস্থার সামঞ্জস্য করিতে না পারিলে কোন জীবের নিস্তার নাই। এক এক জীব এমন কৌশলে আপনার অবস্থা পারিপার্শ্বিক অবস্থার অনুরূপ করিয়া লয় যে তাহা স্মরণ করিয়া চমৎকৃত হইতে হয়।

জীবন-সংগ্রাম প্রধানতঃ দুই প্রকারের—প্রথমতঃ প্রবল জীবের কবল হইতে আত্মরক্ষা করা। দ্বিতীয়তঃ অপর জীবের সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিয়া নিজের আহার্য্য আহরণ করা। মৃগকে সিংহ ব্যাঘ্র প্রভৃতি শ্বাপদের গ্রাস হইতে আপনাকে রক্ষা করিবার জন্য যেমন সদাই সশঙ্কিত থাকিতে হয় অপর পক্ষে তেমনি অপর তৃণাহারী পশুর মুখের গ্রাস কাড়িয়া আপনার উদর পূরণের জন্য তাহাকে সর্ব্বদা ব্যস্ত থাকিতে হয়। যেমন এক পক্ষে আত্মরক্ষার জন্য তাহাকে কতকগুলা উপায় অবলম্বন করিতে হয় তেমনি দেহপুষ্টির জন্যও তাহার সামান্য পশু-বুদ্ধির বিকাশ করিতে হয়। সকল জীবের জীবন-সংগ্রামের ঐ এক নিয়ম।* এ প্রবন্ধে আমরা এই সকল কৌশলের কতকগুলি উদাহরণ দিব।

এক শ্রেণীর জীব আত্মরক্ষার জন্য বা আহার্য্য সংগ্রহের জন্য অপর প্রকার জীবের আকৃতি প্রকৃতির অনুকরণ করে, এ শ্রেণীর কৌশলের মধ্যে ইহাই প্রধান। মলয় দেশে এক প্রকার জন্তু আছে—ইহারা পোকামাকড় ছোট ছোট জীবজন্তু ধরিয়া আহার করে। ইহাদের আকৃতি ঠিক কাঠবিড়ালীর মত—ঠিক তাহাদের মত বর্ণ তাহাদের মত আকার তাহাদের মত লাঙ্গুলে ঘনঘন কেশ এবং তাহাদের মত পুচ্ছ তুলিয়া ইহারা ঘুরিয়া বেড়ায়। কীট পতঙ্গ ছোট ছোট পশু পক্ষী যেমন কাঠবিড়ালীকে হেয় জ্ঞান করে, ইহাদিগকেও কাঠ-বিড়ালী ভ্রম করিয়া সশঙ্কিত ভাবে পলায় না। ইহারা নিকটে আসিয়া তাহাদের

* অর্চ্চনা—১০ম বর্ষ ১২৩ পৃষ্ঠা।

ধরিয়া আহার করে। ইহারা জীবন সংগ্রামের জন্ত কাঠবিড়ালীর রূপ অনুকরণ করিয়া বেশ স্বল্প আয়াসে জীবিকা আহরণ করিতেছে।

আমাদের দেশের স্ত্রীজাতীয় কোকিল এবং পাপিয়ার দেহের বর্ণ অনেকটা শ্যেন পক্ষীর মত। আমার বোধ হয় দুর্ব্বলদেহ কোকিল বধূ এই গুণেই অনেক প্রবল পক্ষীর কবল হইতে আত্মরক্ষা করিতে সক্ষম হয়। ডিম ফুটাইয়া শাবক বাহির করিবার ক্ষমতা কোকিল বধূর নাই। ইহারা গোপনে কাকের বাসায় অণ্ড প্রসব করে। বোধ হয় কাকেরা ইহাকে শ্যেন ভ্রমে একটু সরিয়া যায় সেই অবসরে কোকিল তাহাদের বাসায় ডিম্ পাড়িয়া রাখে। পাপিয়াকে শ্যেন ভ্রম করিয়া অনেক পক্ষী তাহার সহিত কলহ বিবাদ করিতে অগ্রসর হয় না। অপর পক্ষে বোধ হয় পাপিয়া এইরূপ আকৃতির বলে সহজে পোকা ধরিয়া খাইতে পারে।

প্রসিদ্ধ জীবতত্ত্ববিদ্ ওয়ালেস্ সাহেব অষ্ট্রেলিয়া প্রভৃতি প্রদেশে এক প্রকার মধুভুক্ পক্ষী দেখিয়াছিলেন। তাহারা দলবদ্ধ হইয়া উড়িয়া বেড়ায় আর খুব কাকলী করে। ইহারা বড় নির্ভীক। কাক, চিল, শ্যেন প্রভৃতি সাহস করিয়া তাহাদের দল হইতে শিকার ধরিতে পারে না। এই সকল দেশে আর এক প্রকার পক্ষী আছে। তাহারা বড় দুর্ব্বল, প্রকৃতির নিয়মে কিন্তু ইহারা বাহ্যিক আকারে এবং বর্ণে এক প্রকার পূর্ব্বোক্ত মধুভুক পক্ষীর মত। তাই অন্যান্য পক্ষীরা ভয়ে তাহাদিগকে ধরিয়া খাইতে পারে না। ইহারা অপেক্ষাকৃত প্রবল পক্ষীর বর্ণ ও আকৃতি অনুকরণ করিয়া জীবন-সংগ্রামে জয়লাভ করিতে সমর্থ হইয়াছে।

সরীসৃপদিগের মধ্যে এরূপ অনুকরণ অনেক সময় দেখিতে পাওয়া যায়। বিষ নাই অথচ "কুলোপানা চক্র" অনেক সাপের আছে। অনেক শ্রেণীর সর্প বিষাক্ত নহে অথচ তাহাদের গাত্রের বর্ণ ঠিক বিষাক্ত সর্পের মত। আমেরিকার ভুজঙ্গদিগের মধ্যে এরূপ অনুকরণ ওয়ালেস্ সাহেব অনেক দেখিয়াছেন। অন্যান্য জীব ইহাদিগকে বিষাক্ত ভাবিয়া বর্জ্জন করে। ইহারা কিন্তু অপেক্ষাকৃত দুর্ব্বল হইয়াও কেবল প্রবল জীবের মত বর্ণ বিন্যাস করিয়া বিপদের হস্ত হইতে আত্মরক্ষা করিতে সক্ষম হইয়াছে।

কিন্তু ষট্‌পদদিগের মধ্যে এইরূপ অনুকরণের উদাহরণ বড় অধিক মাত্রায় দেখিতে পাওয়া যায়। অনেক প্রকারের পতঙ্গ আকৃতিতে ঠিক বোলতা, ভ্রমর বা মধুমক্ষিকার মত কিন্তু তাহারা একেবারে হুলশূন্য, অতএব দংশন করিতে

অক্ষম। ইহাদিগের দ্বারা দংশিত হইবার ভয়ে শত্রুগণ ইহাদিগকে দুর্জ্জন ভাবিয়া দূরে পরিহার করে। ইহারাও প্রাণধারণ করিতে সক্ষম হয়। অনেক ষট্‌পদের দেহের স্বাদ তিক্ত এবং দুর্গন্ধময়। ষট্‌পদ তত্ত্ববিদগণ ঠিক তাহাদের আকৃতির অনেক ষট্‌পদ আবিষ্কার করিয়াছেন। ইহারা সুস্বাদু হইলেও বর্ণ অনুকরণ করিয়া কীটভোজী পক্ষিদিগের আক্রমণ হইতে রক্ষা পায়। ইহাদিগকে ভোজন করিলে শেষে কষ্ট পাইতে হইবে ভাবিয়া বিহঙ্গমগণ ইহাদিগকে গ্রাস করে না। এক প্রকার মক্ষিকা আছে যাহাদের লার্ভা শাবক-গণ মধুমক্ষিকার লার্ভা আহার করিয়া প্রাণধারণ করে। এই মক্ষিকার আকৃতি ঠিক মধুমক্ষিকার মত। ইহারা মধুমক্ষিকার সহিত মিলিয়া তাহাদের চাকে প্রবেশ করে এবং যে ঘরে মধুমক্ষিকাদের ডিম্ব থাকে সেই ঘরে আপনারা অণ্ডপ্রসব করিয়া আসে। পরে উভয় জাতীয় ষট্‌পদের অণ্ড হইতে লার্ভা নির্গত হইলে মক্ষিকার লার্ভা মধুমক্ষিকার লার্ভায় দেহের পুষ্টিসাধন করে। মধুমক্ষিকা প্রহরিগণ কিছু বুঝিতে পারে না। তাহার পর যখন তাহারা পলাইয়া যায় তখন বুঝিতে পারে তাহাদের কি সর্ব্বনাশ হইয়াছে।

জীব-জগতে এইরূপ অনুকরণের উদাহরণ অনেক দেখিতে পাওয়া যায়। অভিব্যক্তিবাদের সাহায্যে ইহার কারণও অতি সহজে নির্ণয় করিতে পারা যায়। অবশ্য এক পক্ষী যখন অপর পক্ষীর বর্ণ বা আকৃতি অনুকরণ করে তখন সে তাহা জ্ঞানতঃ করে না একথা বলা বাহুল্য। পক্ষীর সাজসজ্জা বেশবিন্যাসের জন্য তাহাকে কোনও বিপণীতে যাইতে হয় না। তাহার বেশবিন্যাস পক্ষের বর্ণ জন্মগত, অনেক ক্ষেত্রে বংশগত। প্রাকৃতিক নির্ব্বাচনের দ্বারা এক জাতীয় পক্ষীর অপর জাতীয় পক্ষী অনুকরণ করিতে সক্ষম হয় এবং বহুদিনের নির্ব্বা-চনের ফলে এক আকৃতির অথচ বিভিন্ন প্রকৃতির জীব সৃষ্ট হয়। আমরা সংক্ষেপে সে কথা বুঝাইতে চেষ্টা করিব।

একই জননী-জঠর হইতে বিভিন্ন বর্ণের শাবক জন্মগ্রহণ করে তাহা আমরা নিত্যই দেখিতে পাই। এক কুক্কুরী কাল, সাদা, লাল তিন বর্ণের শাবক প্রসব করে, এক বিড়ালীর গর্ভ হইতে এক সঙ্গে পাঁচ বর্ণের পাঁচটি শিশু জন্মলাভ করে। পক্ষীশাবকদিগের সম্বন্ধেও একথা বলিতে পারা যায়। এ বিষয়ের কারণ বিবৃত করিবার জন্য আমরা পূর্ব্বোক্ত কাঠবিড়ালীর মত কীটভোজী চতুষ্পদের উদাহরণ গ্রহণ করিব। প্রথমে হয়ত ঐ কীটভোজী আকারে কাঠ-বিড়ালী অপেক্ষা বড় ছিল এবং তাহার বর্ণ কাঠবিড়ালীর বর্ণ হইতে বিভিন্ন ছিল

এবং সে মোটেই কাঠবিড়ালীর মত ঊর্দ্ধপুচ্ছ ছিল না। যে বনে ঐ প্রকারের জীব বাস করিত সে বনের কীটকুল তাহাদিগকে দেখিলে শশব্যস্ত হইত, আত্মরক্ষার নানারূপ উপায়-উদ্ভাবন করিত এবং ক্রমেই কীটভোজীদিগের জীবিকা আহরণ কঠিন করিয়া তুলিত। তাহারা কিন্তু কাঠবিড়ালী দেখিলে আদৌ ভীত হইত না। তাহারা তাহাদিগের সামান্য কীটবুদ্ধিতে বুঝিয়াছিল যে ঊর্দ্ধপুচ্ছ খর্ব্বাকার কাঠবিড়ালী নিরীহ জীব, তাহাদের সম্মুখে নির্ভয়ে আত্মপ্রকাশ করিতে পারা যায়। পূর্ব্বে বলিয়াছি এক মাতার নানা বর্ণের সন্তান জন্মিতে পারে। খাদ্যাভাবে হউক বা অপর কারণেই হউক সেই কীটভোজীদিগের বংশে যে সকল সন্তান জন্মিতে লাগিল তাহাদের মধ্যে কতকগুলা খর্ব্বাকৃতি হইল, গাত্রের বর্ণও কতকটা বিভিন্ন হইয়া নিরীহ কাঠবিড়ালীর বর্ণের অনুরূপ হইল। কতকগুলা সন্তানসন্ততি হয়ত বাপ পিতামহের মত খুব লম্বা চওড়া দেহ প্রাপ্ত হইল, আবার কতকগুলা হয়ত অন্য রকম কলেবর লইয়া ইহলীলা আরম্ভ করিল। এই সকল সন্তানের মধ্যে যেগুলা বাপ পিতামহের বর্ণের তাহারা কীটজগত হইতে খাদ্যসংগ্রহ করিতে পারিল না। অনশনে অকালে কেহ কেহ প্রাণত্যাগ করিল, কেহ সে অরণ্য পরিত্যাগ করিয়া নূতন কর্ম্মক্ষেত্রে প্রস্থান করিয়া নূতন উদ্যমে কীট জাতির বংশনাশ করিতে প্রবৃত্ত হইল। তাহাদের আর বংশ বৃদ্ধি হইল না, জীবিকারণে ভঙ্গ দিয়া তাহারা পলায়ন করিল, তাহাদের মত সবল দেহ কীটভোজী আর জন্মিল না। তাহাদের মধ্যে যেগুলা একটু খর্ব্বাকৃতি হইয়াছিল, যাহাদের বর্ণের সহিত কাঠবিড়ালীর বর্ণের একটু সাদৃশ্য ছিল তাহাদের একটু সুবিধা হইল। তাহাদের দেখিয়া কীটগণ আর তত ত্রস্ত হইল না সুতরাং তাহাদের ভোজনকার্য্য বেশ চলিতে লাগিল। ক্রমে তাহাদের সন্ততির মধ্যে যেগুলা আরও খর্ব্বাকৃতি হইল, যাহাদের বর্ণের সহিত কাঠবিড়ালীর বর্ণের আরও অধিক সাদৃশ্য জন্মিল, নূতন জীবন-সংগ্রামে তাহাদের একটু সুবিধা হইল। বংশানুক্রমিক এইরূপ সামান্য পার্থক্যের ফলে সেই কীটভোজী জাতির একেবারে কলেবর পরিবর্ত্তিত হইল। এখন তাহাদের দেখিলে মনে হয় যেন তাহারা কাঠবিড়ালীর অনুকরণ করিয়া দেহ গঠিত করিয়াছে, যেন তাহাদের আহার্য্য আহরণ করিবার শক্তি দিবার জন্য প্রকৃতি-জননী তাহাদের শরীরের এরূপ আকৃতি করিয়াছেন। স্বাভাবিক নির্ব্বাচনের ফলে দেহের বর্ণ পরিবর্ত্তিত করিয়া ঐরূপ জীব জীবন-সংগ্রামে জয়লাভ করিয়াছে, শত্রুর চক্ষে ধূলি নিক্ষেপ করিয়া সন্তান সন্ততির দ্বারা ধরাতল সজ্জিত করিতেছে।

এই ত গেল এক প্রকার কৌশল। অপর প্রকার কৌশল ধরণীর বর্ণের সহিত আপনাদের দেহের বর্ণের সামঞ্জস্য করিয়া লওয়া। অবশ্য বিজ্ঞানের ভাষায় বলিতে হয় যে অনেক জন্তু পারিপার্শ্বিক অবস্থার সহিত আপনার অবস্থার সামঞ্জস্য করিয়া জীবন সংগ্রামে জয়ী হয়—একপক্ষে প্রবল শত্রুর কবল হইতে আত্মরক্ষা করিতে পারে, অপরপক্ষে সহজে আহার্য্য সংগ্রহ করিয়া আপনার অবস্থার জীবের সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতায় জয়লাভ করে। উপরে যে নিয়ম বর্ণনা করিয়াছি তাহা হইতে বুঝিতে পারা যাইবে যে কোন বনে একটি জীবের পাঁচ বর্ণের পাঁচটি শাবক জন্মিলে যে শাবকের বর্ণ সেই বনের অনুরূপ হইবে সেই শাবকেরই আত্মরক্ষার বিশেষ সুবিধা এবং গোপনে অপর জীবকে উদরসাৎ করিবার অধিক সম্ভাবনা। ধপধপে সাদা খরগোস আমরা মনুষ্যালয়ে জন্মগ্রহণ করিতে দেখি, মাঠে যে সকল খরগোস দেখিতে পাই তাহারা কৃষ্ণ বা হরিদ্রাবর্ণ। মাঠে আদৌ সাদা খরগোস জন্মগ্রহণ করে না সে কথা কেহ বলিতে পারে না। কিন্তু সবুজ মাঠে সাদা ধপ্‌ধপে খরগোস কয়দিন প্রাণধারণ করিতে পারে? শৃগাল, কুকুর, ব্যাঘ্র, সিংহ, ভাম, খট্টাস সকলেই খরগোসের শত্রু। হরিত ক্ষেত্রে শ্বেত শশক ধরিতে ইহাদিগকে অধিক পরিশ্রম করিতে হয় না। তাই শ্বেত খরগোসের উচ্ছেদ অবশ্যম্ভাবী। পাকা ধানের ক্ষেতে একদল হরিদ্রাবর্ণের খরগোস অবলীলাক্রমে ঘুরিয়া বেড়াইতে পারে, আনন্দে ভোজন করিতে পারে, কোনও শ্বাপদ সহজে তাহাদিগের অকল্যাণ সাধিতে পারে না, কোনও কৃষক সহজে তাহাদিগের প্রতি লোষ্ট্রনিক্ষেপ করিতে পারে না।

উপরি উক্ত কারণে আমরা দেখিতে পাই যে, প্রকৃতি স্নেহভরে আপনার সন্তানদিগের বর্ণবিন্যাস গাছপালা প্রস্তর মৃত্তিকা প্রভৃতির বর্ণের অনুরূপ করিয়া দেয়। উত্তর ও দক্ষিণ মেরুর ভল্লুকগণ শ্বেত বর্ণের। বরফের উপর শ্বেত ভল্লুকের পক্ষে জীবন ধারণ করা যতটা সহজসাধ্য কৃষ্ণখক্ষের পক্ষে সাদা বরফের উপর জীবন ধারণ করা তত সুবিধাজনক নহে। টিয়া, চন্দনা প্রভৃতি শুকপক্ষী হরিত বর্ণের। তাহারা উষ্ণদেশে জন্মিয়া থাকে। গ্রীষ্মপ্রধান দেশে ধরণী উর্ব্বরা, হরিতবর্ণের বন উপবনের গ্রীষ্মপ্রধান দেশেই প্রাচুর্য্য। তাই ঐরূপ দেশে হরিত ও কৃষ্ণবর্ণের পক্ষীর প্রাদুর্ভাব অধিক।

অনেক প্রদেশ শীতকালে তুষারমণ্ডিত থাকে, বরফ গলিয়া হরিদ্রাভ পাহাড় দৃষ্টিগোচর হয়। ঐ সকল প্রদেশের পশুপক্ষীর বর্ণ শীতকালে সাদা, গ্রীষ্মে হরিদ্রাভ। আর্টিক প্রদেশের শৃগাল, এরমিন নামক জীব, আলপ্‌সের শশক এবং

টারমিগান প্রভৃতি অনেক পক্ষী শীতকালে তুষার শুভ্র এবং গ্রীষ্মে হরিদ্রাভ। মরুভূমির যত পক্ষী, যত সরীসৃপ, যত কীট পতঙ্গ সকলেরই বর্ণ বালুকার মত।

আমাদের দেশের লাউডগা সাপ এই বিষয়ের প্রকৃষ্ট উদাহরণ। ইহাদিগকে ইংরাজিতে Green whip snake বলে। আলিপুরের পশুশালায় এই জাতীয় সর্প অনেকগুলি আছে। ইহাদের বর্ণ সবুজ—ঠিক লাউ ডাঁটার মত। ইহারা গাছের সঙ্গে মিশিয়া থাকে, সুবিধা পাইলে জীবজন্তুকে দংশন করে। আমাদের দেশের বালুকার উপরও এক প্রকার বালুকার রঙের সাপ দেখিতে পাওয়া যায়।

কৈ, মাগুর, যোল প্রভৃতি মৎস্য পুষ্করিণীর পঙ্কের মধ্যে লুকায়িত থাকে। ইহাদের বর্ণও কৃষ্ণবর্ণ পঙ্কিল। যে সকল ষট্‌পদের শিশু লার্ভা পত্র ভোজন করিয়া বর্দ্ধিত হয় তাহাদের বর্ণও ঠিক সেই সকল পত্রের মত।

একটু লক্ষ্য করিয়া দেখিলে বুঝিতে পারা যায় যে বড় বড় জন্তুদিগের বিষয়েও এ নিয়ম প্রযুজ্য অর্থাৎ ইহারাও যে যেরূপ প্রদেশে বাস করে ইহাদের বর্ণ বিন্যাসও সেই প্রদেশের অনুরূপ। সিংহ পাহাড়ে এবং মরুভূমিতে বাস করে। সিংহের গাত্রের আভাও ধূসর বর্ণ একটু হরিদ্রাভ। দূর হইতে অনুর্ব্বর পাহাড়ের উপর বা মরুভূমির বালুকার মধ্যে ইহাদিগকে লক্ষ্য করিতে পারা যায় না। ব্যাঘ্র কিন্তু বাঁশের ঝোঁপে বড় বড় ঘাসের মধ্যে লুকাইয়া থাকে তাই তাহার গাত্রে লম্বা লম্বা কাল দাগ। তাহার দেহে কৃষ্ণ ও হরিদ্রাবর্ণের বিকার্ণ। জেগুয়ার প্রভৃতি বড় বড় গাছের জঙ্গলে বাস করে, গাছের ডালে উঠিতে পারে তাই তাহাদের গাত্রের বর্ণের আলো ও ছায়া জঙ্গলের আলো ও ছায়ার অনুরূপ।

বড় বড় জলজন্তুর পৃষ্ঠদেশ কৃষ্ণবর্ণ কিন্তু পেটের দিকটা সাদা। উপর হইতে দেখিলে জলাশয় প্রায় কৃষ্ণবর্ণ বলিয়া প্রতীয়মান হয় বলিয়া কচ্ছপ, কুম্ভীর প্রভৃতির বর্ণ কাল। কিন্তু জলের ভিতর হইতে দেখিলে উপরের জল আদৌ কৃষ্ণবর্ণ বলিয়া মনে হয় না তাই ইহাদের পেটের বর্ণ অপেক্ষাকৃত ফরসা। বৃন্দাবনের যমুনা কালিন্দী বলিয়াই কি বৃন্দাবনে অত কুম্ভীর ও কূর্ম্মের প্রাচুর্য্য? রুই, কাতলা এমন কি ইলিস মাছেরও উপরিভাগ অপেক্ষাকৃত কৃষ্ণবর্ণ।

বহুরূপী প্রভৃতি কতকগুলি জীব ইচ্ছামত দেহের বর্ণ বদলাইতে পারে। নিবিষ্ট চক্ষে কোনও বর্ণ দেখিলেই আপনা আপনি ইহাদের গাত্রের বর্ণ সেই প্রকার হইয়া যায়। এই সকল জীবকে অন্ধ করিয়া দিয়া দেখা গিয়াছে যে ইহাদের বর্ণ-পরিবর্ত্তন করিবার ক্ষমতা লোপ পাইয়াছে।

উষ্ণদেশে বনানী নানাবর্ণে রঞ্জিত বলিয়া এ দেশের জীবজন্তু নানাবর্ণের। পূর্ব্বেই বলিয়াছি উষ্ণদেশে হরিতবর্ণের পক্ষীর কিছু অধিক প্রাদুর্ভাব। এক একটা গিরগিটির রঙ ঠিক গাছের রঙ্গের অনুরূপ। সর্পের কথাও বলিয়াছি। ষট্পদদিগের মধ্যে এ বিষয়ে প্রকৃত কৌশল দেখিতে পাওয়া যায়। যে ফুলের সঙ্গে যে ষট্পদের প্রণয় অধিক সেই ষট্পদের বর্ণ সেই ফুলের মত। আমাদের দেশে নানাবর্ণের ফুল আছে বলিয়াই নানাবর্ণের প্রজাপতি দেখিতে পাওয়া যায়। হিমালয় প্রভৃতি পার্ব্বত্য প্রদেশেই ফুলের বর্ণশোভা তাই এ সকল দেশের প্রজাপতি, ভৃঙ্গ প্রভৃতিরও অমন বেশ বিন্যাস। বাস্তবিক ফুলের বর্ণের সহিত কীট পতঙ্গের বর্ণের সাদৃশ্য থাকে বলিয়া "কীটোঽপি সুমনসঙ্গাৎ আরোহতি সতাম্ শিরম্।"

অবশ্য এই সকল কৌশলের ভিতর প্রাকৃতিক নির্ব্বাচনের কার্য্যই সমধিক প্রতীয়মান কিন্তু তাহা বলিয়া এইরূপ অনুকরণ, এইরূপ ভাবে পারিপার্শ্বিক অবস্থার সহিত সামঞ্জস্যের মধ্যে জীবের বুদ্ধিশক্তির বিকাশ নাই একথা বলিলে জীব-জগতের উপর অযথা দোষারোপ করা হয়। নিজের দেহের স্বাভাবিক আকৃতি বুঝিয়া যে তাহারা সমান আকৃতির পারিপার্শ্বিক প্রকৃতির আশ্রয় গ্রহণ করে তাহা নিঃসন্দেহ। লাউডগা সাপ যে প্রকারেই অভিব্যক্ত হউক তাহার হরিত দেহ লইয়া সে যে হরিত বৃক্ষে শাখা ধরিয়া লতিকার মত দুলিতে আরম্ভ করে তাহা তাহার সর্প-বুদ্ধির পরিচায়ক। দেহের সঙ্গে সঙ্গে যে জীবজন্তুর মানসিক ভাবের অভিব্যক্তি হয় তাহা বেশ বুঝিতে পারা যায়। বানর নরের দেহলাভ করিয়াছে, তাহার সঙ্গে সঙ্গে বুদ্ধিমত্তায় অপর অনেক জীবের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে। অভিব্যক্তিবাদ সত্য হইলে, অভিব্যক্তির উদ্দেশ্য যে মানসিক অভিব্যক্তি, বুদ্ধির বিকাশ, ন্যায় অন্যায় বিচার বুদ্ধির প্রসার তাহা নিঃসন্দেহ। জীবন-সংগ্রামের ঘাত-প্রতিঘাতে জীবশ্রেণী যেমন অঙ্গ প্রত্যঙ্গের বিভিন্নতা লাভ করিতেছে, জীবের প্রাণধারণের সুবিধাজনক ইন্দ্রিয় লাভ করিতেছে তেমনি ক্রমশঃ অভিজ্ঞতার ফলে বুদ্ধিলাভ করিতেছে তাহা কে অস্বীকার করিবে? বুদ্ধির সহিত দয়াদাক্ষিণ্য, শ্রদ্ধাভক্তি, প্রেম প্রভৃতি বৃত্তি রাশির অভিব্যক্তি হইয়া জগতের নূতন যুগ প্রবর্ত্তিত হইতেছে। সৃষ্টির উদ্দেশ্য যে মহৎ অভিব্যক্তির লক্ষ্য যে রক্ত মাংসের বাঁধন ছাড়াইয়া উন্নত জীব বিকশিত করা তাহা স্পষ্ট বুঝিতে পারা যায়।

শ্রীকেশবচন্দ্র গুপ্ত।

বাঙ্গালা-সাহিত্য ও দ্বিজেন্দ্রলাল।

আমাদের দেশে আজকাল লোকশিক্ষার প্রধান উপায় নাট্যশালা, সংবাদ-পত্র এবং গান। গান যেরূপে অতি সহজে অতি শীঘ্র আমাদের মনের উপর আধিপত্যবিস্তার করে অপর কোনও জিনিষ সেরূপে করে না। ভাল গানের, ভাব ও ভাষা অবিনশ্বর। দেশে যে ভাব যখন প্রবল হয়, সংবাদপত্রে সে ভাব প্রথম আলোচিত হয় এবং ইতিহাসে, কাব্যে এবং গানে সেই ভাব শেষে সংরক্ষিত হয়। গত ত্রিশ বৎসরের ভাবসমষ্টি দ্বিজেন্দ্রলাল গানের আকারে যে ভাবে ধরিয়া রাখিয়াছেন, সে ভাবে অন্য কাহাকেও ধরিতে দেখি নাই। তাঁহার গানের ভাব সজীব, ভাষা সজীব, এবং যে সময়ে তিনি গান রচনা করিয়াছেন সে সময়ও সজীব। বঙ্গের সঙ্গীত-সাহিত্যে তিনি এক যুগ আনয়ন করিয়াছেন। পাশ্চাত্য শিক্ষার ফলস্বরূপ, দেশানুরাগের ভাব, যে সময় শিক্ষিত লোকের উপর প্রভাব বিস্তার করিতেছিল, দ্বিজেন্দ্রলাল সেই সময় পাশ্চাত্য সঙ্গীতের আদর্শ লইয়া সাহিত্যের আসরে নামিয়াছিলেন। তিনি পাশ্চাত্য জাতীয় সঙ্গীতের আদর্শে, আমাদের অনেক জাতীয় সঙ্গীত রচনা করিয়াছেন। পাশ্চাত্য সঙ্গীতের সুবিখ্যাত গীত-অবলম্বনে মাতৃভাষায় সঙ্গীত-রচনা করিয়া এবং সেগুলি পাশ্চাত্য সুরে তালে লয়ে বসাইয়া বঙ্গসাহিত্যের অশেষ পুষ্টিসাধন করিয়াছেন। তাঁহার রচিত গান প্রাণে যেরূপ উন্মাদনা-সঞ্চার করে, অপরের রচিত গানে সেরূপ হয় না। পাশ্চাত্য পণ্ডিতেরা বলেন যে আমাদের দেশীয় সঙ্গীত সাধারণতঃ করুণরসাত্মক, বৈরাগ্যব্যঞ্জক গিটখিরী প্লাবিত এবং নাকী সুর যুক্ত। ইহা দ্বারা কণ্ঠের 'কর্ত্তব' (vocal gymnastics) দেখান ছাড়া আর কোন জিনিষ দেখান হয় না। এবং ইহা গাহিলে কিম্বা শুনিলে অবসাদ আসে। দেশীয় সঙ্গীত হইতে এই অপবাদ দূর করিবার জন্য, দ্বিজেন্দ্রলাল বাঙ্গালা সুরের সহিত পাশ্চাত্য সুরের বহুল সংযোগ ঘটাইয়াছেন, Chorus ঢুকাইয়াছেন, এবং খোলা ভরাট পুরুষোচিত স্বরে গান গাহিবার রাস্তা দেখাইয়া দেশীয় সঙ্গীতে এক নবশক্তি সঞ্চার করিয়াছেন। পাশ্চাত্য সাধারণ বিদ্যায় তিনি যেরূপ সুপণ্ডিত ছিলেন, দেশীয় ও পাশ্চাত্য সঙ্গীত বিদ্যায়ও সেইরূপ অসাধারণ ব্যুৎপন্ন ছিলেন। তাঁহার মুখে তাঁহার রচিত গান যিনি না শুনিয়াছেন তিনি গানে যে কি শক্তি এবং কি উন্মাদনা আছে, তাহা সম্যক্ উপলব্ধি করিতে পারিয়াছেন বলিয়া বোধ হয় না।

সকলেই বোধ হয় জানেন, কিছুকাল হইতে, আমাদের জাতীয় আদর্শ পাশ্চাত্য আদর্শের সহিত সংঘর্ষিত হইতেছে। তাহার ফলে আমাদের সাহিত্যে, সমাজে, এবং ধর্ম্মে এক বিরাট বিপ্লব উপস্থিত হইয়াছে। একপক্ষ বলিতেছেন যে আমাদের জাতীয় আদর্শ আমাদের জাতীয় অভ্যুত্থানের পক্ষে সম্পূর্ণ অনুপযোগী। অপর পক্ষ আবার ইহার ঠিক বিপরীত কথা বলিতেছেন। এই দুই বিপরীতগামী সভ্যতার সংঘর্ষণে পণ্ডিত, গোঁড়া, নব্যহিন্দু, ব্রাহ্ম, বিলেত-ফেরত প্রভৃতি দলের আবির্ভাব হইয়াছে। প্রত্যেক দলই সমাজে,ধর্ম্মে, সাহিত্যে প্রাধান্যলাভের চেষ্টা করিতেছে। কিন্তু কেহ কাহাকেও অতিক্রম করিয়া যাইতে পারিতেছে না। সকল দলই অল্পাধিক পরিমাণে উদ্যমহীন, মনুষ্যত্বহীন এবং ন্যাকামি-জ্যেঠামি-ভণ্ডামি-বোকামি প্রভৃতিতে পূর্ণ। এই লইয়া দ্বিজেন্দ্রলাল কখনও ব্যঙ্গ করিয়াছেন, কখনও রঙ্গ করিয়াছেন, কখনও হাসাইয়াছেন, কখনও কাঁদাইয়াছেন। এক একটি গানে প্রত্যেক দলের ন্যাকামি ভণ্ডামি প্রভৃতি, তিনি চক্ষুতে অঙ্গুলি দিয়া দেখাইয়াছেন। ফলে, দেশ হইতে অনেক ন্যাকামি ভণ্ডামি বিতাড়িত হইয়াছে। এই সকল গান অনেক স্থলেই হাস্যরসাত্মক। আমাদের মধ্যে অনেকের বিশ্বাস যে হাস্যরসাত্মক সাহিত্যের প্রয়োজন কেবল 'দন্তরুচি কৌমুদী'র বিকাশ দেখাইবার জন্য। কিন্তু ইহা নিতান্ত অসার বিশ্বাস। বর্ণনীয় পদার্থকে, প্রভূত পরিমাণে বিকৃত করিয়া আঁকিলে সহজেই যে হাসি আসে সে এক প্রকারের হাসি। সে হাসি স্নায়ুবিশেষের উত্তেজনায় উদ্ভূত। ইহার সহিত বুদ্ধির ভাবের বা হৃদয়ের কোনও সম্বন্ধ নাই। এবং ইহার অবতারণার জন্য কোনও কবিত্বশক্তির প্রয়োজন হয় না। কিন্তু অপর এক প্রকার হাসি আছে যাহা আমাদের স্নায়বিক উত্তেজনা অতিক্রম করিয়া বুদ্ধি বৃত্তির এবং হিতাহিত জ্ঞানের মূল হইতে নিঃসৃত হয়। হাসির ন্যায় কান্না, ঘৃণা, বিরক্তি, ক্রোধ প্রভৃতিও এই মূল হইতে নিঃসৃত হয়। মন হইতে এই সকলের উদ্ভব হয় বলিয়া মনে ইহাদের অনুভূতি হইয়া থাকে। এই অনুভূতি এবং বুদ্ধিবৃত্তির সাহায্যে আমরা একটা জিনিষের সহিত আর একটার তুলনায় বিচার করি। আমরা এরূপ অভ্যাসের দাস এবং চিরন্তন প্রথা বা সংস্কারের এরূপ পক্ষপাতী যে আমাদের জীবনের কোনও একটি ঘটনার সামান্য একটু ব্যতিক্রম হইলে, আমরা একেবারে অভিভূত বা বিপর্য্যস্ত হইয়া পড়ি এবং হাসিয়াই হউক বা কাঁদিয়াই হউক আমাদের ভাবপ্রকাশ করিয়া থাকি। আরও দেখা যায় যে আমাদের সকলেরই কোন না কোনরূপ ব্যক্তিগত গাম্ভীর্য্য আছে। এই

গাম্ভীর্য্য আমাদের ব্যক্তিগত বুদ্ধিবৃত্তি, অনুভূতি এবং সংস্কারের উপর নির্ভর করে। ইহাদের ইতর বিশেষ হইতে, গাম্ভীর্য্যেরও ইতর বিশেষ হইতে দেখা যায়। এই ব্যক্তিগত গাম্ভীর্য্য একটু শিথিল করিয়া দিলেই হাসির, এবং ইহা ছাড়াইয়া আরও উপরে উঠিলেই কান্নার উদ্ভব হয়। এক্ষণে দেখা গেল যে হাসি ও কান্না, এই দুই পরস্পর বিরুদ্ধ ভাব, একই জিনিষ রূপান্তরিত হইয়া একই কারণ হইতে উদ্ভূত হইয়া থাকে। এ হাসিতে অসারতা মাত্র নাই। ইহা স্বাভাবিক, সম্পূর্ণ এবং গাম্ভীর্য্যমূলক। ইহা ভাঁড়ামী এবং ব্যঙ্গ হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন এবং ইহার অবতারণার জন্য, বিশেষ কবিত্বশক্তির প্রয়োজন হয়। এই হাস্যরসের স্বার্থকতা, কবির কল্পনা এবং সহানুভূতির উপর নির্ভর করে। এই হাস্যরসের ভিতর দিয়া যে কবি যতটা করুণরস ফুটাইতে পারেন, সেই কবি ততটা উচ্চ স্থানের অধিকারী হয়েন। বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ প্রভৃতি এই রসে বিশেষ কৃতিত্ব দেখাইলেও, দ্বিজেন্দ্রলাল তাঁহাদের অপেক্ষা কম কৃতিত্ব দেখান নাই। এই রস তাঁহার হৃদয়ের সারল্যে মাধুর্য্যে এবং কারুণ্যে স্বতঃ প্রবাহিত এবং অবারিত। ইহা বিশুদ্ধ প্রীতি প্রফুল্ল এবং অসূয়াক্রোধ সম্পর্ক-শূন্য। অশ্লীল হাবভাবসমন্বিত গ্রাম্য 'দাদামহাশয়ী' রসিকতার পরিবর্ত্তে দ্বিজেন্দ্র-লাল বিশুদ্ধ হাস্যরসের এক যুগ আনয়ন করিয়াছেন। যে মনীষী আমাদের এই একঘেয়ে দারিদ্র্যদলিত, দাসত্বময় জীবন, কৌতুকের আবরণে আবরিত করিয়া আমাদের কৌতুকনেত্র-উন্মোচনে সমর্থ এবং আমাদিগকে হাসিবার, হাসাইবার এবং হাসি উপভোগ করিবার শক্তি দিতে সমর্থ, তিনি আমাদের সকলেরই শ্রদ্ধার পাত্র।

দ্বিজেন্দ্রলাল, 'শিক্ষিত' বাঙ্গালীর কবি। তিনি যে সাহিত্যের সৃষ্টি করিয়া-ছেন তাহা "শিক্ষিত" বাঙ্গালী-সমাজের জীবন্ত চিত্র। তাঁহার চিত্রগুলি নিখুঁত, তাঁহার বিশ্লেষণ শক্তি অতুলনীয়। আমার বোধ হয় তাঁহার পূর্ব্ববর্ত্তী কোনও কবিই, সাহিত্যকে সমাজের সহিত এরূপ ঘনিষ্ঠ ভাবে মিলাইতে পারেন নাই।

দ্বিজেন্দ্রলাল বাস্তব-জীবনের কবি হইলেও, বাস্তব-জীবনের চরিত্র-বিশ্লেষণে যেরূপ কৃতিত্ব দেখাইয়াছেন, আদর্শ চরিত্র-চিত্রনেও সেইরূপ কৃতিত্ব দেখাইয়া-ছেন। তাঁহার "পাষাণী" নাটকের মহর্ষি গৌতমে, তিনি আদর্শ ব্রাহ্মণ চরিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন। সে চরিত্র কি উদার, কি পবিত্র, কি মহৎ, কি ক্ষমাশীল। "রাণা প্রতাপের" প্রতাপসিংহে তিনি আদর্শ ক্ষত্রিয় চরিত্র অঙ্কিত

করিয়াছেন। সে চরিত্র কি দৃঢ়প্রতিজ্ঞ, কি উদ্যমশীল, কি ন্যায়নিষ্ঠ, কি দারিদ্র্য গৌরবে গৌরবান্বিত। হৃদয়ের শোণিত দিয়া, প্রাণপণ-আগ্রহ দিয়া, কঠোর দারিদ্র্যের সহিত নিরবচ্ছিন্ন যুদ্ধ করিয়া, প্রতিজ্ঞাপালনে তৎপর। দ্বিজেন্দ্রলালের আশ্চর্য্য সৃষ্টি, "দুর্গাদাসে"র দুর্গাদাস-চরিত্র। এ চরিত্র দেব-দুর্লভ। কি দেশহিতৈষণা, কি কর্ত্তব্যনিষ্ঠা, কি ত্যাগ, কি সংযম! নাটকে যিনি এরূপ দেবচরিত্র ফুটাইতে পারেন তিনি ধন্য।

দ্বিজেন্দ্রলালের স্বদেশানুরাগ অপরিসীম। তাঁহার মতে দেশাচারের সীমা আছে, ধর্ম্মেরও সীমা আছে, কিন্তু দেশানুরাগের সীমা নাই। দ্বিজেন্দ্রলাল আশৈশব পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত হইয়াছিলেন, পাশ্চাত্য সমাজে ঘনিষ্ঠভাবে মেশামিশি করিয়াছিলেন, পাশ্চাত্য সাহিত্যে লব্ধপ্রবেশ এবং লব্ধপ্রতিষ্ঠও হইয়াছিলেন কিন্তু তথাপি অনন্যসাধারণ দেশানুরাগের মহিমায় তিনি দেশকে ঐ পাশ্চাত্য শিক্ষার ভিতর দিয়া, পাশ্চাত্য সাহিত্যের ভিতর দিয়া, পাশ্চাত্য সমাজের ভিতর দিয়া, যে ভাবে দেখিয়াছিলেন, তেমন ভাবে বুঝি আর কেহ কখনও দেখেন নাই। আদর্শ লইয়া সমাজে চিরকালই মতভেদ থাকিবে। দ্বিজেন্দ্রলাল যে আদর্শ লইয়া সাহিত্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন সে আদর্শের পক্ষপাতী অনেকে না হইতে পারেন। কিন্তু তাঁহার অসীম দেশানুরাগের এবং অকৃত্রিম সাহিত্যসেবার পক্ষপাতী যে সকলেই ইহা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করা যাইতে পারে।

শ্রীবারিদবরণ মুখোপাধ্যায়।

৺রাম বসু।

(৺ ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত বিরচিত।)

৺"রাম বসু" যিনি কবিওয়ালাদের মধ্যে একজন সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সুবিখ্যাত কবি ছিলেন। তিনি অতি ভদ্র কুলোদ্ভব, কুলীন কায়স্থ, তাঁহার নাম "রামমোহন বসু"। কলিকাতার পশ্চিম পারস্থ শালিখা গ্রামে জন্ম গ্রহণ করেন, তাবতেই তাঁহাকে "রাম বোস্" বলিয়া জানিতেন, যথা "রাম বোসের দল" "রাম বোসের গান" ইত্যাদি। এই রাম বসু বাল্যকালে কলিকাতাস্থ যোড়াসাঁকো নিবাসী মান্যবর ৺বারাণসী ঘোষের বাটীতে তাঁহার পিসার নিকট থাকিয়া লেখা পড়া করিতেন, ইনি "জন্ম কবি" ছিলেন, পাঁচ বৎসর বয়সের সময় কবিতা রচনা

করিয়াছেন, যখন পাঠশালে লিখিতেন তখন কবিতা রচিয়া কলাপাতে লিপিবদ্ধ করিতেন, কবিওয়ালা ভবানে বেনে কোন উপায়ে তাহা জানিতে পারিয়া বিস্তর উপাসনা করত তাঁহার নিকট হইতে গান সকল গ্রহণ করিত। ঐ সময়ে বসুর বয়স ১২ দ্বাদশ বৎসরের অধিক হয় নাই, সেই সমস্ত গান গাহিয়া ঐ ভবানে বেনে অত্যন্ত প্রতিপত্তি করিয়াছিল।

এই মহাশয় ইংরাজী ভাষা কিঞ্চিৎ অভ্যাস করিয়া প্রথমে কেরাণীগিরি কর্ম্মে নিযুক্ত হয়েন, কিন্তু কবিতাকরে অতিশয় আমোদ জন্মিবায় বিষয় কর্ম্মে তাঁহার কিছুমাত্র প্রবৃত্তি ছিল না,একারণ আশু সে কর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া কেবল গান রচনায় প্রবৃত্ত হইলেন, এবং তাহাতে যতই তাঁহার অনুরাগের আধিক্য হইল, ততই দৈবশক্তির কৃপা বৃদ্ধি হইতে লাগিল। এবম্প্রকারে রাম বসুর কবিত্ব কুসুমের সৌরভ সর্ব্বত্র বিস্তৃত হইলে বড় বড় "কবিওয়ালা" মাত্রেই তাঁহার অনুগত হইতে লাগিল। প্রথমে তিনি অনুরোধ-পরবশ হইয়া বিনা বেতনে গান করিতেন। পরে সংসারের প্রয়োজন কিম্বা অনাটন বা প্রবৃত্তি অথবা লোভ দেবের আবির্ভাব বশতঃ মূল্য লইয়া গান সমস্ত বিক্রয় করিতে আরম্ভ করিলেন।

সর্ব্বাগ্রে তিনি ভবানে বেনেকে, পরে নীলু ঠাকুর, তৎপরে মোহন সরকার, সর্ব্বশেষে ঠাকুরদাস সিংহের দলে গান দিতেন। ঠাকুরদাস সিংহের জীবিতাবস্থাতেই তিনি স্বয়ং দল করিয়া বসেন। সেই দল "রাম বসুর দল" নামে ঘোষিত হওয়াতেই বসুজ বঙ্গদেশের সর্ব্বস্থানে আহূত ও সমাদৃত হইয়াছিলেন। বাঙ্গালা ১২৩৫ কিম্বা ৩৬ সালে রামবসু লোকান্তরিত হয়েন, ইনি ৪২ বেয়াল্লিশ বৎসরের অধিককাল এই জগতীপুরে জীবিত ছিলেন না। এই সময়ের মধ্যে উক্ত কবি প্রচুর প্রকার সুখ সম্ভোগ পূর্ব্বক সমূহ সম্মান সহযোগে দেহযাত্রা নির্ব্বাহ করিয়াছেন। মুরশিদাবাদস্থ ৺রাজা হরিনাথ রায় বাহাদুরের ভবনে ৺দুর্গা পূজার সময় গান করিয়া তথা হইতে পীড়িত হইয়া আসেন, সেই সাংঘাতিক রোগেই অনিত্য শরীর পরিত্যাগ করিলেন।

কলিকাতার নিজ দক্ষিণ ভবানীপুরস্থ ভদ্র সন্তানেরা যে এক "নল দময়ন্তী" যাত্রার দল করিয়াছিলেন, অদ্যাপি যে দলের প্রতিষ্ঠা ঘোষণা হইয়া থাকে, রাম বসু সেই দলের সমুদয় গান ও ছড়া প্রস্তুত করিয়া দিয়াছিলেন। সেই গীতে গায়কেরা সকলকেই পুলকিত করিয়াছিলেন। তাহার দুইটি গানের কিয়দংশ নিম্নভাগে প্রকাশ করিলাম।

যথা— "কেনেগো, সজনী আমার, উড়ু উড়ু করে মন্।
পিঞ্জরের পাখি যেমন, পলাবারি আকিঞ্চন।"

তথা— "নল্ নল্ নল, বলিস্ কি, তা বল।
দাবানল, মনানল, প্রেমানল, কি অনল, কি সেই, কুল মজানে কামানল্।"

রাম বসু ভবানী বিষয়, সখীসংবাদ, বিরহ, খেউড়, লহর, সপ্তমী, শ্যামা বিষয়ের রণ বর্ণন ও টপ্পা প্রভৃতি সমুদয় গান উত্তম রচিতেন। তন্মধ্যে সপ্তমী ও বিরহ তুলনা রহিত, এই দুই গানেই তিনি অধিক প্রশংসিত হয়েন। কিন্তু তিনি সমস্ত গানই ভালরূপে রচনা করিতে পারিতেন। তাঁহার এক একটা লহর ও শ্লেষোক্ত খেউড় অতি সুন্দর, সর্ব্বমনোরঞ্জক, রহস্য পরিপূরিত।

যথা— "তেম্‌নি এই নীলুর দলে রামপ্রসাদ একটিন্।
নয় কাজের কাজী, ঠাটের বাজী, ভাইরে,
যেমন্ ঢাকের পিঠে বায়া থাকে,
বাজেনাকো একটি দিন।" ইত্যাদি

এই গানের সমুদয় প্রকাশের প্রয়োজন করে না। ইহার সমুদয় শুনিলে হাসিতে হাসিতে নাড়ী ছিঁড়িয়া যায়।

যেমন সংস্কৃত কবিতায় "কালীদাস" বাঙ্গালা কবিতায় "রামপ্রসাদ" ও "ভারতচন্দ্র" সেইরূপ কবিওয়ালাদিগের কবিতায় "রাম বসু" যেমন ভৃঙ্গের পক্ষে পদ্মমধু, শিশুর পক্ষে মাতৃস্তন, অপুত্রের পক্ষে পুত্রসন্তান, সাধুর পক্ষে ঈশ্বর-প্রসঙ্গ, দরিদ্রের পক্ষে ধনলাভ, সেইরূপ ভাবুকের পক্ষে 'রাম বসুর গীত'।

যে পর্য্যন্ত রাম বসুর মৃত্যু হইয়াছে, সে পর্য্যন্ত কবিওয়ালাদিগের কবিতা শুনিয়া আর কেহই সুখি হয়েন না, তাঁহার অভাবে এককালেই এ বিষয়ে অভাব হইয়াছে বলিতে হইবেক। কোকিলের কুহুরব নিবারণ হইয়া এইক্ষণে কেবল ভেকের ধ্বনি হইতেছে, অতএব এখন এই কুরবে অধীর না হইয়া বধির হওয়াই কর্ত্তব্য হয়। নেত্র-সুখকর মনোহর ফুল্লারবিন্দ—মকরন্দ পান করিয়া আনন্দ লাভ করিলে আর কি রসহীন কণ্টকময় কেতকী কুসুমে আসক্তি জন্মে?— নীরদ নির্গত নীরানন্দ পরিহার পূর্ব্বক নিরানন্দকর লবণনীরধির নীরে কি আনন্দ জন্মিতে পারে? সুবর্ণ—সুবর্ণদর্শক অপক্ক আম্ররূপ-বৎ তাম্র দৃষ্টে কি নয়নের তৃপ্তি জন্মাইতে পারে? যাহা হউক, কীর্ত্তিকুশলে মহাত্মাগণের কীর্ত্তিকলাপ পৃথ্বীময় ব্যক্ত হইলেই অত্যন্ত সুখের বিষয় হয়। প্রার্থনা করি, জগদীশ্বর আমারদিগের এই সঙ্কল্পিত কল্পে কল্পের ঘটনা না করিয়া অল্পে অল্পে প্রসন্নতা প্রকাশ করিতে থাকুন।

অনেক গীতের অনেকাংশ প্রাপ্ত হওয়া যায় নাই, ইহার নিমিত্ত আমরা বিস্তর পর্য্যটন করিয়াছি, প্রাণপণে পরিশ্রম করিয়াছি, এবং অর্থব্যয় স্বীকার করিয়াছি, তথাচ কৃতকার্য্য হইতে পারিলাম না। সুধাপানে ক্ষুধা নিবারণ না হইলে যেমন অন্তঃকরণে অপর্য্যাপ্ত আক্ষেপ জন্মে, তদ্রূপ এতদ্বিষয়ের অপ্রাপ্তি জন্য আমারদিগের মনের সকল অভিপ্রায় বিপুল বিলাপেই বিলুপ্ত হইতেছে। কি করি, সাধ্যের অতীত কিছুই হইতে পারে না। যতদূর সাধ্য তাহা করিলাম, অথচ সর্ব্বতোভাবে অভিপ্রেত সুসিদ্ধ করিতে পারিলাম না। যে যে মহাশয় যাহা যাহা জ্ঞাত আছেন, তাহা অনুগ্রহ পূর্ব্বক লিখিয়া পাঠাইলে সংপূর্ণরূপ না হউক অনেকাংশেই মানস পরিপূর্ণ হওনের সম্ভাবনা বটে। কি পরিতাপ! দেশীয় লোকেরা ইহাতে কিছুমাত্র মনোযোগ করেন না, এই স্বাদে স্বাদিত নহেন, যিনি কিছু কিছু জানেন, তিনি মনে করেন, তাহা লিখিয়া পাঠাইলে বুঝি তাহার সর্ব্বনাশ হইয়া আমারদিগের রাজ্য লাভ হইবে। আমরা কিছু লাভের প্রত্যাশায় লোভের অধীন হইয়া এ বিষয় প্রকাশার্থ ব্যাকুল হই নাই, কেবল পূর্ব্বতন সুকবি কদম্বের কীর্ত্তিকলাপ প্রকটন করিয়া দেশের হিত সাধন জন্য এতদ্রূপ যত্ন ও চেষ্টা করিতেছি, কারণ এতদ্দ্বারা আধুনিক নব্যভব্য সভ্য জনেরা কাব্য ঘটিত প্রাচীন ব্যাপার যতই জ্ঞাত হইবেন, ততই সুখি হইতে পারিবেন, এবং গীতের রচনা দৃষ্টে ভাব, রস ও অর্থাদি সংগ্রহ করিয়া অনেক উপকার প্রাপ্ত হইবেন, শিক্ষার্থিগণ রসজ্ঞ ও গুণজ্ঞ হইয়া রচনা প্রণালী পক্ষে পরম পারদর্শি হইবেন।

আমরা রাম বসুর গীত সংগ্রহের সঙ্গে সঙ্গেই "রাসু, নৃসিংহ, হরু ঠাকুর, নীলু ঠাকুর, নিতাই দাস বৈরাগী" প্রভৃতি প্রাচীন বিখ্যাত কবিওয়ালাদিগের জীবন-চরিত্র সম্বলিত ও উত্তম উত্তম কবিতা সকল, ও কীর্ত্তনওয়ালাদিগের কীর্ত্তন, যাত্রা ও ঢপওয়ালাদিগের "ধুয়া...পদ..." ও তুক্কা সমুদয় নানা উপায়ে সংগ্রহ করিতেছি, ক্রমে ক্রমে তাহা পত্রস্থ করিয়া সাধারণের সুবিদিত করিব।

আমরা যে সকল কবিতা প্রকাশ করিতেছি, সুর সম্বলিত তাহার গাহনা শুনিলে অন্তঃকরণে আশু যেরূপ আহ্লাদ জন্মে, মুখে পাঠ করিলে তত সুখোদয় হইতে পারে না। ফলে ইহাতে কবির কবিত্ব ও বিদ্যার অন্যথা কি হইতে পারে? ঐ সমস্ত কবিতার সুর অদ্যাপি অনেকেই জ্ঞাত আছেন, তাহা বড় কঠিন নহে, সহজেই শিক্ষা হইতে পারে, যৎকিঞ্চিৎ যত্ন করিলে অনায়াসেই সুরজ্ঞ জনের নিকট হইতে অভ্যাস করিতে পারিবেন।

'হাফ্ আখড়াই' 'দাঁড়া সখের কবি' ও 'পেসাদারি' কবিতার গাহনার প্রণালী প্রায় এক প্রকার। কিছুমাত্রই প্রভেদ নাই। প্রথমে 'চিতেন' পরে 'মহড়া' সর্ব্বশেষে 'অন্তরা' গাহিতে হয়, কিন্তু লিখনকালে অগ্রে মহড়া, পরে চিতেন, শেষে 'অন্তরা' লিখিতে হইবে। পাঠকগণের মধ্যে যাঁহারা অবিদিত আছেন, তাঁহাদের বিদিতার্থ লিখিতেছি যে, পাঠকালীন্ প্রথমে 'চিতেন' পরে 'মহড়া' তৎপরে 'অন্তরা' পাঠ করিবেন এবং সুর করিয়া গাহিতে হইলেও উক্ত নিয়ম অবলম্বন করিবেন।

* * * * *

কবির দলের কবিতা সকল পয়ার, ত্রিপদী, চৌপদী ইত্যাদি কোন গ্রন্থের ছন্দে বর্দ্ধিত নহে। শুদ্ধ সুরের উপরেই নির্ভর করে। সুরানুযায়ি শব্দ বসিয়া থাকে, ইহাতে কথার ন্যূনাধিক হইলে কোন মতেই দোষ হইতে পারে না। কারণ সুরের অনুরোধে শব্দ সংযোগ করিতে হয়, এজন্য আমরা সুরাক্রান্ত উচ্চারণ ভেদে পদ সকল লিপিবদ্ধ করিলাম। যথা—কথনো, তখনো, বন্ধুগো, নীলো, কমলো, গমন্, ধর্, মান্, কর্, বল্, হাস্, বাস্, ধরো, করো" ইত্যাদি। অতএব পাঠক মহাশয়েরা এরূপ লেখাকে অশুদ্ধ জ্ঞান করিবেন না।

৺নিত্যানন্দ দাস বৈরাগী।*

কবিওয়ালার মধ্যে নিত্যানন্দ বৈরাগী অত্যন্ত বিখ্যাত ও সর্ব্বপ্রিয় ছিলেন। ইহাঁকে সাধারণে "নিতে বৈষ্ণব" বলিত, এই নিতাই দাস ঈশ্বরানুকম্পায় এতদ্দেশীয় সংগীত বিদ্যায় অতিশয় নিপুণ হইয়াছিলেন; তাঁহার কণ্ঠবিগলিত সুস্বর শুনিয়া সকলেই মোহিত হইতেন। গীত এবং গাহনার দ্বারা ইনি বহুজনের মন হরণ করিয়াছিলেন।—গাহনা বিষয়ে ইহাঁর যদ্রূপ ক্ষমতা ছিল, কবিতা রচনা পক্ষে তদ্রূপ ছিল না, তথাচ সময়ে সময়ে প্রয়োজন মতে স্বয়ং গান প্রস্তুত করিতেন; কলিকাতার সিমুলা নিবাসী ৺গৌর কবিরাজ এবং নবাই ঠাকুর নামক একজন ব্রাহ্মণ কবিতা সকল প্রবচন পূর্ব্বক ইহাঁকে প্রদান করিতেন, তাঁহারদিগের প্রণীত গীতের দ্বারা নিতাইদাস সর্ব্বত্র প্রতিষ্ঠিত হই-

---

* 'সংবাদ প্রভাকর' হইতে উদ্ধৃত। এই জীবন-চরিতের প্রথমাংশে, শেষাংশ ও অন্তর্গত স্থানে স্থানে অবান্তর বোধ হওয়ায় পরিত্যক্ত হইল।

তেন। গৌর কবিরাজ বিরহ ও খেউড় গান যেমন উত্তমরূপে রচনা করিতে পারিতেন, অন্য গান তত উত্তম করিয়া রচিতে পারিতেন না; কিন্তু তাহাও অনেকাংশে উৎকৃষ্ট হইত। উক্ত কবিরাজ নিত্যানন্দ ভিন্ন অপরাপর অনেক দলে গানের সাহায্য করিতেন, "লোকে যুগী" নামে বিখ্যাত লক্ষ্মীকান্ত কবি-ওয়ালাকে ও নীলু ঠাকুরকে সর্ব্বদাই গান দিতেন, শ্রোতৃগণ অতিশয় যত্নযোগে সেই সকল গান শ্রবণ করত বিশেষ গৌরব প্রকাশ করিতেন। নিত্যানন্দ যে সমস্ত বিরহ ও খেউড় গাহিয়া যশস্বী হয়েন তাহার অধিকাংশই ইনি রচনা করিয়া দেন।

নবাই ঠাকুরের নিবাস কোথায় তাহা জ্ঞাত হইতে পারি নাই, ফলে রচনা পক্ষে সবাই নবাই ঠাকুরের অনুরাগ করিয়া থাকেন। ইনি সকল প্রকার গান নির্ম্মাণ করিতে পারিতেন, কিন্তু তন্মধ্যে সখীসংবাদ সর্ব্বাপেক্ষাই উত্তম হইত, এবং আসরে উত্তর কাটিতে ভাল পারিতেন।

নিতাই দাস বাঙ্গালা ১১৫৮ সালে চুঁচুঁড়ার দক্ষিণ চন্দননগর গ্রামে কৃষ্ণদাস বৈষ্ণবের ভবনে জন্মগ্রহণ করেন। ইনি সপ্ততি অর্থাৎ ৭০ বৎসরের অধিক-কাল এই জগতীপুরে বিচরণ করিতে পারেন নাই। ইঁহার একমাত্র স্ত্রী এবং "জগচ্চন্দ্র, রামচাঁদ ও প্রেমচাঁদ" নামে তিন পুত্র ছিল, পিতার মরণান্তে ঐ তিন সহোদর পৃথক্ পৃথক্ রূপে তিন দল করত গাহনা দ্বারা খ্যাতিলাভ করিয়াছিল, এইক্ষণে তাহারা কেহই সজীব নাই, একে একে তাবতেই মানবলীলা সম্বরণ করিয়াছে। সংপ্রতি ঐ বংশে বংশধর কেহই নাই।

নিতাইদাস যদিও কোন শাস্ত্রাভ্যাস করেন নাই, তথাচ সভ্যতা ও বক্তৃতা গুণে কেহই তাঁহাকে অশাস্ত্রিক জ্ঞান করিতে পারিত না, কারণ বাক্পটুতা ভাল ছিল, এবং নিজে যে যে কবিতা রচিতেন তাহা নিতান্ত মন্দ হইত না। বিশেষতঃ অপরের আনুকূল্যে যে সকল কবিতা গান করিতেন, প্রায় সকলেই তৎসমুদয় তাঁহার কৃত বলিয়া জানিত। সেই গীতাবলীর শব্দ পারিপাট্য ও বিশুদ্ধ ভাব জন্য পণ্ডিতেরাও নিতাইকে পণ্ডিত বলিয়া উল্লেখ করিতেন।

ইঁহার দলে গোরাচাঁদ ঠাকুর ও নীলু ঘোষ, এই দুইজন গায়ক প্রায় তাঁহার তুল্যই ছিল। ধনিলোক মাত্রেই কোন পর্ব্বাহ উপলক্ষে কবিতা শুনি-বার ইচ্ছা হইলে অগ্রেই নিতাই দাসকে "বায়না" দিতেন। ইঁহার সহিত "ভবানী বেনের" সংগীত যুদ্ধই ভাল হইত। (যথা, কথা—"নিতে ভবানের লড়াই")

এক দিবস ও দুই দিবসের পথ হইতেও লোক সকল নীতে ওখানের লড়াই শুনিতে আসিত, যাঁহার বাটীতে গাহনা হইত, তাঁহার গৃহে লোকারণ্য হইত, ভিড়ের মধ্যে ভেদ করিয়া প্রবেশ করিতে হইলে প্রাণান্ত হইত, তৎকালে যদিও অন্যান্য অনেক দল ছিল, কিন্তু হরুঠাকুর, নিতাইদাস, এবং ভবানী বণিক্, এই তিন জনের দল সর্ব্বাপেক্ষাই প্রধানরূপে গণ্য ছিল।

এই নিত্যানন্দের গোঁড়া কত ছিল, তাহার সংখ্যা করা যায় না, কুমারহট্ট, ভাটপাড়া, কাঁচরাপাড়া, ত্রিবেণী, বালী, ফরাসডাঙ্গা, চুঁচুঁড়া প্রভৃতি নিকটস্থ ও দূরস্থ সমস্ত গ্রামের প্রায় সমস্ত ভদ্র ও অভদ্র লোক নিতায়ের নামে ও ভাবে গদগদ হইতেন। নিতাই দাস জয়লাভ করিলেই ইহাঁরা যেন ইন্দ্রত্ব পাইতেন। পরাজয় হইলে পরিতাপের পরিসীমা থাকিত না। যেন হতসর্ব্বস্ব হইলেন, এমনি জ্ঞান করিতেন, অনেকের আহার নিদ্রা রহিত হইত, কতস্থানে কতবার গোঁড়ায় গোঁড়ায় লাঠালাঠি কাটাকাটি হইয়া গিয়াছে। অন্যে পরে কা কথা, ভাটপাড়ার ঠাকুর মহাশয়েরা নিত্যানন্দকে "নিত্যানন্দ প্রভু" বলিয়া সম্বোধন করিতেন, ইহাঁর গাহনার প্রাকালে "প্রভু উঠেছেন" বলিয়াই গোঁড়ারা চলচল হইত। নিতায়ের এই এক প্রধান গুণ ছিল, যে, ভদ্রাভদ্র তাবল্লোককেই সমভাবে সন্তুষ্ট করিতে পারিতেন। বিশিষ্ট জনেরা ভদ্রগানে এবং ইতর জনেরা খেঁউড় গানে তুষ্ট হইত। এমত জনরব যে, বসন্তকালে কোন এক রজনীতে কোন স্থানে ইনি সখীসংবাদ ও বিরহ গাহিয়া আসর অত্যন্ত জমাট করিয়াছেন, তাবৎ ভদ্রেই মুগ্ধ হইয়া শুনিতেছেন, ও পুনঃ পুনঃ বিরহ গাহিতেই অনুরোধ করিতেছেন, তাহার ভাবার্থগ্রহণে অক্ষম হইয়া ছোটোলোকেরা আসরে দাঁড়াইয়া চিৎকার পূর্ব্বক কহিলা "হ্যাদ্ দেখ্ লেতাই, ক্যার্ ঝড়ি কাল্কুকিলির গান্ ধল্লি, তো, দো, দেলাম, খাড়্গা" নিতাই তচ্ছ্রবণে তৎক্ষণাৎ মোটা ভজনের খেউড় ধরিয়া তাহারদিগের অস্থির চিত্তকে সুস্থির করিলেন।

এই নিতাই দাস ১২২৮ সালে কাসিমবাজারের রাজভবনে দুর্গাপূজার সময়ে গাহনা করত প্রত্যাগত হইয়া সাংঘাতিক রোগে তনুত্যাগ করিলেন। ইনি কবিতা গাহিয়া বিস্তর ধন উপার্জ্জন করিয়াছিলেন, কিন্তু সর্ব্বদাই সৎকর্ম্মে থাকিয়া সদ্ব্যয় দ্বারা সেই ধনের সার্থকতা করিতেন, বাবাজী চুঁচুঁড়ার এক "আখড়া" ও বাটীতে এক দেবালয় প্রতিষ্ঠা করেন, বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের মতানুযায়ি "দোল" "রাস" ইত্যাদি ক্রিয়া কলাপ যথা নিয়মে করিতেন, অনেক লোককে নিত্য আহার দিতেন, অতিথি সেবায় অত্যন্ত অনুরাগ ছিল, তাঁহার

বাটীতে অতিথি আসিয়া কখনই বিমুখ হয় নাই। অধুনা জীবিত থাকিলে এতদিনে তাঁহার বয়স ১০৩ বৎসর হইত, যেহেতু ১১৫৮ সালে জন্ম লইয়া নিত্যানন্দ নিত্যানন্দ ভোগ করত ১২২৮ সালে নিত্যানন্দধামে নিত্যানন্দে লয় প্রাপ্ত হয়েন। ৩৩ বৎসরের অধিক নহে তিনি ইহলোক হইতে অবসৃত হইয়াছেন।

আমরা বহুদিন পর্য্যন্ত বহু পরিশ্রম ও বহু কষ্টভোগ করিয়া বহুস্থান হইতে বহুলোকের উপাসনা পূর্ব্বক নিতাইদাস বাবাজীর দলের কয়েকটী সংপূর্ণ ও অসংপূর্ণ গীত সংগ্রহ করতঃ নিম্নভাগে প্রকাশ করিলাম *, সকলে মনোযোগ সহযোগে এতৎপ্রতি নয়ন নিক্ষেপ করুন। এই সমস্ত অসংপূর্ণ গান যিনি সংপূর্ণ করিয়া দিবেন এবং ইহার অতীত অপরাপর কবিতা প্রদান করিবেন, আমরা তাঁহাকে পরম হিতকারী কারুণিক বন্ধু বলিয়া চিরকাল রসনাযন্ত্রে তাঁহার সুখ্যাতি ঘোষণা করিতে থাকিব। অপিচ এইস্থলে এইমাত্র আক্ষেপ রহিল যে প্রত্যেক্ কবিতায় প্রচকদিগের নাম পৃথক্ পৃথক্ করিয়া প্রকাশ করিতে পারিলাম না, কারণ কোন্ গান কাহার কৃত তাহার নির্ণয় হইল না, কিন্তু কোন কোন প্রাচীন লোকে কহেন, নিতাই যে সকল ভাল ভাল বিরহ গাহিয়াছিলেন তাহার অধিকাংশই গৌর কবিরাজের কৃত।

বন্ধু-বিয়োগে

কি বলিব আজি সখা বিদায়ে তোমায়
দু'দিনের হাসি শুধু জীবন অসার
শুনিতাম এই কথা—উপলব্ধি তার
তুমি যে বুঝালে প্রিয়! এতটা আঁধার
অমানিশা চেয়ে বেশী—ভেঙ্গে গেছে মেলা—
মেঘে মেঘে হয়ে গেছে এতখানি বেলা।
বড় শীঘ্র ফুরাইল হাসির দুদিন
শুকাইল হৃদয়ের যা কিছু নবীন!
তারপর বুঝিয়াছি ঝঞ্চা বায়ু সনে
অসার অসত্য সাথে চাপিয়া বেদনে—
শুষ্কমুখে কাষ্ঠ হাসি হাসি অকারণে
ভাঙ্গা বুক জোড়া দিয়া জীবন-যাপনে;
ধীরে অগ্রসরি যাব অনন্তের পানে
নিয়ন্ত্রিত, বিঘূর্ণিত অদৃষ্ট-বিধানে।

শ্রীউমাচরণ ধর।

* স্থানাভাববশতঃ গানগুলি উদ্ধৃত করা হইল না।

চন্দ্র *

ঊর্দ্ধে ঊর্দ্ধে [illegible] কোন্ লোকে, অন্ধকার—
কোন্ গ্রহ-উপগ্রহে কোন্ [illegible] বাঁধিয়াছ।
ছিন্ন করি প্রীতি-বাহু, রাহু-করে চন্দ্র-প্রাণ,
কে নির্দ্দয় কেড়ে নিলি, অদৃষ্টের এই দান!
ভেঙ্গে গেল চন্দ্রহাট, খেলাধুলা সব যায়—
চন্দ্রহীন [illegible]লোক পূর্ণ চন্দ্র-[illegible]।

আরক্ত নয়নদ্বয় [illegible] উন্মাদিনী—
গুমরিয়া কাঁদে শিশু, মূরছিল অর্দ্ধাঙ্গিনী।
সন্তান অধিক যে যে,—শিষ্যগণ পাগল পারা,
বিলুপ্ত বিবেকজ্ঞান, আত্মীয়স্বজন যারা।

রোগে নহে—শোকে নহে—বিশ্বত্রাস ভয়ে নহে—
তা'তে বুঝি বোঝে মন, সে আঘাত সবে সহে!
এ আঘাত বুঝি কেহ, পায় নাই আর'পর—
কেড়ে নিল মহা প্রাণ, নির্দ্দয় পিশাচ-কর!

বন্ধু-[illegible] হেন করি অদ্ভুত আদরে তুমি!
—অর্থ, যশ, কিবা হেথা নতশির চুমি চুমি।
তুমি নাই তুমি নাই, সারা বিশ্বে তুমি নাই—
এ 'নাই' ভাবিতে নাই, চাই ফিরে ফিরে চাই।

কোন্ পথ দিয়া গেলে, কোন্ মন্দাকিনী-তীরে
বল বল বিতারিয়া, পারি যদি এসে ফিরে!
এখনো গাহিছে গান—[illegible]-বীণা হাহাস্বরে;—
'ঘরের ছেলে আয়রে [illegible] দেখি তোরে আঁখি ভরে'।

শ্রী[illegible] চন্দ্র।

---

* বর্দ্ধমান [illegible] সম্মেলনের প্রথম দিবসে শ্রীযুক্ত চন্দ্রভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের [illegible] পঠিত.